বীর শ্রেষ্ঠ ভূতের গল্প

অনুবাদক

মণীন্দ্র দত্ত

রবীন্দ্রনাথ বসু

তীর্থপতি দত্ত

সুনীলকুমার ঘোষ

তুলি-কলম

১ কলেজ রো, কলকাতা ৯

তুলি-কলম

প্রথম প্রকাশ

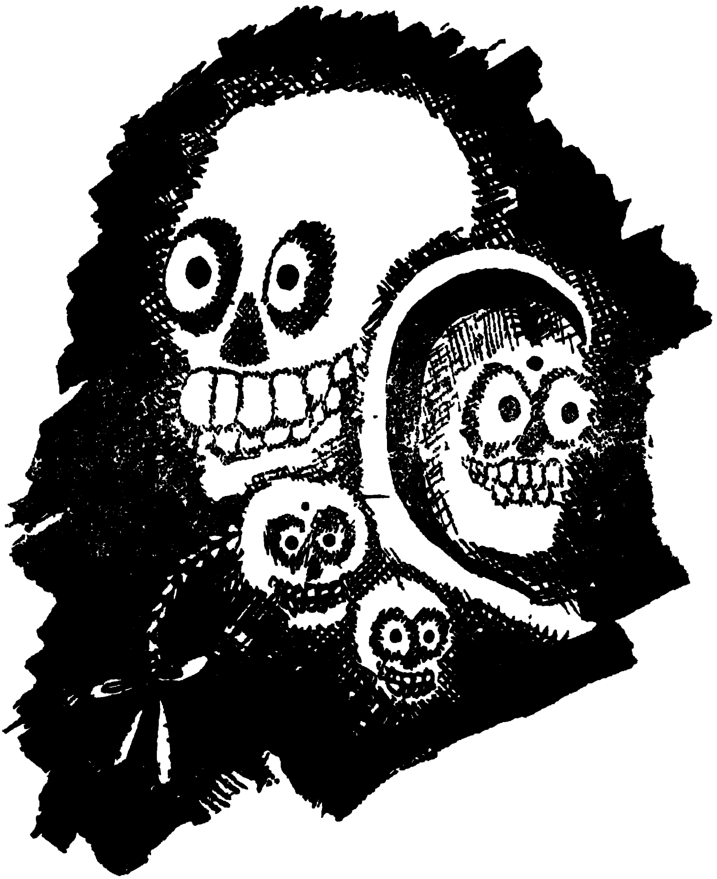
দোলপূর্ণিমা, ১৩৬০

প্রকাশক : কল্যাণব্রত দত্ত ॥ তুলি-কলম ॥
১, কলেজ রো, কলকাতা-৯

মুদ্রক : জহর ভট্টাচার্য ॥ মোহন প্রিন্টিং ওয়ার্কস ॥
২এ, কেদার দত্ত লেন, কলকাতা-৬

সঞ্জয়কুমার বারিক ॥ কণ্টাই
২৪৪/২, মাণিকতলা মেন রোড, কলকাতা-৫

প্রচ্ছদ : কুমার অজিত
অলংকরণ : অশোককুমার দত্ত



যাঁরা লিখেছেন

ই, এফ, বেনসন, এ, ই, ডি, স্মিথ, এ্যালগারনন ব্ল্যাকউড, এইচ, জি, ওয়েলস, ডবলিউ, এইচ, হাডসন, ডবলিউ ডবলিউ জ্যাকবস, এডগার ওয়ালেস, জে, এস, ফ্লেচার, এডওয়ার্ড বুলার লিটন, জোসেফ সেরিডন লি ফানু, উইলিয়ম ম্যাকেলার, অসকার ওয়াইল্ড, মপাসাঁ, থিওফিল গোতিয়ের, জন জ্যাকায়ার ফারনল, ডন গর্ণট, ড্যানিয়েল ডিফো, এইচ, রাসেল ওয়েকফিল্ড, ক্যাথারিন ক্রো, সাকি, ই, এম, ফর্স্টার, উইলিয়ম স্যানসম, রবার্ট গ্রিবস, চার্লস ডিকেন্স, উইলিয়ম উইমার্ক জ্যাকবস, মোরাগ গ্রীয়ার, ওয়াল্টার ডি লা মেয়ার, ওয়াল্টার স্কট, মার্গারেট পটার, রোজ মেরি টিমপারলি, ডোনাল্ড ই ওয়েস্টলেক, কেনেথ হারকার, মার্ক টোয়েন, জেমস হগ, পিটার টিউনিস উড, হিচকক, লেনি শাগওয়ে।



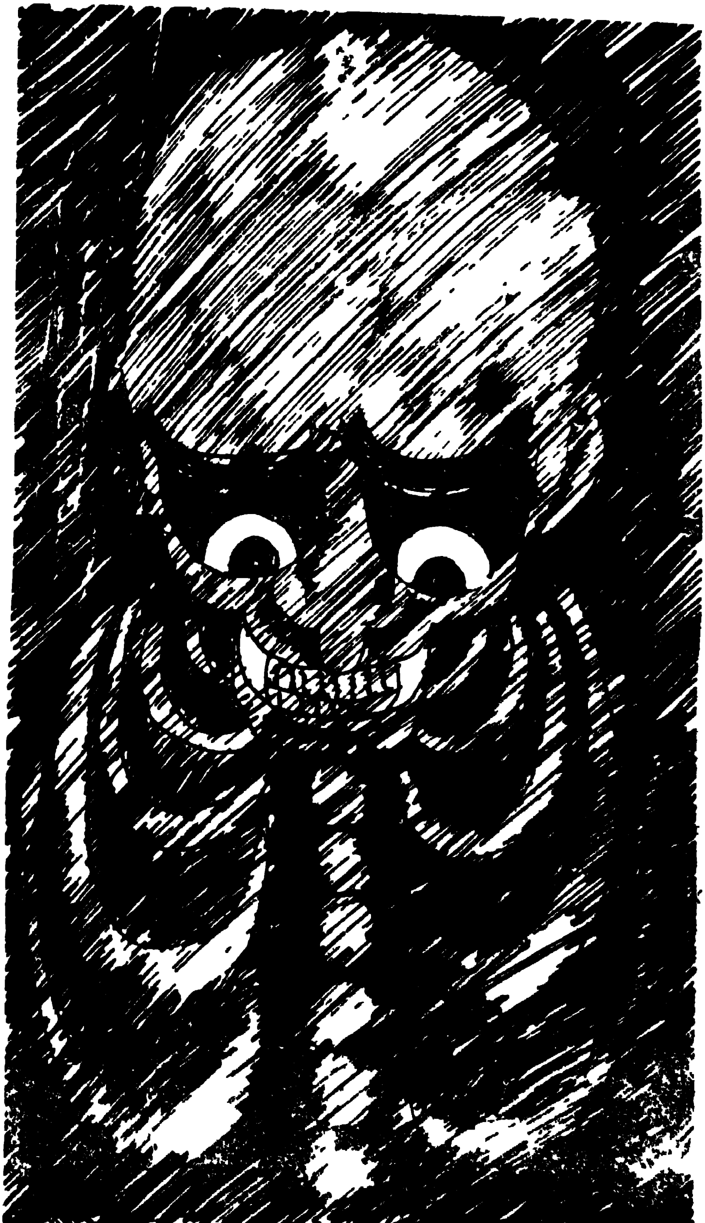


সূচীপত্র











ভূমিকা

'পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ভূতের গল্প' প্রকাশিত হ'ল। এই গল্প-সংকলনটিকে কেন্দ্র
র পাঠকমহলে যে অভূতপূর্ব সাড়া লক্ষ্য করেছি তাতে সাড়া দিয়ে যথাসাধ্য
ায় অত্যন্ত সীমিত সময়ের মধ্যে এই গ্রন্থখানি প্রকাশ করতে পারায় প্রকাশক
াবে খুবই উৎসাহ ও আনন্দবোধ করছি। বিদেশের সেকাল ও একালের
তর গল্প লেখকদের মূল গল্পগুলি সংগ্রহ, সেগুলির সুষ্ঠু ও সাবলীল অনুবাদের
স্থা, গল্পের মূল সুরের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে চিত্তাকর্ষক ছবি আঁকানো ও মুদ্রণ,
ং ছয়শতাধিক পৃষ্ঠার বৃহৎ গ্রন্থখানির মুদ্রণ পারিপাট্যের প্রতি দৃষ্টি রাখা
ত্য এক দুরূহ দায়। পাঠক-সাধারণের শুভেচ্ছা ও আশীর্বাদকে স্মরণ করে
ামত সে দায় বহন করতে চেষ্টা করেছি। তাদের সন্তোষ ও আনন্দই
াদের পাথেয়।

প্রথমেই মনে একটা প্রশ্ন জাগে: ভূত কি? ভূত কাকে বলা হয়? এক
ায় এ প্রশ্নের জবাব দেওয়া শক্ত হলেও বলা যায়: কোন মৃত ব্যক্তির আত্মা
া অশরীরী হয়ে জীবিতদের মাঝে ফিরে আসে তখনই সে আসে ভূত হয়ে।
াব্দীর পর শতাব্দী ধরে ভূত বলতে মানুষ এই বিশ্বাসকেই আঁকড়ে ধরে আছে।
সী ভাষায় ভূতকে বলা হয় revenant—যে মৃত্যু পুরী থেকে ফিরে এসেছে।

ভূত নানা রকমের হতে পারে। লোকে সাধারণভাবে বিশ্বাস করে: যে মানুষ কোন অশুভ পরিবেশে রহস্যজনকভাবে অথবা দুর্ঘটনায় মারা যায় সেই ভূত হয়ে ফিরে আসে তার পূর্ব বাসস্থানে শান্তির প্রত্যাশায়। অনেক সময়ই কোন ভুতুড়ে বাড়িকে ভেঙে ফেলতে বা সংস্কার করতে গিয়ে তার মধ্যে কোন গুপ্ত কক্ষে বা সুড়ঙ্গের মধ্যে নর-কংকাল পাওয়া যায়। সেই কংকালকে কবর দিয়ে সংকার করার পরে অনেক সময় ভূতের উপদ্রব চলেও যায়। আবার অনেক ক্ষেত্রে শুভকামী ও কল্যাণার্থী ভূতের গল্পও শোনা যায়। পাকা-চুল, মিষ্টি চেহারার বুড়ি ভূতরা অনেক সময়ই অসহায় আশ্রয়হীন শিশুদের আদর করে, যত্ন করে, রাতের বেলা এসে ঘুম পাড়িয়ে দেয়। এককথায়, মন্দ হোক আর ভাল হোক, চঞ্চল হোক আর শান্ত হোক, ভূতরা মৃত্যুপুরী থেকে ফিরে আসে—আমাদের সামনেই চলাফেরা করে, এমন কি কথাও বলে—যেভাবেই হোক তাদের অস্তিত্বকে আমরা অনুভব করতে পারি। অতএব ভূত আছে। অনেকেই তাদের দেখতেও পায়।

কিন্তু বিংশ শতাব্দী বিজ্ঞানের যুগ। কাজেই ভূত সম্পর্কে মানুষের বিশ্বাসেরও রূপান্তর ঘটছে—ঘটতে বাধ্য। আজকের মানুষের দৃঢ় বিশ্বাস: ভূত আছে, কিন্তু তারা দেহধারী জীব না হয়ে একধরনের অস্তিত্বমাত্র—বলা যেতে পারে, তারা দূরদর্শনের পর্দায় দেখা ছবির মত। তুলনাটা খুবই উপযোগী। কয়েক শ' বছর আগে কোন মানুষ যদি বৈঠকখানায় একটা বাক্সের মধ্যে চাঁদের বুকে মানুষের কাণ্ড-কারখানার ছবি দেখাতে চেষ্টা করত তাহলে তো তাকে নির্ঘাৎ ডাইনী ভেবে পুড়িয়ে মারা হত। অথচ আজকের জীবনে এটা একটা সর্বজন-গ্রাহ্য সত্য। আজ এ সবই আমাদের জানা, অন্তত জানা বলেই আমাদের ধারণা। কালক্রমে মানুষের জ্ঞানের পরিসর বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আরও কত কিছুই তো আমরা জানতে পারব, বুঝতে পারব। অথচ এটাও তো ঠিক যে আমাদের জ্ঞান-রাজ্যের দিগন্ত-রেখার ওপারে আজও এমন অনেক কিছুই আছে একশ' বছর পরে যা হয় তো আমাদের জ্ঞানের আলোয় ধরা পড়বে। আজ যেমন বেতার, দূরদর্শন, টেপ-রেকর্ডিং বা ফটোগ্রাফকে আমরা সহজেই বুঝতে পারি ও বোঝাতে পারি, অদূর ভবিষ্যতে হয় তো ভূত ও ভৌতিক অস্তিত্বকেও আমরা তেমনই সহজে বুঝতে পারব, বোঝাতেও পারব। একটা ফটোগ্রাফের জন্য দরকার একটা ক্যামেরা, একটা অনুভূতিশীল ফিল্ম, একজন ফটোগ্রাফার ও এমন একটা কিছু যার ফটো তোলা হবে। তেমনই ভূতও এমন একটি ছায়াময় অস্তিত্ব যা কোন অনুভূতিশীল বস্তু বা স্থানের উপর তার ছাপ এঁকে দেয়, আর সুবিধাজনক পরিবেশে সেই ছাপ যখন আবার সক্রিয় হয়ে ওঠে তখন হয় তো কোন নতুন ধরনের ক্যামেরার তীক্ষ্ণ অনুভূতিশীল ফিল্মে তার ছবি ধরা পড়তে পারে। একটা ক্যামেরার যেমন একজন ক্যামেরাম্যান দরকার, তেমনই এই সব ভৌতিক ছবিও কতকগুলি বিশেষ মুহূর্তে কিছু বিশেষ অনুভূতিশীল

মানুষের কাছেই ধরা পড়বে। এই হল ভূত ও ভৌতিক অস্তিত্ব সম্পর্কে পাশ্চাত্য দেশের আধুনিক মত ও বিশ্বাস।

আর এখানেই ভূত ও ভূতের গল্প সম্পর্কে আমাদেব ও বিদেশের ভাবনা ও বিশ্বাসের মধ্যে একটা চরিত্রগত পার্থক্য একান্তভাবে লক্ষণীয়। এ দেশে আমরা সচরাচর যে ধরনেব ভূতের গল্প পড়তে ও শুনতে অভ্যস্ত তাতে একটা ভৌতিক শারীর উপস্থিতি একান্তই প্রকট। আমাদের ভূতের গল্পের ভূতরা সশরীরে উপস্থিত হয়, খোনা-খোনা নাকি সুরে কথা বলে, নানা আজগুবি কাণ্ড-কারখানা ঘটায়। কিন্তু পাশ্চাত্য দেশে ভূতের গল্পে—বিশেষ করে আধুনিক লেখকদের ভূতের গল্পে—শারীর উপস্থিতির পরিবর্তে ভৌতিক পরিবেশ ও পবিমণ্ডলটাই অধিক গুরুত্বপূর্ণ। একটা গা-ছম্‌ছম্‌, মাথা-ঝিম্‌ঝিম্ আবহাওয়া সেখানে পাঠককে অভিভূত করে, কৌতূহলে উন্মুখ করে তোলে, কিন্তু কোন অলৌকিক অট্টহাসি অথবা আনুনাসিক কণ্ঠস্বর তাদেব রোমকূপকে আতংক-কণ্টকিত করে তোলে না। এ-দেশ ও ও-দেশেব ভূতের গল্পের এই চরিত্রগত ও আচরণগত পার্থক্যটুকু স্মরণে রাখতে আমরা এই গ্রন্থের আগ্রহী পাঠকদের সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাই। ভূত ও ভূতের গল্পের প্রাচীন ও আধুনিক কোন ব্যাখ্যাটি সঠিক সেটা পাঠক নিজেই স্থির করবেন। আমরা শুধু বলি: পৃথিবী অনেক বড়। আমাদের জ্ঞান-সরণী তার নাগাল পায় না। মানুষের জ্ঞান দূর-বিস্তার। অথচ বিপুলা এ পৃথিবীর কতটুকুই বা আমরা জানি!

পরিশেষে জানাই, এ বই ছোট বড় সকলের জন্য। কিন্তু সংকলনটিকে আকর্ষণীয় ও ছোটদের ভাল লাগার জন্য শিল্পীর আঁকা বিভিন্ন ধরনের ভূতের ছবি দেওয়া হলো এবং তা এই বৃহৎ বইখানির বিভিন্ন পাতায় ছড়িয়ে দেওয়া হল। ছবিতে যারা আগ্রহী তাদের খুঁজে বের করতে হবে কোন্ গল্পের ছবি কোন্‌টি।

—প্রকাশক





সব লৌকিক ছাবাও কর্তকতাপ

প্রায়শ্চিত্ত

ফাঁসির অপেক্ষায় দিন গুণছে কারাগারে বন্দী এক হত্যাকারী। এই দণ্ডের বিরুদ্ধে তার সমস্ত আবেদন নিবেদন ব্যর্থ হয়েছে। কারাগারের ডাক্তার টীসডেল নিয়মমত সপ্তাহে একবার কি দুবার প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত এই আসামীকে দেখতে আসেন। যতই তার ফাঁসির দিন এগিয়ে আসতে থাকে ডাক্তার লক্ষ্য করেন বাঁচার প্রতি আসামীর একটা জান্তব কামনা যেন ততই তাকে পেয়ে বসছে। ডাক্তার তাঁর অভিজ্ঞতায় এমন ঘটনা কখনও প্রত্যক্ষ করেন নি। আসামীর আবেদন নাকচ হওয়ার কথা জানালে, উৎকণ্ঠা ও যন্ত্রণার হাত থেকে মুক্ত হয়ে উদাসীন ভাবে সে অবশ্যম্ভাবী পরিণামের জন্য অপেক্ষা করতে থাকে।

ডাক্তারের মনে হল এ খবর তাকে সমস্ত বুদ্ধি বিবেচন রহিত করলেও যেন ব... জীবনের ওপর তার একটা প্রবল আকর্ষণ তাকে উতলা করে তুলছে। কথাটা শুনে তার মূর্চ্ছা ঘটলেও সেটা সাময়িক পরমুহূর্তে যা ঘটে গেছে সে-বিষয়ে সচেতন হয়ে ওঠে।

খুনটা একটা অদ্ভুত, আতঙ্কজনক। খুনীর ওপর জনসাধারণের কোন সমবেদনা ছিল না। খুনীর নাম চার্লস লিংকওয়ার্থ। শেফিল্ডের একটা ছোট স্টেশনারী দোকানের মালিক ছিল। তার স্ত্রী ও মায়ের সঙ্গে সে বাস করত। মা তার নৃশংসতার বলি হয়। মায়ের পাঁচশ পাউণ্ড আত্মসাৎ করাই ছিল এই জঘন্য কাজের মূল উদ্দেশ্য। আদালতের বিচারে প্রকাশ পায়, চার্লস সেইসময় একশ পাউণ্ড দেনার দায়ে পড়ে। গত কয়েক বছর ধরে তার সঙ্গে মায়ের নানা অসন্তোষ ও ঝগড়ার মধ্যে দিন কাটছিল। তিনি বেশ কয়েকবার শাসিয়ে বলেন যে তাদের সংসারে তিনি আর থাকবেন না, এমনকি প্রতি সপ্তাহে যে ... টি শিলিং করে খরচ দেন তাও বন্ধ করে দেবেন। তাঁর নিজের যে টাকা অন্যে... ছে তা থেকে আয়ের বন্দোবস্ত করবেন।

স্ত্রীর ... একদিন চার্লসের স্ত্রী কোন এক আত্মীয়ের বাড়ী যায়। সেইদিনই তার মা পাবে... থেকে সব টাকা তুলে নিয়ে আসেন। তাঁর স্ত্রীর অনুপস্থিতিতে সংসারের ... নাটি ব্যাপার নিয়ে তার মায়ের সঙ্গে ঝগড় বাধে। অশান্তি সহ্য করতে এবিষ... পরে তিনি জানান পরের দিন লণ্ডনে চলে যাবেন, সেখানে তার বন্ধুদের থাকবে... থাকবেন। কিন্তু সেই রাতে চার্লস তার মাকে গলা টিপে হত্যা করে। দিতে ... তর অন্ধকারে সেই মৃতদেহ বাড়ির পেছনে বাগানে কবর দে...।

পুলিশে... তার স্ত্রীর ফিরে আসার আগে সে যকাণ্ড করেছিল তা যুক্তিসঙ্গত ও মৃত্যু... বিচনাগ্রাহ্য। পরের দিন সকালে সে তার মায়ের জিনিসপত্র দুটো বাক্সে তাদে... ট্রেনের মালগাড়ীতে তুলে দেয়। সন্ধ্যাবেলা তার বন্ধুদের ভোজে নিমন্ত্রণ

করে। সেইসময় সে তার মায়ের অন্তর্ধানের কথা বলে। এজন্যে কোন দুঃখ প্রকাশের ভানও সে করে না। কারণ তার বন্ধুরা জানত তাদের দুজনের মধ্যে



ভাল সম্বন্ধ ছিল না। তিনি চলে যাওয়াতে ঘরের শান্তি আরো বাড়
স্ত্রী ফিরে এলে একই কথা তাকে জানাল। সেইসঙ্গে আরো বলল

এমন চরমে ওঠে যে যাবার সময় তার ঠিকানাটা পর্যন্ত দিয়ে যাননি। এটাও একটা তার বুদ্ধিমত্তার পরিচয় যাতে তার স্ত্রী কোন চিঠি লিখতে না পারে। মনে হল তার স্ত্রী কাহিনীটা পুরোপুরি বিশ্বাস করল। স্বাভাবিক, এব্যাপারে সন্দেহ করার মত বা আশ্চর্য হওয়ার কিছু ছিল না।

সাধারণত এধরনের ক্ষেত্রে অপরাধীরা একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত নিরীহ হাবভাব ও চাতুর্যের জন্যে ধরা পড়ে না। কিন্তু কিছুদিন পরে তারা সহজেই ধরা পড়ে। চার্লসের ব্যাপারেও তাই ঘটল। যেমন তাড়াতাড়ি সে ঋণ শোধ করল না, তার মায়ের খালি ঘরে এক তরুণ ভাড়াটে বসাল, তার দোকান থেকে লোক ছাড়িয়ে দিল এবং নিজেই সব কাজকর্ম করতে লাগল। এতে তার নিজের খরচার পরিচয় পাওয়া গেল। আবার একই সঙ্গে তার ব্যবসার উন্নতির কথা বলে বেড়াতে লাগল। একদিন পর্যন্ত তার মায়ের ড্রয়ার থেকে ব্যাঙ্ক নোট ভাঙাল না। তারপর হঠাৎ দুটো পঞ্চাশ পাউণ্ডের নোট ভাঙিয়ে পাওনাদারদের কিছু দেনা শোধ করল।

এইসময় থেকে সে আর নিজেকে ঠিক রাখতে পারল না। স্থানীয় ব্যাঙ্কে একটা নতুন একাউন্ট খুলল। তার সেভিংস ব্যাঙ্কে ক্রমশ টাকা বাড়িয়ে চলল। বাগানে যে কবর দিয়েছে সে ব্যাপারে অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। তাই নিজেকে আরো নিরাপদ রাখবার জন্যে ভাড়াটের সাহায্য নিয়ে সেই জায়গাটার ওপর মাটিতে পাথর দিয়ে একটা উঁচু ঢিবি তৈরি করল।

তারপর এল সেই অপ্রত্যাশিত ঘটনা যা তার এই বিপজ্জনক খেলার সমাপ্তি ঘটাল। হঠাৎ কিংস ক্রস স্টেশনের বেওয়ারিশ মালের ঘরে আগুন লাগে। তার মায়ের জিনিস আগেই সেখান থেকে নেওয়া উচিত ছিল। দুটো বাক্সের মধ্যে একটা আংশিক পুড়ে যায়। রেল কোম্পানী ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য। সেই পোড়া বাক্সটার ভেতরে মায়ের নামাঙ্কিত একটা কাপড় ও শেফিল্ডের ঠিকানা লেখা একটা খাম পাওয়া গেল। রেল কোম্পানী ক্ষতিপূরণ দেবার জন্যে মিসেস লিংকওয়ার্থের নামে একটা চিঠি পাঠাল। সেই চিঠি চার্লসের স্ত্রীর হাতে গিয়ে পড়ল। সে ভাড়াটিয়ার সামনে সেটা খুলে বিষয়বস্তু জানতে পারে।

এটা একটা নির্দোষ চিঠি মনে হলেও আসলে কিন্তু চার্লসের মৃত্যু-পরোয়ানা। এবিষয়ে চার্লসকে জিজ্ঞেস করা হল। সে তার মায়ের কোন দুর্ঘটনা ঘটে থাকতে পারে বলা ছাড়া বাক্সগুলোর ব্যাপারে আর কোন যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা দিতে পারল না। তাদের পরামর্শ অনুযায়ী মায়ের খোঁজ খবর নেবার ভার পুলিশের হাতে ছেড়ে দেবার মনস্থ করল। যদি প্রমাণিত হয় সত্যি তার মায়ের মৃত্যু ঘটেছে তবে জিনিসপত্রের সঙ্গে ব্যাঙ্কের টাকাটাও সে দাবী করবে। তাই তাদের কথা প্রত্যাখ্যান করল না।

এরপর থেকে পুলিশ তার ওপর নজর রাখতে আরম্ভ করে। ব্যাঙ্কে খোঁজ

খবর নিতে থাকে, ব্যবসার উন্নতির কারণ অনুসন্ধান করে। পাশের বাড়ির ছাদ থেকে তার বাড়ি ও বাগানের ওপর দৃষ্টি রাখে। কিছুদিন পরেই তাকে গ্রেপ্তার করে তার বিচার শুরু হয়। বিচারপর্ব বেশীদিন চলেনি। বিচার চলাকালীন কোর্টে অনেক লোকের সমাগম হত। তাদের মধ্যে বয়স্ক ভদ্র-মহিলাও ছিল। এই জঘন্য হত্যাকাণ্ড তাদের মাতৃত্বকে দারুণ আঘাত দেয়। বিচারে তার ফাঁসি হয়।

কারাগারের যাজক অনেক চেষ্টা করেও তার স্বীকারোক্তি আদায় করতে সক্ষম হয়নি। সেপ্টেম্বর মাসের এক উজ্জ্বল প্রভাতে আসামীর ফাঁসি হয়ে গেল। ডাক্তার ফাঁসিমঞ্চে উপস্থিত ছিলেন। আসামীকে ফাঁসি কাঠ থেকে গর্তের মধ্যে পড়ে যেতে দেখেছিলেন। দড়ির ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ তার কানে পৌঁছেছিল। গর্তের মধ্যে মুখ বাড়িয়ে দেহের তীব্র ছটফটানি লক্ষ্য করেছিলেন, যদিও সেটা কয়েক সেকেণ্ডের বেশী স্থায়ী ছিল না। ফাঁসি সুষ্ঠুভাবেই হয়েছে। মৃত্যু সম্বন্ধে তিনি স্থির নিশ্চিত।

এক ঘণ্টা পরে ডাক্তার পোষ্ট মোর্টম করে দেখতে পান যে ঘাড়ের কাছে মেরুদণ্ডের কশেরুকা বিচ্ছিন্ন হয়ে তৎক্ষণাৎ মৃত্যু ঘটেছে। পোষ্ট মোর্টমের কোন প্রয়োজন ছিল না। কারণ মৃত্যু সম্বন্ধে ডাক্তার নিঃসন্দেহ তবু নিয়ম রক্ষা করতে তাঁকে একাজ করতে হয়। ঠিক সেইমুহূর্তে এক বিচিত্র অনুভূতি ডাক্তারের মনকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। তিনি অনুভব করতে লাগলেন মৃতের প্রেতাত্মা যেন তার পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে। সেই ছিন্ন বিচ্ছিন্ন দেহের মধ্যে যেন প্রাণের অস্তিত্ব বর্তমান। অথচ এক ঘণ্টা আগে তার মৃত্যু হয়েছে সে সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই থাকতে পারে না। একজন ওয়ার্ডার সেইসময় এসে জানতে চাইল যে দড়িটা দিয়ে লোকটার ফাঁসি হয়েছে এবং যেটা জল্লাদের প্রাপ্য, সেটা ভুল করে মৃতদেহের সঙ্গে মর্গে এসেছে কি না। আশ্চর্যের কথা সেটা কোথাও পাওয়া গেল না। এটা তুচ্ছ ব্যাপার কিন্তু তবু যেন কিসের ইঙ্গিত করছে।

ডাক্তার অবিবাহিত। বেডফোর্ড স্কোয়ারের বাসিন্দা। এক রাঁধুনী তার রান্নার কাজ করে, তার স্বামী ডাক্তারের অন্য কাজকর্ম দেখাশুনা করে। কারাগারের ডাক্তারী করা ছাড়া রোজগারের আর দরকার ছিল না। যে টাকা তিনি পেতেন তাতে তাঁর ভালভাবেই চলে যেত। অপরাধীদের মনস্তাত্ত্বিক বিচার বিশ্লেষণের জন্যেই তিনি এই কাজ বেছে নিয়েছিলেন। তিনি মনে করতেন বেশীরভাগ পাপকাজ মস্তিষ্ক বিকৃতিজনিত অথবা, কোন কিছু থেকে বঞ্চিত হওয়ার ফলে ঘটে। যেমন, চুরি করার অপরাধ কোন একটা নির্দিষ্ট কারণে ধরা যায় না। তবে এটা সত্যি যে প্রায়শঃ অভাবের দরুণ একাজ করা হয় কিন্তু ঘন ঘন এমন হলে বুঝতে হবে সেটা মাথার কোন অজানা রোগের লক্ষণ। সাধারণত একে চৌর্যোন্মাদ হিসেবে ধরা হয়। তাঁর স্থির বিশ্বাস ছিল দৈহিক

প্রয়োজন ছাড়া আরো কিছু নিশ্চয়ই আছে। বিশেষ করে এই জঘন্য পাপ কাজের সঙ্গে হিংসাত্মক ঘটনা জড়িত। এই হত্যার প্রকৃত উদ্দেশ্য টাকাপয়সা নয়। যে জঘণ্যতা ও অস্বাভাবিকতা দেখা যায় তাতে হত্যাকারীকে সাধারণ অপরাধী বলে মনে হয় না, সে একজন উন্মাদগ্রস্ত।

যতদুর জানা যায় চার্লস ছিল শান্ত স্বভাববিশিষ্ট, উপযুক্ত স্বামী এবং মিশুকে প্রতিবেশী। সে এই অপরাধ করে এবং একমাত্র একটিই যা তাকে সমস্ত ভাবনা চিন্তার বাইরে রেখেছিল। এই ভয়ঙ্কর কাজ প্রকৃতিস্থ বা অপ্রকৃতিস্থ যেই করুক না কেন, মোটেই বরদাস্ত করা যায় না। এই পৃথিবীতে তার কোন স্থান নেই। যাই হোক, যদি আসামী তার অপরাধ স্বীকার করত, ডাক্তারের বোধ হল, সে তার বিচারের স্বপক্ষেই মত দিত। [illegible]ভাবে সে দোষী। যখন কোন আশার আলো দেখা গেল না তখন নিজেই বিচারের রায় মেনে নিয়েছিল।

সেদিন রাতে ডাক্তার খাওয়া দাওয়া সেরে নিজের ঘরে বসে আছেন। বই পড়ার কোন ইচ্ছা নেই। আনমনা হয়ে আগুনের প্লেটের দিকে মুখ করে চেয়ারে বসে আছেন। ভাবছেন তার সকালের অদ্ভুত অনুভূতির কথা, যেন চার্লসের প্রেতাত্মার উপলব্ধি, যদিও তার একঘণ্টা আগেই জীবন দীপ নিভে গেছে। এটাই প্রথম নয়, আকস্মিক মৃত্যুতে এধরনের প্রত্যয় তার আগেও হয়েছে। তবে আজ যা ঘটল তা ভোলা যায় না। তার মনের এই ভাব চেতন উপলব্ধি ও আত্মগত মনের ওপর প্রতিষ্ঠিত। এখানে বলা যেতে পারে ডাক্তার আত্মার বিশ্বাসী, মৃত্যুর পরেই যে সব শেষ হয়ে যায় তা নয়। শক্তিহীন অথবা অনিচ্ছুক আত্মা এই পৃথিবীর খুব কাছে ঘুরে বেড়ায়। ডাক্তার অবসর সময় ভূতপ্রেত নিয়ে অনেক পড়াশুনা করেছেন। পণ্ডিত ও দক্ষ ডাক্তারের মত তিনিও দেহ ও আত্মার মধ্যে ব্যবধান যে কত সূক্ষ্ম তা স্বীকার করেন, জাগতিক বস্তুর প্রতি তার ভীষণ প্রভাব যে কত অননুভবনীয় এবং একথা বিশ্বাস করতে কষ্ট হল না যে বাস্তব ও সীমাবদ্ধ মানুষের সঙ্গে বিদেহী আত্মার সোজাসুজি যোগাযোগ সম্ভব।

এইরকম নানা চিন্তার মধ্যে তিনি যখন মগ্ন টেবিলের ওপরে টেলিফোনটা তখন হঠাৎ বেজে উঠল। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার টেলিফোনের স্বাভাবিক ক্রিং ক্রিং আওয়াজটা খুব ক্ষীণ স্বরে বাজল, মনে হল বিদ্যুৎ সরবরাহ কম অথবা যন্ত্রে কোন গোলমাল হয়েছে। যাই হোক, সত্যিই ফোনটা বাজছে কিনা সন্দেহ দূর করবার জন্যে ডাক্তার উঠে গিয়ে ফোনটা তুলে কানে দিলেন।

হ্যাঁ, হ্যাঁ—আমি বলছি। কে আপনি?

টেলিফোনের অপর প্রান্ত থেকে দুর্বোধ্য ও শ্রবণাতীত ফিসফিসানি কানে এল।

আমি আপনার কথা শুনতে পাচ্ছি না।

আবার সেই ফিস ফিস শব্দ, তারপর নিস্তব্ধতা। টেলিফোনটা যথাস্থানে রেখে দিয়ে ডাক্তার কয়েকমুহূর্ত কি যেন ভাবলেন। আবার টেলিফোনটা তুলে নিয়ে এক্সচেঞ্জে ফোন করে জিজ্ঞেস করলেন, বলতে পারেন কোন নম্বর থেকে এইমাত্র ফোন করা হয়েছিল ?

কিছুক্ষণ পর তাঁকে জানাল যে জেলখানার যিনি ডাক্তার সেখান থেকে ফোন করা হয়েছিল।

আমাকে সেখানে লাইনটা দিন।

লাইন সংযোগ করা হল।

এইমাত্র তুমি আমায় টেলিফোন করেছিলে ? হ্যাঁ, আমি ডাক্তার টীসডেল বলছি। ব্যাপার কি ? তুমি কি বললে আমি কিছুই বুঝতে পারিনি।

ওপ্রান্ত থেকে পরিষ্কার ও বোধগম্য গলার স্বর শোনা গেল।

কিছু ভুল হয়েছে স্যার। আমরা আপনাকে ফোন করিনি।

কিন্তু তিন মিনিট আগে আমার এক্সচেঞ্জ জানাল তোমাদের ওখান থেকেই ফোন করা হয়েছিল।

এক্সচেঞ্জ ভুল করেছে স্যার।

অদ্ভুত ব্যাপার ! আচ্ছা ঠিক আছে। গুড নাইট। ওয়ার্ডার ড্রেকট কথা বলছ না ?

হ্যাঁ স্যার। গুড নাইট স্যার।

ডাক্তার তাঁর চেয়ারে ফিরে গেলেন। বই-এর মধ্যে তিনি মনোনিবেশ করতে পারলেন না। ফোনের ব্যাপারটা ঘুরে ফিরে তার চিন্তাকে ঘোরালো করে তুলছে। মাঝে মাঝে ভুলক্রমে তাঁর টেলিফোনটা বেজে ওঠে বটে, আবার কখনও এক্সচেঞ্জ ভুল নম্বর দিয়ে বসে। কিন্তু এই যে মৃদুস্বরে ফোনের আওয়াজ, অপর প্রান্ত থেকে দুর্বোধ্য ফিসফিসানি ডাক্তারের মনে এক অদ্ভুত প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। চেয়ার ছেড়ে উঠে তিনি ঘরের মধ্যে পায়চারী করতে থাকেন আর নানা চিন্তার জট মনের মধ্যে পাকাতে থাকে।

একসময় স্বগতোক্তি করে বসলেন, কিন্তু এ অসম্ভব।

পরদিন সকালে যথারীতি তিনি জেলখানায় গেলেন। অদৃশ্য কিছুর উপস্থিতি আবার তাঁর বোধশক্তিকে অদ্ভুত ভাবে ঘিরে রইল। এর আগেও তাঁর আধিদৈবিক অভিজ্ঞতা হয়েছিল। তিনি জানতেন যে তিনি অনুভবনশীল অর্থাৎ কোন নির্দিষ্ট ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে যিনি নিয়ম বহির্ভূত অনুভূতি লাভ করতে পারেন এবং আমাদের চারিদিকে অবস্থিত অদৃশ্য জগতের আভাস পেতে পারেন। তাই আজ সকালে যে লোকটির গতকাল ফাঁসি হয়েছে তার উপস্থিতি সম্বন্ধে সচেতন। এটা স্থানিক এবং এই ছোট জেলখানার চত্বরে ও প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত বন্দীকে রাখার কারাকক্ষের সামনে দিয়ে যাবার সময় তা বিশেষভাবে উপলব্ধি করলেন। এটা এমনই প্রবল হয়ে উঠেছিল যে তাঁর

সামনে যদি সেই মানুষটিকে সশরীরে দেখা যেত তবুও তিনি আশ্চর্য হতেন না। এমনকি সেই গলিপথের শেষ প্রান্তে পৌছে তাকে প্রকৃতই দেখবার জন্যে পেছন ফিরে তাকান। সব সময়েই তিনি মনে একটা গভীর আতংক সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন এবং এই অদৃশ্য কিছুর উপস্থিতি তাঁকে বিরক্ত করে তুলল। তাঁর মনে হল এই হতভাগ্য প্রেতাত্মা তার হয়ে কিছু করতে চায়। এই আবেগ যে বৈষয়িক তাঁর মনে একবারও সে সন্দেহ জাগেনি। তাব মনের চিন্তাধারা এমনই বাস্তবানুগ যে একে অলীক কল্পনার সৃষ্টি ধরা যেতে পারে না। চার্লসের বিদেহী আত্মা সেখানে উপস্থিত ছিল।

তিনি হাসপাতালে ঢুকে কিছুক্ষণ কাজের মধ্যে ব্যস্ত রইলেন। কিন্তু সর্বক্ষণ তাঁর কাছাকাছি সেই আত্মার উপস্থিতি উপলব্ধি করতে লাগলেন। তবে সেই মানুষটি যেসব স্থানে নিবিড়ভাবে যুক্ত ছিল সেখানে যত বেশী অনুভূত হয়েছিল এখানে সে তুলনায় অনেক কম। শেষে তাঁর ধারণা পরীক্ষা করবার জন্য ঘর থেকে বেরিয়ে আসার আগে ফাঁসিমঞ্চের ছাউনির দিকে তাকালেন। পরমুহূর্তে তাঁর মুখ ফ্যাকাসে হযে গেল। দরজাটা তাড়াতাড়ি বন্ধ করে ঘর থেকে বেরিযে এলেন। তিনি দেখতে পেলেন মঞ্চে ওঠার শেষ ধাপে দাঁড়িয়ে অস্পষ্ট ও আবছা এক মূর্তি—হাত দুটো পেছনে বাঁধা, মাথা ও মুখ কালো কাপড়ে ঢাকা। তিনি যে সেটা দেখতে পেলেন সেবিষয়ে কোন ভুল নেই।

ডাক্তার টীসডেল সাহসী লোক। এই আকস্মিক বিস্ময়ে বিহ্বল হয়ে পড়লেন না বরঞ্চ ক্ষণিক উদ্বিগ্নে লজ্জাবোধ করলেন। ভয়ে আতঙ্কিত হয়ে তাঁর মুখ ফ্যাকাসে হয়ে ওঠেনি সেটা প্রধানতঃ আকস্মিক বিস্ময় হয়েছিল। ভৌতিক দৃশ্য প্রত্যক্ষ করে তিনি কৌতূহলী হয়ে উঠেছিলেন তবু সেখানে ফিরে যাবাব মত মনকে শক্ত কবে তুলতে পাবেননি। যদি এই হতভাগা পৃথিবী-মুখী প্রেতাত্মার তাঁকে কিছু জানাবাব থাকে তবে সেটা দূব থেকে হওয়াই তিনি বাঞ্ছনীয় মনে করেন। যতদূব তিনি জানেন এরা অবাধে চতুর্দিক বিচরণশীল গারদখানা, প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত অপরাধীর কারাকক্ষ, হাসপাতাল—সর্বত্রই এর গতিবিধি অনুভূত হয়েছে। আরো একটা ব্যাপার মনে উদয় হওয়াতে তিনি নিজের ঘরে গিয়ে ওয়ার্ডার ড্রেকটকে ডেকে পাঠালেন। এই ড্রেকটই গতরাতে টেলিফোনে তাঁর সঙ্গে কথা বলেছিল।

তুমি স্থির নিশ্চিত, গত রাতে আমি ফোন করার আগে কেউ আমাকে ফোন করেনি?

ওয়ার্ডারের ইতস্ততভাব ডাক্তারেব নজর এড়িয়ে গেল না।

আমি বুঝতে পারছি না স্যার, কি করে এটা সম্ভব হতে পারে? আধ ঘণ্টা এমনকি তারও বেশী সময় আমি টেলিফোনের কাছেই বসেছিলাম। যদি কেউ ফোনের কাছে থাকত, আমি অবশ্যই তাকে দেখতে পেতাম।

তাহলে তুমি কাউকে দেখনি? ডাক্তার একটু জোর গলায় বললেন।

লোকটি আরো বেশী অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন।

না স্যার, কাউকে দেখিনি, সে তো জোরের সঙ্গে উত্তর দিল।

ডাক্তার অন্যদিকে দৃষ্টি রেখে তাচ্ছিল্যভাবে জিজ্ঞেস করলেন, কিন্তু তোমার হয়ত মনে হয়েছিল সেখানে কেউ ছিল?

স্পষ্টই বোঝা গেল ড্রেকটের মনে কিছু ছিল কিন্তু তা প্রকাশ করতে সে কুণ্ঠাবোধ করছিল।

আপনি যদি ওভাবে বলেন স্যার তা বলতে পারেন, আমি ঝিমুচ্ছিলাম অথবা আমার বা[illegible] ছিল

ডাক্তা[illegible] সতর্ক হ[illegible] উঠলেন।

[illegible] আমি [illegible] কেবলমাত্র [illegible] আমার [illegible] এখানে [illegible]

[illegible]

আমি [illegible] স্যার, আর [illegible] একজন [illegible] ওপর চারধারে ঘুরে [illegible] কারণ ঘরের অন্য কিছু [illegible]ছিল না, বা[illegible] আম [illegible] হবার জন্যে [illegible] বন্ধ [illegible] দিই। কিন্তু স্যার, এক ঘণ্টারও বেশী [illegible] ঘরের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছিল টেলিফোন বইয়ের পাতা ওলটানোর খসখস শব্দ হচ্ছিল। [illegible] আমার কাছে আসছিল, আমার চুলগুলো ততই এ[illegible] হয়ে উঠছিল। আর কি [illegible] ঠাণ্ডা, স্যার।

ডাক্তার একদৃষ্টে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। এরপর হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন, গতকাল সকালে কি করা হয়েছিল সে ব্যাপারে তোমায় কিছু মনে করিয়ে দিয়েছিল কি?

আবার লোকটি ইতস্তত করে শেষে বলল, হ্যাঁ স্যার, চার্লস লিংকওয়ার্থকে অপরাধী বলে সাব্যস্ত করা।

নিশ্চিতভাবে ডাক্তার মাথা নাড়লেন। বললেন, ঠিক আছে। আজ রাতে কি তুমি ডিউটিতে আছ?

হ্যাঁ স্যার, তবে না থাকতেই আমি ইচ্ছুক।

আমি জানি তোমার কি অবস্থা, আমারও ঠিক এইরকম হয়েছিল। যাই

হোক না কেন, মনে হয় আমাকে সে কিছু জানাতে চায়। আচ্ছা, কাল রাতে এখানে কোন গোলমাল হয়েছিল কি?

হ্যাঁ স্যার, আধ ডজন লোক বিরাট চীৎকার ও আর্তনাদ করে ওঠে। এরা সাধারণত শান্ত প্রকৃতির লোক। মাঝে মাঝে কোন ফাঁসি হবার পর রাতে এরকম হয়। আমি এটা আগেই জানতাম তবে গত রাতে যেমন হয়েছে এমন আর কখনও হয়নি।

হুঁ। আচ্ছা দেখ, যদি এই—এই বস্তুটা যাকে তুমি দেখতে পাও না, আজ রাতে আবার যদি টেলিফোনের কাছে যায়, তুমি তাকে সব সুযোগ দেবে। হয়ত ঠিক একই সময় সে আসবে। আমি তোমাকে বলতে পারব না কেন, তবে সাধারণত তাই ঘটে। যদি নেহাতই আমাকে ঘরে থাকতে হয়, ঠিক সাড়ে দশটা থেকে সাড়ে এগারটা এই একঘণ্টা তুমি টেলিফোনের কাছে থাকবে না। যদি আমাকে কেউ ফোন করে, সময় শেষ হলে পর আমি তোমাকে ফোন করে জানাব

তবে কিছু নেই স্যার?

সকালে ওয়ার্ডেন নিজে আবেদনের কথা মনে পড়ে কিন্তু তিনি বেশ আবেশভাবেই বললেন, আমি নিশ্চিত যে কিছু নেই।

সেদিন রাতে ডাক্তার এক ভাবের দোলায় তিনি ঠিক সাড়ে দশটার কিছু আগে নিজের পড়ার ঘরে এসে বসলেন। যে বিধি অনুযায়ী প্রেতাত্মাদের গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত এ সম্বন্ধে সাধারণ মানুষের অজ্ঞতাবশত ডাক্তার ওয়ার্ডারকে বলতে পারেননি কেন মাঝে মাঝে নির্দিষ্ট সময় তাদের আবির্ভাব ঘটে, বিশেষ করে সেই প্রেতাত্মার যখন কোন সাহায্যের প্রয়োজন হয়, যেমন এখানে হতে পারে, তিনি দেখেছেন দিনে অথবা রাতে ঠিক একই সময় আগমন হয়। নিয়ম অনুযায়ী, এদের দেহ ধারণ করার বা উদ্দেশ্য জানাবার বা অনুভব করানোর ক্ষমতা মৃত্যুর পরেই অন্তত কিছুক্ষণের জন্যে অতি তীব্র থাকে। পরে যত তারা পৃথিবীর অভিমুখ থেকে দূরে সরে যায় তাদের ক্ষমতা তত ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হতে হতে একেবারে নিবৃত্ত হয়। আজ রাতে তিনি আরো ক্ষীণ অনুভূতি উপলব্ধি করবার জন্যে তৈরি হয়ে আছেন। শুঁয়োপোকা থেকে যেমন নতুন মথের জন্ম হয় তেমনি গোড়ার দিকে আত্মা দেহ থেকে পৃথক হলে দুর্বল হয়।

ঠিক সেইসময় টেলিফোন বেজে উঠল। আগের রাতের মত তত ক্ষীণ নয় কিন্তু তা স্বাভাবিকভাবেও নয়। ডাক্তার তৎক্ষণাৎ উঠে গিয়ে ফোনটা কানে দিলেন। তিনি শুনতে পেলেন হৃদয়বিদারক ফোঁপানি, সেইসঙ্গে প্রচণ্ড আক্ষেপ মনে হল যেন শোককারীকে খণ্ড বিখণ্ড করে তুলেছে।

তিনি কথা বলার আগে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলেন, এক অজানা ভয়ে সমস্ত শরীর ঠাণ্ডা বোধ হল তবু যদি তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় সাহায্য করার জন্যে উৎসুক হয়ে উঠলেন।

হ্যাঁ, হ্যাঁ। অবশেষে তিনি বললেন। আমি ডাক্তার টীসডেল। আমি তোমার জন্যে কি করতে পারি? আর তুমিই বা কে? যদিও ভাবলেন এটা অনাবশ্যক প্রশ্ন।

আস্তে আস্তে ফোঁপানি থেমে গেল। ফিসফিস শব্দ হতে লাগল। তখনও কান্নার বেগ থামেনি। আমি বলতে চাই স্যার—আমি বলতে চাই—আমি অবশ্যই বলব—।

হ্যাঁ, কি বলবে বল?

না, তোমাকে নয়—অন্য আর একজনকে। স আমাকে দেখতে আসত। আমি তোমাকে যা বলব তাকে কি বলবে? তাকে আমার কথা শোনাতে অথবা আমাকে দেখাতে আমি পারব না।

তুমি কে? তার কথা শেষ হবার আগেই ডাক্তার জিজ্ঞেস করলেন।

চার্লস লিংকওয়ার্থ। আমার মনে হয় তুমি জান। আমি ভীষণ দুঃখী। আমি জেলখানা ছাড়তে পারছি না—ভীষণ ঠাণ্ডা। তুমি কি ঐ ভদ্রলোককে ডেকে পাঠাবে?

তুমি যাজকের কথা বলছ?

হ্যাঁ, যাজক। গতকাল আমি যখন উঠোনের চত্বর পার হচ্ছিলাম সে ধর্মোপাসনা করছিল। আমাকে বলা হয়েছিল আমি এত দুঃখী হব না।

ডাক্তার একমুহূর্ত ইতস্তত করলেন। এই অদ্ভুত গল্প কারাগারের যাজক মিঃ ডকিন্সকে বলতে হবে যে যাকে গতকাল ফাঁসি দেওয়া হয়েছে তার আত্মা টেলিফোনে আমার সঙ্গে কথা বলেছে। তিনি গভীরভাবে বিশ্বাসী এই অসুখী আত্মা দুঃখী এবং সে প্রায়শ্চিত্ত করতে চায়। সে কি বলতে চায় তা জিজ্ঞেস করার আর দরকার নেই।

অবশেষে ডাক্তার বললেন, হ্যাঁ। আমি তাকে এখানে আসতে বলব।

ধন্যবাদ স্যার, হাজারবার ধন্যবাদ। তুমি তাকে আনবে, তাই না?

তার গলার স্বর ক্রমশঃ ক্ষীণ হতে লাগল।

অবশ্যই কাল রাতে। আমি আর বেশীক্ষণ কথা বলতে পারছি না। আমাকে যেতে হবে দেখতে—হা ঈশ্বর।

আবার ফোঁপানি শুরু হল, ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর।

প্রবল উত্তেজনার বশে ডাক্তার চীৎকার করে জিজ্ঞেস করলেন, কি দেখতে? তুমি কি করছ আমাকে বল? তোমার কি হচ্ছে?

আমি বলতে পারব না, আমি বলতে পারব না। ওটা ক্ষীণ শব্দ থেমে গেল।

ডাক্তার ফোনটা কানে রেখে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলেন। কিন্তু কর্কশ শব্দ ছাড়া আর কিছুই শোনা গেল না। ফোনটা নামিয়ে রেখে কপালে হাত দিয়ে বুঝতে পারলেন ভয়ে তাঁর বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে উঠেছে। তাঁর কান ভোঁ ভোঁ

করছে, হৃদয়ে দ্রুত ও ক্ষীণ স্পন্দন হচ্ছে। নিজেকে প্রকৃতিস্থ করবার জন্যে চেয়ারে বসে পড়লেন। দু-এক বার তাঁর মনে হল কেউ কি তাঁর সঙ্গে ভীষণ ঠাট্টা করছে? কিন্তু তা হতে পারে না তিনি জানতেন। তিনি স্পষ্টভাবেই বুঝতে পারলেন যে ভয়ানক ও অপ্রীতিকর পাপ কাজের দরুন দারুণ মর্মপীড়ায় পীড়িত এক আত্মার সঙ্গে কথা বলছিলেন। এটা তার মনের ভ্রান্তি নয়। কি আশ্চর্য! এই লণ্ডনের বেডফোর্ড স্কোয়ারের এক মনোরম ঘরে আরামদায়ক পরিবেশের মধ্যে বসে তিনি মৃত চার্লস লিংকওয়ার্থের আত্মার সঙ্গে কথা বললেন!

কিন্তু এই চিন্তায় মগ্ন হয়ে বসে থাকবার সময় তাঁর নেই। প্রথমেই তিনি কারাগারে ফোন করলেন।

ওয়ার্ডার ড্রেকট?

অপর প্রান্তে লোকটির ভ' 'কম্পিত গলার স্বর স্পষ্টই উপলব্ধি করা যায়।

হ্যাঁ স্যার। আপনি কি ডাক্তার টীসডেল?

হ্যাঁ। তোমার ওখানে কিছু হয়েছে?

দুবার মনে হল লোকটি কিছু বলার চেষ্টা করছে কিন্তু পারছে না। তৃতীয়-বারের চেষ্টায় গলার শব্দ পাওয়া গেল।

হ্যাঁ স্যার। সে এখানে ছিল। আমি তাকে টেলিফোনের ঘরে ঢুকতে দেখেছিলাম।

ওঃ! তার সঙ্গে তুমি কথা বলেছিলে?

না স্যার, আমার সর্বাঙ্গে ঘাম ঝরছিল, আমি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করছিলাম। আর আধ ডজন লোক তাদের ঘুমের মধ্যেই আর্তনাদ করছিল। কিন্তু এখন সব শান্ত। আমার মনে হয় সে ফাঁসিমঞ্চের দিকে গেছে।

আচ্ছা। আমার মনে হয় আর কোন গোলমাল হবে না। হ্যাঁ ভাল কথা, আমাকে মিঃ ডকিন্সের বাড়ির ঠিকানাটা দাও ত।

* * * *

ডাক্তার যাজককে পরদিন রাতে তার বাড়িতে ভোজের নিমন্ত্রণ করলেন। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার টেলিফোনটা খুব কাছেই থাকাতে টেবিলের ওপর তিনি লিখতে পারলেন না। ওপরতলায় গিয়ে ড্রইংরুমে বসে তিনি লেখার কাজ শেষ করলেন। সেই চিঠিতে জানালেন এক অদ্ভুত ইতিহাস তার কাছে ব্যক্ত করবেন এবং তার সাহায্য নেবেন। এমন কি কোন কাজ থাকলেও তা যেন তিনি বাতিল করেন। আরো লিখলেন, তিনি নিজেও আজ রাতে তাই করেছিলেন, তা যদি না করতেন তবে তারজন্য তাকে দুঃখ প্রকাশ করতে হত।

পরদিন রাতে যথারীতি খাওয়া-দাওয়া শেষে দুজনে বসে সিগারেট ও কফি খাচ্ছিল। তখন ডাক্তার বললেন, ডকিন্স, আমার কথা শুনে আপনি আমাকে পাগল ভাববেন না।

মিঃ ডকিন্স হাসলেন। বললেন, আমি কথা দিচ্ছি তা হবে না।

খুব ভাল। গত রাতে এবং তার আগের রাতে, এ সময় থেকে আর একটু পরে, দুদিন আগে আমরা যাকে ফাঁসি হতে দেখেছি সেই চার্লস লিংকওয়ার্থের প্রেতাত্মার সঙ্গে আমি টেলিফোনে কথা বলেছি।

যাজক হাসলেন। চেয়ারটা একটু পেছনে ঠেলে বসলেন। মুখে বিরক্তির ভাব।

টীসডেল, আমাকে এই কথা বলতে, অবশ্যি আমি দুর্বিনীত হতে চাই না, এই গুজবের গল্প শোনাবার জন্য আজ রাতে আমাকে এখানে নিমন্ত্রণ করেছেন ?



হ্যাঁ। আপনি এখনও সব শোনেন নি। আপনাকে এখানে আনবার জন্যে কাল রাতে সে আমাকে বলেছে। সে আপনাকে কিছু বলতে চায়। আমার মনে হয় সেটা কি আমরা তা ধারণা করতে পারি।

ডকিন্স উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, দয়া করে আমাকে আর শোনাবেন না। মৃত ফিরে আসে না। কি অবস্থায় এবং কি পরিস্থিতিতে তারা বিদ্যমান তা এখনও আমাদের কাছে পরিস্ফুট নয়। জাগতিক সমস্ত সম্পর্ক তাদের শেষ হয়েছে।

কিন্তু আমি আপনাকে আরো কিছু বলব। দুরাত আগে আমাকে ফোন করেছিল, খুব ক্ষীণ অস্পষ্ট স্বর শুনেছিলাম। সঙ্গে সঙ্গে আমি খবর

নিই কোথা থেকে আমাকে ফোন করা হয়েছিল এবং আমাকে জানান হয় জেলখানা থেকে ফোন এসেছিল। আমি জেলখানায় ফোন করি, ওয়ার্ডার ড্রেকট জানায় কেউ আমাকে ফোন করেনি। সেও কিছুর উপস্থিতি অনুভব করেছিল।

আমার মনে হয় লোকটা মদ খেয়েছিল, তীক্ষ্ণ কণ্ঠে ডকিন্স বললেন।

ডাক্তার একমুহূর্ত থামলেন।

ওধরনের কথা বলা আপনার উচিত নয়। তার মত ধীর স্থির লোক আমাদের আর একজনও নেই। সে যদি মাতাল হয়ে থাকত তবে আমিও তাই হয়েছিলাম?

যাজক আবার চেয়ারে বসে পড়লেন।

আমাকে ক্ষমা করবেন, তবে আমি আর এগোতে চাই না। এব্যাপারে মাথা ঘামানো বিপজ্জনক ব্যাপার। তাছাড়া, এটা যে একটা তামাশা নয় তা কি করে আপনি জানলেন?

কে তামাশা করছে? চুপ! শুনুন! হঠাৎ ডাক্তার বললেন।

টেলিফোন বেজে উঠলো। ডাক্তার স্পষ্ট শুনতে পেলেন।

আপনি শোনেন নি?

কি শুনব?

টেলিফোনের বেল বাজার আওয়াজ?

আমি কোন আওয়াজ শুনিনি, যাজক বেশ রাগতভাবে বললেন। কোন বেল বাজেনি।

ডাক্তার কোন কথা না বলে তাঁর স্টাডিরুমে উঠে গেলেন এবং আলো নিভিয়ে দিলেন। তারপর রিসিভারটা তুলে নিয়ে কানে দিলেন।

হ্যাঁ? কে কথা বলছে? ডাক্তারের গলা কাঁপছে। হ্যাঁ মিঃ ডকিন্স এখানে আছেন। তাকে তোমার সঙ্গে কথা বলতে চেষ্টা করব।

তিনি অন্য ঘরে ফিরে গেলেন।

ডকিন্স, নিদারুণ যন্ত্রণায় এক আত্মা অপেক্ষা করছে। তার কথা শুনতে আমি সনির্বন্ধ অনুরোধ করছি। ঈশ্বরের দোহাই আসুন এবং শুনুন।

যাজক একমুহূর্ত ইতস্তত করলেন। তারপর বললেন, বেশ আপনি যা বলবেন।

তিনি রিসিভারটা টেবিলের ওপর থেকে তুলে নিয়ে কানে দিলেন।

আমি মিঃ ডকিন্স বলছি।

তিনি অপেক্ষা করলেন।

আমি কিছুই শুনতে পাচ্ছি না। হ্যাঁ কিছু যেন—একটা ক্ষীণ ফিসফিস শব্দ।

শুনতে চেষ্টা করুন, শুনতে চেষ্টা করুন। ডাক্তার বললেন।

আবার যাজক মন দিয়ে শুনতে চেষ্টা করলেন। হঠাৎ তিনি রিসিভারটা টেবিলে নামিয়ে রেখে ভুরু কুঞ্চিত করলেন।

কিছু—কেউ যেন বলল, আমিই তাকে মেরেছি, আমি স্বীকার করছি। আমাকে ক্ষমা করা হোক। ডাক্তার টীসডেল এটা একটা তামাশা। প্রেতাত্মাবাদে আপনার ঝোঁক আছে জেনে কেউ এই ভীষণ ঠাট্টা করছে। আমি এ বিশ্বাস কবতে পাবি না।

ডাক্তার রিসিভারটা কানে তুলে নিলেন।

আমি ডাক্তার টীসডেল বলছি। কিছু সঙ্কেত মিঃ ডকিন্সকে দিতে পারে যাতে বোঝ যাবে তুমিই চার্লস লিংকওয়ার্থ?

তারপর রিসিভারটা নামিয়ে রাখলেন।

সে বলল পারবে। আমাদের অপেক্ষা কবতে হবে। ডাক্তার বললেন।

রাতটা বেশ গুমোট হয়ে আছে। ঘরের খোলা জানালা দিয়ে বাড়ির পেছন দিকের পাথর বাঁধান চত্বর দেখা যাচ্ছে। মিনিট পাঁচেক কি তারও বেশী দুজনে চুপচাপ দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন। আশ্চয হবার মত কিছুই ঘটল না।

তখন যাজক বললেন, আমি যা বলেছি আমার মনে হয় ওটাই যথার্থ সিদ্ধান্ত।

তাঁর কথা বলতে বলতেই হঠাৎ একঝলক ঠাণ্ডা বাতাস ঘরের মধ্যে ঢুকল। টেবিলের ওপরে কাগজগুলো খসখস করে আওয়াজ তুলল। ডাক্তার জানালাটা বন্ধ করে দিলেন।

আপনি অনুভব করলেন?

হ্যাঁ একঝলক বাতাস, বেশ ঠাণ্ডা।

আবার বন্ধ ঘরের মধ্যে বাতাস ঘুরতে লাগল।

এবং এবার ওটা অনুভব করলেন?

যাজক মাথা নেড়ে সায় দিলেন। হঠাৎ তার বুক ধড়ফড় করে উঠল। গলার স্বর বন্ধ হয়ে আসতে লাগল। বিস্ময়ে চিৎকার করে ঈশ্বরের উদ্দেশে বলতে লাগলেন, আসন্ন রাত্রির সমস্ত বিপদ থেকে আমাদের রক্ষা করুন।

কিছু যেন আসছে! ডাক্তার বললেন।

বলার সঙ্গে সঙ্গেই সে হাজির। তাঁদের থেকে তিন গজও দূরে নয়, ঘরের ঠিক মাঝখানে মানুষের এক আকৃতি, মাথাটা কাঁধের ওপর ঝুলে পড়েছে। মুখটা দেখা যাচ্ছে না; সে দুইহাত দিয়ে তার মাথাটা তুলে ধরল যেন মনে হল একটা ভারী কিছু ওঠাল—তাদের দিকে তাকাল। তার চোখ দুটো ও জিভটা ঠেলে সামনের দিকে বেরিয়ে আসছে, গোলাকার দাগটা গলায় স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। পরমুহূর্তে কাঠের মেঝের ওপর ঘরঘর শব্দ হল—মূর্তি অদৃশ্য! মেঝেয় পড়ে আছে একটা নতুন দড়ি।

অনেকক্ষণ তাদের দুজনের কেউ কথা বলল না। ডাক্তারের মুখ দিয়ে ঘাম ঝরছে। ফ্যাকাসে ঠোঁট দুটো দিয়ে যাজক বিড়বিড় করে ঈশ্বরকে ডেকে চলেছে। অনেক কষ্টে নিজের সম্বিৎ ফিরিয়ে এনে ডাক্তার দড়িটা দেখাল।

ফাঁসি হবার পর থেকে এটা পাওয়া যাচ্ছিল না। ডাক্তার বললেন।

আবার টেলিফোন বেজে উঠল। এবার যাজককে আর বলে দিতে হল না। তিনি একলাফে ফোনের কাছে গেলেন কিন্তু বেল বাজা থেমে গেল। কিছুক্ষণ চুপ করে তিনি কি যেন শুনলেন।

অবশেষে তিনি বললেন, চার্লস লিংকওয়ার্থ, তুমি ঈশ্বরের সামনে দাঁড়িয়ে আছ, তোমার পাপ কাজের জন্যে তুমি সত্যিই দুঃখিত?

শ্রবণাতীত কিছু উত্তর ডাক্তারের কানে এল এবং যাজক দুচোখ বুজলেন। পাপমুক্তির বাণী উচ্চারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তার টীসডেল হাঁটু মুড়ে বসে প্রার্থনা করতে লাগলেন।

তারপর আবার নিস্তব্ধতা।

আর বেশী কিছু আমি শুনতে পাইনি। রিসিভারটা যথাস্থানে রাখতে যাজক বললেন।

সেইসময় ডাক্তারের চাকর একটা ট্রেতে স্পিরিট ও নলযুক্ত বোতল নিয়ে ঘরে ঢুকল। প্রেতাত্মা যেখানে দাঁড়িয়েছিল সেদিকে না তাকিয়ে চাকরকে আঙুল দিয়ে নির্দেশ করে বললেন, পার্কার ওখানে দড়িটা পড়ে আছে, ওটা নিয়ে পুড়িয়ে ফেল।

একমুহূর্ত নীরবতা।

কোন দড়ি নেই স্যার। পার্কারের বিস্ময়কর উত্তর।

Confession of Charles Linkworth—*E. F. Benson*

ভূতুড়ে কোট

আমি বেশ ভাল করেই জানি অফিসের অন্য লোকেরা আমাকে মনে করে এক অদ্ভুত জীব—এক বিচিত্র পক্ষীবিশেষ। যদিও, একজন লোক যে অধ্যয়নশীল স্বভাববিশিষ্ট, যে গোলমাল পছন্দ করে না এবং যে নির্বোধের সঙ্গই বেছে নেয়, আরো বিশেষ করে যে দৃষ্টির অভাবহেতু মোটা কাঁচের চশমা পরে, সে সবসময় নীচমনা লোকদের কাছে ভুল বুঝে থাকবে। সাধারণভাবে, আমার বন্ধুদের মতামতের জন্যে যে অবজ্ঞা পাওয়া উচিত তাই দিয়ে থাকি। কিন্তু এই বিশেষ মুহূর্তে আমি ভাবতে শুরু করেছি যে তাদের অভিমতের পেছনে হয়ত

কিছু থাকতে পারে। যদিও আমি ঐ বিচিত্র পক্ষীবিশেষ ব্যাপারটা মেনে নিতে পারি না, তবে নিঃসন্দেহে আমি একটা গাধা—একটা প্রথম শ্রেণীর বোকা লোক। তা না হলে আমি দিব্যি আরামে সকলের সঙ্গে মিলেমিশে ছুটিটা উপভোগ করতে পারতাম। ভাঁড়ের গান শুনে অথবা সমুদ্রের ধারে বিশ্রাম নিয়ে দিন কাটাতাম। তার পরিবর্তে ফ্রান্সের এক নাম না জানা জায়গায় বোকার মত সাইকেলে ঘুরে বেড়াবার মতলব করেছি। বৃষ্টিতে পুরোদস্তুর ভিজে, ক্ষুধার্ত ও দিশেহারা হয়ে এক অচেনা দেশে অপরিচিতের মত, হতোদ্যমে মাল বোঝাই সাইকেল ঠেলতে ঠেলতে ঘুরে বেড়াচ্ছি—গর্দভের মত বাছাই করার এই বর্তমান ফল।

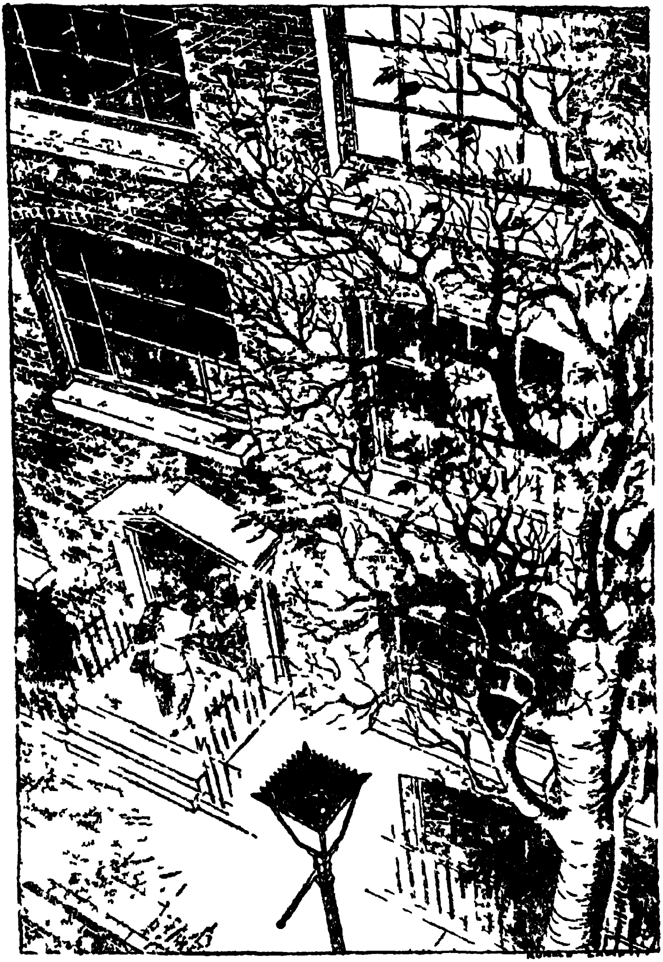
ঝড়ের বেগে আমি নির্দিষ্ট পথ থেকে অনেক মাইল দূরে সরে গেছি, ভোসজেসের এক জনশূন্য রাস্তা দিয়ে প্রায় দুঘণ্টা ধরে প্রবল বৃষ্টি মাথায় করে অনেক কষ্টে চলেছি, কোথাও জীবন্ত মানুষ অথবা মানুষের বাসস্থান চোখে পড়েনি।

অনেকক্ষণ পর অবশেষে একটা মোড় ঘুরতেই সামনে একটা বাড়ির ছাদের অংশ এবং চিমনী চোখে পড়ল। রাস্তা ছেড়ে একটু ভেতরে এক গাছের ঝাড়ের আড়ালে নির্জন জনশূন্য পরিবেশে বাড়িটা অবস্থিত। এমন কি সেখানে আকর্ষণ করার মত কিছু নেই। তবু ওই বন্য পরিবেশের মধ্যেও বাড়িটা স্বাগতম জানাবার পক্ষে যথেষ্ট। সাময়িক আশ্রয় পাবার আশায় এবং কিছু খাবার প্রয়োজনেও, আমি সেইদিকে তাড়াতাড়ি চলতে লাগলাম। দুশো গজ যাবার পর তবে বাড়ির গেটের সামনে এসে হাজির হয়ে এক শোচনীয় হতাশার সম্মুখীন হলাম। ছাদহীন দরোয়ানের ঘর, পুরনো ক্ষয়প্রাপ্ত লোহার গেট দুটো কব্জার ওপর ভর করে ঝুলছে, সামনের পায়ে চলার পথটা ঝোপঝাড়ে ভর্তি—এসব কিছুই ইঙ্গিত দিচ্ছে এখানে কেউ থাকে না।

মন থেকে সব ভাবনা চিন্তা ঝেড়ে ফেলে এই বলে চাঙ্গা করে তুলতে লাগলাম যে এমন দুর্যোগময় অবস্থার মধ্যে এই পরিত্যক্ত বাড়িটা অবজ্ঞা করা ঠিক নয়। কোন ঢাকা জায়গায় দাঁড়াতে পারলে আমার ভিজে পোশাক নিঙড়োতে পারব আর ভাঙা সাইকেলটাও মেরামত করে নিতে পারব। তাই আর সময় নষ্ট না করে সাইকেল নিয়ে বারান্দার নিচে দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। সেটা একটা পুরনো জমিদার বাড়ি বলে মনে হল। লতাগুল্ম বাড়িটার দেয়াল ঢেকে ফেলেছে। দরজার পাশে দুধারে খোদাই করা পাথরে বংশমর্যাদার নিদর্শন। বোঝা যাচ্ছে এখানে একসময় উঁচুদরের লোক বাস করত। জানালাগুলো প্রায় সব বন্ধ, ঝুলে ভর্তি। মনে হচ্ছে বহুদিন এখানে কেউ বাস করেনি।

দরজাটা খোলবার চেষ্টা করলাম। কি আশ্চর্য, দরজা খোলা! কাঁধের একটু ধাক্কা লাগতেই পাল্লাটা ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দে ফাঁক হয়ে গেল। সামনে বড়

হলঘর, অস্পষ্ট আলোয় ভেতরে ঢুকলাম। একটা ভ্যাপসা গন্ধ নাকে এল। কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে চারদিকে চোখ বোলালাম। একটা পুরনো খালি বাড়িতে ঢুকলে যেমন গা ছম ছম করে আমারও তেমনি একটু ভয় ভয় করছিল। আমার সামনে একটা চওড়া সিঁড়ি, তার ঠিক ওপরে লম্বা মত জানালা—কাঁচগুলো



মাকড়সার জালে আর ময়লা। ভর্তি, একটুও আলো দেখা যাচ্ছে না। সিঁড়ি দিয়ে উঠে সামনেই যে ঘরটা দেখা গেল তার দরজাটা ঠেলে খুলে ফেললাম। ঘরটা বেশ বড় আর সাজানো গোছানো। এটাই প্রধান ঘর বলে মনে হল, যদিও বহুদিন অযত্ন ও অব্যবহারে শোচনীয় অবস্থা। কারুকায করা কানিশ

ভেঙে ভেঙে গেছে, ঘরের ছাদের এককোণের চুনবালি একেবারে খসে গেছে। আঠার শতাব্দীর আসবাবপত্রগুলোয় সবুজ ছাতা ধরেছে। ছেঁড়া পর্দা-ঝালরগুলো ঝুলছে। দরজার গোড়া থেকে ফায়ার প্লেস অবধি সুন্দর পার্শিয়ান কার্পেটের প্রায় অর্ধেকটায় কমলা রঙের ছাতা গজিয়ে উঠেছে।

ফায়ারপ্লেসটা দেখে আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এল। জ্বালানি কিছু পেলে আগুন জ্বালিয়ে গরম চা করতে পারি আর ভিজে পোশাক শুকিয়ে নিতে পারি। বাইরে একটু খুঁজতেই শুকনো ডালপালা পাওয়া গেল। কিছু ডালপালা নিয়ে আবার বাড়িতে ঢুকে চটপট সিঁড়ি দিয়ে উঠলাম। কিন্তু কেন জানি না, ঘরটার চৌকাঠে দাঁড়িয়ে হঠাৎ থমকে গেলাম। পা দুটো যেন তাদের ইচ্ছায় আমাকে আর টেনে নিয়ে যেতে চাইল না—কিছু যেন আমাকে ঘরের বাইরে যাবার জন্যে প্ররোচিত করছে। ডালপালা আমার পায়ের কাছে নামিয়ে রেখে কিছুটা অনিশ্চিত ভাবে দরজায় দাঁড়িয়ে রইলাম। সেই পরিবেশের মধ্যে আমি অজানা বিপদের গন্ধ উপলব্ধি করতে লাগলাম। এ জায়গা ছেড়ে যাবার সময় সব যেমন ছিল তেমনই আছে তবু আমার বোধ হচ্ছে আমার স্বল্পকালের অনুপস্থিতিতে অশুভ কিছু এই ঘরে ঢুকেছিল, আবার বেরিয়ে গেছে।

আমি ভীতু অথবা কুসংস্কারাচ্ছন্ন লোক নই অথচ কিছুক্ষণ পরে আমি অতি বিনয়ী হয়ে ডালপালা তুলে নিয়ে সিঁড়ির দিকে ফিরে গেলাম। আসলে কিন্তু কোন ভয় পেয়ে আমি একাজ করিনি। আমার মনে হল সদর দরজার কাছাকাছি থাকলে এবং নিচে কোন ঘরে আগুন জ্বালালে হয়ত আমি বেশী স্বস্তি পাব। যদিও—এটা একটা ডাহা মূর্খের কল্পনা তা আমি জানি, কিন্তু—আচ্ছা, যদি কিছু—অদ্ভুতই ঘটল। ঐ পথ দিয়ে হঠাৎ পালিয়ে যাবার চেষ্টা করলাম।

সিঁড়ির দ্বিতীয় ধাপে পা দিয়ে যেই খোলা সদর দরজার আলোর দিকে তাকিয়েছি হঠাৎ একটা জিনিস নজরে পড়তেই চমকে উঠলাম। মনে হল কেউ যেন এইমাত্র ধুলোর ওপর দিয়ে থলে কিংবা ঐ ধরনের কিছু সিঁড়ির মাঝখান দিয়ে ওপরে টেনে তুলেছে।

আরো লক্ষ্য করলাম, সিঁড়ির শেষ ধাপ থেকে সেই ঘষড়ানো দাগটা হলঘর পেরিয়ে উল্টোদিকে দেয়ালের কাছে গিয়ে শেষ হয়েছে। সেখানে দেয়ালে আটকান আলনায় ঝুলছে একটা পুরনো, পোকায় কাটা কোট। দেখলাম অনেকগুলো দাগ ঘরের বিভিন্ন দিকে গেছে—কোনটা দুদিকে দরজার কাছে গিয়ে শেষ হয়েছে, কোন কোনটা সিঁড়ির পাশ দিয়ে বাড়ির পেছন দিকে গেছে—কিন্তু সবগুলো একটা জায়গা থেকেই উদ্ভূত—কোট ঝোলানো আলনা থেকে। সবচেয়ে অদ্ভুত ব্যাপার হচ্ছে, আমার পায়ের দাগ ছাড়া আর কোন পায়ের চিহ্ন নেই।

অস্থিরতা আবার আমাকে ঘিরে ধরল। মনে হচ্ছে বাড়িতে কেউ বাস

করে না অথচ পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে কেউ বা কিছু সম্প্রতি এখানে ছিল। কে অথবা কি অশান্ত, অনুসন্ধানী প্রাণী যে ঐ কোট থেকে অদ্ভুত দাগগুলো করেছে? কোন বোকা ভবঘুরে—হয়ত মেয়ে—যার পেছনে ঝুলেপড়া চাদরের ঘষড়ানিতে তার নিজের পায়ের দাগ মুছে গেছে?

সেই পুরনো কোটটার কাছে গিয়ে ভাল করে দেখলাম। এটা একটা পুরনো ধাঁচের মিলিটারী ওভারকোট, তখনও দু একটা ময়লাধরা রূপোর বোতাম লাগান রয়েছে। বহুদিন ব্যবহারের স্বাক্ষর বহন করছে। যথেষ্ট সতর্কতার সঙ্গে আস্তে আস্তে আলনাটাকে ঘোরালাম। দেখলাম বাঁ কাঁধের ঠিক নিচে পেনার মত গোলাকার একটা গর্ত—তার চারধারের কাপড় পোড়া ও বিবর্ণ, মনে হয় যেন খুব কাছে থেকে পিস্তলের গুলি লেগে এমন হয়েছে। যদি পিস্তলের গুলিতে এই গর্ত হয় তবে নিশ্চয়ই কোন মৃতের গায়ে এই কোট ছিল।

একটা বিরক্তিতে মনটা ভরে উঠল কিন্তু বেশীক্ষণ স্থান দিলাম না। এটা একটা কল্পনা হতেও পারে না। তবে মনে হল বিশ্রী কাপড়ের গন্ধ ছাড়াও যেন একটা পচা মাংস ও হাড়ের গন্ধও বেরোচ্ছে……।

কোন জন্তুর পচা গন্ধ—মৃদু অথচ সন্দেহাতীত—বাতাসে তা আমি ঘ্রাণ করতে পারছি। সেইসঙ্গে কিছু অবর্ণনীয় কিন্তু সত্য—ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অনুভূত অতীতের কোন কলঙ্কিত ও লজ্জাজনক পাপকার্যে সমস্ত পরিবেশটা ঘিরে রয়েছে।

নিজেকে শক্ত করে তুললাম। কি এমন আছে যা ভয় করতে হবে? কোন মনুষ্য লুণ্ঠনকারীদের ভয় পাই না কারণ সব সময় আমার কাছে পিস্তল থাকে। আর ভূত? যদি সত্যিই কোন অস্তিত্ব থাকে তবে দিনেরবেলায় তারা ঘুরে বেড়ায় না। গা ছমছমে জায়গা এটা ঠিক, আমি ত' আর এখানে রাত কাটাচ্ছি না। আমার অতি প্রয়োজনীয় গরম চা ও সাইকেল মেরামত না করে বৃথা অলীক কল্পনায় ভীত হয়ে আবার আমি বৃষ্টির তাণ্ডবের মধ্যে বাইরে বেরোচ্ছি না।

সুতরাং আমার কাছেই যে দরজাটা ছিল সেটা খুলে একটা ছোট ঘরে ঢুকলাম। একসময় এটা পড়ার ঘর হিসেবে ব্যবহার করা হত বলে মনে হল। দরজার উল্টোদিকে ফায়ার প্লেস—ঝাঁঝরিতে তখনও শেষ কাঠের ছাই পড়ে রয়েছে। খোঁচানি দিয়ে ছাই পরিষ্কার করে শুকনো ডাল সাজিয়ে নিলাম। কিন্তু কাঠগুলো এমন স্যাঁতসেঁতে ছিল যে আমার অর্ধেক দেশলাই শেষ হয়ে গেল তবু আগুন ধরল না, শুধু ধোঁয়া বেরোতে লাগল। চিমনি দিয়ে এক দমকা বাতাস এসে ঘরের মধ্যে ধোঁয়ায় ভর্তি হয়ে গেল। মেঝেয় হাঁটু ও হাত রেখে কাঠগুলোর কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে মরিয়া হয়ে ফুঁপিয়ে আগুন ধরাবার চেষ্টা করতে লাগলাম। এই বিরক্তিকর কাজের মধ্যে হঠাৎ হলঘর থেকে একটা

আওয়াজ শুনে চমকে উঠলাম—মনে হল কে যেন মেঝেয় ধপ্ করে জামা ফেলল।

পলকের মধ্যে উঠে দাঁড়িয়ে কান খাড়া করে কিছু শোনবার চেষ্টা করলাম। কোন সাড়াশব্দ নেই, অটোমেটিক পিস্তলটা হাতে নিয়ে পা টিপে টিপে দরজার দিকে এগোতে লাগলাম। হলঘরে কোথাও কিছু নেই, কিছু শুনতে পাওয়া যাচ্ছে না, কেবল বাইরে বৃষ্টির শব্দ। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার, সেই পুরনো কোটটার ঠিক নিচে মেঝেয় ধুলো উড়ছে!

দূর! একটা ইঁদুর! স্বগতোক্তি করে নিজের কাজে ফিরে গেলাম।

পোড়া কাঠে আরো জোরে ফুঁ দিয়ে খোঁচাখুঁচি করে, আরো দেশলাই কাঠি জ্বালিয়ে আগুন জ্বালাবার চেষ্টা করতে লাগলাম—এর মধ্যেও আবার সেই অদ্ভুত শব্দ শুনতে পেলাম খুব জোরে নয়, অথচ পরিষ্কার ও নির্ভুল।

আর একবার হলঘরে গেলাম। ঠিক একই জায়গায় একইভাবে ধুলো উড়তে দেখলাম। চোখে পড়ার মত আর কিছু নেই। কিন্তু সেই ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের আসন্ন বিপদের ইঙ্গিত আরো বেশী করে অনুভূত হল। এবার আমি বুঝতে পারলাম—এই পুরনো, খালি বাড়িতে আমি একা নই—কোন অপবিত্র, অদৃশ্য কিছুর গুপ্তভাবে চলাফেরা স্পষ্টই উপলব্ধি করতে পারলাম।

এসব চিন্তার আমার আর দরকার নেই। আমি বোকা ভীতু হতে পারি কিন্তু এসব সহ্য করতে পারছি না। আমার জিনিসপত্র নিয়ে চলে যাই তারপর যা ঘটে ঘটুক। এই বলে নিজেকে শক্ত করে তুললাম।

ঘরের মধ্যে ফিরে গিয়ে তাড়াহুড়ো করে হ্যাভারস্যাকের ভেতর জিনিসপত্র পুরতে পুরতে এক একবার ভয়ে ভয়ে দরজার দিকে তাকাতে লাগলাম। থলির মুখ বন্ধ করে দড়ির শেষ পাক দিচ্ছি এমন সময় হলঘর থেকে খুব আস্তে চাপা হাসির শব্দ শুনতে পেলাম, তারপরই মৃদু পায়ের শব্দ। ক্ষিপ্রগতিতে পিস্তলটা তাক করে দরজার দিকে ফিরে ঘরের মাঝখানে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। দেহের রক্ত ঠাণ্ডা হয়ে আসছে। দরজার ফাঁক দিয়ে দেখলাম একটা ছায়ার মত কি যেন চলে গেল। তারপরই বোধ একটু ক্যাঁচর ক্যাঁচর শব্দ, আস্তে আস্তে দরজাটা খুলে গেল—ভেতরে ঢুকলো সেই কোট।

দরজার গোড়ায় সেটা সোজা হয়ে দাঁড়াল, তারপর একটু এদিক ওদিক দুলতে লাগল, অদৃশ্য লোক যেন কলারটা তুলে রেখেছে—এটা সেই কোট যেটা হলঘরে ঝুলতে দেখেছি।

অনন্ত শূন্যের মধ্যে পাথরের মূর্তির মত আমি দাঁড়িয়ে, দৃষ্টি আমার দোরগোড়ার বস্তুটির প্রতি নিবদ্ধ। আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে সোজা দাঁড়িয়ে রইলাম, সম্মোহিতের মত সমস্ত দেহ অবশ হয়ে গেল, অসাড় আঙুল থেকে পিস্তলটা মাটিতে পড়ে গেল। তবু আমার মাথা ঠিক রইল। আমি জানতাম চরম অমঙ্গলের সান্নিধ্যে রয়েছি—দোরগোড়ায় নরকপ্রসূত বস্তুটির যে অলৌকিক

আভা বিচ্ছুরিত তা সংক্রামক—এর সামান্য স্পর্শ শুধুমাত্র যে আমার দেহের ধ্বংস তা নয়, আমার আত্মার অনন্ত নরকভোগ!

এখন সেটা ঘরের মধ্যে ঢুকছে—এক অবর্ণনীয় চলার গতি,—অদ্ভুতভাবে খালি হাতা দুটো দুলছে, কোটের প্রান্ত মেঝেয় একবার করে পড়ছে, ঘষড়ানির দাগ হচ্ছে আর সেইসঙ্গে ধুলো উড়ছে, ধীরে ধীরে আমার দিকে এগোচ্ছে। আমার বিস্ফারিত চোখ দুটো বস্তুটার ওপর স্থির ভাবে নিবদ্ধ রেখে পায়ে পায়ে পিছু হটতে লাগলাম। আড়ষ্ট, অচেতন যন্ত্রের মত চলতে চলতে একেবারে অগ্নিকুণ্ডের দেয়ালে পিঠ স্পর্শ করল, তার পিছনে যাবার জায়গা নেই। মারাত্মক অশুভ উদ্দেশ্যে তখনও সেটা আমার দিকে এগিয়ে আসছে। শূন্য হাতা দুটো কাঁপতে কাঁপতে ওপরে উঠে আমার গলা ছোঁবার চেষ্টা করছে। মনে হল পরমুহূর্তে সেগুলো আমাকে ধরে ফেলল। ভীতি ও আতঙ্কে বুঝতে পারলাম আমার সমস্ত বিচারবুদ্ধি লোপ পাবে। সেইমুহূর্তে একটা চিন্তা আমার মাথায় এল—অনেকদিন আগে কোথায় যেন পড়েছিলাম কি শুনেছিলাম—পবিত্র চিহ্নের—ক্ষমতা—অশুভশক্তির—বিরুদ্ধে। প্রচণ্ড প্রয়াসে ইচ্ছাশক্তিকে জাগরিত করে আড়ষ্ট আঙুল তুলে ক্রস চিহ্ন তৈরি করলাম। এবং সেইমুহূর্তে পেছনে আমার অন্য হাতটা কিছু পাবার জন্যে উত্তেজিত হয়ে হাতড়াচ্ছে, একটা ঠাণ্ডা, শক্ত, গোল কিছুর সংস্পর্শে এল। সেটা পুরনো, ভারী উনুন খোঁচানোর হাতল।

সেই ঠাণ্ডা লোহার স্পর্শ আমার সমস্ত বোধশক্তিকে জাগিয়ে দিল। বিদ্যুতের গতিতে সেই ভারী খোচানিটা তুলে নিয়ে আমার সামনে আতঙ্কজনক বস্তুটিতে আঘাত করলাম। দেখ! মুহূর্তে বস্তুটি পড়ে গেল এবং কোট ছাড়া আর কিছুই নয়, আমার পায়ের কাছে জড়ো হয়ে রয়েছে। অথচ, আমি দিব্যি করে বলছি, একলাফে সেটা পার হয়ে ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে গেলাম। আড়চোখে ফিরে দেখলাম, বস্তুটি আমার পিছনে হামাগুড়ি দিয়ে তাড়া করেছে।

সেই অভিশপ্ত বাড়ির বাইরে এসে যে দৌড় লাগালাম জীবনে সেরকম কখনও দৌড়ইনি। একটা সরাইখানার দরজায় অর্দ্ধচৈতন্যহীন অবস্থায় পড়ে যাবার আগে পর্যন্ত আমার আর কিছুই মনে নেই। টলতে টলতে ভেতরে ঢুকে বলি, ঈশ্বরের দোহাই, আমাকে মদ দিন। আমি যখন মুখে মদ ঢালছি তখন একটা ছোট জনতা বিস্ময়ে আমাকে দেখছে।

আমি ভাঙা ফরাসী ভাষায় আমার কাহিনী বলতে চেষ্টা করলাম। বিহ্বল দৃষ্টিতে তারা আমার দিকে তাকিয়ে আছে। অবশেষে সরাইখানার মালিকের মুখে সহানুভূতির ভাব ফুটে উঠল।

এও কি সম্ভব, মশাই ওই বাড়িতে ছিলেন! জুলিয়েট তাড়াতাড়ি। মশাইয়ের আর এক বোতল মদ লাগবে!

পরে ঐ মালিকের কাছ থেকে আমি একটা গল্প শুনি, যদিও সে বলার জন্য

খুব আগ্রহী ছিল। নেপোলিয়নের সৈন্যদলের একজন অবসরপ্রাপ্ত অফিসার ঐ পরিত্যক্ত বাড়িতে থাকত। আফ্রিকান বংশজ ঐ লোকটি আধা-পাগল ছিল। গল্প শুনে মনে হয় লোকটি অতি বদ ছিল। নিশ্চয়ই মশাই খুব খারাপ লোক—ঐ লোকটি। সে তার স্ত্রীকে মেরে ফেলে, সমস্ত জীবন্ত প্রাণীর ওপর, এমনকি, লোকে বলে, তার নিজের মেয়েদেব ওপর নিদারুণ অত্যাচার করত। পুরনো জমিদার বাড়িটার খুব খারাপ নাম আছে। আপনি যদি এক মিলিয়ন ফ্রাঁ-ও দেন তবু এদেশের কোন লোকই ঐ বাড়িটাব কাছে যাবে না।

গোড়ায় যা বলেছি, আমি জানি অফিসের লোকেরা আমায় একটা মানুষ মনে কবে, তাই তাদের কাছে আমি এ গল্প করিনি। তবু এটা ডাহা সত্যি। আমার নতুন সাইকেল ও জিনিসপত্র ঐ ভূত-প্রেত অধ্যুষিত জমিদার বাড়ির হলঘরে হয়ত এখনও পড়ে আছে। কেউ যদি ওগুলো সংগ্রহ করতে সাহসী হয় তবে রেখে দিতে পারে।

The Coat—*A. E. D. Smith*

গ্যাস-লাইট ভূতের গল্প

আমার পক্ষে ভূতের গল্প বলা খুব সহজ কারণ ছেলেবেলা থেকেই আমি শুনতে অভ্যস্ত। এসবে বিশ্বাস করতে আমাকে শেখান হয়েছিল। তবে নার্স-বুড়ীদের সেই সাদা কাপড় পরা ছায়ামূর্তি, দাঁত বার করা মাথার খুলি বা ভয়ঙ্কর অপদেবতার গল্প নয়। চেনা-জানা মানুষদের মৃত্যুর পর সত্যি সত্যি দেখা পাওয়া, যে জামাকাপড় পরে তারা এখানে ঘুরে বেড়াত, যেখানে যেখানে তারা যেত সেসব জায়গায়, এ ধরনের গল্প লোকেরা ঠাট্টা করে, মাঝে মাঝে বাতুলতা করে বলত ডেল পরিবারে ভূত আসা যাওয়া করে। ক্ষুদ্র বুদ্ধিসম্পন্ন লোক যারা এসব ঘটনা বিশ্বাস করেনা মাঝে মাঝে তাদের কাছে আমরা হাস্যাস্পদ হয়ে উঠতাম। আমার ঠাকুরদার বাবার সম্বন্ধে একটা গল্প তোমাদের বলতে পারি। তিনি একজনকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে মেরে ফেলেছিলেন। তাঁরই বিদেহী আত্মা মাঝে মাঝে তাঁকে দর্শন দিত। যেখানেই তিনি যেতেন পেছনে সেও ঘুরত। কখনও জনতার মধ্যে তাঁকে ইসারা করে ডাকত। কখনও তাঁর চেম্বারে একাকী থাকবার সময়ে দেখা দিত। একদিন এমন হয়েছিল যে তাঁর বাটলার মৃত লোকটির বিদেহী আত্মা তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে আছে অস্বীকার করলে সাময়িক উত্তেজনায় তরবারি বার করে তাকে ছুঁড়ে দিয়েছিল আর কি !! এইরকম ক্রমাগত আতঙ্কে তিনি পাগল হয়ে উঠেছিলেন, গেছল, [illegible]

অবশ্যি কিছু লোক বলত তিনি আগেই পাগল হয়েছিলেন।

সেইরকম তাঁর ছেলে, রডারিক ডেলও এক অজানা ভূতের ভয়ে শেষ জীবনটা পাগলখানায় কাটিয়েছিলেন। তেমনি তাঁর ভাগনে চার্লস মারডিন বারবার তাঁর পিতার বিদেহী-আত্মাকে দেখেছিলেন। হঠাৎ যেন দেয়াল থেকে তাঁর আবির্ভাব ঘটত। আমি তোমাদের এসব গল্প বলতে পারি তবে তোমরা তা শোনবার ভানও করবে না।

যে গল্পটা আমি তোমাদের বলতে যাচ্ছি সেটা কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। বছর দুই আগে এটা ঘটেছিল। এর সত্যতা প্রমাণ করতে এখনও ডজনখানেক লোক বেঁচে আছে। এখানে কিন্তু সাধারণ ভূতুড়ে গল্পের ভয় ধরাবার মত কোন উপাদান নেই। না আছে ভাঙাচোরা নির্জন বাড়ি, না গীর্জা-লাগোয়া কবরখানা, মাঝরাতের ঘণ্টা বাজার আওয়াজও নেই, শেকলের ঝন ঝনানি অথবা কোন আর্তনাদও নেই। এককথায়, আসল ভূতের গল্প, সাজানো-গোছানো কোন ভূতের রাজত্ব নয়। ব্যাপারটা ঠিকমত বুঝতে গেলে কুড়ি মাস আগের ম্যাপলটন শহরের অবস্থা এবং সেখানকার কয়েকজন বাসিন্দার সম্বন্ধে আমাকে কিছু বলতে হয়।

ম্যাপলটন প্রধানতঃ কৃষিপ্রধান জায়গা। প্রচুর কৃষিকার্য ও কৃষক সেখানে আছে। লোকসংখ্যা যেমন কম চাহিদাও তেমনি অল্প। রাজনীতিতে তারা সংরক্ষণশীল, স্বতন্ত্র সমাজ, অন্য দেশ সম্বন্ধে তাদের অজ্ঞতা অনেক। অধিকন্তু, জমিদার খুব অল্প কিন্তু ধনী এবং তাদের ভাড়াটে চাষীরা সচ্ছল ও সুখী। জানা যায়, একজন যুবক ম্যাপলটনের সাধারণ অবস্থায় বিরক্ত হয়ে ওঠে। যে বাড়িতে সে থাকত সেখানে তার পূর্বপুরুষেরা জন্মেছে এবং মরেছে। তার পক্ষে এখানে থাকা অসহনীয় হয়ে ওঠায় গ্রামের প্রান্তে কটেজ ও ভিলা স্টাইলে একটা নতুন বাড়ি তৈরি করে। এর কিছুদিন পরে সে একেবারে গোল্লায় যায় এবং তার জন্মস্থান ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়।

এইভাবে ম্যাপলটনে একটা বাড়ি ভাড়া দেওয়ার ঘটনা ঘটল। কিন্তু বেশ কয়েকবছর খালি থাকার পর কেমন করে গ্রেগরী বার্ণস্টেক এ খবর পেল এবং সেটা ভাড়া নিল তা কখনও জানতে পারা যায়নি। সে কে এবং কোথা থেকে এল কেউ জানে না। তাকে দেখতে খুব সুন্দর, তার মানে পাথরে খোদাই করা মুখের মত। কিন্তু চেহারাটা কাঠখোট্টা ও ভাবলেশহীন। সে যুবকও নয় বৃদ্ধও নয়। তার কোন বন্ধু তার সঙ্গে দেখা করতে আসে না। তাকে দেখে মনে হল বেশ স্বচ্ছল। ম্যাপলটনের লোকেরা ঠিক করল তার পরিচয় না জানা পর্যন্ত তার কাছ থেকে দূরে থাকাই ভাল। কিন্তু গ্রেগরী বার্ণস্টেক কখনও তার মনের অবস্থা জানতে দেবার সুযোগ দেয়নি। সেও যতটা পারে তাদের সংসর্গ এড়িয়ে চলে। তাই লোকেরা বলত—সে নিজের মধ্যেই নিজে থাকে।

একমাত্র ডাক্তারই শহরের লোক যে তার বাড়িতে ঢুকেছিল। গ্রেগরী একদিন দুপুর বেলায় অজ্ঞান হয়ে পড়ে। তার চাকর ছুটে গিয়ে ডাক্তার স্ইটম্যানকে তাড়াতাড়ি ডেকে নিয়ে আসে। ম্যাপলটনের নতুন অধিবাসী কাচের ওপর শুয়ে আছে। তার শরীর ঠাণ্ডা ও শক্ত, চোখ দুটো স্থির, দেখলেই মনে হয় একজন মরা শুয়ে আছে।

একঘণ্টার পর শরীরের কাঠিন্য চলে গেল, চোখ দুটোও আগের স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এল। রাগান্বিতভাবে একটু উঠে বসে ডাক্তারের ওপর গিয়ে পড়ল সব রাগ।

কে আপনি? হঠাৎ সে জিজ্ঞেস করল।

ডাক্তার স্ইটম্যান। আপনার চাকরের কাছ থেকে শুনলাম আপনি অসুস্থ, তাই এলাম আপনার কোন কাজে লাগতে পারি কি না।

আপনাকে ধন্যবাদ। যখন আমার ডাক্তারের দরকার হবে আপনাকে ডেকে পাঠাব।

ডাক্তার হাসিখুশি ও খোসমেজাজের লোক, এটাকে অগ্রাহ্য হিসেবে নিল। সে কিছুতেই দোষ ধরে না তবে আপ্যায়নে সন্তুষ্ট হতে পারলেন না।

গুড ডে, স্যার। ডাক্তার দরজা খুলে বলল।

অনুরোধ করছি একটু থাকুন ডাক্তার। গ্রেগরি বলল। আমি আপনাকে অসন্তুষ্ট করেছি মনে হয় আমাকে ব্যাপারটা বলতে দিন। মাঝে মাঝে আমার এরকম ফিট হয়। কখন এমন হবে আমি বলতে পারি না। আমাকে আক্রমণ করে একঘণ্টা, দুঘণ্টা এমন কি তিনঘণ্টা পর্যন্ত বোধশক্তিহীন করে সমস্ত দেহ অসাড় করে দেয়। এসময়ে কোন ডাক্তারের পটুত্ব আমার উপকার করতে পারে না। সেটা কেটে যাবার সঙ্গে সঙ্গে আমি ভাল হয়ে যাই যেমন এখন দেখলেন।

সেইসময় কি আপনার মন অচেতন থাকে? ডাক্তার জিজ্ঞেস করলেন।

বর্তমান সময়ের জন্যে অচেতন কিন্তু অতীতে আমি জীবিত থাকি ক্লান্তিতে হাই তুলে গ্রেগরী উত্তর দিল।

প্রথম যখন আক্রান্ত হন কোন ব্যথা অনুভব করেন?

হ্যাঁ। মনে হয় একটা বরফের হাত বুকের ওপর চেপে বসেছে। তারপর সেটা আরো চাপ দেয়, দারুণ ব্যথা বোধ করি, শেষে একেবারে সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ি।

হুঁ। অদ্ভুত তবে অভূতপূর্ব নয়। আপনার জন্যে কিছু পাঠাতে যদি আপনি অনুমতি দেন, আমি আশাকরি আপনার কষ্ট লাঘব করতে পারব।

এটা ভুল। আপনার মত ডাক্তারেরা ফলদানে বিশ্বাস করে ওষুধ দিয়ে যেতে থাকেন।

ডাক্তারীর ওপর আপনি ভুল ধারণা পোষণ করেন।

দান করেছিল, সুবর্ণকার

ডাক্তারীর ওপর ততটা নয় যতটা ডাক্তারের ওপর। শঠ ও বোকা লোকদের নিয়ে এই পৃথিবী। বোকা লোকেরা ওষুধ নেয় আর প্রতারকরা ওষুধের ব্যবস্থা করে। উত্তেজিত হয়ে বেশ মুখের মত জবাব দেয় ডাক্তার।

তাহলে স্যার, ধরে নিতে হবে পৃথিবীতে আপনি শ্রেষ্ঠ, কিছু ব্যবহার করতে উপদেশ দেবার মত শঠ আপনি নন আর সেটা গ্রহণ করবার মত বোকাও নন।

আপনার ওভাবে সিদ্ধান্ত করা ঠিক নয় কারণ আমার মত একজন হতভাগ্য প্রতারকের খেলা খেলতে গিয়ে বোকা বনেছি আর এই অবস্থায় পরিণত হয়েছি। আপনি যদি আমার জীবনের কথা শুনতেন, তবে আপনি—।

কি স্যার?

আপনি এক দুঃখীর কথা জানতেন।

কথাটার ওভাবে শেষ হওয়াতে ডাক্তারকে সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছিল। তার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেল। তার মাথায় নানা চিন্তার উদয় হল। সেকি কোন পাগলের সঙ্গে কথা বলছিল না বইয়ে পড়া কোন রহস্যজনক নায়কের সঙ্গে গল্প করছিল, যা সচরাচর দেখা যায় না।

ম্যাপলটনে গতানুগতিক জীবনধারা চলতে লাগল। ফসল কাটা হয় আবার ফসল বোনা হয়। কিন্তু গ্রেগরী রহস্যই রয়ে গেল। ডাক্তারের সঙ্গেই যা দু' একবার কথা হয়েছিল আর কারোর সঙ্গে সে বড় একটা ভদ্রতার সৌজন্য বিশেষ দেখাত না।

তারপর একটা সময় এল যখন তাকে প্রতিবেশীদের সঙ্গে মিশতে হয়েছিল। একটা রেল কোম্পানী ম্যাপলটনে কোন রেল লাইন না দেখে তার লোকদের পাঠাল। ওভারবেরী থেকে ম্যাপলটনের মধ্যে দিয়ে হার্সটোন হীথ পর্যন্ত রেললাইন পাতার জন্যে তারা ক্ষেতের মধ্যে জমি জরিপ করতে লাগল। স্টীম ইঞ্জিনের এই অনধিকার প্রবেশ রোধ করার জন্যে জমিদারেরা মিলিত হল।

গ্রেগরীকে একটা চিঠি দিয়ে এ ব্যাপারটা জানান হল। আরও বলা হল কোন একদিন সেভেন স্টারস হোটেলে ডিনারের সঙ্গে একটা সভা হবে। এ সভার উদ্দেশ্য প্রস্তাবিত রেল পরিকল্পনাকে বন্ধ করার জন্যে তীব্র প্রতিবাদ করা, আবেদন করা এবং আরো কিছু যা প্রয়োজন হতে পারে। এই চিঠির কোন উত্তর সে দেয়নি।

আর একটা চিঠি তাকে দেওয়া হল। প্রথমটার বিষয় মোটামুটি জানিয়ে বলা হল যে ঐ বাড়িটা স্টেশন করার জন্য মনোনীত হয়েছে; সে তখন জানাল এ খবর শুনে সে দুঃখিত। রেল লাইন হলে তাকে এ জায়গা ছেড়ে চলে যেতে হবেই। তবে ডিনারে উপস্থিত থাকতে সে প্রত্যাখ্যান করল।

যাহোক, তার ওপর চাপ দেওয়া হল। শেষে ডাক্তারের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে সে রেগে বলল: ঠিক আছে, বেশী কথা বাড়িয়ে দরকার

নেই, আমি উপস্থিত থাকব। কিন্তু মনে রাখবেন যা কিছু ঘটুক না কেন আমি তার জন্য দায়ী থাকব না।

অনেক কারণে সভায় তার উপস্থিতি কাম্য ছিল। তার মধ্যে প্রধান হচ্ছে সে-ই বেশী উৎসাহী হবে কারণ তারই বিশাল লীজ নেওয়া জমি রেল কোম্পানীর দরকার। আর একটা কথা, কানাঘোষা শোনা যাচ্ছিল সে নাকি খুব চালাক; ল্যাটিন ও গ্রীক বইও সে পড়ে এবং রহস্যজনক সব বই যা পণ্ডিত ছাড়া কারোর বোঝার ক্ষমতা নেই, তার টেবিলের ওপর পড়ে থাকে। ম্যাপলটনের অধিবাসীরা সাধারণতঃ সাহিত্য থেকে চাষবাস সম্বন্ধে বেশী জানত। তাদের মধ্যে এমন একজন লোককে পেয়ে ভাবল চিঠিপত্র লেখার দিক দিয়ে আর আসল ব্যাপার ঠিকভাবে লিখে জা'বার জন্যে তাকে খুব দরকার লাগবে। তাই গ্রেগরী অনিচ্ছাভাবে সভায় উপস্থিত থাকবার ঝামেলা নিল।

ম্যাপলটনবাসীদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের দিন এল। জমিদার ও বেশীর ভাগ ভাড়াটে চাষীরা সেভেন স্টারস হোটেলের বড় হলঘরটায় এসে মিলিত হল। ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় সময় ধরে গ্রেগরী এল। দরজা খুলে তাকে ভেতরে ঢোকার রাস্তা দিলে, চারদিকে চাপা গুঞ্জনধ্বনি উঠল। সে ভেতরে ঢুকতেই সব চুপচাপ। দু'একজন তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে তাকে সাদর অভ্যর্থনা জানাল। শেষ পর্যন্ত সে যে প্রতিবেশীদের সঙ্গে মেলামেশা শুরু করল তার জন্যে তারা খুব আনন্দিত হল। আশা করল ভবিষ্যতে তাকে পাওয়ার সৌভাগ্য যেন তাদের হয়। এর উত্তরে গম্ভীরভাবে সে জানাল যাকে সমাজ বলা হয় সেখানে মিশে সে কোন আনন্দ পায় না তবে তাকে যেভাবে জোর দেওয়া হল তাতে তাদের ইচ্ছে সে মেনে নিল। কিন্তু, এমন জোরে সে কথাগুলো বলল যাতে ঘরের সবাই শুনতে পায়, তোমাদের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করে, আমি বলতে ভুলে গেছি, আমার একার পক্ষে আসা অসম্ভব, তাই আমার অনুরোধ আর একজন অতিথির জন্যে একটা চেয়ার খালি থাকবে।

সকলেই বিস্মিত হয়ে গেল। গ্রেগরীকে কখনও কারো সঙ্গে ভালভাবে কথা বলতে দেখেনি, তার কোন বন্ধু বান্ধব আছে বলে কখনও মনে হয়নি অথচ তার এমন কেউ আছে যার কাছ থেকে কয়েক ঘণ্টার জন্যেও আলাদা থাকতে পারবে না।

আপনার বন্ধু কি এই প্রস্তাবিত অবৈধ রেল লাইন পাতার বিরুদ্ধে কোন-ভাবে উৎসাহী? এক বিশিষ্ট জমিদার জিজ্ঞেস করল।

কোনদিকেই নয়।

তার এখানে কোন সম্পত্তি আছে?

কিছুই না।

যেকোনভাবে জড়িত অথবা এবিষয়ে উৎসাহিত নয় এমন কোন লোককে

আমার এখানে আজ আশা করি না, তবে—। কথাবার্তার শেষ হল না, মুখটা লাল হয়ে উঠেছে।

আপনাদের যদি কোন আপত্তি থাকে আমি এখুনি প্রত্যাহার করছি।

না, না। কোনমতেই নয়। আমি বলতে যাচ্ছিলাম আপনার যেকোন বন্ধুকে আমরা গ্রহণ করব।

একটা চাপা নিস্তব্ধতা, কিছু অসংলগ্ন কথাবার্তা, তারই মধ্যে ডিনার ঘোষণা করা হল।

আপনার বন্ধু কি এসে পৌঁছেছেন? জমিদারটি সেই স্বল্প পরিচিত অদ্ভুত লোকটিকে জিজ্ঞেস করল। আমি ত' পরিচিত কোন লোককে দেখলাম না।

এখানে এখন নেই তবে নিশ্চয়ই সে আসবে। আমার পাশের চেয়ারটা খালি রাখতে চাই।

কোন আপত্তি উঠল না। ঐ একটা চেয়ার খালি রেখে যে যার আসনে বসে পড়ল। টেবিলে খাবারের ঢাকা খুলে খাওয়া শুরু হল।

খাবার সময় বেশী কথাবার্তা হল না কারণ ম্যাপলটনবাসীরা মনে করে খাওয়াটা মানুষের প্রধান কর্তব্য। প্রথম পর্ব শেষ হবার আগেই সকলে একসঙ্গে খাবারের থালা থেকে চোখ তুলে খালি চেয়ারে বসা মূর্তির দিকে চেয়ে রইল। শুধু গ্রেগরী নির্বিকারভাবে বসে রইল। তার পাশে চেয়ারে বসে আছে একজন লোক, তার চেহারার থেকে সাজগোজের বহরই বেশী। বয়সটা চল্লিশ-পঞ্চাশের মধ্যে। চুল ও জুলপি লাল রঙের, পরিপাটি করে আঁচড়ানো। সবচেয়ে লক্ষণীয় হচ্ছে তার রূপ—ফিকে ছাই রঙের যা দেখলেই বিস্মিত হয়ে গা শিউরে ওঠে। আর একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তার পোশাক। গায়ে তার পুরো সামাজিক সান্ধ্য ভোজের পোশাক।

চুপচাপ বসে আছে, কিছুই খাচ্ছে না, কোন ডিসের পাশে কাঁটা নিয়ে নাড়াচাড়া করছে। কেউ তাকে ঢুকতে দেখেনি, কেউ তাকে চেয়ারে বসতে দেখেনি, শান্ত ও নির্বিকারভাবে বসে আছে যেন সকলেরই জানা একজন আমন্ত্রিত অতিথি। সে যখন বাঁ হাত দিয়ে কাঁটা নাড়াচাড়া করছিল তখন আর একটা জিনিস স্পষ্ট দেখা গেল। তার হাতের দ্বিতীয় ও তৃতীয় আঙুল নেই।

যখন সকলেই থমকে আগন্তুকের দিকে চেয়েছিল তখন শুধু একজনই তার উপস্থিতি সম্বন্ধে নির্বিকার ছিল আর তার জন্যই সে এই ঘরে ঢুকেছে। জমিদার লোকটা ভাবল যে এটা যেন কিরকম বেমানানসই ব্যাপার কারণ গ্রেগরীর তাকে পরিচয় করিয়ে দেবার কোন ইচ্ছা নেই। সেই গ্যাস-লাইট জ্বালানো গরম ঘরে, সামনে টেবিলের ওপর ডিনার সাজানো সভাদের মধ্যে একজনও ছিল না যে অস্বস্তি বোধ করেনি কিন্তু কেন তা মোটেই বুঝতে পারেনি।

বিরক্তিজনক নীরবতা ভঙ্গ করার দায়িত্ববোধে সেই জমিদার বলল, আসুন

ভদ্রমহোদয়গণ, আশা করি এমন অনুষ্ঠানের সুযোগ আগে হয়নি। মিঃ পার্কহার্ষ্ট, আপনার সঙ্গেই মদের গেলাসের আনন্দ উপভোগ করি।

মিঃ পার্কহার্ষ্ট তার গেলাস ভর্তি করল।

ওঃ, আমার স্মরণ হচ্ছে বুড়ো টনি এই মদ কিনেছিল খুব সুন্দর—দেখি এটা কবেকার, '৪৪ সালের মনে হচ্ছে।

না। আগন্তুক বলল। '৪৮ সালের।

মাফ করবেন স্যার, আপনি কি টনি বীনকে জানতেন?

আগন্তুক মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল।

যাই হোক, যে বছর জেম হেলসকে চুরি করে শিকার করার জন্যে শাস্তি দেওয়া হয়েছিল এটা সে বছরের। তার দণ্ডভোগের সময় শেষ হয়ে এসেছে, সে শিগগির বাড়ি ফিরবে।

জেম হলস কখনও বাড়ি ফিরবে না, আগন্তুক বলল।

তাহলে তাকে আপনি চেনেন?

আমি তাকে খুব অল্প সময়ই দেখেছিলাম।

তাই বটে। ইংলণ্ডে না?

না।

এখন সে কোথায়?

তার কবরে।

জমিদার এই অনাহুত অতিথির দিকে ভয়ে তাকাল কিন্তু এব্যাপারে আর বেশীদূর এগোল না।

ডিনার টেবিলে কথাবার্তা ঝিমিয়ে এল, দু একবার সরগম করার চেষ্টা হয়েছিল কিন্তু পাশাপাশি লোকের মধ্যে ফিসফিসানির পরিসমাপ্তি ঘটল।

কাপড় সরিয়ে নিয়ে যাবার পর সভার লোকেরা আবার চাঙ্গা হয়ে উঠল। জমিদার দাঁড়িয়ে বাগ্মিতার মধ্যে দিয়ে সমস্ত রেল কোম্পানীর বিরুদ্ধে, বিশেষ করে ম্যাপলটনের প্রাচীন সরলতাকে ধ্বংস করার প্রচেষ্টাকে উচ্চরবে নিন্দা করতে লাগল। সকলেই একসঙ্গে হৈ হৈ করে ওঠায় সভাটা পণ্ড হবার উপক্রম হল। তখন গ্রেগরী উঠে আস্তে আস্তে বক্তৃতা আরম্ভ করল। এমন বক্তৃতা ম্যাপলটনে আগে কখনও শোনা যায়নি। সমস্ত ঘটনা পরিষ্কারভাবে ও সংক্ষেপে বলে স্বপক্ষে দরখাস্ত লেখবার এবং সই করবার জন্যে জোর দিল।

সমস্তক্ষণ আগন্তুক শান্ত ও অনড় হয়ে বসেছিল। যখন দরখাস্ত লেখার তোড়জোড় হচ্ছে তখন সে বলল, কষ্টের হাত থেকে আপনারা নিজেদের বিরত রাখুন। আপনাদের দরখাস্ত কোন কাজেই আসবে না।

আপনি কি করে জানলেন? তীক্ষ্ণকণ্ঠে জমিদার জিজ্ঞেস করল।

আমি প্রকৃত কথাই বলছি।

আপনি বোধ হয় কোম্পানীর একজন অংশীদার, ঠাট্টার সুরে একজন চাষী বলল।

আজ থেকে উনিশ মাস পরে ম্যাপলটনের ভেতর দিয়ে রেল যাবে। আগন্তুক বলল।

আশাকরি আপনি একজন মিথ্যা ভবিষ্যদ্বক্তা, স্যার, জমিদারের মন্তব্য।

তার ভবিষ্যদ্বাণী করা সত্ত্বেও দরখাস্ত তৈরি হল, সকলের সই হবার পর সভা ভেঙ্গে গেল।

দেখলেন ত' আমরা দৃঢ়ভাবে আমাদের পরিকল্পনা চালিয়ে গেলাম, যদিও আপনি অসাফল্যে ভবিষ্যদ্বাণী করলেন। টুপী মাথায় দিতে দিতে জমিদার বলল।

আগন্তুক মাথা নিচু করে অভিবাদন জানাল।

গুড ইভনিং স্যার।

আট মাসের মধ্যে আবার আমরা মিলিত হব।

আপনি নিশ্চয়ই অবস্থার ওপর নির্ভর করে ভবিষ্যদ্বাণী করেন। জমিদার কথাগুলো বলে ঈষৎ মাথা নামিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

গ্রেগরীর মনোযোগ আকর্ষণ করে ডাক্তার হুইটম্যান বলল, এক বিস্ময়কর লোক আপনার বন্ধু।

খুব।

মাফ করবেন, আমি ধৃষ্টতা দেখাতে চাই না, তবে আমার পেশার স্বার্থে জানাতে চাইছি, উনি কি কোন আভ্যন্তরীণ রোগে ভুগছেন?

আমি বলতে পারি কোন রোগই নয়।

এটা অদ্ভুত? এরকম রঙ আমি কোন জীবন্ত মানুষের দেখিনি।

সে জীবন্ত মানুষ নয়, এই কথা বলে গ্রেগরী চলে গেল। ডাক্তার ভয়ে বিস্মিত হয়ে তার দিকে চেয়ে রইল।

এই ভোজসভার আট সপ্তাহ পর সেই জমিদার ঘোড়ায় চড়ে শিকারী কুকুর নিয়ে বেড়িয়েছিল। একটা ছোট ঝোপ পার হতে গিয়ে হোঁচট খায়। তার ফলে জমিদার ঘোড়ার পিঠ থেকে ছিটকে পড়ে যায়। জমিদার কিংবা ঘোড়া কেউই আঘাত পায় নি। ঘোড়াটা টগবগ করে দৌড়চ্ছিল, জমিদারও তাকে ধরবার জন্যে তার পেছনে ছুটছিল। মাঠ, ঝোপঝাড় পেরিয়ে ঘোড়াটা একটা গাছের বেড়ার কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল। জমিদার দূর থেকে দেখল ঘোড়াটা একটা পুকুরের কাছে দাঁড়িয়ে, তার পাশে মানুষের এক মূর্তি। মানুষটা বিনা টুপীতে সান্ধ্য পোশাকে সজ্জিত। জমিদার মুহূর্তে তাকে চিনতে পারল দুমাস আগের ভোজসভার সেই আগন্তুক।

সেভেন ষ্টারস হোটেলের চার দেওয়ালের মধ্যে তাকে যেমন দেখেছিল হুবহু সেইরকম। কিন্তু খোলা জায়গায় এইরকম পোশাকে তাকে দেখে জমিদার

চমকে উঠল। সে সাহসী হলেও তাকে এড়িয়ে যেতে পারত। সেই 'গতিহীন মূর্তিটার পাশ দিয়ে না গিয়ে ঘোড়ার কাছে পৌছবার জন্যে এক থলে টাকাও সে দিতে পারত কিন্তু সেটা একেবারেই অসম্ভব। তাই টুপীটা মাথা থেকে তুলে ভয়লেশহীন মুখে আগন্তুককে ঘোড়াটা ধরবার জন্যে ধন্যবাদ জানাল। কিন্তু সে একটা শব্দও মুখ থেকে বার করল না। শেষে যখন জমিদার ঘোড়ার পিঠে চড়ে বসল তখন মূর্তিটা নড়ে উঠল। তার দিকে ফিরে দুটো আঙুল-খোয়া হাত বাড়িয়ে পুকুরের দিকে নির্দেশ করল।

জমিদার ঘোড়াকে নালের আঘাতে তাড়না করে চলে গেল।

দিনে দিনে সপ্তাহ, সপ্তাহ থেকে মাস পেরিয়ে গেল। রেল কোম্পানী ম্যাপলটনের ভেতর দিয়ে লাইন পাতার অনুমতি পেল। রাস্তা উঁচু করার কাজে শ'য়ে শ'য়ে মজুর লেগে গেল। জমিদারের কাছে স্মরণীয় পুকুরটায় জল বার করবার সময় এমন কিছু দেখে তারা কাজ বন্ধ করে দিল। কর্মকর্তাদের সেখানে ডেকে পাঠান হল। পুকুরের কাদার মধ্যে আধ-পোঁতা অবস্থায় একটা মানুষের কঙ্কাল পাওয়া গেল।

ডাক্তার হুইটম্যানকেও অবশ্যি তাদের মধ্যে ডাকা হয়েছিল। তার পরীক্ষার জন্যে কঙ্কালটায় হাত দেওয়া হয়নি। সেটা পরীক্ষা করার পর ডাক্তার বলল, এটা অদ্ভুত ব্যাপার। একটা হাতের দুটো আঙুল নেই।

অনুসন্ধানের পর এব্যাপারে করার কিছুই ছিল না। কঙ্কালটাকে একটা কফিনের মধ্যে পুরে গীর্জা সংলগ্ন জমিতে কবর দেওয়া হল। একটা চিন্তা ডাক্তারের মাথায় এল—হয়ত গ্রেগরী এই কঙ্কালের বিষয়ে কিছু আলোকপাত করতে পারে। তার সেই রহস্যময় বন্ধুটার বাঁ হাতের দুটো আঙুল ছিল না। ডাক্তার ফেরার সময় গ্রামের প্রান্তে সেই বাড়িতে গেল।

সে দরজায় ধাক্কা দিল, কোন সাড়া নেই। দরজাটা ভেজান ছিল, ঠেলতেই খুলে গেল। সে বসার ঘরে গেল যেখানে এই বাড়ির অদ্ভুত মালিকের সঙ্গে তার প্রথম দেখা হয়েছিল। প্রথমেই নজর পড়ল গ্রেগরী বার্নিষ্টেক মেঝেয় পড়ে রয়েছে। তার সুন্দর মুখখানা যন্ত্রণায় ভয়ঙ্করভাবে বিকৃত—সে মৃত!

সত্যিই কি সে মৃত না কি সেই ফিটের ব্যারামে সে পড়েছে! ডাক্তার বিভিন্নভাবে তাকে পরীক্ষা করল, শেষে নিশ্চিত হল সত্যিই তার মৃত্যু হয়েছে —ফিটের নিদারুণ যন্ত্রণা তাকে শেষ করে দিয়েছে। বাকীটা বলার সাহস আমার নেই। কিন্তু তবু এটা সত্যি যে মৃতদেহ পরীক্ষা করার সময় তার বুকের ওপর একটা হাত সজোরে চেপে ধরার স্পষ্ট দাগ দেখা যায়। সেই হাতে দ্বিতীয় ও তৃতীয় আঙুল নেই।

এই গল্প তোমাদের বলতে চেয়েছি। এখন তোমরা এটাকে যেভাবে ইচ্ছা নিতে পার। এটা একটা রহস্য, চিরদিন এ রহস্য থেকে যাবে। অনেক অদ্ভুত গল্প শোনার মধ্যে এটা একটা এবং সত্যি বলে জানি তবে রহস্য সমাধানের

কোন সূত্র আমি তোমাকে দিতে পারব না।

শেষে এইটুকু বলতে পারি এ গল্পের সত্যতা প্রমাণ করতে এখনও যারা



বেঁচে আছে তারাও আমার মত এই অদ্ভুত ঘটনার কোন ব্যাখ্যা দিতে নারাজ। আমি এই গল্পের নামকরণ করেছি—গ্যাস-লাইট ভূতের গল্প।

মিসেস ম্যাবারলির গল্প বিভিন্ন শ্রোতাদের মধ্যে ভিন্ন ধারণা সৃষ্টি করল। কয়েকজন ভয়ে শিউরে উঠে অস্বস্তিতে এদিক ওদিক দেখতে লাগল। বাকীরা অনেক কষ্টে হাসি চেপে রেখে যতই গল্পটা চরম পরিণতির দিকে এগোতে থাকে ততই তাদের ঠোঁট দুটো কেঁপে কেঁপে কুঁচকে ওঠে।

উঃ ভীষণ ভয়ঙ্কর! তিন-আঙুলে লোকটার স্বপ্ন দেখব নিশ্চয়ই। মিসেস মেরীফিল্ড বলে ওঠে।

ওঃ মেগি, মেগি, হো হো করে হাসতে হাসতে বলে মিসেস ফেদারষ্টোন, এমন বাজে গল্প কেউ বিশ্বাস করতে পারে? জামা-কাপড়, চামড়ার জুতো পরে একটা ভূত! রাগ করো না, আমি না হেসে থাকতে পারছি না।

আমার কাছে মনে হয়, রহস্যপূর্ণভাবে মিস ম্যাক্রিগর বলল, এটা আনন্দের থেকে দুঃখের ব্যাপার। অতিপ্রাকৃত শক্তির অস্তিত্ব সম্বন্ধে বিশিষ্ট লোকেরা যে মত দিয়েছে, তাতে এখনও অনেক লোককে এব্যাপারে বিশ্বাস করতে দেখা যায়।

কিন্তু কি করে আমরা ইন্দ্রিয়ের সাক্ষ্যকে অস্বীকার করতে পারি? মিসেস ম্যাবারলি জোরের সঙ্গে বলল। আমি যদি একটা দেখি তবে লোকের কথা না শুনে আমার নিজের চোখকেই বিশ্বাস করব।

মিসেস ম্যাবারলি, ভূত বলে কিছু নেই।

স্ত্রীলোকটি কথা বলার সময় ঘরের মধ্যে একটা চাপা হাসি শোনা গেল, কোথা থেকে এই হাসি এল কেউ জানে না। বিবাহিত স্ত্রীলোকেরা আতঙ্কে সচকিত হয়ে পরস্পরের মুখের দিকে চেয়ে রইল।

এটা কি? কোথা থেকে আওয়াজ এল। তুমি শুনেছ? ভয়ে ফিসফিস করে একজনকে জিজ্ঞেস করল।

ঘুলঘুলি দিয়ে বাতাসে শোঁ শোঁ শব্দ হচ্ছে, কুমারী মেয়েটি সাহসের সঙ্গে বলল, দেখ এখনও কেমন বাতির শিখাটা কাঁপছে—বাতাস ছাড়া আর কিছুই নয়, যেমন সব ভূতের গল্পে হয়।

A tale of a Gas-light Ghost—*Anonymous*

প্রতিজ্ঞা-পালন

তখন রাত এগারটা। লণ্ডনের এডিনবার্গ শহরের রাস্তাগুলো এ সময়ে বেশ নির্জন থাকে। পথে বিশেষ লোক চলাচল করে না। এমন এক শান্ত ও নিস্তব্ধ রাস্তায় এক হোস্টেল বাড়ির চার তলায় থাকে ম্যারিয়ট। সে এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। সেখানে তার নিস্তব্ধতা ভঙ্গ হয় না বললেই চলে। এই হোস্টেলে তার মত কিছু ছাত্র এবং সাধারণ খেটে খাওয়া লোকও থাকে।

দরজায় খিল দিয়ে একমনে সে পড়া মুখস্ত করে চলেছে। বেশ কয়েক-বার পরীক্ষায় ফেল করায় তার বাবা-মা বলেছেন এটাই তার শেষ সুযোগ। তাদের অবস্থা বিশেষ ভাল নয়। আর তাঁরা টাকা পয়সা খরচ করতে পারবেন না। সেইজন্যে সে এবার আদা-জল খেয়ে লেগেছে— তাকে পাশ করতে হবে নয় মরতে হবে।

তার কিছু বন্ধু ও পরিচিত লোক ছিল। তারা প্রতিজ্ঞা করেছিল রাতে তার পড়ার কোন ব্যাঘাত ঘটাবে না। বেশ কয়েক সপ্তাহ ধরে সে ভীষণ পড়ছে। যে সময় এবং টাকা নষ্ট হয়েছে সেটা সে উসুল করতে চায় যদিও এ দুটোর গুরুত্ব সে কোনটাই বোঝে না।

এত রাতে হঠাৎ দরজায় বেল বাজার আওয়াজ শুনে সে একটু বিস্মিত হল। ভাবল কোন লোক এসেছে। কখনও কখনও কোন বাসিন্দা বেলটা চাপা দিয়ে নিঃশব্দে নিজের কাজে চলে যায়। কিন্তু ম্যারিয়ট সে ধরনের ছিল না। লোকটি কে এবং কি চায় সে যদি না জানতে পারে তাহলে সারারাত মনটা তার খুঁতখুঁত করবে। তাই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তার আসার উদ্দেশ্য জেনে নিয়ে তাকে বিদায় করতে হবে।

বাড়িওয়ালিও রোজ ঠিক রাত দশটার' সময় খাওয়া দাওয়া সেরে শুতে যায়। এরপর দরজায় কোন বেল বাজলে সে না শোনার ভান করে। অগত্যা ম্যারিয়ট দরজা খুলে দেবার জন্যে পড়া ছেড়ে লাফিয়ে উঠল।

পাথরে বাঁধানো সিঁড়ি। প্রত্যেক তলায় একটা করে গ্যাসের আলো জ্বলছে। তার মৃদু আলো জায়গাটাকে আরো ভয়াবহ করে তুলেছে। সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে আবার বেল বাজল। মনে রাগ ও বিরক্তি নিয়ে নিচে এসে দরজা খুলে বলল, সবাই জানে আমি এখন পরীক্ষার পড়া তৈরি করছি। এই অসময়ে এসে কেন তারা আমাকে বিরক্ত করে ?

হাতে বই নিয়ে দরজা খুলে ম্যারিয়ট দাঁড়িয়ে রয়েছে। ভাবছে যেকোন মুহূর্তে আগন্তুকের আবির্ভাব হবে। জুতোর শব্দটা এত কাছে এবং এত

জোরে যে মনে হচ্ছে পা দুটো যেন আগে আগে আসছে। যেই হোক না কেন, এই অসময়ে তার কাজে ব্যাঘাত ঘটানোর উপযুক্ত আপ্যায়নের জন্তে সে তৈরি হয়ে আছে কিন্তু লোকটির দেখা নেই! পায়ের শব্দটা তার নাকের ডগায় অথচ কাউকে দেখা যাচ্ছে না!

হঠাৎ ভয়ে তার শরীর শিংশিরিয়ে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে ভয়টা আবার কেটেও গেল। ভাবল, চীৎকার করে অদৃশ্য আগন্তুককে ডাকবে না দরজা বন্ধ করে তার পড়ায় ফিরে যাবে। সেই সময়ে একটা খসখস শব্দ হল, আগন্তুককে দেখা গেল।

লোকটি বয়সে তরুণ, বেঁটে খাটো, মোটা চেহারা। মুখটা খড়ির মত সাদা, উজ্জ্বল চোখ দুটোর তলায় কালো দাগ। যদিও তার একমুখ দাড়ি এবং চুলগুলো আলুথালু তবু তার পোশাকের পারিপাট্য দেখে ভদ্রলোক বলে মনে হয়। সবথেকে আশ্চর্যের ব্যাপার তার মাথায় কোন টুপী নেই এমন কি হাতেও নেই। সন্ধ্যে থেকে সমানে বৃষ্টি হয়ে চলেছে, তার গায়ে ওভার কোটও নেই, হাতে ছাতাও নেই।

তাকে দেখে ম্যারিয়টের মনে নানা প্রশ্ন উঁকি মারতে লাগল। তার জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হল, কে আপনি? কি প্রয়োজনেই বা আপনার আগমন? কিন্তু মুখ দিয়ে কোন শব্দ বেরোবার আগেই লোকটির মাথাটা একটু ঘোরালো। গ্যাসের আলো তার মুখে পড়তেই ম্যারিয়ট মুহূর্তে তাকে চিনতে পারল।

ফিল্ড! তুমি বেঁচে আছ? ভয়ে ম্যারিয়টের শ্বাস রুদ্ধ হবার উপক্রম হল।

ম্যারিয়ট এই ফিল্ডের সঙ্গে একই স্কুলে পড়েছিল। সে যা ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল অবশেষে সেই দুঃখময় পরিণতি ঘটেছে। তার বাবা তাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন। তার সঙ্গে পরে একবারই মাত্র দেখা হয়েছিল। তার বাড়ির কাছেই ফিল্ড থাকত তাই তার বোনেদের মারফত সব খবরই ম্যারিয়ট পেত। ফিল্ড অসংযত জীবন যাপন করত—মদ্যপান, আফিম ইত্যাদির নেশায় সে একেবারে গোল্লায় গিয়েছিল।

ভেতরে এস। ম্যারিয়টের সব রাগ দূর হয়ে গেছে। মনে হচ্ছে কিছু গণ্ডগোল হয়েছে। ভেতরে এস। আমাকে সব বল, হয়ত আমি কোন সাহায্য—। আর কি বলবে সে ভেবে পেল না, তোতলাতে লাগল। জীবনের যে অন্ধকার দিক আছে, তার যে ভয়াবহতা আছে, সেটা এমন এক জগৎ যা ম্যারিয়টের জানা ক্ষুদ্র বইয়ের গণ্ডি ও স্বপ্নের অনেক দূরে। কিন্তু তার হৃদয় আছে।

সদর দরজা বন্ধ করে তাকে নিয়ে ম্যারিয়ট হলের দিকে এগোতে লাগল। সে লক্ষ্য করল ফিল্ড অনেকটা সংযমী কিন্তু সে যে পরিশ্রান্ত তার টলায়মান পা

দুটো তার স্বাক্ষর দিচ্ছে। ম্যারিয়ট হয়ত পরীক্ষায় পাশ করতে পারবে না কিন্তু তার মুখে তীব্র ক্ষুধার জ্বালা সে অনুভব করতে পারছে।

উৎফুল্ল হয়ে এবং সমবেদনার সুরে ম্যারিয়ট বলল, আমার সঙ্গে এস। তোমাকে দেখে আমার খুব আনন্দ হয়েছে। এইমাত্র আমি কিছু খেতে যাচ্ছিলাম, তুমি ঠিক সময়ে এসেছ।

অন্যজনের কাছ থেকে কোন উত্তর পাওয়া গেল না। সে এতই দুর্বলভাবে হাঁটছে যে ম্যারিয়ট তার হাতটা ধরে নিয়ে চলল। এই প্রথম সে লক্ষ্য করল জামা কাপড় তার গায়ে খুব ঢিলেঢালা। তার বিরাট চেহারাটা কঙ্কালসার। তাকে ছোঁয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ম্যারিয়টের মূর্ছা প্রবণতা ও ভীতির উত্তেজনা উদ্রেক করল। কিন্তু তা মুহূর্তের জন্যে। পরক্ষণেই সে নিজেকে সান্ত্বনা দিল তার বন্ধু ফিল্ডের দুঃখজনক অবস্থা তাকে আঘাত করেছিল বলেই তার মনের এমন অবস্থা ঘটেছিল।

তোমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাওয়াই ভাল। খুব অন্ধকার—এই হল-ঘরটা। আমি বারবার নালিশ করি। কিন্তু বুড়িটা কথা দেওয়া ছাড়া আর কিছুই করে না। তাকে ঘরে নিয়ে গিয়ে সোফায় বসাল। ম্যারিয়ট আশ্চর্য হচ্ছে এই ভেবে যে কোথা থেকে ফিল্ড আসছে আর কি করেই বা সে তার ঠিকানা জানল। অন্ততঃ সাত বছর আগে তারা সেই স্কুলে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বের মধ্যে দিয়ে দিন কাটিয়েছিল।

এক মিনিটের জন্যে আমাকে মাফ কর, আমি আবার ঠিক করি। সেই-সঙ্গে তুমি কথা বলতে বিরক্ত হয়ো না। সোফায় বিশ্রাম নাও, তুমি বড্ড ক্লান্ত। পরে আমাকে সব বলো, আমরা দুজনে পরিকল্পনা করব।

ফিল্ড সোফার ধারে বসে কোন কথা না বলে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল। ম্যারিয়ট আলমারী থেকে বাদামী রঙের পাউরুটি, কেক এবং একটা বড় পাত্রে কমলালেবুর আচার বার করে আনল। এডিনবার্গের ছাত্রেরা সবসময় এগুলো মজুত রাখে। আলমারীর দরজার কাছ থেকে ঘাড় ফিরিয়ে দেখল তার চোখ দুটো ভীষণ চকচক করছে। ম্যারিয়ট ভাবল এটা কোন ওষুধের জের। ওর অবস্থা খুবই খারাপ অতএব তার কাছ থেকে শোনা পর্যন্ত অপেক্ষা করাই ভাল। তাছাড়া কথা বলার পক্ষে সে এখন বড়ই ক্লান্ত। সুতরাং ভদ্রতার দিক দিয়ে—এবং আরো একটা দিকে—সেটা যে ঠিক কি তা সে নিজেই বুঝে উঠতে পারল না—তাকে বিশ্রাম দেওয়াই উচিত। কোকো তৈরি করবার জন্যে সে স্পিরিট-ল্যাম্প জ্বালাল। জল যখন ফুটছে তখন খাবার টেবিলটা সোফার কাছে টেনে নিয়ে এল যাতে ফিল্ডের চেয়ারে উঠে গিয়ে বসতে কষ্ট না হয়।

এস, এখন ভুরি-ভোজন করা যাক, তারপর পাইপ টানতে টানতে গল্প করা যাবে। পরীক্ষার জন্যে আমি তৈরি হচ্ছি, বুঝলে। এই সময় আমি কিছু কিছু নিয়ে ব্যস্ত থাকি। একজন বন্ধুকে কাছে পেয়ে খুব আনন্দ হচ্ছে।

চোখ তুলে তাকিয়ে দেখল তার অতিথি তারই দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রয়েছে। ম্যারিয়টের মাথা থেকে পা পর্যন্ত একটা শিহরণ খেলে গেল। বসে থাকা লোকটির মুখ মৃতের মত সাদা এবং ব্যথা ও মানসিক কষ্টের একটা ভীতি-পূর্ণ ভাব তার মুখে ফুটে উঠেছে।

হা ভগবান! ম্যারিয়ট লাফিয়ে উঠল। আমি একেবারে ভুলে গেছি! কোথায় যেন মদ রেখেছি! আমি কি গাধা! এমন কাজের মধ্যেও আমি ছুঁইনি।

আলমারী থেকে মদের বোতল ও গেলাস বার করে আনল। গেলাসে মদ ঢেলে ফিল্ডকে দিল। সে জল না মিশিয়ে সেটা এক ঢোঁকে শেষ করে ফেলল। ম্যারিয়ট দেখল তার কোটটা ধুলোয় ভর্তি, কাঁধে মাকড়সার জাল আটকে রয়েছে। একেবারে শুকনো খটখটে। বৃষ্টিঝরা রাতে ফিল্ড এসেছে—টুপী, ছাতা, ওভারকোট কিছুই নেই—অথচ শুকনো, এমনকি ধূলোভর্তি! তাহলে সে ঢাকা অবস্থায় ছিল। এসবের কি মানে? সে কি এই বাড়িতেই লুকিয়েছিল?

এটা বড় অদ্ভুত ব্যাপার! তবু সে কিছু জিজ্ঞেস করেনি। সে ঠিক করেছে তার খাওয়া ও ঘুম না হওয়া পর্যন্ত তাকে কোন কথা জিজ্ঞেস করবে না। খাদ্য এবং ঘুম—এ দুটোই এখন এর প্রয়োজন। ঠিক লক্ষণ ধরতে পেরে সে সন্তুষ্ট। সে একটু সুস্থ না হয়ে ওঠা পযন্ত কোন চাপ দেওয়া ভাল হবে না।

তারা দুজনে খেতে লাগল। ম্যারিয়ট একাই কথা বলে যাচ্ছে। তার নিজের সম্বন্ধে, তার পরীক্ষার ব্যাপারে, বুড়ি বাড়িওয়ালির কথা। একনাগাড়ে বলে চলেছে যাতে তার অতিথিকে কিছু বলতে না হয়। ম্যারিয়টের খাবার কোন ইচ্ছে নেই, হাতে খাবার নিয়ে নাড়াচাড়া করছে। অথচ লোকটি গোগ্রাসে গিলছে। এক ক্ষুধার্ত লোকের এইভাবে ঠাণ্ডা, বাসি খাবার খাওয়ার আগ্রহ দেখে অনভিজ্ঞ ছাত্র ম্যারিয়টের সামনে না খেতে পাওয়ার এক বিস্ময়কর রহস্য উদ্‌ঘাটিত হল। আশ্চয হয়ে দেখছে আর ভাবছে লোকটার গলায় খাবার আটকে যাচ্ছে না তো!

কিন্তু ফিল্ড যেমন ক্ষুধার্ত তেমনি নিদ্রালু। মাঝে মাঝে তার মাথা সামনের দিকে ঝুলে পড়ছে, মুখের খাবার চিবোন বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। ম্যারিয়ট বারবার তাকে ঝাঁকানি দিয়ে জাগিয়ে তুলছে। একটা জোরালো আবেগ দুর্বলতাকে বসে আনতে পারে কিন্তু ক্ষুধার জ্বালা মেটানো এবং নিদ্রা দূর করার এই যে সংগ্রাম এটা তার কাছে অদ্ভুত লাগল। বিস্ময়মিশ্রিত ভয়ে সে একদৃষ্টে তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। সে শুনেছে ক্ষুধার্তকে সামনে বসিয়ে খাওয়ানোর মধ্যে আনন্দ আছে কিন্তু তার নিজের সে অভিজ্ঞতা কখনও হয়নি। ফিল্ড পশুর মত গবগব করে খাবার মুখে পুরে সরু গলনালি দিয়ে গিলে ফেলল। ম্যারিয়ট পড়ার কথা ভুলে গেল। তার নিজেরই গলায় যেন কিছু আটকে

আছে বোধ হল।

তার শেষ কেকটা গলাধঃকরণ করার পর হঠাৎ বোকার মত ম্যারিয়ট বলল, তোমাকে দেবার মত আমার আর কিছু নেই।

তখনও ফিল্ড কোন কথা বলল না। তার নিজের জায়গায় প্রায় ঘুমিয়ে পড়ার মত অবস্থা। ক্লান্ত ও কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে সে একবার চোখ তুলে দেখল।

এখন একটু ঘুমের দরকার নচেৎ তোমার শরীর একেবারে ভেঙে পড়বে। আমাকে সারারাত জেগে পরীক্ষার পড়া করতে হবে। আমার বিছানায় তুমি স্বচ্ছন্দে ঘুমোতে পার। কাল একটু বেলাতে ব্রেকফাষ্ট সারব, আর—আর দেখি কি করা যায়—পরিকল্পনা করব—তুমি জান আমি এব্যাপারে ওস্তাদ। ঘরের পরিবেশ হাল্কা করার জন্যে ম্যারিয়ট কথাগুলো বলল।

ফিল্ড মৃত্যুর নীরবতা পালন করে চলেছে। তার মৌনতা সম্মতির লক্ষণ ভেবে ম্যারিয়ট তাকে তার ছোট শোবার ঘরে নিয়ে গেল। ফিল্ড জমিদারের ছেলে, তাদের বাড়ি প্রাসাদতুল্য। তার কাছে এই ছোট সামান্য ঘরটা নেহাতই পুতুল ঘর।

ক্লান্ত অতিথি কোন ধন্যবাদ বা ভদ্রতার ভান না করে তার বন্ধুর হাতে ভর দিয়ে পা টেনে টেনে ঘরে গেল। গায়ের পোশাক শুদ্ধ তাকে বিছানার ওপর শুইয়ে দিল।

দরজায় দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ ম্যারিয়ট তাকে দেখল। তারপর তাকে যেন এমন দুর্ভাগ্যজনক অবস্থার মধ্যে পডতে না হয় তার জন্যে ভগবানের কাছে আন্তরিক প্রার্থনা জানাল। পরমুহূর্তে তার চিন্তা হল এই অনাহুত অতিথিকে নিয়ে কাল সে কি করবে। কিন্তু বেশীক্ষণ এ ভাবনা তাকে উতলা করে তুলতে পারল না কারণ তার পরীক্ষার ব্যাপারটা তার মন কেড়ে নিল।

দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে সে বই নিয়ে বসল। মেটিরিয়া মেডিকার যেখান থেকে নোট করতে করতে বেল শুনে উঠে গেছল সেখানে আবার মনোনিবেশ করল। কিন্তু বেশ খানিকক্ষণ সে মনোযোগ দিতে পারল না। তার চিন্তা কেবল এই মূর্তিটায় ঘুরপাক খাচ্ছে—সাদা ফ্যাকাসে মুখ, অদ্ভুত জ্বলন্ত চোখ, ক্ষুধার্ত ও মলিন বেশ, পোশাক ও জুতো পরে বিছানায় শুয়ে রয়েছে।

তার মনে পড়ল সেই ফেলে আসা স্কুল জীবনের কথা। তাদের দুজনের মধ্যে ছাড়াছাড়ি হবার আগে তারা চিরন্তন বন্ধুত্বের শপথ নিয়েছিলেন। আরো কত কি! আর এখন! কি ভয়াবহ দুর্দশা! কেমন করে তার ওপর একজন মানুষের ভালবাসা জন্মাতে পারে।

কিন্তু তাদের দুজনের একটা শপথ ম্যারিয়ট একেবারে ভুলে গেছে। ঠিক এই মুহূর্তে সেই স্মৃতি তার মনের অনেক দূরে।

ম্যারিয়ট আধখোলা দরজা দিয়ে শোবার ঘর থেকে গভীর দীর্ঘশ্বাসের শব্দ শুনতে পাচ্ছে। শ্রান্ত, ক্লান্ত মানুষের গভীর নিদ্রা তাকেও প্রায় বিছানায়

আকর্ষণ করছিল।

ম্যারিয়ট ভাবল, এটা তার দরকার, আর ঠিক সময়েই হয়ত এই ঘুম তার এসেছে।

তখন বাইরে সোঁ সোঁ শব্দে ঠাণ্ডা বাতাস বইছে; জানালার সার্সিতে ও রাস্তায় অঝোরে বৃষ্টি পড়ছে। ম্যারিয়ট আবার পড়ায় মনোনিবেশ করল কিন্তু বইয়ের মধ্যে সে স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে পাশের ঘরের লোকটির ভারী ও গভীর নিঃশ্বাস।

ঘণ্টা দুয়েক পর একটা হাই তুলে সে বই বদল করল। তখন তার নিঃশ্বাস কানে আসছে। সন্তর্পণে দরজার কাছে গিয়ে সে একবার ঘরের চারদিক দেখল।

প্রথমে, হয় ঘরের অন্ধকারে সে চোখে কিছু দেখতে পাচ্ছিল না' নয়ত আলোয় এতক্ষণ বসে থেকে তার চোখ ধাঁধিয়ে গেছল। কিছুই সে ঠিক বুঝে উঠতে পারল না—আসবাবপত্রগুলো কালো ঢেলার মত, দেয়ালে ড্রয়ারের আলমারীটা একটা কালো বস্তু, ঘরের মাঝখানে সাদা বাথটবটা যেন একটা সাদা প্রলেপ।

তারপর ধীরে ধীরে তার বিছানাটা দৃষ্টিপথে এল। সে দেখল তার ওপর একটা ঘুমন্ত দেহের রেখা ক্রমে ক্রমে আকার নিল। তারপর অন্ধকারের মধ্যে অদ্ভুতভাবে সে বাড়তে লাগল। একটা পরিষ্কার আকৃতি পরিগ্রহণ করল—সাদা শুজনির ওপর একটা লম্বা কালো মূর্তি!

সে না হেসে পারল না। ফিল্ড একটুও নড়েনি। কয়েক মুহূর্ত তাকে দেখে ম্যারিয়ট আবার তার বইয়ের কাছে ফিরে এল।

একঘেয়ে বৃষ্টি আর বাতাস বয়ে চলেছে। গাড়ির কোন শব্দ নেই, পাথরের ওপর দিয়ে দুচাকার গাড়ি চলার ঠনঠন শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না, দুধের গাড়ি চলারও সময় এখন নয়। ম্যারিয়ট স্থিরভাবে ও বিচারবুদ্ধি দিয়ে পড়া করতে লাগল। মাঝে মাঝে ঘুম তাড়াবার জন্যে একটা কাপে চুমুক দিচ্ছে। তারই ফাঁকে ফিল্ডের গভীর নিঃশ্বাস তার কানে আসছে।

বাইরে বেগে ঝড় বইছে কিন্তু বাড়ির মধ্যে নিস্তব্ধতা বিরাজ করছে। টেবিল ল্যাম্পের আলো সমস্ত টেবিলে ছড়িয়ে পড়েছে অথচ ঘরের সবটাই অন্ধকারাচ্ছন্ন। শোবার ঘরটা সে যেখানে বসে আছে ঠিক তার উল্টো দিকে, তার কাজে ব্যাঘাত ঘটাবার মত কিছুই নেই, তবে মাঝে মাঝে ঝড়ের ঝাপটা জানালার ওপর পড়ছে আর তার হাতে সামান্য একটু ব্যথা অনুভব করছে।

এই ব্যথাটা যে কি করে হল সে বুঝতে পারছে না, কখনও টনটন করে উঠছে। এটা তাকে বিরক্ত করে তুলছে। সে মনে করবার চেষ্টা করছে কেমন করে, কখন এবং কোথায় তার হাতে ধাক্কা লেগেছিল কিন্তু কিছুই ভেবে পাচ্ছে না।

অবশেষে তার চোখের সামনে বইয়ের পাতার রঙ হলদে থেকে ধূসর বর্ণে বদলে গেল এবং নিচে রাস্তায় চাকার শব্দ কানে এল। তখন ভোর চারটে। ম্যারিয়ট চেয়ারে হেলান দিয়ে বিরাট হাঁ করে হাই তুলল। জানালার পর্দাগুলো সে সরিয়ে দিল। তখন ঝড়বৃষ্টি থেমে গেছে। বাইরের সবকিছুই কুয়াশায় ঢাকা। আর একবার হাই তুলে সেদিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিল। ব্রেকফাস্টের আগে শোফায় শুয়ে বাকি চার ঘণ্টা ঘুমিয়ে নেবার জন্যে প্রস্তুত হল। কিন্তু তখনও পাশের ঘরে গভীর নিঃশ্বাস ফেলছে। পায়ে ভর দিয়ে নিঃশব্দে আর একবার তাকে দেখে নিল।

সন্তর্পণে আধখোলা দরজার ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে ভোরের মৃদু আলোয় বিছানাটা পরিষ্কার দেখতে পেল। একদৃষ্টে তাকিয়ে দেখছে। একবার চোখটা রগড়ে নিয়ে দেখল। আবার সে চোখ রগড়ালো—তীব্র দৃষ্টিতে চেয়ে রইল। অবাক বিস্ময়ে তার মুখটা হাঁ হয়ে গেল। বিছানা শূন্য, ঘর শূন্য।

ফিল্ডের প্রথম আবির্ভাবে যে ভয় ম্যারিয়টের মনে জেগে উঠেছিল সেই ভয় হঠাৎ যেন সে আবার অনুভব করতে লাগল। এবার যেন আরো বেশী। সেই সঙ্গে সে সচেতন হয়ে উঠল তার বাঁ হাতটা দপদপ করছে, আরো বেশী ব্যথা বোধ করছে। বিস্ময়ে হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে আর চিন্তা করার চেষ্টা করছে। পা থেকে মাথা পর্যন্ত ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপছে।

সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে মনে বল এনে সাহসের সঙ্গে সে বিছানার দিকে এগিয়ে গেল। দেখল, বিছানার ওপর যেখানে ফিল্ড শুয়ে ঘুমিয়েছিল সেখানে দেহের চাপ পড়ে একটা ছাপ রয়েছে। বালিশে মাথা রাখার দাগ, নিচের দিকে শুজনির ওপর যেখানে বুটজুতো পরা পা রেখেছিল সেখানটা গর্ত হয়ে গেছে। আর সে বিছানার এত কাছে ছিল যে পরিষ্কারভাবে নিঃশ্বাসের শব্দ শুনতে পাচ্ছিল!

সমস্ত শক্তি সংহত করে সে চীৎকার করে তার বন্ধুর নাম ধরে ডাকতে লাগল—ফিল্ড! তুমি আছ! কোথায় তুমি!

কোন সাড়া নেই। বিছানা থেকে নিঃশ্বাসের শব্দ অব্যাহত রয়েছে! তার নিজের স্বর তার কানে অদ্ভুত লাগছে। আর সে ডাকল না। হাঁটু গেড়ে বসে বিছানার ওপরে-নিচে ভাল করে পরীক্ষা করে দেখল। শেষে শুজনি তুলে ফেলল, একটার পর একটা চাদর, তোষক তুলে দেখতে লাগল। যদিও দৃশ্যত ফিল্ডকে দেখা যাচ্ছে না তবু সে তার নিঃশ্বাসের শব্দ শুনতে পাচ্ছে। এমন কোন জায়গা নেই যেখানে লুকিয়ে থাকতে পারে। দেয়ালের কাছ থেকে খাটটা টেনে নিয়ে এল তবু শব্দটা সেখানেই রয়ে গেল, বিছানার সঙ্গে সেটা স্থানান্তরিত হল না।

এই ক্লান্তিকর অবস্থায় ম্যারিয়ট খুব সহজে আত্মসংযমী হয়ে উঠতে পারছিল

না। সে তন্ন তন্ন করে সমস্ত ঘর খুঁজে দেখল। কোথাও কারও চিহ্ন নেই। ঘরের ওপর দিকে ছোট জানালাটা বন্ধ। অবশ্য সেটা খোলা থাকলেও একটা বেড়াল যাবার মত চওড়া নয়। বসার ঘরের দরজাটা ভেতর দিক থেকে বন্ধ। সেপথ দিয়ে সে বেরিয়ে যেতে পারে না। অদ্ভুত সব চিন্তা ম্যারিয়টের মনকে অস্থির করে তুলল, সেই সঙ্গে অবাঞ্ছিত অনুভূতি তার মনে জেগে উঠল। সে ক্রমশঃ উত্তেজিত হয়ে উঠতে লাগল। আবার সে বিছানা উল্টেপাল্টে দেখল। দুটো ঘর খুঁজল—এটা যে নিষ্ফল তা সে গোড়া থেকেই জানত,—তবু আবার সে দেখল। তার সারা দেহে ঠাণ্ডা ঘাম ঝরছে। ঘরের কোণে ফিল্ড যেখানে শুয়েছিল সেখান থেকে নিঃশ্বাসের শব্দ আসা কিন্তু বন্ধ হল না।

তখন সে অন্য কিছু করার চেষ্টা করল। খাটটা যেখানে ছিল সেখানে সরিয়ে রেখে সেই বিছানার ওপর সে শুয়ে পড়ল। শোবার সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল। নিঃশ্বাসটা একেবারে তার গালের ওপর পড়ছে—দেয়াল এবং তার মাঝে! সেই ফাঁক দিয়ে একটা বাচ্চা গলে যাওয়ারও জায়গা নেই।

সে তার বসার ঘরে ফিরে গিয়ে সব জানালা খুলে দিল। ঘরে আলো হাওয়া খেলতে লাগল। আগাগোড়া সমস্ত ব্যাপারটা ধীরে সুস্থে চিন্তা করার চেষ্টা করল। সে জানত যারা খুব বেশী পড়াশুনা করে অথচ কম ঘুমোয় তাদের মনে নানা অলীক, অবাস্তব চিন্তা জেগে উঠে যন্ত্রণা দেয়। আবার সে শান্তচিত্তে রাতের সব ঘটনাগুলো ভাবতে লাগল—তার মনের অনুভূতি, প্রাণবন্ত ঘটনা, তার মনকে আলোড়িত করা ভাবাবেগ, ভয়ঙ্কর ভোজন পর্ব—এত সব একসঙ্গে মিলে, এত সময় ধরে কোন ভৌতিক কাণ্ড ঘটতে পারে না। বারবার তার মূর্চ্ছা প্রবণতা, একবার কি দুবার তার মনে অদ্ভুত ভীতির সঞ্চার, তারপর তার হাতের ভীষণ যন্ত্রণা—এসব কিছুই চিন্তা করে কোন কূল পেল না, কোন কারণও খুঁজে পেল না।

এসব খতিয়ে দেখে পরীক্ষা করতে করতে একটা বিস্ময়কর ব্যাপার হঠাৎ তার মনে উদয় হল। সারাক্ষণ ধরে ফিল্ড মুখ দিয়ে একটাও ত শব্দ বার করেনি! তার ভাবনা চিন্তাকে ঠাট্টা করবার জন্যে তখনও ভেতরের ঘর থেকে দীর্ঘ গভীর ও স্বাভাবিক নিঃশ্বাসের শব্দ আসছে! একটা অবিশ্বাস্য, অযৌক্তিক ব্যাপার!

ভুতুড়ে চিন্তার জালে জড়িয়ে পাগলের মত মাথায় টুপী ও গায়ে বর্ষাতি চাপিয়ে বাড়ি থেকে সে বেরিয়ে পড়ল। সকালে বিশুদ্ধ বাতাস, অকূল সমুদ্রের দৃশ্য, ছোট ছোট গাছ-গাছালির বুনো গন্ধ তার মাথার সমস্ত জট ছাড়িয়ে দেবে। বেশ কিছুক্ষণ ভিজে স্যাঁতসেঁতে মাটির ওপর ঘুরে বেড়িয়ে যখন বুঝতে পারল তার মন থেকে ভয় দূর হয়েছে, খিদেও চনচনে হয়েছে, তখন সে বাড়ি ফিরে এল।

ঘরে ঢুকতেই দেখতে পেল একজন লোক জানালায় ঠেসান দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তাকে দেখে প্রথমে চমকে উঠেছিল কিন্তু পরে চিনতে পারল। সে হচ্ছে গ্রীণ, তার বন্ধু—তার সঙ্গে পরীক্ষা দেবার জন্যে তৈরি হচ্ছে।

সারারাত খুব পড়েছ, ম্যারিয়ট। সে বলল। ভাবলাম তোমার সঙ্গে নোটগুলো মিলিয়ে নিই আর ব্রেকফাষ্টটাও শেষ করি। তাই তোমার কাছে এলাম। তুমি এত সকালে বাইরে গেছলে?

ম্যারিয়ট জানাল তার মাথাটা ধরেছিল বলে সে একটু বেড়াতে বেরিয়েছিল।

ও! গ্রীণের কণ্ঠে বিস্ময় জেগে উঠল। এই সময় একজন পরিচারিকা ঘরে ঢুকে গরম পরিজ টেবিলে রেখে বেরিয়ে গেল। তারপর বেশ জোরের সঙ্গে গ্রীণ বলল, ম্যারিয়ট, তোমার মদ্যপানাসক্ত বন্ধু আছে বলে জানতাম না ত?

এটা স্পষ্টতই সাময়িক তাই নীরসভাবে জানাল সে নিজেও তা জানে না।

মনে হচ্ছে বিছানায় কেউ আরামে ঘুমিয়ে গেছে না? মাথা নেড়ে শোবার ঘরটা দেখিয়ে কৌতূহলী হয়ে ম্যারিয়টের দিকে তাকিয়ে রইল।

দুজনে কয়েক সেকেণ্ড পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকার পর সাগ্রহে ম্যারিয়ট বলল, তাহলে তুমিও শুনেছ? ভগবানকে ধন্যবাদ!

নিশ্চয়ই আমি শুনেছি। দরজা খোলা রয়েছে। আমি যদি তাই বোঝাতে চাই তার জন্যে দুঃখিত।

না, না, আমি কিছু মনে করি নি। ম্যারিয়ট নিচু স্বরে বলল। আমি একেবারে আতঙ্কমুক্ত। আমাকে ব্যাপারটা বলতে দাও। অবশ্যি যদি তুমি শুনে থাক তবে ঠিক আছে। কিন্তু আমি যা বলতে পারি তার থেকে বেশী আমাকে ভীত করে তুলেছিল। আমি ভেবেছিলাম আমার মাথার কোন গোলমাল হয়েছে। তুমি জান এই পরীক্ষার ওপর আমার অনেক কিছু নির্ভর করছে। এটা সব সময় শুরু হয় কোন শব্দ, দৃশ্য অথবা অলৌকিক চিন্তার মধ্যে দিয়ে এবং আমি--।

বাজে যত সব! তার কথার মাঝে হঠাৎ গ্রীণ বলল। তুমি কিসের কথা বলছ?

আমার কথা শোন গ্রীণ, যতটা সম্ভব শান্তভাবে ম্যারিয়ট বলল। তখনও সেই নিঃশ্বাসের শব্দ শোনা যাচ্ছে। আমি যা বলতে চাই তোমাকে বলব কিন্তু কোন বাধা দিও না। তারপর রাতে যা ঘটেছিল সব বলল, এমন কি হাতের ব্যথার কথাও বলতে ভুলল না। বলা শেষ হলে টেবিল থেকে উঠে সে ঘরের ওপাশে গেল। বলল, এখন তুমি পরিষ্কারভাবে নিঃশ্বাসের শব্দ শুনতে পাচ্ছ, তাই না? গ্রীণ সম্মতি জানাল। বেশ, এস আমার সঙ্গে, আমরা দুজনে ঘরটা ভাল করে খুঁজে দেখব। অন্যজন কিন্তু তার

চেয়ার থেকে নড়ল না।

আমি আগেই ওখানে গেছি, নিষ্ক্রিয়ভাবে উত্তর দিল গ্রীণ। আমি শব্দ শুনে ভেবেছিলাম যে তুমি। দরজা হাট করে খোলা ছিল তাই ভেতরে ঢুকেছিলাম।

ম্যারিয়ট কোন মন্তব্য না করে দরজাটা ঠেলে একেবারে খুলে দিল। দরজাটা খুলতেই নিঃশ্বাসের শব্দটা আরো জোর এবং পরিষ্কারভাবে হতে লাগল। কেউ নিশ্চয়ই ওখানে আছে। চাপা স্বরে গ্রীণ বলল।

কেউ ওখানে আছে, কিন্তু কোথায়? ম্যারিয়ট বিস্মিত হয়ে বলল। আবার তার বন্ধুকে তার সঙ্গে ঘরে ঢোকবার জন্যে জেদ করতে লাগল। কিন্তু গ্রীণ সোজাসুজি তা প্রত্যাখ্যান করল। বলল, সে একবার ঘরে ঢুকে চারদিক খুঁজেছে, কোথাও কিছু দেখতে পায়নি। সে আর ভেতরে যাবে না।

তারা দরজা বন্ধ করে দিয়ে বসার ঘরে ফিরে এল। নানাদিক দিয়ে তারা এব্যাপারে আলোচনা করতে লাগল। গ্রীণ তার বন্ধুর খুব কাছে বসে প্রশ্ন করে যেতে লাগল। কিন্তু কোন আশাব্যঞ্জক ফল পাওয়া গেল না। কারণ সত্য ঘটনা কখনও প্রশ্নে বদলানো যায় না।

একমাত্র ব্যাপার যার সঠিক এবং যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা হওয়া তা হচ্ছে আমার হাতের ব্যথাটা। এই বলে ম্যারিয়ট তার আহত হাতটা বুলোতে বুলোতে মুখে মৃদু হাসি ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করল। এটা সর্বক্ষণ আমায় নারকীয় যন্ত্রণা ও ব্যথা দিয়ে চলেছে। কখন যে ধাক্কা লেগেছিল কিছুই মনে করতে পারছি না।

দেখি, তোমার হাতটা একটু পরীক্ষা করতে দাও তো। হাড়ের ওপর আমার জ্ঞান বেশ আছে, যদিও আমার পরীক্ষকগণ তা মানতে চান না। একটু মসকরা করলে মনের বোঝা হাল্কা হয়ে যায়—তাই ম্যারিয়ট কোটটা খুলে জামার হাতাটা গুটিয়ে ফেলল।

হা ভগবান! রক্ত বেরোচ্ছে! সে চীৎকার করে উঠল। দেখ, দেখ! এটা কি?

হাতের কব্জির কাছাকাছি একটা সরু লাল দাগ। এর ওপরে টাটকা রক্তের ফোঁটা। গ্রীণ কাছে এগিয়ে এসে ঝুঁকে পড়ে বেশ খানিকক্ষণ সেটা দেখল। তারপর চেয়ারে বসে পড়ে কৌতূহলী দৃষ্টি দিয়ে বন্ধুর মুখ দেখতে লাগল।

সঙ্গে সঙ্গে সে বলল, তোমার অজান্তে তুমি নখের আঁচড় কেটেছ!

কোন চিহ্ন নেই তো। এ নিশ্চয়ই অন্য কিছু যা আমার হাত বেদনাময় করে তুলেছে।

ম্যারিয়ট নিশ্চল হয়ে বসে একদৃষ্টে হাতের দিকে তাকিয়ে আছে। মনে হচ্ছে যেন সবকিছু রহস্যের সমাধান প্রকৃতই হাতের চামড়ার ওপর লেখা

আছে।

কি ব্যাপার? একটা আঁচড়ে অদ্ভুত কিছু আমি দেখছি না। প্রত্যয়হীন স্বরে গ্রীণ বলল। এটা হয়ত তোমার জামার আস্তিনের বোতামের দাগ। গতরাতে তোমার উত্তেজনাবশত—।

কিন্তু ম্যারিয়টের ঠোঁট দুটো ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। সে কথা বলার চেষ্টা করল। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে উঠেছে। অবশেষে সে তার বন্ধুর মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ল।

মৃদু কম্পিত অনুচ্চ কণ্ঠে সে বলল, দেখ। ঐ লাল দাগটা দেখছ? আমি বলতে চাইছি নীচের দিকে যাকে তুমি আঁচড বলছ?

গ্রীণ স্বীকার করল কিছু যেন দেখেছে। ম্যারিয়ট রুমাল দিয়ে সেটা মুছে ফেলে আবার তাকে ভাল করে লক্ষ্য করতে বলল।

হ্যাঁ, দেখতে পাচ্ছি। মনে হচ্ছে একটা পুরনো ঘায়ের দাগ। একটু মনোযোগ দিয়ে পরীক্ষা করে সে বলল।

এটা একটা পুরনো ঘা। ফিসফিস করে ম্যারিয়ট বলল। ঠোঁট দুটো তার কাঁপছে। এখন সব কিছু মনে পড়ছে।

সব কিছু কি? চেয়ারে বসে অস্থির হয়ে গ্রীণ জিজ্ঞেস করল।

চুপ! আস্তে! আমি তোমাকে বলব। এই ক্ষত ফিল্ডেরই কীর্তি!

বিস্মিত হয়ে তারা দুজনে দুজনের মুখের দিকে চেয়ে বসে রইল। কারোর মুখে কোন শব্দ নেই।

ঐ ক্ষত ফিল্ড করেছিল! অবশেষে ম্যারিয়ট একটু উঁচু গলায় পুনরাবৃত্তি করল।

ফিল্ড! তুমি বলছ—কাল রাতে?

না, কাল রাতে নয়—অনেক বছর আগে—একটা ছুরি দিয়ে স্কুলে। এবং আমিও তার হাতে ক্ষত করেছিলাম। ম্যারিয়ট এখন তাডাতাড়ি কথা বলছে। আমরা পরস্পরের ক্ষত দিয়ে রক্ত বদল করেছিলাম। সে একফোঁটা আমার হাতে ফেলেছিল আমিও একফোঁটা তার—।

হায় ভগবান, কিসের জন্যে?

এটা একটা নিবিড বন্ধুত্বের বন্ধন। আমরা একটা পবিত্র অঙ্গিকার করেছিলাম, একটা চুক্তি। আমার এখন সব নিখুঁতভাবে মনে পড়ছে। আমরা ভুতুড়ে বই পড়তাম এবং শপথ নিয়েছিলাম যে আগে মরবে সে অন্যকে দেখা দেবে। এবং এই নিবিড় বন্ধুত্ব আমরা রক্ত দিয়ে অঙ্গিকারবদ্ধ হয়েছিলাম। আমার স্পষ্ট মনে পড়ছে—আজ থেকে সাত বছর আগে, এক ভীষণ গরমের দুপুরবেলায় খেলার মাঠে—এবং একজন শিক্ষক আমাদের ধরে ফেলেন আর ছুরি দুটো কেড়ে নেন—এবং আজ পর্যন্ত আমার আগে এব্যাপার মনে আসেনি—।

তাহলে তুমি বলতে চাও—। গ্রীণ তোতলাতে লাগল।

কিন্তু ম্যারিয়ট কোন উত্তর দিল না। সে চেয়ার ছেড়ে উঠে সোফার ওপর ক্লান্ত হয়ে শুয়ে পড়ল। মুখটা দুহাতে ঢেকে রইল।

গ্রীণ নিজেও একটু হতবাক হয়ে পড়ল। সে একা একা সমস্ত ব্যাপারটা আবার চিন্তা করতে লাগল। একটা ধারণা তার মাথায় এল। সে ম্যারিয়টের কাছে গিয়ে তাকে শোফা থেকে তুলল। যাহোক, কোন বিষয়ের যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা থাক বা না থাক, তার মুখোমুখি হওয়া ভাল। নীরবে মেনে নেওয়া মানে বোকার মত প্রস্থান করা।

আমি বলি কি ম্যারিয়ট, এব্যাপারে এত ঘাবড়ে যাওয়া ভাল নয়। তার মানে এটা যদি অলীক কিছু হয় আমরা জানি কি করতে হয়। আর এটা যদি না হয়, তবে আমরা কি ভাবব তা জানি, তাই না?

ফ্যাকাসে মুখে তার দিকে তাকিয়ে ম্যারিয়ট বলল, আমার মনে হয় তাই। কিন্তু অন্য কারণে এ আমাকে ভীষণ আতঙ্কগ্রস্ত করে তুলেছে। এবং ঐ বেচারা আত্মা—

সে যাহোক, যদি সব থেকে মন্দটাই সত্যি হয় আর—আর ঐ লোকটা তার প্রতিজ্ঞা রেখেছে—ব্যস্, সে তার কথা রেখেছে, ব্যাপার মিটে গেল, তাই না?

ম্যারিয়ট মাথা নেড়ে সায় দিল।

একটা জিনিস আমি বুঝতে পারছি না, গ্রীণ বলতে লাগল, আর তা হচ্ছে, তুমি কি নিশ্চিত যে সত্যিই সে ওভাবে খেয়েছিল—তার মানে প্রকৃতই সে কিছু খেয়েছিল?

ম্যারিয়ট কিছুক্ষণ একদৃষ্টে তাকে দেখে জানাল যে সেবিষয়ে তার কোন সন্দেহ নেই। সে শান্তভাবে কথা বলছিল। বড় আঘাত পাবার পর ছোটখাট কোন আশ্চর্য ব্যাপার মনকে প্রভাবিত করতে পারে না।

সে জানাল, আমাদের খাওয়া শেষ হলে নিজের হাতে সেগুলো সরিয়ে রেখেছি। ঐ আলমারীর তৃতীয় তাকে পাত্রগুলো আছে। ওগুলো সেই থেকে কেউ ছোঁয়নি।

চেয়ারে বসেই ম্যারিয়ট দেখাল। গ্রীণ উঠে গিয়ে সেগুলো পরীক্ষা করে দেখল।

ঠিক যা ভেবেছি তাই। যেকোন অবস্থাতেই হোক না কেন, এটা কিছুটা মনের কল্পনা। খাবারগুলো একেবারেই ছোঁয়া হয়নি। এদিকে এস, নিজের চোখে দেখ।

তারা দুজনে তাকটা পরীক্ষা করে দেখল। বাদামী রঙের পাউরুটি পড়ে আছে, থালায় বাসি কেক, পাত্রে কমলা লেবুর আচার—যেমন রাখা হয়েছিল তেমনি আছে, একদম হাত দেয়নি। এমন কি ম্যারিয়টের ঢালা গেলাস ভর্তি

মদও এতটুকু কমেনি।

তুমি কাউকে খাওয়াও নি, গ্রীণ বলল। ফিল্ড কোন খাদ্যও খায়নি, কিছু পানও করেনি। সে সেখানে মোটেই ছিল না।

কিন্তু নিঃশ্বাস? চাপা গলায় সে জানতে চাইল। হতবুদ্ধির ভাব তার সারা মুখে।

গ্রীণ কোন উত্তর দিল না। সে শোবার ঘরের দিকে এগিয়ে গেল। ম্যারিয়টের দৃষ্টি তাকে অনুসরণ করল। সে দরজা খুলে কান পেতে কিছু শুনল। কথা বলার দরকার হল না। গভীর নিরবিচ্ছিন্ন নিঃশ্বাসের শব্দ বাতাসে ভেসে আসতে লাগল। সেটা কোন অলীক কল্পনা নয়। অন্য ঘরে ম্যারিয়ট যেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে সেখানেও সে শুনতে পাচ্ছে।

গ্রীণ দরজা বন্ধ করে ফিরে এল। সে এই বলে ব্যাপারটার নিষ্পত্তি করল, একটা কাজই করবার আছে। বাড়িতে চিঠি লিখে তার সম্বন্ধে জান। ইত্যবসরে আমার ঘর থেকে তোমার পড়া শেষ কর। আমার আলাদা বিছানা আছে, তোমার কোন অসুবিধে হবে না।

বেশ, রাজী আছি; ঐ পরীক্ষার ব্যাপারে কোন অবাস্তবতা নেই; যা কিছু ঘটুক আমাকে পাশ করতেই হবে।

এর এক সপ্তাহ পরে ম্যারিয়ট তার বোনের কাছ থেকে চিঠির উত্তর পেয়েছিল। চিঠির কিছু অংশ সে গ্রীণকে পড়িয়ে শুনিয়েছিল, তার বোন লিখেছিল:

এটা অদ্ভুত লাগছে তুমি ফিল্ডের সম্বন্ধে জানতে চেয়েছ। সে এক ভীষণ ব্যাপার। কিছুদিন আগে স্যার জনের সব ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেছল। তিনি তাকে কপর্দকশূন্য অবস্থায় বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেন। তুমি কি ভাবছ? সে আত্মহত্যা করে। অন্তত তাকে দেখে মনে হয়। সে বাড়ি থেকে না গিয়ে ভূগর্ভস্থ ঘরে আশ্রয় নিল। ধীরে ধীরে অনাহারে প্রাণত্যাগ করে।......তারা এটা চাপা দেবার চেষ্টা করছে। আমাদের বাড়ির পরিচারিকার কাছে একথা শুনেছি, সে আবার তাদের চাপরাসীর মুখ থেকে শুনেছে। তারা ১৪ তারিখে মৃতদেহ দেখতে পায়। ডাক্তার তাকে পরীক্ষা করে বলছে বার ঘণ্টা আগে তার মৃত্যু ঘটেছে। তাকে ভয়ঙ্কর রোগা দেখাচ্ছিল।

তাহলে সে ১৩ তারিখে মরেছে, গ্রীণ বলল।

ম্যারিয়ট মাথা নাড়ল।

ঠিক ঐ রাতে সে তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল:

ম্যারিয়ট আবার মাথা নেড়ে সায় দিল।

Keep in his Promise—*Algernon Blackwood*

প্রেত-লাভ

যে পরিবেশের মধ্যে ক্লেটন গল্পটা বলেছিল আমার মনে সেটা জীবন্ত হয়ে ফিরে আসছে। আগুনের পাশে হেলানওয়ালা লম্বা বেঞ্চের ওপর অনেকক্ষণ ধরে বসে ধূমপান করছে। সেখানে আছে ইভানস, একজন কুশলী নায়ক আর আছে উইশ, অতি বিনয়ী লোক। আমরা সকলে সেই শনিবারের সকালে মারডেম ক্লাবে এসে হাজির হয়েছি কেবল ক্লেটন ছাড়া। সে আগেরদিন রাতে ওখানেই ঘুমিয়েছিল—সেটাই তাকে গল্প বলার মুখ ধরিয়ে দিয়েছিল। আমরা অনেকক্ষণ ধরে গলফ খেললাম, খাবার খেলাম, তারপরে গল্প শোনার যন্ত্রণার হাত থেকে রেহাই পাবার মত আমাদের মনেব স্বাভাবিক অবস্থা ছিল। যখন ক্লেটন একটা গল্প বলতে শুরু করল আমরা ধরে নিলাম সে মিথ্যা বলছে। হয়ত সে মিথ্যা বলে থাকতে পারে, সেটা আমার মত পাঠকেরাও খুব তাড়াতাড়ি বিচার করতে সক্ষম হবেন। এটা সত্যি, সে খুব সাদাসিধেভাবে গল্পটা আরম্ভ করেছিল। কিন্তু আমরা ভেবেছিলাম সেটা ওর চালাকি করে তৈরি করা।

আমি বলছি! তোমরা জান কাল রাতে আমি এখানে একা ছিলাম।

বাড়ির চাকর ছাড়া, উইলস বলল।

যারা বাড়ির শেষপ্রান্তে শোয়, ক্লেটন জবাব দিল। যা হোক—, বলতে গিয়ে থেমে গেল সে। কিছুক্ষণ সিগারে টান দিল। তখনও নিজের ওপর বিশ্বাসে তার সন্দেহ ছিল। তারপর বলল, বেশ শান্তভাবেই বলল, আমি একটা ভূত ধরেছিলাম।

ভূত ধরেছিলে, তুমি? কোথায় সে? স্যাণ্ডারসন জানতে চাইল।

উইশ ক্লেটনের খুব প্রশংসা করে এবং চার সপ্তাহ আমেরিকায় ছিল, সেও চীৎকার করে উঠল, তুমি ভূত ধরেছিলে, ক্লেটন? আমি শুনে সুখী হলাম। এখুনি আমাদের এ সম্বন্ধে সব বল।

ক্লেটন জানাল সে এক মিনিটের মধ্যে সব জানাবে এবং তাকে দরজাটা বন্ধ করে দিতে বলল।

সমর্থন পাবার উদ্দেশ্যে সে আমার দিকে তাকাল। বলল, যদিও কেউ আড়ি পেতে নেই, তবু এখানে ভূতের গুজব শুনে আমাদের সুন্দর পরিবেশনের বাধা দিতে চাই না। এ নিয়ে মজা করার মত অনেক ছায়া ও ওক কাঠে দেয়াল নক্সা করা আছে। আর জান, এটা নিয়মিত ভূত নয়। আমার মনে হয় না আবার কখনও আসবে।

তুমি বলতে চাও তুমি ওটা রাখনি? স্যাণ্ডারসন বলল।

আমার সে অবস্থা ছিল না।

স্যাণ্ডারসন জানাল সে আশ্চর্যান্বিত হয়েছে।

আমরা হেসে উঠলাম এবং ক্লেটনকে দুঃখিত মনে হল।

একটুকরো হাসিমুখে সে বলল, আমি জানি, আসল কথা এটা সত্যিই একটা ভূত। আমি যেমন তোমাদের সঙ্গে কথা বলছি সেরকমই আমি নিশ্চিত। আমি ঠাট্টা করছি না। আমি যা বলছি ঠিক তাই।

স্যাণ্ডারসন একটা লাল চোখ তার ওপর রেখে খুব জোরে পাইপে টান দিল তারপর আস্তে আস্তে এমনভাবে ধোঁয়া ছাড়ল যেন তাতে অনেক কথা বোঝাল।

ক্লেটন মন্তব্যটা গ্রাহ্য করল না। বলল, এমন অদ্ভুত ঘটনা আমার জীবনে কখনও ঘটেনি। তোমরা জান আগে কখনও ভূত বা সেই ধরনের কিছুর ওপর আমার বিশ্বাস ছিল না। তারপর বুঝলে, আমার যে অভিজ্ঞতা হল তাতে আমার সব ওলটপালট হয়ে গেল।

আর একটা সিগার বার করে অনেকক্ষণ ধরে সে চিন্তা করতে লাগল।

তুমি কথা বলেছিলে? উইশ জানতে চাইল।

এক ঘণ্টার মত সুযোগ হয়েছিল।

গল্প সল্প? নাস্তিকদের সঙ্গে যোগ দিয়ে আমি বললাম।

বেচারা আত্মা কষ্টে পড়েছে।

ফুঁপিয়ে কাঁদছিল? কে যেন বলল।

ক্লেটন বাস্তব স্মৃতি চিন্তা করে দীর্ঘশ্বাস ফেলল। হা ভগবান! হ্যাঁ। বেচারা!

কোথায় তুমি আঘাত করেছিলে? আমেরিকান ঢঙে উইশ জিজ্ঞেস করল।

তাকে অগ্রাহ্য করে ক্লেটন বলল, আমি বুঝতে পারিনি, একজন ভূত দুর্ভাগা হতে পারে। আবার সে আমাদের কিছুক্ষণ উত্তেজিত করে তুলল। নিজে পকেট থেকে দেশলাই বার করে সিগার ধরিয়ে দেহ গরম করতে লাগল।

আমি একটা সুযোগ নিয়েছিলাম, গভীরভাবে বিবেচনা করে অবশেষে বলল।

আমাদের মধ্যে কারোরই তাড়া ছিল না।

সে বলল, একটা চরিত্র দেহত্যাগ করলেও ঠিক একই চরিত্র থাকে। সে ব্যাপারটা আমরা প্রায়ই ভুলে যাই। লোকেদের কোন নির্দিষ্ট ক্ষমতা অথবা বিশেষ উদ্দেশ্য থাকলে ভূত হয়েও তাদের সেই অবস্থায় দেখা যায়। তোমরা জান, প্রায় সব ভূতেরাই এক উদ্দেশ্যে উন্মত্ততাগ্রস্ত এবং অশ্বতরের মত একগুঁয়ে হয়ে বারবার আবির্ভূত হয়। এই বেচারা প্রাণীর কিন্তু তা কিছুই ছিল না। হঠাৎ সন্দিগ্ধ হয়ে সে ওপর দিকে এবং ঘরের চারদিকে চোখ বোলাল। পরোপকারিতার দিক দিয়ে বলছি, ব্যাপারটা নির্ভেজাল সত্যি। প্রথম দর্শনেই

তাকে দুর্বল বলে মনে হয়েছিল।

তার সিগারের সাহায্যে জোর দিয়ে সে কথাগুলো বলছিল।

লম্বা প্যাসেজে আমি তার সামনে পড়ি। তার পেছন দিকটা আমার সামনে ছিল। আমিই তাকে প্রথম দেখি। সঙ্গে সঙ্গেই তাকে আমি ভূত মনে করি। সে স্বচ্ছ এবং সাদাটে রঙের; তার বুকের ভেতর দিয়ে আমি শেষ প্রান্তের জানালার আলো দেখতে পাই। কেবল তাঁর দেহ নয়, তার হাবভাবেও তাকে দুর্বল মনে হয়। সে দেখছিল, বুঝলে, সে কি করতে চায় তার কিছুই সে জানে না মনে হল। একটা হাত তার জানালার গরাদে আর একটা হাত তার মুখে কাঁপছে। ঠিক এইরকম!

কেমন চেহারা? স্যাণ্ডারসন বলল।

রোগা! জান, সেই যুবকের ঘাড় থেকে দুটো বড় বাঁশির মত হাড় নিচের দিকে নেমে গেছে—ঠিক এখানে আর এখানে! ছোট ক্ষুদে মাথায় বুরুশ করা চুল, কান দুটো বিশ্রী, কাঁধ দুটোও বেমানান, কোমরের থেকে সরু; জামার কলার নামান, রেডিমেড ছোট জ্যাকেট, ট্রাউজার থলের মত ঢলঢলে, তলার দিকটা ছেঁড়া। আমি খুব সন্তর্পণে সিঁড়িতে উঠলাম। আমি আলো নিই নি। বাতিগুলো নিচের টেবিলের ওপর, সেখানেই লম্ফটা রয়েছে—এবং আমি পাড় লাগান চটি পরেছিলাম। আমি উঠতে উঠতে তাকে দেখলাম। তাকে এগিয়ে আসতে দেখে আমি মরার মত দাঁড়িয়েই রইলাম। আমি একটুও ভীত হইনি। আমি ভাবলাম এসব ক্ষেত্রে বেশীর-ভাগ সময় কারও ভয় পাওয়া বা উত্তেজিত হওয়া কখনও ঠিক নয় যা একজন সচরাচর মনে করে কেউ হয়ে থাকে। আমি একই সঙ্গে বিস্মিত ও উৎসুক হয়ে উঠলাম। আমার চিন্তা হল—ওঃ ভগবান, শেষকালে এখানে একটা ভূত! আর গত পঁচিশ বছর ধরে একমুহূর্তের জন্যে ভূতের ওপর বিশ্বাস করি নি।

হুম—। উইশ শুধু মুখে আওয়াজ করল।

আমাকে সে দেখার আগে আমি ভাবিনি যে আমি সিঁড়ির অবতরণস্থলে নেই। তখন আমি দেখলাম একজন অপরিণত যুবকের মুখ, নিস্তেজ নাক, ছোট গোঁফ আর তোবড়ান গাল। কিছুক্ষণের জন্যে আমরা দাঁড়িয়ে রইলাম—সে কাঁধের পাশ দিয়ে উঁকি মেরে আমাকে দেখছে—দুজনেই দুজনকে নিরীক্ষণ করছি। তারপরেই ঘুরে দাঁড়িয়ে সে সোজাসুজি আমার মুখের দিকে চেয়ে দুহাত তুলে ভূতের মত হাত ছড়িয়ে আমার দিকে এগিয়ে এল। গাল দুটো তার তুবড়ে গেল, মুখ দিয়ে অদ্ভুত বু-উ-উ শব্দ বেরিয়ে এল। না এটা একটুও ভীতিজনক নয়। আমি পেট ভরে খেয়েছি, শ্যাম্পেনও গিলেছি, বেশ শক্ত হয়ে রয়েছি, কিছুতেই ভয় নেই। বু-উ, বাজে যত সব। তুমি এখানকার লোক নও। এখানে কি করছ? আমি তাকে উত্তেজ

করে কথাগুলো বললাম।

আমি তাকে বেদনায় কুঁচকে যেতে দেখলাম

বু-উ-উ। সে শুধু মুখে আওয়াজ করল।



চুলোয় যাক বু-উ-উ। তুমি কি এখানকার সভ্য? তাকে যেন আমি গ্রাহ্যই করিনি এইরকম ভাব দেখিয়ে তার একপাশে গিয়ে বাতিটা জ্বালালাম।

তুমি কি সভ্য? মুখ ফিরিয়ে আবার জিজ্ঞেস করলাম।

আমার সামনে থেকে সরে দাঁড়াল। তাকে একটু মনমরা লাগল। না, আমি সভ্য নই। আমি প্রেতাত্মা।

তবে কি এখানে কারোর সঙ্গে দেখা করতে এসেছ বা ঐ ধরনের কিছু? যাতে সে আমার মদের নেশা বুঝতে না পারে সেইজন্যে যতটা সম্ভব অবিচলিত-ভাবে বাতিটা জ্বালালাম। তারপর আলোটা তার দিকে তুলে ধরে জিজ্ঞেস করলাম, তবে এখানে কি করছ?

হাত দুটো নামিয়ে নিয়ে মুখের শব্দ বন্ধ করল। এক দুর্বল, বোকা, উদ্দেশ্যহীন যুবকের প্রেতাত্মা সপ্রতিভ ও হতবুদ্ধি হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। আস্তে আস্তে সে বলল, আমি আতঙ্কগ্রস্ত।

তোমায় কোন প্রয়োজন নেই। শান্ত কণ্ঠে আমি বললাম।

আমি একজন ভূত। যেন নিজের পক্ষ সমর্থনের জন্যেই সে উত্তর দিল।

তা হতে পারে, কিন্তু তোমার এখানে আসার কোন দরকার নেই। এটা একটা সম্মানজনক ব্যক্তিগত ক্লাব। লোকেরা প্রায়ই তাদের ছেলেমেয়ে ও তাদের নার্সদের নিয়ে এখানে আসে এবং তোমার মত এদিক সেদিক ঘুরে বেড়ায়। একবারও ছেলেমেয়েরা তোমার সামনে পড়ে ভয় পেতে পারে। আমার মনে হয় তুমি সেটা চিন্তা কর নি?

না, স্যার। তা আমি করি নি।

তোমার করা উচিত ছিল। এই জায়গায় তোমার কোন অধিকার নেই, আছে কি?

কিছুই না স্যার। কিন্তু আমি ভেবেছিলাম এটা একটা পুরনো ও ওক কাঠের প্যানেল করা—।

ওটা কোন ওজর নয়, দৃঢ়কণ্ঠে বললাম। তোমার এখানে আসাটাই ভুল। পকেটে দেশলাই আছে কিনা দেখার ভান করে পরক্ষণেই তার দিকে সোজাসুজি দাঁড়িয়ে বললাম, তোমার জায়গায় যদি আমি হতাম তবে ভোর হওয়ার জন্যে অপেক্ষা করতাম না। এইমুহূর্তে উধাও হয়ে যেতাম।

সে হতচকিত হয়ে গেল। ব্যাপারটা হচ্ছে স্যার—।

সে বলতে আরম্ভ করেছিল কিন্তু তাকে থামিয়ে বললাম, আমি উধাও হতাম।

ব্যাপারটা হচ্ছে স্যার, যে—কিছুর জন্যে—আমি পারছি না।

তুমি পারছ না?

না, স্যার। কিছু একটা আমি ভুলে গেছি। গত মাঝরাত থেকেই আমি এখানে ঘুরঘুর করছি, খালি ঘরের আলমারীর পেছনে লুকিয়ে, এদিক ওদিকে গিয়ে এইভাবে। আমি বিক্ষুব্ধ। আমি আগে কখনও এখানে আসিনি, আমাকে অসুবিধেয় ফেলেছে।

অসুবিধেয় ফেলেছে?

ঠিক তাই স্যার। এটা আমি বারবার করবার চেষ্টা করেছি কিন্তু সফল হইনি। একটা ছোট জিনিস আমার হাতছাড়া হয়ে গেছে সেটা আর ফেরত নিতে পারছি না।

তোমরা জান সেটা আমাকে পর্যুদস্ত করেছে। সে আমার দিকে এমন নিতান্ত হীনভাবে তাকাল যে তর্জন-গর্জন করে আমার কর্তৃত্ব জাহির করার আর অবস্থা রইল না।

অদ্ভুত ব্যাপার! আমার মনে হল নিচে যেন কারোর চলাফেরা করার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি। তাকে বললাম, আমার ঘরে এস, এ সম্বন্ধে আমাকে আরও বল।

আমি অবশ্য এব্যাপারে কিছুই বুঝিনি এবং তাকে হাত ধবে নিয়ে আসবার চেষ্টা করলাম। তোমরা সেটা মনে করতে পার একটা ধোঁয়ার কুণ্ডলী ধরার চেষ্টা করার মত। আমার ঘরের নম্বরটা ভুলে গেছি মনে হল। যাই হোক, আমি কতকগুলো ঘর পেরিয়ে গেছি মনে হল। ভাগ্যবশত সেই-দিকে আমিই একমাত্র জীবন্ত প্রাণী। শেষে আমার নিজস্ব লটবহর দেখতে পেলাম। এই যে এসে গেছি, এই বলে আমি একটা চেয়ারে বসলাম। এখানে বস, আমাকে সব বল।

সে বসল না। ঘরের মধ্যে নিঃশব্দে চলাফেরা করাই পছন্দ করল যদিও আমার কাছে সেটা একইরকম। কিছুক্ষণের মধ্যে আমরা দীর্ঘ ও গুরুত্বপূর্ণ কথার মধ্যে ডুবে গেলাম। সেইসময় আমার মুখ দিয়ে মদ ও সোডার ঢেকুর উঠছে। কি উগ্র রাম আর ভূতুড়ে ঝামেলায় পড়েছি তখন থেকেই বুঝতে শুরু করলাম। ঐ আধা স্বচ্ছ মায়াময় এক মূর্তি, ভূতুড়ে গলার স্বর ছাড়া আর কোন হৈ চৈ নেই। সুন্দর, পরিষ্কার ছিট কাপড় ঝোলানো পুরনো শোবার ঘরে সে এদিক ওদিক পায়চারী করছে। সহজেই তার শরীরের ভেতর দিয়ে আমার বাতিদানে আলোর ঔজ্জ্বল্য, প্রেতাত্মার ছাই চাপা দেবার ঢাকনার ওপরে পড়া আলো, এবং দেয়ালের কোণে কারুকায করা ছবির ফ্রেম চোখে পড়ছে। তার সবেমাত্র চরম দুর্দশাগ্রস্ত পার্থিব জীবন শেষ হওয়ার গল্প বলছে। তার মুখে সততার কোন ছাপ নেই কারণ দেহটা স্বচ্ছ কিন্তু সত্য সে এড়িয়ে যেতে পারল না।

এ্যাঁ? হঠাৎ চেয়ারে সোজা হয়ে বসে উইশ জিজ্ঞেস করল।

কি?

স্বচ্ছ—তবু সত্য এড়িয়ে যেতে পারল না—আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।

আমিও কিছু বুঝিনি, তবু তোমাকে নিশ্চিত বলতে পারি, এটা সত্যি। আমি বিশ্বাস করি না সে বাইবেলের সত্য থেকে একচুল নড়েছে। সে আমাকে বলল কিভাবে সে মরেছে—সে লণ্ডনের একটা বাড়ির নিচে বাতি নিয়ে গ্যাসের লিক দেখতে গেছল। নিজেকে লণ্ডনের এক প্রাইভেট স্কুলের

সিনিয়র ইংলিশ টীচার হিসেবে পরিচয় দেয়।

বেচারা হতভাগা। আমি বললাম।

ঠিক তাই আমি ভেবেছিলাম এবং যতই সে বলতে লাগল ততই আমার চিন্তা বাড়তে লাগল। এই সে দাঁড়িয়ে আছে—যে জীবনে এবং জীবনের পরেও লক্ষ্যহীন। সে তার বাবার, মায়ের, স্কুলমাষ্টারের এবং অতি সামান্য-ভাবেও যে তার জীবনের সঙ্গে জড়িত ছিল—তাদের সবার কথা বলল। সে খুব মর্মস্পর্শী ও ভীষণ ভীতু ছিল, কেউ তাকে ঠিকমত বিচার করতে অথবা বুঝতে পারেনি। আমার মনে হয় পার্থিব জীবনে তার কোন প্রকৃত বন্ধু ছিল না। তার জীবনে কোন সফলতা আসেনি। সে খেলাধূলো এড়িয়ে চলত এবং পরীক্ষাতেও কৃতকার্য হত না।

সে বললে, মোটামুটি প্রায় অন্য লোকের মত। পরীক্ষার ঘরে অথবা অন্য কোথাও গেলে মনে হত সবই বিফল।

বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে যাচ্ছিল সেই সময় গ্যাসে তার সব শেষ হয়ে যায়।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, এখন কোথায় তুমি?

সে ব্যাপারে খুব পরিষ্কার নয়। যে ধারণা সে দিল তা হচ্ছে অস্পষ্ট, মধ্যবর্তী অবস্থা, পাপ অথবা পুণ্যের ফলে অস্তিত্বহীন আত্মার বিশেষ সংরক্ষিত জায়গা। আমি তা জানি না। মৃত্যুর পরপারের জায়গা, দেশ সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা আমাকে দিতে সে অনিচ্ছুক। যেখানেই সে থাকুক না কেন, মনে হয় সে এক দয়ালু আত্মায় পরিণত হয়েছে। খাস লণ্ডন শহরের এক দুর্বল ভূত। তার আতঙ্কগ্রস্ত হওয়া সম্বন্ধে অনেক কিছু বলার আছে। হ্যাঁ—আতঙ্কগ্রস্ত। সেগুলো যেন ভূতুড়ে, ভয়ঙ্কর অ্যাডভেঞ্চার—সবসময় ভয়ে পিছিয়ে যেতে হয়। এইভাবে তৈরি হয়ে সে এসেছে।

কিন্তু সত্যি। উইশ আগুনের দিকে মুখ করে বলল। ক্লেটন নম্রভাবে বলল, এইরকম একটা ধারণা সে আমাকে দিয়েছিল। আমার হয়ত তখন কোন বাছ বিচার করার মত অবস্থা না থাকতে পারত তবে নিজের পূর্ব অবস্থা সম্বন্ধে এই ধরনের বিবৃতি দিয়েছিল। সরু গলার স্বরে কথা বলতে বলতে ঘরের মধ্যে সে পায়চারী করছিল—তার হতভাগ্য জীবনে—কিন্তু গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত পরিষ্কার ও সোজাসুজি কখনও নয়। সে বেঁচে থাকলে যেমন হত তার থেকেও বেশী রোগা, মূর্খ ও অপ্রাসঙ্গিক। জীবন্ত অবস্থায় সেভাবে সে আমার ঘরে থাকত না। আমি তাকে লাথি মেরে তাড়িয়ে দিতাম।

নিশ্চয়ই, এমন হতভাগ্য মানুষও আছে, ইভানস বলল।

হ্যাঁ, আমাদের মত তাদেরও ভূত দেখার সুযোগ আছে। আমি স্বীকার করলাম।

তার যে এইভাবে আসা, জানলে, সেটাও মনে হয় বাঁধাধরা সীমার মধ্যে মূর্খের মত এই ভূত হ... আমা... তাকে ভীষণভাবে হতাশ করেছে। তাকে

বলা হয়েছিল এটা একটা মজা করা। আর একটা মজা করার আশায় সে এসেছিল কিন্তু এটাও তার ব্যর্থতায় পর্যবসিত হল। নিজেকেই সে ডাহা মিথ্যে বলে ঘোষণা করছে। সে বলল এবং আমি সত্যিই বিশ্বাস করতে পারি যে সে জীবনে কখনও এমন কাজ করেনি যাতে সে তালগোল পাকিয়ে ফেলতে পারে আর পৃথিবী রসাতলে গেলেও সে করবে না। যদি সে কিছু সমবেদনা পেত, হয়ত—। কথা শেষ না করে আমার দিকে দেখতে লাগল। সে মন্তব্য করল, আমার কাছে হয়ত অদ্ভুত লাগতে পারে, (আমি যেমন সমবেদনা দেখাচ্ছি) তেমন কেউ এমনকি একজন আমার প্রতি সমবেদনা দেখায়নি। সে কি করতে চায় বুঝতে পেরে আমি সেইমুহূর্তে তাকে ছেড়ে চলে যাবার মনস্থ করলাম। আমি বোকা হতে পারি জানলে কিন্তু একমাত্র প্রকৃত বন্ধুর আখ্যা লাভ করে, সে ভূত বা দেহধারী হোক না কেন, আমার শারীরিক সত্ত্বের বাইরে। চটপট উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, এব্যাপারে বেশী চিন্তা করো না। যেটা তোমার করা দরকার তা হচ্ছে এখুনি এখান থেকে চলে যাও, এই মুহূর্তে। সমস্ত শক্তি দিয়ে চেষ্টা কর।

আমি পারব না, সে বলল।

চেষ্টা কর। আবার বললাম। এবং সে চেষ্টা করল।

চেষ্টা করল! কি করে? অবাক হয়ে স্যাণ্ডারসন জিজ্ঞেস করল।

মিলিয়ে গেল, ক্লেটন বলল।

মিলিয়ে গেল?

নানারকম অঙ্গভঙ্গী করে হাত তুলে মিলিয়ে গেল। যেভাবে সে এসেছিল সেইভাবেই সে আবার অদৃশ্য হল। ও ভগবান! কি ঝামেলায় না পড়েছি!

কিন্তু কোন ধারাবাহিক অদৃশ্যতা কি করে সম্ভব হতে পারে—আমি বলতে আরম্ভ করলাম।

ওহে আমার প্রিয়, আমার দিকে ফিরে কতকগুলো কথার ওপর বেশ জোর দিয়ে বলল, সব কিছু পরিষ্কার তুমি চাও। সেটা কি করে আমি জানি না। এটুকু জানি তুমি যেমন কর, সেও তাই করল। ভীতিপূর্ণ সময় কাটিয়ে হঠাৎ সে অদৃশ্য হল।

তুমি কি সেই যাওয়া লক্ষ্য করেছিলে? স্যাণ্ডারসন আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করল।

হ্যাঁ, বলে ক্লেটন কিছু ভাবতে লাগল। তারপর বলল, সেটা ভীষণ অদ্ভুত ব্যাপার। এই ছোট নিস্তব্ধ শহরের শুক্রবারের রাতে এই নিস্তব্ধ শূন্য ক্লাবে ঐ নিস্তব্ধ ঘরে ঐখানে আমরা, আমি ও সেই রোগা অস্পষ্ট ভূত। আমাদের গলার স্বর ও তার দেহ সঞ্চালনের সময় হাঁপানোর মৃদু শব্দ ছাড়া আর কোন আওয়াজ কোথাও নেই। মাত্র দুটো বাতি জ্বলছে—একটা ঘরে আর একটা ড্রেসিং টেবিলে। মাঝে মাঝে হাওয়ার অভাবে লম্বা, সরু এবং আশ্চর্যভাবে

বাতির শিখাগুলো জ্বলছে। আরো অদ্ভুত ব্যাপার ঘটল।

আমি পারব না। আমি কখনও—। কথা শেষ না করে বিছানার শেষদিকে ছোট চেয়ারটার ওপর ধপাস করে বসে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। ভগবান! সে কি যন্ত্রণাদায়ক শব্দ!

তোমার সমস্ত শক্তি সংহত কর। এই বলে আমি তার পিঠ চাপড়াবার চেষ্টা করলাম, এবং·· ·· আমার ডান হাতটা সোজা তার দেহের ভেতর দিয়ে চলে গেল! সিঁড়ির শেষ ধাপে দাঁড়িয়ে আমি যেমন সংহত ছিলাম জানলে এখন তেমন থাকতে পারলাম না। এর সম্পূর্ণ বিচিত্রতা আমি উপলব্ধি করলাম। আমার মনে পড়ছে, হাতটা চট করে বার করে এনে একটু রোমাঞ্চিত হয়ে ড্রেসিং টেবিলের দিকে এগোলাম।

তুমি নিজেকে শক্ত করে তোল আর চেষ্টা কর, আমি তাকে বললাম। তাকে উৎসাহিত ও সাহায্য করতে আমিও চেষ্টা করতে লাগলাম।

কি? অদৃশ্য হওয়া? আশ্চর্য হয়ে স্যাণ্ডারসন জিজ্ঞেস করল।

হ্যাঁ, অদৃশ্য হওয়া।

কিন্তু—, একটা ধারণার বশবর্তী হয়ে আমি বলতে যাচ্ছিলাম কিন্তু স্যাণ্ডার তার মাঝেই বলল, এটা একটা কৌতূহলের ব্যাপার। তুমি বলতে চাও তোমার এই ভূতটা ছেড়ে দিল—।

বিভ্রান্ত বাধা দূর করবার জন্যে সে যথাসাধ্য চেষ্টা করল? হ্যাঁ।

সে করেনি, করতে পারে না, নয়ত তোমারও ঐ অবস্থা হত। উইশ বলল

ঠিক তাই। আমার চিন্তাধারাটা তার কথার মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পেল।

ঠিক তাই। চিন্তান্বিত দৃষ্টিতে আগুনের দিকে তাকিয়ে ক্লেটন বলল।

কিছুক্ষণ সব চুপচাপ।

অবশেষে সে তাই করল? স্যাণ্ডারসনের জিজ্ঞাস্য।

হ্যাঁ, অবশেষে সে তাই করল। আমি তাকে উত্তেজিত করে তুলতে লাগলাম, সে তাই করল হঠাৎই। সে হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল—আমরা একটা নাটকের দৃশ্য করেছিলাম। তারপর সে হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে আস্তে আস্তে আমাকে আবার সে মহড়া দিতে বলল যাতে সে দেখতে পারে।

সে বলল, আমার বিশ্বাস, আমি যদি দেখি আমার ভুলটা সঙ্গে সঙ্গে নজরে পড়বে।

আমি করলাম।

আমি জানি, সে বলল।

তুমি কি জান?

আমি জানি, সে আবার বলল। তারপর খিটখিটে মেজাজে বলল, আমি করতে পারব না। আমার দিকে দেখ—আমি সত্যি পারব না। কিছুটা এরকম সবসময় ছিল। আমি ভীতু বলে তুমি আমাকে অসুবিধেয় ফেলছ।

যাহোক, আমাদের মধ্যে একটু তর্কাতর্কি হল। স্বভাবতই আমি দেখতে চাইলাম, কিন্তু সে গোঁয়ার-গোবিন্দের মত দাঁড়িয়ে রইল। আমি ভীষণ ক্লান্ত বোধ করলাম। ঠিক আছে, আমি তোমার দিকে দেখব না, এই বলে আমি বিছানার পাশে আয়নার দিকে ফিরলাম।

সে খুব তাড়াতাড়ি শুরু করল। আয়নার মধ্যে দিয়ে তাকে দেখার চেষ্টা করলাম। হাত দুটো ছড়িয়ে সে ঘুরছে, বোঁ বোঁ করে ঘুরছে, হঠাৎ সে সর্বশেষ ভঙ্গি করল। আমি চীৎকার করে বললাম, ঠিক হয়ে তুমি দাঁড়াও। সে দাঁড়াল। কিন্তু পরমুহূর্তেই দেখি—সে নেই, কোথাও নেই! আমি বোঁ করে তার দিকে ঘুরে দাঁড়ালাম। সেখানে কিছুই নেই। আমি একা—অনাবৃত বাতির অগ্নিশিখা আর বিহ্বল মন। কি হল? কিছু কি ঘটল? আমি কি স্বপ্ন দেখছিলাম? সেইসময় সিঁড়ির মাথায় ঘড়িটায় একটা বাজল। আমার শ্যাম্পেন ও মদ কোথায় তলিয়ে গেছে। আমি হতভম্ব অবস্থায় থ' হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। বিচিত্র অনুভূতি বোধ হল, গা শিউরে উঠল। ওঃ ভগবান!

এই অবধি বলে ক্লেটন সিগারেটের ছাই ফেলল। বলল, যা ঘটেছিল তা এই।

আর তারপর তুমি বিছানায় গেলে? ইভানস জিজ্ঞেস করল।

তাছাড়া আর কি করার থাকতে পারে?

আমি উইশের দিকে তাকালাম। আমরা তাকে ঠাট্টা করতে চেয়েছিলাম কিন্তু তার গলার স্বর ও হাবভাবে আমাদের সে ইচ্ছায় বাধ সাধল।

তার অঙ্গভঙ্গিগুলো? স্যাণ্ডারসন জিজ্ঞেস করল।

আমার বিশ্বাস সেগুলো এখন করতে পারব।

ওঃ! তাহলে সেগুলো করছ না কেন?

তাই আমি করতে যাচ্ছি।

ওগুলো কাজ করবে না। ইভানস বলল।

যদি সেগুলো করে—। আমার কথা শেষ হল না।

উইশ পা দুটো সোজা করে ছড়িয়ে বলল, আমার ধারণা তুমি করনি।

কেন? ইভানস জিজ্ঞেস করল।

বাস্তবিকই সে করেনি, উইশ জবাব দিল।

হয়ত সে ঠিকমত বুঝতে পারেনি, পাইপে টোব্যাকো গুঁজতে গুঁজতে স্যাণ্ডারসন বলল।

সে যাই হোক, সে করেনি, উইশ বলল।

আমরা উইশের সঙ্গে তর্ক করতে লাগলাম। সে বলল, ক্লেটনের ঐসব অঙ্গভঙ্গি করা মানে একটা গূঢ়তত্ত্বের তামাশা করা।

কিন্তু তোমরা কি বিশ্বাস কর না—?

উইশ আমার কথা শেষ করতে না দিয়ে ক্লেটনের দিকে তাকিয়ে বলল, আমি বিশ্বাস করি, আধা-আধি করি।

আমি বললাম, ক্লেটন, তুমি একটা আস্ত মিথ্যাবাদী। প্রায় অনেকখানি ঠিক ; তবে ঐ অদৃশ্য ব্যাপারটা ঠিক যুক্তিগ্রাহ্য নয়। এটা একটা গাঁজাখুরি গল্প।

আমার কথায় কান না দিয়ে ক্লেটন ফায়ারপ্লেসের সামনে দাঁড়িয়ে আমার দিকে তাকাল। একমুহূর্ত নিজের পায়ের দিকে চেয়ে রইল তারপরেই গভীর মনে দেয়ালের দিকে চেয়ে রইল। আস্তে আস্তে হাতদুটো চোখ বরাবর তুলে আরম্ভ করল . ।

মধ্যযুগীয় ইউরোপের ফোর কিংস নামে এক গুপ্ত ভ্রাতৃসঙ্ঘের সভ্য ছিল স্যাণ্ডারসন। সে এই সঙ্ঘের অতীত ও বর্তমান গুপ্ত বিষয়সমূহের গভীর অধ্যয়ন এবং সেগুলো বিস্তারিত আলোচনাও করত। সে রক্তচক্ষু নিয়ে গভীর উৎসাহের সঙ্গে ক্লেটনের অঙ্গভঙ্গি দেখছিল। শেষ হলে সে বলল, এটা নেহাৎ মন্দ নয়। জান ক্লেটন, সত্যি তুমি অতি অদ্ভুতভাবে সংহত করার ক্ষমতা রাখ। কিন্তু একটা ছোট ব্যাপার তুমি ছেড়ে গেছ।

আমি জানি, আমার বিশ্বাস আমি বলতে পারি কোনটা।

আচ্ছা ?

এইটা—এই বলে ক্লেটন অদ্ভুতভাবে শরীরটা মোচড় দিয়ে, কুঁচকে হাত দুটো সজোরে ঠেলে দিল।

হ্যাঁ। ঠিক।

ওটাও সে ঠিকমত করে উঠতে পারেনি। কিন্তু তুমি কেমন করে— ?

এব্যাপারের সবটাই, বিশেষ করে তুমি কি করে আবিষ্কার করলে তার কিছু আমি বুঝছি না। তবে ঐ একটা ক্রিয়া আমি করি। সে কিছু যেন চিন্তা করতে লাগল। বলল, এগুলো হচ্ছে একটা ধারাবাহিক অঙ্গসঞ্চালন পদ্ধতি, কোন আভ্যন্তরীণ গুহ্যমন গুপ্তবিদ্যার সঙ্গে জড়িত। হয়ত তুমি জান, নতুবা—কি করে এমন হল ? সে আবার কিছুক্ষণ ভেবে বলল, ঠিকমত সঙ্কোচনের ব্যাপারটা তোমায় বলতে আমি কোন ক্ষতি দেখি না। যাই হোক, যদি তুমি জান ভাল। না জানত না।

আমি কিছুই জানি না, কেবল গতরাতে বেচারা শয়তানটা যা দেখিয়েছিল।

বেশ, তা খা হবে, এই বলে স্যাণ্ডারসন তাকে ফায়ারপ্লেসের ওপরে সমান জায়গায় দাঁড় করাল। তারপর খুব দ্রুত তার হাত দুটো বিভিন্নভাবে ঘোরাল।

এইরকম ? ক্লেটন সেগুলো করে দেখাতে লাগল।

হ্যাঁ, এইরকম। স্যাণ্ডারসন আবার পাইপটা মুখে নিল।

ওঃ, আমি এখন সব ঠিক করতে পারব।

সে নিবন্ত আগুনের সামনে দাঁড়িয়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসল।

কিন্তু আমার মনে হল সেই হাসির মধ্যে যেন কিসের ইঙ্গিত রয়েছে। সে বলল, যদি আমি আরম্ভ করি—।

আমি করব না, উইশ বলল।

ঠিক আছে। ইভানস বলল, উপাদান ধ্ব সাতাত। তোমরা ভেবনা এধরনের ভোজবাজি ক্লেটনকে অশরীরির জগতে ছিনিয়ে নিয়ে যাবে। এটা ত নয়ই! তুমি চেষ্টা করে যাও ক্লেটন যতক্ষণ না কব্জি থেকে তোমার হাত খসে যায়।

আমি ওতে বিশ্বাস করি না। উইশ উঠে দাড়িয়ে ক্লেটনের কাঁধে হাত দিয়ে বলল। তোমার গল্পে আমার আধা-বিশ্বাস জন্মেছে এবং তোমার ওকাজ আমি দেখতে চাই না।

হা ভগবান! উইশ ভয় পেয়ে গেছে! আমি বললাম।

সত্যি অথবা প্রশংসার ভান করেই হোক উইশ বলল, হাঁ আমি পেয়েছি। আমি বিশ্বাস করি ক্লেটন ঐসব অঙ্গভঙ্গি করলে সে চলে যাবে।

ক্লেটন সে ধরনের কিছু করবে না, আমি চীৎকার করে উঠলাম। এই মনুষ্যলোক ছেড়ে যাবার একটাই মাত্র পথ আছে আর ক্লেটনের বয়স ত মাত্র তিরিশ। এছাড়া · ঐ ধরনের ভূত! তোমরা কি মনে কর··· ?

উইশ আমার কথায় বাধা দিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে টেবিলের ধারে দাঁড়িয়ে বলল, ক্লেটন, তুমি একটা বোকা।

ক্লেটন কৌতুকের দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে মৃদু হাসল। বলল, উইশ ঠিকই বলেছে, তোমরা সকলে ভুল করছ। আমি চলে যাব। আমার এই চর্চা শেষ হলে এবং শেষ শিষের আওয়াজ বাতাসে মিশে গেলে—লাগ ভেলকি চটপট লাগ—দেখবে এ জায়গা খালি, ঘরের মধ্যে আশ্চর্যের খেলা, ভদ্রবেশ পরিহিত পনের স্টোন ওজনের এক ভদ্রলোক চুপ করে হাওয়ায় মিলিয়ে গেল। আমি নিশ্চিত, তোমারও তাই হবে। এবিষয়ে আমি আর কিছু বলতে চাই না। ব্যাপারটা চেষ্টা করে দেখা যাক।

ন , উইশ চীৎকার করে এক পা এগিয়ে এসে থেমে গেল। ক্লেটন হাত তুলে আর একবার আত্মার চলে যাওয়ার মহড়া দিল। সেই সময়, বুঝলে কিনা, আমরা একটা চাপা উত্তেজনার মধ্যে ছিলাম। বিশেষ করে উইশের ব্যবহারে। আমরা সকলেই ক্লেটনের দিকে চোখ রেখে বসে আছি—অন্তত আমি আকস্মিক অবস্থা সঙ্কটে লোহার মত কাঠ হয়ে রয়েছি। এক প্রশান্ত শান্তির গাম্ভীর্যে ক্লেটন আমাদের সামনে এক একবার মাথা নিচু করে তার হাত দুটো ঘোরাচ্ছে, দোলাচ্ছে। যতই সে সমাপ্তির দিকে এগিয়ে আসছে আমরা ততই আতঙ্কে জমে যাচ্ছি, আমাদের দাঁতকপাটি লাগছে। শেষ ভঙ্গি হচ্ছে, মুখটা ওপরে তুলে হাত দুটো ছড়িয়ে বোঁ বোঁ করে ঘোরা। তার সেই অবস্থা দেখে আমার দম বন্ধ হয়ে আসতে লাগল। এটা অসম্ভব ব্যাপার কিন্তু

তোমরা জান সেই ভূতের গল্পের অনুভূতি—রাতের খাবারের পর, এক বিচিত্র পুরনো, ছায়া ছায়া ঘেরা বাড়ির মধ্যে……। সে কি তাহলে……?

ঘরের ঝোলানো বাতির মৃদু আলোয়, আত্মবিশ্বাসী ও উচ্ছল উঁচুকরা মুখে হাত দুটো ছড়িয়ে এক বিস্ময়কর মুহূর্ত সে দাঁড়িয়ে রইল। সেই ক্ষণিক মুহূর্ত আমাদের কাছে যুগ মনে হল। তারপর আমাদের কিছুটা অশেষ মুক্তির দীর্ঘশ্বাস, কিছুটা নিশ্চিতভাবে 'না' শব্দ মুখ থেকে বেরিয়ে এল। দৃশ্যত—সে যাচ্ছে না এসব কাজে। সে আমাদের একটা তুচ্ছ গল্প বলেছে এবং প্রায় আমাদের বিশ্বাস জন্মিয়েছে, এই যা! ঠিক সেই মুহূর্তে ক্লেটনের মুখের ভাব পালটে গেল।

পালটে যাচ্ছে, যেমন একটা আলোকোজ্জ্বল বাড়ি হঠাৎ অন্ধকার হয়ে যায়। তার চোখ দুটো স্থির হয়ে গেল, মুখের হাসি ঠোঁটেই জমে রইল এবং সে শান্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর খুব আস্তে আস্তে দুলতে লাগল।

সেই মুহূর্তটাও যেন এক অনন্ত সময়। মনে হল চেয়ারগুলো অনাবশ্যক-ভাবে ছুঁড়ে ফেলা হচ্ছে, সমস্ত জিনিসপত্তর ধুপধাপ করে পড়ছে, আমরা যেন গতিশীল। হাঁটুর ওপর ভর করে সে আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না। সামনে ঝুঁকে পড়ে যাচ্ছে এমন সময় ইভানস উঠে গিয়ে তার হাত ধরে ফেলল……।

এটা আমাদের সকলকে হতবুদ্ধি করে দিয়েছে। এক মিনিট কেউ কোন কথা বলল না। আমাদের বিশ্বাস হল, তবু যেন বিশ্বাস্য নয়……। জড়বুদ্ধির মত বিহ্বল হয়ে তার পাশে হাঁটু গেড়ে বসে পড়লাম। তার জামা গেঞ্জী ছিঁড়ে ফেলে স্যাণ্ডারসন তার বুকের ওপর হাত রাখল……।

সোজা ব্যাপারটা আমাদের বুঝতে একটু অপেক্ষা করতে হয়েছিল। আমাদের বোঝার কোন তাড়া ছিল না। ওখানেই সে ঘণ্টাখানেক পড়ে রইল। এখনও পর্যন্ত আমার মনে সেই ঘটনা জলজ্বল করছে। ক্লেটন চলে গেল সেই রাজ্যে—যা আমাদের এত কাছে অথচ কতদূরে, সেই পথ দিয়ে—যে-পথে সাধারণ মানুষ যায়। কিন্তু সে বাস্তবিক সেই ভূতের জাদুমন্ত্রে চলে গেল অথবা বাজে গল্প বলার মাঝে হঠাৎ সন্ন্যাস রোগে আক্রান্ত হয়ে জীবন শেষ হল—অবশ্যি করোনারের মতে তাই—সেটা আমার বিচারের বিষয় নয়। এটা এমন এক প্রহেলিকাময় ব্যাপার যা বুদ্ধিতে ব্যাখ্যা করা যায় না, সমস্ত বিষয়ের শেষ সমাধান না হওয়া পর্যন্ত এটা অজানিত থাকবে। এই মুহূর্তে আমি নিশ্চয় করে যা জানি তা হল—তার সেই অঙ্গভঙ্গি করা শেষ হলে, তার মুখের পরিবর্তন হচ্ছিল, ঘুরছিল এবং আমাদের সামনে পড়ে গেল—তার মৃ হল।

The inexperienced Ghost—*H. G. Wells*

নিশাচর

সেরাত ছিল তারাহীন, অন্ধকার। আমরা উত্তর প্রশান্ত মহাসাগরে বাতাসের অভাবে গতিহীন। ক্লান্তিকর ও শ্বাসরোধকারী সারা সপ্তাহে সূর্যের মুখ দেখা গেল না। আমাদের মাথার ওপর মাস্তুল শীর্ষে পাতলা কুয়াশায় সূর্য ঢাকা। মাঝে মাঝে আমাদের চারিদিকের সমুদ্রে কুয়াশা নেমে আসছে।

বাতাস না থাকায় হাল ঘোরাবার হাতলটা সোজা করে রাখা আছে। ডেকের ওপর আমিই একমাত্র প্রাণী। দুজন লোক ও একটা ছেলেকে নিয়ে



আমাদের নাবিকদল। তারা ডিঙির খোলে ঘুমোচ্ছে। আমার বন্ধু ও ছোট ডিঙির মাষ্টার—উইল ছোট কেবিনের বাক্সের পেছনে।

হঠাৎ চারধারের অন্ধকারের ভেতর থেকে একটা চীৎকার শোনা গেল :

ওহে, মাল্লা!

চীৎকার এমনই অপ্রত্যাশিত যে আমি বিস্মিত হয়ে সঙ্গে সঙ্গে যেন উত্তর দিলাম না।

আবার শোনা গেল—অদ্ভুত খনখনে অমানুষিক গলার স্বর, আমাদের বন্দর থেকে দূরে অন্ধকার সমুদ্রের মধ্যে কোথা থেকে ডাকছে।

ওহে, মাল্লা।

হ্যালো, কে? মনে সাহস এনে উত্তর দিলাম। কি করছ তুমি? তুমি কি চাও?

তোমার ভয় পাবার কিছু নেই, অদ্ভুত স্বরে সে উত্তর দিল। হয়ত সে আমার কথার মধ্যে কিছু বিভ্রান্তি লক্ষ্য করেছিল। আমি একজন বুড়ো লোক।

তবে কাছে আসছ না কেন? একটু তীব্রভাবে জিজ্ঞেস করলাম। কারণ আমি যে একটু ভয় পেয়েছি সেটা তাকে জানতে দিতে চাই না।

আ—আমি পারব না। এটা নিরাপদ হবে না। আমি—। কথা বন্ধ হয়ে গেল। নীরবতা বিরাজ করতে লাগল।

তুমি কি বলতে চাও? আরো আশ্চয হয়ে গেলাম। কেন নিরাপদ নয়? কোথায় তুমি?

কান পেতে শোনার চেষ্টা করলাম কিন্তু কোন উত্তর এল না। এবং তার-পরেই হঠাৎ অজানা এক সন্দেহে দ্রুত কম্পাস রাখার বাক্সের ওপর দাঁড়িয়ে আলোর লণ্ঠনটা এগিয়ে ধরলাম। ঠিক সেই সময়ে উইলকে জাগাবার জন্যে পায়ের গোড়ালি দিয়ে ডেকের ওপর শব্দ করলাম। রেলিংয়ের ধারে এসে হলদে আলোটা নিস্তব্ধ গভীরতার দিকে দেখালাম। এইরকম বারবার করার সময়ে আমি একটা অস্পষ্ট চাপা শব্দ শুনতে পেলাম, পরক্ষণেই ঝপাং শব্দে জলে হঠাৎ দাঁড় ফেলার আওয়াজ কানে এল। যদিও আমি নিশ্চিতভাবে দেখেছি তা বলতে পারব না। আমার বোধ হল প্রথম আলো ফেলার সময় জলের ওপর কিছু দেখেছিলাম কিন্তু এখন আর নেই।

ওহে শুনছ! আমি বললাম। এটা কি ঠাট্টা হচ্ছে!

একটা নৌকো অন্ধকারের মধ্যে মিলিয়ে যাওয়ার একটা অস্পষ্ট শব্দ পেলাম। সেইসময় নৌকোর ভেতর থেকে উইলের গলার আওয়াজ শুনলাম।

কি হয়েছে, জর্জ?

এখানে এস, উইল।

কি ব্যাপার? ডেক পার হয়ে আসতে আসতে জিজ্ঞেস করল উইল।

আমি তাকে অদ্ভুত ঘটনার কথা বললাম। সে আমাকে কতকগুলো প্রশ্ন করল। তারপর একমুহূর্ত থেমে মুখে হাত রেখে চীৎকার করে আহ্বান জানিয়ে বলল, ওহো, নৌকো।

অনেক দূর থেকে একটা ক্ষীণ উত্তর ভেসে এল। আমার সঙ্গী আবার ডাক

দিল। অনতিবিলম্বে, কিছুক্ষণ নীরবতার পর, চাপা দাঁড় টানার শব্দ কর্ণগোচর হল। আবার উইল চীৎকার করে উঠল।

এইবার একটা উত্তর এল—আলো নিবিয়ে দাও।

আমি রাজী হলাম না। কিন্তু যেমন করতে বলা হচ্ছে উইল আমাকে তাই করতে বলল। আমি বুলওয়ার্কের নিচে আলোটা ঢুকিয়ে রাখলাম।

আরো কাছে এস, সে বলল। দাঁড় ফেলার শব্দ হতে লাগল। স্পষ্ট বোঝা গেল ছয় ফ্যাদম দূরে সেটা বন্ধ হয়ে গেল।

পাশে এস। এখানে ভয়ের কিছু নেই। উইল চীৎকার করে বলল।

প্রতিজ্ঞা কর আলো দেখাবে না।

আলোকে এমন ভয় পেলে তোমাকে নিয়ে আমরা কি করতে পারি আমি বললাম।

কারণ—। বলতে আরম্ভ করে হঠাৎ থেমে গেল।

কারণ কি? চটপট আমি জিজ্ঞেস করলাম।

উইল আমার কাঁধে হাত রাখল।

আরে বুড়ো, এক মিনিট চুপ কর। আমাকে ব্যাপারটা দেখতে দাও। সে চাপা গলায় বলল।

সে রেলিংএর ওপর আরো ঝুঁকে দাঁড়াল।

ওহে মশাই এই গভীর সমুদ্রে তোমার এভাবে আমাদের কাছে আসাটা এক বিচিত্র ব্যাপার মনে হচ্ছে। ভোজবাজি দেখিয়ে তুমি যে আমাদের ঠকাচ্ছ না তা কি করে বুঝব? তুমি বললে একা আছ। তোমাকে না দেখলে কি করে বুঝব, বল? আলোতে তোমার আপত্তি কিসের?

তার কথা শেষ হতেই আমি আবার দাঁড় টানার শব্দ শুনলাম। তারপরেই তার গলার স্বর মনে হচ্ছে আরো দূর থেকে—হতাশা ও করুণ সে স্বর।

আমি দুঃখিত। আমি ক্ষুধার্ত, তা না হলে তোমায় কষ্ট দিতাম না। আর এই স্ত্রীলোকটিও।

স্বর মিলিয়ে গেল। ঝুপঝুপ করে দাঁড় ফেলার শব্দ হচ্ছে। সেটাও স্বাভাবিকভাবে নয়।

থাম! উইল চীৎকার করে উঠল। তোমাকে তাড়িয়ে দিতে চাই না। ফিরে এস! যদি তুমি পছন্দ না কর আমরা আলো সরিয়ে রাখব।

আমার দিকে ফিরে বলল, এটা একটা অদ্ভুত বিচিত্র কৌশল; আমার মনে হয় ভয় পাবার কিছু নেই?

তার কথার মধ্যে প্রশ্ন আছে, তাই জবাব দিলাম।

না, মনে হয় এখানে কোথাও তার নৌকার কিছু ক্ষতি হয়েছে, তাই পাগল হয়ে গেছে।

দাঁড়ের শব্দ আবো কাছে এগিয়ে আসছে।

কাঠের পাটাতনের নিচে লণ্ঠনটা রাখ। এই বলে উইল রেলিংয়ে ঝুঁকে কিছু শোনার চেষ্টা করল। আমি লণ্ঠনটা সরিয়ে রেখে দিয়ে তার পাশে দাঁড়ালাম। দাঁড় ফেলার শব্দ কিছু দূরে থেমে গেল।

এখন তুমি পাশে আসতে পারবে না? কাঠের পাটাতনের নিচে আলো ঢুকিয়ে রেখেছি।

আ-আমি পারব না। আমি কাছে আসতে সাহস করি না। এমনকি খাবারের দাম দিয়েও পারব না।



ঠিক আছে। উইল একটু ইতস্তত করল। তোমাকে স্বাগত জানান হচ্ছে, যত ইচ্ছে খাবার নিতে পার।

তুমি খুব ভাল। ভগবান যিনি সব কিছু বোঝেন, তোমাকে পুরস্কৃত করুন।

স্ত্রীলোকটি? সে কি—? কথার মাঝেই উইল জানতে চাইল।

তাকে আমি দ্বীপে রেখে এসেছি।

কোন দ্বীপ?

আমি নাম জানি না। আমি ভগবানের কাছে—। বলতে আরম্ভ করে যেন হঠাৎ সংযত হয়ে গেল।

আমরা একটা নৌকা তার জন্যে পাঠাতে পারি না?

না! অদ্ভুত জোর দিয়ে সে বলল। ওঃ ভগবান! না! একমুহূর্ত বিরতি। আবার শুরু করল, আমার চাহিদার জন্যে এই ঝুঁকি নিয়েছি—কারণ তার

নিদারুণ যন্ত্রণা আমাকে উৎপীড়িত করে তুলছে।

আমি কি বোকা! এক মিনিট অপেক্ষা কর। তুমি যেই হও না কেন এখুনি তোমার জন্যে কিছু আনছি।

কয়েকমিনিটের মধ্যে সে দুহাত ভর্তি খাবার জিনিস নিয়ে ফিরে এসে রেলিংয়ের ধারে দাঁড়াল।

এগুলো নেবার জন্যে কাছে আসতে পারবে না?

না, আমার সাহস নেই।

তার গলার স্বরে আকুল কামনার সুর ধ্বনিত—যেন এক জাগতিক বাসনা গোপন করার প্রচেষ্টা। চকিতে আমার মনে উদয় হল, অন্ধকারের মধ্যে ঐ যে বেচারা মানুষটা, উইলের হাতে ধরা জিনিসের প্রয়োজনেই কষ্ট পাচ্ছে। অথচ আমাদের এই ছোট ডিঙিটার পাশে এসে সেগুলো নিতে যেন কিসের ভয়ে পিছিয়ে যাচ্ছে। বিদ্যুতের ঝলকের মত আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মাল যে অদৃশ্য লোকটি পাগল নয়, প্রকৃতিস্থ অবস্থায় আতঙ্কজনক কিছুর সম্মুখীন হচ্ছে সে।

নিকুচি করেছে উইল। একটা বাক্স নিয়ে এস, ওর মধ্যে পুরে তার দিকে বাক্সটা ভাসিয়ে দেব।

তাই করলাম। একটা লম্বা বাঁশের লগা দিয়ে অন্ধকারের মধ্যে বাক্সটাকে ঠেলে দিলাম। কিছুক্ষণ পরে একটা চাপা চীৎকার ভেসে এল, বুঝতে পারলাম সে বাক্সটা পেয়েছে।

একটু পরে সে উচ্চস্বরে আমাদের বিদায় সম্ভাষণ জানাল, সেই সঙ্গে কৃতজ্ঞতা-পূর্ণ আশীর্বাদ বাণী উচ্চারণ করল। ধীরে ধীরে দাঁড়ের শব্দ অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

এত তাড়াতাড়ি চলে গেল। উইল যেন মনে একটু আঘাত পেল।

অপেক্ষা কর। মনে হয় সে আবার ফিরে আসবে। খাদ্যটা তার খুবই প্রয়োজন ছিল।

আর স্ত্রীলোকটি। একমুহূর্ত নীরব থেকে আবার বলল, আমার মাছ ধরার শুরু থেকে এই প্রথম এমন এক অদ্ভুত ব্যাপারের সম্মুখীন হলাম।

হ্যাঁ। এই বলে আমি গভীর চিন্তায় ডুব দিলাম।

বিস্ময়ে অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে সময় যেতে লাগল—একঘণ্টা, আরো একঘণ্টা। উইল আমার সঙ্গেই দাঁড়িয়ে আছে। এই বিচিত্র অভিজ্ঞতা তার চোখের ঘুম কেড়ে নিল। আরো একঘণ্টার পর নিস্তব্ধ সমুদ্রের মধ্যে আবার দাঁড় টানার শব্দ শুনতে পাওয়া গেল।

শোন! উইলের চাপা স্বরে উত্তেজনা।

সে আসছে, ঠিক আমি যা ভেবেছিলাম।

জলের মধ্যে দাঁড় পড়ার শব্দ কাছে আসছে। সেটা আরো দৃঢ় ও দীর্ঘ সময় নিচ্ছে। খাদ্যের প্রয়োজন হয়েছে। একটু দূরে আওয়াজ থেমে গেল

এবং অন্ধকারের মধ্যে সেই অদ্ভুত স্বর ভেসে আসছে।

ওহে মাল্লা!

তুমিই সেই? উইল জানতে চাইল।

হ্যাঁ। আমি হঠাৎ তোমাদের ছেড়ে গিয়েছিলাম, কিন্তু—ভীষণ দরকার।

স্ত্রীলোকটি? আবার উইল জিজ্ঞেস করল।

স্ত্রীলোকটি এখানে কৃতজ্ঞ কিন্তু শীঘ্রই সে স্বর্গে আরো কৃতজ্ঞ হবে।

উইল কিছু বলতে চাইল কিন্তু পারল না, বিভ্রান্ত হয়ে পড়ল। আমিও চুপ করে রইলাম। তার এই হঠাৎ বিরতিতে আমি চিন্তা করতে লাগলাম। এছাড়াও তার প্রতি আমার গভীর সমবেদনা জেগে উঠল।

সে বলতে লাগল: আমরা—মানে, সে ও আমি ভগবানের কৃপা লাভ করে কত গল্প করেছি, এবং তোমাদের—।

উইল তার কথায় বাধা দিল কিন্তু সঙ্গতি হারিয়ে ফেলল।

আমি তোমাদের কাছে প্রার্থনা করছি আজ রাতে তোমাদের দানকে ছোট মনে করো না। নিশ্চয়ই জানবে তাঁর নজর এড়ায়নি।

পুরো এক মিনিট নীরব থাকার পর আবার সে বলতে শুরু করল।

আমাদের ভাগ্যে যা ঘটেছে সেই নিয়ে আমরা দুজনে কথা বলছিলাম। আমরা ভেবেছিলাম আমাদের জীবনে যে আতঙ্ক এসেছে কাউকে না জানিয়ে দূরদেশে চলে যাব। সে আমার সঙ্গে বিশ্বাস করে আজ রাতের ঘটনা কোন বিশেষ নিয়মেই ঘটেছে। এটা ভগবানের ইচ্ছা আমরা তোমাদের সবকিছু জানাই, সেই থেকে—সেই থেকে যে কষ্ট ভোগ করছি—।

হ্যাঁ, বলুন। মৃদু স্বরে উইল বলল।

অ্যালবাট্রসের ডুবে যাওয়া থেকে।

ওঃ! অনিচ্ছাকৃতভাবে আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল। জাহাজটা ছমাস আগে ফ্রিসকোর উদ্দেশে নিউক্যাসল থেকে যাত্রা করেছিল। তারপর থেকে তার সম্বন্ধে আর কিছু শোনা যায় নি।

হ্যাঁ, অদৃশ্যের স্বর শোনা গেল। কিন্তু কয়েক ডিগ্রী উত্তরে জাহাজ ভীষণ ঝড়ে মাস্তলহীন হয়ে পড়ে। দিনের আলোয় দেখা গেল জাহাজে মারাত্মক ফাটল ধরেছে, এখন সেটা শান্তির রাজ্যে পড়ে আছে। নাবিকেরা সব নৌকো নিয়ে চলে গেল। সেই ধ্বংসপ্রাপ্ত জাহাজে ফেলে রেখে গেল এক যুবতীকে—আমার বাগদত্তাকে আর আমাকে।

যখন তারা আমাদের পরিত্যাগ করে তখন আমরা জাহাজের নিচে আমাদের জিনিসপত্তর ঠিক করছিলাম। ভয়ে একেবারে বিহ্বল হয়ে তারা বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়ে পড়েছিল। আমরা ডেকের ওপরে উঠে দেখলাম দূরে দিকচক্রবালে তাদের বিন্দুর মত দেখাচ্ছে। তবু আমরা হতাশ হই নি। একটা ছোট ভেলা তৈরি করতে লেগে গেলাম। যতটুকু জিনিস ধরা সম্ভব ভেলাতে তুললাম। তার

মধ্যে কিছু জল ও বিস্কুট ছিল। জাহাজটা অনেকখানি জলের ভেতর ডুবলে আমরা ভেলায় চড়ে ভেলা ঠেলে দিলাম। পরে আমি লক্ষ্য করলাম আমরা জোয়ার বা স্রোতের টানে পড়েছি। জাহাজ থেকে আমরা কোনাকুনি ভেসে চলেছি। আমার ঘড়িতে তিনঘণ্টা চলার পর জাহাজের হাল আমাদের দৃষ্টির বাইরে চলে গেল, তার ভাঙা মাস্তলটা আরো কিছুক্ষণের পর দেখা গেল। সন্ধ্যের দিকে কুয়াশা নেমে এল। সারারাত এইভাবে চলল। পরের দিন কুয়াশা আমাদের ঢেকে রাখল, আবহাওয়া শান্তই ছিল।

চারদিন কুয়াশার মধ্যে ভাসতে ভাসতে সন্ধ্যের সময়ে দূরে ঢেউ আছড়ে পড়ার শব্দ কানে আসতে লাগল। ক্রমশঃ এটা পরিষ্কার হয়ে এল, সারারাতের পরেই আমাদের দুপাশে আওয়াজ শুনতে পেলাম। ভেলাটা কয়েকবার উঁচু হয়ে উঠল। তারপরেই আমরা অশান্ত জলে পড়লাম। আমাদের পেছনে ঢেউ ভাঙার শব্দ।

দিনের আলোয় দেখলাম আমরা একটা বিরাট হ্রদে পড়েছি। সেইসময় এব্যাপারে আমরা বিশেষ লক্ষ্য করিনি। আমাদের খুব কাছে কুয়াশার মধ্যে অস্পষ্ট দেখলাম একটা বড জাহাজের হাল! একসঙ্গে দুজনে হাঁটু গেড়ে বসে ভগবানকে ধন্যবাদ জানালাম। আমরা ভাবলাম আমাদের দুর্দশার এখানেই শেষ। অনেককিছু তখনও আমাদের জানার ছিল।

ভেলাটা জাহাজের কাছে গেলে আমরা তাদের চীৎকার করে জাহাজে তোলার জন্যে বললাম। কিন্তু কেউ সাড়া দিল না। জাহাজের গায়ে ভেলাটা লাগল। একটা দড়ি ঝুলতে দেখে আমি সেটা ধরে ওপরে উঠতে লাগলাম। দড়িটায় ধূসর রঙের শ্যাওলা জলে এমন হড়হড়ে হয়েছিল যে আমাকে অনেক কষ্ট করতে হয়েছিল। জাহাজের গায়েও আঁচিলের মত ছাতা ধরেছিল।

রেলিংয়ে পৌছে সেটা টপকে জাহাজের ডেকে দাঁড়ালাম। দেখলাম ডেকের ওপরে মাঝে মাঝে বড় বড় ধূসর বর্ণের চাপড়া, তা থেকে কয়েক ফুট উঁচু গাছ জন্মেছে। এব্যাপারে মাথা না ঘামিয়ে জাহাজে কোন লোক আছে কিনা সেই চিন্তাই করছিলাম। আমি চীৎকার করলাম, কোন সাড়াশব্দ নেই। তখন জাহাজের পেছন দিকে নিচে নামবার দরজার কাছে গেলাম। সেটা খুলে ভেতরে উঁকি মারলাম। একট বিশ্রী ভ্যাপসা দুর্গন্ধ বেরিয়ে এল। সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারলাম ভেতরে জীবন্ত কিছু নেই। তাড়াতাড়ি বন্ধ করে দিলাম। তখন উপলব্ধি করলাম আমি একা।

আমি ফিরে গেলাম যেখান থেকে উঠেছি সেখানে। দেখলাম আমার বাগদত্তা শান্তভাবে ভেলায় বসে আছে। আমাকে দেখে সে জানতে চাইল জাহাজে কেউ আছে কিনা। আমি উত্তরে জানালাম জাহাজটা দেখে মনে হচ্ছে এটা পরিত্যক্ত। তাঁকে একটু অপেক্ষা করতে বলে আমি একটা সিঁড়ির সন্ধানে গেলাম ওকে ডেকে তোলার জন্যে। তাহলে আমরা দুজনে একসঙ্গে

জাহাজটা খুঁজে দেখতে পারব। একটু পরে উল্টোদিকে একটা দড়ির সিঁড়ি দেখতে পেলাম। সেটা দিয়ে তাকে ডেকে তুলে আনলাম।

জাহাজের কেবিন ও ঘরগুলো দুজনে ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলাম। কোথাও কোন জীবনের চিহ্ন নেই। এখানে ওখানে এমনকি কেবিনের মধ্যেও ছাতা গজিয়ে উঠেছে। আমার বাগদত্তা জানাল এগুলো পরিষ্কার করা যেতে পারে।

জাহাজের পেছন দিকটার মত সামনেও কোন জীবনের লক্ষণ দেখা গেল না। নিঃসন্দেহ হয়ে আমরা জাহাজের পেছনদিকে ফিরে এসে যতটা সম্ভব আরাম উপভোগের বন্দোবস্ত করতে লাগলাম। দুজনে মিলে দুটো কেবিন পরিষ্কার করে ফেললাম। তারপর কিছু খাদ্যের সন্ধান করতে ছুটে গেলাম। প্রাণ খুলে ভগবানকে তাঁর দয়ার জন্যে ধন্যবাদ জানালাম। এইসঙ্গে ভাল জলের বাষ্পও আবিষ্কার করলাম। এটা ঠিক করে পাম্পে জল তুলে মুখে দিয়ে দেখলাম কিছুটা বিস্বাদ।

কয়েকদিন আমরা সেই জাহাজেই কাটালাম। ডাঙ্গায় যাবার কোন চেষ্টা করলাম না। জায়গাটা বাসোপযোগী করে তুলতে ব্যস্ত রইলাম। এসব সত্ত্বেও আমরা আমাদের দুর্ভাগ্য সম্বন্ধে সচেতন। প্রথমেই আমরা কেবিনের মেঝেতে ও দেয়ালে যে শ্যাওলার চাপড়া ছিল সেগুলো পরিষ্কার করলাম। কিন্তু চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে আবার সেগুলো গজিয়ে উঠল। এগুলো যে আমাদের শুধু নিরুৎসাহ করল তাই নয় একটা অনিশ্চিত অস্বস্তির মধ্যে ফেলল।

আবার নতুন উদ্যমে সেগুলো পরিষ্কার করে, ভাঁড়ার থেকে পাওয়া এক টিন কার্বোলিক দিয়ে ভিজিয়ে দিলাম। তবু সপ্তাহের শেষে আবার দেখা গেল, আর এক জায়গাই নয় অন্যত্রও ছড়িয়ে পড়েছে, মনে হচ্ছে আমাদের হাতের ছোঁয়া লেগে বীজাণু ছড়াচ্ছে।

সপ্তম দিনের সকালে ঘুম ভাঙলে আমার বাগদত্তা অবাক হয়ে দেখল তার বালিশে, একেবারে মুখের কাছে চাপড়া জন্মেছে। সঙ্গে সঙ্গে উঠে সে আমার কাছে এল। সেইসময় আমি জাহাজের রান্নাঘরে ব্রেকফাস্ট তৈরি করবার জন্যে আগুন জ্বালাচ্ছিলাম।

জন, এখানে এস। সে আমাকে টেনে নিয়ে গেল। বালিশের ওপর সেটা দেখে আমি শিউরে উঠলাম। তখনি আমরা ঠিক করলাম জাহাজ ছেড়ে ডাঙ্গায় গিয়ে থাকবার বন্দোবস্ত করব।

তাড়াতাড়ি করে আমরা কিছু জিনিস গুছিয়ে নিতে লাগলাম। তার-মধ্যেও আমি লক্ষ্য করলাম ছাতা ধরতে আরম্ভ করেছে। একটা শালের একধারে টলার মত ছাতা ধরেছে। তাকে কিছু না জানিয়ে আমি শাল থেকে ঝেড়ে ফেললাম।

ভেলাটা তখনও জাহাজের পাশে ছিল। এমন জবরজঙ্গ ভেলা নিয়ে চলা যায় না। রেলিংয়ের ধারে ঝোলানো একটা ছোট নৌকো জলে নামিয়ে

দিলাম। এতে চড়েই আমরা ডাঙ্গায় যাব। যতই আমরা কাছে যেতে লাগলাম, ক্রমেই আমি সচেতন হয়ে উঠলাম, সেই জঘন্য ছাতা যা আমাদের জাহাজ থেকে বিতাড়িত করেছে, তা এখানেও হৈ হৈ করে বাড়ছে। এক এক জায়গায় ভয়ঙ্কর ও অদ্ভুতভাবে তূণীরের মত উঁচু ঢিবি হয়ে আছে। এখানে সেখানে বিরাট আঙুলের মত, আবার কোথাও সমতলভূমির মত মসৃণ।

প্রথমে মনে হয়েছিল ডাঙ্গায় কোথাও এমন জায়গা নেই যেখানে এর দৌরাত্ম্য কম। কিন্তু সে ধারণা আমার ভুল। একটু পরে ডাঙ্গার কাছে আসতে আসতে সাদা ছোপ দেখে মনে হল মিহি বালি। সেখানেই আমরা নামলাম। এটা বালি না, তবে কি তা বুঝতে পারলাম না। একটু মনোযোগ দিয়ে দেখে বুঝলাম এতে ছাতা জন্মাতে পারে না। কিন্তু সর্বত্র, কেবল বালিময় জায়গা ছাড়া, সেই ধূসর জঘন্য ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না।

একটা জায়গা একেবারে এর থেকে মুক্ত দেখে কি যে আনন্দ হয়েছিল তা বলে তোমাদের বোঝাতে পারব না। সেখানে আমাদের সব জিনিসপত্তর রাখলাম। তারপর আবার ফিরে গেলাম জাহাজে আমাদের প্রয়োজনীয় যা কিছু পাওয়া যায় সংগ্রহ করে আনতে। অন্য জিনিসের মধ্যে জাহাজের পালগুলো নিয়ে এসে দুটো ছোট তাঁবু খাটালাম। যদিও সেটা ঠিকমত হল না তবে কাজ চালাবার পক্ষে যথেষ্ট। এরমধ্যে বাস করতে লাগলাম ও নানা প্রয়োজনীয় জিনিস রাখলাম। চার সপ্তাহ বেশ ভালভাবেই কাটল, মন্দের কিছু ঘটল না। প্রকৃতপক্ষে, বেশ আনন্দেই কেটেছে কারণ—আমরা দুজনে ছিলাম।

তার ডান হাতের আঙুলে প্রথম জন্মাতে দেখা গেল। একটা ছোট গোলাকার বস্তু ঠিক তিলের মত। ওঃ ভগবান! যখন সে আমায় জায়গাটা দেখাল কি ভয়েই না আমার বুক দুরুদুরু করে উঠেছিল। আমরা দুজনে সেটা কার্বোলিক ও জল দিয়ে পরিষ্কার করলাম। পরেরদিন সকালে সে আবার আমাকে তার হাতটা দেখাল। ধূসর আঁচিলের মত বস্তুটা আবার দেখা যাচ্ছে। কিছুক্ষণ নীরবে আমরা পরস্পরের দিকে চেয়ে রইলাম। বিনা বাক্যে আবার আমরা সেটা পরিষ্কার করতে লেগে গেলাম। এই কাজের মধ্যে হঠাৎ সে বলল —

তোমার মুখের পাশে ওটা কি প্রিয়? তার গলার স্বরে ব্যগ্রতা।

অনুভব করার জন্যে আমি হাত তুললাম।

ওখানে! কানের পাশে চুলের নিচে। আর একটু সামনে বাস।

সেই জায়গার ওপর আঙুল রেখে অনুভব করলাম।

এস, তোমার আঙুলটা আগে ঠিক করি। আমি বললাম।

সে সম্মতি জানাল কারণ এটা পরিষ্কার হওয়ার আগে আমাকে স্পর্শ করতে সে ভয় পাচ্ছে। তার আঙুলটা ধুয়ে পরিষ্কার করে জীবাণুমুক্ত করলাম।

তারপর সে আমার মুখের দিকে চাইল। কাজটা শেষ হলে দুজনে বসে নানা-রকম গল্প করলাম। আমাদের জীবনে হঠাৎ ভীষণ চিন্তা দেখা দিয়েছে। মরার থেকেও খারাপ কিছুর জন্যে আমরা ভীত হয়ে পড়েছি।

আমরা নৌকো বোঝাই করে জিনিসপত্তর, জল নিয়ে সমুদ্র যাত্রার কথা বললাম। তবু আমরা যেন অনেক কারণে অসহায় এবং সেই বস্তুটির ক্রম-বৃদ্ধিতে আমরা আক্রান্ত। আমরা থাকবার মনস্থ করলাম। ভগবানের যা ইচ্ছা তাই তিনি করবেন। আমরা শুধু অপেক্ষা করে থাকব।

একমাস—দুমাস—তিনমাস—এইভাবে কেটে গেল। আরো বিস্তীর্ণ জায়গায় আক্রান্ত হল। সত্যি বলতে কি আমাদের শ্রমসাধ্য প্রয়াসে তাদের বৃদ্ধি কিছুটা শ্লথ করতে পেরেছি।

মাঝে মাঝে জাহাজে গিয়ে আমাদের প্রয়োজনীয় কিছু বস্তু আনি। সেখানে ক্রমশঃ ছত্রাকের বৃদ্ধি দেখলাম। ডেকের ওপরে ছত্রাকের ঢিবি আমার মাথার সমান উঁচু হয়েছে।

আমরা এই দ্বীপ ছেড়ে যাবার সমস্ত ভাবনা চিন্তা ত্যাগ করলাম। আমরা স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করলাম যে জিনিসে ভুগছি তা নিয়ে কোন সুস্থ মানুষের মধ্যে যাওয়া ঠিক নয়। এই সঙ্কল্প নিয়ে আমরা আমাদের খাবার ও জল বুঝে সুঝে খরচ করা স্থির করলাম। কারণ হয়ত আমাদের এখানে অনেক বছর থাকতে হবে।

আমার মনে পড়ছে তোমাদের বলেছিলাম আমি একজন বৃদ্ধ। বছর হিসেবে কিন্তু তা নয়। তবে—তবে—। হঠাৎ থেমে গিয়ে আবার বলতে শুরু করল :

আমি যা বলছিলাম, খাদ্যের ব্যাপারে আমাদের সতর্ক হওয়া উচিত। কিন্তু কতটুকু খাদ্য অবশিষ্ট আছে সেবিষয়ে কোন ধারণা ছিল না। এক সপ্তাহ পরে আবিষ্কার করলাম যে রুটির ট্যাঙ্কগুলো ভর্তি ভেবেছিলাম সেগুলো একেবারে খালি। কিছু সবজি, মাংস আর অন্য জিনিস ছাড়া আমাদের নির্ভর করার আর কিছু নেই। অবশ্যি এখন যেটা থেকে রুটি নিচ্ছি সেটা ভর্তি আছে।

এ ব্যাপার জানার পর থেকে কর্মতৎপর হয়ে হ্রদে মাছ ধরার কাজে লেগে গেলাম। কিন্তু কিছু পেলাম না। কিছুটা বেপরোয়া হয়ে হ্রদের বাইরে খোলা সমুদ্রে খাবারের সন্ধানে প্রবৃত্ত হলাম। যা সামান্য কিছু মাছ পেলাম আমাদের ক্ষুধা মেটাবার পক্ষে যথেষ্ট নয়। মনে হল আমাদের দেহে গজিয়ে ওঠা বস্তুটি মৃত্যুর কারণ হবে না, ক্ষুধাই মৃত্যু ডেকে আনবে।

এই মানসিক অবস্থার মধ্যে চতুর্থ মাস কাটল। সেইসময় আমি এক ভীষণ জিনিস আবিষ্কার করলাম। একদিন দুপুরের কিছু আগে জাহাজ থেকে বিস্কুট নিয়ে ফিরছি। এমন সময় দেখলাম আমার বাগদত্তা তাঁবুর সামনে বসে কি খাচ্ছে।

ওটা কি ? ডাঙায় লাফিয়ে উঠে চীৎকার করে জিজ্ঞেস করলাম। আমার কথা শুনে একটু হতভম্ব হয়ে ঘুরে নোংরা ফেলার জায়গায় কিছু ছুঁড়ে ফেলল। সেটা টিনের মধ্যে পড়ল না। আমার মনে একটা সন্দেহ উঁকি দিল। আমি সেটা তুলে দেখলাম—একটুকরো ছত্রাক।

সেটা হাতে নিয়ে তার কাছে গেলে দেখলাম তার মুখটা ফ্যাকাসে হয়ে গেল কিন্তু পরমুহূর্তে গোলাপের মত লাল হয়ে উঠল। আমি বিস্মিত ও ভীত হলাম।

তাকে সম্ভাষণ করা ছাড়া আর কিছুই বলতে পারলাম না। আমার কথা শুনে সে কান্নায় ভেঙে পড়ল। ক্রমে সে কিছুটা শান্ত হলে তার কাছ থেকে জানতে পারলাম আগের দিনও সে খেয়েছিল আর—তার ভালই লেগেছিল। আমি তাকে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিলাম যতই আমরা ক্ষুধার্ত হই না কেন এ জিনিস কখনও ছোঁব না। প্রতিজ্ঞা করার পর সে আমাকে বলল হঠাৎই তার ইচ্ছা জাগে কিন্তু তার আগে পর্যন্ত এর প্রতি ঘৃণাই ছিল।

পরে একসময় তাদের অস্বস্তি বোধ করায় বালির মত আঁকাবাঁকা রাস্তা দিয়ে হাঁটতে শুরু করলাম। এ রাস্তায় আমি আগেও এসেছি কিন্তু বেশীদূর এগোয়নি। এবার নানা চিন্তায় চিন্তিত হয়ে অনেক দূর এগিয়ে গেলাম।

হঠাৎ আমার বাঁদিকে অদ্ভুত ঘরঘর শব্দে চমকে উঠলাম। ঘুরে দেখলাম আমার পাশেই অস্বাভাবিক বড় ছত্রাকের একটা পিণ্ড নড়ছে। ধীরে ধীরে হেলতে দুলতে চলেছে পিণ্ডটা। দেখতে দেখতে মনে হল যেন একটা বিকৃত মানুষের মূর্তি। এমন চিন্তা মাথায় উদয় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কিছু ছেঁড়ার শব্দ পেলাম। দেখলাম গাছের ডালের মত হাত দুটো চারিদিকের ধূসর আগাছা থেকে বিচ্ছিন্ন করে আমার দিকে এগিয়ে আসছে। আমি হতভম্বের মত দাঁড়িয়ে রইলাম, নোংরা হাতটা আমার মুখের ওপর ঘষে দিল। ভয়ে চীৎকার করে কয়েক পা পিছিয়ে গেলাম। আমার ঠোঁটে মিষ্ট স্বাদ অনুভব করলাম। সেটা জিভ দিয়ে চাটতেই এক অমানুষিক ইচ্ছা মনে জেগে উঠল। আমি এক-গোছা ছত্রাক ছিঁড়ে নিলাম। তারপর আরো—আরো, কিছুতেই যেন আর তৃপ্ত হয় না। সাগ্রহে গেলবার সময় আমার গোলমেলে মাথায় সকালের ঘটনা উঁকি দিতে লাগল। এ ভগবানেরই দান। আমার হাত থেকে মাটিতে সেগুলো পড়ে গেল। চরম দুর্দশাগ্রস্ত ও ভীষণ অপরাধী ভেবে তাঁবুর দিকে ফিরে চললাম।

আমার দিকে তার তাকানো দেখে বুঝলাম ভালবাসার সহজাত প্রবৃত্তিতে সে ব্যাপারটা জেনে ফেলেছে। তার নীরব সমবেদনা আমাকে সহজ করে তুলল। আমার হঠাৎ দুর্বলতার কথা তাকে বললাম। কিন্তু সেই অস্বাভাবিক বস্তু সম্বন্ধে কিছুই জানালাম না। অনাবশ্যক ভয়ে তাকে উত্যক্ত করার ইচ্ছা হল না।

আমি নিজে যে জ্ঞান লাভ করলাম তা অকল্পনীয়, মাথার মধ্যে অবিরাম আতঙ্কের সৃষ্টি করলাম। জাহাজ থেকে এই দ্বীপে নেমে আসা একজনের যে পরিণতি দেখলাম নিঃসন্দেহে বলতে পারি আমাদেরও ঐ ভয়ঙ্কর অবস্থা ঘটবে।

এরপর থেকে আমরা ঐ ঘৃণ্য খাদ্য ত্যাগ করলাম যদিও আমাদের রক্তের সঙ্গে তার প্রতি আকুল কামনা মিশে গেছল। বিষণ্ণতার দণ্ড আমাদের ভোগ করতে হল। দিনের পর দিন আমাদের দেহের ওপর ভীষণ ছত্রাকের দ্রুত সম্প্রসারণ হতে লাগল। কিছুতেই তাদের গতিরোধ করতে পারলাম না। আমরা মানুষ হয়ে গেলাম—। প্রতিদিনই চিন্তা কমে আসতে লাগল। কেবল—কেবল আমরা পুরুষ ও স্ত্রী হয়ে রইলাম।

দিন দিন বাঁচার লড়াই আরও ভয়ানক হয়ে উঠল। ভীষণ ছত্রাক খাবার দুরন্ত আগ্রহকে দমন করা কঠিন হয়ে পড়ল।

এক সপ্তাহ আগে আমরা শেষ বিস্কুট খেয়েছি। তখন থেকে মাত্র তিনটে মাছ ধরতে পেরেছি। আজ রাতে আমি মাছ ধরতে বেড়িয়েছি। কুয়াশার মধ্যে তোমাদের নৌকোটা আমার দিকে এগিয়ে এল। আমি তোমাদের ডাকলাম। বাকীটা জান। ভগবান তোমাদের আশীর্বাদ করুন, যে দয়া তোমরা এই পরিত্যক্ত জীবন দুটোর প্রতি দেখালে।

জলে ঝুপ করে দাঁড় পড়ার শব্দ—আর একটা। আবার সেই গলার স্বর —চারদিকের কুয়াশার ভেতর থেকে ভয়াবহ ও শোকার্ত স্বর শেষবারের মত শোনা গেল—

ভগবান তোমাদের মঙ্গল করুন। বিদায়।

বিদায়। ভাবাবেগে আকুল হৃদয়ে আমাদের গলার স্বর আড়ষ্ট।

দিনের আলো ফুটে উঠেছে। দিকচক্রবালে সূর্যরশ্মির ছটা সাগরের বুক চিরে জেগে উঠছে। কুয়াশায় তা নিষ্প্রভ। অনুজ্জ্বল আলোয় ফিরে যাওয়া নৌকোটার ছায়ারূপ দেখা যাচ্ছে। অস্পষ্টভাবে দেখলাম দাঁড়ের মাঝে কি যেন একটা তালে তালে দুলছে। সেটা একটা স্পঞ্জ ভেবেছিলাম—বড় ধূসর বর্ণের বাঁকান স্পঞ্জ। দাঁড় চলছে—নৌকোর মত সেগুলোও ধূসর দাঁড় ও তাদের সংযোগস্থল দেখার জন্যে বৃথাই আমার দৃষ্টি ফিরছে। হঠাৎ মাথার দিকে চোখ পড়ল। দাঁড়টা পেছনে টানার সময় মাথাটা সামনে ঝুঁকছে। আমার জলে দাঁড় পড়ছে—নৌকোটা দূরে চলে যাচ্ছে কিন্তু সেই বস্তুটা ওঠানামা করছে।

The voice in the night—*W. H. Hodgson*

অজানা আশঙ্কা

এ্যান্টনি কেলার রক্তশূন্য ও বিভ্রান্ত মুখে হোঁচট খেয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। তার পেছনের দরজাটা নিঃশব্দে বন্ধ করে দিল। মাত্র আধ ঘণ্টা আগে সে হেনরী মার্টলকে নিয়ে ঘরে ঢুকেছিল। মার্টল আর এখন ঘর থেকে বেরোবে না যতক্ষণ না তাকে বয়ে নিয়ে আসা হচ্ছে।

সে ঘড়িটা পকেট থেকে বার করে না দেখেই আবার পুরে রাখল। চেয়ারে বসে কম্পিত পা দুটোকে স্থির রাখার ও চিন্তা করার চেষ্টা করল। দরজা বন্ধ ঘরের মধ্যে ঢং ঢং করে নটা বাজার শব্দ হল। পরেরদিন সকালে মেয়েছেলেটি কাজ করতে আসার আগে তার হাতে এখনও দশ ঘণ্টা সময় আছে।

দশ ঘণ্টা! মনটা তার কিছু করতে চাইল না। অনেক কিছু ভাববার আছে, অনেক কিছু করার আছে। ওঃ ভগবান! যদি সেই দশ মিনিট আবার ফিরে আসত! যদি মার্টল না বলত এটা তার হঠাৎ আসা আর কেউ জানে না!

সে পেছনের ঘরে গিয়ে এক গেলাস মদ গিলে ফেলল। ঘরটা যে আগের মতই মনে হবে এটা তার কাছে অভাবনীয়। দেয়ালে কারুকার্য করা এমন সুন্দর ঘর, টেবিলের ওপর বইটা উপুড় করা—মার্টলের ডাকে সাড়া দিতে গিয়ে যেমন ছিল। এখনও সে তার ডাক শুনতে পাচ্ছে, এবং—

তার হাতের মধ্যে খালি গেলাসটা চাপে ভেঙে গেল। কেউ যেন দরজায় ধাক্কা দিচ্ছে? একমুহূর্তে দাঁড়িয়ে সে কাঁপতে লাগল। হাতের রক্ত মুছে নিয়ে ভাঙা কাঁচের টুকরোগুলো পা দিয়ে একবারে সরিয়ে দিয়ে অনড়ভাবে দাঁড়িয়ে রইল। আবার ধাক্কা দেওয়ার আওয়াজ, বেশ জোরে আর একনাগাড়ে মনে হচ্ছে পাশের ঘরের ব্লাস্তাটিকে জাগিয়ে তুলবে। সে এগিয়ে গিয়ে দরজা খুলে ফেলল। একজন বেঁটে, গাঁট্টা গোঁট্টা লোক ঘরে ঢুকতে সম্ভাষণ জানাল।

মনে হল তুমি যেন মারা গেছ! হ্যালো।

ভাঙা গেলাসে হাত কেটে ফেলেছি, বেশ কষ্টে উত্তর দেয় কেলার।

আহা! ওটা ত ব্যাণ্ডেজ করতে হবে! একটা পরিষ্কার রুমাল আছে?

সে দরজার দিকে এগোল। ঠিক সেইমুহূর্তে কেলার একলাফে তাকে ধরে টেনে নিয়ে এল! না, ওদিকে নয়!

ব্যাপার কি! হাঁ করে তাকিয়ে রইল লোকটি।

কেউ ওখানে আছে, এদিকে এস।

সে তাকে একরকম ঠেলে পেছনের ঘরে নিয়ে গিয়ে একটা চেয়ারে বসাল।

ধন্যবাদ। আমি ধূমপান করতে এসেছিলাম। বাইরের লোক তোমার

এখানে আছে তা জানতাম না। যাহোক আমার দরকার নেই, চলি। গুড নাইট।

কেলার তারদিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল। তার বন্ধুও তাকিয়ে, হঠাৎ চোখ দুটো তার জ্বলে উঠল, দুষ্টুমির হাসি হাসল।

ওর ভেতরে কি আছে? ঘরের দিকে আঙুল দেখিয়ে স্পষ্টভাবে সে জানতে চাইল।

কেলার ভয়ে পিছিয়ে গেল। না—না, কিছু না, কিছু— । সে তোতলাতে লাগল।

ও হো, ঠিক আছে। কিছু ভেবো না। ব্যাস আর একটি কথাও নয়। তোমার মত নিরীহ লোকেরা সবসময়ই খারাপ। একটু ভাল হও।

কেলারের পাঁজড়ায় ঠাট্টা করে একটা খোঁচা মেরে চাপা হাসি হেসে সে চলে গেল। দম বন্ধ করে কেলার তাকে গেট অবধি যেতে দেখল। তারপর ধীরে দরজা বন্ধ করে খিল দিয়ে পেছনের ঘরে ফিরে গেল।

আরো কিছু মদ গিলে তার করণীয় কাজের জন্যে সমস্ত স্নায়ু ও মনকে কঠিন করে তোলবার চেষ্টা করল। তার আতঙ্ক ও অনুতাপকে দূর করতে হবে, ঐ ঘরের বস্তুটির প্রতি তার ভয় কাটিয়ে তুলতে হবে এবং সেটা এমন জায়গায় রাখতে হবে যেন কেউ কখনও দেখতে না পায়। সে, এ্যান্টনি কেলার, একজন নিরীহ, সাধারণ নাগরিক, তাকে একাজ করতেই হবে।

পাশের ঘরের ছোট ঘড়িটায় দশটার ঘণ্টা বাজল। ন' ঘণ্টা তার হাতে আছে! পেছনের দরজা দিয়ে নিঃশব্দে বাইরে বেরিয়ে সাইকেল সেডের দরজার তালা খুলে ভেতরে উঁকি দিয়ে দেখল। ওঃ অনেক জায়গা।

দরজাটা খুলে রেখে বাড়ির ভেতরে এসে পড়ার ঘরের দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। দুবার সে খুব আস্তে হাতলটা ঘোরাল—আবার দরজা বন্ধ করল। মার্টলের দিকে দেখলে যদি সে তার দিকে তাকায়। সে হঠাৎ হাতলটা ঘুরিয়ে দরজা হাট করে খুলে ফেলল।

মার্টল বেশ শান্ত, নিরীহ ও শান্তিপূর্ণ। যদিও একটু দুঃখদায়ক। কেলারের মন থেকে ভয় দূর হয়ে হিংসা জেগে উঠল। মোটের ওপর মার্টল বেশ ভালই আছে। তার আতঙ্কগ্রস্ত জীবন নয়, কোন ব্যর্থ হতাশা ও ভয়ের জন্যে উৎকণ্ঠিত নয়। তার রক্তশূন্য সাদা মুখ ও চূর্ণ বিচূর্ণ মাথার দিকে চেয়ে কেলার তার সামনের বছরগুলো চিন্তা করতে লাগল। অথবা সেগুলো কমে কি সপ্তাহে দাঁড়াবে? একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে সে তার কাজে লেগে গেল। মার্টলের হাত দুটো ধরে টানতে টানতে শেডের ভেতরে নিয়ে গেল।

দরজায় তালা দিয়ে চাবিটা পকেটে রাখল। তারপর এক বালতি জল ও কয়েকটা তোয়ালে নিল। তার হাত থেকে তখনও রক্ত পড়ছে তবে সে এটাকে কায়দা করে অনেক কাজে লাগাবে।

এটা একটা ক্লান্তিকর সময়সাপেক্ষ কাজ কিন্তু অবশেষে তা শেষ হল। চেয়ারে বসে ভাবতে লাগল, চারিদিকে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগল কোথাও কিছু পড়ে আছে কিনা যা তার অপকর্মের সাক্ষ্য বহন করবে।

তখন মধ্যরাত্রি। টহলদারী পুলিশের যাতে নজর না পড়ে সেইজন্যে সে বাড়ির আলোগুলো তাড়াতাড়ি নিভিয়ে দিয়ে ওপরের ঘরে গেল।

শুতে যাওয়ার চিন্তা বাতুলতা মাত্র। গ্যাসের আলোটা কমিয়ে দিয়ে চেয়ারে বসে দিনের আলোর জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল। একটা চাপা উত্তেজনায় চেয়ারের ওপর কাঠ হয়ে বসে আড়াআড়িভাবে হাত দুটো ধরে কিছু শুনতে লাগল। এই গভীর রাতে নিস্তব্ধ বাড়িটায় নানারকম অস্পষ্ট অদ্ভুত অথচ মৃদু খুটখাট শব্দ, ঘষড়ানির সরসর আওয়াজ সে শুনতে লাগল। হঠাৎ যদি মার্টলের বিদেহী আত্মা বাড়ির মধ্যে ঘুরে বেড়াতে থাকে।

চেয়ার ছেড়ে উঠে ঘরের মধ্যে পায়চারী করতে লাগল। মাঝে মাঝে কিছু শোনার জন্যে হঠাৎ থেমে পড়ছে। সে দিব্যি গেলে বলতে পারে দরজার বাইরে যেন কিছু নিঃশব্দে ঘুরঘুর করছে। একবার হঠাৎ ঘুরে দরজার দিকে তাকাতেই মনে হল যেন হাতলটা ঘুরছে। এইভাবে কখনও বসে, কখনও ঘরের মধ্যে পায়চারী করে রাতটা কোনরকমে কাটিয়ে দিল। দূরে কোথাও মোরগের ডাক শোনা গেল, কিছু পরে নানা পাখির কলকাকলীতে দিনের সূচনা জানিয়ে দিল।

২

দিনের উজ্জ্বল আলো ফুটে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে তার মনে সাহস ফিরে এল। মন থেকে সবকিছু ঝেড়ে ফেলে দিয়ে কি করে জঘন্য পাপ কাজের পরিণতির হাত থেকে এড়িয়ে যাবে সেবিষয়ে চিন্তিত হয়ে উঠল। বাগানে গিয়ে শেডের চারপাশে ঘুরে দেখল। কোথাও কোন ছিদ্র বা ফাঁক না থাকায় তার গোপনীয় বস্তুর প্রকাশ হবে না ভেবে সে সন্তুষ্ট হল। বাগানের শেষ প্রান্তে গিয়ে চারদিকে একবার চেয়ে দেখল। একশ গজের মধ্যে কোন বাড়ি নেই আর গাছের আড়ালে বাগানের মাটি দেখা যায় না। দুধারে বেড়ার কোণে মাটি তুলে সে একটা সরু গর্ত করবে তারপর এর ওপরে ইট, পাথর, মাটি দিয়ে ঢিবি তৈরি করবে। একবার শুরু করলে শেষ করার সময় সে পাবে এবং দিন দিন নিজেকে নিরাপদ মনে করবে। ঢিবির ব্যাপারে নির্ভরতা ও স্থায়িত্ব সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না।

বাড়ির ঝি আমার ঠিক আগে সে বাগান থেকে ফিরে এল। তাকে গত রাতের দুর্ঘটনার কথা জানিয়ে হাতটা দেখাল। আমি যতটা পেরেছি পরিষ্কার করে দিয়েছি, সে জানাল।

মিসেস হোয়ে মাথা নাড়ল। আপনার ব্রেকফাস্ট খেতে খেতে আমি সব

দেখব'খন। রক্ত দেখে অজ্ঞান হয়ে থাকার মত লোক আপনি নন'

কফি ও বেকন এনে ডাইনিং টেবিলে রাখল। কেলার সেগুলোর সদ্ব্যবহার করছে আর উদ্বিগ্ন হৃদয়ে পাশের ঘরে হোয়ের কাজ করার শব্দ শুনছে। খাওয়া শেষ হলে চুরুট ধরিয়ে চিন্তা করতে লাগল। হঠাৎ হোয়ের আবির্ভাব হল। তাকে দরজায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে কেলারের মাথার সব ঘুলিয়ে গেল। কিছুক্ষণ সে বোবা হয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইল। সম্বিৎ ফিরে এলে জিজ্ঞেস করল, কি ব্যাপার ?

সাইকেল-শেডের চাবিটা, তার দিকে দৃষ্টি রেখে মেয়েটি বলল। আপনার সাইকেল পরিষ্কার করতে আমার কাছ থেকে দুটো ঝাড়ন নিয়েছিলেন।

কেলার এ পকেট সে পকেট হাতড়িয়ে ভাবতে লাগল। তারপর বলল, হুঁ, আমি কোথায় ফেলেছি মনে করতে পারছি না। আমি খুঁজে দেখব'খন।

আপনাকে বিশেষ ভাল দেখাচ্ছে না। আপনি যা ভেবেছেন তার থেকে হয়ত বেশী নিজেকে যন্ত্রণা দিয়েছেন।

কেলার কোন জবাব না দিয়ে মাথা নেড়ে মৃদু হাসল। সে চলে গেলে—চেয়ারে বসে শরীরের হাড় কাঁপুনি দমন করার চেষ্ট করতে লাগল। অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে মিসেস হোয়ের এদিক ওদিক চলাফেরার পায়ের শব্দ শুনছে। পেছনের দরজার সিঁড়ি পরিষ্কার করার আওয়াজ পেল। তার কিছু পরে একটা ঘস্‌ঘস্‌, করকর শব্দ কানে এল। প্রথমে সে কিছু খেয়াল করেনি। তখন এক-গোছা চাবি নাড়াচাড়া করার মৃদু শিঞ্জন-ধ্বনি শুনে লাফিয়ে উঠল—চাবি !

পাগলের মত চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে দরজার দিকে দৌড়ে গেল। মিসেস হোয়ে রিংয়ে আটকান একগোছা চাবি থেকে একটা চাবি সাইকেল-শেডের দরজার তালায় লাগিয়ে খোলবার চেষ্টা করছে।

থাম ! আতঙ্কগ্রস্ত স্বরে চীৎকার করে উঠল। থাম !

চাবির গোছা তার হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে ওপর দিকে ছুঁড়ে লুফতে লাগল আর তার দিকে বোকার মত চেয়ে রইল। তার চোখে ভয়ের লক্ষণ দেখে কেলার নিজের মধ্যে ফিরে এল। বলল, তালাটা নষ্ট করবে দেখছি। সত্যিই আমি চীৎকার করে ওঠার জন্যে দুঃখিত। সারারাত ঘুমোইনি, মন-মেজাজ খারাপ। স্নায়ুশূল। বুঝলে আমার স্নায়ুদৌর্বল্য হয়েছে।

মেয়েটির মুখ স্বাভাবিক হল। চোখের দৃষ্টিও কোমল হয়ে এল। সে একটু বিস্মিত হয়ে বলল, সকালে আপনাকে দেখেই বুঝেছিলাম আপনি সুস্থ নন।

সে বাড়ির মধ্যে চলে গেল কিন্তু কেলারের মনে হল যাবার সময় সে তার দিকে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখে গেল। মেয়েটি তার নিজের কাজ করে যেতে লাগল। দুএকবার কেলারের সঙ্গে চোখাচোখি হলে মেয়েটি ভীত হয়ে চোখ ফিরিয়ে নেয়। শেষে তার মনে হল যে সে একটু অদ্ভুত আচরণ করছে। বাড়ির

ভেতরে ও বাইরে এবং বাগানে যেখানেই সে ঘোরাঘুরি করছিল শেডের থেকে বেশী দূরে সে যাচ্ছিল না।

দুপুরের খাবারের সময়ের মধ্যে কেলার নিজেকে ঠিক করে তুলল। একটা বীয়ারের বোতল খুলে, চপগুলো ভাল হওয়ার জন্যে মিসেস হোয়েকে ধন্যবাদ জানাল। তারপর তার স্বামীর কাজের সম্বন্ধে নানা কথা বলতে লাগল। মেয়েটির মন থেকে কিছুটা ভয় চলে গেল কিন্তু সবটা নয়। কিছুটা স্বস্তি নিয়ে সে ঘর ত্যাগ করল।

কেলার খাবার পর কিছু সময় ডাইনিং রুমে বসে রইল। সেটা যেন তার ব্যতিক্রম। দু'একবার উঠে ভাবল একটু বেরিয়ে আসবে কিন্তু শেষটাই তাতে বাধা হয়ে দাঁড়াল। অরক্ষিত অবস্থায় এটা ফেলে রেখে যাবার ইচ্ছা হল না। শেষে দৃঢ় প্রয়াসে সংকল্পবদ্ধ হয়ে বাগানে সেই ঘৃণ্য কাজ আরম্ভ করার জন্যে নিজের শরীরটা টেনে নিয়ে চলল।

সে এবড়ো-খেবড়োভাবে গর্ত করতে লাগল কারণ হঠাৎ কোন লোক দেখলে কোন সন্দেহ করবে না। মাটি নরম ছিল। তার হাত জখম হলেও অনেকখানি কাজ এগিয়ে গেল। মাঝে মাঝে কাজ থামিয়ে দিয়ে কিছু শোনবার চেষ্টা করছিল, আবার একটু সরে গিয়ে শেডটার ওপর নজর রাখছিল।

চা পানের জন্যে একটু বন্ধ রেখে একটানা সাতটা অবধি কাজ করে গেল। সেসময় তাকে খেতে ডাকা হল। কায়িক শ্রম তার পক্ষে ভাল হল, তার চেহারাও স্বাভাবিক হয়ে উঠল। সে মিসেস হোয়েকে তার দুপুরের কাজের কথা বলে জানতে চাইল কোথায় ভাল গাছ পাওয়া যাবে।

সমস্ত পরিষ্কার করে রেখে হোয়ের বাড়ি ছেড়ে চলে যাবার পর আবার ভীতি তার ওপর ভর করল। আবার বাড়িটা ভূতুড়ে হয়ে উঠল এবং সাইকেল শেডটা অবর্ণনীয় আতঙ্কের জায়গায় পরিণত হল। যদি সে আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলে, দরজাটা খুলতে না পারে! মিটমিটে আলোয় প্রায় ঘণ্টাখানেক পায়চারী করে অন্ধকার নামার জন্যে অপেক্ষা করল।

অবশেষে অন্ধকার নামল। মনের সঙ্গে সংগ্রাম করে সমস্ত ভয় ও আতঙ্ক থেকে উত্তীর্ণ হয়ে বাগানের মালবাহী গাড়িটা টানতে টানতে শেডের কাছে নিয়ে এল। পকেট থেকে চাবি বার করল। একবার সামনের গেটের কাছে গিয়ে নিস্তব্ধ রাস্তার এদিক ওদিক দেখল। তারপর ফিরে এসে তালা খুলে ঘরে ঢুকল। আগেরদিন রাতে যে বস্তুটা রেখে গেছল টর্চের আলো ফেলে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে তার দিকে দেখল।

সামান্যতম শব্দও শোনার জন্যে কান খাড়া রেখে বস্তুটিকে টানতে টানতে বাইরে নিয়ে এল। গাড়ির ওপর তুলতে বেশ কষ্ট করতে হল। মরা কাঠ দেহটা বিপজ্জনকভাবে গাড়ির ওপরে ভারসাম্য বজায় রইল। মৃতের মুখটা তার দিকে। গাড়ির হ্যাণ্ডেলটা ধীরে ধীরে অথচ নিঃশব্দে মার্টেলের জন্যে তৈরি

কবর। জায়গায় নিয়ে এল।

গর্তের মধ্যে তাকে রেখে মাটি চাপা দিল। তারপর খানকুড়ি ইঁট সাজিয়ে গোলাকার ঢিবি তৈরি হল। তারও ওপর মাটি চাপিয়ে উঁচু করা হল। অনেকক্ষণ সে জায়গা ছেড়ে কেলার নড়ল না। তারপর ধীরে ধীরে সেখান থেকে শেডে গিয়ে দরজায় তালা লাগিয়ে বাড়ির ভেতর গেল।

দেহটার বন্দোবস্ত করে ফেলায় কিছুটা স্বস্তি বোধ করল। অনুতাপ হয়ত বা বিস্মরণের মধ্যে সে বেঁচে থাকবে। বাসন ধোয়ার কলে হাত পা ধুয়ে ডাইনিং রুমে ঢুকল। ওপরে কোন ছায়া দেখার ভয়ে ভারী পর্দাগুলো টেনে নামিয়ে দিল। তারপর ইজি চেয়ারে নিশ্চিন্ত হয়ে বসল। সমস্ত বোধশক্তি হারিয়ে যাওয়া পর্যন্ত সে মদ খেয়ে যেতে লাগল। তার সমস্ত শিরা উপশিরা নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ল। হাড়গোড়ের ব্যাথা দূর হল। সে গভীর ঘুমে ঢলে পড়ল।

৩

সকাল ছটায় ঘুম ভাঙল। টলতে টলতে উঠে গিয়ে পর্দাগুলো তুলে দিল গ্যাসের আলো নিভিয়ে দিল। তারপর ওপরে উঠে, শোবার বিছানাটা বিশৃঙ্খল করে রেখে বাথরুমে গেল। ঠাণ্ডা জলে স্নান করে, দাড়ি কামিয়ে, জামাকাপড় বদল করে শরীরটা বেশ ঝরঝরে মনে হল। সে সব জানালা দরজাগুলো খুলে দিল। সকালের বিশুদ্ধ বাতাসে সমস্ত বাড়ি ভরে উঠল। এই বাড়িরই বাসিন্দা হয়ে তাকে থাকতে হবে কারণ এ বাড়ি ছেড়ে যেতে সে সাহস পাবে না। অন্য লোকেরা তার এই ঢিবির বাগান হয়ত পছন্দ নাও করতে পারে।

মিসেস হোয়ের সতর্ক দৃষ্টিতে কেলার আবার নিজের মধ্যে ফিরে এল। মূল্যবান ঝাড়নগুলো সে এলে তাকে মৃদু হেসে কেলার ফেরত দিল। তারপর সাইকেলে চড়ে কাছাকাছি গাছপালা দোকানের মালিকের কাছে গিয়ে পাথরের টালি ও চারা গাছের অর্ডার দেবার জন্যে গেল। যতই দিন যায় ঢিবিটা আরো বড় ও জমাট হয়ে উঠছে। প্রত্যেকটা পাথর ও গাছে বসানোর সঙ্গে তার নিরাপত্তা বাড়তে লাগল। সে ভাল করে খেতে সুরু করল, আরো আশ্চর্যের ব্যাপার নিশ্চিন্ত আরামে ঘুম হল। কিন্তু প্রত্যেকদিন ঘুম ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে তার দুঃখও বাড়তে লাগল।

বাগানটা আর নিরিবিলি প্রমোদ উদ্যান রইল না। একবছর আগেও উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া যে বাড়িটা আনন্দ দিত এখন সেটা সারা জীবনের জন্যে যেন তার কাছে জেলখানা হয়ে রইল। সে এটা ভাড়াও দিতে পারবে না, বিক্রিও করতে পারবে না। সেই সর্বনাশা সন্ধ্যের পর থেকে ভয়ে আর খবরের কাগজ দেখে না পাছে মার্টেলের নিরুদ্দেশ সংবাদ তাকে পড়তে হয়।

এমন কি কোন বন্ধুর সঙ্গেও দেখাসাক্ষাৎ করেনি।

মার্টেল বেশ শান্ত প্রকৃতির ছিল। বাড়িতে অবাস্তব কিছু দেখা যায় না, চাপা শব্দ কিছু হয় না, রাতে বাগানে ছায়ামূর্তির দুপদাপ চলার শব্দও পাওয়া যায় না। স্মৃতিই একমাত্র তাকে জর্জরিত করে তুলেছে, কিন্তু এটাই যথেষ্ট।

তারপর সেই স্বপ্ন এল। বিভ্রান্ত ও অদ্ভুত স্বপ্ন, যা সাধারণত হয়ে থাকে। সে স্বপ্ন দেখল, তারার মিটমিটে আলোয় সে ঢিবির কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তার মনে হল সে দেখল একটা পাথর নড়ে উঠল। অন্য পাথরগুলোও তাই হচ্ছে। মাথার ওপরের একটা বড় পাথর টলতে টলতে নিচের দিকে নেমে আসছে। স্পষ্ট প্রতীয়মান হল ভেতরের কোন শক্তিতে সমস্ত মাটির ঢিবি ও পাথর কাঁপছে। কিছু যেন ভেতর থেকে বেরিয়ে আসবার চেষ্টা করছে। তখন তার মনে হল তাকে ওখানে কবর দেওয়া হয়েছে। এখানে বাইরে দাঁড়িয়ে থাকবার কোন প্রয়োজনই নেই। তার ভিতরে যাওয়াই উচিত। কি কারণে সে বুঝতে পারল না মার্টেলের প্রতি তার ভাতি জন্মাচ্ছে। সে যন্ত্রপাতি এনে কাজে লেগে গেল। এটা একটা দীর্ঘ ক্লান্তিকর কাজ। আরো এটা কষ্টকর হয়ে উঠল এই কারণে যে সে কোনরকম আওয়াজ করতে পারবে না। সে খুঁড়ছে ত খুঁড়ছেই কিন্তু কবর অদৃশ্য। হঠাৎ তখন তাকে যেন কিছু ধরল আর নিচে নামাতে লাগল—নিচে, আরো নিচে। সে নড়তে পারল না, চীৎকার করতেও পারল না।

একটা আর্তনাদ করে সে জেগে উঠল। দু'এক মিনিট শুয়ে ঠকঠক করে কাঁপতে লাগল। ভগবানকে ধন্যবাদ, এটা একটা স্বপ্ন। ঘরটা সূর্যের আলোয় ভর্তি। সে শুনতে পাচ্ছে মিসেস হোয়ে নিচে ঘুরে বেড়াচ্ছে। জীবনটা মধুর কিন্তু তবু যেন তার জন্যে কিছু সঞ্চিত আছে।

দশ মিনিট সে বিছানায় শুয়ে রইল। তারপর উঠতে যাচ্ছে এমন সময় সিঁড়িতে মিসেস হোয়ের ওপরে ওঠবার শব্দ পেল। তার হঠাৎ দরজায় ধাক্কা দেবার আগেই সে বিপদের গন্ধ পেল।

মিঃ কেলার! মিঃ কেলার!

কি ব্যাপার? তার গলার স্বর ভারী।

আপনার ঢিবি! আপনার সুন্দর মাটির ঢিবি! সমস্ত শূন্য!

শূন্য? চীৎকার করে ওঠে কেলার। লাফিয়ে বিছানা থেকে উঠে এক ঝটকায় দরজা থেকে ড্রেসিং গাউনটা নিল।

সমস্ত উপড়ে ফেলেছে! দরজা খুলে মিসেস হোয়ে বলল। আপনি কখনও এমন তালগোল পাকান আর দেখবেন না। সমস্ত জায়গাটা মনে হয় কোন বদ্ধ পাগলের কাজ।

যন্ত্রের মত পা দুটো স্লিপারে ঢুকিয়ে কেলার নিচে নেমে এল। দ্রুত বাগানে যেতে যেতে হাত নাড়িয়ে হোয়েকে আসতে বারণ করল। সেই ধ্বংসের

সামনে দাঁড়িয়ে দেখল চারিদিকে পাথর ও মাটি ছড়ানো। কিন্তু আসল জায়গাটা অক্ষত। একটা অজানা ভয়ে তার সর্বশরীর কাঁপতে লাগল। কে এমন কাজ করতে পারে? কেন এমন করা হল? হঠাৎ তার স্বপ্নের কথা মনে পড়ল। তাহলে স্বপ্নটা কি সত্যি! এখন সে আসল দোষী কে জানল।

পুলিশে কি খবর দিতে যাব? পেছন থেকে মিসেস হোয়ের কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

কেলার পাথরের মূর্তির মত তার দিকে চেয়ে রইল। আস্তে আস্তে বলল, না, অ-আমি নিজেই তাদের সঙ্গে কথা বলব।

কোদাল নিয়ে সে আবার ঢিবিটা ঠিক করার কাজে লেগে গেল। এক ঘণ্টা ধরে কাজ করার পর বাড়ির ভেতরে গিয়ে জামাকাপড় পরে ব্রেকফাষ্ট করল। সারাদিন ধরে কাজ করে সন্ধ্যের মধ্যে প্রায় সবটাই আবার তৈরি করে ফেলল। তারপর ভেতরে গিয়ে দীর্ঘ রাতের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল।

মানুষের সবচেয়ে বড় বন্ধু ঘুম এখন তার কাছে এক অকরুণ শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছে। গ্যাস-স্টোভে কফি তৈরি করে, কাপের পর কাপ কফি খেয়ে ঝিমুনি দূর করতে লাগল। বই পড়ে, সিগারেট খেয়ে, ঘরের মধ্যে পায়চারী করে সময় কাটাতে লাগল। সেই স্বপ্নের কিছুটা, যা সে একেবারেই ভুলে গেছল, তার মনের মধ্যে বারবার উঁকি দিয়ে তাকে বিব্রত করে তুলছে। সেই সঙ্গে তার নরকভোগের নিশ্চয়তা জানিয়ে দিচ্ছে।

তখন তার একমাত্র ভরসা ছিল কিছুদিনের জন্য বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়া, এত দূরে যে স্বপ্নেও এর কথা চিন্তা করতে পারবে না। আর হয়ত পারিপার্শ্বিক পরিবেশ তার মনকে সবল করে তুলতে পারে, সমস্ত ভ্রান্তিকে দূর করতে পারে। পরে হয়ত কিছুদিনের জন্যে বাড়িটা ভাড়া দিলেই চলবে তবে শর্ত থাকবে বাগানে কিছু অদল বদল করা চলবে না। এটা একটার পরিবর্তে আর একটা বিপদের ঝুঁকি নেওয়া।

দিনের আলো বেরোবার সঙ্গে সঙ্গে কেলার বাগানে গিয়ে বাকী কাজটা শেষ করে ফেলল। মিসেস হোয়ে এলে তাকে তার হঠাৎ চলে যাওয়ার কথা জানালো। স্নায়ুদৌর্বল্য ও ঘুমের অভাবের দরুণ তার রক্তশূন্যতা ও বিকৃত মুখ সত্য বলেই প্রমাণ দেয়।

সবকিছুই ঠিক হয়ে যাবে। আমি পুলিশকে বলব রাতে বাড়িটার ওপর নজর রাখতে. আমি গতরাতেই একজনকে বলেছি যেকোন জানোয়ার বা কাণ্ডজ্ঞানহীন লোকে ঢিবির ওপরের সুন্দর বাগানটা নষ্ট করে দিয়েছে। যদি আবার এরকম করে তার ফল পাবে। মিসেস হোয়ে জানাল।

কেলার একটু শিরশিরিয়ে উঠল কিন্তু বাইরে কিছু প্রকাশ পেল না। সে ওপরে উঠে ব্যাগ গুছিয়ে নিয়ে দুঘণ্টার মধ্যে এক্সিটারের উদ্দেশ্যে ট্রেনে রওনা

দিল। সেখানে রাতটা কাটিয়ে কর্ণওয়াল যাত্রা করবে।

সেখানে হোটেলে একটা ঘর নিয়ে রাতের খাওয়া সেরে একটু ঘোরবার জন্যে বাইরে বেরোল। রাস্তার লোকদের এমন কি গরিবদেরও দেখে কত সুখী, কত আনন্দময় মনে হল কেলারের। সকলেই মুক্ত, স্বাধীন। তারা খেয়ে ঘুমিয়ে জীবনের তুচ্ছ জিনিসের মধ্যেও আনন্দ উপভোগ করে। যুদ্ধ, হত্যা, হঠাৎ মৃত্যু এসব ব্যাপারে কোন ভাবনা চিন্তা নেই।

ডাইনিং রুমের ঝলমলে আলো ও হৈ চৈ তাকে আনন্দ দিল। তার চার-পাশে এত লোক দেখে একাকী রাত কাটাবার বিভীষিকা মন থেকে দূর হল, বুঝতে পারল যখন সে ঘুমোবে বাড়ি ভর্তি লোক থাকবে। একটা নতুন জীবনের আস্বাদ সে অনুভব করতে লাগল। একদল মানুষের মাঝে ভবিষ্যতে সে বাস করবে।

অনেক রাতে ওপরে উঠল। বিছানায় শুয়ে কিছুক্ষণ জেগে রইল। নিচের থেকে মৃদু শব্দ ভেসে আসছে। পাশের ঘরে কারোর চলাফেরার পদশব্দ শুনে নিরাপত্তার স্বস্তি বোধ করল। পরিতৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলে সে গভীর ঘুমে ঢলে পড়ল।

দরজায় ধাক্কা দেওয়ার আওয়াজে হঠাৎ তার ঘুম ভেঙে গেল। বিছানার ঠিক মাথার ওপরে শব্দটা হল কিন্তু চোখ থেকে ঘুম তাড়াবার আগেই সেটা বন্ধ হয়ে গেল। ভয়ে চারদিক তাকিয়ে দেখল, তারপর একটা বাতি জ্বালিয়ে চুপচাপ শুয়ে কান খাড়া করে রাখল। আওয়াজটা আর হল না। সে স্বপ্ন দেখছিল কিন্তু সেটা কি সে মনে করতে পারল না। অপ্রীতিকর কিন্তু অস্পষ্ট। শুধু অপ্রীতিকর নয় ভয়াবহ। কেউ যেন তার দিকে তাকিয়ে চীৎকার করছিল। —গলা ফাটিয়ে চীৎকার!

আগের রাতের ক্ষীণ আশা তার মন থেকে উবে গেল। সেই চীৎকার করছিল এবং পাশের ঘরের বাসিন্দার অদ্ভুত গোলমাল আসতে লাগল। সে কি বলেছিল? আর পাশের ঘরের লোকই বা কি শুনেছিল?

সে আর ঘুমোতে পারল না। নিচে কোথাও ঘড়ির ঘণ্টা বাজার আওয়াজ শুনল। বিছানায় এপাশ ওপাশ করছে আর ভাবছে তার জন্যে এখনও কত বাকী আছে।

অবশেষে প্রভাত হল। সে নিচে ব্রেকফাস্ট খেতে নামল। তখন বেশী সকাল হয়নি, মাত্র দুটো টেবিলে লোক বসে আছে। তার একজন বয়স্ক লোক মুখে খাবার ভর্তি করে তার দিকে অদ্ভুতভাবে তাকিয়ে আছে। অবশেষে সে কেলারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে জিজ্ঞেস করল, ভাল মনে হচ্ছে?

কেলার তার কম্পিত ঠোঁটে জোর করে মৃদু হাসি টানার চেষ্টা করল।

অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে থাকবার পর দরজায় ঘা দিই আমি ভেবেছিলাম আপনি হয়ত ভুল বকছেন। কয়েকটা কথা বারবার বলে চলেছেন—ছলনা,

সাক্ষাতিক,—ছলনা, সাক্ষাতিক। প্রায় একশবার আপনি একই কথা বলেছেন।

কেলার কোন কথা না বলে কফি শেষ করে একটা সিগারেট ধরিয়ে লাউঞ্জে গিয়ে বসল। সে মনখোলা ভাব হবার চেষ্টা করল কিন্তু সফল হল না। শেষে শহরে যাবার ট্রেনের সময় দেখে বিল মেটাবার জন্যে ঘণ্টা বাজাল।

৪

গ্রীষ্মের সন্ধ্যার অস্পষ্ট আলোয় কেলার ফিরে এল সেই নিস্তব্ধ বাড়িতে। বাড়ির চারদিকে নীরবতা নেমে এসেছে। আতঙ্কের ছায়া দূর হয়ে নিরবচ্ছিন্ন শান্তি বিরাজ করছে। তার মন থেকে সব ভীতি চলে গেছে, সেই সঙ্গে যন্ত্রণা ও অনুশোচনা থেকে সে মুক্ত। শান্ত ও স্থিরচিত্তে সেই মারাত্মক ঘরে ঢুকল। জানালা খুলে দিল। সেখানে বসে বাইরের শূন্য পানে চেয়ে তার ফেলে আসা জীবনের অস্পষ্ট ছবি মনের পর্দায় ভেসে উঠতে লাগল। কিছু ভাল, কিছু মন্দ, কিন্তু বেশীর ভাগই মাঝামাঝি। মার্টেলের সঙ্গে তার ভাগ্য জড়িয়ে পড়বার আগে পর্যন্ত তার জীবন ছিল অতি সাধারণ। সে একজন জীবন্ত মানুষ এক মৃতের সঙ্গে চিরবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে রইল।

ক্রমে অন্ধকার নেমে এল। গ্যাসের আলো জালিয়ে তাক থেকে একটা কাব্যগ্রন্থ নিয়ে এসে বসে পড়তে লাগল। এমন অন্তর্দৃষ্টি ও মূল্যায়ন করে এর আগে কোনদিন সে পড়েনি। কিছু অদ্ভুত রীতি তার সমস্ত বোধশক্তিকে মনে হল ধারাল ও পরিমার্জিত করে তুলল।

একঘণ্টা পড়বার পর বইটা রেখে দিয়ে ওপরে গেল। অনেকক্ষণ বিছানায় শুয়ে ভাবতে লাগল এবং যে সমস্যার এখনও সমাধান হয়নি তার বিশ্লেষণ করতে করতে ঘুমিয়ে পড়ল।

কিছুক্ষণ সে স্বপ্ন দেখতে লাগলাম—সুন্দর, সুখকর স্বপ্ন। তার মন সন্তুষ্টিতে ভরে উঠল। মনে হল স্বপ্ন মিলিয়ে গেলেও সন্তুষ্টি থেকে যাবে। সে আবার তার পুরনো অবস্থা ফিরে পেল।

এবার কিন্তু এটা অন্যরকমের। সে মাটি খুঁড়ছে কিন্তু ভয়ে ও আতঙ্কে নয়। সে খুঁড়ছে কারণ কে যেন তাকে বলেছে এটা তার কর্তব্য এবং এই কাজ করেই সে নিজেকে সংশোধন করতে পারে। আর এটা তার কাছে আশ্চর্যের ব্যাপার নয় যে মার্টেল তার পাশে দাঁড়িয়ে দেখছে। যে মার্টেলকে সে জানে এ সে মার্টেল নয় এমনকি রক্তাক্ত মরণাপন্ন মার্টেলও নয়—এ হচ্ছে পরম ও মহৎ মার্টেল। তার মুখে এক সমঝোতার দৃষ্টি যা কেলারকে কাঁদিয়ে তুলল।

এক বন্ধুত্বের অনুভূতি নিয়ে সে খুঁড়ে যেতে লাগল। তারপর হঠাৎ কিছু না জানিয়েই অন্ধকারের ভেতর থেকে সূর্যচ্ছটা বেরিয়ে এসে তার মুখের ওপর ছড়িয়ে পড়ল। অসহ্য সে আলো—হাতের কোদাল ফেলে দিয়ে আর্তস্বরে

দুহাত দিয়ে চোখ ঢাকল। আলো অস্তমিত হল—অন্ধকারের মধ্যে থেকে একটা গলার স্বর ভেসে উঠল।

সে চোখ খুলে দেখল এক অস্পষ্ট ছায়ামূর্তি তার থেকে গজখানেক দূরে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

আশাকরি আপনাকে আমি ভয় পাইয়ে দিই নি স্যার। আমি আপনাকে দু একবার ডাকলাম, তারপর ভাবলাম আপনি ঘুমের মধ্যে একাজ করছেন।

আমার ঘুমের মধ্যে, কেলার পুনরাবৃত্তি করল। হ্যাঁ।

এবং বেশ তালগোল পাকিয়ে ফেলেছেন, অমায়িক হাসিতে কনস্টেবল বলল। ভগবান! রোজ সকালে আপনি কাজ করছেন আর রোজ রাতে ভাঙছেন। আপনাকে চাৎকার করে ডেকেছি কিন্তু আপনি জেগে ওঠেন নি।



তার টর্চ লাইটের আলো কেলারের চোখ ধাঁধিয়ে তুলল। সে ধ্বংসস্তূপটা নিরীক্ষণ করতে লাগল। কেলার একপাশে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে—অপেক্ষা করছে।

ভূমিকম্প হয়েছে মনে হচ্ছে, বিড়বিড় করে বলল কনস্টেবল। টর্চের আলোটা সে একটা নির্দিষ্ট জায়গায় ফেলল। তারপর নিচু হয়ে আঙুল দিয়ে

মাটি খুঁড়ে সজোরে টানল। হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে কেলাবের ওপর আলো ফেলল, অন্য হাতে তার পকেট হাতড়াতে লাগল। কঠিন ও ভারিক্কি চালে সে বলল, আপনি কি শান্তভাবে আসবেন?

কেলাব ছুটে। হাত বাড়িয়ে তার দিকে এগিযে গল।

আমি শান্তভাবেই আসছি। ভগবানকে ধন্যবাদ।

His Brother's Keeper—*W. W. Jacobs*

রাতের সঙ্গী

টিক-টক টক—ইন্সপেক্টরের ডেস্কের পাশে টেবিলের ওপরে রাখা ছোট যন্ত্রটার শব্দ হচ্ছে। একটু পরেই থেমে গেল, মনে হল যেন প্রেরিত বার্তার কথা বলার জন্যে ভাবছে। চার্জরুম বেশ শান্ত, এত নির্জন যে ফায়ার প্লেসের মাথার ওপরের ঘড়িটার টক-টক-আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। সেইটা এবং ডেস্কের ওপর ইন্সপেক্টরের সামনে হলদে কাগজে কলমের খস খস শব্দ ছাড়া ঘরে আর কিছু শোনা যাচ্ছে না।

বাইরে ঝির ঝির করে বৃষ্টি পড়ছে, রাস্তা জনশূন্য। পুব থেকে পশ্চিমে লাইন দিয়ে আলোগুলো আরো নির্জনতা ফুটিযে তুলছে।

টিক-টক, টিক-টক, টিক-টক—যন্ত্রটা আরো উত্তেজিত হয়ে উঠল।

ইন্সপেক্টর সোজা হযে বসে শুনতেই চেয়ারটায় ক্যা-চ করে শব্দ হল।

দরজায় একজন কনস্টেবল দাঁড়িয়ে, সেও শব্দটা শুনতে পেল।

কি ব্যাপার, গিল? ইনসপেক্টর জানতে চাইল।

টিকোটি-টিকোটি টিক-টক—যন্ত্রটা বাজছে আর কনস্টেবল বার্তা লিখে নিচ্ছে:

সমস্ত ষ্টেশন শর্তাধীনে মুক্তিপ্রাপ্ত কয়েদী জর্জ টমাসকে গ্রেপ্তার করে আটকে রাখ। বয়স ৩৫ বছর, উচ্চতা ৫ ফুট ৮ ইঞ্চি, রঙ ও চুল কাল, চোখ বাদামী, ভদ্রলোকের মত চেহারা। গুদাম ডাকাতিতে সন্দেহ করা হচ্ছে। ওয়ালথামষ্টো ও ক্যানিং টাউন এটা বিশেষ করে নোট করে জানাও।

এস. ওয়াই.

এই মাঝ রাতে! হতাশায় চীৎকার করে উঠল ইন্সপেক্টর। আমি যা বেশ কয়েক ঘণ্টা আগে বলেছি এখন তা আমায় ডেকে বলছে। কি রসিকতা!

আশাহীনভাবে সে মাথা নাড়ল।

বাইরে পাতলা বৃষ্টির মধ্যে একজন লোক রাস্তা দিয়ে আসছে—হাত দুটো

পকেটে ঢোকাল, কোটের কলারটা ওপর দিকে তোলা, মাথাটা বুকে ঝোলানো। পা টেনে টেনে চলছে, বৃষ্টির জলে তার বুট জুতোর প্যাচ-প্যাচ শব্দ হচ্ছে, ষ্টেশনের কাছে আসতেই তার গতি কমে গেল। পুলিশকে দরজায় দাঁড়িয়ে থাকতে আশা করেছিল কিন্তু অনুপস্থিত।

সিঁড়ির ধাপের সামনে লোকটা একটু অস্বস্তিতে দাঁড়াল, দাঁত ঠিক করে ধীরে উঠতে লাগল।

চার্জরুমের খোলা দরজার সামনে প্যাসেজে আবার সে থামল· ।

টমাস সম্বন্ধে একটা অদ্ভুত ব্যাপার। আমি ভেবেছিলাম সে সৎ জীবন চালাবার চেষ্টা করছে, ইন্সপেক্টরের গলার স্বর ভেসে এল।

এটা তার স্ত্রীর জন্যে, স্যার, কনস্টেবল বলল। তারপর একটানা নীরবতা, কেবল ঘড়ির টক-টক আওয়াজ সে নীরবতা ভঙ্গ করছে।

তাহলে কেন তার স্ত্রী তাকে তালাক দিল?

সে করেছে, স্যার?

কনস্টেবলের স্বরে বিস্মিতভাব কিন্তু প্যাসেজে অপেক্ষমান লোকটি তা শুনতে পায়নি। রং করা দেয়ালে ঠেসান দিয়ে সে দাঁড়িয়ে আছে, একটা হাত তার গলায়, তার রোগা, দাড়ি না-কামানো সাদা মুখটা ময়লায় ভর্তি, ঠোঁট দুটো তার কাঁপছে।

সে তাকে তালাক দিয়েছে। তুমি তাকে জান?

একটু স্যার।

সুন্দরী মহিলা। টমাসের থেকে আরো ভালো লোককে বিয়ে করতে পারত।

আমার মনে হয় সে করেছে, নীরস কণ্ঠে কনস্টেবল বলল। তারা দুজনেই হেসে উঠল।

ওটাই কারণ তাই না? টমাসকে প্যাঁচ কষতে চায়, এ ধরনের কেস শুনেছি· ·· ।

প্যাসেজে অপেক্ষমান লোকটি গুটি গুটি পায়ে নিঃশব্দে বাইরে বেরিয়ে এল। তার সমস্ত দেহ কাঁপছে। শেষ ধাপে এসে সে প্রায় পড়ে গেছল, রেলিংটা ধরে সোজা হয়ে দাঁড়াল।

বৃষ্টি পড়ে চলেছে কিন্তু সেদিকে তার ভ্রূক্ষেপ নেই। সে আঘাত পেয়েছে, তার চলচ্ছক্তি লোপ পেয়েছে। সে ওয়ার হাউসে ডাকাতি করেছে কারণ তার উন্নতিসাধনের চেষ্টাকে সে হেসে উড়িয়ে দিয়েছে। সে ভাল হয়ে চলার চেষ্টা করেছিল কিন্তু সেই তাকে এই বাঁকা পথ ধরিয়েছে।· এবং যখন সব কাজ শেষ হয়েছে, পুরনো দক্ষতায় সে কোন সাক্ষ্য রেখে আসেনি, তখন সে সোজা পুলিশে গিয়ে খবর দেয় এবং তাকে তাড়িয়ে দেয়। কিন্তু সেটা কিছু না। স্ত্রীলোকেরা এরকম কাজ আগেও করেছে—হিংসাপ্রসূত অথবা কোন সামান্য

সত্যি বা কল্পনায় ভর করে পাগলের মত রাগবশত—কিন্তু এটা সে করেছে ইচ্ছে করে, বদমাইশি করে কারণ সে আমার থেকে অন্ত কোন লোককে বেশী ভালবাসত।

এখন সে আগ্রহহীন, সব ব্যাপারটা স্পষ্ট দেখছে, মাথা উঁচু করে তাড়াতাড়ি সে পা চালাল যেমন সে চলত যখন সে এক দালালের অফিসে জুনিয়রের কাজ করত আর তার স্ত্রী ছিল বালহামের এক নভেল-পড়ুয়া মেয়ে।

তার মুখের ওপর দিয়ে বৃষ্টির জল গড়িয়ে পড়ছে, সরু জ্যাকেটের কাফটা জলে ভিজে কব্জির সঙ্গে লেগে আছে, উরু থেকে পায়ের গোছ পর্যন্ত তার ট্রাউজারটা ভিজে গেছে। কমার্শিয়াল রোডে সে একটা দোকান জানে যেখানে চীজ, মাখন ও কাঠ বিক্রি হয়। সে এক পেনী দিয়ে একটুকরো পাউরুটি ও চীজ কিনেছিল। তার মনে পড়ছে কাউন্টারের পেছনে মহিলাটি একটা ভারী, নতুন শান দেয়া ছুরি দিয়ে চীজ কেটেছিল…দোকানের দিকে ঘুরে সে ব্যাপারটা ভেবে নিয়েছিল। ঐ ধরনের ছুরি সাধারণতঃ ড্রয়ারের ভেতর থাকে, টাকা-পয়সা রাখার জন্যে দোকানের কাউণ্টার সংলগ্ন দেরাজে, শুকনো শুয়োরের মাংস কাটার ছোট করাত, মিল্ক-টেষ্টার ও রবার ষ্ট্যাম্পের সঙ্গে থাকে। সে জানত দোকানের শাটার ফেলা থাকবে, দরজায় তালা দেওয়া থাকবে এবং দরজা ভেঙে ঢোকবার মত কোন যন্ত্রও তার নেই। তার ব্যক্তিগত জিনিসপত্তর পুলিশের হাতে, ভগবান জানেন কি করে ডিটেকটিভেরা সেগুলো পেল—কিন্তু এখন সে জানতে পেরেছে।

সে নিঃশব্দে ফোঁপাতে লাগল।

তবু একটা পথ নিশ্চয়ই আছে। ছুরিটা দরকার। তার শেষ সশ্রম কারাদণ্ডের সময় থেকে এখনও সে দুর্বল, তার হাত দিয়ে তাকে মারতে পারবে না, সে এত শক্তিশালী ও সুন্দর—ওঃ কি সুন্দর!

এলোমেলো চিন্তা করতে করতে সে দোকানের কাছে এল!

একটা ছোট রাস্তার ধারে দোকানটা। একটামাত্র আলো সমস্ত রাস্তাটাকে আলো দিচ্ছে। টিপ টিপ বৃষ্টির শব্দ ছাড়া আর কোন আওয়াজ নেই, কাউকে দেখাও যাচ্ছে না……। শাটার ফেলা দরজার ওপরে আলো যাবার একটা ছোট জানালা। সেটা দেখে সঙ্গে সঙ্গে সে জানল এটাই একমাত্র পথ। কখনও কখনও এগুলো আটকানো থাকে না। পায়ের আঙুলের ওপর ভর দিয়ে খুব সতর্কতার সঙ্গে জানালার তলার দিকের কাঁচের ফ্রেমের ওপর ভর দিয়ে উঠল। জানালার তাকের কিছুর সঙ্গে তার আঙুল ঠেকল—সঙ্গে সঙ্গে তার বুকটা লাফিয়ে উঠল। একটা চাবি…। সে ভেবেছিল এটা বুঝি একটা তালাবন্ধ দোকান। সে বেশ ভালভাবেই জানত এইসব ছোট দোকানের মালিকেরা এমনই অসতর্ক যে সহজেই যে-কেউ দোকানে ঢুকতে পারে সে ব্যাপারে কোন নিরাপত্তা নেয় না। সে চাবিটা নিয়ে তালা খুলে ভেতরে ঢুকে আস্তে আস্তে

দরজা বন্ধ করে দিল।

ঘরের ভেতরটা গরম ও গুমোট, নানা খাবারের তীব্র গন্ধ—চীজ, হ্যাস এবং জ্বালানী কাঠের গন্ধ। তার পকেটে একটা দেশলাই ছিল বটে কিন্তু সেটা স্যাঁতসেঁতে হওয়ার দরুণ জ্বলছে না। তাক হাতড়ে একটা দেশলাই পেল। একটা কাঠি জ্বেলে হাতচাপা দিয়ে আগুনটা নিভতে দিল না। দোকানটা ঝাঁট দিয়ে রাতের মত পরিষ্কার করে রাখা হয়েছে। দাঁড়িপাল্লার পাশে বাটখারাগুলো সুন্দরভাবে সাজান রয়েছে। খোলা মাখনের ওপর একটা মস্‌লিন কাপড় চাপা দেওয়া। কাউন্টারের ওপর চট করে নজরে পড়ে এমন একটা লেখা নোট রয়েছে। এতে ফ্রেডকে কিছু নির্দেশ দেওয়া রয়েছে—কাঁচা হাতে পেনসিলে বড় বড করে লেখা। সে আগুন জ্বালাবে, তার ওপর কেটলি বসিয়ে দুধ নিয়ে স্মিথকে পরিবেশন করবে।

ফ্রেড নামে ছেলেটা খুব সকালে আসে, তার জন্যেই চাবিটা রাখা হয়েছে। এটা লক্ষণীয় যে তার নিজের জন্যে এই নির্দেশগুলো কাজে লাগাল। কাঠির পর কাঠি জ্বালাতে লাগল, নতুন শান দেওয়া ছুঁচোল ভারি ছুরিটা খুঁজতে লাগল। এমনকি এত সহজে সে দোকানে ঢুকতে পেরে মনে মনে উৎফুল্ল হল এবং শিস দিয়ে গুন গুন করে গাইবার ইচ্ছাও হল।

সে ছুরিটা খুঁজে পেল। কাউন্টারের তলায় এটা ছিল। খবরের কাগজে ভাল করে জুড়ে নিল। তারপর তার খেয়াল হল সে ভীষণ ক্ষুধার্ত। খানিকটা চীজ নিল, কোন রুটি পেল না। কিন্তু একটা খোলা বিস্কুটের টিন দেখতে পেল।

হাতে খাবার নিয়ে, পকেটে ছুরি পুরে সে ঘরটা ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগল। দোকানের পেছনদিকে একটা ছোট বৈঠকখানা ঘর, দরজা খোলা। সে ভেতরে ঢুকল। একটার পর একটা দেশলাই কাঠি জ্বালাচ্ছে। একমুহূর্ত কি ভেবে গ্যাস জ্বালাল। এটা একটা ছোট্ট ঘর, সস্তা আসবাবপত্তরে সুন্দরভাবে সাজান। ম্যান্টেল-শেলফে কিছু চায়না জিনিস, দেয়ালে টাঙানো কিছু লিথোগ্রাফ এবং একটা বড় দেয়াল ঘড়ি। পুলিশ ষ্টেশনে একটা ঘড়ি আছে

মুখবিকৃতি করল, মনে হল যেন যে যন্ত্রণায় কাতর, হাত দিয়ে ছুরিটা অনুভব করে মৃদু হাসল।

ঘরের মাঝখানে একটা ছোট টেবিলে বসে সামনের দেয়ালের দিকে তাকিয়ে আনমনাভাবে খেয়ে গেল।

তার জন্যেই সে সব কিছু করেছে···তার প্রথম অপরাধ···ক্যাশ-বাক্স থেকে কয়েকটা মুদ্রা বার করে নেওয়া। সে-ই তাকে অনুপ্রাণিত করেছিল। তার সমস্ত পদক্ষেপের নিচে ছিল তার ছোটখাট বোকামি, সীমালঙ্ঘন ও অহঙ্কার।·

···দেয়ালের দিকে চেয়ে তার এই অধঃপতনের পথ খুঁজে বার করেছিল। বাইবেলের একটা ক্ষুদ্র অংশ ছাপা কাগজ দেয়ালে সাঁটা রয়েছে। এতক্ষণ ধরে সেটার দিকে সে চেয়েছিল, কালো এবং সোনালী, সবুজ এবং গাঢ় লাল

রঙে ছাপান কাগজটার তলায় বাঁদিকে স্পষ্ট লেখা যে এটা স্যাক্সনীতে ছাপা।

তার চিন্তাধারা ছিল বিস্তৃত কিন্তু অবান্তর সরুপথ দিয়ে চলতেই তার মন চাইল। উদাস দৃষ্টিতে সেদিকে সে চেয়ে রইল, অর্ধচেতন অবস্থায় তার চিন্তাধারাকে কেন্দ্রীভূত করার চেষ্টা করল। তার চিন্তাধারার অর্ধেক অতীতের গতিপথ অনুসরণ করছিল, বাকী অর্ধেক দেয়ালের কথাগুলোর অর্থ নিরূপণের চেষ্টা করছিল। যে কথাগুলো শুধু বড হরফে লেখা সেগুলো সে পডছিল:

তাকাও·· ভেড়া···ভগবান···নিয়ে নয়···পাপসমূহ···পৃথিবী।

ডাকাতির জন্যে তিন বছরের সশ্রম কারাদণ্ড, দুবার ছ মাস করে ভাঙাব ও ঢোকার জন্যে·· । সে তার হাতের কাছে···কয়েকবছর আগে সে গীর্জার সভা ছিল, একসঙ্গে গান করত, ধর্মীয় ব্যাপারে তার কাছে অর্থবহ ছিল। এটা অদ্ভুত লাগে কি করে একজন বয়স্ক লোকের কাছ থেকে সেগুলো অদৃশ্য হয়। কি করে বিশ্বাসের মধুর দীপ্তি মুছে যায়। মেরিলিবোনের এক রেজিষ্ট্রি অফিসে সে তাকে বিয়ে করেছিল। তারপর তাকে নিয়ে ব্রাইটনে মধুচন্দ্রিমা যাপন করতে গিয়েছিলাম। সে খুব ভালো করেই জানত যেভাবে তারা জীবন চালাচ্ছে সেভাবে চালাতে সে পারবে না। সে কখনও স্বপ্নে ভাবেনি যে মনিবের টাকা চুরির ব্যাপারটা সে বুঝতে পেরেছে; যখন ঠাণ্ডা মাথায় এবং কিছুটা কৌতুকের সঙ্গে সে তাকে জানাল তখন চমকে উঠল, থ' বনে গেল।

তাকাও·· ···ভেড়া·· ···

ধর্ম কি তাকে আশা দিতে পারত যদি সে শিক্ষাগুলোকে মেনে চলত? আস্তে আস্তে চাক্স ও বিস্কুট চিবোতে চিবোতে বাইবেলের অংশের দিকে চেয়ে সে ভাবতে লাগল।

কিছু দুধ দেখতে পেয়ে পান করে উঠে পড়ল। আলোটা নিভিয়ে দিয়ে কান খাড়া করে ধীরে ধীরে দরজার কাছে গেল। একটু দরজাটা ফাঁক করে উঁকি মেরে বাইরেটা দেখে নিল। কাউকে দেখা যাচ্ছে না। বাইরে বেরিয়ে দরজাটা তালা দিয়ে দিল। যেখান থেকে সে চাবিটা পেয়েছিল সেখানে রেখে দিল। তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে বড় রাস্তার দিকে চলল। তার প্রতিপদক্ষেপে নতুন শান দেয়া ছুঁচোল ভারী ছুরিটা তার উরুতে ধাক্কা লাগছে।

সে একটু অস্বস্তি বোধ করল এবং শুরু থেকে ব্যাপারটা চিন্তা করার চেষ্টা করল। সে ঠিক করল এটা সেই বাইবেলের অংশবিশেষ। আপন মনেই মৃদু হাসল। কিন্তু হঠাৎ তার হাসি স্তব্ধ হয়ে গেল—সে একা নয়।

অন্ধকারের মধ্যে একজন লোক দ্রুত, নিঃশব্দ চরণে তার পাশে পাশে চলেছে।

সে থেমে পড়ল, হাতটা তার পকেটে ছুরির ওপর চলে গেল।

কি চাও তুমি? রুক্ষ স্বরে জিজ্ঞেস করল।

কোন উত্তর নেই। তার মুখটা ছায়ার আড়ালে। কি কাপড় সে পরেছে,

কি ধরনের লোক সে, টমাস বলতে পারে না। শুধু এটুকু জানে যে দাঁড়িয়ে আছে সে বেশ লম্বা, চমৎকার দেহের গঠন, স্বচ্ছ গতি। তার দুজনে চুপচাপ, তারপর:

এস—রাতের আগন্তুকর মুখ থকে শব্দটা বেরিয়ে এল। ছিঁচকে চোরটাও কোন প্রশ্ন না করে তাকে অনুসরণ করল।

দুজনে নিঃশব্দে চলেছে। টমাস লক্ষ্য করল যেপথ সে ধরবে বলে মনে করেছিল সে পথেই সে এগোতে লাগল।

পরে আমি তোমাকে ছেড়ে চলে যাব, অদ্ভুত স্বরে তাড়াতাড়ি কথাগুলো সে বলল। আমি এর সব শেষ করব—শেষ—শেষ—।

এটা টমাসের কাছে অদ্ভুত বলে মনে হল, এ যেন তারই মনের অভিব্যক্তি। তার দৃঢ় প্রত্যয় জন্মাল, আগন্তুক সবকিছু জানে।

ও আমাকে ক্রমশ নিচের দিকে নামিয়েছে, তার পাশে চলতে চলতে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে টমাস বলল। একটা সরু রাস্তা ধরে তারা এগোতে লাগল, রাস্তাটা নদীর দিকে গেছে। প্রথম প্রথম এই আমাকে উদ্বগ্ন করে তুলত কিন্তু সে আমার বিবেকের টুঁটি টিপে ধরেছিল, আমার ভয়ে সে হেসেছিল আমি তোমায় বলছি—সে একটা শয়তান।

লোকেরা বলে, মেয়েটা আমাকে প্রলুব্ধ করেছিল। আগন্তুক মৃদুস্বরে বলল। তবু মানুষের একটা চিন্তা ও নিজের ইচ্ছা আছে।

টমাস মাথা নেড়ে তার কথায় সায় দিল।

সে কি অবস্থায় আছে, তা আমার জানার ইচ্ছে নেই। তাকে মারলে আমি আবার মানুষ হব। পকেটটা টিপে দেখল যে ছুরিটা ঠিকই আছে। আমাদের যদি ছেলেমেয়ে থাকত তবে ব্যাপারটা অন্যরকম দাঁড়াত। সে সন্তান ঘৃণা করে।

তার হাত থেকে যদি নিজেকে মুক্ত কর তবে আবার মানুষ হতে পারবে। আগন্তুক বলল। তার গলার স্বর মধুর গম্ভীর ও মর্মঘাতি।

হ্যাঁ, হাঁ, ঠিক বলেছ। এটাই আমি বলতে চেয়েছি। সে আমার পথের বাধা স্বরূপ। তাকে মারলে আমি আবার নতুন করে জীবন শুরু করতে পারব, কি পারব না? আমি সমস্ত লোকের সামনে দাঁড়িয়ে বলতে পারব—আমার অসৎভাবকে হত্যা করেছি, আমায় আর একটা সুযোগ দাও—দেখ! সে পকেট থেকে ছুরিটা বার করল। কাগজের মোড়কের ওপর বৃষ্টি পড়ার টুপটাপ আওয়াজ হচ্ছে। ছুঁচলো, রূপোর মত চকচকে ছুরিটা দেখবার ইচ্ছায় উত্তেজনায় তার হাত কাঁপছে।

আমি হাত দিয়ে তাকে মারতে পারব না, তাই ছুরিটা এনেছি। আমাকে একাজ করতেই হবে যদিও কোন কিছু মারা আমি ঘৃণা করি। যখন ছোট ছিলাম আমি একটা খরগোশ মেরেছিলাম। তার আতঙ্কে আমার বেশ

কয়েকদিন কেটেছে।

নিজেকে তার হাত থেকে মুক্ত করতে, আবার মানুষ হতে পারবে। আগন্তুক আবার একই কথা বলল।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক তাই বলছি—আমি ফিরে যেতে পারব—আমার জানা লোকদের মধ্যে। তারা জানে না আমি কত নিচে নেমেছি। টমাসের গলার স্বর ধরে এল।

তারা চলতে লাগল—একদিক থেকে আর একদিকে, বড় রাস্তা পার হয়ে, সরু গলির মধ্যে দিয়ে যেখানে ফলওলাদের গাড়িগুলো জড় করা, চাকায় চাকায় যেন বাধা, পোড়োজমির কাদার ওপর দিয়ে।

একটা সরু গলি দিয়ে যাবার সময় একধারা নদীর জল দেখা গেল। দেখল পাশাপাশি তিনটে বজরা নদীর ঢেউএর তালে তালে ওঠানামা করছে। মাঝ-নদীতে একটা ষ্টীমার দাঁড়িয়ে, তার তিনটে আলো মৃদুভাবে জ্বলছে।

আমি পেছনদিক দিয়ে বাড়ির মধ্যে ঢুকব, টমাস বলল। এক বুড়ি ছাড়া বাড়িতে আর কেউ নেই—অন্তত থাকা উচিত নয়। সামনের ঘরে আমার স্ত্রী ঘুমোয়।

তার হাত থেকে মুক্ত হলে তুমি আবার মানুষ হতে পারবে, আগন্তুক বলল।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ। অপরাধী অধৈর্য হয়ে উঠল। আমি তা জানি· আমি মুক্ত হলে । আনন্দে হাসতে লাগল।

সে তোমাকে অনেক নিচে টেনে নিয়ে গেছে, রাতের মানুষটি মৃদুস্বরে বলল। ভালোর জন্যে যা কিছু করতে গেছ, সে তোমায় পদে পদে বাধা দিয়েছে—।

ঠিক কথা—সেটাই সত্যি।

তুমি কখনও তার কাছ থেকে পালাতে পারবে না, তুমি কর্তব্যনিষ্ঠ, বিশ্বাসী এবং দয়ালু।

ভগবান জানেন তা সত্য, টমাস কাঁদতে লাগল।

ভাল অথবা মন্দের জন্যে, প্রচুর অথবা সামান্যের জন্যে—টমাসের মনে হল আগন্তুক একই সঙ্গে কথাগুলো বলে গেল।

অবশেষে তারা সেই রাস্তায় এসে পৌছল, অন্য রাস্তার থেকে আরো অন্ধকার, আরো জঘন্য।

একটা সরু রাস্তার সামনে এসে লোকটি দাঁড়াল, সেটা বাড়ির পেছন দিকে গেছে।

আমি এখন ভেতরে যাচ্ছি। তুমি আমার জন্যে এখানে অপেক্ষা কর। আমি ফিরে এলে আবার নতুন করে জীবন শুরু করব। খুব তাড়াতাড়ি তাকে মেরে আসছি।

রাতের লোকটি কোন উত্তর দিল না। টমাস সেই সরু রাস্তা ধরে চলে গেল। কাঠের বেড়ার মধ্যে দিয়ে আরো সরু একটা পথ দিয়ে ডানদিকে বেঁকে ভাঙাচোরা পেছনের গেটের সামনে এসে দাঁড়াল।

গেটটা খুলে সে ভেতরে ঢুকল। বাড়ির ফেলা ময়লায় ভর্তি একটা উঠানে এসে দাঁড়াল। একটা মুরগী কিছু উল্‌টে ফেলে দৌড়ে পালাল। একটা মোরগ জোরে ডেকে উঠল।

সে জানে পেছনের ঘরটা খালি। জানালাটা ঠেলে ওপর দিকে তুলল। একটু ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ হল। মোরগের আবার ডাকের জন্যে অপেক্ষা করল যাতে এই শব্দ ঢাকা পড়ে যায়। তারপর সে লাফিয়ে জানালা গলে ঘরের মধ্যে নামল। ছুরির ছুঁচলো মাথায় লেগে পাতলা কাপড়টা ছিঁড়ে গেল এবং সে পায়ে ব্যথা অনুভব করল।

পকেট থেকে ছুরিটা বার করে ধার পরীক্ষা করল। সেই সময় হঠাৎ সে সচেতন হয়ে উঠল ঘরের মধ্যে কেউ রয়েছে।

ছুরিটা চেপে ধরে অন্ধকারের মধ্যে বাড়িয়ে ধরে ফিসফিস করে বলল, কে ওখানে?

আমি। সে গলা চিনতে পারল, এ হচ্ছে সেইরাতের লোকটির গলার স্বর।

কি করে—কি করে তুমি ভেতরে ঢুকলে? সে বিস্মিত হতভম্ব হয়ে গেল।

আমি তোমার সঙ্গে এসেছি। এস, এই মেয়েটার হাত থেকে আমাদের মুক্ত করি—সে তোমাকে নিচে টেনে নামিয়েছে, সে আগাছার মত তোমার অন্তরের মহত্ত্ব প্রকাশ্যে ব্যাহত করছে।

হ্যাঁ, হ্যাঁ। টমাস ফিসফিস করে হাত বাড়িয়ে আগন্তুকের হাত ধরল। হাত ধরাধরি করে তারা দুজনে মেয়েটার ঘরে এল।

ঘরে একটা সস্তা দামের নাইট-লাইট জ্বলছে। সে বিছানায় শুয়ে আছে, একটা হাত ছড়িয়ে বিছানার বাইরে চলে গেছে, বুকটা নিঃশ্বাসের তালে তালে ওঠানামা করছে (সে কিছু দেখেছিল যা একঘেয়েমীভাবে উঠছে আর নামছে; সেটা কি? হ্যাঁ, নদীর ওপর বজরাগুলো)

সাধারণভাবে বলতে গেলে সে সুন্দরী, ঘুমন্ত অবস্থাতেও তার মুখে মৃদু হাসি লেগে আছে। লোকটার নড়াচড়া তার ঘুমের ব্যাঘাত ঘটাল—সে একটু নড়ে উঠে বিড়বিড় করে একটা নাম উচ্চারণ করল—এ নাম কিন্তু মাথার দিকে দাঁড়ান লোকটার নাম নয়, যার কম্পিত হাতে ধরা একটা ছুরি।

তুমি ওকে ভালবাস? আগন্তুকের গলার স্বর অনুচ্চ।

লোকটি মাথা নাড়ল। একসময়—আমি তাই ভাবতাম—কিন্তু এখন· ·আবার সে মাথা নেড়ে অসম্মতি জানাল।

তুমি কি ওকে ঘৃণা কর?

চোরটা সাগ্রহে ঘুমন্ত মেয়েটির দিকে তাকাল।

আমি তাকে ঘৃণা করি না, সাদাসিধেভাবে বলল। আমার কর্তব্য মনে করে তার পরিচর্যা করেছি।

এস—। আগন্তুক বলল। তারা দুজনে ঘর ছেড়ে চলে গেল।

টমাস দরজা খুলে দিল, তারা আবার বিষণ্ণ রাতের পথে এসে নামল।

আমি তাকে ভালবাসি না, আমি তাকে ঘৃণা করি না। অস্ফুট স্বরে টমাস বলল। আমি তার কাছে গিয়েছিলাম কারণ এটা আমার কর্তব্য। আমি কাজ করেছি ও চুরি করেছি—সে আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। আর আমি ভেবেছিলাম তাকে আমি মেরে ফেলব।

ছুরিটা তখনও তার হাতে।

নিঃশব্দে যেপথ দিয়ে তারা এসেছিল সেপথেই চলল যতক্ষণ না পর্যন্ত সেই সরু পথটায় এল যেটা নদীতে গিয়ে পড়েছে।

সেদিকে তারা ঘুরল।

রাস্তার শেষে কয়েকটা পাথরের সিঁড়ি, তার ওপরে জলের ছলাৎ-ছলাৎ-শব্দ তারা শুনতে পেল।

টমাস হাত তুলে ছুরিটা নদীর জলে ছুঁড়ে ফেলে দিল। সিঁড়ির ধাপ থেকে তাকে কে যেন সম্বোধন করল।

কে তুমি, কোল?

তার হৃৎস্পন্দন প্রায় বন্ধ হয়ে এসেছিল। গলার স্বর কঠিন ও খনখনে। ঘুম থেকে জেগে ওঠার মত পিটপিট করে দেখতে লাগল।

তুমি কি কোল—কে ওখানে?

টমাস সিঁড়ির কাছে একটা নৌকো দেখতে পেল, তাতে চারজন লোক। নদীর পাড়ে লোহার কড়ায় একজন নৌকোর দড়ি বাঁধতে ব্যস্ত।

আমি, চোরটা বলল।

এ কোল নয়, একজন বিরক্তির স্বরে বলল। কোল এসে পৌঁছবে না—সে মাতাল হয়েছে।

নৌকোয় ফিসফিস কথার শব্দ এল, তারপর একজন কর্তৃত্বের স্বরে বলল, চাকরী চাও, ছোকরা?

টমাস দুটো সিঁড়ি নেমে ঝুঁকে দেখল।

হ্যাঁ, আমি চাকরী চাই।

জোয়ার হাতছাড়া হয়ে যাবার জন্যে একজন কিছু বলল।

তুমি রান্না করতে পার?

হ্যাঁ, পারি।

বন্দীদশায় সে এই কাজ করেছিল।

লাফিয়ে ওঠ, কাল লেখাপড়া হবে। আমরা ভালপারাইসো যাচ্ছি তোমার মানানসই হবে ত?

টমাস নির্বাক।

আমি ফিরে আনতে চাই না—এখানে। সে বলল।

ফিরতি সময়ে আমরা ভাল লোক পাব—লাফিয়ে ওঠ।

সে টলতে টলতে নৌকোয় উঠল। পেছনের চাকার ওপর দাঁড়িয়ে অফিসার আদেশ দিল।

নৌকো ছেড়ে দিল এবং তখন চোরটার রাতের লোকটার কথা মনে পড়ল।

সে তাকে আগের থেকে আরো পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে। জলের ধারে ডাঙায় অন্ধকারে একটা দীপ্তিময় মূর্তি দাঁড়িয়ে রয়েছে।

টমাস তার মুখ দেখল সুন্দর ও সদাশয়, মৃদু আলোর আভা যেন তার চারপাশে ঘিরে রয়েছে।



তাকাও, নৌকোর লোকটা বিড়বিড় করে বলল। এটা অদ্ভুত, কি করে বাইবেলের ঐ অংশটা। বিদায়, বিদায়, মহাশয়।

বন্ধু, কার সঙ্গে তুমি কথা বলছ? যে নাবিকটা দাঁড় টানছিল সে বলল।

লোক—যে লোকটা আমার সঙ্গে ছিল। টমাস বলল।

তোমার সঙ্গে কোন লোক ছিল না, তুমি একাই ছিলে। নাবিকটা অবজ্ঞার সঙ্গে বলল।

The Man of the Night—*Edgar Wallace*

কবরের প্রেতাত্মা

২১শে অক্টোবর—আজ ওরা আমাকে অনিচ্ছাভরে ও স্নেহভরা কণ্ঠে বলল যে আমাকে কাল কোন এক ডাক্তার ক্রাইবারের বাড়ি যেতে হবে এবং তার তত্ত্বাবধানে যতদিন না সুস্থ হয়ে উঠি ততদিন আমাকে থাকতে হবে। স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার! হায় ভগবান! উনিশ বছরের এক স্বাস্থ্যবান ছেলের সঙ্গে আমার কোন তফাৎ নেই। আমার যতদূর স্মরণ হয় সাত বছর বয়সে একবার হাম হয়েছিল আর কয়েক বছর আগে সামান্য লাল ফুসকুড়িযুক্ত সংক্রামক জ্বর ছাড়া আর কোন রোগই হয়নি। হায়! স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার! না, এটা তাদের একটা পরোপকারিতা দেখানোর পরাকাষ্ঠা! যা তারা আসলে বলতে চেয়েছে: আমাকে যেতে হবে এবং এই ডাক্তার ক্রাইবারের সঙ্গে থাকতে হবে। সে যেই হোক না কেন, যতক্ষণ না পর্যন্ত সে, তারা এবং অন্য ডাক্তারেরা হালে যাদের তারা প্রায়ই আমাকে দেখাতে নিয়ে আসে, মনে করে যে আমি প্রকৃতিস্থ হয়েছি।

সেটাই প্রকৃত সত্য। মাঝে মাঝে আমি ভাবি—ক্রমে ক্রমে এই যে আমি নিঃসঙ্গ শৈশবাবস্থা থেকে বড হয়ে উঠেছি, এটা ভাবতে অদ্ভুত লাগে বাচ্চার কাছে সত্য বলা যত সোজা বড়োর কাছে তত কঠিন—সেটাই আমি এখন বুঝতে আরম্ভ করেছি। এ সত্ত্বেও, যদি আমার অভিভাবক এবং তার স্ত্রী আমাকে বলত—এ্যাব্জাস, আমরা ভীষণ দুঃখিত, ডাক্তারেরা ও আমরা তোমার বোধ-শক্তি যা হওয়া উচিত তা নয়, এবং ডাক্তার ক্রাইবার একজন বিশিষ্ট মানসিক চিকিৎসক; এব°—সেটা হয়ত আমার বেশী ভাল লাগত।

সত্যিই যদি তারা আমাকে পাগল মনে করত, তখনও কিন্তু আমাকে সেকথা বলতে পারেনি। তারা তাই করছিল। আমি জানি—আমি একবার নয় হাজারবার দেখেছি, দুবছর আগে আল্‌ট-না-শীয়েল থেকে এখানে লণ্ডনে আসার পর থেকে (হায়! কখন আবার দেখব কুয়াশায় ঢাকা পাহাড়!) মেলায় রঙ্গ দেখার মত এখানকার লোকেরা আমার দিকে তাকিয়ে থাকে। তাদের মুখ দেখেই তাদের বিহ্বল করা দৃষ্টি ধরা পড়ে, তাদের ভুরু কুঁচকে ওঠে, তাদের ঠোঁটগুলো আস্তে আস্তে চুপসে যায় অথবা মানিব্যাগের মুখের মত সঙ্কুচিত হয়ে ওঠে। যদি তারা ভাবে আমি তাদের দেখছি না—তারা পরস্পরের দিকে তাকিয়ে নীরবে মাথা নাড়ে ও দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

আমাকে পাগল মনে করার পেছনে তাদের তিনটে ব্যাপার আমার নজরে পড়ে। এক, আমি খুব নির্জনতা পছন্দ করি, সবসময়ে একা একা থাকতে ভালবাসি। আর একটা, আমি খুব চিন্তা করি যেমন খুব পড়াশোনা করি,

কখনও চিন্তায় আমার ভুরু কুঁচকে ওঠে, কখনও আপন মনে হাসি, তাদের দিকে চেয়ে চীৎকার করে উঠি। যখন রাতের খাওয়া দাওয়ার পর মেজর কেনেডি টাইমস ম্যাগাজিন পড়ে, মিসেস কেনেডি বোনা নিয়ে ব্যস্ত থাকে, তখন আমার এরকম ব্যবহার তাদের কাছে অদ্ভুত লাগে—এটাও কারণ হতে পারে। কোন কিছু ভেবে হয়ত আমি মজা পেয়েছি, তখনই আমি খুব জোরে হাসতে থাকি —কেনই বা হাসব না, যখন কোন মজার ব্যাপার দেখে বা ভাবে তখন কি কেউ হাসে না? আর ঠিক সেইসময় কেনেডি হঠাৎ বই ফেলে চেয়ার থেকে লাফিয়ে ওঠে—সত্যি সত্যিই লাফিয়ে ওঠা যাকে বলে। লণ্ডনে আমার এমন অনেক লোকের সঙ্গে দেখা হয়েছে যারা একটু হাসির ইঙ্গিত পেলেই হাসতে থাকে।

এই হচ্ছে দুটো কারণ। আর তৃতীয় কারণটা হচ্ছে—আমার মনে হয় দুএকবার তাদের বলেছি যেমন ডাক্তারদেরও বলেছি—আমি মাঝে মাঝে কিছু দেখি যা সাধারণ মানুষেরা দেখে না বা দেখতে পায় না। যেমন প্রথমবার আমি বলেছিলাম, আল্‌ট-না-শীয়েল-এ আমি বার কুড়ি অশরীরী প্রেতাত্মা দেখেছি। তারা আমার দিকে এমনভাবে চেয়ে থাকত যেন আমি মিথ্যে কথা বলছি, তারা অদ্ভুত অস্বস্তিতে আমার দিকে দেখত। আমার বুড়ি নার্স মার্গারেট ল্যাণ্ড এবং বাবার বুড়ো চাকর ডুনাল্ড গ্রায়ামকে এসব বললে তাদের কোন পরিবর্তন দেখতাম না। মনে হত আমার এসব কথা বলার অর্থ বুঝতে এবং উপলব্ধি করার চেষ্টা করছে।

আমি আজ ভাবছি তোমার অভিভাবক এবং তাঁর স্ত্রীর কথা শোনার পর থেকে—বেচারা, তাঁর সেই মিলিটারী ধরনের কথা ও স্ত্রীর কান্নার মধ্যে দিয়ে। আমার ফেলে আসা জীবনের কথা প্রথমে শিশু অবস্থায় তারপর বালকের বয়সে। স্ট্রাথার্ন পর্বতমালার মধ্যে আল্‌ট্-না-শীয়েল একটা নির্জন সঙ্কীর্ণ উপত্যকা, রেলপথের দিক দিয়ে এটা একটা বড় পথ। সেখানে আমার বাবা অ্যাঙ্গাস ম্যাকইণ্টায়ার, ঠিক আমার মত—বিয়ে করার পর মাকে নিয়ে সেখানে বাস করতে গিয়েছিলেন। আমার জন্মাবার ঠিক পরেই আমার মা মারা যান। আমার বাবা খুব পড়ুয়া ছিলেন এবং মা মারা যাবার পর থেকে দিনরাত বই মুখে পড়ে থাকতেন। ডুগাল গ্রায়ামের সাহায্যে মার্গারেট ল্যাণ্ড আমায় মানুষ করে তুলেছিলেন। কিন্তু আমার হাঁটতে শেখার পর থেকে মুক্ত প্রকৃতিই আমার সত্যিকারের নার্স ও মা হয়েছিল। উন্মুক্ত পরিবেশে আমি যেখানে সেখানে সারাদিন ধরে বসে থাকতাম—অসীম আকাশ পানে তাকিয়ে, প্রকৃতির নানা বিচিত্র শব্দ শুনে, ঝোপ-ঝাড়, লতা-গুল্মের বন্য গন্ধ শুঁকে আমি সন্তুষ্ট থাকতাম। সেই পেছন পানে তাকিয়ে আমি মনে করতে পারছি না কখন আমি সেইসব জিনিস দেখতাম যা অপরে দেখে না। যা দেখেছি তাতে কখনই আমি ভয় পাইনি।

সেই থেকে এখনও পর্যন্ত আমি দেখি তবে বেশ সময় অন্তর। আমার সতের বছর বয়সে বাবা মারা গেলেন। একজন দূর সম্পর্কের আত্মীয় মেজর কেনেডি আমার অভিভাবক হলেন। একুশ বছর বয়স পযন্ত আমাকে তাঁর সঙ্গে থাকতে হয়েছিল। তাই আজ আমি বেজওয়াটারে মেজর কেনেডির বাড়িতে আমার ঘরে বসে ডায়েরীতে এই কথা লিখছি এবং কেন আমাকে কাল উইমব্লেডন কমন-এ ডাক্তার স্ক্রাইবারের সঙ্গে আমাকে থাকতে হবে। খুব সম্ভব এটা আমি লিখছি তার কারণ, যতদূর আমি জানি, আমার পরিপূর্ণ স্বাধীনতার আজই শেষ দিন। এইসব প্রাইভেট পাগলা-গারদের কি নিয়ম তা আমি জানি না—অবশ্যি আমি যেখানে যাচ্ছি যদি সেট তাই হয়।

২

২৩শে অক্টোবর—গতকাল দুপুরে ডাক্তার উইকিনসনের সঙ্গে ডাক্তার স্ক্রাইবারের বাড়ি এসেছি। শেষ ক দিন এই ডাক্তার আমাকে প্রায়ই দেখতে আসতেন। কেনেডি পরিবারের সঙ্গে আমার এই বিচ্ছেদ ঠিক যেন ছেলেদের স্কুল বোর্ডিংএ যাওয়ার মত। মেজর কেনেডি অন্তত ছ বার আমার সঙ্গে হ্যাণ্ড-সেক করেছেন আর মিসেস কেনেডি কেঁদেছেন। বেজওয়াটার থেকে উইমব্লেডন আসার পথে আমি ও ডাক্তার উইকিনসন ফুটবল খেলার কথা নিয়েই সময় কাটিয়েছি, আমি জানতে পেরেছি তিনি অক্সফোর্ডের ব্লু, বছরটা আমি ভুলে গেছি।

ঠিক উইমব্লেডন কমন-এ নামবার আগে আমি ঠিক করেছিলাম ডাক্তার উইকিনসনের সঙ্গে আমার সোজাসুজি কিছু কথা হওয়া উচিত।

দেখুন স্যার, আমি বললাম। আপনি, ডাক্তার গর্ডন এবং মেজর ও মিসেস কেনেডির সঙ্গে একমত হয়ে ভাবেন যে আমি পাগল ?

আমার মনে হয় ডাক্তার স্ক্রাইবারের কাছে কয়েকমাস থাকলেই তুমি নিখুঁত স্বাস্থ্য ফিরে পাবে।

আচ্ছা, এককথায় যখন সত্যিটা বলা এত সহজ তখন কেন লোকেরা সেটা এড়িয়ে যায় ?

ওঃ, কেন তারা বলে না ? আমি নিজেও সেটা মাঝে মাঝে ভাবি।

অথবা আবার দেখুন, যদি একজনের নিজের ত্রুটি না থাকা সত্ত্বেও কোন গুণ বা ক্ষমতা না থাকে, যা অন্য লোকেরা, প্রায় সব লোকেরাই, অধিকারী হয় না—তারা সেই গুণ বা ক্ষমতাকে অদ্ভুত বলে ভাবে কেন ?

তিনি ব্যাপারটা না জানার মত মাথা নাড়লেন। আমি গভীর ও চিন্তাশীল ভাবনায় ডুব দিলাম। অবশেষে তিনি জানতে চাইলেন আমি কিসের চিন্তা করছি।

আমি ভাবছি স্যার, সেই মধ্যযুগীয় চিকিৎসকদের মত আপনি কিভাবে

প্রশংসনীয় দক্ষতা দেখাতেন, যদি কোন শক্তিশালী রাজা বা রাজনীতিবিদ চাইতেন তাদেব কোন শত্রুর হাত থেকে বাঁচাতে এবং তারা যদি তাদের পাগল বলে ঘোষণা করে অন্ধকার ঘরে বা গুপ্তকক্ষে রেখে দেবার জন্যে বলত—।

শোন বাছা, তুমি ডাক্তার স্ক্রাইবারের বাড়িতে কোন অন্ধকাব ঘর দেখতে পাবে না। হাসতে হাসতে সে বলল। এই যে এসে গেছি, তুমি নিজের চোখেই দেখতে পাবে।

ঘোড়ার গাড়ি থেকে নেমে চারদিক দেখতে লাগলাম। একটা পুরনো ধরনের লাল ইটের বাড়ি। চারিদিকে লতানে গাছ দিয়ে পাঁচিল ঢাকা। সবুজ লনের মাঝে বাড়িটা, নানা ফুলেব গাছে ঘেরা, শরতের কোটা ফুলে গাছ ভর্তি। গারদের মত কিছু আছে বলে সন্দেহ হয় না, তার বদলে মুক্তি ও স্বাধীনতার রূপ ফুটে উঠেছে। আমার প্রথম দর্শনেই বেজওয়াটারের সঙ্গে এর তুলনা করতে বাধ্য করল।

ডাক্তার স্ক্রাইবার বেরিয়ে এসে আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এলেন। তিনি কমবয়সী লোক, বোধহয় পঁয়ত্রিশ কি চল্লিশ বছর বয়স—লম্বা, স্বাস্থ্যবান, চওড়া কাঁধ, তামাটে রং এবং হাসি খুশি ভাব। তাঁকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন পেশাদার ক্রিকেট খেলোয়াড়ের মত সাজ-পোশাকে ফুল বাবু—কিন্তু তিনি যে প্রাইভেট পাগলা গারদের মালিক সেটা বিশ্বাসই হচ্ছিল না। তিনি বেশ বন্ধুত্বপূর্ণভাবে আমাকে স্বাগত জানালেন। তারপর ডাক্তার উইকিনসন আমাকে বাড়ি ও বাগানটা ঘুরিয়ে দেখাতে লাগলেন। কেবল বাড়ির কয়েকজন চাকর ও মালীকে লনের শুকনো পাতা ঝাঁট দিতে ছাড়া আর কাউকে দেখতে না পেয়ে আমি কিছুটা বিস্মিত হয়েছিলাম।

কোথায় স্যার, আর বাকীরা? আমি জানতে চাইলাম।

বাকা কারা? তিনি আশ্চর্য হয়ে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন।

আপনাদের বাকী পাগল লোকেরা? আমাকে এখানে পাঠান হয়েছে কারণ তারা মনে করে আমি পাগল।

তিনি খুব জোরে হেসে উঠে আমার পিঠে একটা চাপড় মারলেন।

আরে বুড়ো ছেলে, ছেড়ে দাও ওসব কথা। এখানে কেউ নেই শুধু তুমি, আমি, আমার এ্যাসিষ্টান্ট পোলার্ড যে একজন সত্যি ভাল এবং চাকর-বাকরেরা। তুমি এখানে বাতাসের মত মুক্ত এবং যদি সম্পূর্ণ সময় তোমায় দিতে না পারি তবে সেটা আমার দোষ।

এরপর আমরা গলফ খেলার কথায় চলে গেলাম। আজ, তার রুগী দেখার পর, তার বেশ ভালই পশার আছে মনে হল, আমরা সন্ধ্যের আগে পর্যন্ত পুরো চক্কর খেলার সময় পেলাম। তিনি আমাকে দুই একে হারালেন।

৩

২৭শে অক্টোবর—এখনও পর্যন্ত আমি এখানে বেশ সুখেই আছি। এই বাড়িতে এবং ডাক্তার ক্লাইবারের সঙ্গে জীবন বেশ আনন্দেই কাটছে। আমার মনে হয় যত লোকের সঙ্গে আমি মিশেছি ইনি তা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা ধরনের। আমি প্রায়ই তাঁর সঙ্গে তাঁর গরীব রুগীদের দেখতে যাই। তাদের সমস্ত নালিশ তিনি হেসে উড়িয়ে দেন। আমি একথা বলছি না যে তিনি তাদের ঠাট্টা করেন, সংক্রামক ব্যাধির মত তাঁর প্রফুল্লতা তাদেব সব দুঃখ কষ্ট দূর করে। সত্যিই তিনি এক মহৎ লোক!

গতরাতে খাওযা দাওযার পর তিনি এবং আমি বিলিযার্ড খেলছিলাম। কিন্তু কিভাবে জানি না, লোকেরা আমার সোহাবেশ ব্যাপারে কি বলে সেই কথায় আমরা এসে পৌছলাম। আমরা বসে পড়লাম। এই প্রথম আমি তাঁকে এব্যাপারে কথা বললাম। তাঁকে বললাম আমি কিছু দেখেছি—বিশেষ করে আর্ডনা সোনাকের গীর্জায় করণিকের প্রেতাত্মা (যদি প্রেতাত্মা হয)। যেন তিনি তাঁর কানকে বিশ্বাস করতে পারছেন না। এভাবে না দেখে (যেমন মেজর কেনেডি দেখতেন) অথবা তাচ্ছিল্যভরে মাথা না নেড়ে (যেমন ডাক্তার উইকিনসন করতেন), তিনি গভীর মনোযোগের সঙ্গে শুনে একগাদা প্রশ্ন করলেন আমাকে। আমার সম্বন্ধে বা আমি ঘৃণা করি এরকম প্রশ্ন নয়, বেশ বিচক্ষণের প্রশ্ন।



জানেন, সেগুলো কোন প্রবঞ্চনা নয়। আমি সেসব দেখেছি—তাদের দেখেছি! আপনি আমায় বিশ্বাস করেন?

হ্যাঁ, আমি বিশ্বাস করি। দেখ, এখানে থাকাকালে তুমি যদি কিছু দেখ,

ঠিক সেই আমার কাছে এসে জানাবে। এস, শুতে যাবার আগে আর একশো খেলা যাক।

৪

৪ঠা নভেম্বর—আমি এই পুরনো বাড়িটার ভেতর ও বাইরে একটু উৎসাহের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে দেখছি। দিন দুই আগে ডাক্তার ক্রাইবার বলেছিলেন এটা একসময় (এক শতক বা তারও আগে) এক বিখ্যাত কূটনীতিজ্ঞ ব্যক্তির বাসা-বাড়ি ছিল। আমার মনে হয় এটা জর্জ সম্রাটগণের রাজত্বের গোড়ার দিকে তৈরি, সুন্দর বড় বড় ঘর, অনেকগুলোর দেয়ালে উঁচু পর্যন্ত ওক কাঠের প্যানেল করা। একটা ঘর, আগে যেটা লাইব্রেরী ছিল এখন ডাইনিং-রুম হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে, অন্য ঘরের থেকে সেটাই আমাকে বেশী আকৃষ্ট করেছে। এঘরে বাগানের দিকে মুখ করে চারটে সরু মত উঁচু জানালা আছে। অদ্ভুত অথচ মনোরম পুরনো ওক কাঠের ফার্নিচার (যেগুলো ডাক্তার ক্রাইবার টাবেলনামীয় তাঁরই পেশার একজন পূর্ববর্তী লোকের কাছ থেকে নিয়েছিলেন, যিনি ডাক্তারের কথা অনুযায়ী একজন চতুর লোক ছিলেন) এ ঘরের রূপ ও বৈশিষ্ট্য বাড়িয়েছে। ঐ যে ফায়ার প্লেসের কাছে লম্বা ওক কাঠের বেঞ্চিটা রয়েছে শীতকালের ঠাণ্ডায় ওতে বসে আগুন পোহাতে বেশ ভাল লাগবে।

৫

১৭ই নভেম্বর—কিছু ঘটল না।

সেই গতানুগতিক ও নীরস ব্যাপার কিন্তু ব্যাখ্যা সমেত তিনটে শব্দ বেশী অর্থবহ। সত্যি বলতে কি আমার অদ্ভুত অনুভূতির (আলাদা বোধশক্তি মনে হয়) আবার প্রকাশ ঘটল। পাঁচ বছর আগে এমন হয়েছিল যখন ডালনারোসি গীর্জার কাছে আমি পরীদের দেখেছিলাম।

গতকাল বিকেল পাঁচটা নাগাদ আমি একা ডাইনিং রুমে লম্বা বেঞ্চিটার এককোণে বসে আছি। সেসময় ডাক্তার ক্রাইবার লণ্ডনে গেছেন এবং মিঃ পোলার্ড রুগী দেখতে গেছেন। ফায়ার প্লেসের আগুন ছাড়া ঘরে আর কোন আলো ছিল না। আগেরদিন ডাক্তারের ষ্টাডিরুম থেকে একটা পুরনো অদ্ভুত ধরনের বই পেয়েছিলাম। লাঞ্চ খাওয়ার পর থেকে বেশীর ভাগ সময় এই বইটা পড়ে কাটাচ্ছি। চোখ বন্ধ করে গদীতে হেলান দিয়ে বসে আছি, ভাবছি আমি কি পড়লাম আর উপভোগ করছি অপ্রচুর আলোয় ভরা ও ছায়াঘেরা ঘরের শান্ত পরিবেশ। হঠাৎ আমার বোধ হল আমি একা নই। বোধশক্তিটা এতই প্রবল ও গভীর যে পুরো এক মিনিট আমি নিথর হয়ে গেলাম। অবশেষে চোখ খুললাম এবং নিঃসন্দেহে বুঝতে পারলাম আমি কিছু দেখতে পাচ্ছি।



আমি যা দেখলাম তা এই :

আমার থেকে কয়েক ফুটের মধ্যে বড কার্পেটের ওপব দাঁড়িয়ে এক যুবক আমারই বয়সী কি কিছু বেশী। লম্বা, সামনের দিকে ঝুঁকে এক অশরীরি প্রেতাত্মা। তার পোশাক পরিচ্ছদ আধুনিক—কালো কোট, ওয়েষ্ট কোট এবং ষ্ট্রাইপ দেওয়া ট্রাউজার—হাত দুটো পকেটে ঢুকিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে, ইটন ছেলেদের মত ঢঙে—কিছুটা জবুথবু ভাব। মাথাটা তার সামনে ঝোলা। প্রথমে তার মুখটা আমি দেখতে পাইনি কিন্তু একটু ঘুরতেই আগুনের আভা তাব মুখে পড়ল। তখনই বুঝতে পারলাম আমি ভূত দেখছি।

তার মুখই প্রমাণ করে সে বয়সে উনিশ বছরের এক তরুণ ছিল। এক দুঃখময়, অশান্ত মুখ—মুখের উপর উদ্বিগ্ন, কষ্ট, হতাশার ছাপ পরিস্ফুট এবং অদ্ভুত বুভোটে ধবনের। এটা খুব একটা জোরালো মুখ নয়--চিবুক ছোট ও কৃশ, ঠোঁট দুটো মনোরম কিন্তু দুর্বল, চোখ দুটো বড ও নীল ঠিক ছোটদেব মত—একটা ভীতির ভাব প্রকাশ পাচ্ছে।

আমি নিস্পন্দ হযে বসে দেখছি। মূর্তিটা কিছুক্ষণ অস্থিরভাবে কার্পেটের ওপব চলাফেরা কবল—তারপর আস্তে আস্তে জানালার কাছে হেঁটে যেয়ে খানিকক্ষণ বাইরে বাগানের দিকে দেখল, তারপর আবার কার্পেটের ওপর ফিরে এল। সেখানে মিনিটখানেক সময কাটিযে শেষে ঘর পেরিয়ে দবজা খুলে দিল. সেইমুহূর্তে আমি তাকে অনুসরণ করলাম, চাকরেরা হলঘবের আলো তখন জ্বালিযে দিয়েছে এবং হলঘবটা সম্পূর্ণরূপে আলোকিত। কিন্তু হলঘর খালি, সেখানে কোন মূর্তি নেই।

গতরাতে বিলিয়ার্ড খেলা শেষ হবার পর আমি ডাক্তারকে সব কথা বলেছিলাম। তিনি গভীর মনোযোগ দিয়ে সবকিছু শুনে শুধু মন্তব্য করলেন :

এ্যাঙ্গাস, তুমি যদি আবার এই প্রেতাত্মাকে অথবা যাই হোক না কন দেখ, তখুনি আমায় বলতে ভয় পেও না।

৬

২২শে নভেম্বর—সেই তরুণ যুবকের প্রেতাত্মা আমি আবার দেখেছি।

আমি বিকেলবেলা রাস্তায় একটু বেডাতে বেরিয়েছি এবং ঘুরতে ঘুরতে উইমব্লেডন গীর্জের কবরে এসে পড়েছি। উদ্দেশ্যহীনভাবে হাঁটছি, স্মৃতিপ্রস্তবগুলো দেখছি আর ভাবছি যদি তাদের কোন অসাধারণ নাম অথবা অদ্ভুত লিপি উৎকীর্ণ করা থাকত, ঠিক সেইসময় হঠাৎ আবার আমি প্রেতাত্মা দেখলাম—গীর্জার পূর্বাংশের শেষে একটা কবরের পাশে দাঁড়িয়ে আছে। ঠিক আগের মত পোশাক, একই ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে--একটু ঝুঁকে, হাত দুটো ট্রাউজারের পকেটে। মুখ সেইরকম দুঃখ ও কষ্ট ভারাক্রান্ত এবং বিহ্বলতায় ভরা। বড় বড় নীল রঙের ছেলেমানুষী চোখদুটো একবার কবরের দিকে আর

একবার কবরের মাথার দিকে দেখছে, মনে হচ্ছে কিছু যেন পড়বার বা দেখবার চেষ্টা করছে। তারপর সমস্ত কবরখানায় চোখ বোলাতে লাগল।

আমি কাছে এগিয়ে গেলাম। যে কবরের কাছে প্রেতাত্মা দাঁড়িয়েছিল সেই কবরের প্রস্তরখণ্ডের ওপর লিপির দিকে তাকালাম—প্রকৃতপক্ষে আমি প্রেতাত্মার কয়েক ফুটের মধ্যে এগিয়ে গেলাম। মনে হল সে যেন আমাকে দেখেছিল—এমনি, উদাসীনভাবে যেন একজন অজানা থেকে অপরের দিকে তাকায়।

লিপিটা ছোট এবং অনাড়ম্বর :

এখানে মেজর জেনারেল স্যার আর্থার ডেবেনহাম, কে. সি. বি.-র দেহ শায়িত ;

জন্ম ১৫ই জানুয়ারী ১৮৩১ ; মৃত্যু ৪ঠা অক্টোবর ১৮৯২।

ফ্লোরেন্স জর্জিয়ানা, তাঁর স্ত্রীর দেহও শায়িত ,

জন্ম ১২ই সেপ্টেম্বর ১৮৩৪, মৃত্যু ৭ই ফেব্রুয়ারী ১৮৯৩।

তাঁদের একমাত্র পুত্র ইভরার্ড-এর স্মৃতির উদ্দেশ্যে ,

জন্ম ১২ই আগস্ট ১৮৭৪,

মৃত্যু ২৩শে জুলাই ১৮৯৩ হুডিক্সভাল, সুইডেন, যেখানে সে সমাহিত।

যখন আবার মাথা ফিরিয়ে তাকালাম সে প্রেতাত্মা অদৃশ্য।

আমি সোজা ডাক্তার স্লাইবারের বাড়িতে ফিরে এলাম এবং ঘটনাক্রমে সেইসময় তাঁকে ঢুকতেই ধরলাম। এই দ্বিতীয়বার প্রেতাত্মার আবির্ভাবের কথা তাঁকে বললে তিনি কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন। অবশেষে কোন মন্তব্য না করে আমাকে তাঁর সঙ্গে বাগানে যেতে বললেন। তিনি মালীর কাছে গেলেন—খুব বুড়ো, বহুদিন এখানে কাজ করছে।

গ্রেগসন, তুমি এখানে বহুদিন বাস করছ, তাই না ?

সেই ছেলেবেলা থেকে, পঞ্চান্ন বছর স্যার।

মেজর জেনারেল স্যার আর্থার ডেবেনহামের নাম কখনও শুনেছ ?

বুড়ো জেনারেলের নাম স্যার ? আমি শুনেছি বৈকি ! তিনি ত এখান থেকে আধ মাইল দূরে থাকতেন। আমি তাদের সবাইকে জানি। সেই তরুণ ভদ্রলোকটি, বেচারা ইভরার্ড এখানে এই বাড়িতে আপনার পূর্বতন ডাক্তার টারেলের সঙ্গে লেডী ডেবেনহাম মারা যাবার পর কয়েকমাস বাস করেছিল। ডাক্তার টারেল এবং সে কণ্টিনেণ্টে ঘোরবার সময় মিঃ ইভরার্ড মারা যায় স্যার।

তার কি হয়েছিল—মিঃ ইভরার্ডের ?

কি হয়েছিল, স্যার ? বলতে পারি তাঁর দ্রুতগতিতে দেহের ক্ষয় হচ্ছিল। সে বরাবর দুর্বল ও ফ্যাকাসে ছিল। ডাক্তারের সঙ্গে বাস করবার পর থেকে আরো খারাপের দিকে যাচ্ছিল। তাই তারা বিদেশে গিয়েছিল যদি কোন কিছু উপকার হতে পারে।

কেন সে ডা   ারেলের সঙ্গে ছিল—তার কি নিজের কোন আত্মীয় ছিল না যেখানে গি   তে পারে?

তারা বলত স্যার, তাদের কোন আত্মীয় পরিজন নেই। ডাক্তার টারেল বুড়ো জেনারেলের চিকিৎসক ছিলেন এবং তাঁর স্ত্রীরও। কাছাকাছি তিনিই একমাত্র তাঁদের বন্ধু ছিলেন স্যার। তারা একটু বিচিত্র ধরনের ছিল—বুড়ো ভদ্রলোক এবং লোকে বলত তাঁর স্ত্রী ছিল খামখেয়ালী।

জেনারেল কি ধনী ছিল?

গ্রেগসন মাথা চুলকাল। বলল, তিনি প্রাণবন্ত মানুষ ছিলেন স্যার, সব সময়ে একই রকম। তিনি গাড়ি রাখতেন, ইত্যাদি।

আরো কিছু প্রশ্ন করে ডাক্তার চলে গেলেন। কিন্তু সেই থেকে আমি গেগ্রসন ও বাড়ির পরিচারককে নানা প্রশ্ন করতাম। তাদের বর্ণনা অনুযায়ী ইভরার্ড ডেবেনহামের সেই অশরীরি প্রেতাত্মা যাকে আমি দুবার দেখেছি।

৭

২৮শে নভেম্বর—আমার মনে হয় মেজর কেনেডিও কি এখন বিশ্বাস করবেন যে আমার সাধারণত অদৃশ্য কিছু দেখার অদ্ভুত শক্তি আছে।

গতকাল বেলা দুটো নাগাদ যখন ডাক্তার ক্রাইবার, মিঃ পোলার্ড এবং আমি লাঞ্চ খাচ্ছিলাম তখন হঠাৎ আমি সেই প্রেতাত্মাকে ডাইনিং রুমে ঢুকতে দেখলাম। খুব নিঃশব্দে সে এল—তার স্বাভাবিক ঝুঁকেপড়া ভঙ্গিমায়। ঘরে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গেই সে থেমে গেল এবং অস্থিরভাবে এদিক ওদিক দেখতে লাগল। তার মুখের ভাব আরো উদ্বিগ্ন, দৃষ্টি হতাশায় জর্জরিত।

আমার সঙ্গীরা আমাকে ছুরি-কাঁটা টেবিলে নামিয়ে রেখে একদৃষ্টে দরজার দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখল।

কি হয়েছে, এ্যাঙ্গাস? ডাক্তার জিজ্ঞেস করলেন।

আবার এখানে এসেছে! আমি উত্তর দিলাম। মিঃ পোলার্ড এই সময়ের মধ্যে এ ব্যাপার জেনে ফেলেছেন।

কোথায় সে?

আপনার এবং দরজার মাঝে দাঁড়িয়ে আছে। দেখে মনে হচ্ছে কোথায় যাবে সে জানে না বা কি করবে বা যেন কাউকে বা কিছু খুঁজছে।

খুব ভালভাবে দেখ, তারপর আমাদের বল কি ঘটে।

তখন আমি প্রেতাত্মার গতিবিধি তাঁদের বলতে লাগলাম।

সে হেঁটে জানালায় গেল, সেখানে দাঁড়িয়ে বাগান দেখছে…এখন সে আগুনের কাছে কার্পেটের ওপর এল, আগুনের দিকে তাকিয়ে আছে… এখন সে আবার ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে…।

ওকে অনুসরণ কর, ডাক্তার বললেন।

আমরা তিনজনেই টেবিল ছেড়ে প্রেতাত্মাকে ঘরের বাইরে অনুসরণ করতে লাগলাম। এবার সে অদৃশ্য হল না, তার পরিবর্তে সে হলের ভেতর দিয়ে গিয়ে ডানদিকে ঘুরে ডাক্তারের ষ্টাডিরুমে গেল।

সে কি করছে? আমরা ভেতরে ঢুকলে ডাক্তার জিজ্ঞেস করলেন।

আপনার ডেস্কের সামনে দাঁড়িয়ে আছে, আপনার চেয়ারের দিকে দেখছে। মনে হচ্ছে আগের থেকে আরো বেশী বিহ্বল। এবার সে ফায়ার প্লেসের সামনে গিয়ে ম্যান্টলপিসের ওপর কিছু যেন খুঁজছে·· এখন সে ঘর ছেড়ে চলে যাচ্ছে॥



অনুসরণ কর।

প্রেতাত্মা হলের ভেতর দিয়ে বাগানে গেল—আমরা তিনজন তার খুব কাছে কাছে যাচ্ছি। দরজার বাইরে সিঁড়ির ওপর একমুহূর্ত দাঁড়াল। খুব মনমরা দেখাচ্ছে। তারপর আস্তে আস্তে বাগান পার হয়ে লনের মাঝখানে তুএকবার ঘুরল। এখন সে আরো ঝুঁকে পড়েছে, এবং তার মাথাটা সামনের দিকে এমন ঝুঁকে পড়েছে মনে হচ্ছে যেন কোন কষ্ট বা ব্যথা পাচ্ছে। হঠাৎ সে ঘুরে একটা সরু পথ দিয়ে এগোতে লাগল যেখানে বাগানের ময়লা ফেলা হয়। তার আরও গতিবিধি আমি সঙ্গীদের বলতে লাগলাম।

সেই সরু পথ দিয়ে সে সামার-হাউসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে· ·এবার সে সামার-হাউসের ভেতরে ঢুকল···সেখানে দাঁড়িয়ে তাকে দেখাচ্ছে যেন আরো

হতাশা, কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছে—এখন সে···ওঃ।

কি দেখছ, এ্যাঙ্গাস? ডাক্তার জিজ্ঞেস করলেন।

সে চলে গেছে—অদৃশ্য হয়েছে।

আমরা বাড়িতে ফিরে এলাম।

পোলার্ড, এ সম্পর্কে তুমি কি ভাব? ডাক্তার জানতে চাইলেন।

অদ্ভুত! বিচিত্র!

এর বেশী কেউ কিছু বললেন না। এরপরেই সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা দুজন একসঙ্গে বেরিয়ে গেলেন। ঘণ্টাখানেক পরে তাঁরা ফিরে এলেন। সঙ্গে একজন ছুতোর ও তার সহকারী এবং আরো দুজন লোক যাদের দেখে মনে হচ্ছিল তারা মাটি খোঁড়ার মজুর। ডাক্তার স্ক্রাইবার আমাকে তাদের সঙ্গে যেতে বললেন এবং তিনি আমাদের সামার হাউসে নিয়ে গেলেন। সেখানে উপস্থিত হলে তিনি ছুতোরকে বললেন।

আমি চাই এ জায়গাটা খুঁড়তে হবে যতক্ষণ না বলব খোঁড়া থামাবে না। এখুনি শুরু কর।

ছুতোর ও তার লোকদের মেঝে খুঁড়তে বেশী সময় লাগল না কারণ চৌকো পাইন কাঠ দিয়ে তৈরি যা সহজে সরান যায়।

তারপর তারা খুঁড়তে আরম্ভ করল।

এই ভয়ঙ্কর অনুসন্ধানের বিবরণ লেখার কোন দরকার নেই। আমরা একজন তরুণের মৃতদেহ পেলাম যার প্রেতাত্মা আমি বেশ কয়েকবার দেখেছি। এর পোশাক পরিচ্ছদ ঠিক প্রেতাত্মার মত। গ্রেগসন তৎক্ষণাৎ সেটা ইভরার্ড ডেবেনহামের বলে সনাক্ত করল।

ডাক্তার স্ক্রাইবার স্বরাষ্ট্র দপ্তর, পুলিশ ও করোনারের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন।

৮

৩০শে নভেম্বর—করোনারের অনুসন্ধান সবেমাত্র শেষ হয়েছে। স্বরাষ্ট্র দপ্তরের অভিজ্ঞ লোক, একজন বিখ্যাত ডাক্তার, বলেন যে ইভরার্ড ডেবেনহামকে বিষ খাওয়ানো হয়েছিল, এবং জুরিগণ ডাক্তার টারেলের বিরুদ্ধে ইচ্ছাকৃত হত্যার রায় দেন। দেখা যায়, ইভরার্ডের বিবাহ ও সন্তান জন্মের পূর্বে তার মৃত্যু ঘটলে মেজর ডেবেনহামের যাবতীয় সম্পত্তি তারই হবে। আমরা শুনেছি ডাক্তার টারেলকে এডিনবার্গে গ্রেপ্তার করা হয়। ডাক্তার স্ক্রাইবারের কাছে তার এই বাড়ি বিক্রি করে সেখানে বাস করতে থাকে।

৯

২১শে মার্চ—এ্যালাসিও, ইটালী—বিকেলে এখানে পৌঁছে ইংরাজি কাগজে দেখি গত সপ্তাহে ওয়াণ্ডসওয়ার্থ বন্দীশালায় ডাক্তার টারেলের ফাঁসি হয়েছে

এবং তিনি স্বীকারোক্তি করে গেছেন। এছাড়াও অন্য লেখার মধ্যে যে অদ্ভুত পরিস্থিতিতে এই অপরাধ আবিষ্কার হয় সে ব্যাপারে মন্তব্য করা হয়।

কিন্তু সেগুলো আমার কাছে কিছুই অদ্ভুত নয়।

The other sense—*J. S. Fletcher*

বাড়ি এবং বুদ্ধি

একদিন আমার এক পণ্ডিত ও দার্শনিক বন্ধু কিছুটা ঠাট্টার ছলে, কিছুটা আন্তরিকভাবে আমায় বলেছিল—কি অদ্ভুত! আমাদের সেই শেষ দেখা হওয়ার পর এই লণ্ডন শহরের মধ্যে একটা ভূতুড়ে বাড়ি আবিষ্কার করেছি।

সত্যি ভূতুড়ে? ভূত আছে?

এগুলোর উত্তর আমি দিতে পারব না, যা জানি তা হচ্ছে এই: ছ' সপ্তাহ আগে আমি ও আমার স্ত্রী একটা সাজানো গোছানো ফ্ল্যাটের সন্ধান করেছিলাম। একটা নির্জন রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে একটা বাড়ির জানালায় বোর্ড ঝুলছে। তাতে লেখা: আসবাবপত্রে সজ্জিত ফ্ল্যাট ভাড়া। পরিবেশটা পছন্দ হওয়াতে আমরা সেখানে এক সপ্তাহের জন্যে একটা ফ্ল্যাট ভাড়া নিই। কিন্তু তিন দিনের দিন আমরা সেটা ছাড়তে বাধ্য হই। কোন কিছুই আমার স্ত্রীকে সেখানে থাকতে প্ররোচিত করতে পারল না।

তুমি কি দেখেছিলে?

আমায় মাফ কর। কল্পনার স্বপ্নবিলাসী বলে আমি নিজেকে উপহাসাস্পদ করতে চাই না। এমন কি তোমার কাছে যেটা অবিশ্বাস্য সেটা তোমাকে সত্যি বলে মানতে বাধ্য করতে পারি না। একমাত্র নিজের অভিজ্ঞতা ছাড়া তা হতে পারে না। আমি এইটুকু মাত্র বলতে পারি, আমরা কি দেখে বা শুনে সেখান থেকে চলে আসতে বাধ্য হয়েছি সেটা বড় কথা নয় (তুমি হয়ত মনে করতে পার আমরা নিজেদের মনে অদ্ভুত কল্পনার দ্বারা প্রতারিত অথবা অন্য কোন প্রতারণার শিকার), যখনই একটা আসবাবপত্রহীন ঘরের সামনে দিয়ে যেতাম তখনই একটা অব্যক্ত ভীতি আমাদের পেয়ে বসত। আমরা কোনকিছু দেখিনি বা শুনিনি। আর সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার আমার স্ত্রীর সঙ্গে একমত হয়ে তৃতীয় রাত কাটাবার মত মনের অবস্থা ছিল না।

যাই হোক, কোনরকমে তৃতীয় রাত কাটিয়ে পরেরদিন সকালেই সেই বাড়ির পরিচারিকাকে যে আমাদের দেখাশুনা করে, জানালাম যে এই ঘর

আমাদের পছন্দ না হওয়াতে আমরা এক সপ্তাহ থাকব না। তখন সেই মহিলাটি নীরস কণ্ঠে বলল :

আমি জানি কেন, আপনারা অন্যদের থেকে বেশীদিন থেকেছেন। খুব কম লোকই দুরাত কাটিয়েছে, আপনার মত তিন রাত কাটায়নি। কিন্তু আমি স্বীকার করছি তারা আপনাদের ওপর সদয়।

তারা- কারা? মৃদু হাসিটানার ছল করে জিজ্ঞেস করলাম।

কেন, তারা যারা এই বাড়িতে ঘুরে বেড়ায়, তারা যেই হোক, আমি তাদের কিছু মনে করি না। অনেকদিন আগে থাকতেই আমি তাদের জানি যখন আমি পরিচারিকা হিসাবে এখানে থাকতাম না, কিন্তু আমি জানি তারাই যে-কোনদিন আমার মৃত্যুর কারণ হবে। আমি গ্রাহ্য করি না, আমার বয়স হয়েছে, যেকোন সময় মৃত্যু ঘটবে। তখন তাদের মধ্যে-ই একজন হব এবং এই বাড়িতেই থাকব।

মহিলাটি এমন শান্তভাবে ভয়ার্ত কণ্ঠে কথাগুলো বলল যে এব্যাপারে আর বেশী কথা বলতে সাহস হল না। এক সপ্তাহের টাকা মিটিয়ে নির্ঝঞ্ঝাটে সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে পেরে আমি ও আমার স্ত্রী অত্যন্ত সুখী হলাম।

তুমি আমার ঔৎসুক্য জাগিয়ে তুলছ, আমি বললাম! ভূতুড়ে বাড়িতে শুতে খুব মজা পাই। দয়া করে আমাকে সেই বাড়ির ঠিকানাটা দাও।

আমার বন্ধু ঠিকানা দেবার পর সে চলে গেলে আমি সোজা সেই বাড়ির অভিমুখে রওনা দিলাম।

এ জায়গাটা অক্সফোর্ড স্ট্রীটের উত্তর দিকে নিরিবিলি অথচ ভদ্র পাড়ায় অবস্থিত। বাড়িটা দেখলাম বন্ধ, জানালায় কোন বোর্ড নেই, দরজায় কড়া নাড়তেও কেউ সাড়া দিল না। আমি ফিরে চলে আসছি এমন সময় একটা ছোট ছেলে বীয়ারের বোতল কুড়োতে কুড়োতে আমায় বলল, স্যার, আপনি ঐ বাড়ির কাউকে চান?

হ্যাঁ, শুনেছিলাম এটা ভাড়া দেওয়া হবে।

ভাড়া! আরে যে মেয়েটা থাকত সে আজ তিন সপ্তাহ হল মারা গেছে। কাউকেই ওখানে থাকতে দেখিনি। অবশ্যি যদিও মিঃ জে—অনেক চেষ্টা করেছে। সে আমার মাকে, তার টুকিটাকি কাজ করে, এ বাড়ির জানালাগুলো খোলা ও বন্ধ করার জন্যে সপ্তাহে এক পাউণ্ড করে দিতে চেয়েছিল। মা রাজী হয়নি।

রাজী হয়নি! কেন?

এ বাড়িটা ভূতুড়ে। যে বুড়ি এই বাড়িটায় ছিল একদিন দেখা গেল তার বিছানায় ড্যাবডেবে চোখ চেয়ে মরে পড়ে আছে। লোকে বলে শয়তান তার গলা টিপে মেরেছে।

আরে ধ্যাৎ! তুমি মিঃ জে-এর কথা বলছ। সেই কি এই বাড়ির মালিক?

হ্যাঁ।

কোথায় সে থাকে ?

জি—স্ট্রীটের—নম্বর বাড়িতে।

সে কি করে ? কোন ব্যবসা আছে তার ?

না স্যার, নির্দিষ্ট কিছু করে না, তিনি ত' একা।

ছেলেটাকে খবর দেওয়ার জন্যে কিছু বকশিস করে সেই ভূতুড়ে বাড়িটার কাছে জি স্ট্রীটে মিঃ জে'র খোঁজে চললাম। আমার সৌভাগ্য তাকে বাড়িতেই পেলাম। বেশ বয়স্ক লোক, চোখেমুখে বুদ্ধির ছাপ, চালচলনও আকর্ষণীয়।

আমার নাম এবং আসার উদ্দেশ্য তাকে খোলাখুলি জানালাম। বললাম, শুনেছি বাড়িটা নাকি ভূতুড়ে বাড়ি। এমন সন্দেহজনক বাড়ি পরীক্ষা করার দারুণ ইচ্ছে। এক রাতের জন্যে হলেও যদি বাড়িটা সে আমাকে ভাড়া দেয় আমি বাধিত হব। তার বদলে সে যা দাবী করবে আমি দিতে প্রস্তুত।

মিঃ জে বেশ সৌজন্যতা দেখিয়ে বলল, স্যার, আপনার যতদিন ইচ্ছা, বাড়িটা ব্যবহার করতে পারেন। ভাড়ার কোন প্রশ্নই ওঠে না। আপনি যদি এই অদ্ভুত ব্যাপারের কারণটা খুঁজে বার করতে সক্ষম হন আমিই তার জন্যে কৃতার্থ হব। আমি এটা ভাড়া দিতে পারব না কারণ কোন লোক এখানে আসতে চাইবে না এমন কি কোন কাজ করার লোকও না।

দুর্ভাগ্যবশত বাড়িটাতে শুধু রাতে নয় দিনের বেলাতেও ভূতের তাণ্ডব-নৃত্য হয়। যদিও রাতের ব্যাপারটা খুবই অপ্রীতিকর এবং কখনও কখনও যথেষ্ট ভীতিপূর্ণ। বেচারা বুড়ি যে তিন সপ্তাহ আগে এখানে মারা গেছে সে একজন নিঃস্ব গরীব ছিল। তাকে আমিই ওয়ার্ক হাউস থেকে নিয়ে আসি। ছোটবেলায় সে আমাদের বাড়ির সঙ্গে পরিচিত ছিল এবং একসময় সে আমার কাকার বাড়ি ভাড়া দিয়ে দেখাশুনা করত। সে একজন লেখাপড়া জানা শক্ত মনের মেয়েছেলে ছিল। একমাত্র তাকেই আমি এ বাড়িতে থাকতে পীড়াপিড়ি করেছিলাম। বাস্তবিক, তার এই হঠাৎ মৃত্যুতে এবং করোনারের বিচারের ফলে আশেপাশে বদনাম ছড়িয়ে পড়ায় কাউকেই বাড়িতে রাখতে পারছি না, ভাড়াটে ত নয়ই। যদি কেউ এ বাড়ির কর ইত্যাদি দিতে রাজী হয় ত এক বছরের জন্যে তাকে আমি বিনা ভাড়াতেও রাখতে পারি।

কতদিন হল বাড়িটার এমন বদনাম হয়েছে ?

আমি ঠিক সেটা বলতে পারব না তবে অনেক বছর হল। সেই বুড়ি বলত যখন সে এটা ভাড়া দিয়েছিল তার আগেও নাকি ভূতের অত্যাচার হত, ধরুন তিরিশ থেকে চল্লিশ বছর আগে। আসল কথাটা হচ্ছে পূর্ব ভারতীয় দ্বীপ-পুঞ্জেই আমার জীবন কেটেছে, ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর চাকরীতে ছিলাম।

গত বছর আমি ইংলণ্ডে ফিরে আসি। কাকার সম্পত্তির সঙ্গে এই বাড়িটাও পাই। আমি বরাবর এই বাড়িটা বন্ধ থাকতে এবং কাউকে বাস না করতে

দেখতে পাই। আমাকে বলা হয়েছিল এটা ভুতুড়ে বাড়ি, আর কেউ এবাড়িতে থাকতে চায় না। তাদের সেকথা শুনে আমি আজগুবি গল্প মনে করে হেসে উড়িয়ে দিই।

বাড়িটা সারিয়ে রং করতে কিছু খরচ করি, সেইসঙ্গে পুরনো আসবাবপত্রের সঙ্গে নতুন কিছু এনে সাজাই। তারপর বিজ্ঞাপন দিয়ে এক বছরের মধ্যে ভাড়াটে পাই। সে একজন অবসরপ্রাপ্ত কর্নেল। তার মাইনের অর্ধেক পেনসন হিসাবে পেত। সে তার পরিবারের সঙ্গে এক ছেলে ও এক মেয়ে নিয়ে আর চার-পাঁচজন চাকর নিয়ে এখানে আসে। কিন্তু পরের দিনই তারা বাড়ি ছেড়ে সকলে চলে যায়। যদিও তারা হলফ করে বলে যে এমন অদ্ভুত কিছু তারা দেখেছিল যা সত্যিই তাদের কাছে ভীতিজনক। চুক্তিভঙ্গের অভিযোগে আমি সত্যিই কোন অভিযোগ করিনি এমনকি দোষও দিইনি তাদের।

তারপর আমি এই বুড়িকে এখানে রাখি এবং তাকে ঘর ভাড়া দেওয়ার ক্ষমতাও দিই। আমি কখনও তিনরাত থাকার মত কোন ভাড়াটে পাইনি। তাদের গল্প আমি আপনাকে বলব না। কোন দুজন ভাড়াটে একই ঘটনার কথা বলেনি। আগের গল্প না শুনে আপনি নিজেই প্রত্যক্ষ করে বিচার করে দেখুন, তবে কিছু দেখার বা শোনার জন্যে তৈরি হয়েই আপনি থাকুন এবং তার জন্য যা সতর্কতা নেওয়ার প্রয়োজন মনে করেন আপনি নিজেই তা নেবেন।

ঐ বাড়িতে একরাত কাটাবার জন্যে আপনার নিজের কোন ঔৎসুক্য জাগেনি?

হ্যাঁ আমি কাটিয়েছি, তবে এক রাত নয়, দিনের বেলা একা তিন ঘণ্টা। আমার কেবল ঔৎসুক্যই মেটেনি সব ইচ্ছা দূরীভূত হয়েছে। নতুন করে কিছু দেখবার আর আমার ইচ্ছা নেই। আমি মন খুলে সব বলছি না বলে আপনি অনুযোগ করবেন না। আর, আপনি জানার জন্যে যদি খুব ব্যগ্র না হন এবং প্রচণ্ড সাহস আপনার না থাকে তবে আমার আন্তরিক অনুরোধ, এক রাতও আপনি ও বাড়িতে কাটাবেন না।

আমার দারুণ উৎসাহ, আমি বললাম, এবং যদিও ভীরুরা এমন অপরিচিত পরিস্থিতির ব্যাপারে সাহসের কথা বলবে তবু নানা বিপদের মধ্যে আমার সাহস যেভাবে তৈরি হয়ে উঠেছে আমি অনায়াসে তার ওপর নির্ভর করতে পারি, এমনকি ভুতুড়ে বাড়িতেও।

মিঃ জে আর বিশেষ কিছু বলল না। সে বাড়ির চাবিটা এনে আমাকে দিল। অকপটে সবকিছু বলার জন্যে এবং আমার ইচ্ছা পূরণে তার ভদ্রজনোচিত ব্যবহারে তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে চাবিটা নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম।

জানার জন্যে উতলা হয়ে বাড়িতে ফিরেই আমি আমার খাস ভৃত্যকে ডাকলাম। সে একজন স্ফূর্তিবাজ যুবক, নির্ভীক মনোভাবাপন্ন, এবং কোন-রকম কুসংস্কারাচ্ছন্ন নয়।

এফ—, আমি বললাম, তোমার নিশ্চয়ই মনে আছে জার্মানীতে আমরা সেই পুরনো দুর্গে ভূত দেখতে না পেয়ে কিরকম হতাশ হয়েছিলাম; লোকে বলত সেখানে কন্দকাটা ভূতের তাণ্ডব আছে। দেখ, এই লণ্ডন শহরে একটা বাড়ি আছে আমি শুনেছি যেখানে আমার বিশ্বাস ভূত আছে। তার মানে বলতে চাই সেখানে আমি আজ রাত কাটাব। যা শুনেছি তাতে নিঃসন্দেহ যে কিছু নিশ্চয়ই দেখা বা শোনা যাবে—হয়ত এমন কিছু যা সত্যিই ভয়ঙ্কর। তোমার কি মনে হয়, যদি আমি তোমাকে সঙ্গে নিই, যা কিছু ঘটুক না কেন তোমার প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের ওপর আমি নির্ভর করতে পারি?

ওঃ স্যার, আমার ওপর আপনি বিশ্বাস করতে পারেন, সে বেশ উৎফুল্ল হয়ে বলল।

বেশ, ঠিক আছে, এই নাও বাড়ির চাবি, আর এই ঠিকানা। এখুনি সেখানে গিয়ে আমার শোবার জন্যে একটা ঘর ঠিক কর। বহুদিন ধরে সে বাড়িতে কেউ না বাস করায় ফায়ার প্লেসে ভাল করে আগুন জ্বালাবে, বিছানা পরিষ্কার করে জানালা দরজা খুলে আলো বাতাস ঢোকার ব্যবস্থা করবে। আর হ্যাঁ, দেখো সেখানে বাতি ও জ্বালানী যেন থাকে। আমার রিভলবার ও ছুরিটা তুমি নিয়ে যাও, আমার অস্ত্রশস্ত্র ছাড়াও তুমি নিজেকে তৈরি রাখবে। যদি আমরা একডজন ভূতের মোকাবিলা করতে না পারি তবে বৃথাই আমরা দুজন ইংরেজ।

সারাদিন আমি বিশেষ জরুরী কাজের মধ্যে এমন ডুবে রইলাম যে নৈশ অ্যাডভেঞ্চারের কথা ভাববার কোন অবকাশ পেলাম না। আমি একা একা খাওয়া সারলাম এবং বেশ দেরি করেই—আমার অভ্যাসমত খেতে খেতে পড়তে লাগলাম। যে বইটা আমি বেছে নিয়েছিলাম সেটা মেকলের একটা রচনা। চিন্তা করলাম বইটা আমি সঙ্গে করে নিয়ে যাব। এই রচনাশৈলীর মধ্যে আধ্যাত্মিক উন্নতির যথেষ্ট অবকাশ আছে এবং বিষয়বস্তুর মধ্যে প্রত্যক্ষ জীবনের কুসংস্কারের প্রতিশেধক হিসাবে এটা বিশেষ উপযোগী।

রাত সাড়ে নটায় বইটা পকেটে পুরে বেড়াতে বেড়াতে সেই ভূতুড়ে বাড়ির দিকে যেতে লাগলাম। আমার প্রিয় বুল টেরিয়র কুকুরটা সঙ্গে নিয়ে চললাম—খুব তীক্ষ্ণবুদ্ধি, সাহসী। রাতে অন্ধকার জায়গায় ইঁদুরের সন্ধানে বা অদ্ভুত কিছু দেখলেই চীৎকার করে ওঠে।

তখন গরমের রাত তবে ঠাণ্ডা ছিল, আকাশটা মেঘাচ্ছন্ন। আকাশে সরু একফালি চাঁদ উঠেছে, মৃদু আভা মেঘের ভেতর থেকে বেরোচ্ছে। অধিক রাতে মেঘ কেটে গেলে আলোটা বেশ উজ্জ্বলই হবে।

বাড়িতে পৌঁছে দরজায় ঘা দিতেই আমার চাকর এসে দরজা খুলে হাসিমুখে আমাকে স্বাগত জানাল।

সব ঠিক আছে স্যার এবং খুব আরামদায়ক।

ওঃ! আমি একটু হতাশ হয়ে বললাম। তুমি বিশেষ লক্ষণীয় কিছু দেখনি বা শোননি?

হ্যাঁ স্যার, আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি। অদ্ভুত কিছু শুনেছি।

কি?—কি?

আমার পেছনে পা ফেলে দ্রুতবেগে চলার শব্দ, একবার কি দুবার আমার কানের কাছে ফিসফিস করে কিছু কথার আওয়াজ, আর কিছু নয়।

তুমি মোটেই ভয় পাও নি?

আমি! একটুও নয় স্যার।

লোকটার দুঃসাহসিকতা আমাকে একটা বিষয়ে নিশ্চিন্ত করল যে যা কিছুই ঘটুক না কেন, সে আমাকে ছেড়ে যাবে না।

আমরা হলঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে, সদর দরজা বন্ধ, আমার মনোযোগ কুকুরটার দিকে। প্রথমে সে বেশ উৎফুল্ল হয়ে ঘরের মধ্যে দৌড়াদৌড়ি করল কিন্তু তারপরই বন্ধ দরজার কাছে গিয়ে মুখ নিয়ে কি যেন শুনতে লাগল আর বাইরে বেরোবার জন্যে দরজায় আঁচড়াতে লাগল। আমি তার মাথায় আদর করে চাপড় দিতে সে যেন পরিস্থিতিটা বুঝতে পেরে আমাকে ও এক-কে অনুসরণ করল। বাড়ির ভেতরে সে আমার পায়ে পায়ে চলতে লাগল। তার স্বাভাবিক অভ্যাসমত অজানা জায়গায় অনুসন্ধিৎসু হয়ে আগে যাবার প্রবণতা দেখা গেল না।

আমরা প্রথমে নিচের তলার ঘরগুলো দেখলাম, তারপর রান্নাঘর, বিশেষ করে ভাঁড়ার ঘর। সেখানে দেখলাম তখনও দু' তিনটে মদের বোতল ঝুড়িতে রয়েছে, চারদিক ঝুলে ভর্তি, দেখলেই মনে হয় বহুদিন তাতে হাত পড়েনি। এটা বেশ স্পষ্ট যে ভূতেরা মদখোর নয়।

নজর কাড়বার মত আর কিছুই নেই। পেছন দিকে একটা ছোট অপরিষ্কার বাগান, উঁচু পাঁচিল দিয়ে চারদিক ঘেরা। ধুলো ভর্তি পাথর বাঁধানো পথে যেখানে আমাদের পা পড়ছে সেখানে দাগ রয়ে যাচ্ছে।

এখানেই এই অজানা অদ্ভুত পরিবেশের মধ্যে আমি প্রথম বিস্ময়কর ব্যাপার প্রত্যক্ষ করলাম।

আমার সামনে দেখলাম হঠাৎ একটা পায়ের ছাপ ফুটে উঠছে। থমকে দাঁড়িয়ে চাকরের হাতটা ধরে ইসারায় সেইদিকে দেখালাম। সেই পায়ের চিহ্নের সামনে হঠাৎ আর একটা পায়ের ছাপ ফুটে উঠল। আমরা দুজনেই দেখলাম। আমি তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেলাম, পায়ের ছাপও একটার পর একটা করে আমার দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। একটা ছোট পায়ের ছাপ—শিশুর পা, পায়ের ছাপ খুব স্পষ্ট না হলেও আমাদের বুঝতে অসুবিধা হল না যে সে নগ্ন পায়ের ছাপ।

আমাদের সামনে দেয়ালের কাছে যেতেই সেই অদ্ভুত ব্যাপারটা থেমে

গেল। আমাদের ফিরে আসার সময়ও সেটা আর দেখা গেল না।

সিঁড়ি দিয়ে উঠে নিচের তলার ঘরগুলো দেখতে লাগলাম—খাবার ঘর, পেছন দিকের একটা ছোট ঘর, তার থেকেও ছোট আর একটা ঘর হয়ত কোন চাকর থাকত—সর্বত্র মৃত্যুর স্তব্ধতা বিরাজ করছে।

তারপর আমরা ড্রইংরুমে ঢুকলাম, চারদিক বেশ ঝকঝকে তকতকে। আমি একটা চেয়ারে বসলাম। এক—টেবিলের ওপর একটা বাতি জ্বালিয়ে দিল, ঘরটায় বেশ আলো হল। তাকে দরজা বন্ধ করে দিতে বললাম। সে ঘুরতেই দেখলাম আমার সামনে একটা চেয়ার নিঃশব্দে দ্রুত দেয়ালের কাছ থেকে সরে এসে আমার সামনে গজ খানেকের মধ্যে এসে থেমে গেল।

আরে, এযে দেখছি মন্তর পড়া টেবিল ঘোরানোর থেকে চমকপ্রদ, মনে মনে ভেবে হাসতে গিয়ে দেখলাম আমার কুকুরটা একটু পিছিয়ে এসে ঘেউ ঘেউ করে ডাকতে লাগল।



এক—ফিরে এল, সে চেয়ার নড়ার ব্যাপারটা কিছুই লক্ষ্য করেনি। সে কুকুরকে শান্ত করতে ব্যস্ত হল। আমি চেয়ারের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রয়েছি, মনে হল চেয়ারে বসে বিবর্ণ, নীলচে, ধোঁয়াটে মানুষের মূর্তির এক দেহরেখা। কিন্তু সেটা এতই অস্পষ্ট যে আমার নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারলাম না। কুকুরটা এখন শান্ত হয়ে বসে রয়েছে।

আমার সামনের চেয়ারটা সরিয়ে রাখ, একেবারে দেয়ালের কাছে নিয়ে যাও, আমি এক কে বললাম।

এক—সেইমত কাজ করল। হঠাৎ ঘুরে সে বলল, আপনি কি স্যার?

আমি—কি?

মনে হল কেউ আমাকে মারল। কাঁধে আমি অনুভব করলাম, ঠিক এখানে, এই বলে সে হাত দিয়ে জায়গাটা দেখাল।

না, তবে এখানে ভোজবাজিকর রয়েছে। যদিও তাদের চালাকি ধরতে পারছি না, আমাদের ভয় দেখাবার আগেই তাদের ধরে ফেলব।

আমরা বেশীক্ষণ ড্রইংরুমে বসে থাকতে পারলাম না কারণ ঘরটা ভীষণ স্যাঁতসেঁতে আর ঠাণ্ডা। ওপরের ঘরে আগুনের সামনে বসার ইচ্ছা হল। যাবার সময় ঘরটা তালাবন্ধ করে দিলাম—নিচের সব ঘরেই পরীক্ষার পর তালা দিয়েছি।

ওপরে যে ঘরটা চাকর আমার শোবার বন্দোবস্ত করেছে সেটাই সব থেকে ভাল, ঘরটা বেশ বড়, রাস্তার দিকে দুটো জানালা। চারপেয়ে ছোট বিছানাটা ফায়ার প্লেসের ঠিক উল্টো দিকে—আগুনের তাত লাগছে। বাঁদিকে আমার বিছানা ও জানালার মাঝে দেয়ালে একটা দরজা। সেই দরজা দিয়ে পাশের ঘরে আমার চাকরের সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়। ঘরে আর কোন দরজা নেই, ঘরের বাইরে আর কারও সঙ্গে দেখা করা যাবে না।

ফায়ার প্লেসের দুধারে দেয়ালের সঙ্গে আটকানো দুটো আলমারী, তালা লাগান নেই। আমরা সেদুটো পরীক্ষা করে দেখলাম, মেয়েদের জামাকাপড় ঝোলানো হুক ছাড়া আর কিছুই নেই। দেয়ালে ঘা মেরে দেখলাম সেটা পুরু, বাড়ির বাইরের দিকে দেয়াল।

ঘরগুলো দেখা শেষ করে আগুনের কাছে বসে দেহটাকে গরম করতে লাগলাম। তারপর সিগারেট ধরিয়ে সমস্ত ব্যাপারটা মনে মনে চিন্তা করতে লাগলাম। তখনও এফ—আমার কাছে রয়েছে। সিঁড়ির মুখে একটা দরজা আছে সেটা বেশ ভালভাবেই বন্ধ।

স্যার, বিস্মিত হয়ে আমার চাকর বলতে লাগল, যখন আমি এখানে প্রথম আসি তখন অন্য সব ঘরের সঙ্গে এই দরজাটার তালা খুলে রেখেছিলাম, ভেতর থেকে তা বন্ধ হতে পারে না, কারণ এটা একটা—।

তার কথা শেষ হবার আগেই দরজাটা—যেটা আমরা দুজনের কেউই ছুঁইনি, হঠাৎ আপনা থেকেই আস্তে আস্তে খুলে গেল। একই সঙ্গে আমরা পরস্পরের দিকে তাকালাম। একই চিন্তা আমাদের দুজনের মনে। কোন মানুষের গুপ্ত চালাকি ধরা যেতে পারে। আমি প্রথমে দৌড়ে সেদিকে গেলাম, আমার পেছনে চাকর। একটা ছোট, খালি, আসবাবপত্রহীন ঘর। কতকগুলো খালি বাক্স ও ঝুড়ি ঘরের এককোণে পড়ে আছে, একটা ছোট জানালা, খড়খড়ি বন্ধ —ফায়ারপ্লেস নেই—আমরা যে দরজা দিয়ে ঢুকেছি সেটা ছাড়া আর কোন দরজা নেই। মেঝেয় কোন কার্পেট নেই, অনেক দিনের পুরনো মেঝে, এবড়ো-

খেবড়ো, পোকা-ধরা এখানে-সেখানে জোড়াতালি দেওয়া, কাঠের ওপর সাদা দাগ দেখলেই তা বোঝা যায়। কোন মানুষ নেই এবং লুকিয়ে থাকার মত ঘরে কোন জায়গা নেই।

আমরা দাঁড়িয়ে ঘরের চারদিক দেখছি এমন সময় যে দরজা দিয়ে আমরা ঢুকেছিলাম সেটা আস্তে আস্তে নিঃশব্দে বন্ধ হয়ে গেল। আমরা বন্দী হলাম।

এই প্রথম আমি এক অব্যক্ত ভীতির শিরশিরানি অনুভব করলাম। আমার চাকরের কিন্তু তা হল না।

ওরা আমাদের ফাঁদে ফেলতে পারবে না স্যার, আমি একলাথি মেরে ঐ ঝরঝরে পুরনো দরজাটা ভেঙে দিতে পারি।

হাত দিয়ে খোলার চেষ্টা আগে কর। যে ভীতি আমাকে পেয়ে বসেছিল তা মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে বললাম, ততক্ষণে আমি জানালার খড়খড়ি খুলে দেখি বাইরে কি আছে।

জানালার খড়খড়ি খুলে দেখি বাড়ির পেছনদিকের সেই বাগানটা দেখা যায় যার কথা আগেই বলা হয়েছে। জানালার নিচে কোন আলসে নেই, সোজা দেয়াল নেমে গেছে। জানালা দিয়ে কোন মানুষের পালাবার উপায় নেই কারণ পা রাখার কোন জায়গা না থাকায় তাকে একেবারে সোজা পাথরের ওপর গিয়ে পড়তে হবে।

এর মধ্যে এফ—দরজাটা খোলার বৃথা চেষ্টা করছে। এবার সে আমার দিকে নীরবে চেয়ে দরজা ভাঙার জন্যে আমার আদেশের অপেক্ষায় রয়েছে। চাকরের প্রতি কোন অন্যায় অবিচার না করে এখানে আমার স্বীকার করা উচিত যে এইরকম এক পরিস্থিতির মধ্যে পড়ে সে বিন্দুমাত্র ভীত না হয়ে যেভাবে সাহস না হারিয়ে ধীর স্থির হয়ে রয়েছে তাতে তাকে প্রশংসা না করে থাকতে পারছি না। আমি স্বেচ্ছায় তাকে অনুমতি দিলাম। যদিও সে একজন শক্তিমান পুরুষ কিন্তু তার সর্বশক্তি নিষ্ফল হল, তার সজোর পদাঘাতে দরজা একচুলও নড়ল না।

হাঁফাতে হাঁফাতে সে চেষ্টা পরিত্যাগ করল। আমি তখন নিজে চেষ্টা করলাম, তাও বৃথা হল। সেই কাজ থেকে বিরত হতে আবার আমার দেহ ভয়ে শিরশির করে উঠল। এবার যেন আরো শীতল ও অদম্য। মনে হতে লাগল ঘরের মেঝের ফাটল থেকে অদ্ভুত ও ভয়ঙ্কর নিঃশ্বাস সমস্ত ঘর ভরিয়ে তুলছে যা মানুষের জীবনকে অসহনীয় করে তোলে।

দরজাটা যেন নিজের ইচ্ছেয় ধীরে ধীরে নিঃশব্দে খুলে গেল। আমরা নিজেদেরকে একধাক্কায় সিঁড়ির সামনে গিয়ে পড়লাম। আমরা দুজনেই একটা বিবর্ণ আলোর আভা দেখলাম—ঠিক মানুষের আকৃতির মত—কিন্তু আকারহীন ও অস্তিত্বহীন—আমাদের আগে আগে সেটা সিঁড়ি দিয়ে ছাদের উপর উঠতে লাগল।

আমি আলোটা অনুসরণ করলাম, চাকরও পেছনে আসতে লাগল। আলোটা ওপরে উঠে ডানদিকে একটা ছোট চিলেকোঠার ভেতরে ঢুকল, দরজাটা খোলাই রইল। একই সঙ্গে আমিও ভেতরে ঢুকলাম। আলোটা একটা ক্ষুদ্র গোলকে পরিণত হয়ে জ্বলজ্বল করতে লাগল, তারপর সেটা ঘরের কোণে বিছানার ওপর কিছুক্ষণ থেকে কাঁপতে কাঁপতে অদৃশ্য হয়ে গেল।

আমরা বিছানার কাছে এগিয়ে গিয়ে সেটা পরীক্ষা করলাম—একটা পুরনো খাট যা সাধারণতঃ চাকর-বাকরেরা ব্যবহার করে। বিছানার কাছেই একটা খোলা ড্রয়ারে একটা পুরনো বিবর্ণ সিল্কের রুমাল দেখতে পেলাম, তাতে তখনও একটা ছুঁচ গাঁথা রয়েছে, কিছুটা সেলাই করা। রুমালটা ধুলোয় ভর্তি, হয়ত এটা সেই বুড়িটার যে এখানে শেষ মরেছে। আর এঘরটা বোধ হয় তার শোবার ঘর ছিল।

অন্য ড্রয়ারগুলো খুলে দেখবার ঔৎসুক্য হল। [illegible] কিছু পোশাক রয়েছে, একটা ফিকে হলদে রঙের রিবনে দুটো চিঠি বাঁধা। চিঠি দুটো ছাড়া আমার কাছে ঘরে লক্ষ্যণীয় আর কিছু চোখে পড়ল না। এমনকি আলোটাও আর দেখা গেল না। কিন্তু আমরা যখন ঘর থেকে বেরোবার জন্যে [illegible] দাঁড়িয়েছি ঠিক সেই সময়ে স্পষ্ট শুনতে পেলাম আমাদের আগে আগে পা ফেলার শব্দ হচ্ছে।

আমরা অন্য চিলেকোঠাগুলো ঘুরে ঘুরে দেখলাম, সবশুদ্ধ চারটে ঘর আছে। সবসময়ে পদশব্দটা আমাদের আগে আগে চলছে। কিছুই দেখা যাচ্ছে না কেবল পদশব্দ শোনা যাচ্ছে। আমার হাতে চিঠিগুলো রয়েছে। ঠিক যখন আমি সিঁড়ি দিয়ে নামতে যাব, স্পষ্ট অনুভব করলাম আমার কব্জিটা কেউ ধরেছে এবং মৃদু চাপ দিয়ে আমার হাত থেকে চিঠিগুলো নেবার চেষ্টা করছে। আমি আরো জোরে সেগুলো চেপে ধরে রইলাম এবং তারপর সে প্রচেষ্টা থেমে গেল।

আমরা আবার আমাদের শোবার ঘরে ফিরে এলাম। সেইসময় আমি লক্ষ্য করলাম কুকুরটা আমাদের সঙ্গে যায়নি। সে আগুনের খুব কাছে বসে কাঁপছে। চিঠিগুলো পড়ার জন্যে আমি খুব উতলা হয়ে উঠলাম। যখন আমি সেগুলো পড়ছি তখন আমার চাকর একটা ছোট বাক্স খুলে অস্ত্রগুলো বার করে আমার বিছানার মাথার দিকে একটা টেবিলের ওপর সেগুলো রাখল। তারপর সে কুকুরের কাছে গিয়ে তার গায়ে হাত বুলিয়ে তাকে শান্ত করতে লাগল কিন্তু মনে হল সে যেন কিছুই গ্রাহ্য করছে না।

চিঠিগুলো খুব ছোট, তারিখ দেখে জানা গেল ঠিক পঁয়ত্রিশ বছর আগের লেখা। সেগুলো কোন লোক হয়ত তার কোন মেয়ে বন্ধুকে লিখছে নতুবা কোন স্বামী তার স্ত্রীকে লিখছে। কেবলমাত্র ভাবের প্রকাশের মধ্যে দিয়ে নয় স্পষ্টতই তাতে পূর্ব-সমুদ্রযাত্রার উল্লেখ থেকে জানা যায় যে লেখক একজন সমুদ্র নাবিক। বানান ও হাতের লেখা দেখে বোঝা যায় লোকটি অল্প শিক্ষিত। কিন্তু ভাষা বেশ জোরালো। ভাষার আবেগের মধ্যে ভালবাসার

ইঙ্গিত রয়েছে; তবে মাঝে মাঝে কিছু অপরিস্ফুট; দুর্বোধ্য গুপ্ত কথার ইঙ্গিত রয়েছে যা ভালবাসার নয়—অপরাধের।

আমাদের দুজনেই দুজনকে ভালবাসা উচিত—এইরকম একটা কথা আমার মনে পড়ছে—যদি সবকিছু ফাঁস হয়ে যায় তবে প্রত্যেকেই আমাদের কি ভীষণ অভিসম্পাত করবে।

আবার রাতে তোমার সঙ্গে আর কাউকে ঘরে থাকতে দিও না—কারণ তুমি ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কথা বল।

আর এক জায়গায়: যা ঘটে গেছে তার আর কিছু নেই; আমি তোমাকে বলছি আমাদের বিরুদ্ধে কিছুই নেই যদি না মৃত পুনর্জীবন লাভ করে।

এখানে লাইনের মধ্যে পাকা হাতে লেখা (বোধ হয় মেয়ের)—তারা জানে।

চিঠির শেষে পরের তারিখ দেওয়া একই মেয়ের হাতে লেখা—৪ঠা জুন সমুদ্রে হারিয়ে গেল, একই দিনে যেমন —।

চিঠিগুলো রেখে আমি চিন্তা করতে লাগলাম।

আমার চিন্তাধারা আমার সমস্ত স্নায়ুকে দুর্বল করে তুলতে পারে সেই ভয়ে মনকে আমি শক্ত করে তুললাম যাতে আসন্ন রাত্রির যেকোন অবস্থার সম্মুখীন হতে পারি। আমি উঠে পড়লাম। চিঠিগুলো টেবিলে রেখে আগুনটা একটু খুঁচিয়ে আরো গনগনে করে তুললাম। তারপর আবার ম্যাকলের বইটা খুললাম।

রাত সাড়ে এগারটা পর্যন্ত বেশ নিশ্চিন্ত হয়ে পড়লাম। তারপর বিছানায় শুয়ে আমার চাকরকে বললাম সে তার নিজের ঘরে শুতে যেতে পারে কিন্তু নিজেকে সজাগ করে রাখবে, তাকে দুটো ঘরের মাঝের দরজাটা খুলে রাখতে বললাম। আমার মাথার কাছে টেবিলের ওপর দুটো বাতি জ্বেলে একা ঘরে রইলাম। অস্ত্রের পাশে আমার হাতঘড়িটা খুলে রেখে আবার ম্যাকলে পড়তে শুরু করলাম। আমার বিপরীত দিকে আগুন জ্বলতে লাগল আর কুকুরটা তার সামনে শুয়ে ঘুমোচ্ছে। মিনিট কুড়ি পরেই অনুভব করলাম একটা ভীষণ ঠাণ্ডা হাওয়া আমার গালের পাশ দিয়ে বয়ে গেল। আমার মনে হল আমার ডানদিকে যে দরজাটা দিয়ে সিঁড়ির সামনে দালানের সঙ্গে যাতায়াত করা যায় সেটা বোধ হয় খোলা রয়েছে কিন্তু না, সেটা বন্ধ।

বাঁদিকে তাকালাম, দেখলাম বাতির শিখা বাতাসের বেগে ভীষণভাবে কাঁপছে। ঠিক সেইমুহূর্তে টেবিলের ওপর থেকে আমার হাতঘড়িটা সরে যাচ্ছে—আস্তে আস্তে—কোন হাত দেখা যাচ্ছে না—ঘড়িটা চলে গেল। তড়াক্ করে লাফিয়ে উঠে একহাতে রিভলবার অন্য হাতে ছোরাটা নিলাম; ঘড়ির মত সেগুলোর অবস্থা হবে তা আমি চাই না।

এইভাবে সশস্ত্র হয়ে আমি ঘরের চারদিকে দেখতে লাগলাম, ঘড়ির কোন চিহ্ন নেই। বিছানার মাথার দিকে জোরে থেমে থেমে তিনবার স্পষ্ট আওয়াজ

শুনলাম, আমার চাকর চীৎকার করে বলে উঠল :

আপনি নাকি স্যার ?

না, তৈরি থাক।

কুকুরটাও উঠে পড়ে থাবা গেড়ে বসেছে, কান দুটো তার একবার সামনে আবার পেছনে দ্রুত নাড়াচ্ছে। সে এমন অদ্ভুতভাবে আমার দিকে তাকিয়ে রয়েছে যে আমার সমস্ত মনোযোগ তার ওপরেই ন্যস্ত হয়ে রয়েছে। আস্তে আস্তে সে উঠে দাঁড়াল, তার গায়ের সমস্ত লোম খাড়া হয়ে উঠেছে, কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে সেই অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে।

কুকুরটাকে দেখার তখন আমার সময় ছিল না। আমার চাকর তার ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে, এবং আমি যদি কখনও কোন মানুষের মুখে আতঙ্ক-জনিত কম্পন দেখি তবে সেই সময়ে তার মুখের প্রত্যেক রেখা এমনভাবে বিকৃত হয়েছে যে রাস্তায় তাকে দেখলে আমি চিনতেই পারতাম না। সে আমার পাশ দিয়ে দ্রুতবেগে চলে যেতে যেতে ফিসফিস করে আর ঠোঁট দিয়ে আওয়াজ বেরোল :

পালান ! পালান ! আমার পেছনে আসছে !

সে দালানে যাবার দরজাটা টেনে খুলে সবেগে বেরিয়ে গেল।

অনিচ্ছাকৃতভাবে তার পেছনে দৌড়ে তাকে থামতে বললাম কিন্তু সে কোন কথা কানে নিল না। সিঁড়ির রেলিং ধরে দু'তিনটে সিঁড়ি লাফিয়ে লাফিয়ে নামতে লাগল। সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে শুনলাম সজোরে দরজা খোলার ও বন্ধ হওয়ার আওয়াজ।

আমি সেই ভূতুড়ে বাড়িতে একাই রইলাম।

কয়েকমুহূর্ত আমি ভেবে ঠিক করতে পারলাম না যে চাকরকে আমি অনুসরণ করব কি না। অহঙ্কার ও ঔৎসুক্য এমন কাপুরুষের মত পালিয়ে যাওয়া নিষেধ করল। আমার ঘরে আবার ফিরে এসে দরজাটা বন্ধ করে খুব সতর্কভাবে ভেতরের ঘরের দিকে এগোতে লাগলাম। আমার চাকরের আতঙ্কিত হওয়ার মত কিছুরই মুখোমুখি হলাম না।

আমি আবার দেয়ালগুলো পরীক্ষা করলাম যদি কোন গুপ্ত দরজা থাকে। কোন চিহ্নই দেখতে পেলাম না, এমন কি যে বাদামী কাগজ দিয়ে দেয়াল মোড়া আছে তার মধ্যেও কোন সেলাই দেখতে পেলাম না। তাহলে কি করে সেই বস্তুটি—সে যাই হোক না কেন, যা তাকে এমন ভীত করে তুলেছে—ঘরের মধ্যে ঢুকল, একমাত্র আমার ঘর ছাড়া ?

আমার ঘরে ফিরে এসে মাঝের খোলা দরজাটা বন্ধ করে চাবি দিয়ে আগুনের সামনে দাঁড়িয়ে প্রস্তুত হয়ে প্রতীক্ষা করতে লাগলাম।

আমি উপলব্ধি করলাম কুকুরটা ছুটে দেয়ালের কোণে এমনভাবে দেয়ালে পিঠ দিয়ে শরীরটা কুঁচকে দাঁড়িয়ে আছে মনে হচ্ছে যেন জোর দিয়ে সে দেয়ালের

ভেতর ঢুকে যেতে চাইছে। তার কাছে এগিয়ে গিয়ে তার সঙ্গে কথা বললাম; বেচারা পশু! ভয়ে একেবারে গুটিয়ে গেছে। দাঁতগুলো তার বেরিয়ে পড়েছে, মুখের দুপাশ দিয়ে লালা ঝরছে, তাকে তখন যদি ছুঁতাম সে নিশ্চয়ই আমাকে কামড়ে দিত। মনে হল সে যেন আমাকে চিনতেই পারছে না। কেউ যদি চিড়িয়াখানায় দেখে থাকে কেমন করে একটা সাপ একটা খরগোসকে মন্ত্রমুগ্ধ করে কোণঠাসা করে রেখেছে ঠিক সেইরকম কুকুরটার নিদারুণ যন্ত্রণা কিছুটা উপলব্ধি করতে পারবে।

জন্তুটাকে শান্ত কববার সব চেষ্টাই বৃথা দেখে এবং জলাতঙ্ক রোগে পাগল হওযার মত এর এই অবস্থায় কামড যে বিষাক্ত সেই ভয়ে তাকে একা থাকতে দিলাম। আমার অস্ত্রগুলো আগুনের পাশে টেবিলের ওপর রেখে চেয়াবে বসে আবাব ম্যাকলে পডতে শুরু করলাম।

বিস্ময়কর ও অবিশ্বাস্য কোনকিছু পরীক্ষা নিরীক্ষার সঙ্গে আমি যথেষ্ট পরিচিত বলে এরকম পবিস্থিতিব মধ্যে পড়েও আমাব মনটা বেশ শক্ত করে তুললাম অথবা বলা যেতে পারে মনে সাহস আনলাম। পৃথিবীর বিভিন্ন জাযগায নানারকম অদ্ভুত ও অচিন্তানীয় ব্যাপার প্রত্যক্ষ কবেছি—অদ্ভুত সব ব্যাপাব যা বললে একেবারে বিশ্বাসই হবে না বা অতিপ্রাকৃতের পর্যায়ভুক্ত হবে।

আমাব মতে অতিপ্রাকৃত শক্তি এক অসম্ভব জিনিস। অতিপ্রাকৃত বলতে যা বোঝায় সেটা প্রকৃতির নিয়ম সংক্রান্ত কিছু যাব সম্বন্ধে আমরা একেবাবে অজ্ঞ। সুতরাং আমার সামনে যদি ভূতেব আবিভাব হয়, আমি বলতে পাবি না—অতিপ্রাকৃত শক্তি থাকা সম্ভব, পরন্তু বলা যেতে পাবে—ভূতেব আবির্ভাব, সাধারণ ধারণার বিরুদ্ধে, প্রকৃতির নিয়মানুগ অর্থাৎ অতিপ্রাকৃত নয়।

আমার বইয়েব পাতা ও আলোর মাঝে যেন কিসের একটা ছায়া, ক্রমে পাতাটা অন্ধকারে ঢাকা পড়ে গেল। মুখ তুলে তাকালাম, যা দেখলাম আমার পক্ষে তা বর্ণনা করা দুরূহ।

শূন্যে একটা আবছা অন্ধকার মূর্তি সেটা যে ঠিক মানুষের তা বলা যেতে পারে না তবে কিছুটা সেইরকম আকৃতি যা একটা মানুষের ছায়ার মত। সেই মূর্তিটা এত বিরাট যেন তার মাথাটা কড়িকাঠে গিয়ে ঠেকেছে।

তার দিকে তাকিয়ে আমার শরীরের মধ্যে শীতল শিহরণ খেলছে, সামনে একটা বড় বরফের চাই থাকলেও আমি হয়ত এতটা কাঁপতাম না। আমি জোর করে বলতে পারি এ কাঁপুনিটা কিন্তু ঠাণ্ডার ভয়ে নয়। সেদিকে তাকিয়ে আমি লক্ষ্য করলাম দুটো জ্বলন্ত চোখ আমার দিকে দেখছে। একবার সেটা স্পষ্টই ধরতে পারলাম কিন্তু পরক্ষণেই সেটা অদৃশ্য হয়ে গেল। কিন্তু অন্ধকারের মধ্যে দুটো ফিকে নীল রঙের রশ্মি মাঝে মাঝে দেখা যেতে লাগল। কিছুটা বিশ্বাসে কিছুটা সন্দেহে আমি অপ্রত্যাশিতভাবে দুটো চোখের সম্মুখীন হলাম।

আমি কথা বলার চেষ্টা করলাম কিন্তু গলা দিয়ে কোন আওয়াজ বেরোল না। নিজের মনে ভাবতে লাগলাম—এটা কি ভয়? এটা ভয় নয়! উঠতে চেষ্টা করলাম কিন্তু বৃথা সে চেষ্টা : মনে হল বিশাল কোন ভার আমার মাথায় চাপিয়ে আমাকে বসিয়ে রাখা হয়েছে। আমার শারীরিক ও মানসিক ক্ষমতা হারিয়ে ফেললাম—ক্রমশ আমার মনে আতঙ্কের সৃষ্টি হল—এমন আতঙ্ক যে ভাষায় বর্ণনা করা যায় না।

সাহস হারিয়ে ফেললেও তখনও আমার মধ্যে আত্মাভিমান ছিল। মনে মনে বলতে লাগলাম—এটা আতঙ্ক, ভয় নয়। আমি ভীত না হলে আমার কোন ক্ষতি হতে পারে না। আমাব যুক্তি একে মানতে অস্বীকার করল—এটা একটা মায়া, ভয় নয়।

প্রচণ্ড মনঃশক্তি প্রয়োগ করে অবশেষে আমার হাতটা টেবিলে রাখা অস্ত্রের দিকে বাড়াতে সক্ষম হলাম। সেইসময় আমাব হাতে ও কাঁধে হঠাৎ একটা ধাক্কা খেলাম, আমার হাত শক্তিহীন হয়ে পাশে ঝুলে পড়ল। এমন আতঙ্ক-পীড়িত অবস্থায় আমি লক্ষ্য করলাম বাতির শিখাটা ক্রমে কমে আসতে লাগল কিন্তু একেবারে নিবে গেল না। ফায়ারপ্লেসে আগুনও ঠিক সেইভাবে কমে যেতে লাগল যেন জলন্ত কাঠের আলো ক্রমশ নিবে আসছে। কয়েক মিনিটের মধ্যে সমস্ত ঘবটা অন্ধকারে ভবে গেল।

এইভাবে অন্ধকার ঘরের মধ্যে বসে সেই অন্ধকার বস্তুর প্রতি যে ভীতি আমাকে পেয়ে বসল, যার শক্তি আমি বিশেষভাবে উপলব্ধি করলাম, আমার সমস্ত স্নায়ুতে তার প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। প্রকৃতপক্ষে, আতঙ্ক এমন চরম পর্যায়ে গিয়ে পৌছেছিল যে হয় আমাব সব ইন্দ্রিয়শক্তি হারিয়ে ফেলব নয় সম্মোহিত হয়ে আমি ফেটে পড়ব।

সত্যি আমি বিস্ফারিত হয়েছিলাম।

আমি আমার গলার স্বর ফিরে পেয়েছিলাম যদিও সেটা একটা তীক্ষ্ণ চীৎকার। আমার মনে পড়ছে এধরনেব কথা বলেছিলাম—আমি ভয় করি না, আমার আত্মা ভয় পায় না। এবং একই সময় আমার শক্তি ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছিল।

সেই গভীব আঁধারেও আমি একটা জানালার দিকে ছুটে গিয়ে জানালার পর্দা ছিঁড়ে ফেললাম, জানালার পাল্লা দুটো হাট করে খুলে দিলাম। আমার প্রথম চিন্তা তখন—আলো।

যখন আমি আকাশে চাঁদ দেখলাম—পরিষ্কার, শান্ত তার আলো—একটা আনন্দ আমার আগেকার আতঙ্কের ক্ষতিপূরণ করল। ঐ ওপরে চাঁদের আলো আর নিচে নির্জন রাস্তায় গ্যাস লাইটের আলো। পেছন ফিরে ঘরের ভেতরটা দেখলাম—মৃদুভাবে ঘরের কিছুটায় চাঁদের আলো পড়েছে। সেই অন্ধকার বস্তুটা, সে যাই হোক না কেন, অদৃশ্য হয়েছে। কেবলমাত্র একটা অস্পষ্ট ছায়া

দেখতে পেলাম, মনে হল সেটা আমার সামনের দেয়ালেরই ছায়া।

তখন আমার দৃষ্টি পড়ল টেবিলের ওপর এবং দেখলাম টেবিলের তলার থেকে একটা হাত উঠেছে, কব্জি অবধি দেখা যাচ্ছে। মনে হল আমারই মত রক্তমাংসে গড়া একটা হাত, কিন্তু সেটা যেন এক বয়স্ক লোকের, রোগা, কোঁচকান, ছোট্ট—একজন স্ত্রীলোকের হাত। হাতটা খুব আলতোভাবে টেবিলের ওপর রাখা চিঠি দুটো ধরে আছে। হাত ও চিঠিগুলো—দুটোই অদৃশ্য হয়ে গেল। আবার সেই মাপা তিনটে টোকা মারার আওয়াজ শুনতে পেলাম যা এই অদ্ভুত নাটক শুরু হবার আগে পেয়েছিলাম।

ধীরে ধীরে শব্দটা মিলিয়ে যেতেই সমস্ত ঘরটা যেন মৃদু কেঁপে উঠল। আর সেইসঙ্গে ঘরের শেষ দিকে মেঝে থেকে বুদবুদের মত আলোর ফুলকি উঠতে আরম্ভ করল—বিভিন্ন রঙের, সবুজ, হলদে, লাল—ওপরে-নীচে, এপাশে-ওপাশে চারদিকে সেই আলোর ফুলকিগুলো ঘুরে বেড়াতে লাগল। দেয়াল থেকে অদৃশ্য হাতে একটা চেয়ার এগিয়ে টেবিলের সামনে থেমে গেল।

হঠাৎ সেই চেয়ারে একটা আকৃতি ফুটে উঠতে লাগল—একটা স্ত্রীলোকের মূর্তি পরিগ্রহ করল। সেটা যেন জীবন্ত অথচ মৃত্যুর মত ভয়ঙ্কর। মুখটা যুবতীর, একটা অদ্ভুত শোকাবহ সৌন্দর্য সেই মুখে, গলা ও কাঁধ খালি, বাকি শরীরটা একটা আলগা মেঘের মত সাদা কাপড়ে ঢাকা। কাঁধের ওপর ছড়ানো লম্বা চুলগুলো হাত দিয়ে নাড়াচাড়া করছে। তার চোখ দুটো কিন্তু আমার দিকে নেই, দরজায় তার দৃষ্টি—কিছু যেন শুনছে, লক্ষ্য করছে, কারোর জন্যে অপেক্ষা করছে। পেছন দিকের ছায়াটা যেন ক্রমশ আরো অন্ধকার হয়ে আসছে এবং আবার আমার মনে হল আমি যেন দুটো জলন্ত চোখ দেখছি, দৃষ্টি তার চেয়ারে উপবিষ্ট মূর্তিটার দিকে।

দরজায় আর একটা মূর্তির আবির্ভাব হল যদিও সেটা খুলল না—সেইরকম স্পষ্ট, সেইরকম ভয়ঙ্কর—একটা মানুষের, একজন যুবকের আকৃতি। গায়ের পোশাকটা মনে হল গত শতাব্দীর বা সেই ধরনের। পুরুষ ও স্ত্রীলোকের মূর্তি অশরীরি, স্পর্শাতীত—দুজনেই এক প্রতিমূর্তি, অলীক ছায়ামূর্তি। ঠিক যখন নরমূর্তিটা নারীমূর্তির দিকে এগোচ্ছে এমন সময় সেই অন্ধকার ছায়া সামনের দিকে এগিয়ে এল—মুহূর্তের মধ্যে তিনটি অন্ধকারে ঢেকে গেল।

সেইদিকে আলোটা পুনরায় আবির্ভাব হতেই দেখা গেল দুজনের মধ্যে সে দাঁড়িয়ে দুজনকে ধরে রয়েছে। মেয়েটার বুকে রক্ত-চিহ্ন; লোকটা ভূতুড়ে তরোয়ালের ওপর ঝুঁকে রয়েছে, তার ঘাড় থেকে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত ঝরছে, মাঝের অন্ধকারে মূর্তিটা সেই রক্ত পান করছে। তারা সকলেই অদৃশ্য হয়ে গেল। আবার বুদবুদের মত আলোর ফুলকি ঘুরতে ঘুরতে ক্রমশ সেগুলো বড় হতে লাগল।

ফায়ারপ্লেসের ডান দিকের দরজাটা খুলে গেল, সেখান থেকে একজন

বয়স্ক স্ত্রীলোকের মূর্তি বেরিয়ে এল। তার হাতে চিঠিগুলো ধরা রয়েছে—সেই চিঠিগুলো যে হাত দিয়ে ধরা ছিল। তার পেছনে পায়ের শব্দ শোনা গেল। সে ঘুরে দাঁড়িয়ে কিছু শোনার চেষ্টা করল এবং তারপর সে চিঠিগুলো খুলে মনে হল পড়ছে। তার কাঁধের ওপর দিয়ে একটা বিবর্ণ মুখ দেখতে পেলাম—বহুদিন জলে ডুবে থাকা একজন মানুষের মুখ—ফ্যাকাশে সাদা, ফুলো, জলে ভেজা চুলে সামুদ্রিক আগাছা জড়িয়ে রয়েছে। এবং স্ত্রীলোকটির পায়ের কাছে একটা ছোট শবের আকৃতি পড়ে রয়েছে, তার পাশে গুটিসুটি মেরে একটা শিশু—দারিদ্র্য-পীড়িত দুঃখিত শিশু, গাল দুটো শুকনো, চোখে ভয়ের চিহ্ন। বয়স্ক স্ত্রীলোকটির মুখের দিকে তাকাতেই দেখলাম তার মুখের কোঁচকানো দাগ অদৃশ্য হয়েছে এবং যুবতীর মুখ ফিরে এসেছে—কঠিন চক্ষু, স্থির কিন্তু তবু যৌবনে ভরা। সেই ছায়ামূর্তি আবার ছুটে এসে সব মূর্তিকে আগের মত অন্ধকারে ঢেকে ফেলল।

আবার ঘরটা কেঁপে উঠল, আবার তিনবার টোকা মারার শব্দ শোনা গেল, আবার সবকিছু অন্ধকারের মধ্যে মিশে গেল। অন্ধকার থেকেই সবকিছুর আবির্ভাব হয়েছিল আবার অন্ধকারের মধ্যেই সবকিছু মিলিয়ে গেল।

অস্পষ্টতা দূর হতেই ছায়াও ধীরে ধীরে চলে গেল। ফায়ারপ্লেসে আগুন গনগনে হয়ে উঠল, বাতির শিখা বেড়ে গেল। সমস্ত ঘরটার মধ্যে আবার একবার শান্তভাব ফিরে ফিরে এল, সবকিছুই পরিষ্কারভাবে দৃষ্ট হল।

দুটো দরজা তখনও বন্ধ, চাকরের ঘরের দরজাটা তালা দেওয়া। দেয়ালের কোণে কুকুরটা হাত পা ছড়িয়ে পড়ে আছে। আমি তাকে ডাকলাম—কোন নড়ন চড়ন নেই। কাছে গিয়ে দেখলাম কুকুরটা মরে গেছে। চোখ দুটো ঠিকরে বেরিয়ে এসেছে, জিবটা মুখ থেকে বেরিয়ে পড়েছে, চোয়ালের দুপাশে ফেনা জমে রয়েছে। তাকে দুহাতে তুলে নিয়ে আগুনের কাছে আনলাম। আমার প্রিয় কুকুরটার এইভাবে মৃত্যু হওয়াতে গভীর দুঃখ অনুভব করলাম। তার মৃত্যুর জন্যে নিজেকে দায়ী করলাম। আমার ধারণা ভয়ে তার মরণ হয়েছে। সব থেকে যেটা আমার কাছে আশ্চর্য লাগল সেটা হচ্ছে ঘাড়টা তার ভাঙা—যেন কেউ তার ঘাড়টা মচকে দিয়েছে। অন্ধকারের মধ্যে কি এটা করা হয়েছে? আমার মত কোন মানুষের হাত দিয়ে নিশ্চয়ই এটা করা হয়নি? এই সময়ের মধ্যে নিশ্চয়ই ঘরে কোন মানুষ ছিল না? সন্দেহ করার যথেষ্ট কারণ আছে। আমি বলতে পারব না। আসল ঘটনা বিবৃত করা ছাড়া আর কিছু বলতে পারব না, পাঠক নিজেই সিদ্ধান্ত করুন।

আর একটা আশ্চর্যকর ঘটনা—আমার ঘড়িটা যে রহস্যজনকভাবে উধাও হয়েছিল আবার সেটা টেবিলে ফিরে এসেছে, কিন্তু যেমুহূর্তে অপহৃত হয়েছিল তখনই এটা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। কয়েক ঘণ্টা হয়ত ঘড়ি মেরামতকারীর কায়দায় এটা চলবে তবে ঠিকমত নয় এবং তারপরে একেবারে থেমে যাবে।

বাকী রাতটুকুর মধ্যে আর কিছুই ঘটল না। দিনের আলো না বেরোন পর্যন্ত আমি সেই ভূতুড়ে বাড়ি ছেড়ে চলে আসিনি। চলে আসবার আগে সেই ছোট ঘরটা দেখতে গেলাম যেখানে আমি ও আমার চাকর কিছুক্ষণের জন্য বন্দী হয়েছিলাম।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস, যদিও ঠিক কারণ বলতে পারব না, এই ঘর থেকেই ভূতুড়ে কাণ্ডের সবকিছুর উৎপত্তি যা আমি আমার ঘরে প্রত্যক্ষ করেছি। যদিও দিনের আলোয় আমি এঘরে ঢুকেছি, জানালা দিয়ে সূর্যের আলো ঢুকছে, তবু মেঝেয় দাঁড়িয়ে আমার গা ভয়ে শিরশির করছে কারণ এই ঘর থেকেই গতরাতের আমার প্রথম অভিজ্ঞতা শুরু।

বাস্তবিক আধ মিনিটের বেশী সেই ঘরে আমি থাকতে পারিনি। সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামতে নামতে আমার আগে আবার সেই পায়ের শব্দ শুনতে পেলাম। যখন সদর দরজা খুললাম তখন স্পষ্ট একটা চাপা হাসির শব্দ কানে এল। বাড়ি গিয়ে আমার পালিয়ে যাওয়া চাকরকে দেখবার আশা করলাম। কিন্তু তাকে দেখতে পেলাম না এমনকি তিনদিন তার সম্বন্ধে কিছু শুনতে পেলাম না তার লেখা লিভারপুল থেকে একটা চিঠি পেলাম, তাতে লেখা :

মাননীয় মহাশয়,

বিনীতভাবে আমি আপনার ক্ষমা প্রার্থী যদিও আমি তা আপনার কাছ থেকে আশা করি না, কারণ ভগবান দোহাই—আপনি দেখেছিলেন আমি কি করেছি। নিজেকে ফিরে পেয়ে আবার কাজ করতে আমার বেশ কয়েক বছর লাগবে। এখন কোন প্রশ্নই ওঠে না। সুতরাং আমি এখন মেলবোর্ণে আমার শ্যালকের কাছে যাচ্ছি। জাহাজ আগামীকাল ছাড়বে। হয়ত দূর সমুদ্র-যাত্রা আমার পক্ষে ভাল হবে। আমি এখন কিছুই করিনা তবে মাঝে মাঝে হঠাৎ ভয় পেয়ে চমকে উঠি, মনে হয় আমার পেছনে কেউ যেন রয়েছে। আপনার কাছে আমার বিনীত প্রার্থনা মহাশয় যে আমার জামাকাপড় ও পাওনা মাইনা আমার মাযের নামে ওয়ালওয়ার্ণে পাঠাইয়া বাধিত করিবেন, জন তাঁর ঠিকানা জানে।

The House and the Brain—*Edward Bulwer-Lytton*

কারমিলা

প্রথম অধ্যায়

প্রথম আতঙ্ক

আমরা খুব উঁচুদরের লোক না হয়েও সিরিয়াতে একটা বড় প্রাসাদে বাস করতাম। পৃথিবীর সেই অংশে অল্প আয় হলেও বেশ জাঁকজমকে থাকা যায়। বছরে আটশ' নয়শ রোজগার থাকলে অবাক করার ব্যাপার। ধনী লোকদের মধ্যে অল্প হলেও আমাদের খুব নাম ছিল। আমার বাবা ছিলেন ইংরেজ, সেইজন্যে আমার নামও ইংরেজদের মত, কিন্তু আমি কখনও ইংলণ্ডে যাইনি। এখানে, এই নিজন ও সেকেলে জায়গায় সবকিছুই অদ্ভুত সস্তা। কিভাবে এত টাকা আমাদের সুখ স্বাচ্ছন্দে বা বিলাসিতায় লাগতে পারে তা আমি সত্যিই পাচ্ছি না।

আমার বাবা অষ্ট্রিয় সরকারের চাকরি করতেন। সেখান থেকে অবসর নিয়ে পেনসান ও পৈতৃক সম্পত্তি পেয়ে এই জমিদার ও প্রাসাদ সংলগ্ন ছোট জমিদারী খুব সস্তায় কিনে নেন। এমন ছবির মত সুন্দর জায়গা আর হতে পারে না। বনের ঠিক মুখেই এই বাড়ি। পুরনো সরু রাস্তা পরিখার পুলের সামনে দিয়ে চলে গেছে। আমার সময় এই পুলটা কখনও ওঠাতে দেখিনি। পরিখার জল মাছে ভর্তি, কত রাজহাঁস জলে চরে বেড়ায়, পদ্মফুল ফুটে থাকে। এর ওপর বাড়িটার সামনের দিকে অনেক জানালা, উঁচু টাওয়ার এবং গথিক গীর্জাও আছে।

গেটের সামনে অল্প অল্প গাছ ও ফাঁকা জায়গা ছবির মত দেখায়। ডানদিকে ছোট নদীটার ওপর একটা খাড়াই গথিক পুল পার হয়ে রাস্তায় পড়া যায়। এই জলধারা বনের মধ্যে দিয়ে চলে গেছে।

আমি বলেছি এটা একটা খুব নির্জন জায়গা। এখন আপনারাই এর সত্যতা বিচার করুন। হলঘরের দরজা দিয়ে রাস্তার দিকে তাকালে দেখা যাবে যে বনের সামনে আমাদের এই দুর্গ অবস্থিত তা ডানদিকে পনের মাইল এবং বাঁদিকে বার মাইল বিস্তৃত। খুব কাছে যে বসবাসকারী গ্রাম সেটা বাঁদিকে ইংরেজি সাত মাইল দূরে। কোন ঐতিহাসিক সম্বন্ধযুক্ত আবাসিক দুর্গ বলতে যেখানে বৃদ্ধ জেনারেল স্পিয়েলসডর্ফ থাকেন সেটা ডানদিকে এখান থেকে কুড়ি মাইল দূর।

আমি বলেছি কাছাকাছি আবাসিক গ্রাম কারণ জেনারেল স্পিয়েলসডর্ফের দুর্গের দিকে তিন মাইল পশ্চিমে এক পরিত্যক্ত গ্রাম আছে। সেখানে একটা অদ্ভুত অথচ মনোরম ছাদহীন গীর্জা আছে যার চত্বরে ছাঁচে তৈরি বিখ্যাত

কার্নষ্টাইল পরিবারের সমাধিস্তম্ভ রয়েছে। অধুনালুপ্ত এই পরিবার একসময় গভীর বনের মধ্যে ধ্বংসপ্রাপ্ত শহরের দিকে মুখ করে অবস্থিত বর্তমানে পরিত্যক্ত দুর্গের মালিক ছিল।

এই আকর্ষণীয় ও বিষাদময় জায়গার পরিত্যাক্তের কারণ হিসাবে যে কাহিনী প্রচলিত আছে তা অন্য একসময়ে আমি বলব।

এখন আমার বলার কথা, এই দুর্গের মধ্যে আমরা খুব কম কয়েকজনই থাকি। আমি চাকর বা অন্য পোষ্য কাউকে ধরছি না যাবা এখানে থাকে। শুনুন এবং অবাক হন! আমার বাবা খুবই দয়ালু লোক এবং ক্রমশ বৃদ্ধ হয়ে উঠছিলেন এবং যখনকার এই গল্প বলছি তখন আমার বয়স উনিশ। আট বছর পার হয়ে গেছে। সেখানে পরিবার বলতে আমি আব বাবা। আমাব মা ছিলেন একজন স্টিরীয়দেশী মহিলা এবং আমার শৈশবেই তিনি মারা যান। তখন থেকে আমি একজন সৎ স্বভাববিশিষ্ট আযার কাছে মানুষ হয়েছি। আমি ঠিক মনে করতে পারছি না কবে থেকে তার সেই মোটা, সদাশয় মুখটা আমার স্মৃতি থেকে মুছে গেছে। তার নাম ছিল ম্যাডাম পেবোডোন, বার্নের অধিবাসী। আমার মাতৃহারা হৃদয়কে যত্ন ও ভালবাসার মধ্যে দিয়ে ভুলিয়ে রেখেছিল। আমাদেব ছোট ডিনার পার্টিতে সে ছিল তৃতীয়—চতুর্থ জন ছিল যার নাম মাডাময়েসেল ডি লা ফনটেন, যাকে বলা যেতে পারে উৎকর্ষ সাধনার্থ সমাপক আয়া। সে ফরাসী ও জার্মান ভাষা বলত, ম্যাডাম পেরোডোন বলত ফরাসী ও ভাঙা ইংরাজী এবং আমি ও আমার বাবা তার সঙ্গে ইংরাজী যোগ করতাম। কিছুটা স্বদেশভক্তের মত আমরা রোজই এই ভাষা ব্যবহার করতাম। এই জগাখিচুড়ি ভাষা ব্যবহার করাব ফলে হত এক বিশৃঙ্খলা যা লোকে শুনে ও দেখে হাসত এবং আমিও সেবিষয়ে আর এখানে বলার চেষ্টা করব না। এছাড়া আবও দু তিনজন কমবয়েসী মেয়ে বন্ধু ছিল, মাঝে মাঝে তারা আসত, আমিও তাদের বাড়িতে কখনও সখনও যেতাম।

এই ছিল আমাদের সামাজিক আদান-প্রদান। কিন্তু আঠার-বিশ মাইলের মধ্যে পড়শীরাও আমাদের সঙ্গে দেখা করতে আসত। যাহোক আমি নিশ্চয় করে বলতে পারি আমার জীবন একরকম একাকী ছিল।

আমার জীবনে প্রথম যে ঘটনা ঘটে সেটা খুবই ভয়ঙ্কর। আমার শৈশব জীবনের সে ঘটনা মন থেকে কখনও মুছে যায়নি। হয়ত অনেকে মনে করতে পারেন এমন এক তুচ্ছ ঘটনা এখানে উল্লেখ না করাই ভাল। কিন্তু ক্রমশঃ পাঠকেরা এটা পড়তে পড়তে বুঝতে পারবেন কেন আমি এ ঘটনার কথা বলছি। দুর্গের ওপর তলায় একটা বড ঘব, ওক কাঠ দিয়ে তার ছাদ তৈরি করা। এটাকে নার্সারী বলা হলেও আমি একাই সে ঘরটা দখল করেছিলাম। তখন আমার বয়স ছ' বছরের বেশী নয়। একদিন রাতে হঠাৎ আমার ঘুম ভেঙে যায়। বিছানায় শুয়ে ঘরের চারদিকে তাকিয়ে কোথাও ধাইমাকে

দেখতে পেলাম না। এমনকি অন্য কোন পরিচারিকাকেও সে ঘরে দেখতে না পেয়ে আমি নিজেকে একলা বোধ করলাম। আমি কিছুমাত্র ভীত হলাম না কারণ কোন ভূতুড়ে গল্প বা রূপকথার গল্প আমাকে শোনান হত না। ফলে হঠাৎ দরজায় ক্যাঁচর-ক্যাঁচর শব্দ হলে কিংবা বাতির শিখায় দেয়ালে ছায়া নড়াচড়া করলে স্বাভাবিকভাবে মনের মধ্যে যে একটা ভয়ের সঞ্চার হয়, সে ব্যাপার ঘটার কোন সম্ভাবনা ছিল না। আমি নিজেকে এইভাবে অবহেলিত বোধ করে বিক্ষুব্ধ ও অপমানিত হয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলাম। ক্রমশঃই সেটা উচ্চ চীৎকারে পরিণত হল। সেইসময় আমি বিস্মিত হয়ে দেখলাম একটা সুন্দর মুখ আমার বিছানার পাশ থেকে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। বিছানার চাদরে দুহাত রেখে হাঁটু গেড়ে সেই সুন্দরী বসে রয়েছে। আমি ফোঁপানি থামিয়ে পুলকিত বিস্ময়ে তার দিকে দেখতে লাগলাম। সে আমাকে হাত দিয়ে আদর করল, আমার পাশে বিছানায় শুয়ে আমাকে কাছে টেনে নিয়ে মৃদু হাসতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে আমি অদ্ভুত শান্ত হয়ে আবার ঘুমিয়ে পড়লাম। একটা কিছুর অনুভূতিতে আমার ঘুমটা ভেঙে গেল, মনে হল আমার বুকের গভীরে একজোড়া ছুঁচ ঢুকে যাচ্ছে। আমি চীৎকার করে উঠলাম। মেয়েটা পেছিয়ে গিয়ে আমার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল এবং তারপরই মেঝেয় গড়িয়ে পড়ে বিছানার তলায় লুকিয়ে পড়ল বলে আমার মনে হল।

এই প্রথম আমি ভয় পেলাম এবং যত জোরে পারলাম চীৎকার করে উঠলাম। নার্স, ধাইমা, বাড়ির পরিচারিকা সকলেই একসঙ্গে ছুটে এল। আমার কথা শুনে, সেটা উড়িয়ে দিয়ে আমাকে নানাভাবে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু আমি শিশু হলেও কোন কিছুর উদ্বিগ্নতাবশত তাদের মুখ সাদা ফ্যাকাসে হয়ে যেতে দেখলাম। আমি আরো দেখলাম তারা বিছানার তলায়, ঘরের চারদিকে, টেবিলের তলায় আলমারীর পেছনদিকে উঁকিঝুঁকি দিতে লাগল। বাড়ির পরিচারিকা নার্সকে ফিসফিস করে বলতে লাগল: বিছানার ওই গর্তটায় তোমার হাত রাখ, কেউ ওখানে শুয়েছিল, তুমি যে নও সেবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই ত, জায়গাটা এখনও গরম।

আমার মনে পড়ছে ধাইমা আমাকে আদর করতে লাগল, বাকী তিনজন আমার বুকটা পরীক্ষা করতে লাগল যেখানে আমি ছুঁচ ফোটার ব্যথা অনুভব করেছিলাম। তারা বেশ জোর দিয়ে বলল এমন কোন চিহ্ন দেখা যাচ্ছে না যাতে সেরকম কিছু ঘটেছিল বোঝা যায়।

বাড়ির পরিচারিকা ও বাকি দুজন সারারাত বসে থেকে আমাকে পাহারা দিল। সেই থেকে আমার চৌদ্দ বছর বয়স পর্যন্ত একজন করে সেই ঘরে বসে থাকত।

এই ঘটনার পর থেকে অনেকদিন পর্যন্ত আমি নার্ভাস হয়ে পড়েছিলাম। একজন ডাক্তার ডাকা হয়েছিল, তিনি লোলচর্ম বৃদ্ধ। তার বিষণ্ণ অলস বসন্ত-

দাগ মুখটা, বাদামী রঙের পরচুলা পরা চেহারা আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। বেশ কিছুদিন ধরে একদিন অন্তর সে আসত আর ওষুধ দিয়ে যেত। আমার মোটেই পছন্দ হত না।

এই ভূত দেখার পরেরদিন থেকেই আমি এমন আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ি যে দিনের বেলাতেও একা থাকতে ভরসা পেতাম না।

আমার মনে পড়ছে আমাব বাবা ওপরে উঠে এসে আমার বিছানার পাশে দাঁড়াতেন এবং আমার সঙ্গে বেশ হাসি তামাশার মধ্যে দিয়ে কথা বলতেন। নার্সকে নানা প্রশ্ন করতেন, কোন কোন উত্তব শুনে মন খুলে হাসতেন। আমার কাঁধে চাপড় দিয়ে আদর কবতেন, আমাকে চুমো খেতেন। আমাকে ভয় না পাবাব জন্যে সাহস দিতেন, বলতেন এসব স্বপ্ন, কোন ক্ষতি করতে পারে না।

কিন্তু আমি কোন সান্ত্বনা বোধ করতাম না কারণ আমি জানতাম সেই মেয়েটাব আসাটা স্বপ্ন নয় এবং আমি ভীষণভাবে ভয় পেয়েছিলাম।

ধাই-মা আমাকে এই বলে আশ্বস্ত কবাব চেষ্টা করল যে সেই রাতে বিছানার কাছ থেকে আসতে দেখেছিল, আমার পাশে শুয়েছিল, আধা ঘুমন্ত অবস্থায় তার মুখটা আমি চিনতে পারিনি। নার্স এককথায় সায় দিলেও আমি কিন্তু সন্তুষ্ট হইনি।

আমার মনে পড়ছে দিনের বেলায় কালো আলখাল্লা পরা এক বুড়ো ধর্মযাজক নার্স ও পরিচারিকাব সঙ্গে আমার ঘরে এল। তাদের সঙ্গে কিছু কথা বলে আমার দিকে সদয় দৃষ্টিতে দেখল। তার মুখটা খুব মিষ্টি ও শান্ত। আমাকে বলল তার ঈশ্বরেব উদ্দেশ্যে প্রার্থনা জানাবে, আমার হাত দুটো জোড়া করিয়ে আস্তে একথাগুলো বলতে বলল: যীশুর নামে, হে ঈশ্বর, আমাদের সশ্রদ্ধ প্রার্থনা শুনুন। এই কথাগুলোই আমি বারবার উচ্চারণ করতে থাকি। আমার নার্স বেশ কয়েক বছর এই কথাগুলো আমার প্রার্থনার মধ্যে দিয়ে মুখস্থ করিয়ে দিয়েছিল।

আমার মনে পড়ছে সেই পাকাচুল বৃদ্ধ কালো আলখাল্লা পরা চিন্তান্বিত মিষ্টি মুখখানা, তিনশ বছরের পুরনো ফার্নিচারে ভর্তি উঁচু নোংরা ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে, ঘরের ঘুলঘুলি দিয়ে মৃদু আলো এসে ঘরটাকে আলো-আঁধারিতে ভরিয়ে তুলেছে। তিনজন মেয়ের সঙ্গে সেই ধর্মযাজক হাঁটু গেড়ে বসে কাঁপা গলায় চীৎকার করে প্রার্থনা করতে লাগল। সেই ঘটনার আগের ও পরের সবকিছুই অস্পষ্ট হয়ে গেছে কিন্তু যে ঘটনাগুলো আমি এইমাত্র বলেছি সেগুলো অন্ধকারের মধ্যে অলীক ছায়ামূর্তির প্রবাহের মত জ্বলজ্বল করে চোখের সামনে এখনও জ্বলছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

অতিথি

আমি এখন এমন অদ্ভুত কিছু বলতে যাচ্ছি যা সত্যি বলে বিশ্বাস করতে গেলে আমার সত্যবাদিতার ওপর আপনাদের আস্থা রাখার প্রয়োজন। এটা যে কেবল সত্যি তা নয়, প্রকৃত ঘটনার আমি স্বাক্ষী।

সেদিন ছিল গরমের এক মধুর সন্ধ্যা। আমার বাবা যেমন বলে থাকেন তেমনি সেদিনও তাঁর সঙ্গে আমাকে আমাদের দুর্গের সামনে বনের মধ্যে একটু ঘুরে আসবার জন্যে বললেন।

হাঁটতে হাঁটতে বাবা বললেন, আমি আশা করছি জেনারেল স্পিয়েলসডর্ফ এত তাড়াতাড়ি আমাদের কাছে আসতে পারবেন না।

বেশ কয়েক সপ্তাহ আগে তিনি আমাদের সঙ্গে দেখা করেছেন এবং আমরা পরের দিন তাঁর আসার অপেক্ষায় ছিলাম। তাঁর ভাইঝি ও মেয়ের মত রাইনফেলডটকে তাঁর সঙ্গে নিয়ে আসার কথা। তাকে আমি কখনও দেখিনি কিন্তু শুনেছি স নাকি খুব সুন্দরী এবং যার সঙ্গে মনে মনে ঠিক করেছি আনন্দেই দিন কাটাব। তার এই আগমন ও নতুন পরিচয়ের প্রতিশ্রুতি আমার মনে বহুদিন ধরে দিবাস্বপ্নের মত ছিল।

আমি জানতে চাইলাম কবে তিনি আসবেন।

শরৎকালের আগে নয়। দু মাসের মধ্যে ত' নয়ই। বাবা বললেন। এবং তুমি যে রাইনফেলডট্‌কে জানন৷ তাতে আমি খুব খুশি।

কেন? কিছুট৷ অবাক হয়ে কিছু অনুসন্ধিৎসু হয়ে জানতে চাইলাম।

কারণ বেচারা মেয়েটি মারা গেছে। আমি তোমাকে বলতে ভুলে গেছি, আজ সন্ধ্যায় আমি যখন জেনারেলের চিঠি পাই তখন তুমি ঘরে ছিলে না।

আমি ভীষণ আঘাত পেলাম। ছ সাত সপ্তাহ আগে তাঁর প্রথম চিঠিতে জানিয়েছিলেন মেয়েটার শরীর ভাল যাচ্ছে না কিন্তু সেটা যে এমন বিপজ্জনক হবে তার বিন্দুমাত্র বোঝা যায়নি।

এই যে জেনারেলের চিঠি, এই বলে বাবা আমার হাতে দিলেন। আমার মনে হয় তিনি নিদারুণ শোকে কাল কাটাচ্ছেন। চিঠিটা দেখে মনে হয় তিনি বিহ্বল চিত্তে এটা লিখেছেন।

একসারি সুন্দর বাতাবিলেবু গাছের তলায় একটা এবড়ো-খেবড়ো বেঞ্চির ওপর আমরা বসলাম। দূরদিগন্তে অস্তমিত সূর্যের ছটা আকাশকে বিষাদের রঙে রাঙিয়ে তুলেছে। যে ছোট নদীটা আমাদের বাড়ির পাশ দিয়ে খাড়া পুলের নিচ দিয়ে বয়ে চলেছে সেটা আমাদের সামনে দেখা যাচ্ছে, তার জলে আকাশের গাঢ় লাল রঙ প্রতিফলিত হয়েছে। জেনারেলের চিঠিটা এমন অদ্ভুত, এমন উদ্দীপ্ত এবং মাঝে মাঝে এমন স্ববিরোধী যে সেটা আমি দুবার

পড়লাম। দ্বিতীয়বারের বেলায় চীৎকার করে পড়লাম কিন্তু তবুও ঠিকমত চিঠিটা বুঝতে পারলাম না। কেবলমাত্র এটুকু বোঝা গেল তাঁর মনটা শোকে বিচলিত।

এতে লেখা আছে, আমার অতি প্রিয় কন্যাকে আমি হারিয়েছি, আমি তাকে কত ভালবাসতাম। আমার বার্থার অসুখের শেষ দিনগুলোতে আমি আপনাকে চিঠি লিখতে পারিনি। আগে আমি তার কোন বিপদের কথা ভাবিনি। আমি তাকে হারিয়েছি, এখন সব জানতে পেরেছি কিন্তু অনেক দেরি হয়ে গেল। সে ভবিষ্যৎ সুখের আশায় পাপশূন্যতার শান্তিতে মরেছে। শয়তান আমাদের চরম আতিথ্যকে বিশ্বাসঘাতকতা করে এই কাজ করেছে। আমি ভেবেছিলাম আমার হারান বার্থার এক নিষ্পাপ, আমুদে বন্ধুকে বাড়িতে ঢুকিয়েছি। ও ভগবান! আমি কি বোকা! আমি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাই যে সে তার দুঃখের কোন কারণ না জেনেই মরেছে। তার অসুস্থতার সমস্ত দুঃখের অভিশাপের কারণ না জেনেই সে মরেছে! আমার বাকি দিন-গুলো সেই দানবকে খুঁজে বার করতে ও ধ্বংস করতেই কেটে গেছে। আমাকে সকলে সান্ত্বনা দিয়েছিল আমি যেন আমার ন্যায়পরায়ণ ও ক্ষমাশীল উদ্দেশ্য সার্থক করে তুলতে আমি আশাব্যঞ্জক হয়ে উঠি। বর্তমানে আমাকে চালনা করার মত কোন আশার আলো দেখছি না। আমার অবিশ্বাসী আত্মগর্বকে, আমার জঘন্য আত্মম্ভরিতাকে, আমার অন্ধত্বকে, গোঁড়ামিকে—আমি ধিক্কার জানাই, কিন্তু অনেক দেরি হয়ে গেছে। আমি গুছিয়ে লিখতে বা বলতে পারি না। আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছি। একটু সুস্থ হয়ে উঠলেই এব্যাপারে অনুসন্ধান করবার জন্যে হয়ত আমাকে সুদূর ভিয়েনাতেও যেতে হতে পারে। দুমাস বাদে, শরৎকালের কোন সময় কিংবা তার আগে যদি আমি বেঁচে থাকি, আপনার সঙ্গে দেখা করব—অবশ্যি যদি আপনি মত দেন। আমি তখন আপনাকে সব বলব, এই কাগজে এখন কিছু লিখতে আমার সাহস হচ্ছে না। বিদায়। হে আমার প্রিয় বন্ধু, আমার জন্যে প্রার্থনা করুন।

এইভাবে এই অদ্ভুত চিঠি শেষ হয়েছে। যদিও আমি কখনও বার্থা রাইনফেলডট্‌কে দেখিনি কিন্তু এই চিঠি মারফৎ তার কথা পড়ে আমার চোখ দুটো জলে ভরে উঠল। এই আকস্মিক খবর আমার চমক সৃষ্টি করল সেইসঙ্গে গভীর হতাশায় গ্রস্ত করে তুলল।

তখন সূর্য অস্ত গেছে। গোধূলির আলোয় আমি জেনারেলের চিঠিটা বাবাকে ফেরত দিলাম। আমরা দুজনে অন্যমনস্কভাবে হাঁটতে হাঁটতে চিঠিটার প্রকৃত মর্মোদ্ধার করার চেষ্টা করছি। আমাদের বাড়ির সামনে রাস্তায় এসে পড়তে প্রায় একমাইল যেতে হলো। ততক্ষণে চাঁদের আলো চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। টানা পুলের কাছে আমাদের সঙ্গে ম্যাডাম পেরোডোন ও ডি লাফোনটাইনের দেখা হল। তারা মাথায় বনেট না পরেই এই সুন্দর সন্ধ্যার

চন্দ্রকিরণ উপভোগ করার জন্যে বেরিয়েছে।

আমরা সামনে এগিয়ে যেতে তাদের প্রাণোচ্ছল বকবকানি কানে এল। তাদের সঙ্গে মিলে এই মনোরম সন্ধ্যার প্রশংসায় মেতে উঠলাম।

আমাদের সামনে বন, বাঁদিকের সরু পথটা লম্বা লম্বা গাছের মধ্য দিয়ে ঘন বনের ভেতর মিলিয়ে গেছে। সেই পথটাই আবার বনের মধ্যে পাক খেয়ে ডান দিকে উঁচু খাড়া পুল পার হয়ে চলে গেছে দূরে। এই পুলটার কাছে সেই টাওয়ারের ভগ্নাবশেষ একসময়ে যেটা এই রাস্তা থেকে নজরে পড়ত। পুলের ওপাশে উঁচু পাহাড়ের সারি। নিচে জমির ওপর পাতলা কুয়াশার চাদর ঢাকা, মাঝে মাঝে আঁকাবাঁকা নদীর জলে চাঁদের আলো পড়ে চিকচক করছে।

এমন মনোরম, মধুর দৃশ্য কল্পনা করা যায় না। যে খবরটা এইমাত্র শুনেছি সেটা যেন এসব সৌন্দর্যকে ম্লান করে দিয়েছে। কিন্তু এই গভীর শান্তভাব কিছুতেই ভঙ্গ হবার নয়।

আমার বাবা এবং আমি, দুজনেই এই মনোরম সৌন্দর্য নিঃশব্দে উপভোগ করছি। আমাদের থেকে একটু দূরে দাঁড়িয়ে, দুই গভর্নেস, চাঁদের দিকে তাকিয়ে মাতোয়ারা হয়ে পড়েছে।

ম্যাডাম পেরোডোন মোটা মনোবৃত্তির, রোমান্টিক, তার কথাবার্তা কাব্যময়। ডিলাফন্টাইন-জার্মানদেশীয়, মনোবিদ, অধিবিদ ও কিছুটা রহস্যময়তার ভান করে বলে যে চাঁদ যখন এমন উজ্জ্বলভাবে তার কিরণ ছড়ায় তখন পারলৌকিক কিছুর ইঙ্গিত করে। পূর্ণচন্দ্রের এই উজ্জ্বল কিরণের প্রভাব অনেক।—স্বপ্নে, উন্মত্ততায়, ভীতু লোকের মনে এর কার্য সুদূরপ্রসারী, জীবনের সঙ্গে সংযুক্ত দৈহিক প্রভাবও বিস্ময়কর। ডি লাফন্টাইন গল্প করতে লাগল, তার ভাইপো এক বাণিজ্যিক জাহাজের মেট ছিল। এইরকম এক চাঁদনি রাতে ডেকের ওপর চিৎ হয়ে শুয়ে চাঁদের দিকে মুখ করে ঘুমোচ্ছিল। হঠাৎ একটা স্বপ্ন দেখে তার ঘুম ভেঙে যায়—একটা বুড়ি তার গাল খামচে ধরেছে এবং একধারে ভীষণভাবে তাকে চেপে ধরেছে। সেই যে তার ঘাড় বেঁকে গিয়েছিল তার আর কখনও সোজা হয়নি। এই রাতের চাঁদ অদ্ভুত সম্মোহিনী মায়ায় উজ্জ্বল —আর দেখ, তুমি যদি পেছন ফিরে দুর্গটার দিকে তাকাও দেখবে সেটার সমস্ত জানালাগুলো কেমন রূপোলি আলোয় চকচক করছে মনে হবে রূপকথার অতিথিদের অভ্যর্থনা জানাতে কোন অদৃশ্য হাত যেন ঘরে আলো জ্বালিয়ে দিয়েছে।

কোন অলস শক্তির প্রভাবে কথা বলতে অক্ষম হয়ে আমাদের কান অপরের কথা শুনতেই আনন্দ বোধ করে। সেইরকম আমি স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছি আর মেয়েদের কথাবার্তা শুনছি।

কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকার পর আমার বাবা বললেন, আজ রাতে আমার মেজাজ একেবারে ঝিমিয়ে পড়েছে। শেক্সপীয়রের একটা শ্লোক আওড়ালেন :

বাকীটা আমি ভুলে গেছি। কিন্তু আমার মনে হল আমাদের জন্যে কিছু দুর্ভাগ্য অপেক্ষা করছে। আমার ধারণা, জেনারেলের সেই যন্ত্রণাদায়ক চিঠির কোন প্রভাব এর মধ্যে আছে।

ঠিক সেইমুহূর্তে রাস্তায় গাড়ির চাকার ও খুরের অনভ্যস্ত শব্দ ভেসে উঠল, আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করল। মনে হল সেই শব্দ পুলের ওপারে উঁচু জায়গা থেকে এগিয়ে আসছে। একটু পরেই গাড়িঘোড়া সেদিক থেকেই আবির্ভূত হল। দুজন ঘোড়সওয়ার প্রথমে পুল পার হল, তারপর চার ঘোড়ায় টানা একটা গাড়ি এগিয়ে এল, তার পেছনে দুজন ঘোড়সওয়ার।

মনে হল কোন উচ্চপদস্থ লোকের বেড়াবার গাড়ি, আমরা সকলে একসঙ্গে এই অদ্ভুত দৃশ্য আত্মভূত হয়ে দেখতে লাগলাম। কয়েকমুহূর্তের মধ্যে এটা আরো বেশী চমকপ্রদ হয়ে উঠল। যেমুহূর্তে গাড়িটা পুলের মাঝখানে এসেছে ঠিক তখনই আগের পথপ্রদর্শকের একজন হঠাৎ ভয় পেয়ে বাকী জনদের সেকথা জানিয়ে কি করবে ঠিক করতে পারল না। সমস্ত দলটা তখন খুব জোরে ঘোড়া চালিয়ে দিল। যে দুজন ঘোড়সওয়ার সামনে ছিল তাদের দুধারে ছিটকে ফেলে গাড়িটা বিদ্যুৎ গতিতে আমাদের দিকে এগিয়ে আসতে লাগল।

গাড়ির ভেতর থেকে একটানা মেয়ের চীৎকার সেই উত্তেজনাময় দৃশ্যটাকে করুণ করে তুলল।

আমরা সকলেই ভীত অথচ অনুসন্ধিৎসু হয়ে এগোলাম, বাবা নীরব, অন্যেরা নানা ভয়ের কথা বলছে।

আমাদের উৎকণ্ঠা বেশীক্ষণ রইল না। দুর্গের টানাপুলের কাছে পৌঁছবার আগে একদিকে একটা সুন্দর লেবু গাছ, অপর দিকে একটা পাথরের পুরনো ক্রুশচিহ্ন রয়েছে। সেই রাস্তা দিয়ে তারা পুলের দিকে ছুটে আসতে আসতে ঘোড়াগুলো ক্রুশচিহ্নটা দেখেই এমনভাবে ঘুরে গেল যে একদিকের চাকা মাটির ওপরে গজিয়ে ওঠা গাছের গুড়ির শিকড়ের ওপরে গিয়ে ধাক্কা খেল।

আমি জানতাম এর পরিণতি কি। সে দৃশ্য চোখে না দেখবার জন্যে হাত দিয়ে চোখ ঢেকে ফেললাম। একই মুহূর্তে আমার মেয়ে বন্ধুদের চীৎকার শুনতে পেলাম, তখন তারা আমাদের থেকে একটু দূরে ছিল।

কৌতূহলে আমার চোখ দুটো খুলে গেল এবং একটা চরম বিশৃঙ্খলদৃশ্য দেখতে পেলাম। দুটো ঘোড়া মাটিতে গড়াগড়ি খাচ্ছে, গাড়িটা পাশে পড়ে রয়েছে, চাকা দুটো শূন্যে ঘুরছে, লোকেরা চিহ্নগুলো মুছে ফেলতে ব্যস্ত। একজন জাঁদরেল মহিলা গাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে দুহাতে রুমাল ধরে বারবার চোখ মুছছে। গাড়ির দরজার মধ্যে দিয়ে একজন তরুণীকে তুলে ধরা হল, বোঝা গেল সে জীবনহীন। আমার বৃদ্ধ পিতা তখন ঐ বৃদ্ধ মহিলার পাশে টুপী হাতে দাঁড়িয়ে মনে হয় যতদূর সম্ভব সাহায্য দেবার প্রস্তাব দিচ্ছেন। তাঁর কথা সেই মহিলাটি শুনছে বলে মনে হল না এবং রোগা মেয়েটাকে নদীর তীরে

শোয়ানোর দিকে তার লক্ষ্য।

আমি কাছে এগিয়ে গেলাম; স্পষ্টই তরুণীটির ধাঁধা লেগে গেল। তবে সে নিশ্চয়ই মৃত নয়! আমার বাবা নিজেকে একজন ডাক্তার বলে বোধ করেন, তিনি মেয়েটির কব্জিতে আঙুল রেখে বৃদ্ধ মহিলাটি যিনি মেয়েটির মা বলে পরিচয় দিলেন তাকে আশ্বস্ত করলেন এই বলে যে তার নাড়ী যদিও ক্ষীণ ও অনিয়মিত তবু স্পষ্ট। মহিলাটি হাত জোড় করে কৃতজ্ঞতা জানানোর ভঙ্গীতে ওপর দিকে তাকাল। কিন্তু পরক্ষণেই সে আবার থিয়েটারী ভঙ্গীতে কেঁদে উঠল যা আমার বিশ্বাস কিছু লোকের কাছে স্বাভাবিক।

মহিলাটি যৌবনে খুবই সুন্দর ছিল দেখে মনে হয়, বেশ লম্বা তবে রোগা নয়, কালো ভেলভেটের পোশাক পরা। একটু ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে বটে কিন্তু তার চলনে বলনে গর্ব ও ঔদ্ধত্য ফুটে উঠছে। যদিও এখন তার মনটা বিক্ষুব্ধ। তবে চেহারা ও ভারিক্কি চালে কর্তৃত্বের ছাপ রয়েছে।

কেউ কি এমন চরম দুর্দশার মধ্যে জন্মেছে? এগিয়ে আসতে আসতে তাকে বলতে শুনলাম, হাতটা তখনও তার জোর করা। জীবন মৃত্যুর পথের ওপর আমি দাঁড়িয়ে রয়েছি, একঘণ্টা সময় নষ্ট করা মানে সমস্ত হারিয়ে ফেলা। আমার শিশুটি তার পথ চলতে শুরু করার মত যথেষ্ট সুস্থ হয়ে উঠতে কতদিন লাগবে তা কে বলতে পারে। তাকে এখানেই রেখে যেতে হবে কারণ আমার আর দেরি করতে সাহস হচ্ছে না। মহাশয়, বলতে পারেন এখান থেকে কতদূরে খুব কাছের গ্রামটা? তাকে সেখানেই রেখে যেতে হবে। তিন-মাসের মধ্যে আমার বাচ্চা সোনাকে আর দেখতে পাব না বা তার বিষয় কিছু শুনতে পাব না যতদিন না পর্যন্ত ফিরে আসি।

বাবার কোট টেনে ইশারায় ডেকে তাঁর কানে ফিসফিস করে বললাম, বাবা, ওঁকে তুমি আমাদের কাছে থাকবার অনুরোধ কর না—খুব আনন্দ হবে। তাঁকে বল।

ম্যাডাম, আপনি যদি আপনার শিশুকে আমার মেয়ের সঙ্গী হিসেবে এবং তার ধাইমা ম্যাডাম পেরোডোনের দায়িত্বে আমাদের অতিথিরূপে থাকবার অনুমতি করেন, অত্যন্ত যত্ন ও সেবার সঙ্গে তার তত্ত্বাবধানের কোনরূপ অবহেলা হবে না সে ব্যাপারে আমি আপনাকে নিশ্চয়তা দিতে পারি।

আমি তা করতে পারি না, মহাশয়, আপনার দয়ালুতা ও সাহসিকতার ওপর আমার নিষ্ঠুর আচরণ করা হবে, মহিলা বিহ্বল চিত্তে উত্তর দিল।

মোটেই তা নয়, অত্যন্ত প্রয়োজনের সময় আমাদের ওপর সে ভার দিলে আমরা নিজেদের ধন্য মনে করব। এইমাত্র আমার মেয়ে এক নিদারুণ সংবাদে দুঃখিত যার সংসর্গে আনন্দ লাভ করার জন্যে অনেকদিন ধরে সে উৎসুক হয়েছিল। এই তরুণীর যথাযথ যত্নের জন্য আমাদের ওপর যদি আস্থা রাখেন তবে তার পক্ষে অত্যন্ত সান্ত্বনাদায়ক হবে। খুব কাছের গ্রামই অনেকদূর এবং

সেখানে আপনার মেয়েকে রাখার মত কোন পান্থশালা আপনি পাবেন না। আর এই অবস্থায় বিপদের মধ্যে এতদূর তাকে টেনে নিয়ে যেতেও আপনি নিশ্চয়ই মত দেবেন না। আপনার কথা অনুযায়ী, আপনি যদি আপনার যাওয়া স্থগিত রাখতে না পারেন অন্তত আজ রাতের জন্যে তাকে এখানে রেখে যান এমন যত্ন ও ভালবাসা কোথাও আপনি পাবেন না।

এই মহিলাটির চালচলন ও চেহারা এমন বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ও কর্তৃত্বব্যঞ্জক এবং তার চিত্তাকর্ষক স্বভাব সহজেই একজনকে প্রভাবান্বিত করে। তার গাড়ি-ঘোড়া, সাজসজ্জা ও অনুচরবৃন্দের মর্যাদাপূর্ণ অবস্থা ছাড়াও সে যে একজন সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠিত তাই সাব্যস্ত করে।

এই সময়ের মধ্যে গাড়িটাকে সোজা করে দাঁড় করান হল এবং ঘোড়াগুলোকে আবার গাড়িতে লাগান হল।

মহিলাটি তার কন্যার প্রতি যে দৃষ্টিপাত করল আমার কাছে সেটা মোটেই স্নেহমাখা মনে হল না অথচ এই ঘটনার প্রথম থেকেই যা সচরাচর সকলে আশা করে। তারপর সে আমার বাবাকে একটু ইসারা করে ডেকে দু'তিন পা পিছিয়ে গেল যাতে তাদের কথা শোনা না যায়। বাবার প্রতি স্থির দৃষ্টি রেখে কথা বলতে লাগল, এতক্ষণ যেভাবে কথা বলছিল সেভাবে কিন্তু নয়।

আমি আশ্চর্য হয়ে গেলাম বাবা এই পরিবর্তন কোন খেয়ালই করলেন না। বাবার কানে এত দ্রুত ও ব্যগ্রভাবে কথা বলে যেতে লাগল যে বাবা কোন কথা না বলে সে কি বলছে তা জানার জন্যে উৎসুক হয়ে উঠলেন।

দু'তিন মিনিট এইভাবে কথা বলে হঠাৎ ঘুরে কয়েক পা এগিয়ে ম্যাডাম পেরোডোনের সঙ্গে যেখানে তার মেয়ে শুয়েছিল সেখানে এল। মেয়েটির পাশে হাঁটু মুড়ে বসে তার কানে ফিসফিস করে কি যেন বলল। ম্যাডাম পেরোডোনের মনে হল তার কানে কিছু আশীর্বাদ ঢেলে দিল। তারপরেই একনিমেষে তাকে চুমো দিয়েই তার গাড়িতে চড়ে দরজা বন্ধ করে দিল। সঙ্গের লোকেরা পেছনে ঘোড়ায় উঠে পায়ের গোড়ালি দিয়ে ঘোড়াগুলোর পেটে ঘা দিল। কোচোয়ান ঘোড়ায় চাবুক লাগাল, ঘোড়াগুলো চাবুক খেয়ে হঠাৎ লাফিয়ে উঠে দৌড় শুরু করল, গাড়িটা বিদ্যুৎ গতিতে ছুটে চলল। সেইসঙ্গে পেছনের দুজন ঘোড়সওয়ারও গাড়িটাকে দ্রুতগতিতে অনুসরণ করল।

তৃতীয় অধ্যায়

আমরা নোটগুলি পরীক্ষা করলাম

সেই শোভাযাত্রার ওপর আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ যতক্ষণ না পর্যন্ত দ্রুত অন্ধকার বনের মধ্যে সেটা মিলিয়ে না যায়। নিস্তব্ধ রাতে খুরের ও চাকার শব্দ ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল।

একমুহূর্তের জন্যেও আমাদের মনে হল না যে এই উত্তেজনাপূর্ণ ঘটনাটা মিথ্যা। সেই তরুণীটি ঠিক সেইসময় চোখ খুলল। আমি তার মুখ দেখতে পেলাম না কারণ তার মুখ অন্যদিকে ছিল। সে মাথা তুলে তার চারধার দেখতে লাগল। একটা মিষ্ট আওয়াজ শুনতে পেলাম, সে জিজ্ঞেস করছে, কোথায় আমার মা ?

স্নেহভরা কণ্ঠে আমাদের প্রিয় ম্যাডাম পেরোডোন তার উত্তর দিয়ে আরও কিছু সান্ত্বনা দিল।

তখনও তাকে জিজ্ঞেস করতে শুনলাম, কোথায় আমি ? এটা কোন জায়গা ? তারপর সে বলল, আমি গাড়ি দেখছি না আর মাট্স্কা সে কোথায় ?

যতদূর সম্ভব সে বুঝতে পারে এমনভাবে ম্যাডাম তার সমস্ত কথার উত্তর দিল। ক্রমে তরুণীটি বুঝতে পারল কিভাবে এই দুর্ঘটনা ঘটেছে। সে শুনে সুখী হল যে কেউই গাড়ির দুর্ঘটনায় আহত হয়নি। যখন সে জানতে পারল তার মা তিন মাসের মধ্যে ফিরছে না তখন সে কাঁদতে লাগল।

ম্যাডাম পেরোডোনের সঙ্গে আমিও তাকে সান্ত্বনা দিতে এগিয়ে যাচ্ছিলাম সেইসময় কুমারী ডি লাফোঁতে আমার হাতটা চেপে ধরে বলল, এগিয়ো না। এসময়ে তার একজনের সঙ্গে কথা বলাই ভাল। একটু উত্তেজিত হয়ে উঠলে তার পক্ষে ক্ষতিকর।

সে বিছানায় আরামে শুতেই আমার ইচ্ছা হল ছুটে গিয়ে তাকে দেখি।

ইতিমধ্যে আমার বাবা একজন চাকরকে ঘোড়ায় করে ডাক্তার ডাকতে পাঠিয়েছেন। এখান থেকে প্রায় সাত মাইল দূরে সে থাকে। মেয়েটির জন্যে একটা শোবার ঘরের বন্দোবস্ত করা হচ্ছে।

মেয়েটি এর মধ্যে উঠে পেরোডোনের হাতে ভর দিয়ে ধীরে ধীরে হেঁটে টানা পুল পার হয়ে দুর্গের দরজার কাছে এগিয়ে গেল।

হলে চাকরেরা তাকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্যে অপেক্ষা করছে এবং তাকে সঙ্গে সঙ্গে তার ঘরে নিয়ে যাওয়া হল।

যে ঘরটা আমরা ড্রইংরুম হিসেবে ব্যবহার করি সেটা বেশ বড়। ঘরের চারটে জানালা দিয়ে পরিখা, টানা পুল ও বনের দৃশ্য ভালই দেখা যায়। ঘরটায় আছে পুরনো ওক কাঠের আসবাবপত্র, বড় বড় কাজ করা ক্যাবিনেট এবং চেয়ারগুলো টকটকে লাল রঙের উট্রেচ ভেলভেট দিয়ে মোড়া। সমস্ত দেয়ালে কারুকার্য করা, সোনালী রঙের ফ্রেম করা, মূর্তিগুলো মানুষ প্রমাণ, পুরনো ও অদ্ভুত ধরনের পোশাক তাদের। ছবির বিষয়বস্তু—শিকার করার দৃশ্য, বাজপাখি নিয়ে শিকার করা এবং সাধারণ উৎসবের দৃশ্য। আরামে কাটাবার মত করে তৈরি নয় সে ঘর। এখানেই বসে আমরা আমাদের চা পান করি কারণ বাবার দেশপ্রীতি এই জাতীয় পানীয়কে রোজ কফি ও চকোলেটের সঙ্গে চাই।

সেইরাতে এই ঘরে বসে আমরা সন্ধ্যার উত্তেজনাপূর্ণ ঘটনা আলোচনা করছিলাম।

ম্যাডাম পেরোডোন ও কুমারী ডি লাফোঁতে দুজনই আমাদের সঙ্গে ছিল। তরুণী আগন্তুক বিছানায় শোয়ামাত্র গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়লো। এই মহিলা দুজন একজন চাকরের ওপর তার ভার দিয়ে এখানে এসেছে।

ম্যাডাম ঘরে ঢুকতেই তাকে জিজ্ঞেস করলাম, আমাদের অতিথিকে তোমার কেমন মনে হয়? তার সম্বন্ধে আমায় সব কথা বল।

তাকে আমার খুব পছন্দ হয়। আমার মনে হয় এমন সুন্দরী আমি আর দেখিনি। প্রায় তোমার বয়সী, নম্র ও শান্ত।

সে পরমা সুন্দরী, লাফোঁতে একবার আগন্তুকের ঘরে উঁকি মেরে মন্তব্য করল :

আর কি মিষ্টি স্বর, পেরোডোন যোগ করল।

গাড়িটা সোজা করার পর তোমরা কি গাড়িতে আর একজন মহিলাকে দেখেছিলে যে গাড়ি থেকে নামেনি কিন্তু জানালা দিয়ে দেখছিল? লাফোঁতে জানতে চাইল।

না, আমরা কেউই তাকে দেখিনি।

তখন সে লুকোনো কালো মহিলাটির বর্ণনা দিল—রঙ করা পাগরী তার মাথায়, সারাক্ষণ গাড়ির জানালা দিয়ে দেখছিল, মহিলাদের প্রতি মাথা দুলিয়ে মুখ বিকৃত করছিল, বড় বড সাদা জলজ্বলে চোখ, দাঁতগুলো যেন রাগে কড়মড় করছে।

তোমরা কি লক্ষ্য করেছ সঙ্গের লোকগুলোকে কি বিশ্রী দেখতে? পেরোডোন বলল।

ঠিক সেইসময় বাবা ঘরে ঢুকেই বললেন, হ্যাঁ। কুৎসিত, নীচ লোকের মত দেখতে, জীবনে আমি কখনও এমন দেখিনি। আশাকরি তারা বনের মধ্যে মহিলাটির ওপর যেন ডাকাতি না করে। তারা চতুর দুর্বৃত্ত গোছের, এক মিনিটেই তারা সব কিছু করতে পারে।

আমার মনে হয় তারা অনেক পথ চলে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। পেরোডোন বলল। বদমাশ দেখতে ছাড়াও তাদের মুখগুলো শুকনো, কালো, গোমরা-মুখো। আমার কেমন অদ্ভুত লাগছে। আমি নিশ্চয় করে বলতে পারি তরুণীটি কাল আমাদের সবকিছু জানাবে অবশ্যি যদি সে সেরে ওঠে।

আমার মনে হয় না সে বলবে, একটা রহস্যমাখা হাসিতে বাবা বললেন। মাথাটা এমনভাবে নাড়লেন যেন অনেক কিছু জানেন কিন্তু আমাদের বলবেন না।

এতে আমাকে আরো বেশী কৌতূহলী করে তুলল বাবার সঙ্গে সেই কালো ভেলভেট পরা মহিলার কি কথাবার্তা হয়েছিল জানার জন্যে। মহিলাটির

প্রস্থানের পরমুহূর্তে সংক্ষিপ্ত অথচ আগ্রহভরা সেই কথোপকথন। আমরা দুজনে একাকী হতেই আমি বাবাকে বলার জন্যে অনুরোধ করলাম। তাঁকে বেশী জোর দেবার প্রয়োজন হল না।

তিনি বললেন, তোমাকে না বলার বিশেষ কোন কারণ নেই। তার মেয়ের যত্ন নেবার জন্যে আমাদের কোন কষ্ট করার প্রতি সে অনীহা প্রকাশ করেছিল। বলেছিল—সে সুস্থই আছে কিন্তু ভয় পেয়েছে, তবে কোন কিছুর কবলে সে পড়েনি—কোন মায়ায় আবিষ্ট হয়নি। আসলে সে প্রকৃতিস্থ আছে।

এসব কথা কি অদ্ভুত! বলার কোন প্রয়োজন ছিল! মাঝপথে তাঁকে বাধা দিয়ে বললাম।

যাই হোক একথা বলা হয়েছে। তিনি হাসতে লাগলেন। আর তোমার জানতে ইচ্ছে করছে কি কথা হয়েছে। যদিও খুব সামান্য, আমি তোমাকে বলব। তারপর সে বলল, একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে আমাকে অনেক দূর যেতে হচ্ছে—গুরুত্বপূর্ণ কথাটার ওপর সে জোর দিয়েছিল—খুব তাড়াতাড়ি ও গোপনীয়—তিন মাসের মধ্যে আমি মেয়ের কাছে ফিরে আসব; এই সময়ের মধ্যে, আমরা কোথা থেকে আসছি এবং কোথায় যাচ্ছি সে ব্যাপারে নীরব থাকবে। এই যা সেই মহিলাটি বলেছিল। সে খাঁটি ফরাসী ভাষায় কথা বলেছিল। যখন সে 'গোপনীয় কথাটা উচ্চারণ করেছিল তখন সে কিছুক্ষণ থেমেছিল, কঠোরভাবে আমার প্রতি তার দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল। আমার মনে হয় সেটাতে খুব গুরুত্ব দিয়েছিল। তুমি লক্ষ্য করেছিলে কেমন দ্রুত সে চলে গেল। আশাকরি এই মেয়েটির দায়িত্ব নিয়ে আমি কোন বোকার কাজ করিনি।

আমার দিক দিয়ে বলতে গেলে আমি খুব আনন্দিতই হয়েছিলাম। তাকে দেখার এবং তার সঙ্গে কথা বলার খুব ইচ্ছা হয়েছিল। ডাক্তারের মতের অপেক্ষায় ছিলাম। আপনারা যারা শহরে বাস করেন, বুঝতে পারবেন না সেই নির্জন জায়গায় একজন নতুন বন্ধু পাওয়া যে কি আনন্দ।

রাত একটার আগে ডাক্তার এসে পৌঁছল না। আমি বিছানায় শুতে যেতে পারিনি। আমার মনে হচ্ছিল সেই কালো ভেলভেট পরা রাজকুমারী গাড়ি করে যেখানে গেছে সেখানে আমি পায়ে হেঁটেই চলে যাই।

ডাক্তার ড্রইং রুমে এসে রুগী সম্বন্ধে ভাল রিপোর্ট দিল। সে এখন উঠে বসেছে, তার নাড়ী স্বাভাবিক, আপাতদৃষ্টিতে ভালই আছে। সে কোন আঘাত পায়নি। হঠাৎ ধাক্কাটা সে সামলে উঠেছে। তাকে দেখার জন্যে নিশ্চয়ই তার কোন ক্ষতি হবে না যদি আমরা দুজনেই ইচ্ছুক হই। অনুমতি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমি তার কাছ থেকে জানতে পাঠালাম কয়েক মিনিটের জন্যে তার ঘরে গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করার মত আছে কিনা।

চাকর তৎক্ষণাৎ ফিরে এসে জানাল সে আর কিছুই ইচ্ছা করে না। আপনারা নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন আমার অনুমতি পেতে বেশী দেরী হয়নি।

এই দুর্গের মধ্যে সবচেয়ে ভাল ঘরে সে শুয়ে আছে। এ খবরটা একটু জাঁকজমক করা। বিছানার পায়ের দিকে দেয়ালে সুন্দর কাজ করা—ক্লিওপেট্রা কোলে একটা ছোট সাপ ধরে আছে। অন্য দেয়ালগুলোতে নানারকম সুন্দর দৃশ্যের ছবি, সেগুলোর একটু রঙ চটে গেছে। নানারকম রঙের এসব কারুকার্য দেখে মনে হয় একসময় এগুলো খুবই চমৎকার ছিল। বিছানার পাশে বাতি জ্বলছে। বিছানায় বসে আছে সে, পাতলা সুগঠিত শরীরটায় একটা কাজ করা সিল্কের চাদর জড়ানো। মাটিতে যখন সে শুয়েছিল তার মা এটা তখন তার গায়ে দিয়েছিল।

তার বিছানার পাশে গিয়ে যখন তাকে প্রীতি-সম্ভাষণ জানাতে যাই তখন কি দেখে আমি হতভম্ব হয়ে চুপ। পিছিয়ে এলাম। সেই কথাই আমি বলব।

ছোটবেলার সেই রাতের ঠিক সেই মুখ! এ মুখ আমার মনে গেঁথে আছে। মাঝে মাঝে আমার মনে যখন সেই মুখটা ভেসে ওঠে তখন আমি আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ি, কেউ সন্দেহ করতে পারে না আমি কি চিন্তা করছি।

সেই মনোরম সুন্দর মুখখানা যখন আমি দেখেছিলাম ঠিক এইরকমই বিষণ্ণ ছিল। পরিচিতির মৃদু হাসি মুখে ফুটে উঠল।

পুরো এক মিনিট নীরব থেকে সে বলল, আমি পারি নি।

কি আশ্চয! সে বলতে লাগল, বারো বছর আগে তোমার মুখটা আমি স্বপ্নে দেখেছিলাম আর তখন থেকেই আমার মনে বারবার দেখা দেয়।

সত্যিই আশ্চর্যজনক! আমি কথাটা পুনরাবৃত্তি করলাম। এতক্ষণ ভয়ে আমার কথা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। স্বপ্নই হোক আর সত্যই হোক, বারো বছর আগে আমি তোমাকে নিশ্চয়ই দেখেছিলাম। তোমার মুখ ভুলতে পারিনি। তখন থেকেই আমার চোখের সামনে ভেসে আছে।

তার মুখে হাসি ছড়িয়ে পড়ল। এরমধ্যে যা কিছু আমি অদ্ভুত দেখেছিলাম তা সব দূর হয়ে গেছে। তার টোল খাওয়া গাল দুটো ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে।

আমার মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মাল। তাকে স্বাগতম জানিয়ে বললাম তার হঠাৎ ঘটনাক্রমে এখানে আসাতে আমরা কত আনন্দিত বিশেষ করে আমার কাছে এটা খুবই সুখকর।

কথা বলতে বলতে তার হাত ধরলাম। আমি একটু লাজুক, নিঃসঙ্গ লোকেরা যেরকম হয়। কিন্তু সাময়িক অবস্থা আমাকে বাকপটু করে তুলল এমন কি সাহসীও। সে আমার হাতে চাপ দিয়ে তার হাত আমার হাতের ওপর রাখল। চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠল, চকিতে আমার দিকে দৃষ্টি দিয়ে মৃদু হাসল। মুখটা আরক্তিম হয়ে উঠল।

অতি সুন্দরভাবে আমার স্বাগতমের উত্তর দিল। আমি তার পাশে বসে তখনও ভাবছি।

আমার স্বপ্নের কথা তোমাকে বলব। এটা এমন অদ্ভুত ব্যাপার যে শুধু তুমি ও আমি সে বলল, দুজনেই সেই জীবন্ত স্বপ্ন দেখেছি—আমি তোমাকে, তুমি আমাকে—যেমন এখন দেখছি, যদিও আমরা তখন খুব ছোট ছিলাম। তখন আমি ছ বছরের শিশু। হঠাৎ একটা এলোমেলো স্বপ্ন দেখে আমার ঘুম ভেঙে গেল। দেখলাম আমি একটা ঘরের মধ্যে। চারিদিকে চেয়ার টেবিল ছড়ানো। ঘরের অন্য বিছানাগুলো খালি, আমি ছাড়া ঘরে আর কেউ নেই। নিজের দিকে কিছুক্ষণ দেখে একটা লোহার বাতিদানের ওপর আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হল। সেটা দুভাগে বিভক্ত। একটা বিছানার তলা থেকে জানালার দিকে উঠেছে। সেটা হাতে করে টানতে গিয়ে কারোর কান্নার আওয়াজ পেলাম। তখনও আমি হাঁটুর ওপর বসে, ওপর দিকে তাকিয়ে দেখি—তুমি, নিশ্চিতভাবে সে তুমি—যেমন এখন তোমাকে দেখছি, একজন সুন্দর তরুণী, সোনালী চুল, বড় বড় নীল চোখ, ঠোঁট—তোমার ঠোঁট, ঠিক এখন যেমন দেখছি। তোমার দৃষ্টি আমাকে জয় করেছিল। আমি বিছানায় লাফিয়ে উঠে তোমার গায়ে হাত রাখি। আমার যতদূর মনে পড়ছে আমরা দুজনেই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। একটা চীৎকারে আমার ঘুম ভেঙে যায়, জেগে উঠে দেখি তুমি চীৎকার করছ। আমি ভয় পেয়ে মাটিতে নেমে পড়ি, মনে হয় কিছুক্ষণের জন্যে আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলাম। আমার জ্ঞান ফিরে এলে দেখি আবার আমি আমার ঘরে শুয়ে আছি। সেই থেকে তোমার মুখ আমি ভুলতে পারিনি। একরকমের কোন মুখ হলেও আমার চিনতে ভুল হবে না। তুমিই সেই মেয়ে যাকে আমি তখন দেখেছিলাম।

এবার আমার অনুরূপ স্বপ্ন বলার পালা।

আমি জানিনা আমাদের মধ্যে কে বেশী ভয় পাবে, সেই মেয়েটি হাসতে হাসতে বলল। যদি তুমি কম সুন্দরী হতে তোমাকে দেখে আমি ভয় পেতাম কিন্তু যেহেতু আমরা দুজনেই একবয়সী, বারো বছর আগেই তোমার পরিচয় পেয়েছি তাই তোমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হবার অধিকার জন্মেছে। যাই হোক, ছেলেবেলা থেকেই মনে হয় আমাদের মধ্যে বন্ধুত্ব সৃষ্টির ভাগ্য নির্দ্ধারিত হয়েছে। আমি ভাবছি তোমার মনে হচ্ছে কি না কেমন অদ্ভুতভাবে আমাকে তোমার কাছে টেনেছে যেমন আমি তোমাকে টেনেছিলাম। আমার কখনও কোন বন্ধু ছিল না, এখন কি একজনকে পাব? সে দীর্ঘশ্বাস ফেলল, তার সুন্দর কালো চোখ দুটো দিয়ে আমার দিকে আবেগপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

এখন আসল কথা হচ্ছে, আমি যেন অকারণেই এই সুন্দরী আগন্তুকের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়লাম। আমার বোধ হতে লাগল, যেমন সে বলেছে। তার প্রতি আকৃষ্ট হলাম। কিন্তু তা হলেও তার প্রতি কিছু বিতৃষ্ণা ছিল।

এই দ্বৈত মনোভাবের মধ্যে আকর্ষণ শক্তি প্রবলভাবে প্রভাবশালী হল। সে কৌতূহলী করে আমাকে জয় করল! সে এত সুন্দর এবং অবর্ণনীয়ভাবে আকৃষ্টকর।

আমি বুঝতে পারলাম সে ধীরে ধীরে পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছে এবং আমি শীঘ্র তাকে শুভরাত্রি জানিয়ে বিদায় নিলাম।

এটুকু বললাম, ডাক্তার মনে করেন তোমার কাছে সারারাত থাকবার জন্যে কোন লোকের দরকার হবে। আমাদের একজন দাসী অপেক্ষা করছে এবং তাকে তোমার বেশ ভালই লাগবে।

তোমাদের কি দয়া কিন্তু আমি ঘুমোতে পারব না। ঘরে কেউ থাকলে আমি কখনও ঘুমোতে পারি না। আমার কোন লোকের দরকার নেই এবং আমার দুর্বলতা স্বীকার করব যে আমি ডাকাতদের ভয়ে আতঙ্কিত হই। একবার আমাদের বাড়ি ডাকাতি হয় এবং দুজন চাকরকে মেরে ফেলে। তাই আমি সবসময় দরজা চাবি দিয়ে রাখি। এটা আমার অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। তুমি এত দয়ালু, আমি জানি তুমি আমায় ক্ষমা করবে। আমি দেখেছি তালায় একটা চাবি লাগান আছে।

আর সুন্দর হাত দুটো দিয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরে কানে ফিসফিস করে বলল, হে প্রিয় বান্ধবী শুভরাত্রি, তোমাকে ছেড়ে দিতে আমার কষ্ট হচ্ছে তবুও শুভরাত্রি জানাই। আগামীকাল তোমার সঙ্গে আবার দেখা হবে তবে বেশী সকালে নয়। একটা হাই তুলে বালিশে মাথা দিয়ে শুয়ে পড়ল আর বিড় বিড় করতে করতে বলল, শুভরাত্রি, হে প্রিয় বন্ধু।

যুবকেরা এমন ভালবাসার আবেগ ভালবাসে। যে ভালবাসার আসক্তি সে দেখাল তাতে আমি আত্মতৃপ্তি বোধ করলাম যদিও এর কোন সঙ্গত কারণ নেই। যে আত্মবিশ্বাসে সে আমাকে গ্রহণ করল সেটা তার গভীর বন্ধুত্বের পরিচায়ক।

পরের দিন আবার আমরা মিলিত হলাম। নানাভাবে আমার বন্ধুর সঙ্গে আমি আনন্দ উপভোগ করলাম। দিনের আলোর তার দৃষ্টির কোন পরিবর্তন হল না। এমন অদ্ভুত সুন্দরী আমি জীবনে কখনও দেখিনি। সেই স্বপ্নে মুখের যে বিষণ্নভাব দেখেছিলাম এখন তার কিছুই নেই। আমাদের ক্ষণিক আতঙ্ক আমরা আনন্দের মধ্যে দিয়ে হেসে উড়িয়ে দিই।

চতুর্থ অধ্যায়

তার স্বভাব—অলস গতি

আমি আগেই বলেছি ব্যক্তিগতভাবে আমি তার সৌন্দর্যে মুগ্ধ। কিন্তু তারমধ্যে এমন কিছু ছিল যা আমাকে সন্তুষ্ট করতে পারেনি। মাঝারি ধরনের

থেকে একটু বেশী লম্বা। তার কিছু বর্ণনা দিই। পাতলা চেহারা, অস্বাভাবিক মাধুর্য। তার চলাফেরায় জড়তা, খুবই জড়তা, তবে তার বাহ্যিক চেহারায় এমন কিছু নেই যাতে তাকে পঙ্গু বলা যেতে পারে। গায়ের রঙ খুব উজ্জ্বল ও ফর্সা। তার দেহ ছোট কিন্তু চমৎকারভাবে গঠিত। চোখ দুটো বড়, কালো এবং উজ্জ্বল। এমন সুন্দর ঘন ও লম্বা চুল কাঁধ অবধি নেমে এসেছে। মাঝে মাঝে চুলগুলোর নিচে হাত দিয়ে ভার অনুভব করে হাসাহাসি করি। খুব নরম ও পাতলা চুল, সোনালী রঙ। তার ঘরে সে যখন চেয়ারে বসে থাকে আমি তার চুলগুলো হাতের মধ্যে নিয়ে খেলা করি, কখনও আঁচড়ে দিই, কখনও বিনুনি করে দিই।

আমি বলেছি তার মধ্যে এমন কিছু ছিল যা আমাকে সন্তুষ্ট করতে পারেনি। প্রথম রাতে তাকে দেখে তার অন্তরঙ্গতা আমাকে জয় করেছে। কিন্তু আমি লক্ষ্য করেছি অনন্য সংযমের সঙ্গে নিজের সম্বন্ধে, তার মায়ের কথা, তার পারিবারিক ইতিহাস সবকিছুই যার সঙ্গে তার জীবন, তার আত্মীয় কুটুম্ব, তার পরিকল্পনা জড়িত সব এড়িয়ে যায়। আমার অনুমান অযৌক্তিক নয় তবে ভুল হতেও পারে। কালো ভেলভেট পরা জাঁকাল মহিলাটি যে আদেশ আমার ওপর দিয়েছে আমার তা মনে চলা উচিত বলে মনে হয়। কিন্তু কৌতূহল এক চঞ্চল ও বিবেকবর্জিত মনের আবেগ। কোন মেয়ে যতই তার ধৈর্য থাকুক না কেন কৌতূহল না মিটিয়ে সে থাকতে পারে না। যা জানতে আমি এত অত্যুৎসাহী তা অন্য কেউ বলে দিলেই বা ক্ষতি কিসের? আমার সততা ও কর্তব্যপরায়ণতার ওপর কি তার বিশ্বাস নেই? আমি তাকে ঈশ্বরের নামে শপথ করে বলেছি কোন কথাই কেউ জানতে পারবে না তা সত্ত্বেও সে আমাকে বিশ্বাস করছে না? তার নীরবতা ও মৃদুহাস্যে বারবার প্রত্যাখ্যান আমাকে কোন আশার আলো দেখাতে সমর্থ হল না।

আমরা যে এব্যাপারে ঝগড়া করেছিলাম তা বলতে চাই না কারণ স কিছুতেই কথা কাটাকাটি করে না। আমার পক্ষে তাকে চাপ দেওয়া খুবই অন্যায় কিন্তু আমি তা না করে পারিনি আমি এটা ছেড়েও দিতে পারতাম।

যা সে আমাকে বলল আমার বিবেকের বিবেচনায় তা কিছুই নয়।

তিনটে অস্পষ্ট প্রকাশে এই সিদ্ধান্ত করা যায়।

এক, তার নাম কারমিলা।

দুই, তাদের বংশ প্রাচীন ও সম্ভ্রান্ত।

তিন, তাদের বাড়ি পশ্চিমে কোনস্থানে।

তার বংশের নাম, তাদের কুলমর্যাদাসূচক অস্ত্রাদি সম্বন্ধে, তাদের জমিদারীর নাম, এমন কি কোন দেশে তারা থাকে তাও বলেনি।

আমি যে তাকে এই ব্যাপারে অনবরত বিরক্ত করেছিলাম তা নয়। আমি সুযোগের অপেক্ষায় ছিলাম, জোর করার থেকে কৌশলে জানবার চেষ্টায়

ছিলাম। যদিও দু একবার তাকে সোজাসুজি জিজ্ঞেস করি কিন্তু যে কৌশলই অবলম্বন করি না কেন তা বিফল হয়। বিষণ্ণ ও গভীর দুঃখের মধ্যে দিয়ে তার এই এড়িয়ে চলার প্রচেষ্টাকে, আমার প্রতি তার আবেগকে আমি উপেক্ষা করতে পারিনি। একদিন যে আমি সব জানতে পারব এই চিন্তায় আমি তাকে আঘাত দিতে চাইনি।

সে তার সুন্দর হাত দুটো দিয়ে আমার গলা জড়িয়ে ধরত, আমাকে কাছে টেনে নিত, আমার গালে গাল রেখে, গুন গুন করে বলত, প্রিয়তমা, তুমি মনে আঘাত পেয়েছ, আমাকে নিষ্ঠুর ভেব না কারণ আমার শক্তি ও দুর্বলতার অদম্য নিয়ম মেনে চলেছি। যদি তোমার হৃদয়ে আঘাত লাগে আমারও হৃদয় তোমার সঙ্গে যন্ত্রণা পাবে। আমার পরম অবমাননাকর ভাবাবেশে আমি তোমার মধ্যেই বেঁচে থাকব এবং আমার মধ্যে তুমি মরে যাবে—মৃত্যু—সুখের মৃত্যু।—আমি এটা না করে থাকতে পারব না। আমি যেমন তোমায় আকর্ষণ করি, তুমিও তেমন অপরকে আকর্ষণ করবে এবং ভালবাসার নিষ্ঠুরতার পরমানন্দ ভোগ করবে। এখনকার মত আমাকে এবং আমার সম্বন্ধে কিছু জানতে চেও না কিন্তু তোমার ভালবাসার সমস্ত উৎসাহ নিয়ে আমাকে বিশ্বাস কর।

যখন সে এমন আনন্দবিহ্বল উক্তি করছিল, তার কাঁপা আলিঙ্গনে আমাকে আরো গভীরভাবে চেপে ধরে আমার গাল তার ঠোঁট দিয়ে মৃদু চুম্বন দিল।

তার উত্তেজনা, তার ভাষা আমার কাছে দুর্বোধ্য মনে হল।

তার এই হাস্যকর আলিঙ্গন থেকে, আমার বলতে বাধা নেই, এরকম সচরাচর হয় না, আমি নিজেকে মুক্ত করার চেষ্টা করে থাকি। কিন্তু আমার সমস্ত শক্তি যেন হারিয়ে যায়। তার গুন গুন শব্দ আমার কানে ঘুমপাড়ানি গানের মত মনে হয়। আমার বাধা ভাববিহ্বল অবস্থায় পর্যবসিত হয়। যখন আমার গা থেকে সে হাত সরিয়ে নেয় তখনই আমি যেন আমার মধ্যে ফিরে আসি।

আমার এই রহস্যময় মানসিক অবস্থার মধ্যে থাকাকালীন তাকে আমার পছন্দ হত না। এক অদ্ভুত প্রবল আলোড়ন পূর্ব উত্তেজনার আনন্দ আমি উপভোগ করতাম। একই সঙ্গে, ভয় এবং বিরক্তি মিশ্রিত এক অস্পষ্ট অনুভূতি বোধ করতাম। যতক্ষণ পর্যন্ত সেই অবস্থায় থাকতাম মেয়েটির সম্বন্ধে নির্দিষ্ট চিন্তাধারা থাকত না। কিন্তু ভক্তি ও ঘৃণার মধ্যে ভালবাসার উন্মেষ সম্বন্ধে আমি ওয়াকিবহাল ছিলাম। আপাতদৃষ্টিতে এটা সম্ভাব্যতা বিরোধী মনে হলেও কিন্তু সত্য বিরোধী নয়। আমার মনের ভাব ব্যক্ত করার আর কোন-রকম চেষ্টা করতে পারি না।

দশ বছরেরও বেশী পরে আমি এখন লিখছি। আমার হাত কাঁপছে। বিভ্রান্তকর ও আতঙ্কজনক কিছু ঘটনা ও অবস্থা মনে পড়ছে। অচেতনভাবে

আমি আমার দিন কাটাচ্ছি। আমার কাহিনীর আসল ধারা অতি স্পষ্ট ও জ্বলন্তভাবে স্মৃতিপটে জাগরূক। কিন্তু আমি মনে করি প্রত্যেক জীবনেই কিছু আবেগের ধারা আছে যেখানে আমাদের আসক্তি প্রচণ্ডভাবে জেগে ওঠে, যেগুলো অস্পষ্ট ও ক্ষীণভাবে মাঝে মাঝে মনে জাগে।

কখনও কখনও ঘণ্টাখানেক উদাসভাবে কাটাবার পর আমার এই অদ্ভুত ও সুন্দর বান্ধবী আমার হাত ধরে আদর করে চাপ দিত, বারবার একই রকম করত। জড়তাগ্রস্ত ও জ্বলন্ত চোখে আমার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকত। এত দ্রুত নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস ফেলত যে তার পোশাক ওঠানামা করত। অনুরাগের তীব্র আবেগ আমাকে বিহ্বল করে তুলত। এটা ঘৃণাজনক অথচ অদম্য। জয়গর্বিত দৃষ্টিতে সে আমাকে কাছে টেনে নিত এবং তার উষ্ণ ঠোঁট দুটো আমার গালে অবাধে বিচরণ করত। ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে সে বলত, তুমি আমার, তুমি আমারই হবে, তুমি ও আমি চিরদিনের জন্যে এক। তারপর সে চেয়ারে ঢলে পড়ত, তার হাত দুটো চোখের ওপর রাখত, আমি কাঁপতাম।

আমি জিজ্ঞেস করতাম, আমরা কি আত্মীয়? এসব বলে তুমি কি বোঝাতে চাও? আমি তোমাকে মনে করিয়ে দিই হয়তো তুমি কাউকে ভালবাসতে; কিন্তু এমন করা ঠিক নয়, আমি ঘৃণা করি। আমি তোমাকে জানি না—তুমি যখন অমন করে কথা বল ও দেখ তখন আমি নিজেকেই চিনতে পারি না।

আমার কথায় দীর্ঘশ্বাস ফেলত, আমার হাত সরিয়ে দিয়ে অন্যদিকে তাকিয়ে থাকত।

এইসব অস্বাভাবিক প্রকাশভঙ্গির সন্তোষজনক উত্তর খুঁজে পাওয়ার বৃথা চেষ্টা আমি করতাম। এগুলো আমি কোন ছলনা বা কৃত্রিমের পর্যায়ভুক্ত করতে পারি না। সন্দেহাতীতভাবে এটা কোন চাপা আবেগ বা প্রবণতার ক্ষণিক প্রকাশ মাত্র। এটা কি তার মায়ের অস্বীকার করা সত্ত্বেও অল্পক্ষণ স্থায়ী পাগলামীর প্রকাশ? আমি পুরনো গল্পের বইতে এরকম ব্যাপার পড়েছি। কোন বালকসুলভ প্রেমিক ছদ্মবেশে বাড়িতে ঢুকে যদি তার প্রিয়তমাকে দায়ী করে থাকে। এধরনের কল্পনার বিরুদ্ধে অনেক কিছু বলা যেতে পারে। আমার আত্মশ্লাঘার পক্ষে খুবই উৎসাহজনক।

আমার নিজের চেহারার কিছুই বড়াই করতে পারি না। মাঝে মাঝে যখন সে তার বিষণ্ণ দৃষ্টি দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে থাকত তখন আমার মনে হত তার তুলনায় আমি নগণ্য। রহস্যজনক উত্তেজনার মুহূর্ত ছাড়া আর সব সময়ই সে ছেলেমানুষী করে। শরীরের দিক দিয়ে নির্জীবতা ফুটে ওঠে।

কোন কোন ব্যাপারে তার হাবভাব বিসদৃশ ঠেকে। শহুরে মেয়েদের চোখে যতটা না লাগুক, গ্রাম্য মেয়েদের কাছে সেটা বড় হয়ে দেখা দেয়। সে অনেক বেলা করে নিচে নামত, সাধারণতঃ বেলা একটার আগে নয়। তখন সে এক কাপ চকোলেট ছাড়া আর কিছু খেত না। তারপর আমরা বেড়াতে

যেতাম, অলসভাবে ঘুরে বেড়ানো আর কিছুই নয়। কিন্তু মুহূর্তমধ্যে সে পরিশ্রান্ত হয়ে পড়ত। আর হয় সে দুর্গের মধ্যে ফিরে আসত নয়ত বাগানের মধ্যে এখানে সেখানে ছড়ানো কোন একটা বেঞ্চির ওপর বসে পড়ত। এটা যেন মনে হত তার শারীরিক ক্লান্তি, মনের দিক থেকে নয়।

কখনও কখনও সে উদাসীনভাবে তার নিজের বাড়ির কথা, কোন এ্যাডভেঞ্চার বা ঘটনার কথা অথবা তার ছেলেবেলার কিছু স্মৃতি বলত যা অদ্ভুত আচার-ব্যবহার, রীতিনীতিসম্পন্ন লোকদের বোঝাত যাদের সম্বন্ধে আমরা কিছুই জানি না। তার এইসব আভাস-ইঙ্গিতের মধ্য দিয়ে এটুকু জেনেছিলাম যে আমি প্রথমে যা ভেবেছিলাম তার থেকে অনেক অনেক দূরে তার দেশ।

এইভাবে একদিন দুপুরবেলায় যখন আমরা একটা গাছের দিকে বসেছিলাম তখন একটা শবযাত্রা আমাদের সামনে দিয়ে গেল। আমাদের বনরক্ষীদের একজনের এক সুন্দর যুবতী মেয়ের মৃতদেহ। গরীব বেচারা তার প্রিয়তমা কন্যার কফিনের পিছু পিছু চলেছে। সে তার একমাত্র মেয়ে ছিল, খুবই ভেঙে পড়েছে। জোড়ায় জোড়ায় লাইন করে পেছনে চলেছে শোকগান করতে করতে।

শ্রদ্ধা জানাতে আমি উঠে দাঁড়ালাম এবং তাদের গানের সুরে সুর মিলালাম।

আমার সঙ্গী আমাকে বিশ্রীভাবে ঝাঁকানি দিল। আমি অবাক হয়ে তার দিকে ফিরে চাইলাম।

সে রূঢ় ও অসামাজিকভাবে বলল, তুমি বুঝতে পারছ না ওটা কেমন বেসুরো ?

মোটেই না, আমার মনে হয় খুবই মধুর। আমি তার বাধা দানে বিরক্তি বোধ ও ভীষণ অস্বস্তি বোধ করলাম। নচেৎ লোকেরা এধরনের কথাবার্তা শুনে ক্ষুব্ধ হবে।

সঙ্গে সঙ্গে আমি সুর ধরলাম, আবার বাধা পেলাম।

তুমি আমার কান ফুটো করে দিচ্ছ। রাগে বলে উঠল কারমিলা এবং তার ছোট আঙুল দিয়ে কান বন্ধ করল। তাছাড়া, তুমি কি করে বলতে পার তোমার ও আমার ধর্ম এক ? তোমার এই ভাবভঙ্গি আমায় আঘাত করছে আর আমি শোকযাত্রা ঘৃণা করি। কি বিশ্রী হৈ চৈ ! তুমি মরবে—প্রত্যেকেই মরবে, আর মরে সকলেই সুখী হবে। চল বাড়ি যাই।

আমার বাবা যাজকের সঙ্গে গোরস্থানে গেছেন। আমি ভেবেছিলাম সে আজ সমাধিস্থ হবে তুমি জান।

সে ? চাষীদের ব্যাপারে আমি মাথা ঘামাই না। সে কে আমি জানি না। কথাগুলো বলতে বলতে চোখ দুটো তার চকচক করে উঠল।

সে একজন গরীব মেয়ে, তার মনে হয়েছিল দিন পনের আগে সে ভূত দেখেছিল। সেই থেকে গতকাল পযন্ত তার মরার মত অবস্থা। কালই সে মরেছে।

ভূত সম্বন্ধে আমাকে কিছু বলো না। তুমি বললে আমার রাতে ঘুম হবে না।

আশা করি কোন উৎপাত বা ভয়ের কারণ নেই, এ একটা সাধারণ ব্যাপার। শূকর পালকের কমবয়সী স্ত্রী মাত্র এক সপ্তাহ আগে মারা গেছে। সে ভেবেছিল সে যখন বিছানায় শুয়ে কেউ যেন তার গলা টিপে ধরেছে আর প্রায় মেরে ফেলেছিল। বাবা বলেন জ্বরের ঘোরে এধরনের ভয়ার্ত স্বপ্ন দেখা যায়। আগেরদিনে সে ভালই ছিল। তার পর থেকেই সে বিছানায় পড়ে আর মারা যায়।

যাক তার শোক শেষ হয়েছে, শোক গানও শেষ হয়েছে। দুর্বোধ্য ও বেসুরো ভাষায় আর আমাদের কান ঝালাপালা করার দরকার নেই। আমাকে ভীত করে তুলেছে। এখানে আমার পাশে বস, আমার গা ঘেষে বস। আমার হাত ধরে থাক, চাপ দাও জোরে—জোরে—আরও জোরে।

আমরা একটু পেছিয়ে এসে অন্য একটা বেঞ্চিতে বসি।

সেও বসে পড়ল। তার মুখের পরিবর্তন হতে লাগল এমনকি মুহূর্তের জন্যে আমাকে সন্ত্রস্ত করে তুলল। মুখখানা কালো হয়ে ভীষণভাবে নীল হয়ে উঠল। দাঁতে দাঁত দিয়ে হাত দুটো জোরে চেপে ধরল। ভুরু কুঁচকে ঠোঁট চেপে ধরল। পায়েব দিকে মাটিতে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল। ম্যালেরিয়া জ্বরেব মত ভীষণ কাঁপতে লাগল। আকস্মিক প্রকোপ রোধ করবার জন্যে তার সমস্ত শক্তি যেন সে হারিয়ে ফেলল। জোরে জোরে নিঃশ্বাস টানতে লাগল। শেষে যন্ত্রণায় একটা চাপা আর্তনাদ করে উঠল। ধীরে ধীরে মৃগীরোগের আক্ষেপ দূর হল। ঐখানে, ঐ গলা টেপার দল গান গাইতে গাইতে আসছে। আমাকে ধর, চেপে ধরে থাক। ঐ চলে যাচ্ছে।

এদৃশ্য আমাব মনে যে মলিন ও বিষণ্ণ ছাপ ফেলেছিল তা দূর করার জন্যে সে যেন অস্বাভাবিকভাবে উদ্দীপ্ত ও খোশগল্পে মেতে উঠল এবং এইভাবে আমরা বাড়ি ফিরলাম।

তার শরীর সম্বন্ধে তার মা যেকথা বলেছিল এই প্রথম সেই অবস্থা লক্ষ্য করলাম। তার মানসিক অবস্থারও এই প্রথম প্রকাশ আমার দৃষ্টিগোচর হল।

কালো মেঘের মত এ দুটোই তার মন থেকে সরে গেল। পরে মাত্র একবারই তার ক্ষণিক রাগের লক্ষণ দেখেছিলাম। কেমন করে সেটা হয়েছিল তাই এখন বলব।

একদিন ড্রইং রুমে আমরা দুজনে বসে লম্বা জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছি এমন সময় টানা পুল পার হয়ে বাগানের মধ্যে একজন ভবঘুরে ঢুকল।

তাকে আমি চিনি। সাধাবণত বছরে দুবার করে সে এবাড়িতে আসত।

বিকলাঙ্গ হ'লে যেমন হয় সেরকম কুঁজো পাতলা চেহারা লোকটার। একটা ছুঁচলো কালো দাড়ি পরে থাকত। আর যখন মুখব্যাদান করে হাসত, সমস্ত দাত বেবিয়ে পড়ত। হলদে কালো এবং টকটকে লাল রঙের পোশাক পরত। এতগুলো বেল্ট আর ফিতে বাঁধত যে আমি গুণেই শেষ করতে পাবতাম না। সেগুলো থেকে তার সমস্ত জিনিস ঝোলানো থাকত। তার পিঠে ম্যাজিক লণ্ঠন আর দুটো বাক্স থাকত। আমি ভাল করেই জানতাম সেই দুটো বাক্সেব মধ্যে একটাতে থাকত সরীসৃপজাতীয় উভচর প্রাণী আর অপরটায় আলুজাতীয় একবকমেব উদ্ভিদ। এই বিস্ময়কর প্রাণীগুলো বাবার হাসির খোরাক হত। বাঁদর, টিয়া, কাঠবেড়ালী, মাছ ইত্যাদি নানা জন্তুর দেহেব অংশগুলো নিয়ে সেগুলো শুকিয়ে এমন সুন্দর কবে সেলাই কবেছিল যে দেখতে ভারী ভাল লাগত। তার একটা বেহালা ছিল, এক বাক্স ভোজবাজী দেখানোর জিনিসপত্তর ছিল। একজোড়া ভোঁতা তরোয়াল ও মুখোশ তাব বেল্টে ঝুলত। আবও নানা অদ্ভুত বাক্স তাব সঙ্গে ঝুলত। তামার মাথা মোড়া একটা কালো লাঠি তার হাতে থাকত। একটা বিশ্রী রাস্তার কুকুর তার সঙ্গী হয়ে পায়ে পায়ে চলত। টানা পুলটাব কাছে এসে সন্দেহগ্রস্ত হয়ে দাড়িয়ে বিষণ্ণভাবে ঘেউ ঘেউ করে ডাকতে লাগল।

সেই সঙ ইতিমধ্যে বাগানের মাঝখানে দাঁড়িয়ে তার অদ্ভুত ধবনের টুপীটা মাথা থেকে তুলে আমাদেব অভিবাদন করল এবং ফরাসী ও জার্মান ভাষায় অতি কদর্য উচ্চারণে অনর্গল সম্ভাষণ জানাল। বেহালা না বাজিয়ে এমনভাবে গান করতে লাগল ও পাগলের মত নাচতে লাগল যা দেখে না হেসে থাকতে পারলাম না। কুকুরটাব ঘেউ ঘেউ ডাকও তাকে কোন ব্যাঘাৎ করল না।

তারপর সে হাসতে হাসতে আর নমস্কাব করতে করতে জানালার দিকে এগিয়ে এল। বেহালাটা তার হাতে নিয়ে একনিঃশ্বাসে তার কাজের ফিরিস্তি দিতে দিতে আমাদের নানাবকমেব খেলা দেখাবার জন্যে তাব কাছে যা আছে সে সব বলে যেতে লাগল। আমাদের মত পেলেই নানা অদ্ভুত ও আমোদ-জনক খেলা দেখাবার ক্ষমতা তাব আছে সেকথা বলল।

হে সম্ভ্রান্ত মহিলাগণ, আপনারা যদি ইচ্ছা করেন এই রক্ষা কবচ নিতে পারেন, এর ক্ষমতা অসীম। এটা তাবিচ করে কাছে রাখলে কোন অমঙ্গল আপনাদের স্পর্শ করবে না।

এগুলো পার্চমেন্ট কাগজের আয়তাকার ধবনের মোড়ক, ওপরে মন্ত্রপূত সঙ্কেত চিহ্ন এবং নকশা করা।

কৌতূহলী করে তুলেছে।

পরমুহূর্তে সে একটা গুটানো চামড়া খুলে ফেলল। তার ভেতর দেখা গেল ছোট ছোট অদ্ভুত ধরনের যন্ত্রপাতি।

এখানে দেখুন আমাকে উদ্দেশ্য করে সে বলতে লাগল, অন্য অল্প প্রয়োজনীয় জিনিসের মধ্যে আমি দন্তচিকিৎসার কাজও করি। ওঃ কুকুরটা ভীষণ বিরক্ত করছে! এই জানোয়ার, চুপ কর! এমন চীৎকার করছে যে আপনারা কিছুই শুনতে পাবেন না। আপনার ডানদিকে বসা যুবতী, আপনার প্রিয় বান্ধবীর, তীক্ষ্ণ ও ধারাল দাঁত আছে—লম্বা, সরু, ছুঁচলো, পেঁচার মত, সূচের মত; হা, হা! আমার তীক্ষ্ণ ও বিচক্ষণ দৃষ্টিতে যেমুহূর্তে তার দিকে তাকিয়েছি আমি স্পষ্ট দেখতে পেয়েছি। ধরুন, আপনাকে যদি কামড় দেয়, আমার মনে হয় তাই হবে, তারজন্যে আমি এখানে হাজির—এই আমার ফাইল, আমার ছেঁদা করার যন্ত্র, আমার চিমটা। আমি সেটাকে গোল ও ভোঁতা করে দেব, যদি আপনি চান; মাছের দাঁত নয় তার মত একজন সুন্দরী যুবতীর দাত। অ্যাঁ! সুন্দরী কি অসন্তুষ্ট হলেন? আমি কি বেশী দুঃসাহস দেখিয়েছি? সুন্দরী বান্ধবীকে কি মর্মাহত করলাম।

সত্যিই মনে হল বান্ধবী রেগে জানালা থেকে সরে গেল।

ভবঘুরেটার কি স্পর্দ্ধা আমাদের অপমান করে? কোথায় তোমার বাবা? তার কাছ থেকে আমি প্রতিকার চাইব! আমার বাবা হলে এই হতভাগাকে বেঁধে ঘোড়ার চাবুক দিয়ে চাবকে হাড় গুঁড়ো করে দিতেন!

দু একপা জানালা থেকে সরে গিয়ে একটা চেয়ারে বসে পড়ল, তখনও তার দৃষ্টি অপরাধীর ওপর থেকে যায়নি। তার রাগটা যেমন হঠাৎ এসেছিল তেমনি হঠাৎ চলে গেল। ধীরে ধীরে তার স্বাভাবিক স্বর ফুটে উঠল। মনে হল সে সেই কুঁজো লোকটা এবং তার কাজ সবই ভুলে গেছে।

সেদিন সন্ধ্যায় আমার বাবা খুব মনমরা হয়েছিলেন। ফিরে এসে জানালেন সম্প্রতি একই ধরনের দুটি মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। প্রায় মাইলখানেক দূরে তার জমিদারীর এক চাষার মেয়ে খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছে। তার বর্ণনা অনুযায়ী একইভাবে সে আক্রান্ত হয়েছে। এখন সে ক্রমশঃ খারাপ অবস্থার দিকে এগোচ্ছে।

এসব কিছুই স্বাভাবিক নিয়মে ঘটছে। এইসব গরীব লোকেরা একজন অপরজনকে কুসংস্কারে সংক্রামিত করে। তাদের প্রতিবেশীরা যেমন আক্রান্ত হয় তেমনি তারাও মনে মনে সেই ভয়ের মূর্তি কল্পনা করে।

কিন্তু এই নির্দিষ্ট ঘটনাটা একজনকে ভীষণভাবে ভয় পাইয়ে দেয়, কারমিলা বলল।

সেটা কেমন? আমার বাবা জানতে চাইলেন।

আমি নিজে এমন ভয় পেয়েছি যে আমিই সেসব বস্তু দেখেছি মনে হচ্ছে।

বাস্তবের থেকেও খুব খারাপ।

আমরা ভগবানের হাতে। তাঁর ইচ্ছে ছাড়া কিছুই ঘটতে পারে না। যারা তাঁকে ভালবাসে তাদের ভালই হয়। তিনিই আমাদের যথাযথ স্রষ্টা। তিনিই আমাদের সৃষ্টিকর্তা, তিনিই আমাদের দেখবেন।

স্রষ্টা! প্রকৃতি! বাবার শান্ত কথার উত্তর দিল যুবতী। এবং এই রোগ যে সারা দেশে ছড়িয়ে পড়েছে তা স্বাভাবিক। প্রকৃতি। সমস্ত কিছুই প্রকৃতি থেকে উদ্ভূত—তাই না? স্বর্গে, পৃথিবীতে এবং পৃথিবীর নিচে সব কিছুই প্রকৃতির নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করছে আর বেঁচে আছে? আমার ত' তাই মনে হয়।

ডাক্তার আজ এখানে আসবেন বলেছেন, কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর বাবা বললেন। আমি জানতে চাই এব্যাপারে তিনি কি মনে করেন এবং আমাদের কি করা উচিত ভাবেন।

ডাক্তারেরা কখনও আমার ভাল করেন নি, কার্মিলা বলল।

তাহলে তুমি অসুস্থ হয়েছ? আমি জানতে চাইলাম।

তুমি যত না ভুগেছ আমি তার থেকে বেশী ভুগেছি।

অনেকদিন আগে?

হ্যাঁ, অনেকদিন আগে। ঠিক এই রোগেই আমি ভুগেছিলাম। কিন্তু আমার ব্যথা ও দুর্বলতা ছাড়া আর সবই ভুলে গেছি। অন্য রোগে ভুগলে যেমন হয় ততটা খারাপ নয়।

আমি তা বলতে পারব না; এবিষয়ে আর কথা বলার দরকার নেই। তুমি একজন বন্ধুকে আঘাত দিতে চাও না? সে আমার চোখের দিকে অলস-ভাবে তাকিয়ে দুহাত দিয়ে সাদরে আমার কোমর জড়িয়ে ধরে আমাকে ঘর থেকে বাইরে নিয়ে গেল। আমার বাবা জানালার কাছে কিছু কাগজ নিয়ে ব্যস্ত রইলেন।

কেন তোমার বাবা আমাদের ভয় দেখাচ্ছেন? একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে এবং একটু কেঁপে মেয়েটি বলল।

ওহে প্রিয় কারমিলা, তিনি তা করেননি, তার মনের কোথাও সে চিন্তা নেই।

প্রিয়তম, তুমি কি ভয় পেয়েছ?

গরীব লোকেরা যেমন আক্রান্ত হয়েছে তেমন সত্যিকারের কোন বিপদ এলে পাব নিশ্চয়ই।

তুমি মরতে ভয় পাও?

হ্যাঁ, প্রত্যেকেই পায়।

কিন্তু প্রণয়াসক্ত স্ত্রীপুরুষেরা একসঙ্গেই মরে যাতে মরার পরেও তারা এক-সঙ্গে থাকে। মেয়েরা এ জগতে শুঁয়ো পোকার মত বাস করে, গরমকালে তারা প্রজাপতি হয়। মাঝে তারা শূককীট—দেখ না, প্রত্যেকেই তারা স্ব স্ব বৈশিষ্ট্য,

গঠন ও অপরিহার্যভাবে অবস্থান করে। তাই ভঁাসিয়ে বাকো তাঁর বিরাট বইতে বলেছেন, পরের ঘরে।

বেলার দিকে ডাক্তার এলেন এবং বাবার সঙ্গে কিছু বন্ধ ঘরে কথা বললেন। তিনি একজন দক্ষ লোক, বয়স ষাটের ওপরে, পাউডার মাখেন এবং তাঁর বিবর্ণ মুখে কুমড়োর মত মোলায়েম করে দাড়ি কামান। তিনি এবং বাবা দুজনেই ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। আমি বাবাকে হাসতে শুনলাম এবং বাইরে আসবার সময় তাঁকে বলতে শুনলাম—

যাহোক, আপনার মত একজন জ্ঞানী লোকের কাছে আমি আশ্চর্য হচ্ছি।

ডাক্তার হাসতে হাসতে মাথা নেড়ে উত্তর দিলেন—তাহলেও, জীবনমৃত্যু এক রহস্যময় দুর্বোধ্য অবস্থা এবং আমরা এ দুটোর কোনটার ব্যাপারে কিছুই জানি না।

এই ভাবে তাঁরা চলে গেলেন, আমি আর কিছু শুনতে পেলাম না। তখন আমি জানতাম না, ডাক্তার কি বলতে আরম্ভ করেছিলেন কিন্তু আমার মনে হয় এখন আমি বুঝতে পারি।

পঞ্চম অধ্যায়

এক আশ্চর্যজনক মিল

আজ সন্ধ্যায় গ্রেজ থেকে গম্ভীর, কালোমুখো ছবি পরিষ্কার করার জন্য একটা ছেলে এল, সঙ্গে একটা ঘোড়া এবং গাড়িতে দুটো প্যাকিং বাক্স, প্রত্যেকটায় অনেকগুলো ছবি আছে। প্রায় পঁয়ত্রিশ মাইল রাস্তা। আমাদের ছোট্ট রাজধানী গ্রেজ থেকে যখনই কোন দূত এই দুর্গে আসে, হলের মধ্যে আমরা খবর শোনার জন্যে তাকে ঘিরে ধরতাম।

তার এই আগমনে আমাদের নির্জন কোয়ার্টারে একটা হুলুস্থুল পড়ে গেল। বাক্সগুলো হলঘরে পড়ে রইল। দূতের খাওয়া অবধি চাকরেরা তার দেখাশুনা করতে লাগল। তারপর লোকজনদের নিয়ে হাতুড়ি, বাটালী, স্ক্রু-ড্রাইভার নিয়ে আমাদের সঙ্গে হলঘরে মিলিত হল। সেখানে আমরা বাক্সের জিনিস দেখবার জন্যে জড়ো হয়েছিলাম।

কারমিলা বসে উদাসভাবে তাকিয়েছিল। পুরনো ছবিগুলো প্রায় সবগুলোই প্রতিকৃতি যেগুলোকে সারানো হবে। একটার পর একটা বার করা হচ্ছে। আমার মা ছিলেন এক প্রাচীন হাঙ্গেরীয় বংশের, তাঁর মাধ্যমেই ছবিগুলো এসেছে। ছবিগুলো যথাস্থানে রাখা হচ্ছে।

আমার বাবার হাতে একটা লিস্ট রয়েছে। সেটা তিনি পড়ছেন আর চিত্রশিল্পী নম্বর খুঁজে খুঁজে বার করে মিলিয়ে নিচ্ছে। আমি জানতাম না ছবিগুলো এত ভাল, খুব পুরনো সন্দেহ নেই এবং তার মধ্যে আবার কতকগুলো

অদ্ভুত ধরনের। এই প্রথম সেগুলো দেখার সৌভাগ্য আমার হল যদিও সময়ের চিহ্ন তা থেকে মুছে যায়নি।

আমার বাবা বললেন, একটা ছবি এখনও আমি দেখিনি। ওপরের এক কোণে নামটা আমি পড়তে পারি—মার্সিয়া কার্নষ্টাইল, তারিখ—১৬৯৮। এটার কেমন অবস্থা হয়েছে দেখার জন্যে আমি উদ্‌গ্রীব।

আমি মনে করতে পারছি—সেটা একটা ছোট ছবি। প্রায় দেড় ফুট উঁচু, চৌকো এবং কোন ফ্রেম ছিল না ; কিন্তু এমন কালো হয়ে গেছে যে আমি ঠিক করতে পারলাম না।

শিল্পী বেশ গর্বের সঙ্গে সেটা বার করল। খুব সুন্দর, চমকপ্রদ, যেন জীবন্ত। সেটা কারমিলার প্রতিমূর্তি!

প্রিয় কারমিলা, এটা একটা অলৌকিক ব্যাপার। এই যে এই ছবিতে তুমি জীবন্ত, হাস্যময়ী, কথা বলার জন্যে প্রস্তুত। এটা কি সুন্দর নয় বাবা? আর দেখ, তার গলায় একটা ছোট আঁচিল পর্যন্ত।

আমার বাবা হেসে বললেন, নিশ্চয়ই এটা একটা আশ্চর্যজনক মিল। কিন্তু তিনি একে গুরুত্ব দিলেন না দেখে আমি বিস্মিত হলাম। তিনি অন্যদিকে ফিরে ছবি-পরিষ্কারকের সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন। সে নিজে একজন শিল্পী-গোছের এবং প্রতিকৃতি বা অন্য কাজের সম্বন্ধে বেশ বুদ্ধিমানের মত কথা বলতে লাগল। আমি ছবিটাকে যতই দেখছি ততই আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি।

আপনি কি এই ছবিটা আমার ঘরে টাঙাবেন, বাবা? আমি জানতে চাইলাম।

নিশ্চয়ই বাছা, মৃদু হেসে বললেন। তুমি এমন ভেবেছ দেখে আমি খুব খুশি হয়েছি। আমি যা ভেবেছিলাম তার থেকেও সুন্দর, এটা যদি তাই হয়।

যুবতী এমন ভাল কথাটায় সায় দিল না, কানে নিল বলে মনেও হল না। চেয়ারের পেছনে হেলান দিয়ে তার সুন্দর চোখ দুটো দিয়ে একমনে আমার দিকে তাকিয়ে রইল এবং একটা ভাবের বশে মৃদু হাসতে লাগল।

এইবার তুমি পরিষ্কারভাবে কোণে লেখা নামটা পড়তে পার। এটা মার্সিয়ার নাম নয়, মনে হচ্ছে সোনার অক্ষরে লেখা। নাম মিরকালা, কার্নস্টাইনের কাউন্টেস, মাথায় ছোট মুকুট, নিচে লেখা ১৬৯৮ খৃস্টাব্দ। আমি কার্নস্টাইনদের বংশধর অর্থাৎ আমার মা ছিলেন কাউন্টেস।

ওঃ, আমার মনে হয় আমিও তাই, অনেক দূর সম্পর্ক, খুব পুরনো। এখন কি কোন কার্নস্টাইন লোক বাস করে? অলসভাবে মহিলাটি বলল।

আমার বিশ্বাস এই নামে কেউ নেই। সে পরিবার ধ্বংস হয়ে গেছে, মনে হয় অনেকদিন আগে কোন গৃহযুদ্ধে তবে দুর্গের ধ্বংসাবশেষ এখান থেকে তিন মাইল দূরে এখনও আছে।

কি মজার! ক্ষীণকণ্ঠে বলল। দেখ কি সুন্দর চাঁদের আলো! হলঘরের

একটু ফাঁক-করা দরজা দিয়ে এক পলক দেখে নিল। ধর তুমি যদি বাগানে একটু ঘুরে বেড়াও আর রাস্তা ও নদীর শোভা দেখ।

তুমি যেদিন এসেছিলে আজকের রাতটাও সেইরকম, আমি বললাম।

সে দীর্ঘশ্বাস ফেলে মৃদু হাসল।

সে উঠে দাঁড়াল, আমরা হাত দিয়ে দুজনে দুজনের কোমর জড়িয়ে ধরে বাইরে বেরিয়ে এলাম।

নিঃশব্দে, ধীরে ধীরে আমরা টানা পুলের দিকে এগোতে লাগলাম। চমৎকাব প্রাকৃতিক দৃশ্য আমাদের চোখের সামনে ভেসে উঠল।

তাহলে তুমি আমার এখানে আসার রাতের কথা ভাবছ? খুব আস্তে বলল। আমার আসাতে তুমি সুখী হয়েছ?

পরমানন্দিত, প্রিয় কারমিলা।

আব আমার মত দেখতে ঐ ছবিটা তোমার ঘরে টাঙাবার জন্যে বলছ, একটা নিঃশ্বাস টেনে বিড়বিড় করে বলল। তার হাতটা আমার কোমবের আরো কাছে নিয়ে এসে তাব মাথাটা আমার কাঁধে রাখল।

তুমি কি রোমান্টিক, কারমিলা, আমি বললাম। যখনই তুমি আমাকে তোমার গল্প বল সেটা প্রধানত একটা বড় রকমের রোমান্সেব সঙ্গে জড়িত।

আমাকে সে নিঃশব্দে চুম্বন দিল।

আমি নিশ্চয় বলতে পাবি তুমি ভালবাসায় পড়েছ, তার মানে ঠিক এই মুহূর্তে কোন ভালবাসার আদান প্রদান হচ্ছে।

আমি কারোর সঙ্গেই ভালবাসায় পড়িনি আর কখনও পড়ব না, যদি না সে তুমি হও, মৃদু স্বরে সে বলল।

এই চাঁদের আলোয় তাকে কি সুন্দর দেখাচ্ছে!

লজ্জা ও কৌতূহলোদ্দীপক দৃষ্টি নিয়ে সে তাড়াতাড়ি আমার ঘাড়ে ও চুলের মধ্যে মুখ লুকিয়ে ফেলল। বারবার ফোঁপানির মত শ্বাস ফেলে তার কাঁপা হাত দিয়ে আমাকে চাপ দিতে লাগল।

আমার গালে তার নরম গালটা আবেগে উত্তেজিত হয়ে উঠল।

সখি, সখি, আমি তোমার মধ্যেই বেঁচে আছি, আমার জন্যে তুমি মরবে, আমি তাই তোমাকে ভালবাসি।

আমি তার বাঁধন ছাড়িয়ে নিলাম।

সে এমন চোখের দৃষ্টিতে আমাকে দেখতে লাগল যার কোন উজ্জলতা নেই, কোন অর্থ নেই এবং মুখটা তার ফ্যাকাসে, উদাসভাব।

একটু ঠাণ্ডা ঠাণ্ডাভাব আছে নাকি বন্ধু? আমার প্রায় কাঁপুনি ধরছে; আমি কি স্বপ্ন দেখছিলাম? এস ভেতরে যাই। এস, এস, ভেতরে এস।

তোমাকে অসুস্থ দেখাচ্ছে, কারমিলা, একটু মূর্চ্ছাভাব। তোমার গরম কিছু পানীয় দরকার।

হ্যাঁ, তাই কর। আমি এখন ভাল আছি। কয়েক মিনিটের মধ্যে আমি সুস্থ হয়ে যাব। হ্যাঁ, আমায় গরম কিছু পানীয় দাও, দরজার দিকে এগোতে এগোতে সে উত্তর দিল। আবার কিছুক্ষণ দেখি এস, হয়ত এটাই আমার শেষ, তোমার সঙ্গে আমি চাঁদের আলো দেখব।

এখন কেমন লাগছে বন্ধু? তুমি কি সত্যিই সুস্থ হয়েছ? আমি জানতে চাইলাম।

আমি বিপদাশঙ্কা বোধ করলাম পাছে সে আমাদের চারদিকে যে অদ্ভুত সংক্রামক রোগের প্রকোপ দেখা গেছে তাতে আক্রান্ত হয়ে না পড়ে।

আমাদের অজান্তে তুমি যদি একটুও অসুস্থ হও বাবা তবে ভীষণ দুঃখিত হবেন। আমাদের এখানে একজন খুব ভাল ডাক্তার আছেন, তিনি আজ আমার বাবার সঙ্গে ছিলেন।

আমি তা জানি। আমি জানি তোমরা সকলে কত দয়ালু, কিন্তু আমি আবার ভাল হয়ে উঠেছি। আমার কখনও কিছু খারাপ হয়নি, তবে একটু দুবলতা এই যা। লোকে বলে আমি জড়গ্রস্থ। আমি কোন কর্মপ্রচেষ্টায় অপারগ। তিন বছরের শিশুর মত বেশী দূর চলতে পারি না। যখন তখন আমি শক্তি হারিয়ে ফেলি, যেমন এই মাত্র তুমি দেখলে। যাহোক খুব সহজেই আমি ঠিক হয়ে যাই, মুহূর্তেই আমি আমার নিজের মধ্যে ফিরে আসি। দেখলে কেমন আমি সুস্থ হয়ে উঠেছি।

প্রকৃতপক্ষে সে তাই হয়েছিল। সে ও আমি অনেক গল্প করলাম। সে যেন চনমনে হয়ে উঠল। বাকি সন্ধ্যেটা নির্ঝঞ্ঝাটে কেটে গেল অর্থাৎ যাকে বলে মোহাচ্ছন্নের পুনর্বিকাশ ঘটল না। যেমন, তার আবোল তাবোল কথাবার্তা, অদ্ভুত চাহনি—যা আমাকে বিরক্ত এমন কি ভীতও করে তুলেছিল।

কিন্তু সেই রাতে এমন এক ঘটনা ঘটল যা আমার চিন্তা ভাবনাকে নতুন মোড় দিল। সেটা এমন কি কারমিলার জড়ত্বকে নাড়া দিয়ে ক্ষণিক শক্তির উদ্ভব করল বলে মনে হল।

ষষ্ঠ অধ্যায়

এক অতি অদ্ভুত যন্ত্রণা

আমরা ড্রইং রুমে গিয়ে কফি ও চকোলেট খাবার জন্যে বসলাম। যদিও সে কিছুই খেল না, সে সুস্থ হয়ে উঠেছে বোধ হল। পেরোডোন ও ডি লাফোঁতে আমাদের সঙ্গে বসে কিছুক্ষণ তাস খেলল। সেইসময় বাবা ঘরে এলেন।

খেলা শেষ হবার পর তিনি কারমিলার পাশে সোফায় বসে একটু উদগ্রীব হয়ে জিজ্ঞেস করলেন এখানে আসার পর তার মায়ের কাছ থেকে কিছু খবর পেয়েছে কিনা।

সে উত্তর করল, না।

তারপর তিনি জানতে চাইলেন বর্তমানে কোথায় তাঁকে চিঠি লিখলে পৌঁছবে।

আমি বলতে পারি না, ব্যর্থভাবে সে উত্তর দিল। তবে আপনাদের ছেড়ে চলে যাওয়ার কথা ভাবছি। আপনারা আমার প্রতি অনেক আতিথেয়তা ও দয়া দেখিয়েছেন। আমি আপনাদের অনেক কষ্ট দিয়েছি। আমার ইচ্ছে আগামীকাল একটা গাড়ি নিয়ে তাঁর খোঁজে যাব। আমি জানি কোথায় তাঁকে শেষে পাব যদিও এখন সেটা বলতে আমি সাহস পাচ্ছি না।

কিন্তু তোমার এ জিনিস কল্পনা করা উচিত নয়। আমার চিন্তা দূর করে বাবা বললেন। আমরা তোমাকে ওভাবে যেতে দিতে পারি না, বিশেষ করে আমি তোমার যাওয়ায় মত দেবনা। তার ফিরে না আসা পযন্ত তোমাকে এখানে থাকার অনুমতি দিয়েছেন, তার তত্ত্বাবধানেই তুমি যেতে পার। তুমি তাঁর কাছ থেকে কোন খবর পেয়েছ জানলে আমি খুব আনন্দিত হব। যে রহস্যজনক রোগটা আমাদের এলাকায় হানা দিয়েছিল আজ সন্ধ্যায় সেটা আরও বিপদসঙ্কুল হয়ে উঠেছে। আমার সুন্দরী অতিথি, তোমার মায়ের কাছ থেকে কোন আদেশ না পেয়ে আমার দায়িত্ব আরো বেশী বোধ করছি। তবে আমি আমার যথাসাধ্য করব এবং একটা বিষয়ে নিশ্চিন্ত, তোমার মায়ের কাছ থেকে কোন সুস্পষ্ট নির্দেশ না আসা পযন্ত আমাদের ছেড়ে যাবার চিন্তা তোমায় ত্যাগ করতে হবে। এত সহজে মত দিলে তোমার থেকে বিচ্ছিন্ন অনেক কষ্ট আমাদের ভোগ করতে হবে।

আপনার আতিথেয়তার জন্যে হাজারবার ধন্যবাদ দিই, মহাশয়। লজ্জিত-ভাবে মৃদু হেসে সে বলল। আমার প্রতি আপনি খুব দয়া দেখিয়েছেন। জীবনে আগে এত সুখী আমি কদাচিৎ হয়েছি। যেমন আপনার এই সুন্দর দুর্গে, আপনার যত্নে এবং আপনার কন্যার সান্নিধ্যে।

তাঁর পুরনো আদব কায়দায় বাবা তার হাতে চুম্বন দিয়ে মৃদু হেসে তার কথায় সন্তুষ্ট হলেন।

অভ্যাসমত আমি কারমিলার সঙ্গে তার ঘরে গিয়ে বসলাম। সে তার বিছানা ঠিক করতে লাগল আর আমি তার সঙ্গে গল্প করতে লাগলাম।

শেষে আমি বললাম, তুমি কি আমাকে কখনও সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করে গুপ্তকথা বলতে পারনা?

সে আমার দিকে ঘুরে কোন কথা না বলে কেবল আমার দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসতে লাগল।

তুমি কি উত্তর দেবে না? তুমি সন্তোষজনকভাবে উত্তর দিতে পার না। আমার তোমাকে জিজ্ঞেস করা উচিত হয়নি।

আমাকে জিজ্ঞেস করা তুমি ঠিকই মনে করেছ। তুমি জান না। তুমি আমার কাছে কত প্রিয় অথবা তুমি ভাবতেও পার না তোমার ওপর যেকোন আস্থা কতখানি হতে পারে। কিন্তু আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, কোন সন্ন্যাসিনী তার অর্দ্ধেকও নয় এবং এখনও আমার কথা বলতে সাহস করি না এমনকি তোমাকেও নয়। সময় খুব কাছে আসছে যখন তুমি সবকিছু জানবে। তুমি আমাকে নিষ্ঠুর ভাববে, খুব স্বার্থপর কিন্তু ভালবাসা সবসময়ই স্বার্থপর হয়, যত তীব্র তত স্বার্থপর। আমি কত ঈর্ষাপরায়ণ তা তুমি জানতে পাব না। তুমি মরতে আমার সঙ্গে আসবে, আমাকে ভালবাসবে, অথবা আমাকে ঘৃণা করবে তবুও তুমি আমার সঙ্গে আসবে। মৃত্যুর মধ্যে দিয়েও আমাকে ঘৃণা করবে এবং তারপরেও। আমার বেদনাবোধহীন স্বভাবের মধ্যে নিরপেক্ষতা বলে কোন শব্দ নেই।

কারমিলা, তুমি আবার তোমার আজগুবি কথা বলতে স্বরু করেছ, আমি চট করে বলি।

আমি না, আমার মত এক ক্ষুদ্রবুদ্ধিসম্পন্ন খেয়ালী ও কল্পনাপ্রবণ বোকা নয়, তোমার সুবিধের জন্যে আমি মুনি ঋষির মত বলব। তুমি কোন নৃত্য সম্মেলনে গেছ?

না, কেমন করে তোমরা চালাও? এটা কেমন? নিশ্চয়ই খুব চমৎকার!

আমি প্রায় ভুলে গেছি, সেটা অনেকদিন আগের কথা।

আমি হাসলাম।

তুমি ত' অত বৃদ্ধ নও। তোমার প্রথম নৃত্য এরমধ্যেই ভুলে যেতে পার না।

একবার চেষ্টা করলে আমি সবকিছু মনে করতে পারব। আমি সব দেখছি, যেমন ডুবুরিরা কিছুর মাধ্যমে দেখে তাদের ওপরে কি হচ্ছে—ঘন, মৃদু আলোড়িত অথচ স্বচ্ছ। সে রাতে যা ঘটল তার সব ছবিটা গোলমাল হয়ে গেল। রঙগুলোও বিবর্ণ হয়ে গেল। আমাকে বিছানায় হত্যা করা হয়েছিল, এইখানে আহত করেছিল,—সে তার বুকটা স্পর্শ করল। এবং আর কখনও সেরকম হয়নি।

তুমি কি প্রায় মরতে বসেছিলে?

হ্যাঁ সেইরকমই—এক নিষ্ঠুর ভালবাসা—অদ্ভুত ভালবাসা, যা আমার জীবন নিতে বসেছিল। ভালবাসায় আত্মদান আছে। বিনা রক্তে কিছুই ত্যাগ করা যায় না। যাক, চল এবার শুতে যাই। আমি ভীষণ ক্লান্ত বোধ করছি। কি করে আমি উঠে দরজায় তালা দিই?

ঘাড়ের নিচে চুলের মধ্যে তার ছোট ছোট হাত দুটো রয়েছে, তার ছোট্ট মাথাটা বালিশের ওপর। আমি যেদিকেই যাচ্ছি সেই অবস্থায় শুয়ে তার উজ্জ্বল চোখ দুটো আমাকেই অনুসরণ করছে। এমন এক হাসি তার মুখে যার

কোন অর্থই খুঁজে পাচ্ছি না।

তাকে শুভরাত্রি জানিয়ে গুটি গুটি পায়ে এক অস্বস্তিভরা মন নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম।

আমি মাঝে মাঝে ভাবি আমাদের এই সুন্দর অতিথি কোন প্রার্থনা করে কি না। আমি কখনও তাকে হাঁটু গেড়ে বসতে দেখিনি। সকালে আমাদের পরিবারের সকলের প্রার্থনা হয়ে যাবার অনেক পরে সে নিচে নামে। রাতেও হলঘরে আমাদের সঙ্গে প্রার্থনায় যোগ দিতে সে ড্রইংরুম ছেড়ে আসে না।

আমাদের কথাবার্তার মধ্যে কখনও তার খৃস্টধর্মে দীক্ষিত হওয়ার কথা না উঠলেও সে যে একজন খৃস্টান সেবিষয়ে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে। ধর্ম সম্বন্ধে তার কাছ থেকে কোন কথা কখনও শুনিনি। যতদূর আমি তাকে জেনেছি তার এই ব্যাপারে উপেক্ষা বা বিদ্বেষ আমাকে কিছুমাত্র বিস্মিত করত না।

ভীরু লোকদের সতর্কতা অবলম্বন একধরনের সংক্রামক রোগ এবং যেসব লোকেরা একই প্রকৃতির কিছুদিন পরে দেখা যায় তারা সেগুলোই অনুকরণ করে। মাঝরাতে আক্রমণকারীর আগমন এবং গুপ্তঘাতকের নিঃশব্দে ঘুরঘুর করার ব্যাপারে তার যে খেয়ালীভীতি ছিল সেইটা আমার মাথায় থাকার দরুন কারমিলার শোবার ঘরে তালাবন্ধ করার অভ্যাসটা আমিও নিয়েছিলাম। তার ঘরটা ভাল করে অনুসন্ধান করার এবং কোন গুপ্তঘাতকের বা ডাকাতের নিরাপদে লুকিয়ে না থাকার ব্যাপারে তাকে সন্তুষ্ট করার কাজটাও আমি নিজের হাতে নিয়েছিলাম।

এই সমস্ত কাজ করার পর আমি আমার বিছানায় গিয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম। আমার ঘরে একটা বাতি জ্বলছিল। এটা আমার অনেকদিনের পুরনো অভ্যাস এবং কিছুতেই এটা আমাকে ছাড়াতে পারবে না।

এইভাবে আত্মরক্ষার সমস্ত ব্যবস্থা করে তবে আমি শান্তিতে বিশ্রাম নিতে পারতাম। কিন্তু কল্পনা পাথরের দেয়ালের মধ্যে দিয়েও আসে, অন্ধকারময় ঘরকে আলোকিত, অথবা আলোকিত ঘরকে অন্ধকার করে তোলে। স্বপ্নের লোকেরা তাদের ইচ্ছামত ঘরে আসে এবং বার হয় আর তালাওয়ালার প্রতি বিদ্রূপের হাসি হাসে।

সেইরাতে আমি এক স্বপ্ন দেখি আর সেইটাই এক অতি অদ্ভুত যন্ত্রণার শুরু হয়।

এটাকে আমি নিশা স্বপ্ন বলতে পারি না কারণ আমি যে ঘুমিয়ে আছি সে ব্যাপারে আমার চেতনা ছিল। শুধু তাই নয়, আমি যে আমার ঘরে আছি, বিছানায় শুয়ে আছি তাও আমার ভালরকম জ্ঞান ছিল। আমি দেখলাম অথবা মনে হল আমি দেখলাম, ঘর এবং ঘরের আসবাবপত্র আগে যা দেখেছি সবই ঠিক আছে তবে ভীষণ অন্ধকার এবং আমার বিছানার পায়ের দিকে কিছু

যেন নড়াচড়া করছে যা প্রথমে আমি ঠিক বুঝতে পারিনি। কিন্তু কিছু পরেই দেখলাম সেটা যেন একটা দৈত্যাকার বেড়ালের মত আবলুশ-কালো জন্তুবিশেষ। প্রায় চার পাঁচ ফুট লম্বা এবং খাঁচায় বন্দী জানোয়ারের মত বিদ্বেষপূর্ণ অস্থিরতায় এদিক ওদিক ঘুরছে। আমি চীৎকার করতে পারলাম না, যদিও আপনারা ধরে নিতে পারেন আমি ভীষণভাবে আতঙ্কিত হয়ে উঠেছিলাম। তার চলাফেরা করা আরও দ্রুত হয়ে উঠল এবং ঘরটাও যেন আরও দ্রুত অন্ধকার থেকে অন্ধকারতর হয়ে উঠল। অবশেষে এত ঘন অন্ধকার হয়ে গেল যে আমি তার চোখ দুটো ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাচ্ছিলাম না। আমার মনে হল সে যেন আস্তে লাফিয়ে বিছানায় উঠল। বড় বড় দুটো চোখ আমার দিকে এগিয়ে আসতে লাগল এবং হঠাৎ আমি যেন বুকে দুটো ছুঁচ ফোটানোর বেদনা অনুভব করলাম, এক কি দুই ইঞ্চি তফাতে আমার বুকের গভীরে ঢুকে গেছে। আমি আর্তনাদ করে জেগে উঠলাম। ঘরের মধ্যে সারারাত ধরে যে বাতিটা জ্বলছিল তার আলোয় দেখলাম আমার বিছানার পাদদেশে একটু ডানদিক ঘেঁষে একটা স্ত্রীলোকের মূর্তি দাঁড়িয়ে আছে। কালো আলখাল্লা পরে, এলোচুল কাঁধের ওপর ছড়িয়ে রয়েছে। একটা পাথরের চাঁই অমন নিথর হতে পারে না। দেহে শ্বাসপ্রশ্বাসের সামান্যতম কম্পন নেই। তার দিকে তাকাতেই মূর্তিটা জায়গা থেকে সরে গিয়ে দরজার কাছে গেল, তারপর খুব কাছে গিয়ে দরজাটা খুলে বেরিয়ে গেল।

আমি যেন নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলাম, একটু নড়াচড়া করলাম। প্রথমে আমার মনে হল কারমিলা হয়ত আমার সঙ্গে চালাকী করছে আর আমি হয়ত দরজাটা ঠিক করে বন্ধ করিনি। তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে দেখি, না, দরজাটা ভেতর দিক থেকে তালা দেওয়া আছে। আমি সেটা খুলতে ভয় পেলাম—আমি ভীষণভাবে আতঙ্কিত হয়ে উঠলাম। একলাফে বিছানায় উঠে পা থেকে মাথা পর্যন্ত চাদর মুড়ি দিয়ে সকাল হওয়া অবধি মরার মত পড়ে রইলাম।

সপ্তম অধ্যায়

অবরোহণ

সেরাতের ঘটনাটা এখনও মনে পড়লে আমি যে কিরকম আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিলাম সে কথা বলার চেষ্টা বৃথা। স্বপ্নে দেখার মত এটা অল্পকাল স্থায়ী আতঙ্ক নয়। যতই দিন যেতে থাকে এটা যেন ততই মর্মঘাতী হয়ে ওঠে আর সেই ঘর ও ঘরের যাবতীয় আসবাবপত্রের সঙ্গে সেই মূর্তি মিশিয়ে আছে।

পরেরদিন একমুহূর্তও আমি একা থাকতে পারলাম না। বাবাকে আমার বলা উচিত ছিল কিন্তু দুটো (পরস্পর বিরোধী) কারণে বলতে পারিনি।

একবার ভাবলাম আমার গল্প শুনে তিনি হাসবেন আর এটাকে ঠাট্টা করলে আমি সহ্য করতে পারব না। আবার ভাবলাম, তিনি মনে করতে পারেন যে রহস্যজনক রোগটা সারা পাড়ায় ছড়িয়ে পড়েছে তাতেই হয়ত আমি আক্রান্ত হয়েছি। এব্যাপারে আমার নিজের কোন আশঙ্কা ছিল না এবং তিনি কিছুদিন থেকে অসুস্থ হয়ে পড়ায় তাঁকে শঙ্কিত করে তুলতে আমি ভয় পেলাম।

পেরোডোন ও লাফোঁতে—এই দুই হাসিখুশি সঙ্গীর সঙ্গে সময় কাটাতে আমি যথেষ্ট স্বস্তি পেয়েছিলাম। তারা বুঝতে পেরেছিল আমি যেন ভীত ও নিরানন্দময় হয়ে পড়েছি। অবশেষে আমি তাদের আমার বুকের বোঝার কথা বললাম।

লাফোঁতে হাসল কিন্তু লক্ষ্য করলাম পেরোডোন উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছে।

লাফোঁতে হাসতে হাসতে বলল, প্রসঙ্গত বলি কারমিলার শোবার ঘরের জানালার পেছনে সারি সারি লেবু গাছের তলায় ঘুরে বেড়ালে ভূতে ধরে।

বাজে কথা, পেরোডোন বলল। এ জায়গা এটা অবান্তর ভেবে বলল, এমন গল্প তোমায় কে বলেছে শুনি?

মার্টিন বলেছে, দুবার যখন সে রাতে করখানার দরজা মেরামত করছিল তখন দুবারই সে লেবু গাছের তলায় এক মহিলাকে ঘুরে বেড়াতে দেখে। আমার বলতে সাহস কুলোচ্ছে না, তবে মার্টিন ভয় পেয়েছিল এবং অমন একজন বোকাকে কখনও অমন ভীত হতে দেখিনি

তাদের কথার মাঝে আমি বলি, কারমিলাকে এব্যাপারে একটা কথা বলাও ঠিক হবে না কারণ সে তার ঘরের জানালা থেকে সে দৃশ্য দেখতে পারে। আমার থেকেও সে সম্ভবত আরো বেশী ভীতু।

সেদিন কারমিলা অন্যদিনের থেকে বেশী দেরি করে নিচে নামল।

আমরা একসঙ্গে হতেই সে বলল, কাল রাতে আমি এমন ভয় পেয়েছিলাম আর আমি নিশ্চয় করে বলতে পারি আমি কিছু মারাত্মক জিনিস দেখেছিলাম। সেই কুঁজো লোকটার কাছ থেকে মন্ত্রপূত কবচ যা কিনেছিলাম তা না থাকলে ভাল হত। স্বপ্নে দেখলাম কালো মত কিছু একটা আমার বিছানার কাছে এল, আমি আতঙ্কে জেগে উঠলাম। কয়েকমুহূর্ত ভাবলাম আমি যেন চিমনীর কাছে একটা মূর্তি দেখছি। আমার বালিশের তলায় কবচের কথাটা মনে হল আর যেমুহূর্তে আমার আঙুলের স্পর্শ হয়েছে তখনি মূর্তিটা অদৃশ্য হল। আমার নিশ্চয় মনে হয়েছিল ভয়ার্ত কিছুর আবির্ভাব ঘটেছিল আর হয়ত আমার গলা টিপে দিত যেমন শুনেছি গরীব লোকদের করেছে।

ঠিক আছে, আমার কথা শোন। এই বলে আমি গতরাতের ঘটনাটা বললাম, লক্ষ্য করলাম শুনতে শুনতে সে মাঝে মাঝে আতঙ্কিত হয়ে উঠেছিল।

তোমার কাছে কি সেই কবচ ছিল? আগ্রহে সে জিজ্ঞেস করল।

না আমি সেটা ড্রইং রুমে একটা ফুলদানীর মধ্যে রেখেছি। তবে রাতে আমি নিশ্চয়ই সেটাকে কাছে রাখব। এটার ওপর তোমার অনেক বিশ্বাস আছে দেখছি।

এতদিন পরে আমি ঠিক করে বলতে পারব না বা বোঝাতে পারব না, সে-রাতে একা ঘরে শুতে কি করে যে আতঙ্ক কাটিয়ে উঠেছিলাম! আমার স্পষ্ট মনে পড়ছে সেই কবচটা আমি বালিশে বেঁধে রেখেছিলাম। সঙ্গে সঙ্গে আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম আর অন্যদিনের তুলনায় গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়েছিলাম।

পরের রাতেও সেইভাবে কাটালাম। পরমানন্দে গভীর ও স্বপ্নহীন ঘুমে নিদ্রা দিলাম।

আমি যখন কারমিলাকে আমার শান্তিতে ঘুমোবার কথা বললাম সে আমাকে জানাল, তোমাকে সেইকথাই বলেছিলাম না। গতরাতে আমারও খুব ভাল ঘুম হয়েছে। সেই কবচটা আমি আমার নাইটড্রেসের বুকে গেঁথে রেখেছিলাম। আগের রাতের থেকে অনেকদূরে ছিল। আমি নিশ্চিত এসবই কল্পনা, শুধুমাত্র স্বপ্ন। আমি ভাবি পাপ মন স্বপ্ন সৃষ্টি করে। কিন্তু আমাদের ডাক্তার বলেন ওসব কিছুই নয়। জ্বরের ঘোরে বা অন্য কোন রোগে এমন হয় যেমন দরজায় ঘা দিয়ে ভেতরে ঢুকতে না পেরে চলে যায়।

কবচটাকে তুমি কি ভাব? আমি বললাম।

এটা ধোঁয়া বা কোন ওষুধে ডোবান এবং ম্যালেরিয়ার প্রতিষেধক।

তাহলে এটা শুধু দেহের ওপরেই কাজ করে?

নিশ্চয়ই, তুমি মনে করতে পার না রিবনের টুকরো দিয়ে বা ওষুধের দোকানের কোন গন্ধদ্রব্য দিয়ে ভূত ছাড়ান যায়? না, এসব রোগ বাতাসে ঘুরে বেড়ায়, শিরা উপশিরা থেকে কাজ শুরু করে একেবারে মাথায় গিয়ে সংক্রামিত হয়। কিন্তু তোমাকে আক্রান্ত করবার আগে প্রতিষেধক তাদের পরাস্ত করে। এভাবেই কবচটা আমাদের যা করেছে সেবিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। এটা কিছু ভোজবাজী নয়, অতি স্বাভাবিক।

আমি যদি কারমিলার সঙ্গে একমত হতে পারতাম তবে খুব সুখী হতাম কিন্তু আমার যথাসাধ্য চেষ্টা করেও কথাটার মধ্যে গুরুত্ব দিতে পারলাম না।

বেশ কয়েক রাত আমি গভীর ঘুমে কাটালাম। কিন্তু তবুও প্রত্যেকদিন সকালে উঠে অনুভব করতাম যে একই অবসন্নতা ও জড়তা সারাদিন ধরে আমার ওপর ভর করে থাকত। নিজেকে যেন এক অন্য মেয়ে মনে হত। একটা অদ্ভুত হতাশা সারাদিন আমাকে আচ্ছন্ন করে রাখত, যে হতাশাকে আমি কখনই কাটিয়ে উঠতে পারিনি। মৃত্যুর আবছা ছবি আমার সামনে ভেসে উঠতো এবং ক্রমে ক্রমে তার হাতছানিতে আমি এগিয়ে চলতে লাগলাম এধারণাও আমার হল। যদি এটা দুঃখজনক হয় তবে যে মানসিক অবস্থায় আবিষ্ট করত সেটাও মধুর। এটা যাই হোক না কেন, আমার আত্মা এতে

নীরব সম্মতি দিত।

আমি স্বীকার করব না যে আমি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম। আমার বাবাকে কিছু বলতে বা ডাক্তার ডাকতে আমি অনুমতি দিতে চাই না।

কারমিলা আমার প্রতি আরো বেশী আসক্ত হয়ে পড়ল। এবং তার অদ্ভুত জড়তার প্রবল আবেগ ঘন ঘন হতে লাগল। যতই আমার শক্তি ও ক্ষমতা কমতে থাকল ততই যেন সে আমার প্রতি জয়গর্বিত দৃষ্টিতে দেখতে লাগল। ক্ষণিক অপ্রকৃতিস্থতার মত এটা আমাকে আঘাত দিতে লাগল।

আমার অজান্তে এই অদ্ভুত রোগের অনেকদূর বিস্তৃতি হয়েছে যার প্রকোপে মানুষ এমন কষ্টভোগ করেনি। প্রথম প্রথম এই রোগের লক্ষণ দেখে মনে হয়েছিল যে বেশীদূর এগোবার ক্ষমতা এর নেই। কিন্তু এক অবর্ণনীয় আকর্ষণ বাড়তে বাড়তে এমন এক পযায়ে গিয়ে পৌছেছিল যখন ক্রমে ক্রমে এর সঙ্গে ভীতি মিশে আমার সমস্ত জীবনকে বিবর্ণ ও বিকৃত করে তুলেছিল, যা আপনারা পরে জানতে পারবেন।

প্রথম যে পরিবর্তন আমি উপলব্ধি করেছিলাম তা মনোরম। এটা সঙ্কট মুহূর্তের খুব কাছেই যেখান থেকে নরক গমনের শুরু হয়েছে।

আমার ঘুমের মধ্যে কিছু অস্পষ্ট ও অদ্ভুত অনুভূতি দেখা দেয়। যখন আমরা স্নান করি, নদীর স্রোতের বিপরীত দিকে যাই, তখন যে আনন্দময় শীতল শিহরণ অনুভব করি সেটাই স্থায়ী হয়ে রইল। এর সঙ্গে সীমাহীন স্বপ্নের আগমন ঘটল। সেগুলো এমনই অস্পষ্ট যে তার দৃশ্য এবং মানুষদের অথবা পরস্পর সংযুক্ত তাদের কাজের কোন অংশ আমি মনে করতে পারি না। কিন্তু সেগুলো ভীতির ছাপ এবং এক নিদারুণ শ্রান্তির অনুভূতি রেখে যায়, মনে হয় যেন বহুক্ষণ মানসিক প্রচেষ্টা ও বিপদের মধ্যে দিয়ে আমি পথ অতিক্রান্ত করেছি। জেগে ওঠার পর এই সমস্ত স্বপ্নের একটা স্মৃতির রেশ থেকে যায় যা থেকে মনে করতে পারি আমি যেন প্রায়ান্ধকার এক জায়গায় বসেছি এবং লোকের সঙ্গে কথা বলেছি যাদের আমি দেখতে পাইনি। বিশেষ করে, একজন মেয়ের বহুদূর থেকে শান্তকণ্ঠে কথা বলার স্পষ্ট গলার স্বর শুনতে পাই যা আমার মনে অবর্ণনীয় ভয়ের সঞ্চার করে। কখনও আমার গালে ও ঘাড়ে মৃদু হাতের স্পর্শ পাই। কখনও আবার কেউ আমাকে উষ্ণ ঠোঁটের চুম্বন দেয় এবং দীর্ঘ ও গভীরভাবে স্নেহভরা চুম্বন গলা অবধি এসে সে সোহাগ থেমে যায়। আমার বুকের স্পন্দন তখন বেড়ে যায়, দ্রুত শ্বাস প্রশ্বাস নিতে থাকি। গলা টিপে ধরার মত এক ফোঁপানি এসে বাধা হয়ে দাঁড়ায় এবং ভীষণভাবে প্রবল আক্ষেপে তা পরিণত হয়। এতে আমার সমস্ত বোধশক্তি হারিয়ে ফেলি এবং অজ্ঞান হয়ে যাই।

আজ তিন সপ্তাহ হল এই অবর্ণনীয় অবস্থা শুরু হয়েছে। গত সপ্তাহে যে কষ্টবোধ করেছি তার নিদর্শন আমার চেহারার মধ্যেই প্রকট হয়ে ফুটে উঠেছে।

আমি ফ্যাকাশে হয়ে পড়েছি, আমার চোখ ড্যাবডেবে হয়ে পড়েছে, চোখের তলায় কালি পড়েছে এবং যে জড়তা অনেকদিন আগে থেকেই আমি বোধ করছিলাম সেটা এখন সমস্ত দেহে ফুটে উঠেছে।

মাঝেমাঝেই আমার বাবা জানতে চাইতেন আমি অসুস্থ কি না কিন্তু এক অবোধ্য জেদে বারবার তাঁকে আশ্বাস দিতাম আমি সুস্থ আছি।

পরোক্ষ অর্থে এটা সত্যি। আমার কোন ব্যথা বেদনা ছিল না, আমার দৈহিক বিশৃঙ্খলার কোন অভিযোগ করতে পারিনি। আমার রোগ বলতে মনে হয় অলীক কল্পনার অথবা স্নায়ুব এবং যে ভয়ানক কষ্ট ভোগ করতাম তা বিষাদ-গ্রস্ত মনে নিজের মধ্যেই গোপন করে রাখতাম।

চাষীবা যে ভীষণ বোগকে ভূতুড়ে বলত এটাকে সেরকম বলতে পাবা যায় না কাবণ তিন সপ্তাহ ধরে আমি ভুগছি আর তারা কদাচিৎ তিনদিনের বেশী না ভুগেই তাদের দুঃখের অবসান ঘটিয়ে মারা যায়।

কার্মিলা স্বপ্ন ও জ্বরজ্বরভাবের সম্বন্ধে অভিযোগ করে কিন্তু আমার মত এমন শঙ্কাজনক নয়। আমি বলি আমার গুলোই বেশী ভীতিকর। আমি যদি আমার অবস্থা উপলব্ধি করতে সক্ষম হতাম তবে আমি হাঁটু গেড়ে বসে সাহায্য ও উপদেশের জন্যে প্রার্থনা জানাতাম। এক অজানা মাদকের নেশার ঘোরে যেন আমার উপলব্ধি করার সব ক্ষমতা হারিয়ে গেছে।

এমন এক স্বপ্নের কথা বলছি যা আমাকে এক অদ্ভুত আবিষ্কারের সন্ধান দিয়েছিল।

একদিন রাতে, স্বপ্নের ঘোরে অন্ধকারে যে গলার স্বর শুনতে অভ্যস্ত তার বদলে মধুর ও স্নেহভরা কণ্ঠে অথচ ভয়ার্ত স্বরে বলতে শুনলাম, তোমার মা গুপ্তঘাতকের সম্বন্ধে সতর্ক হতে বলেছেন। ঠিক সেইমুহূর্তে অপ্রত্যাশিতভাবে একটা আলো জ্বলে উঠল। দেখলাম কারমিলা আমার বিছানার পাদদেশে দাঁড়িয়ে আছে, সাদা রাত্রিবাস তার পরনে, চিবুক থেকে পা পর্যন্ত একটা রক্তের দাগ।

তীক্ষ্ণ চীৎকার করে জেগে উঠলাম, আমার মাথায় ঘুরছে কারমিলাকে হত্যা করা হয়েছে। আমার মনে পড়ছে বিছানা থেকে লাফিয়ে নেমে বারাণ্ডায় গিয়ে জোরে চীৎকার করতে লাগলাম।

পেরোডোন ও লাফোঁতে শঙ্কিত হয়ে হুড়মুড় করে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। বারাণ্ডায় একটা আলো সবসময় জ্বলে। তারই আলোয় আমাকে দেখে আমার কাছ থেকে আতঙ্কের কারণ জানল।

আমি কারমিলার ঘরের দরজায় ঘা দেবার জন্য পীড়াপীড়ি করতে লাগলাম। দরজায় ধাক্কা দেওয়া সত্বেও কোন উত্তর পাওয়া গেল না। দুমদুম করে দরজায় ধাক্কা দেওয়া আর চেঁচামেচি শুরু হয়ে গেল। আমি চীৎকার করে তার নাম ধরে ডাকতে লাগলাম। কিন্তু সবই বৃথা হল।

আমরা সকলেই ভীত হয়ে পড়লাম কারণ দরজার ভেতর থেকে তালা দেওয়া ছিল। আমরা আতঙ্কিত হয়ে আমার ঘরে ফিরে গেলাম। সেখানে আমরা জোরে জোরে আর অনেকক্ষণ ধরে ঘণ্টা বাজাতে লাগলাম। যদি বাবার ঘরটা বাড়ির সেদিকে হত তবে তাঁকে তক্ষুণি এব্যাপারে সাহায্য করার জন্য বলতাম। কিন্তু হায়! তিনি শোনার বাইরে আর তাঁর কাছে যাওয়া মানে এই রাতের অন্ধকারে দুর্গের ভেতর দিয়ে পথ অতিক্রম করতে হবে। সে সাহস আমাদের কারোর নেই।

চাকরেরা অবশ্যি দৌড়ে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে এল। ইতিমধ্যে আমি ড্রেসিং গাউন ও জুতো পরেছি এবং আমার সঙ্গীরাও একই পোশাকে আবৃত। বারাণ্ডায় চাকরদের গলার স্বর চিনতে পেরে আমরা বেগে ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। আর একবার কারমিলার ঘরের দরজায় ঘা দিয়ে তাকে ডাকার বৃথা চেষ্টা করার পর আমি চাকরদের তালা ভেঙে ফেলতে হুকুম দিলাম। তারা দরজা ভেঙে ফেলার পর আমরা দোর গোড়ায় দাঁড়িয়ে উঁচু করে আলো তুলে ধরে ঘরের মধ্যে একদৃষ্টে দেখতে লাগলাম।

তার নাম ধরে ডাকলাম, কোন উত্তর নেই। ঘরের চারদিকে চোখ ঘোরালাম, কোথাও বিশৃঙ্খলার লক্ষণ নেই। তাকে শুভরাত্রি জানিয়ে চলে যাবার সময় যেমন সব ছিল তেমনই আছে-- কিন্তু কারমিলা নেই।

অষ্টম অধ্যায়

অনুসন্ধান

আমাদের হুড়মুড় করে ঢোকা ছাড়া ঘরের আর কিছুরই কোন অদলবদল না দেখে আমরা ধীরে ধীরে শান্ত হলাম। নিজেদের জ্ঞানে ফিরে আসতেই আমরা চাকরদের সরিয়ে দিলাম। লাফোঁতের মনে হল দরজায় ধাক্কাধাক্কি ও হৈ চৈ করার দরুণ কারমিলা জেগে উঠে বিছানা ছেড়ে পর্দার বা আলমারির পেছনে লুকিয়েছে। হয়ত বাজার সরকার বা দুর্গ ভৃত্যদলের লোকদের চলে না যাওয়া পর্যন্ত সে বেরোতে পারছে না। আমাদের এখন খোঁজ সুরু করতে হবে আর তার নাম ধরে আবার ডাকাডাকি করতে হবে।

এসবকিছুই উদ্দেশ্যহীন হল। আমাদের হতাশা ও উত্তেজনা আরও বৃদ্ধি পেল। আমরা জানালাগুলো পরীক্ষা করে দেখলাম সেগুলো ভালভাবেই বন্ধ। আমি মিনতি করে কারমিলাকে ডাকলাম—যদি সে লুকিয়ে থাকে তবে আমাদের সঙ্গে যেন আর ছলনা না করে—বেরিয়ে এসে আমাদের উদ্বেগ দূর করে যেন। সবই নিষ্ফল হল। এরই মধ্যে আমার বিশ্বাস হল যে সে ঘরে নেই, এমনকি ড্রেসিংরুমেও নয়—কারণ ভেতর দিক থেকেই তার দরজায় তালা দেওয়া। বন্ধ দরজার ভেতর দিয়ে সে যেতে পারে না। আমি একেবারে

ঘাবড়ে গেলাম। তবে কি কারমিলা গোপন পথ খুঁজে পেয়েছে যার কথা বৃদ্ধ গৃহরক্ষক বলে এই দুর্গে আছে বলে জানা যায় যদিও তার সঠিক জায়গাটা হারিয়ে গেছে। সন্দেহ নেই, সময়ে সব কিছুই জানা যাবে তবু বর্তমানে আমরা একেবারে হতাশাগ্রস্ত।

তখন রাত চারটে, বাকী অন্ধকার সময়টা পেরোডোনের ঘরে কাটিয়ে দিতেই মনস্থ করলাম। দিনের আলো এ সমস্যার কোন সমাধান করল না।

পরেরদিন সকালে সমস্ত বাড়ি এক উত্তেজিত অবস্থায় দাঁড়াল। দুর্গের সমস্ত আনাচে কানাচে খোঁজা হল, বাগান তল্লাস করা হল কিন্তু হারানো মেয়ের কোন খোঁজ পাওয়া গেল না। নদীতে জাল ফেলে দেখার মত অবস্থায় এসে পৌছল। আমার বাবা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লেন। বেচারা মেয়েটার মা ফিরে এলে তাকে বলা হবে। আমিও আত্মহারা হয়ে পড়েছিলাম যদিও আমার কষ্টটা সম্পূর্ণ অন্য ধরনের।

শঙ্কা ও উত্তেজনার মধ্যে সারা সকাল কাটল। বেলা একটা বাজল তবুও কোন কিনারা হল না। আমি দৌড়ে কারমিলার ঘরে গিয়ে দেখি সে ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। আমি বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। আমার চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। সে তার সুন্দর আঙুল দিয়ে ইসারায় আমাকে তার কাছে ডাকল। তার মুখে ভীষণ ভয়ের চিহ্ন।

আনন্দের উচ্ছ্বাসে আমি তার কাছে দৌড়ে গেলাম। বারবার তাকে চুম্বন ও আলিঙ্গন করতে লাগলাম। দৌড়ে গিয়ে ঘণ্টা বাজিয়ে সকলকে ডাকলাম যাতে তারা এখানে এসে দেখে আর বাবার উদ্বেগ দূর করে।

প্রিয় কারমিলা, সারা সময়টা তোমার কি হয়েছিল? আমরা তোমার জন্য ভেবে আকুল। কোথায় তুমি ছিলে? কি করে তুমি ফিরে এলে?

গতকালের রাত ছিল এক আশ্চর্যের রাত। সে বলল।

ভগবানের দোহাই, যা পার সব খুলে বল।

সে বলতে লাগল, তখন রাত দুটো বেজে গেছে, আমার ঘরের ড্রেসিংরুমের এবং বারাণ্ডায় যাবার দরজায় তালা লাগিয়ে নিত্যকার মত আমি শুতে গেছি। আমার ঘুমে কোন বাধা ছিল না এবং যতদূর জানি স্বপ্নহীন ঘুম। কিন্তু ড্রেসিং রুমের সোফার ওপরে আমি এইমাত্র ঘুম থেকে উঠলাম। দেখলাম দুটো ঘরের মাঝের দরজাটা খোলা আর অন্যটা ভেঙে ফেলা হয়েছে। আমার ঘুম না ভেঙেই এসব কি করে হল? নিশ্চয়ই এসব করতে খুব আওয়াজ হয়েছে আর একটুতেই আমার ঘুম ভেঙে যায়। কিভাবেই বা আমার ঘুম না ভাঙিয়ে আমাকে ওখানে নিয়ে যাওয়া হল, আমার মত মেয়ে যে সামান্য শব্দেই চমকে ওঠে?

এরই মধ্যে পেরোডোন, লাফোঁতে, আমার বাবা আর বেশ কয়েকজন চাকর ঘর ঢুকেছে। নানা প্রশ্ন, অভিনন্দন ও সাদর সম্ভাষণের ঠেলায় কারমিলা

আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল। তার একটি মাত্রই কাহিনী বলার ছিল এবং আমাদের কেউই ঘটনার মাথামুণ্ডু কিছুই ধরতে পারল না।

আমার বাবা ঘরে পায়চারী করতে করতে ভাবতে লাগলেন। আমি দেখলাম কারমিলার চোখ তাঁর সঙ্গে সঙ্গে ঘুরছে।

বাবা চাকরদের ঘর থেকে বিদায় করলেন, লাফোঁতে ওষুধ আনতে বেরিয়ে গেল। ঘরের মধ্যে তখন কারমিলা, আমার বাবা, পেরোডোন ও আমি ছাড়া আর কেউ ছিল না। চিন্তান্বিতভাবে বাবা কারমিলার কাছে এগিয়ে এলেন, তার হাত দুটো স্নেহভরে ধরে তাকে সোফায় বসিয়ে তার পাশে বসলেন।

বললেন, বাছা আমি যদি কিছু অনুমান করে তোমায় একটা প্রশ্ন করি তবে আমাকে মাফ করবে কি ?

কার বেশী জোর থাকতে পারে ? আপনার যা ইচ্ছা প্রশ্ন করুন, আমি আপনাকে সব বলব। কিন্তু আমার কাহিনী এক অন্ধকারময় ও বিভ্রান্তিকর। আমি কিছুই জানি না। আপনার খুশিমত প্রশ্ন করতে পারেন। কিন্তু আপনি নিশ্চয়ই জানেন মা আমাকে আপনার কাছে কি সীমাবন্ধের মধ্যে রেখে গেছেন।

খুব ভাল করেই জানি, বাছা আমার। যে বিষয়ে তিনি আমাদের নীরব থাকা ইচ্ছা করেন তার মধ্যে যাবার আমার প্রয়োজন নেই। ব্যাপারটা হচ্ছে, গতরাতের বিস্ময়ের মধ্যে তোমাকে ঘুম না ভাঙিয়ে তোমার বিছানা ও ঘর থেকে অন্য ঘরে নিয়ে যাওয়া হল এবং আপাতদৃষ্টিতে যখন ঘরের জানালা এবং দরজা ভেতর থেকে বন্ধ করা ছিল তখনই এই ঘটনা ঘটল। আমি যা ভেবেছি তা তোমাকে বলব কিন্তু প্রথমেই তোমাকে একটা প্রশ্ন করব।

কারমিলা নিরানন্দভাবে হাতের ওপর হেলান দিয়ে বসেছিল পেরোডোন এবং আমি শ্বাসরুদ্ধ হয়ে শুনছিলাম।

এখন আমার প্রশ্নটা হচ্ছে, তুমি কখনও স্বপ্নচারণ কর বলে তোমার সন্দেহ হয় কি ?

খুব ছোটবেলা থেকেই জানি এরকম হয় না।

কিন্তু যৌবনে তুমি স্বপ্নচারণ করেছিলে ?

হ্যাঁ, আমি জানি আমি করেছিলাম। প্রায়ই আমার বুড়ী ধাইমা আমাকে বলতেন।

আমার বাবা হেসে মাথা নাড়লেন।

যাক, তাহলে যা ঘটেছে তা হচ্ছে এই। তুমি ঘুম থেকে উঠে দরজার তালা খুলেছিলে, সচরাচর যা করে থাক তালায় চাবি লাগিয়ে রাখনি বরঞ্চ সেটা খুলে নিয়ে বাইরে তালা লাগিয়েছিলে। আবার তা থেকে চাবি খুলে নিয়ে এই তলার পঁচিশখানা ঘরের কাউকে অথবা হয়ত ওপর তলায় বা নীচের তলায় কাউকে চাবিটা দিয়েছিলে। এখানে অনেক ঘর ও গোপন ঘর আছে, সেখানে

অনেক ভারী ভারী আসবাবপত্র আর অকেজো আসবাবপত্রে ভর্তি। এই বাড়িটা ভালভাবে খুঁজতে এক সপ্তাহ সময় লাগবে। বুঝতে পারছ, আমি কি বলতে চাইছি?

কিছু কিছু, সব নয়।

আচ্ছা বাবা, ওকে ড্রেসিংরুমে শোফায় দেখতে পাওয়ার ব্যাপারে আপনি কি বলতে চান, যেটা আগেই আমরা ভালভাবে দেখেছিলাম?

সেখানে সে এসেছিল তোমাদের খোঁজার পর আর তখনও সে ঘুমেই ছিল এবং শেষে আপনাআপনি জেগে ওঠে। সে অবস্থায় নিজেকে দেখতে পেয়ে আমরা যেমন সেও তেমনি আশ্চর্য হয়েছে।

আমার ইচ্ছা কারমিলা তোমার মত সমস্ত রহস্য সহজ ও সরলভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এই বলে তিনি হাসলেন। অতএব আমরা নিশ্চিন্ত হয়ে আমাদের অভিনন্দন জানাতে পারি যে এই ঘটনার সবচেয়ে স্বাভাবিক ব্যাখ্যা হচ্ছে যে কোন ওষুধ, তালাভাঙা, ছিঁচকে চোর, বন্দী অথবা কোন ডাইনীর ব্যাপার নয়—কারমিলা অথবা অন্য কারোর শঙ্কিত হবার প্রয়োজন নেই।

কারমিলাকে দেখতে খুব সুন্দর লাগছিল। তার মুখের আভার কাছে কোন কিছুই সুন্দর ছিল না। তার এই সৌন্দর্য আমার মনে হয় জড়ত্বের মধ্যে দিয়ে আরো সুন্দর হয়ে উঠেছে। আমার মনে হল বাবা নীরবে আমার সঙ্গে তার রূপের তুলনা করেছেন। কারণ তিনি বললেন।

বেচারী আমার লরা যেন তার মত সুন্দরী হয়। তিনি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। এইভাবে আমাদের শঙ্কা আনন্দের মধ্যে শেষ হল আর কারমিলা তার বন্ধুদের সঙ্গে আবার মিলিত হল।

নবম অধ্যায়

ডাক্তারবাবু

কারমিলা তার ঘরে রাতে কোন লোককে থাকতে দিতে নারাজ। তাই বাবা ঠিক করলেন একজন লোক ঘরের বাইরে দরজার কাছে শুয়ে থাকবে যাতে রাতে সে বেরিয়ে যাবার চেষ্টা করলে তাকে ধরবে।

সে রাতটা নিশ্চিন্তে কাটল। পরেরদিন বেশ সকালেই ডাক্তারবাবু আমাকে দেখতে এলেন। আমাকে কোন কথা না বলে বাবা ডাক্তারবাবুকে ডেকেছেন।

পেরোডোন আমার সঙ্গে লাইব্রেরীতে এল। সেখানে রাশভারী বেঁটে-খাটো মানুষ ডাক্তারবাবু, মাথায় সাদা চুল ও চশমা চোখে, আমার জন্যে অপেক্ষা করছিলেন।

আমি তাঁকে আমার কথা বললাম এবং আমি যতই এগোতে লাগলাম

তিনি আরো গম্ভীর হয়ে উঠলেন।

আমরা দাঁড়িয়ে রয়েছি—তিনি এবং আমি—একটা জানালার মাঝে দুজনে মুখোমুখি।

আমার কথা শেষ হলে তিনি দেয়ালে কাঁধ ঠেসান দিয়ে দাঁড়ালেন। এমন আগ্রহে তিনি আমার দিকে দৃষ্টি দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন যা মনে ভীতির সঞ্চার করে।

মিনিটখানেক সেইভাবে থাকার পর পেরোডোনের কাছ থেকে জানতে চাইলেন তিনি বাবার সঙ্গে দেখা করতে পারেন কি না।

বাবাকে ডাকা হল। মৃদুহাস্যে ঘরে ঢুকতে ঢুকতে তিনি বললেন, আমি মনে করি ডাক্তারবাবু, আপনি বলবেন আমি একটা বুড়ো বোকা তাই আপনাকে এখানে ডেকে আনেছি। আশাকরি আমি তাই।

কিন্তু ডাক্তারবাবু ভীষণ গম্ভীরভাবে বাবাকে তার কাছে ডাকতেই বাবার মুখের হাসি মিলিয়ে গেল।

জানালার যেখানটায় দাঁড়িয়ে আমি ডাক্তারবাবুর সঙ্গে কথা বলেছিলাম ঠিক সেইখানে দাড়িয়ে অনেকক্ষণ ধরে তাঁরা দুজনে কথা বললেন।

মনে হল তাদের কথাবার্তা আগ্রহ ও বিতর্কমূলক। ঘরটা বেশ বড়, একেবারে ঘরের শেষে আমি ও পেরোডোন উৎসুক হয়ে দাঁড়িয়ে আছি। তাঁরা এত আস্তে কথা বলছিলেন যে কিছুই আমরা শুনতে পাচ্ছিলাম না। জানালার খাঁজের মধ্যে ঢাকা পড়া ডাক্তারবাবুকে আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম না এবং বাবার পা, হাত ও কাঁধের কিছু অংশ দেখা যাচ্ছিল। মোটা দেয়াল ও জানালার মাঝে যে কুলুঙ্গি আছে তার জন্যেই হয়ত তাদের গলার স্বর কানে আসছিল না।

কিছুক্ষণ পর বাবার মুখটা দেখা গেল—ফ্যাকাসে, চিন্তান্বিত এবং বিক্ষুব্ধ।

লরা বাছা, এদিকে এসো একবার। ম্যাডাম, ডাক্তারবাবু বলছেন তোমাকে এখন আর আমরা কষ্ট দেব না।

আমি এগিয়ে গেলাম, এই প্রথম একটু শঙ্কা বোধ করলাম। যদিও আমি খুব দুবল আমি কিন্তু কোন অসুস্থতা বোধ করছি না। আর শক্তি যা সকলেই মনে করে থাকে, ইচ্ছামত মনে আনা যায়।

কাছে আসতেই বাবা আমার দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন। ডাক্তারবাবুর দিকে তাকিয়ে বললেন,

এটা নিশ্চয়ই খুব অদ্ভুত, আমি ঠিকমত বুঝতে পারছি না। লরা এদিকে এস বাছা, ডাক্তার স্পিয়েলস বার্গের কাছে তোমার কথা মনে করে বল।

তুমি বলেছিলে যেদিন রাতে প্রথম আতঙ্কজনক স্বপ্ন দেখেছিলে তখন তোমার ঘাড়ের কাছাকাছি কোথাও দুটো ছুঁচের মত চামড়ার মধ্যে বিঁধে ছিল। এখনও সেখানে কোন ক্ষত আছে?

না কিছুই নেই, আমি উত্তর দিলাম।

তুমি কি আঙুল দিয়ে সেই জায়গাটা দেখাতে পার যেখানে তোমার মনে হয়েছিল ছুঁচ ফুটেছে?

গলার তলায়—এইখানে। আমি দেখালাম। প্রাতঃকালীন পোশাক পরে থাকার দরুণ জায়গাটা ঢাকা ছিল।

এখন আপনি নিজে সন্তুষ্ট হতে পারেন; ডাক্তার বাবাকে বললেন। তারপর আমার দিকে ফিরে বললেন, তোমার বাবা পোশাকটা একটু নামালে তুমি নিশ্চয়ই কিছু মনে করবে না? তুমি যাতে কষ্ট পাচ্ছ সেই রোগের লক্ষণটা দেখা দরকার।

আমি নীরবে মাথা নেড়ে সম্মতি দিলাম। আমার কলার থেকে দু' এক ইঞ্চি নিচে।

ভগবান রক্ষা করুন! ঠিক তাই! বাবা চেঁচিয়ে উঠলেন, মুখটা আরও ফ্যাকাসে হয়ে গেল।

আপনার নিজের চোখে এখন আপনি দেখছেন, একটা বিষণ্ণ উল্লাসে ডাক্তার বললেন।

কি ব্যাপার? আমি ভয় পেয়ে জানতে চাইলাম।

কিছুই না, আমার সুন্দরী যুবতী, তোমার কোড়ে আঙুলের ডগার মত ছোট্ট একটা নীল দাগ। বাবার দিকে ফিরে আবার বলতে লাগলেন, এখন প্রশ্ন হচ্ছে, ভাল কি করা যায়?

কোন বিপদ আছে? ভীষণভাবে কেঁপে উঠে আমি জানতে চাইলাম।

আমি বিশ্বাস করি না। তুমি কেন সেরে উঠবে না তা আমি দেখছি না। সুস্থ হয়ে উঠতে তুমি এখনই কেন শুরু করবে না তা দেখছি না। ওটাই হচ্ছে ব্যাপার যেখান থেকে গলা টেপার উপলব্ধি শুরু হয়েছে।

হ্যাঁ, আমি উত্তর দিলাম।

আর, যতটা পার মনে করে দেখ, ঐ চিহ্নটাই উত্তেজনার মূল যা তুমি আমাকে এইমাত্র বলেছ, যেন তোমার মধ্যে দিয়ে একটা ঠাণ্ডা স্রোত বয়ে গেছে।

তা হতে পারে, আমাব মনে হয় তাই হয়েছিল।

হ্যাঁ, আপনি দেখলেন, বাবার দিকে ফিরে তিনি বললেন। ম্যাডাম পেরোডোনের সঙ্গে একটু কথা বলব?

নিশ্চয়ই, বাবা বললেন।

পেরোডোনকে বাবা ডাকলেন।

তিনি বললেন, আমার এখানে এই তরুণী বন্ধু মোটেই সুস্থ নয়। আশাকরি, এটা কিছু বড় ব্যাপার নয়। তবে কিছু সতর্কতা নেবার দরকার হবে যা আমি ক্রমে ক্রমে বলব। কিন্তু তার মাঝে, ম্যাডাম, লরাকে মুহূর্তের

জন্যেও একলা থাকতে দিতে না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। এই মুহূর্তে এই একটা আদেশই আমি দেওয়া মনে করি। এটা অপরিহার্য।

আমি জানি ম্যাডাম আমরা তোমার দয়ালুতার ওপর নির্ভর করতে পারি। বাবা কথাটা যোগ করলেন।

ম্যাডাম তাঁকে সন্তুষ্ট করলেন।

লরা বাছা, আমি জানি তুমি ডাক্তারের নির্দেশ মেনে চলবে।

আর একজন রুগীর সম্বন্ধে আপনার মত জানতে চাইব, যার লক্ষণ আমার মেয়ের মত প্রায় একই, যা এইমাত্র আপনাকে বর্ণনা করেছে, তুলনায় একটু কম তবে আমার বিশ্বাস একই ধরনের। সে এক তরুণী যুবতী—আমাদের অতিথি। আপনি বললেন আজ সন্ধ্যায় এই পথ দিয়ে ফিরবেন, এখানে রাতের খাবার খেয়ে যাবেন আর সেই সময় তাকে দেখতে পাবেন। দুপুর না হওয়া পর্যন্ত সে নিচে নামে না।

আপনাকে ধন্যবাদ। তাহলে, সন্ধ্যে সাতটা নাগাদ আপনার সঙ্গে মিলিত হব।

আবার তাঁরা আমাকে ও ম্যাডামকে নির্দেশের পুনরাবৃত্তি করে ডাক্তারের সঙ্গে বাবা বেরিয়ে গেলেন। আমি তাদের দেখলাম উঁচু নিচু রাস্তা ও পরিখা দিয়ে, দুর্গের সামনে ঘাসের জমির ওপর দিয়ে দুজনে যাচ্ছে, গভীরভাবে নিজেদের মধ্যে আলোচনায় মগ্ন।

ডাক্তার ফিরে এলেন না। আমি দেখলাম তিনি ঘোড়ায় চড়ে বিদায় নিয়ে পূর্বদিকে বনের মধ্যে দিয়ে চলে গেলেন। ঠিক সেই সময়েই দেখলাম ড্রেনফিল্ড থেকে চিঠিপত্র নিয়ে একজন লোক এল। ঘোড়া থেকে নেমে বাবার হাতে থলি দিল।

ইতিমধ্যে ম্যাডাম ও আমি ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। ডাক্তারবাবু ও বাবা কি কারণে এই একটিমাত্র আদেশ চাপিয়ে দিলেন সে ব্যাপারে অনুমান করতে লাগলাম। ম্যাডাম পরে আমাকে বলেছিল ডাক্তারবাবু ভয় পাচ্ছেন হঠাৎ আমি আক্রান্ত হলে ঠিকমত সাহায্য না পাওয়ার দরুন, অজ্ঞান অবস্থায় হয় আমি মারা যেতে পারি নয়ত অন্ততপক্ষে ভীষণভাবে আহত হতে পারি।

এইরকম ব্যাখ্যা আমাকে সন্তুষ্ট করেনি। আমার অনুমান হয়ত আমার স্নায়ুদৌর্বল্যের জন্যে এইরকম একটা ব্যবস্থা করেছিলেন যাতে আমার একজন সঙ্গীর দরকার যে নাকি আমার অতিরিক্ত কাজকর্ম থেকে আমাকে বিরত করবে, অথবা অপক্ক ফল খেতে মানা করবে অথবা পঞ্চাশ রকমের বাজে কাজ করা থেকে আমাকে সরিয়ে রাখবে যা সাধারণত তরুণ-তরুণীদের করতে ঝোঁক হয়।

প্রায় আধঘণ্টা পর আমার বাবা এলেন—তাঁর হাতে একটা চিঠি—তিনি বললেন,

এই চিঠিটা আসতে দেরী করেছে, এটা জেনারেল স্পিয়েলসডর্ফের কাছ থেকে এসেছে। তিনি হয়ত গতকাল এখানে আসতে পারতেন, কাল পর্যন্ত তিনি না আসতে পারেন অথবা তিনি আজই আসতে পারেন।

তিনি আমার হাতে খোলা চিঠিটা রাখলেন, কিন্তু তাঁকে দেখে ভাল মনে হল না, যা সাধারণত হয়ে থাকে—একজন অতিথি, বিশেষ করে জেনারেলের মত প্রিয় একজন লোক, এখানে আসছেন। অপরপক্ষে বাবাকে দেখে মনে হল তিনি রেডসীর তলায় পেলে সুখী হন। তাঁর মনে এমন কিছু আছে যা তিনি প্রকাশ করতে ইচ্ছুক নন।

বাবা, আপনি কি আমায় এটা বলবেন? হঠাৎ তাঁর হাতে আমার হাত রেখে মিনতিপূর্ণ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রইলাম।

হয়ত—, এই বলে তিনি আদর করে মৃদুভাবে আমার চোখের ওপর থেকে চুল সরিয়ে দিলেন।

ডাক্তারবাবু আমাকে কি খুব অসুস্থ মনে করেন?

না বাছা, তিনি ভাবেন যদি ঠিক পথ নেওয়া যায় তুমি আবার ভাল হয়ে উঠবে, দু একদিনের মধ্যে অন্ততপক্ষে পরিপূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠার পথে যাবে। আমাদের বন্ধু জেনারেল অন্য সময়ে এলে ভাল করতেন। তার মানে তুমি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠে তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা জানালে আমি খুশি হতাম।

কিন্তু বাবা আমাকে বলুন, আমার কি হয়েছে ডাক্তার ভাবেন?

কিছু না, তুমি প্রশ্ন করে আর আমাকে বিরক্ত করো না। তিনি এমন বিরক্তির ভাব দেখালেন যা আমি আগে কখনও দেখিনি। মনে হল আমি আঘাত পেয়েছি দেখে, তিনি আমায় আদর করে বললেন, দু একদিনের মধ্যেই তুমি সব জানতে পারবে, তার মানে যা আমি জানি। ইতিমধ্যে তুমি আর এব্যাপারে মাথা ঘামিও না।

তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে কিন্তু পরমুহূর্তেই আবার ফিরে এলেন, বললেন তিনি কার্নস্টাইনে যাচ্ছেন এবং বারটার সময় গাড়ি ঠিক করে রাখতে বলেছেন। আর আমি এবং পেরোডোন তার সঙ্গে যাব। তিনি ধর্মযাজকের সঙ্গে ব্যবসা সংক্রান্ত ব্যাপারে দেখা করতে যাচ্ছেন যে নাকি সেই সুন্দর ছবির মত জায়গায় থাকেন। কারমিলাও অমন সুন্দর জায়গা দেখেনি, সেও যেতে পারে। যখন সে লাফোঁতের সঙ্গে নিচে নামবে তাকে বলবে। লাফোঁতে জিনিসপত্তর সঙ্গে নেবে যাকে তোমরা বলতে পারো এক ধরনের পিকনিক—সেই ধ্বংসপ্রাপ্ত দুর্গের মধ্যে।

ঠিক বারোটার সময় আমি প্রস্তুত এবং কিছু পরেই আমার বাবা, ম্যাডাম ও আমি আমাদের পরিকল্পনা অনুযায়ী যাত্রা করলাম। টানা পুল পার হয়ে ডানদিকে ফিরে রাস্তা ধরে গথিক পুলের পশ্চিমদিকে চলে কার্নস্টাইনের পরিত্যক্ত গ্রাম ও ধ্বংসপ্রাপ্ত দুর্গে এসে পৌছলাম।

কোন আরণ্য ভ্রমণ এত সুন্দর হয় না। মাঠের মধ্যে মাঝে মাঝে ছোট ছোট পাহাড় ও গর্ত, ছোট ছোট ঝোপঝাড়ে সেগুলো ভর্তি—কৃত্রিম গাছপালা লাগানো কোন বাগান নয় এবং আদিম সভ্যতাকে কেটে ছেটে নতুন কোন সভ্যতার প্রকাশ নয়।

বন্ধুর জমি থেকে মাঝে মাঝে রাস্তা সরে গেছে পাহাড়ের ধার ঘেঁসে, উঁচু পাহাড়ের গা বেয়ে বাতাস বইছে। এইরকম এক বাঁকের মুখে হঠাৎ আমরা মুখোমুখি হলাম আমাদের পুরনো বন্ধু জেনারেলের সঙ্গে। তিনি ঘোড়ায় চড়ে আমাদের দিকেই আসছেন, সঙ্গে আছে চাকর। তাঁর জিনিসপত্তর ভাড়া করা একটা ওয়াগনে, যাকে আমরা গাড়ি বলি, পেছনে আসছে।

আমরা দাঁড়াতে তিনি ঘোড়া থেকে নামলেন। তারপর সম্ভাষণ বিনিময়ের পর তাকে সহজেই আমাদের গাড়ির খালি আসনে বসতে রাজী করালাম এবং তাঁর চাকর ঘোড়া নিয়ে দুর্গে এল।

দশম অধ্যায়

শোকসন্তপ্ত

প্রায় দশমাস আগে তাঁর সঙ্গে আমাদের দেখা হয়েছে কিন্তু এই সময়ের মধ্যে তাঁর পরিবর্তন বহু বছরের বলে মনে হয়। তিনি আরো রোগা হয়ে পড়েছেন, তাঁর সবসময় হাসিখুশি ও আনন্দময় চেহারা হতাশা ও উদ্বিগ্নতা ঢেকে ফেলেছে। তাঁর ঘন নীল উজ্জ্বল চোখ দুটো এখন লম্বা কুঞ্চিত পাকা ভুরুর চুলের মধ্যে দিয়ে মিটমিট করে জ্বলছে। দুঃখই কেবল তাঁর এই পরিবর্তন আনেনি ক্রোধের আবেগও এর সঙ্গে জড়িত।

একটু চলার পরই জেনারেল সৈনিকোচিতভাবে কথা বলতে আরম্ভ করলেন, তাঁর আদরের ভাইঝি ও কন্যাসম মেয়ের মৃত্যুতে শোক সম্বন্ধে। তারপরই তিনি রাগে ও জ্বালায় ফেটে পড়লেন। যে নারকীয় জাদুর বলি সে হয়েছে তার বিরুদ্ধে ভর্ৎসনায় সোচ্চার হয়ে উঠলেন। ভক্তির বদলে অতিশয় ক্রুদ্ধভাবে তিনি তাঁর ক্ষোভ প্রকাশ করলেন। কি করে ঈশ্বর এই অমানুষিক নারকীয় লালসা ও চরম ক্ষতির প্রাবল্যকে প্রশ্রয় দেন তা ভেবে তিনি আশ্চর্য হয়ে পড়েন।

সঙ্গে সঙ্গে বাবা তাঁর অস্বাভাবিক কিছু ঘটেছে দেখে তাকে জিজ্ঞেস করলেন, যদি তিনি খুব বেদনাময় মনে না করেন, ঘটনার পূর্ণ বিবরণ বলতে যা বাকি তাঁকে এমন কঠোর সমালোচনার প্রকাশ করতে বাধ্য করছে।

সানন্দে আমি আপনাকে সব বলব, কি আপনি আমার কথা বিশ্বাস করবেন না?

কেন বিশ্বাস করব না?

কারণ আপনাদের সংস্কার ও বিশ্বাসের বাইরে কোন কিছুই মানতে চান না। জেনারেল একটু বিরক্তিভরে কথাগুলো বললেন। আপনার মত যখন ছিলাম আমারও তাই মনে হত কিন্তু এখন আমি অনেক কিছু শিখেছি।

বেশ পরখ করে দেখুন, বাবা বললেন। আপনি যা মনে করেন সেরকম গোঁড়া আমি নই। তাছাড়া, আমি ভাল করে জানি আপনি যা বিশ্বাস করেন তার প্রমাণ থাকে। সেইজন্যে আপনার সিদ্ধান্ত মেনে নিতে আমি খুবই উৎসাহী।

আপনি ঠিকই ধরেছেন, অবিশ্বাস্য, কিছু আমি মেনে নিই না—কিন্তু যা ঘটেছে তা সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য। আমার সমস্ত কিছুর ধারণার বাইরে তাকে আমি মানতে বাধ্য হয়েছি। এক অতিপ্রাকৃতের ষড়যন্ত্রে আমি প্রতারিত হয়েছি।

জেনাবেলের কথার ওপর আস্থা রাখা সত্ত্বেও আমি লক্ষ্য করলাম বাবা এমন দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে যা তাঁব মনে জেনারেলের প্রকৃতিস্থতার ওপর সন্দেহ সৃষ্টি করে।

সৌভাগ্যবশত জেনারেলের কোন নজব ছিল না। তিনি হতাশা ও উদ্‌গ্রীবভাবে বনের দৃশ্য দেখছেন।

আপনি কার্ণস্টাইনের ধ্বংসাবশেষের দিকে যাচ্ছেন? হ্যাঁ। এটা একটা সৌভাগ্যের মিল। আপনি কি জানেন আমি আপনাকে বলতে যাচ্ছিলাম সেগুলো দেখবার জন্য আমাকে সেখানে নিয়ে যাবেন কিনা? বিশেষ বস্তব খোঁজে সেখানে ঢুঁ মারা আমার দরকার। সেখানে একটা গীর্জাব ধ্বংসাবশেষ আছে, তাই না? আর লোপ পাওয়া সেই পরিবারের অনেক স্মৃতিস্তম্ভ আছে, ঠিক না?

হ্যাঁ—সেগুলো খুবই কৌতূহলোদ্দীপক। আশাকরি আপনি ঐ পদবী ও জমিদারী অধিকাবের বিষয় ভাবছেন?

বাবা বেশ হাসতে হাসতে বললেন কিন্তু জেনারেল সেকথার কোন উত্তর দিলেন না পরন্তু বন্ধুর এ ঠাট্টার কথায় মৃদু হাসা ত দূরের কথা তিনি এমন গম্ভীর ও রাগান্বিতভাবে তাকালেন যেন এ ব্যাপারটা তার ক্রোধ ও ভয়ের সঞ্চার করল।

রূঢ়ভাবে তিনি বললেন, সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের কিছু। তার মানে আমি বলতে চাই সেই চমৎকার লোকগুলোর সম্বন্ধে কিছু জানতে চাই। ভগবানের আশীর্বাদে আশাকরি এক শুভ উদ্দেশ্যে অপবিত্রকরণ করতে চাই যাতে এই পৃথিবী কিছু দানবের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবে এবং সৎলোকেরা দুর্বৃত্তদের দ্বারা পীড়িত না হয়ে নিশ্চিন্তে বিছানায় নিদ্রা যেতে পারে। আপনাকে আমার অদ্ভুত কিছু ব্যাপার বলার আছে যা আমি কয়েকমাস আগেও অবিশ্বাস্য বলে ঘৃণার সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করতাম।

বাবা আবার তার দিকে তাকালেন তবে এবার কিন্তু সন্দেহের চোখে নয়,

শঙ্কা ও জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে।

তিনি বললেন, কার্ণস্টাইন দুর্গ অনেকদিন ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে, অন্তত একশ' বছর হল। আমার প্রিয় স্ত্রী মামার বাড়ির দিক থেকে কার্ণস্টাইনদের বংশধর। কিন্তু নাম ও পদবী অনেকদিন হল লোপ পেয়েছে। দুর্গ ধ্বংস হয়েছে, গ্রামটাও পর্বতাক্ত, পঞ্চাশ বছর আগে চিমনির ধোঁয়া দেখা যেত, এখন একটা ছাদও নেই।

খাঁটি কথা। আপনার সঙ্গে শেষ দেখার পর আমি অনেক কিছু শুনেছি— অনেক যা আপনাকে বিস্মিত করবে। কিন্তু আমার মনে হয় আপনাকে ঘটনা-ক্রম অনুযায়ী সবকিছু বলা ভাল। জেনারেল বললেন। আপনি আমার পুষ্যিকে দেখেছেন—আমার বাছা। তার মত কোন সুন্দরী আর হতে পারে না এবং মাত্র তিন মাস আগেও সে বড় হয়ে উঠেছিল।

আহা বেচারা! শেষ যখন তাকে দেখি কি সুন্দর! বাবা বললেন। আমি এত শোক ও আঘাত পেয়েছি যে আপনাকে তা বলতে পারি না। আমি জানতাম এটা আপনার কাছে একটা বড় আঘাত।

তিনি জেনারেলের হাত ধরে একটু সাদরে চাপ দিলেন। বৃদ্ধ সৈনিকের চোখে জল। তিনি তা লুকোবার চেষ্টা করলেন না। তিনি বললেন:

আমরা দুজনে অনেকদিনের বন্ধু, আমি জানি আপনি আমার জন্যে শোকসন্তপ্ত হবেন কারণ আমি সন্তানহীন। সে আমার কাছে চিত্তাকর্ষক হয়ে উঠছিল এবং আমার স্নেহ ভালবাসার যে প্রতিদান দিচ্ছিল তাতে আমার ঘর ও আমার জীবন আনন্দময় ও সুখী হয়ে উঠেছিল। সব শেষ হয়ে গেল। এই পৃথিবীতে আর আমার বেশীদিন নেই। কিন্তু ভগবানের কৃপায় আমার মরার আগে মানুষের জন্যে একটা কাজ করে যেতে চাই। এবং শয়তানের ভগবানের প্রতিশোধ গ্রহণে সাহায্য করতে চাই যে আমার বাছাকে তার আশা-আনন্দের বসন্তে হত্যা করেছে।

এইমাত্র আপনি বললেন ঘটনার সঙ্গে জড়িত সবকিছু বলতে আপনি ইচ্ছুক। দয়া করে তা বলুন, জানবার জন্যে যে নিছক কৌতূহল তা নয়, সে-বিষয়ে আপনাকে নিশ্চিতরূপে জানাচ্ছি।

ইতিমধ্যে আমরা ড্রানস্টল রোডের মোড়ে এসে পৌছলাম যেপথ দিয়ে জেনারেল এসেছেন, এখান থেকেই আমরা ঘুরে কার্ণস্টাইনের দিকে যাব। সেই ধ্বংসাবশেষ কতদূর? জেনারেল জানতে চাইলেন। উদ্বিগ্নভাবে সামনের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

প্রায় দুমাইল, বাবা বললেন। দয়া করে গল্পটা বলুন যা আপনি কথা দিয়েছেন।

একাদশ অধ্যায়

কাহিনী

আমি সব খুলে বলছি। এই বলে জেনারেল একটু থামলেন, হয়ত মনে মনে ঠিক গুছিয়ে নিচ্ছেন। তারপর যা বললেন এমন অদ্ভুত ঘটনা আমি কখনও শুনিনি।

আপনি যেমন ব্যবস্থা করেছিলেন আমার মেয়ে আপনার মেয়ের কাছে যাবার জন্যে আনন্দের সঙ্গে উদ্‌গ্রীব হয়েছিল। এই সময় তিনি সংকোচিত অথচ হতাশভাবে আমার সামনে মাথা নিচু করে অভিবাদন করলেন। এই সময়ে আমার এক পুরনো বন্ধু কাউণ্ট কার্লসফেল্ডের কাছ থেকে নিমন্ত্রণ পেলাম। তিনি থাকেন কার্ণস্টাইনের অপর পার্শ্বে প্রায় পঁচিশ মাইল দূরে। আপনার হয়ত মনে আছে, গ্র্যাণ্ড ডিউক চার্লসের সম্মানে দফায় দফায় যে ভোজসভা দিয়েছিলেন সেই সেখানে উপস্থিত থাকার জন্যই নিমন্ত্রণ।

হ্যাঁ, আমার বিশ্বাস সেগুলো খুব চমৎকার হয়েছিল। বাবা বললেন।

রাজকীয়। তার আতিথ্য সত্যিই রাজকীয়। সে যেন আলাদিনের প্রদীপ। যেরাত থেকে আমার দুঃখ শুরু সেরাত ছিল এক চমৎকার ছদ্মবেশে নাচ গান করার রাত। সমস্ত বাগান উন্মুক্ত, গাছে গাছে রঙীন আলো। এমন বাজী ফাটান হয়েছিল যে প্যারিস শহরও সেরকম দেখেনি। আর কি গান বাজনা—বাজনা, জানেন ত এব্যাপারে আমি একটু দুর্বল—কি সে মাতোয়ারা! কি সুন্দর বাজিয়ের দল, বোধহয় জগতের শ্রেষ্ঠ আর মধুর গাইয়ে যা ইওরোপের সমস্ত অপেরা থেকে বাছাই করা। স্বপ্নলোকের আলোকিত বাগানের মধ্যে দিয়ে ঘুরতে ঘুরতে আপনি দেখতে পাবেন চাঁদের আলোয় দুর্গের সারি সারি জানালা থেকে আলোর রোশনাই ঠিকরে পড়ছে, এমন সময় হঠাৎ আপনি শুনতে পাবেন কোন নিঃশব্দ ঝোপের আড়াল থেকে মনমাতানো গলার স্বর অথবা লেকের ওপর নৌকা থেকে সুমিষ্ট গান। এমন দৃশ্য দেখতে দেখতে আর হৃদয় উদ্বেল করা গান শুনতে শুনতে আমার যৌবনের স্মৃতি মনে উদয় হল।

যখন বাজী পোড়ান শেষ হল এবং নাচ আরম্ভ হল আমরা তখন নাচঘরে এলাম। ছদ্মবেশে নাচ, আপনি জানেন, কি সুন্দর সে দৃশ্য। এমন চমৎকার দৃশ্য আমি আগে কখনও দেখিনি।

সেটা একটা খুব সম্ভ্রান্ত লোকেদের সমাবেশ। আমি যেন তাদের মধ্যে একজন তুচ্ছ ব্যক্তি।

আমার বাছাকে খুব সুন্দর দেখাচ্ছিল। সে কোন মুখোশ পরেনি।

তার উত্তেজনা ও আনন্দ তার চেহারায় সঙ্গে এক অব্যক্ত সৌন্দর্য যোগ করেছিল। সব সময়ই সে হাসি খুশি। আমি লক্ষ্য করলাম এক সুবেশধারী যুবতী মুখোশের ভেতর দিয়ে আমার মেয়ের দিকে বিশেষ উৎসাহে নজর দিচ্ছে। আমি তাকে আগে সন্ধ্যের সময় বড় হল ঘরে দেখেছি আর একবার কয়েক মিনিটের জন্যে দুর্গের জানালার নিচের চত্বরে আমাদের কাছে হাঁটাহাঁটি করছিল ঠিক এইভাবে মুখোশ পরে। একজন মহিলা সেও মুখোশ পরা এবং দামী পোশাক পরা। সঙ্গে ছিল একজন লোক রাজকীয় চালে উচ্চপদস্থ লোকের মত, সহচররূপে তাকে নিয়েছিল। সেই যুবতী যদি মুখোশ পরে না থাকত এই প্রশ্নে আমি আরো বেশী নিশ্চিন্ত হতে পারতাম যে সত্যিই সে আমার সোনামণিকে লক্ষ্য করছে কিনা। এখন আমি ভাল করেই নিশ্চিন্ত যে সে তার ওপর নজর রেখেছিল।

তখন আমরা একটা ঘরে। আমার কন্যা নাচছে এবং মাঝে মাঝে দরজার কাছে একটা চেয়ারে বসে বিশ্রাম নিচ্ছে। আমি কাছেই দাঁড়িয়ে রয়েছি। যে দুজন মহিলার কথা বলেছি তারা এগিয়ে এল এবং কমবয়সী মহিলা আমার মেয়ের পাশের চেয়ারে বসল। তার সঙ্গী আমার পাশে দাঁড়িয়ে রইল। অল্প কিছুক্ষণ তার দায়িত্বে থাকা মহিলার সঙ্গে নিচু স্বরে কথা বলল।

তার মুখোশের সুযোগ নিয়ে আমার দিকে ফিরে এবং বহুদিনের পুরনো বন্ধুর মত স্বরে আমার নাম ধরে ডাকল আর গল্প করতে লাগল। তার আচরণ আমার মনে বেশ কৌতূহলের উদ্রেক করল। সে অনেক ঘটনার উল্লেখ করল যেখানে সে আমার সঙ্গে মিলিত হয়েছিল—রাজসভায়, বিশিষ্ট বাড়িতে। সে ছোট ছোট কয়েকটা ঘটনার উল্লেখ করল যেগুলো আমার বিস্মৃতিতে তলিয়ে গেছে, সেগুলো আবার আমার মনের মধ্যে জেগে উঠল।

প্রত্যেক মুহূর্তেই সে কে তা জানার জন্যে আমার আরো বেশী কৌতূহল জেগে উঠছিল। বেশ কৌশলে ও হাসিখুশি ভাবে তার স্বরূপ জানবার চেষ্টাকে সে এড়িয়ে যেত। আমার জীবনের অনেক কিছুরই তার জ্ঞান আমার কাছে কারণ নির্ণয়ের অসাধ্য। আমার কৌতূহলকে নিষ্ফল করতে সে কোন অস্বাভাবিক পথ গ্রহণ করেনি।

ইতিমধ্যে সেই যুবতী যাকে তার মা মিলারকা নামে ডেকেছিল আমার মেয়ের সঙ্গে খুব সহজভাবেই গল্পে রত ছিল।

সে নিজেকে তার সামনে এই বলে পরিচয় দিল যে তার মা আমার কাছে অনেকদিনের পরিচিত। মুখোশপরা সত্ত্বেও সে তার সঙ্গে খুব অমায়িকভাবে কথা বলতে লাগল। বন্ধুর মত তার পোশাকের প্রশংসা করল এবং পরোক্ষ ইঙ্গিতে তার রূপেরও প্রশংসা করল। সে হেসে হেসে নাচঘরে জড়ো হওয়া লোকদের সমালোচনা করে তাকে আনন্দ দিচ্ছিল। আর আমার মেয়ের মজা দেখে সে হাসত। কিছুক্ষণ পর তাদের মধ্যে বন্ধুত্ব হয়ে গেল। সেই

যুবতী তার মুখোশটা একটু নিচু করে তার অদ্ভুত সুন্দর মুখটা দেখাল। সেরকম মুখ আমি কখনও দেখিনি, আমার মেয়েও নয়। যদিও মুখটা আমাদের কাছে নতুন, সেটা এমনই আকর্ষক ও সুন্দর যে তার প্রতি দৃষ্টি না কেড়ে থাকতে পারে না। আমার ধারণা মেয়েরও তাই হয়েছিল। আমি এমন একজন দেখিনি যে প্রথম দৃষ্টিতে অপরকে আকর্ষণ করে যদিও এস্থলে সেই যুবতী নিজেই তাকে দেখে তার মন হারিয়ে ফেলেছিল।

ইতিমধ্যে ছদ্মবেশীর অনুমতি পেয়ে তাকে কতকগুলি প্রশ্ন করলাম:

আপনি আমাকে একেবারে হতভম্ব করে দিয়েছেন, আমি হাসতে হাসতে বললাম। সেটাই কি যথেষ্ট নয়? এখন কি আপনি দয়া করে আমাকে আপনার মুখোশ খোলবার অনুমতি দেবেন?

কোন অনুরোধ কি অযৌক্তিক হতে পারে? একজন মহিলাকে জিজ্ঞেস করে সুবিধার সুযোগ নেওয়া! তাছাড়া, কি করে আপনি জানলেন আমাকে চিনতে পারবেন? সময়ে অনেক পরিবর্তন হয়।

যা আপনি বোঝেন, আমি মাথা নিচু করে অভিবাদন করলাম এবং মনে হল একটু বিষণ্ণ হাসিও হাসলাম।

যেমন দার্শনিকেরা আমাদের বলেন, এবং কি করে আপনি জানলেন আমার মুখ আপনাকে সাহায্য করবে?

আমার একটা সুযোগ নেওয়া উচিত। আপনাকে একজন বৃদ্ধ স্ত্রীলোক বলে মনে করতে আমার ঠেকছে কারণ আপনার চেহারা তা বলে না।

আপনাকে দেখার পর বহু বছর কেটে গেছে অথবা বলা যেতে পারে আপনি যখন আমাকে দেখেছেন, আমার যা মনে হয়। ওই ওখানে আমার মেয়ে মিলার্ বসে আছে। আমি যখন ছেলেমানুষ তখন আমাকে যেমন দেখেছিলেন তার তুলনা করা যায় না। আপনার মুখোশ খোলার কিছু নেই। বিনিময়ে আপনি আমাকে কিছুই দিতে পারেন না।

ওটা সরাবার জন্যে আপনার অনুগ্রহের কাছে আমার নিবেদন। এবং আপনার কাছে আমার, যেমন আছে তাই থাক।

বেশ, তাহলে অন্ততপক্ষে এইটুকু আমাকে বলুন আপনি ফরাসী না জার্মান; আপনি দুটো ভাষাই সুন্দরভাবে বলেন!

আমার মনে হয় না, জেনারেল আমি আপনাকে সেকথা বলব; আপনি বিস্মিত করতে চান আর কিভাবে আক্রমণ করবেন তাই ভাবছেন।

যেকোন অবস্থায়ই আপনি তা অগ্রাহ্য করতে পারেন না কারণ আপনার অনুমতি নিয়েই কথা বলতে শুরু করেছি। আমার জানা উচিত কিভাবে আপনাকে সম্বোধন করব। আমি কি বলব ম্যাডাম লা কমটেসি!

সে হাসল এবং নিঃসন্দেহে সে আর এক উপায়ে আমাকে এড়িয়ে যেত যদি না আমি আগে থাকতে ঠিক করা কোন সাক্ষাৎকারের ঘটনাকে পরিচালনা

করতে পারতাম কিন্তু এখন আমি বিশ্বাস করি, দক্ষতার সঙ্গে যেকোন সময়ে যেকোন ঘটনাকে কায়দা করা যায়।

সে ব্যাপারে—কথা বলতে আরম্ভ করতেই হঠাৎ সে একজন ভদ্রলোককে দেখে বাধা পেল। কালো পোশাক পরনে, সুরুচিপূর্ণ ও সম্ভ্রান্তবংশীয় চেহারা কিন্তু মুখটা তার মরার মত ফ্যাকাসে। সে কোন ছদ্মবেশে ছিল না, ভদ্র-লোকের মত সাদাসিধে সান্ধ্য-পোশাক। মাথা ঝাঁকিয়ে অভিবাদন করে বিনা হাস্যে বলল :

ম্যাডাম লা কমটেসি আমাকে কি কিছু বলতে অনুমতি দেবেন যা তার কাছে উৎসাহব্যঞ্জক হতে পারে?

মহিলাটি ত্বরিতে তার দিকে ঘুরে ঠোঁটে আঙুল দিয়ে চুপ করার জন্যে ইসারা করে আমাকে বলল, আমার জন্যে জায়গাটা রাখুন, জেনারেল। একটু কথা বলেই আমি ফিরে আসব।

কৌতুকচ্ছলে এই হুকুম দিয়ে কালো পোশাকপরা ভদ্রলোকের সঙ্গে একটু পাশে সরে গেল এবং আপাতদৃষ্টিতে মনে হল তার সঙ্গে আগ্রহে কিছুক্ষণ কথা বলল। তারপর তারা দুজনে ভীড়ের মধ্যে ধীরে ধীরে হেঁটে গেল এবং কিছুক্ষণের জন্যে তাদের হারিয়ে ফেললাম।

এই অবসরে তাকে চেনবার জন্যে মাথা ঘামাতে লাগলাম। মহিলাটিকে আমার একটু একটু মনে পড়ছে। আমি ভাবলাম আমার সুন্দরী কন্যা ও কাউন্টেসের মেয়ের আলাপ-আলোচনার মধ্যে গিয়ে যোগ দিই আর সে ফিরে আসবার আগেই তাকে চমক দেবার জন্যে তার নাম, পদবী, দুর্গ ও জমিদারী সম্বন্ধে সব খবর আমার নখদর্পণে রেখে দেবার চেষ্টা করি। কিন্তু সেইমুহূর্তে সে ফিরে এল, সঙ্গে সেই ফ্যাকাসে মুখ কালো পোশাকপরা লোকটি।

লোকটি বলল, আমি ফিরে এসে ম্যাডাম লা কমটেসিকে জানাব যখন তার জন্যে দরজায় গাড়ি প্রস্তুত থাকবে।

মাথা নিচু করে অভিবাদন জানিয়ে সে বিদায় নিল।

দ্বাদশ অধ্যায়

একটি প্রার্থনা

তাহলে আমরা ম্যাডাম লা কমটেসির সান্নিধ্য থেকে বঞ্চিত হচ্ছি, তবে আশাকরি কয়েক ঘণ্টার জন্যে, আমি মাথা নিচু করে বললাম।

হয়ত তাই অথবা কয়েক সপ্তাহও হতে পারে। এইমাত্র যেকথা সে আমাকে বলল তা অমঙ্গলজনক। এখন আমাকে চিনতে পারলেন কি?

আমি তাকে নিশ্চিত করলাম যে আমি চিনতে পারিনি।

আমাকে জানাবেন তবে এই মুহূর্তে নয়। হয়ত আপনি যা সন্দেহ করেন

তার থেকেও অনেক পুরনো বন্ধু আমরা। এখুনি আমি নিজেকে জানাতে পারছি না। তিন সপ্তাহ পর আমি আপনার সুন্দর দুর্গের সামনে দিয়ে যাব যার সম্বন্ধে আমি খোঁজ খবর করছি। সেই সময় আমি দু এক ঘণ্টা আপনার কাছে থাকব আর আমাদের মধ্যে হাজার স্মৃতির ভীড়ে নতুন করে বন্ধুত্ব পাতাব। এইমুহূর্তে একটা খবর আমার কাছে বজ্রপাতের মত এসেছে। আমাকে এখুনি যাত্রা করতে হবে এবং ঘোরালো পথে প্রায় একশ মাইল রাস্তা, সেই সঙ্গে যতটা পারি কাগজপত্র পাঠাতে হবে। আমার বিহ্বলতা ক্রমেই বাড়ছে। আমার বেচারা মেয়ে এখনও ঠিকমত গায়ে জোর পায়নি। একটা শিকার দেখতে গিয়ে ঘোড়া থেকে পড়ে যায়। হঠাৎ আঘাত পাওয়ায় এখনও সে কর্মশক্তি ফিরে পায়নি। আমাদের ডাক্তার বলেছেন কোনমতেই এখন কিছুদিন তাকে পরিশ্রম করতে দেওয়া যেতে পারে না। ফলে, আমরা এখানে খুব ধীরে ধীরে এসেছি—খুব বেশী কুড়ি মাইল দিনে চলে। আমাকে এখন সারা দিনরাত চলতে হবে—এক জীবন মরণের সমস্যা—এক অতি সঙ্কটময় ও গুরুত্বপূর্ণ কাজ—পরে আপনার সঙ্গে দেখা হলে সবকিছু খুলে বলতে সক্ষম হব। আশাকরি কয়েক সপ্তাহের মধ্যে আমাদের আর কোন কিছুই গোপন রাখার দরকার হবে না।

সে তার এই প্রার্থনা করতে লাগল এবং এমনভাবে কথাগুলো বলল যে অনুগ্রহ চাওয়ার থেকে পরামর্শ নেওয়ার স্বর ফুটে উঠল। বিনয়ের কণ্ঠে যেন নিজের অজ্ঞাতেই কথাগুলো বলে গেল। আরো বেশী দুঃখপ্রকাশ করার ভাব যেন আর হয় না। অতি সরলভাবেই তার অবর্তমানে তার মেয়ের ভার নিতে রাজী হলাম।

সবকিছু বিবেচনা করে মনে হল এটা একটা অদ্ভুত, এমনকি দুঃসাহসী অনুরোধ। সে যেন আমাকে একধরনের নিরস্ত করল, তার বলার ও স্বীকার করার মধ্যে এমন কিছু ছিল যাতে আমি তাকে বাধ্য করি, সে আমার ওপরে নিজেকে প্রত্যর্পণ করল। যা কিছু ঘটছে সবকিছুই যেন নিয়তির নির্দেশে। ঠিক সেইমুহূর্তে, আমার মেয়ে আমার পাশে এল। নিচু গলায় তার নতুন বন্ধু মিলার্কাকে আমাদের বাড়িতে নিয়ে যাবার জন্যে প্রার্থনা করল। সেও সেইমাত্র তাকে বলছিল যে যদি তার মা তাকে অনুমতি দেয় সে খুব আনন্দিত হবে।

অন্য সময় হলে তাদের সম্বন্ধে না জেনে তাকে অপেক্ষা করতে বলতাম। কিন্তু সেইসময় আমার কিছু ভাববার অবসর ছিল না। দুজনেই আমাকে অভিভূত করল এবং আমি স্বীকার করছি, তার সেই সুন্দর সুশ্রী মুখখানি, তার মার্জিতভাব; তার উঁচু বংশমর্যাদা সবকিছুই আমাকে বেঁধে ফেলল। আমি স্বাভাবিকভাবে এই সুন্দরী যুবতীর দেখাশুনার ভার নিলাম, যাকে তার মা মিলার্কা নামে ডাকে।

কাউন্টেস ইসারায় তার মেয়েকে ডাকল। তাকে যখন সাধারণভাবেই বলছিল যে হঠাৎ যে তাকে ডেকে পাঠান হয়েছে তা অস্বীকার করার উপায় নেই। এছাড়া তাকে আমার তত্ত্বাবধানে রাখার বন্দোবস্ত করা হয়েছে তখন সে গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনছিল। আরো বলল যে আমি তার একজন পুরনো এবং নির্ভরশীল বন্ধু।

এব্যাপারে আমি যেকথা বললাম, তা চিন্তা করে দেখলাম এর অর্ধেকও আমি পছন্দ করি না।

কালো পোশাক পরা ভদ্রলোকটি ফিরে এসে অতি ভদ্রতাপূর্ণভাবে মহিলাকে ঘর থেকে বাইরে নিয়ে গেল।

ভদ্রলোকের এরকম আচার ব্যবহার দেখে আমার দৃঢ় প্রত্যয় জন্মাল যে কাউন্টেস এমন একজন উচ্চ সম্ভ্রান্ত মহিলা যা তার পদবী দিয়ে বোঝা যায় না।

তার শেষ আদেশ ছিল, তার ফিরে না আসা পযন্ত আমি যতটুকু জেনেছি তা থেকে বেশী জানার চেষ্টা না করি। আমাদের বিশিষ্ট নিমন্ত্রণকর্তা যার অতিথি সে, তার সব ব্যাপার জানেন।

কিন্তু এখানে আমি অথবা আমার মেয়ে একদিনের বেশী নিবিঘ্নে থাকতে পারবে না। প্রায় ঘণ্টাখানেক আগে একমুহূর্তের জন্যে আমি মুখোশ সরিয়েছিলাম, আমার মনে হয় আপনি আমাকে দেখেছিলেন। তাই আমি আপনার সঙ্গে একটু কথা বলার সুযোগ নিতে মনস্থ করেছিলাম। যদি আমি জানতাম আপনি আমায় দেখেছেন তবে আপনার সততার ওপর নির্ভর করে কয়েক সপ্তাহের জন্যে গোপন রাখতে অনুরোধ করতাম। এখন যা অবস্থা, আপনি যে আমায় দেখেননি তাতে আমি খুশি হয়েছি। কিন্তু আপনি যদি এখন সন্দেহ করেন অথবা পরে সন্দেহ হয় যে কে আমি, তবে আমি সম্পূর্ণভাবে আপনার সততার ওপরে আমি নিজেকে সমর্পণ করছি। আমার মেয়েও একই গোপনতা মেনে চলবে এবং আমি ভাল করেই জানি আপনি সময়ে সময়ে তাকে সে ব্যাপারে স্মরণ করিয়ে দেবেন নতুবা সে অবিবেচকের মত সব ফাঁস করে দেবে।

সে কানে কানে তার মেয়েকে কিছু বলল, তাকে দুবার তাড়াতাড়ি চুমু খেয়ে চলে গেল সঙ্গে কালো পোশাক পরা ফ্যাকাসে মুখ লোকটা। ভীড়ের মধ্যে তারা অদৃশ্য হল।

আমরা সম্মত হয়ে তাকে সঙ্গে করে জানালায় গেলাম। বাইরে তাকিয়ে দেখলাম একটা সুন্দর পুরনো ধরনের ঘোড়ার গাড়ি, সঙ্গে কিছু লোকজন রয়েছে। রোগা ফ্যাকাসে মুখ কালো পোশাক পরা ভদ্রলোককে দেখলাম, একটা মোটা ভেলভেটের ক্লোক হাতে ধরে রয়েছে। মহিলাটির কাঁধে সেটা চাপিয়ে মাথার ওপর বোরখা দিয়ে ঢেকে দিল। সে মাথা নেড়ে তার হাত দিয়ে ভদ্রলোকের হাত স্পর্শ করল। দরজা বন্ধ হতে হতে লোকটি বারবার

মাথা নিচু করে অভিবাদন জানাল, সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি চলতে সুরু করল।

তিনি চলে গেলেন, একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মিলার্কা বলল।

তিনি চলে গেলেন, আমি পুনরাবৃত্তি করলাম। এই প্রথম, আমার অনুমতি দেওয়ার পর থেকে দ্রুত সময় কেটে যাওয়ার পর, আমার মুগ্ধতাপূর্ণ কাজের কথা চিন্তা করতে লাগলাম।

তিনি একবারও ওপরে তাকালেন না, যুবতী মহিলা বিলাপ করতে লাগল।

কাউন্টেস হয়ত তাঁর মুখোশ খুলে ফেলেছেন এবং তাঁর মুখ দেখাতে ইচ্ছুক নন। আমি বললাম। আর তিনি হয়ত জানতেন না যে তুমি জানালায় আছ।

মেয়েটি নিঃশ্বাস ছেড়ে আমার মুখের দিকে তাকাল। সে এত সুন্দর যে আমাব সব কঠোরতা মন থেকে দূর হল। আমি দুঃখিত যে আমি আতিথেয়তার জন্যে অনুশোচনা করেছিলাম।

যুবতী মেয়েটি তার মুখোশ খুলে আমার মেয়ের কাছে গিয়ে বাগানে ফিরে যাবার জন্যে আমাকে রাজি করাতে লাগল, সেখানে নতুন করে বাজনা শুরু হয়েছে। আমরা সেখানে গিয়ে জানালার নিচে চত্বরে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াতে লাগলাম। মিলার্কা আমাদের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠল এবং বারাণ্ডার ওপরে যেসব বড় বড় লোকেদেব আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম তাদের সম্বন্ধে জীবন্ত বর্ণনা ও গল্প বলে আনন্দে মাতিয়ে রাখল। প্রতি মিনিটেই যেন তাকে আমার আরো ভাল লাগতে লাগল। আমি ভাবতে লাগলাম আমাদের বাড়িতে মাঝে মাঝে নির্জন সন্ধ্যায় কি করে সে কাটাবে।

এই নাচগানের মজলিস শেষ হতে হতে আকাশে সূর্যের মুখ দেখা গেল। তখনও পযন্ত গ্র্যাণ্ড ডিউকের খুবই আনন্দ লাগছিল বলে লোকেরা চলে যেতে পারেনি বা শোবার চিন্তাও কবেনি।

আমরা একটা ভীড়ে ভর্তি ঘরেব ভিতর দিয়ে যাচ্ছিলাম সেই সময় আমাব মেয়ে জানতে চাইল মিলার্কার কি হয়েছে। আমি ভেবেছিলাম সে আমার পাশে আছে, সে মনে করেছিল আমি বুঝি তাব পাশে। আসল ব্যাপারটা হল, আমরা তাকে হারিয়ে ফেললাম।

তাকে খুঁজতে আমার সব চেষ্টা বৃথা হল। আমার ভয় হল সে বোধহয় আমাদের খুঁজে পাচ্ছে না হয়ত মুহূর্তের ছাড়াছাড়িতে, এই ভীড়েব মধ্যে বিরাট বাগানের ভেতর তার নতুন বন্ধুদের সঙ্গে মিশে আমাদের হারিয়ে ফেলেছে।

এবার আমার আর একটা বোকামির কাজ লক্ষ্য করলাম ; একজন যুবতী মহিলাব দায়িত্ব ত নিয়েছি অথচ তার নাম সম্বন্ধে বিশেষ জানি না, প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছি অথচ কর্তব্য সম্বন্ধে কিছুই জানি না, এবং হারিয়ে যাওয়া যুবতী মহিলা যে কাউন্টেসের মেয়ে বা কিছুক্ষণ আগে বলে গেছে সে কথা বলে অনুসন্ধান

করার মত কোন যুক্তি খুঁজে পেলাম না।

সকাল হল। দিনের আলোয় আমি খোঁজা ছেড়ে দিলাম। পরের দিন বেলা দুটোর আগে পর্যন্ত হারান মেয়ের সম্বন্ধে কিছু শুনি নি।

প্রায় সেই সময় একজন চাকর আমার ভাইঝির ঘরের দরজায় ধাক্কা দিল। এই কথা জানাল যে খুব বিপদে পড়ে একজন যুবতী মহিলা তাকে আন্তরিকভাবে অনুরোধ করছে যে কোথায় জেনারেল ব্যারণ স্পিয়েলসডর্ফ ও তার যুবতী মেয়ে থাকে খুঁজে বের করতে এবং তাঁদেরই দায়িত্বে তার মা তাকে রেখে গেছে।

সে আমার মেয়েকে গল্প করেছিল কিভাবে অনেকক্ষণ ধরে সে আমাদের খুঁজে পায়নি। অনেকক্ষণ পর আমাদের খুঁজে না পেয়ে হতাশ হয়ে গৃহরক্ষকের শোবার ঘরে ঢুকেছিল। সেখানে সে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। অনেকক্ষণ ধরে ঘুমিয়েও সে তার ক্লান্তি দূর করে শক্তি ফিরে পায়নি।

সেইদিন মিলার্কা আমাদের সঙ্গে বাড়িতে এল। আমার মেয়ের এক সঙ্গী পেয়ে আমিও খুব খুশি হয়েছিলাম।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

কাঠুরিয়া

শীঘ্রই কিছু অসুবিধা দেখা দিল। প্রথমে, মিলার্কা খুব জড়তা সম্বন্ধে অভিযোগ করল। যে দুর্বলতা তার অসুখের পরেও ছিল এবং দুপুর অনেকখানি গড়িয়ে যাবার পর তবে সে নিচে নামত, দ্বিতীয়ত, ঘটনাক্রমে হঠাৎ দেখা গেল যে, যদিও সে সব সময় ভেতর থেকে দরজায় তালা লাগিয়ে থাকত আর চাবিটা তালা থেকে সরাত না যতক্ষণ না পর্যন্ত কোন দাসী তার প্রসাধনে সাহায্য করত, নিঃসন্দেহে মাঝে মাঝে খুব সকালে ঘর থেকে উধাও হত এবং দিনের বিভিন্ন সময়ে সে জানাত যে সে ভীষণ উত্তেজিত হয়ে পড়েছে। বিভিন্ন উক্তি অনুযায়ী তাকে বার বার দুর্গের জানালা থেকে দেখা যেত, উষাকালে সে ভাববিহ্বল অবস্থায় পূর্বদিক লক্ষ্য করে বাগানে বেড়াচ্ছে। এতে আমার বিশ্বাস জন্মাল যে সে ঘুমের মধ্যে চলে বেড়ায় অর্থাৎ স্বপ্নচারণ করে। কিন্তু এই ধারণাটা সমস্যার কোন সমাধান করল না। কি করে ভেতর থেকে দরজা বন্ধ থাকা সত্ত্বেও সে বাইরে বেরোতে পারে? দরজা অথবা জানালা না খুলেই বা সে কিভাবে বাড়ি থেকে বেরোতে পারে?

আমার বিহ্বলতার মধ্যেও আরো ভীষণ এক উদ্বিগ্নতার সৃষ্টি হল।

আমার বাছার চেহারা ও শরীর খারাপ হতে লাগল, সে এক রহস্যজনক ও এমন এক আতঙ্কের অবস্থা যা আমাকে সন্ত্রস্ত করে তুলল।

প্রথমে সে ভীতিপূর্ণ স্বপ্ন দেখত; পরে তার মনে হত মিলার্কার মত দেখতে এক ছায়ামূর্তি কখনও কখনও অস্পষ্টভাবে দৃষ্ট জন্তুর আকৃতি নিয়ে বিছানার

শেষপ্রান্তে এধার ওধার ঘুরে বেড়াত। শেষে সেই গভীর আবেগের অভিব্যক্তি দেখা দিল। একবার সে এমন কথা বলল যা সুখকর নয় কিন্তু অদ্ভুত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। সে জানাল একটা বরফের মত ঠাণ্ডা স্রোত তার বুকের ওপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে। পরে আর একবার বলল, তার বোধ হল যেন গলার একটু নিচে এক জোড়া ছুঁচ তীক্ষ্ণ বেদনায় ভেতরে ফুটে গেল। কয়েক রাত পর, গলাটেপার আক্ষেপে পীড়িত হল, তারপরেই অজ্ঞান হয়ে পড়ল।

বৃদ্ধ জেনারেলের প্রত্যেকটা কথা স্পষ্টভাবে আমার কানে আসছিল কারণ সেইসময় আমরা রাস্তার দুধারের ছোট ছোট ঘাস বিছানো রাস্তার ওপর দিয়ে ছাদহীন বাড়ির গ্রামের দিকে এগোচ্ছিলাম যেখানে আজ পঞ্চাশ বছর ধরে কোন চিমনী দিয়ে ধোঁয়া বের হয় না।

আপনারা সহজেই বুঝতে পারছেন বেচারা মেয়েটা যে রোগে ভুগছিল হুবহু সেই লক্ষণসমূহ আমার সঙ্গে মিলে যাওয়ায় অস্বাভাবিক অস্বস্তি আমি বোধ করছিলাম। ভাগ্যবশতঃ কোন দুঃখময় পরিণতি না ঘটায় আমার বাবার দুর্গে এই মুহূর্তে কোন লোকের আগমন ঘটেনি। আমাদের সুন্দরী অতিথি কারমিলার স্বভাব ও রহস্যময় বৈশিষ্ট্যের সঙ্গেও একটা অদ্ভুত মিল আছে।

বনের মধ্যে এক জায়গায় দেখা গেল দুধারে গাছের সারিতে শোভিত ছোট বড় রাস্তা। হঠাৎ আমরা ধ্বংসপ্রাপ্ত গ্রামের চিমনী ও ছাদের কানার নিচে এসে পড়লাম। দেখা গেল ভাঙা দুর্গের চূড়া ও অস্ত্র ছোঁড়ার জন্যে গর্ত-করা পাঁচিলের অংশবিশেষ, তার চারপাশে বড় বড় গাছের সারি, একটু উঁচুতেই আমাদের মাথার ওপর ডালপালা নুয়ে পড়েছে।

একটা দুঃস্বপ্নের মধ্যে আমি গাড়ি থেকে নামলাম এবং সকলে নিঃশব্দ রইল কারণ ভাববার মত আমাদের অনেক কিছুই ছিল। আমরা দুর্গের মধ্যে পা দিলাম—বড় বড় ঘর, চওড়া সিঁড়ি, অন্ধকার বারাণ্ডা।

এটা একসময় কার্নস্টাইনদের রাজপ্রাসাদ ছিল। অবশেষে বৃদ্ধ জেনারেল বললেন। একটা বড় জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দূরের গ্রামের দিকে তাকালেন এবং দেখলেন দূরে বিশাল তরঙ্গায়িত বনভূমি। এটা একটা খারাপ পরিবার ছিল আর এখানেই এদের রক্তকলঙ্কিত ইতিহাস লেখা আছে। তিনি বলতে লাগলেন। এটা ভাবা যায় না, মৃত্যুর পর তাদের নৃশংস লালসা মানুষজাতিকে সংক্রামিত করে চলবে। ঐ ওখানে দেখা যাচ্ছে কার্নস্টাইনদের গীর্জা। দূরে ঢালু জমিতে গাছপালার পাশ দিয়ে অংশত দেখা যাচ্ছে গথিক অট্টালিকার ধূসর দেয়ালগুলোর দিকে আঙুল দিয়ে দেখালেন। আমি কাঠুরিয়ার কুড়ুলের আওয়াজ পাচ্ছি, এর চারপাশে গাছের কোথাও সে কাটতে ব্যস্ত। আমি যা জানতে চাই সে ব্যাপারে হয়ত সে সম্ভবত কোন খবর দিতে পারে এবং কার্নস্টাইনের কাউন্টেস মিরকাল্লার কবর দেখাতে পারে। এই সমস্ত গেঁয়ো লোকেরা বড় বড় পরিবারের স্থানীয় ঐতিহ্য মনে রাখে। ধনী ও

পদস্থ পরিবারের শেষ বাতি নিভে যাবার পরেও তাদের কাহিনী এরাই বলতে পারে।

কার্নস্টাইনের কাউন্টেস মিরকাল্লার একটা ছবি আমাদের বাড়িতে আছে, আপনি সেটা দেখতে চান? বাবা জিজ্ঞেস করলেন।

হে বন্ধু, অনেকবার দেখেছি। আমার বিশ্বাস আমি আসলই দেখেছি। প্রথমে যা ভেবেছিলাম একটা উদ্দেশ্য নিয়েই আমি আপনার কাছে আগে গিয়েছিলাম আর সেটা হচ্ছে গীর্জাটা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করা। তার দিকেই আমরা এগোচ্ছি।

কি! কাউন্টেস মিরকাল্লাকে দেখতে, সে ত একশ' বছর আগেই মারা গেছে! আশ্চর্যান্বিত হয়ে বাবা বললেন।

আমি যা শুনেছি, ঠিক সেরকম মৃত্যু নয় আপনি যা মনে করেন, উত্তর দিলেন জেনারেল।

আমি স্বীকার করছি জেনারেল, আপনি আমাকে একেবারে হতভম্ব করে দিয়েছেন, জেনারেলের দিকে তাকিয়ে বাবা বললেন। মনে হল তাঁর মনে একটা সন্দেহের উদ্রেক হল যা আমি আগেই লক্ষ্য করেছিলাম। যদিও বৃদ্ধ জেনারেলের মুখে কখনও কখনও ক্রোধ ও ঘৃণারভাব লক্ষ্য করেছি কিন্তু অস্থির-চিত্ত হতে দেখিনি।

আমরা গথিক গীর্জার বিরাট খিলানের তলা দিয়ে যেতে যেতে জেনারেল বললেন, আমার এই পৃথিবীতে আর শেষ কয়েক বছরের মধ্যে একটা ব্যাপার আমাকে কৌতূহলী করে তুলেছে আর সেটা হচ্ছে ভগবানের আশীর্বাদে তার প্রতিহিংসার প্রতিশোধ নিতে একজন জাগতিক মানুষই এখনও পারে।

কিসের প্রতিহিংসার কথা আপনি বলতে চান? আরো বিস্ময়ে বাবা জানতে চাইলেন।

আমি বলতে চাই সেই দানবের শিরশ্ছেদ করতে। একটা প্রচণ্ড চাপা ক্রোধে ফেটে পড়লেন জেনারেল। ফাঁকা ধ্বংসস্তূপের মধ্যে তার কথা বেদনার মত প্রতিধ্বনিত হতে লাগল। ঠিক সেইসময় তাঁর মুষ্টিবদ্ধ হাত উঁচুতে উঠে যেন কুড়ুলের হাতল ধরে ভীষণভাবে শূন্যে ঘোরালেন।

কি! আরো বেশী হতবুদ্ধি হয়ে বাবা বিস্ময়ে চীৎকার করে উঠলেন।

তার মাথা উড়িয়ে দেব!

তার মাথা কেটে ফেলবেন!

হ্যাঁ, একটা কুড়ুল, বর্শা বা যেকোন কিছু দিয়ে যা তার খুনে গলা ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে। রাগে কাঁপতে কাঁপতে বললেন, আপনি শুনবেন—। কথাটা শেষ না করে সামনের দিকে এগিয়ে গেলেন। ঐ গুঁড়িটা বসার পক্ষে যথেষ্ট। আপনার প্রিয় কন্যা পরিশ্রান্ত। সে বসুক আর আমি কয়েকটা কথার মধ্যে আমার ভয়ানক গল্প শেষ করব।

ঘাস-গজানো গীর্জার শান বাঁধানো পথের ওপর একটা চৌকো গাছের গুড়িকে বেঞ্চ করে তার ওপরে বসে স্বস্তি পেলাম। ইত্যবসরে জেনারেল কাঠুরিয়াকে ডাকলেন, সে তখন পুরনো দেয়ালের ওপর ঝোপ পরিষ্কার করছিল, হাতে কুড়ুল নিয়ে এক ষণ্ডামার্কা লোক আমাদের সামনে দাঁড়াল।

সে এইসব স্মৃতিস্তম্ভ সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই বলতে পারল না; তবে সে জানাল এই বনের রক্ষক একজন বৃদ্ধ এখানকার কার্নস্টাইন পরিবারের প্রত্যেকটা স্মৃতিস্তম্ভ সে বলতে পারে কিন্তু এখন সে দু'মাইল দূরে এক পুরোহিতের বাড়িতে আছে। কিঞ্চিৎমাত্র অর্থে যদি আমরা তাকে আমাদের একটা ঘোড়া দিই তবে আধঘণ্টার মধ্যেই তাকে নিয়ে ফিরে আসবে।

তুমি কি এই বনে অনেকদিন আছ? বাবা বুড়ো লোকটিকে জিজ্ঞেস করলেন।

আমি এখানে কাঠুরিয়া ছিলাম, সে দেশী ভাষায় বলতে লাগল, একজন বনরক্ষকের অধীনে, সারাজীবন ধরে, আমার বাবা ছিলেন, তারও আগে, আমি শুনে বলতে পারি কত পুরুষ ধরে। এই গ্রামে সেই বাড়িটা দেখাতে পারি যেখানে আমার পূর্বপুরুষেরা ছিল।



এই গ্রাম কি করে পরিত্যক্ত হল? জেনারেল জিজ্ঞাসা করলেন।

লুণ্ঠনকারীদের উৎপাতে, মহাশয়। তাদের অনেককে ধরে মাথা কেটে, শূলে চড়িয়ে, পুড়িয়ে মেরে ফেলা হয়েছে কিন্তু আমাদের গ্রামবাসী তখন অনেকেই মারা গেছে।

কিন্তু আইন অনুযায়ী অনেক কিছু করার পরেও অনেক কবর অনাবৃত করা হয়েছিল এবং অনেক রক্তশোষণকারী ভূত তাদের ভয়ানক প্রাণ সঞ্চার থেকে বঞ্চিত হয়েছিল। কিন্তু গ্রাম অব্যাহতি পায়নি। একজন মোরেভিয়বাসী সম্ভ্রান্ত লোক এই পথ দিয়ে যাবার সময় সমস্ত ঘটনা শোনে। এই কাজে তিনি খুব দক্ষ ছিলেন। নিদারুণ যন্ত্রণাদানকারীর হাত থেকে গ্রামকে রক্ষা করতে সে এইরকম করেছিল—

সেদিন রাতে উজ্জ্বল চাঁদের আলো ছিল, সূর্য-অস্ত যাবার কিছু পরেই সে গীর্জার চূড়ায় উঠল। সেখান থেকে নিচে কবর স্পষ্ট দেখা যায়। ঐ জানালা থেকেও আপনারা দেখতে পারেন। ঐ জায়গা থেকে সে লক্ষ্য করতে লাগল। সে দেখল একটা রক্ত শোষণকারী ভূত কবর থেকে উঠে পাশেই তার গায়ে জড়ানো কাপড়গুলো রেখে বাতাসে ভেসে গ্রামের অধিবাসীদের সংক্রামিত করতে সেইদিকে গেল।

আগন্তুক সবকিছু দেখে চূড়া থেকে নেমে কবরের পাশ থেকে কাপড়গুলো নিল এবং আবার সেগুলোকে নিয়ে চূড়ায় উঠে এল। ভ্যামপায়ার শিকার থেকে ফিরে এসে কাপড়গুলো না দেখতে পেয়ে গীর্জার চূড়ায় মোরেভিয়কে দেখে রাগে চীৎকার করে উঠল। লোকটি ইসারায় তাকে ওপরে উঠে সেগুলো নিতে বলল। ভ্যামপায়ার তার কথা অনুযায়ী চূড়ায় উঠতে আরম্ভ করল। যেমূহূর্তে সে পাচিলের ওপরে উঠেছে তখনই লোকটি তার তরবারী দিয়ে ভ্যামপায়ারের খুলি দ্বিখণ্ড করে দিল। সে মাটিতে পড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে আগন্তুক ঘোরান সিঁড়ি দিয়ে নেমে তাকে অনুসরণ করে তার মাথা কেটে ফেলল। পরেরদিন গ্রামবাসীদের সে দেহটা তুলে দিল। তারা দেহটাকে শূলে চড়িয়ে আগুনে পুড়িয়ে ফেলল।

এই মোরেভিয়বাসী সম্ভ্রান্ত সেই সময়কার পরিবারের কর্তার কাছ থেকে অনুমতি দিয়ে কার্ণস্টাইন কাউন্টেস মিরকাল্লার স্মৃতিস্তম্ভ সরিয়েছিল তাই কিছু-দিন পরে সেই জায়গাটা সকলেই ভুলে গেল।

তুমি কি সেই জায়গাটা দেখাতে পার? আগ্রহভরে জেনারেল জানতে চাইলেন।

বনরক্ষক অসম্মতি জানিয়ে মাথা নাড়ল এবং মৃদু হাসল।

এমন একজনও কেউ বেঁচে নেই যে এখন বলতে পারে? সে বলল। তাছাড়া লোকে বলে তার দেহটা সরিয়ে ফেলা হয়েছিল কিন্তু কেউই সেবিষয়ে নিঃসন্দেহ নয়।

এইভাবে কথা শেষ করে সে কুড়ুলটা মাটিতে ফেলে চলে গেল। জেনারেলের অদ্ভুত গল্পের শেষটা শোনার জন্যে আমরা অপেক্ষা করতে লাগলাম।

চতুর্দশ অধ্যায়

সাক্ষাৎকার

তিনি আবার শুরু করলেন, আমার প্রিয় কন্যা আরও খারাপের দিকে যেতে লাগল। যে ডাক্তার তাকে দেখছিল সে রোগের কোন কারণই খুঁজে পেল না। আমার শঙ্কা দেখে সে পরামর্শের নির্দেশ দিল। আমি একজন বড ডাক্তার ডাকলাম। গ্র্যাজ থেকে তার এসে পৌছতে কয়েকদিন কেটে গেল। সে একজন সৎ, ধার্মিক এবং জ্ঞানী। আমার বেচারা মেয়েকে তারা ছুজনে দেখার পর লাইব্রেরী ঘরে আলোচনা করার জন্মে চলে গেল। পাশের ঘরে তাদের ডাকার অপেক্ষায় আমি ছিলাম, শুনতে পেলাম বেশ জোরে তারা কিছু নিয়ে কথাবার্তা বলছে যা মোটেই ডাক্তারী ব্যাপার নয়। আমি দরজায় ঘা দিয়ে ভেতরে ঢুকলাম, দেখলাম গ্র্যাজ থেকে আগত বৃদ্ধ ডাক্তার তার মতকেই জোর দিচ্ছে। তার প্রতিদ্বন্দ্বী ঠাট্টা তামাসা ও মাঝে মাঝে উচ্চহাস্তের মধ্যে দিয়ে উডিয়ে দেবার চেষ্টা করছে। আমার ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে তাদের ভাবভঙ্গি ও কথাবার্তা থেমে গেল।

প্রথম ডাক্তার বলল, মশাই, আমার বিজ্ঞ ভাই মনে কবে আপনাব একজন জাতুকর চাই, ডাক্তার নয়।

আমাকে মাফ করবেন, গ্র্যাজ থেকে আগত বৃদ্ধ ডাক্তার অসন্তুষ্টভাবে বলল, এই রোগের ব্যাপারে আমার নিজস্ব মতামত অন্তসময় আমার স্থবিধা অনুযায়ী বলব। আমার দুঃখ হচ্ছে, মঁসিয়ে জেনারেল, যে আমার দক্ষতা ও বিত্তায় আমি কোন কাজে আসব না। আমার যাবাব আগে আপনাকে কিছু বলে যাব।

তাকে দেখে মনে হল চিন্তান্বিত এবং টেবিলে বসে লিখতে লাগলেন। ভীষণভাবে হতাশাগ্রস্ত হয়ে, মাথা নামিয়ে অভিবাদন জানিযে চলে যাবার জন্মে ঘুবে দাঁডাতেই অন্য ডাক্তারটি তাব বন্ধুব কাঁধের ওপর দিয়ে কিছু নির্দেশ করল এবং তারপবই কাঁধ ঝাঁকিয়ে হাত দিয়ে কপাল স্পর্শ করল।

এই পরামর্শ সম্পূর্ণভাবে আমি যেখানে ছিলাম সেখানেই হচ্ছিল। বিক্ষিপ্তচিত্তে আমি বাগানে বেরিয়ে এলাম। দশ পনের মিনিটের মধ্যে গ্র্যাজ থেকে আগত ডাক্তার আমাকে ধরে ফেললেন। আমাকে অনুসরণ করার জন্মে ক্ষমা চাইল কিন্তু জানাল যে নীতিগতভাবে আমাকে কয়েকটা কথা না বলে সে বিদায় নিতে পারছে না। সে বলল যেন তাকে ভুল বোঝা না হয়। কোন স্বাভাবিক রোগের লক্ষণ এখানে নেই এবং মৃত্যু খুব কাছে। একদিন কি তুদিন তার জীবন থাকবে। যদি এই মৃত্যুআলিঙ্গনকে এখুনি রোখা যায়

তাহলে অনেক যত্ন ও দক্ষতায় তার শক্তি হয়ত ফিরে আসতে পারে। কিন্তু সবকিছুই নির্ভর করছে অপ্রত্যাশিতের ওপর। আর একবার আঘাত এলেই তার শেষ জীবনদীপ নিভে যেতে পারে।

কি ধরনের আক্রমণের কথা আপনি বলছেন? আমি তাকে বলতে অনুরোধ করলাম।

এই চিরকুটে আমি সবই বলেছি, আপনার হাতে এটা দিচ্ছি এই নির্দিষ্ট শর্তে যে কাছাকাছি যে ধর্মযাজক আছে তাকে ডেকে পাঠিয়ে তার উপস্থিতিতে এই চিঠি খুলবেন এবং কোন অবস্থায়ই সে আপনার কাছে না থাকলে পড়বেন না। নয়ত আপনি এটা অবজ্ঞা করবেন এবং এটা একটা মরণবাঁচন সমস্যা। যদি যাজক না আসেন তখন আপনি পড়তে পারেন।

যাবার আগে আমাকে বলে গেল যে চিরকুট পড়ার পর যদি আমি উৎসাহী হই তবে তাকে ডাকলে সে আগ্রহের সঙ্গে তার কাছে যেতে পারে।

যাজক ছিল না, আমি নিজেই সেটা পড়লাম। অন্য সময়ে বা অন্য ব্যাপারে হলে এটা আমার উপহাসের বিষয় হত। কিন্তু যেখানে সব প্রচলিত উপায় নিঃশেষ হয়েছে এবং যেখানে এক প্রিয়জনের জীবন বিপন্ন সেখানে শেষ চেষ্টা কবার জন্যে লোকেরা বদ্যির কাছে দৌড়বে না কেন?

আপনি বলবেন, জ্ঞানী লোকের চিঠির থেকে আর কিছু বেশী হাস্যকর হতে পারে না। তাকে পাগলাগারদে বন্ধ করে রাখার চেয়ে বিস্ময়কর আর কিছু নেই। সে বলেছিল রুগী ভ্যামপায়ারের আক্রমণ থেকে কষ্ট পাচ্ছে! সে তার গলার কাছে যে ফুটোর কথা বলেছিল সেটা আব কিছুই নয় দুটো লম্বা, সরু ও তীক্ষ্ণ একজোড়া দাঁত, সকলেরই জানা, যা ভ্যামপায়ারের বৈশিষ্ট্য। সে আরও বলে, এব্যাপারে কোন সন্দেহই থাকতে পারে না যে ছোট নীল রঙের চিহ্নটা সম্বন্ধে সকলেই একমত যে পিশাচের ঠোঁটের সান্নিধ্যেই হয়েছে। আর প্রত্যেকটা লক্ষণই ঠিক ঠিকভাবে মিলে যাচ্ছে যেমন এই ধরনের রোগের আগে নথিভুক্ত কবা আছে।

আমি নিজে ভ্যামপায়ারের মত এক অশুভ লক্ষণযুক্ত কোন বস্তুর অস্তিত্ব সম্বন্ধে একেবারেই অবিশ্বাসী। আমার মতে ডাক্তার যে অতিপ্রাকৃতের যুক্তি দেখিয়েছে সেটা জ্ঞান ও বুদ্ধির সঙ্গে অসমতাভাবে জড়িত অলীক অস্তিত্বে বিশ্বাসের এক নিদর্শন। আমি এমনই দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলাম যে অন্য কিছু চেষ্টা না করে চিঠি অনুযায়ী কাজ করলাম।

বেচাবা রুগীর ঘরের সামনে অন্ধকার ড্রেসিংরুমে লুকিয়ে রইলাম। যতক্ষণ না পর্যন্ত সে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল ততক্ষণ তাকে লক্ষ্য করছিলাম। তার ঘরে একটা বাতি জ্বলছে। দরজায় দাঁড়িয়ে ফাটল দিয়ে উঁকি মেরে দেখতে লাগলাম। আমার পাশে টেবিলের ওপরে আমার খোলা তরবারি। যেভাবে আমাকে নির্দেশ করা হয়েছে সেভাবে অপেক্ষা করতে লাগলাম।

রাত একটার কিছু পরে, আমি একটা বিরাট কালো বস্তু দেখতে পেলাম। সঠিকভাবে নির্দেশ করা কষ্টসাধ্য, মনে হল গুঁড়ি মেরে বিছানার পাদদেশে দাঁড়িয়ে ত্বরিত গতিতে বেচারা মেয়েটি গলার ওপর ছড়িয়ে পড়ল, যেখানে সেটা মুহূর্তের মধ্যে স্ফীত হয়ে এক বিরাট কম্পমান বস্তুতে পরিণত হল।

কয়েকমুহূর্ত আমি ভয়ে অসাড় হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। পরক্ষণেই হাতে তরবারি নিয়ে লাফিয়ে গেলাম। কালো প্রাণীটা হঠাৎ বিছানার পাদদেশের দিকে গুটিয়ে গেল তারপরেই হাওয়ায় ভেসে বিছানার নিচে প্রায় গজখানেক দূরে মেঝেয় দাঁড়িয়ে পড়ল। হিংস্র ও আতঙ্কের দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে রইল—আমি মিলার্কাকে দেখলাম। কোন কিছু না ভেবেই সঙ্গে সঙ্গে আমি আমার তরবারি দিয়ে আঘাত করলাম; কিন্তু তাকে অক্ষত অবস্থায় দরজায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম। আতঙ্কিত হয়ে তাকে অনুসরণ করলাম এবং আবার আঘাত করলাম। সে চলে গেছে! আমার তরবারি দরজায় আটকে গেছে!

সেই ভয়াবহ রাতে যা কিছু ঘটেছিল সব আমি আপনাকে বর্ণনা করতে পারব না। সমস্ত বাড়ি জেগে উঠে হৈ চৈ সুরু করে দিয়েছে। মিলার্কার ছায়ামূর্তি চলে গেছে। কিন্তু তার শিকার দ্রুত নির্জীব হয়ে পড়ছে এবং সকাল হবার আগেই সে মারা গেল।

বৃদ্ধ জেনারেল শোকসন্তপ্ত হয়ে উঠলেন। আমরা কেউ তাঁর সঙ্গে কথা বললাম না। আমার বাবা একটু দূরে হেঁটে গেলেন এবং স্মৃতিস্তম্ভের ওপর লেখাগুলো পড়তে লাগলেন, এভাবে যেতে যেতে গীর্জার পাশের দরজার কাছে পৌঁছে তাঁর অনুসন্ধান শুরু করলেন। জেনারেল দেয়ালে ঠেসান দিয়ে দাঁড়িয়ে চোখ মুছে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। কারমিলা ও ম্যাডাম পেরোডোনের গলার স্বর শুনে আমি স্বস্তি বোধ করলাম। সেইমুহূর্তে তারা এগিয়ে আসছিল।

এই নিস্তব্ধতার মধ্যে বিশিষ্ট ও পদমর্যাদাসম্পন্ন মৃতদের সম্বন্ধে এইমাত্র অদ্ভুত গল্প শুনে, যাদের স্মৃতি এই ধুলোর মধ্যে চারদিকে ছড়িয়ে রয়েছে তার প্রত্যেকটি ঘটনা আমার নিজের রোগের সঙ্গে ভয়ঙ্করভাবে মিল আছে—এই ভূতুড়ে জায়গায়, দেয়াল বেয়ে ঘন ও লম্বা লম্বা গাছের পাতায় ঘেরা অন্ধকারময় জায়গায়—একটা আতঙ্ক আমার ওপর চেপে বসতে লাগল।

বৃদ্ধ জেনারেলের দৃষ্টি মাটির ওপর এক জায়গায় স্থির হয়ে আছে। নিচু হয়ে তিনি একটা ভাঙা স্মৃতিস্তম্ভের ভিতের ওপর হাত দিয়ে রয়েছেন।

একটা সরু খিলানের নিচে যার ওপর নিন্দাজনক ও ভয়ঙ্কর পুরনো গথিক কারুকার্য শোভা পাচ্ছে একটা সুন্দর মুখ ও কারমিলার চেহারা দেখে আমি খুশি হলাম। তারা ছায়াঘেরা গীর্জায় ঢুকছিল।

আমি উঠে মৃদু হেসে তার বিশেষ আকর্ষণপূর্ণ হাসির উত্তরে কথা বলতে যাচ্ছিলাম এমন সময় আমার পাশে বুড়ো লোকটা কাঠুরিয়ার কুড়ুলটা ধরে

চীৎকার করে সামনে এগিয়ে এল। তাকে দেখে তার দেহের ওপর এক পশুর মত চেহারা পরিবর্তন হল। এটা একটা তাৎক্ষণিক ও ভীতিপূর্ণ পরিবর্তন। সে গুড়ি মেরে পিছিয়ে গেল। আমি আর্তনাদ করে ওঠার আগেই লোকটি গায়ের সমস্ত জোব দিয়ে তাকে আঘাত করল। কিন্তু সে নিচু হয়ে সেই আঘাত এড়িযে গিয়ে তার ছোট মুঠি দিয়ে লোকটার কব্জি চেপে ধবল। সে একমুহূর্ত তার হাত ছাড়াতে চেষ্টা করল কিন্তু তাব হাতের মুঠো খুলে কুড়ুলটা মাটিতে পড়ে গেল এবং মেয়েটি উধাও হল।

লোকটি দেয়ালের গায়ে ধাক্কা খেল। তার মাথার পাকা চুল খাড়া হয়ে উঠল এবং তার মুখে ঘাম দেখা দিল যেন সে মৃত্যুব মুখোমুখি হয়েছে।

এই ভীতিপূর্ণ দৃষ্টি একমুহূর্তেই কেটে গেল। এবপর প্রথমেই আমার মনে পড়ে আমার সামনে ম্যাডাম পেরোডোনকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখি এবং অধৈযভাবে বাববার প্রশ্ন করে চলেছে—কোথায কুমাবী কারমিলা ?

অবশেষে আমি উত্তর দিলাম—আমি জানি না—আমি বলতে পারব না—সে ওখানে গেছে। আমি দবজার দিকে দেখালাম যেখান দিযে ম্যাডাম এইমাত্র ঢুকেছে—মাত্র একমিনিট কি দুমিনিট আগে।

কিন্তু আমি এইখানে এই পথে কাবমিলাব ঢোকার পব থেকে দাঁড়িযে আছি এবং সে ফিরে আসেনি।

সে তখন কারমিলাব নাম ধবে ডাকতে লাগল—প্রত্যেকটি দরজায়, গলিতে, জানালা থেকে কিন্তু কোন সাড়া পাওয়া গেল না।

সে নিজের নাম কারমিলা বলে ? জেনাবেল জিজ্ঞেস করলেন, তখনও তিনি বিক্ষুব্ধ।

কারমিলা, হ্যাঁ। আমি উত্তব দিলাম।

হ্যাঁ, সেই হচ্ছে মিলার্কা। তিনি বললেন। সে একই লোক যাকে অনেকদিন আগে বলা হত মিবকাল্লা, কার্নস্টাইনেব কাউণ্টেস। বাছা, যত তাড়াতাড়ি পার এই অভিশপ্ত জায়গা থেকে পালিয়ে চল। যাজকের বাড়ি যাও এবং আমরা না আসা পযন্ত সেখানে থাক। দূর হও ! আর কাবমিলাকে তুমি কখনও ধবতে পারবে না, তুমি ওকে এখানে দেখতে পাবে না।

পঞ্চদশ অধ্যায়

অগ্নিপরীক্ষা এবং কায সম্পাদন

যখন তিনি বলছিলেন সেইসময় এক অদ্ভুতদর্শন লোক গীর্জার দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকল—যে দরজা দিয়ে কারমিলা ঢুকেছিল এবং বেরিয়ে গিয়েছিল।

তাকে দেখতে লম্বা, সরু বুক, সামনের দিকে ঝোঁকা, চওড়া কাঁধ এবং কালো পোশাক পরনে। তার বাদামী রঙের মুখে কুঞ্চিত রেখায় ভর্তি,

চওড়া পাতা দেওয়া এক অদ্ভুত ধরনের টুপী পরেছিল। তার মাথার চুল লম্বা ও ধূসর বর্ণের, কাঁধের ওপর ঝুলে পড়েছে। একটা সোনার চশমা চোখে। ধীরে ধীরে বিশ্রী ভঙ্গিতে হাঁটছিল এবং মাঝে মাঝে তার মুখটা আকাশের দিকে তুলছিল এবং মাঝে মাঝে মাটির দিকে মাথা নামিয়ে অভিবাদন করছিল। মুখে তার মৃদু হাসি লেগে আছে মনে হল। তার রোগা পাতলা বাহু দুটো দোলাচ্ছিল এবং লম্বা কৃশ হাত দুটোয় বেমানান দুটো পুরনো কালো দস্তানা পরে নাড়াচ্ছে আর দুর্বোধ্য ভাষায় অঙ্গভঙ্গি করে কি বলছে।

ঐ সেই লোক! জেনারেল চীৎকার করে উঠলেন। আনন্দে আত্মহারা হয়ে এগিয়ে এলেন। প্রিয় ব্যারন, আপনাকে দেখে আমি কি খুশি। আপনার সঙ্গে এত তাড়াতাড়ি মিলিত হব আশা করিনি। তিনি বাবাকে ডাকলেন, ইতিমধ্যে তিনি ফিরে এসেছেন। যাকে ব্যারন বলে সম্বোধন করছেন তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করাবার জন্যে তাঁকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। তিনি বাবাকে পরিচয় করিয়ে দিয়ে তৎক্ষণাৎ তার সঙ্গে আগ্রহে কথাবার্তা শুরু করলেন। আগন্তুক তার পকেট থেকে গোল করে পাকানো একটা কাগজ বার করল এবং সামনের একটা নষ্ট হয়ে যাওয়া কবরের ওপর বিছিয়ে দিল। তার হাতের আঙুলে একটা পেন্সিল ধরা ছিল। তাই দিয়ে কাগজের ওপর এক জায়গা থেকে অপর জায়গায় কাল্পনিক রেখা টানতে লাগল। সেই লাইনগুলো মাঝে মাঝে দেখে আমি সিদ্ধান্তে এলাম যে সেটা একটা গীর্জার প্ল্যান। একটা ময়লা ছোট বই থেকে মাঝে মাঝে কিছু পড়ছে, যাকে আমি তার লেকচার বলতে পারি। বইটার হলদে পাতায় খুব ঘেঁস ঘেঁস করে লেখা।

আমি যেখানে দাঁড়িয়েছিলাম ঠিক তার উল্টোদিকে তারা অলসভাবে স্তম্ভ-পরিবেষ্টিত গলিতে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। চলতে চলতে তাঁরা কথা বলছেন। তারপর তাঁরা মাপজোপ করে শেষে সকলেই দাঁড়িয়ে পড়লেন। পাশের দেয়ালের একটা অংশে মুখ করে খুব মনোযোগের সঙ্গে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করতে লাগলেন। সেটার গা থেকে আইভিলতার গাছ টেনে উপড়ে ফেললেন, তাঁদের লাঠি দিয়ে চুনবালি খসিয়ে দেয়ালের এখানে ওখানে খোঁচাতে লাগলেন ও ঘা দিতে লাগলেন। অবশেষে একটা চওড়া মার্বেল পাথরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হলেন। তার ওপরে অক্ষর খোদাই করা ছিল।

কাঠুরিয়া শীঘ্র ফিরে আসার পর তার সাহায্যে তাঁরা একটা খোদাই-লিপি ও কুলমর্যাদা চিহ্নাঙ্কিত ঢাল সমেত একটি স্মৃতিস্তম্ভ আবিষ্কার করলেন। সেগুলো অনেকদিনের ভুলে যাওয়া কার্নস্টাইনের কাউন্টেস মিরকাল্লার স্মৃতি সমাধি বলে প্রমাণিত হল।

বৃদ্ধ জেনারেল ওপর দিকে হাত তুলে এবং আকাশের দিকে চেয়ে কিছুক্ষণ নীরবে ধন্যবাদ জানাল।

তাঁকে বলতে শুনলাম, আগামীকাল কমিশনার এখানে আসছেন এবং

আইন অনুযায়ী তদন্ত হবে।

তারপর সোনার চশমা পরা বৃদ্ধ ভদ্রলোকের দিকে ফিরে দুহাত দিয়ে তাকে সাগ্রহে ঝাঁকানি দিয়ে বলল, ব্যারন, আপনাকে কি বলে ধন্যবাদ জানাব জানি না। আমরা সকলে কিভাবে আপনাকে কৃতজ্ঞতা জানাব? একশ' বছরেরও বেশী এই অঞ্চলের অধিবাসীকে যে ব্যাপক যন্ত্রণায় সংক্রামিত করছিল আপনাকে তা থেকে মুক্ত করতে হবে। ভগবানকে ধন্যবাদ, ভয়ানক শত্রুকে অবশেষে খুঁজে পাওয়া গেছে।

আমার বাবা আগন্তুককে একপাশে নিয়ে এগিয়ে গেলেন, জেনাবেলও অনুসরণ করলেন। আমি জানতাম তিনি তাদেরকে আমার শ্রুতিগোচরের বাইরে নিয়ে গেলেন যাতে তিনি আমার ব্যাপারটা বলতে পারেন। তাদের কথাবার্তার মধ্যে মাঝে মাঝে তাদের আমার দিকে চকিতে দৃষ্টি দিতে দেখলাম।

বাবা আমায় এসে বারবার আদর করতে লাগলেন এবং আমাকে নিয়ে গীর্জা থেকে বেরোতে গিয়ে বললেন:

এখন আমাদের ফেরার সময় হয়েছে। বাড়িতে যাওয়ার সময় আমাদের সঙ্গে যাজককে নিয়ে যাওয়া উচিত। তিনি খুব কাছেই থাকেন এবং তাঁকে আমাদের সঙ্গে দুর্গে যাবার জন্যে রাজি করাব।

এই উদ্দেশ্য আমাদের সার্থক হল। ভীষণ পরিশ্রান্ত হওয়ায় বাড়ি ফিরে এসে আমি খুশি হলাম। কিন্তু যখন শুনলাম কারমিলার কোন খোঁজ খবর পাওয়া যাচ্ছে না তখন আমার সন্তুষ্টি আতঙ্কে পরিণত হল। ধ্বংসপ্রাপ্ত গীর্জায় যেদৃশ্য ঘটল তার কোন ব্যাখ্যাই আমাকে বলা হল না। পরিষ্কার মনে হল আমার বাবা বর্তমানে সেব্যাপারটা আমার কাছে গোপন রাখতে বদ্ধপরিকর।

সেই দৃশ্য স্মরণ করে কারমিলার অশুভ অনুপস্থিতি আমাকে ভয়ার্ত করে তুলল। সেরাতের ব্যবস্থা অনন্যসাধারণ। দুজন চাকর ও ম্যাডাম পেরোডোন আমার ঘরে সেরাতে বসে থাকবে। এবং বাবার সঙ্গে যাজক লাগোয়া ড্রেসিং রুম থেকে লক্ষ্য রাখবে।

যাজক সেরাতে কিছু ধর্মীয় অনুষ্ঠান করলেন যার উদ্দেশ্য আমি ধারণা করলাম কিন্তু বুঝতে পারলাম না যে আমার নির্বিঘ্নে ঘুমোবার প্রতিকারই এর কারণ।

কয়েকদিন পর আমার কাছে সবকিছুই পরিষ্কার হয়ে গেল।

কারমিলার অদৃশ্য হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমার রাতের কষ্ট দূর হল।

আপনারা আতঙ্কজনক কুসংস্কারের কথা নিশ্চয়ই শুনেছেন যা উচ্চ ও নিম্ন স্টিরিয়া, মোরেভিয়া, সাইলেসিয়া, তুর্ক সারবিয়া, পোল্যাণ্ড এমনকি রাশিয়াতে পর্যন্ত চালু ছিল—কুসংস্কার, যাকে আমাদের বলা উচিত ভ্যাম্পায়ার। অর্থাৎ রক্তশোষণকারী ভূতের প্রকোপ।

মানুষের প্রামাণিক সাক্ষ্য যদি প্রযত্নে ও বিশ্বস্ততার সঙ্গে গ্রহণ করা যায় তবে সততা ও বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক বহু সভ্য নিয়ে যে বহু কমিশনের সামনে দেওয়া হয়েছিল তার বৃহদায়তন রিপোর্ট যেকোন ধরনের বিদ্যমান কেসকে ছাড়িয়ে যাবে এবং যেকোন মূল্যে এটা অগ্রাহ্য করা কষ্টকর অথবা ভ্যামপায়ার বলে কোন বস্তুর অস্তিত্ব আছে সে সম্বন্ধে সন্দেহ করাও যায় না।

আমার দিক থেকে বলতে পারি আমি এমন কোন সূত্র শুনিনি যা আমি নিজে প্রত্যক্ষ করেছি এবং অভিজ্ঞতা লাভ করেছি তা ব্যাখ্যা করতে পারি কেবলমাত্র প্রাচীন ও দেশীয় বিশ্বাসের ওপর নির্ভর করতে হবে।

পরদিন কার্নস্টাইনের গীর্জায় নিয়মমাফিক প্রতিবিধানাদির ব্যবস্থা হল। কাউণ্টেস মিরকাল্লার কবর উন্মুক্ত করা হল। এখন অনাবৃত মুখটা দেখে জেনারেল ও আমার বাবা প্রত্যেকেই বিশ্বাসঘাতক ও সুন্দরী অতিথিকে চিনতে পারল। যদিও তার সমাধির পরে একশ পঞ্চাশ বছর পার হয়ে গেছে তবুও তার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ থেকে উষ্ণ জীবনের আভা দেখা যাচ্ছে। তার চোখ দুটো খোলা, কফিন থেকে মরার কোন গন্ধ বেরোচ্ছে না। দুজন ডাক্তার, একজন সরকারীভাবে এবং অপরজন তদন্তের উদ্যোক্তার তরফ থেকে সেখানে হাজির ছিল। তারা এই অবিশ্বাস্য ঘটনাকে সত্যি বলে সাক্ষ্য দেয় যে ক্ষীণ অথচ উপলব্ধি করা যায় এমন শ্বাস প্রশ্বাস ও সেই সঙ্গে হৃদস্পন্দন অনুভব করা যায়। দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নমনীয়, মাংস জীবন্ত; সীসা নির্মিত কফিনে রক্ত ভাসছে, তার সাত ইঞ্চি গভীরে দেহটা ডুবে শুয়ে রয়েছে। এখানে রক্তশোষক ভূতের সবরকম চিহ্ন ও প্রমাণ বর্তমান। প্রাচীন নিয়ম অনুযায়ী দেহটাকে তোলা হল এবং একটা ধারাল কাষ্ঠদল (গোঁজ) ভ্যামপায়ারের বুকের মধ্যে গুঁজে দেওয়া হল। সেইমুহূর্তে একটা তীক্ষ্ণ আর্তস্বর বেরিয়ে এল, মনে হল যেন জীবন্ত মানুষের হাত থেকে পালাবার জন্যে শেষ আর্তনাদ। তারপর মাথাটা কেটে ফেলা হল এবং কাটা ঘাড় থেকে রক্ত ফিনকি দিয়ে বেরোতে লাগল। দেহ ও মাথাটা পরে জড় করা কাঠের ওপর রেখে পুড়িয়ে ছাই করা হল। সেই ছাই নদীতে ফেলে দেওয়া হল এবং জলে ভেসে গেল। সেই থেকে সেই অঞ্চল ভ্যামপায়ারের উৎপাত থেকে রক্ষা পেল।

এই ঘটনার সত্যতা প্রমাণিত করে যারা সেখানে উপস্থিত ছিল তাদের সই করা ইম্পিরিয়াল কমিশনের একটা রিপোর্ট বাবার কাছে আছে। এই কাগজ থেকেই আমি শেষ জঘন্য দৃশ্য সংক্ষেপিত করেছি।

ষোড়শ অধ্যায়

উপসংহার

আপনারা মনে করতে পারেন আমি শান্তিতে এইসব লিখেছি। কিন্তু প্রকৃতই তা নয়; উত্তেজনা ছাড়া আমি এটা ভাবতে পারি না। আপনাদের ঐকান্তিক আগ্রহ বারবার প্রকাশ না করা হলে আমি এই কাজে বসতে পারতাম না। সেই অকথ্য ভীতি থেকে মুক্ত হবার পরেও অনেকবছর আমার দিন ও রাত আতঙ্কে ও ভয়ে কেটেছে।

কুশলী ব্যারন ভরডেনবার্গ সম্বন্ধে দুএকটা কথা এখানে বলতে হয় যার অদ্ভুত বিদ্যায় কাউন্টেস মিরকাল্লার কবর আবিষ্কার হয়। আমরা তাঁর কাছে ঋণী।

স্টিরিয়ার অন্তর্গত গ্র্যাজ শহরে তিনি বাস করতেন। একসময় তাঁর পূর্বপুরুষেরা বিশাল সম্পত্তির মালিক ছিলেন। বর্তমানে তার যৎসামান্য অংশ থেকে কোনরকমে তিনি জীবনধারণ করেন। ভ্যামপায়ারের বিস্ময়কর প্রামাণিক ঐতিহ্য সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ও পরিশ্রমের মধ্যে দিয়ে গবেষণা করে দিন কাটাতেন! এর ওপরে যা কিছু ছোটবড় কাজ হয়েছে তা সবই তাঁর নখদর্পণে ছিল। এই সমস্ত বিভিন্ন বই ও লেখার বহু সংকলনের মধ্যে, আমার যতদূর মনে পড়ে কিছু আমার বাবাকে পড়তে দিয়েছিলেন। আইনগত বিচারের এক বিশাল সারসংগ্রহ তাঁর ছিল—যার মধ্যে থেকে ভ্যামপায়ার সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা করেছিলেন। এখানে উল্লেখ করতে পারি, যে মারাত্মক বিবর্ণতা এতে আরোপ করা হয়েছে তা কেবল নিছক নাটকীয় রোমাঞ্চকর গল্প। কবরের মধ্যে সেটা বর্তমান কিন্তু মানুষের সমাজের মধ্যে তা সুস্থতার পরিচায়ক হিসেবে দেখা দেয়। কফিনের মধ্যে সেগুলো যখন আলোয় উন্মুক্ত করা হয়, ভ্যামপায়ার জীবনের যা কিছু লক্ষণ সবই বহুদিন মৃত কার্নস্টাইনের কাউন্টেসের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে।

মাটি অথবা কফিন বা শববস্ত্র বিশৃঙ্খল না করে কিভাবে তারা কবর থেকে পালিয়ে যায় এবং আবার কয়েকঘণ্টা পরে ফিরে আসে তারা ব্যাখ্যা করা দুরূহ সেকথা সকলেই স্বীকার করে। ভ্যামপায়ারের উভচরী অস্তিত্ব প্রতিদিন নতুন করে কবরে তন্দ্রার মধ্যে বাঁচিয়ে রাখে। জীবন্ত মানুষের রক্তের প্রতি ভয়ানক লালসা জেগে ওঠার ক্ষমতাকে শক্তি যোগায়। কোন নির্দিষ্ট লোকের প্রতি যেমন ভালবাসার আগ্রহ তেমনি সম্পূর্ণরূপে আত্মসাৎ করবার জন্যে ভ্যামপায়ারের প্রচণ্ড আসক্তি থাকে। অভীষ্ট বস্তুলাভের ইচ্ছায় শত বাধা অতিক্রম করে অসীম ধৈর্য্য ও কৌশল অবলম্বন করে। যতক্ষণ না পর্যন্ত তার

লালসার তৃপ্তি হচ্ছে এবং কাম্য শিকারের জীবন নিঃশেষিত না হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত সে বিরত থাকে না। তাদের খুনীসুলভ উপভোগ মিতব্যয়িতার সঙ্গে দীর্ঘায়িত করে এবং ক্রমে ক্রমে এক কৌশলপূর্ণ পাণিপ্রার্থনার দিকে অগ্রসর হয়। এই সমস্ত অবস্থায় তারা সম্মতি ও সহানুভূতি লাভ করার জন্যে আকুল আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করে। সাধারণক্ষেত্রে কোন ভ্যামপায়ার তার নির্দিষ্ট শিকারের প্রতি সরাসরি গিয়ে হিংস্রভাবে গলাটিপে পরাজিত ও নিঃশেষ করে একাকী ভোজেই পরমানন্দ লাভ করে।

আপাতদৃষ্টিতে ভ্যামপায়ার কয়েকটিক্ষেত্রে কতকগুলি বিশেষ অবস্থার নিয়ন্ত্রণাধীন। এই বিশেষ ঘটনায় যার পরস্পর সম্পর্কের কথা বলেছি, মিরকাল্লা সাধারণভাবে একটা নাম হতে পারে। যদি এটা তার সত্যিকারের নাম না হয়, তবে একটা অক্ষরও বাদ না দিয়ে বা যোগ না করে অন্ততপক্ষে তার একটা প্রতিরূপ গঠন করা যায় যা আমরা বলতে পারি অক্ষরগুলো ওলট পালট করে তৈরি করা। কারমিলা তাই করেছিল, মিলারকাও সেইপথই নিয়েছিল।

কারমিলার বিতাড়নের পরেও ব্যারন ভোর্ডেনবার্গ দু'তিন সপ্তাহ আমাদের কাছে ছিলেন। আমার বাবা তার কাছে মোরেভিয়ার ভদ্রলোক ও কার্নস্টাইনের ভ্যামপায়ার সম্বন্ধে গল্প করেছিলেন। তারপর তিনি ব্যারনের কাছে জানতে চাইলেন কেমন করে বহুদিনের চাপা পড়া কাউন্টেস মিলার্কার কবরের ঠিক স্থান নির্দ্ধারণ করতে পারলেন। ব্যারনের অদ্ভুত মুখটা মৃদু হাসিতে কুঁচকে উঠল। নিচের দিকে তাকিয়ে তাঁর ভাঙা চশমার খাপটা নাড়াচাড়া করতে করতে তখনও হাসছেন। তারপর ওপর দিকে মুখ তুলে বললেন:

আমার কাছে অনেক সাময়িক পত্রিকা ও অন্যান্য কাগজ আছে যা ঐ অসাধারণ লোকটি লিখেছে, তার মধ্যে একটা অদ্ভুত আলোচনা আছে যাতে কার্নস্টাইনে আগমনের কথা আপনি বলেছেন। সময়ে তার কিছুটা পরিবর্তিত ও বিকৃত হয়েছে। তাঁকে একজন মোরেভিয়ার সম্ভ্রান্ত লোক বলা যেতে পারে কারণ তিনি তাঁর বাসস্থান ঐস্থানে পরিবর্তন করেছিলেন, এছাড়া তিনি এক সম্ভ্রান্ত লোক। কিন্তু আসলে তিনি একজন উচ্চ স্টিরিয়ার অধিবাসী। এটা যথেষ্টভাবে বলা যায় খুব ছোটবেলা থেকেই তিনি কার্নস্টাইনের কাউন্টেস মিরকাল্লার প্রতি প্রবল আবেগপ্রবণ ছিলেন। কাউন্টেসের অকাল মৃত্যুটাকে দুঃখসাগরে নিমজ্জিত করে ভ্যামপায়ারদের স্বভাব সংখ্যাবৃদ্ধি করা কিন্তু সেটা ভৌতিক নিয়ম অনুযায়ী।

প্রথমেই ধরা যাক একটা জায়গা কোন ধ্বংসাত্মক জীবন থেকে মুক্ত। কি করে সে শুরু করে আর কি করেই বা নিজেকে বর্দ্ধিত করে আমি আপনাকে তা বলব। একজন লোক কমবেশী দুষ্ট প্রকৃতির, সে আত্মহত্যা করল। একজন আত্মহত্যাকারী কতকগুলো বিশেষ ব্যাপারে ভ্যামপায়ার হয়। সেই ভূত নিদ্রিত অবস্থায় জীবন্ত মানুষদের কাছে যায়, তারা মরে এবং একইভাবে

কবরে ভ্যামপায়ারে পরিণত হয়। সুন্দরী মিরকাল্লাব বেলায় এইরকমই ঘটেছিল। ঐ ধরনের কোন ভূতের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিল। আমার পূর্ব-পুরুষ ভর্ডেনবার্গ, যাঁর পদবী আমি এখনও ব্যবহার করি। তিনি এটা আবিষ্কার করেন এবং ক্রমশঃ গবেষণা করতে করতে আরো অনেককিছু জানতে পারেন। অনেককিছুর মধ্যে তিনি সিদ্ধান্তে এসেছিলেন যে অনতিকালেই ভ্যামপায়ার সংক্রান্ত অবিশ্বাস মৃত কাউণ্টেসের ওপরে বর্তাবে জীবনে যে তার ভালবাসার পাত্রী ছিল। কাউণ্টেস যে অবস্থাতেই থাকুক না কেন, মৃত্যুর পরেও তাকে বলাৎকারের মত প্রাণবধ কবে তার মৃতদেহের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করা হলে এক আতঙ্কের কল্পনা তিনি করেছিলেন। তিনি এক অদ্ভুত গবেষণামূলক রচনা লিখে রেখে গেছেন যার দ্বারা প্রমাণ কবা যায় যে উভচর অস্তিত্ব থেকে বিতাড়নের পব ভ্যামপায়ার আগে ভীষণ মারাত্মক জীবনের দিকে যায়। এবং তিনি তাঁব একদা ভালবাসার পাত্রী মিবকাল্লাকে এ থেকে বাঁচাতে সঙ্কল্প করেছিলেন।

তার মৃতদেহ সরাবার ভান করে আসলে তার স্মৃতিচিহ্ন মুছে ফেলার উদ্দেশ্যে তিনি এখানে ফাঁকি দিয়ে আসার কৌশল অবলম্বন করেছিলেন।



এ জায়গা ছেড়ে যাবার আগে তিনি তাঁর বিগত যৌবনের কথা চিন্তা করছিলেন সেই অবস্থায় তিনি যা করলেন তাতে তাঁকে আতঙ্কিত করে তুলল। তার আঁকা-জোকা ও নোটের মধ্যে দিয়ে আমাকে আসল জায়গায় যেতে সাহায্য করে এবং যে প্রবঞ্চনা তিনি করেছেন তা স্বীকারোক্তি করেন। এব্যাপারে

অন্য যেকোন কাজ তিনি করতে যেতেন, মৃত্যু এসে তাঁকে বাধা দিত এবং পশুদের ধোঁয়ার অনুসরণে বাধ্য করত।

আরো কিছু কথা আমরা বললাম এবং তার মধ্যে তিনি এই কথা বললেন:

ভ্যামপায়ারের একটা চিহ্ন হাতের শক্তি। যখন জেনারেল কুড়ুল উঁচিয়ে তাকে আঘাত করতে গেছলেন তখন মিরকাল্লার রোগা হাতটা লোহার সাঁড়াশীর মত তার কব্জীতে চেপে বসেছিল। আঁকড়ে ধরার মধ্যেই এর শক্তি সীমাবদ্ধ থাকে না, যেখানটায় ধরে সে জায়গা অসাড় হয়ে যায় এবং খুব ধীরে ধীরে শক্তি পুনরুদ্ধার করে।

পরের বসন্তে বাবা আমাকে ইটালীতে বেড়াতে নিয়ে গেলেন। আমরা প্রায় এক বছরেরও বেশী বাইরে ছিলাম। সাম্প্রতিক ঘটনার ভীতি দূর হতে অনেক সময় লাগল। এখনও পর্যন্ত কারমিলার মূর্তি দুভাবে আমার স্মৃতিতে ভেসে ওঠে—কখনও আনন্দময়, জড, সুন্দরী মেয়ে। আবার কখনও অঙ্গ মোচড়ান শয়তানরূপে যেমন ধ্বংসপ্রাপ্ত গীর্জায় দেখেছিলাম। মাঝে মাঝে আমার ভাবাবেশে কল্পনা করি যেন ড্রইংরুমের দরজায় কারমিলার হাল্কা পদধ্বনি শুনতে পাচ্ছি!

Carmilla—*Joseph Sheridan Le Fanu*

অপূর্ণ আশা

রাস্তার ধারে ছোট ফটো তোলার দোকানটায় সারাদিন ধরে কোন খদ্দের নেই। অতিমাত্রায় দাম্ভিকের কাছেও আলো অনাহুত। সেই সকাল থেকে লণ্ডনের আকাশ আবছা অন্ধকারে ঢেকে রয়েছে। পথচারীরা কাঁপতে কাঁপতে তাড়াতাড়ি রাস্তা পেরিয়ে যে যার বাড়িতে ঢুকে পড়ার জন্য ব্যস্ত। প্রথম তুষারপাত ধীরে ধীরে শুরু হয়েছে যদিও এখনও তাতে ময়লা জমবার মত অবস্থা হয়নি। ঠাণ্ডা কনকনে বাতাসের গুনগুনানিতে মিঃ মার্টিমার জেনকিন তার ময়লা ছেঁড়া কোটের কলারটা আরো ওপরে তোলার চেষ্টা করছে। সে এই দোকানের ফটোগ্রাফার। কোন খদ্দের না পাওয়ার হতাশায় বাইরে দাঁড়িয়ে ঠাণ্ডা হাতে দোকানের গেট বন্ধ করছে। তখন ছ'টা বাজতে পাঁচ মিনিট বাকি।

গেটের শেষ তালাটা বন্ধ করার আগে শোকেসে সাজানো রাজকীয় স্থাপত্যের এক মোটা লোকের প্রতিকৃতির দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল। তারপর গেটে চাবি দিয়ে পাশের দরজা দিয়ে ভেতরে ঢোকবার জন্যে এগিয়ে

গেল। ভেতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করতে গিয়ে তার মনে হল পেছনে কেউ যেন দাঁড়িয়ে আছে। ঘুরে দেখল সরু প্যাসেজে একজন লোক তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

জেনকিন আচমকা লাফিয়ে উঠল। লোকটা তার এত কাছে অথচ তাকে ভেতরে ঢুকতে দেখল না। তাঁর চোখ দুটো বিষণ্ন এবং সনির্বন্ধ অনুরোধের ভাব প্রকাশ করছে। জেনকিন আগেই তার সহকারীকে ছুটি দিয়েছে। সেই ছোট্ট দোতলা বাড়িতে আর কোন লোক নেই। সে যখন পেছন ফিরে ছিল সেই সময় অন্ধকারে লোকটা নিশ্চয়ই ভেতরে ঢুকে পড়েছে, এইরকম সে ভাবল। সে কে হতে পারে আর কিই বা চাইতে পারে? সে কি ভিখিরী, খদ্দের না কোন বদমাশ লোক?

গুড ইভনিং, হাত ঘষতে ঘষতে জেনকিন বলল। তবে তার কথা বলার মধ্যে সামান্য ভদ্রতার স্বর ছিল না যা সাধারণত সে খদ্দেরকে দেখায়। সে 'স্যার' কথাটাও যোগ করতে যাচ্ছিল কিন্তু চেপে যাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ মনে করল। সেইসময় আগন্তুক একটু নড়লে আলোটা তার মুখের ওপর পড়ল। তখন জেনকিন তাকে চিনতে পারল। যদি সে ভুল না করে থাকে তবে আগন্তুক হচ্ছে বড় রাস্তার পুরনো বইয়ের দোকানের মালিক।

ওঃ আপনি মিঃ উইলসন। আধোস্বরে বলল যদিও সে নিশ্চিত হতে পারছিল না। আমাকে মাফ করবেন। আলোটা ঠিকমত না পড়ায় আপনাকে ধরতে পারিনি। আমি দোকানটা এইমাত্র বন্ধ করছি।

লোকটি নীরবে মাথা নিচু করে উত্তর দিল।

আপনি ভেতরে আসবেন না? দয়া করে আসুন।

জেনকিন পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল। ব্যাপারটা কি সে ভাবতে লাগল। আগন্তুক তার খদ্দেরের মধ্যে পড়ে না, প্রকৃতপক্ষে সে যে তাকে চেনে তাও ঠিক করে উঠতে পারল না। মাঝে মাঝে তার দোকানে কিছু কাগজ কিনতে বা অন্য কিছুর জন্যে আসতে দেখেছে। সে এখন উপলব্ধি করতে পারছে লোকটা খুব অসুস্থ এবং ক্লান্ত, মুখটা তার ফ্যাকাসে ও বিষণ্ন। তার এই হঠাৎ আগমন তাকে মানসিক বিপর্যয়ের মধ্যে ফেলল। সে দুঃখিত হল, বেদনার্ত হল। সে অস্বস্তি বোধ করতে লাগল।

ষ্টুডিওর মধ্যে তারা ঢুকল। আশ্চর্য, আগন্তুকই প্রথম ঢুকল যেন সে পথ চেনে। জেনকিন ভাবল নিশ্চয়ই সে কোন বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছে। কোন কথা না বলে আগন্তুক সোজা ঘরের মধ্যে গিয়ে তুলিরং করা গাছের পর্দার দিকে পেছন করে, ক্যামেরার সামনে তাকিয়ে চেয়ারে বসে পড়ল। ষ্টুডিও ঘরে উজ্জ্বলভাবে আলো জ্বালানো ছিল। সে চেয়ারে বসে পা দুটো আড়াআড়িভাবে রেখে কৃত্রিম ফুল দিয়ে সাজানো টেবিলটা টেনে নিয়ে তার ওপর হাত রেখে বিশেষ ভঙ্গিতে তাকিয়ে রইল। সে বোঝাতে চায় তার

ফটো তোলা হোক। তার চোখ দুটো সোজা লেন্সের দিকে যদিও ক্যামেরাটা কালো কাপড় দিয়ে ঢাকা ছিল। তার ভাবটা এমন যে সে ফটো তোলার লোককে গ্রাহ্য করছে না। কিন্তু জেনকিন তখনও দরজার পাশে দাঁড়িয়ে। তার বোধ হল একটা ঠাণ্ডা কনকনে বাতাস তাব মুখের ওপর দিয়ে বয়ে গেল যদিও তা রাস্তার ঠাণ্ডা বাতাস নয়। সে উপলব্ধি করল তার মাথার চুল খাড়া হয়ে উঠছে। তার শিরদাঁড়ায় একটা কাঁপুনি খেলে গেল। সেই ফ্যাকাসে বিষণ্ণ মুখে এবং ঢাকা দেওয়া ক্যামেরার প্রতি স্থিরদৃষ্টি চোখ দুটো দেখে তার অসুস্থতার লক্ষণই স্পষ্ট দেখা গেল যেখানে কোন আশা, কোন ভরসা নেই। মৃত্যুই সে দেখতে পেল।

এক সেকেণ্ডের জন্যে এই চিন্তাটা মনে উদয় হয়েই চলে গেল। সমস্ত ঘটনাটা ঘটতে দুমিনিটের বেশী সময় লাগল না। মিঃ জেনকিন নিজেকে শক্ত করে মন থেকে দুশ্চিন্তা তাড়িয়ে দিয়ে কাজের কথায় এল। বলল, আমাকে মাফ করুন। ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারিনি। আপনি নিশ্চয়ই আপনার ফটো তুলতে চান। সারাদিন আমার খুব ব্যস্ততায় কেটেছে এবং এই অসময়ে আমি কাউকে আশা করিনি। সে যখন কথা বলছিল তখন ঘড়িতে ছটার ঘণ্টা পড়ছিল। কিন্তু শব্দটা তার কানে যায়নি। মনের মধ্যে তার আর একটা চিন্তা খেলছিল : একজন লোকেব অসুস্থ অবস্থায় তার ফটো তোলা উচিত নয় বিশেষ করে যখন সে মরতে চলেছে। ভগবান! তার ফটোটা ভাল করতে গেলে অনেক মেহনত করতে হবে।

সে মনে মনে ছবিটার সাইজ, দাম ইত্যাদি আলোচনা করতে লাগল আর লোকটা চুপচাপ চেয়ারে বসে রইল। কোন কথা তার মুখে নেই। তাকে দেখে মনে হয় তার যেন তাড়া আছে, কোন কথা না বলে কাজটা সেরে ফেললেই হয়। ফটোগ্রাফার ভাবতে লাগল অনেক লোকই এরকম, দাঁতের ডাক্তারের কাছে যাওয়ার থেকে ফটো তোলা এক যন্ত্রণাদায়ক ব্যাপাব। লোকদের ঠিকঠাক করে বসাতে সে যেন বেশ গর্ব অনুভব করে। কিন্তু এ লোকটা একেবারেই বাজে। সে লোকটাকে একবারও ছোঁয়নি এমন কি তার এরকম মারাত্মক অসুস্থতার ভাব দেখে তার খুব কাছে পর্যন্ত যায়নি।

একটা ফ্লাশলাইটের দরকার, মিঃ উইলসন, এই বলে সে অবশেষে ক্যামেরা ষ্ট্যাণ্ডটাকে অস্থিরভাবে নাড়াচাড়া করতে করতে একটু কাছে নিয়ে এল। লোকটা অধৈর্যভাবে মাথাটা একটু নাড়াল। জেনকিনেব একবার ইচ্ছে হল তাকে বলে অন্য সময় আসতে, তার অসুস্থতার সম্বন্ধে একটু সমবেদনা জানাতে, আসলে তার সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে। কিন্তু এই ব্যাপারে তার জিবটা যেন জড়িয়ে গেল। তার সঙ্গে এই ব্যক্তিগত সম্পর্ক গড়ে তোলা একেবারে অসম্ভব। ব্যবসার খাতিরে কিছু গল্প করা যেতে পারে মাত্র। সত্যি বলতে কি জেনকিন যেন হতভম্ব হয়ে গেল—তার মধ্যে নিজেকে সে খুঁজে

পেলনা। এরই মধ্যে তার অস্বস্তিবোধটা ক্রমশ বেড়ে উঠতে লাগল। সে তাড়াতাড়ি করতে লাগল। সেও চাইল কাজটা যত শীঘ্র সেরে তাকে বিদায় করতে পারলে ভাল হয়।

অবশেষে সব ঠিকঠাক করে কেবলমাত্র ফ্লাশলাইটটা ঘোরাবার অপেক্ষায় রেখে তার মাথার ওপর কালো ভেলভেটের কাপড় চাপিয়ে ক্যামেরার লেন্স দিয়ে উঁকি মেরে দেখলাম—কিছুই দেখতে পেলাম না! একটা আলোর ঝলক, একটা মুখ—হা ভগবান! এমন মুখ তার, অথচ সে নয়—একটা আলোর চমক! বিদ্যুতের মত ক্যামেরার পর্দায় খেলে গেল। চোখ ধাঁধিয়ে উঠল—প্রায় অন্ধকার ছিল। একেবারে পুরোদস্তুর তীব্র আলোকের ঝলমলানি।

জেনকিনের মনে হল সে যেন কাপড়ের সঙ্গে জড়িয়ে রইল, চোখ বন্ধ, দম নিয়ে নিঃশ্বাস নিচ্ছে। মন থেকে সব দ্বিধা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে আবার ঠিক করে দাঁড়িয়ে লেন্সের মধ্যে দিয়ে দ্বিতীয়বার দেখে চমকে উঠল—কেউ নেই। বাঁহাতে টুপীটা উত্তেজিতভাবে চেপে ধরে ক্যামেরার ওপব দিয়ে চেয়ারের দিকে তাকাল। জেনকিনের পা কাঁপতে লাগল—ঘরের চারদিকে চকিতে তাকিয়ে দেখল, তারপরে দৌড়ল, চেয়ার উল্টে ফেলে দিয়ে একছুটে প্যাসেজে গেল। প্যাসেজ ফাঁকা, বাইরে যাবার দরজা বন্ধ। আগন্তুক উঠে গেল যেন কখনই সে এখানে ছিল না। ভয়ে তার মাথার চুল আবার খাড়া হয়ে উঠল, গায়ের চামড়া কুঁচকে গেল, শিরদাঁড়ায় কেউ যেন বরফ ঢেলে দিল।

কিছুক্ষণ পর ষ্টুডিও ঘরে ফিরে এসে উত্তেজিতভাবে আবার দেখতে লাগল। চেয়ারটা খালি পড়ে রয়েছে, পেছনে ময়লা পর্দায় গাছ আঁকা—তার পাশেই ফুল সমেত ফুলদানী বসান গোল টেবিল। এক মিনিট আগেও ঐ চেয়ারে মরার মত দেখতে মিঃ উইলসন বসেছিল। তার ভয়ার্ত মনে উদয় হল—তাহলে আমি স্বপ্ন দেখছিলাম না ত! আমি নিশ্চয়ই কিছু দেখছিলাম। আবছা-ভাবে তার মনে পড়ল কাগজে এরকম গল্প পড়েছে—বিপদ থেকে মানুষকে বাঁচাবার অদ্ভুত সঙ্কেত জানানোর গল্প, অথবা স্বপ্নে দেখা কোন মুখের অমঙ্গলের আশঙ্কা থেকে রক্ষা করতে, এই ধরনের নানা গল্প। তার সব তালগোল পাকিয়ে গেল—মনে হল তার যেন কিছু ঘটতে চলেছে। কিছুক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল, আশা হল হয়ত যেমন হঠাৎ সে উধাও হল তেমনি আবার হঠাৎ এসে পড়বে। ঘটনাটা আবার সে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে ভাবতে লাগল। সেইসময় দুটো ব্যাপার সে দেখতে পেল যা আগে ভাবেনি কিন্তু এখন খুবই অদ্ভুত লাগছে। আগন্তুক একটি কথাও বলেনি আর সে নিজেও তাকে একবারও ছোঁয়নি। বেশী কিছু চিন্তা না করে সে টুপী ও কোট নিয়ে বেরিয়ে পড়ল সামনের বড় রাস্তার ওপর ছোট দোকানের উদ্দেশে কিছু কালি ও কাগজ কেনার জন্যে, যদিও সেগুলো তার কোন দরকারই ছিল না।

দোকানটা সেইরকমই আছে তবে মিঃ উইলসনকে দেখা যাচ্ছে না। একজন

লম্বা মত লোক তার সহকর্মীর সঙ্গে নিচু গলায় কথা বলছে। জেনকিন মাথা ঝুঁকিয়ে অভিবাদন করে ভেতরে ঢুকল। সস্তা দামের ষ্টাইলোগ্রাফিক পেন দেখতে লাগল আর অপেক্ষা করতে থাকল কখন তাদের কথাবার্তা শেষ হয়। তাদের কথা জেনকিনের কানে আসতে লাগল। তাছাড়া সে শুনেছে এই ছোট দোকানে মাঝে মাঝে নামকরা লোকের আগমন ঘটে, এ নিশ্চয়ই সেই ধরনের কোন লোক। তাদের কথার কিছুটা তার কানে এল। লম্বা লোকটা বলছে, হ্যাঁ, মৃত্যুপথযাত্রী লোকের এই শেষ কথাগুলো সত্যিই অনন্যসাধারণ, খুবই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। আপনার নিউম্যানের কথা মনে পড়ে—আরো আলো। ঠিক সেরকম না? বই বিক্রেতা মাথা নেড়ে সম্মতি জানিয়ে বলল, খুব সুন্দর বলেছেন।

জেনকিন কলমগুলোর ওপর একটু ঝুঁকে পড়ল। লোকটি চলে যেতে উদ্যত হয়ে বলল, এটাও সেদিক থেকে সুন্দর, পুরনো প্রতিজ্ঞা বুঝলে কিনা, অপূর্ণ অথচ বিস্মৃত নয়। বিকারের ঘোরে হঠাৎ এর প্রকাশ। অদ্ভুত, সত্যিই অদ্ভুত! জীবনের শেষ পর্যন্ত সৎ ও বিবেকী ছিল। বিশ বছর ধরে আমি তাকে দেখে আসছি কথার খেলাপ কখনও সে করেনি…… ।

একটা গাড়ির আওয়াজে বাকি কথাগুলো তার শোনা গেল না। লোকটা দরজার দিকে এগোতে থাকলে বই বিক্রেতাকে বলতে শোনা গেল,·· তারা যখন তাকে দেখেছিল সে তখন অর্ধেক সিঁড়ি নেমেছে আর একই কথা বার-বার বলে চলেছে—আমার স্ত্রীকে কথা দিয়েছি, আমার স্ত্রীকে কথা দিয়েছি তাকে আবার ওপরে তুলে নিয়ে যাওয়ার জন্যে সে পীড়াপীড়ি করছিল, সেরকম কথাই আমি শুনেছি। আর আমার মনে হয় তার তাড়াতাড়ি মৃত্যুর জন্যে ওটাই কারণ। পনের মিনিট পরেই তার মৃত্যু হয়। আগের আগের মতই তার শেষ কথা—আমার স্ত্রীকে কথা দিয়েছি·· ।

লম্বা লোকটা চলে গেল। জেনকিনও তার জিনিস কেনার কথা ভুলে গেছে। কখন এটা ঘটেছে? তার গলার স্বর সে নিজেই বুঝতে পারল না। যে উত্তরটা সে শুনেছিল একমিনিট পরে বাড়ি যাবার জন্যে রাস্তায় নেমে তার কানের মধ্যে সেটা সজোরে বাজতে লাগল। ছটা বাজার কয়েক মিনিট আগে। বেশ কয়েকদিন ধরে ভুগছিল সে। প্রচণ্ড জ্বরে বিছানা ছেড়ে যাবে বলে সিঁড়ি দিয়ে নামছিল সেই সময় তাকে ধরে ফেলা হয়। চীৎকার করে বলছে তার ছবি তোলার জন্যে আপনার কাছে যেতে ভুলে গেছে। হ্যাঁ, খুব দুঃখের ব্যাপার।

কিন্তু জেনকিন তার ষ্টুডিওতে ফিরে গেল না। ঘরে তার সারারাত আলো জ্বলতে লাগল। পাশের একটা ছোট ঘরে সে রাত কাটিয়ে দিল। পরেরদিন সে তার সহকারীকে ছবির প্লেটটা ধুতে দিল। এটাতে দোষ হয়েছে স্যার, জবাব এল। কোন ছবি নেই কেবল একঝলক আলো—অস্বাভাবিক রকম উজ্জ্বল।

যা পার প্রিণ্ট কর, জেনকিন বলল। ছ'মাস পরে জেনকিন হঠাৎ একদিন সেই প্লেট ও প্রিণ্টটা দেখল। সে আশ্চর্য হয়ে গেল দুটো থেকেই আলোর রেখা অদৃশ্য হয়ে গেছে। সেই অস্বাভাবিক রকমের উজ্জ্বলতা যে সেগুলোতে কখনও ছিল তা দেখে মনে হয় না।

The deferred appointment—*Algernon Blackwood*

জীবন্ত ছবি

মিলিগান নোংরা ঘরগুলো ঘুরে ঘুরে দেখছে, মনে মনে ভাড়ার হিসেব করছে, আর সত্যিই ভাড়া নেবে কিনা ভাবছে। বাড়িওয়ালা পেছনে পেছনে রয়েছে। তার হাত দুটো বুকের ওপর জোড়া করে রেখে মনোযোগের সঙ্গে লোকটাকে পর্যবেক্ষণ করছে। যদিও তার দিক থেকে মিলিগানকে বোঝাবার চেষ্টা করছে।

মিলিগান একটা পর্যটন এজেন্সীর করণিক। অবসর সময়ে সে সিনেমার জন্যে গল্প লেখে। এই অতি সাধারণ বাড়িটা তার কাছে আকর্ষক হয়ে উঠেছে তার কারণ ঘরগুলোতে বড় বড় ভাঁজ করা দরজা আছে। সত্যিই এখন যা প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে তা হচ্ছে একটা শোয়া ও বসার ঘর সেইসঙ্গে প্রাতরাশের ব্যবস্থা। হঠাৎ সামনের ঘরটায় বসে সুন্দর ছবির মত দৃশ্য তার চোখের সামনে ফুটে উঠল। এটা তাকে প্রলুব্ধ করল।

আপনার দরটা খুব বেশী মনে হচ্ছে মিসেস—। সে দর কষাকষি শুরু করল।

বোষ্টক স্যার, মিসেস বোষ্টক। এই বলে সে দুর্মূল্যের বাজারে তার দুঃখের কথা বলতে আরম্ভ করল।

মিলিগান সেকথায় মোটেই কান দেয়নি। সে তখন মনে মনে ঘরগুলো নেবার মনস্থ করেছে। মিসেস বোষ্টক বকে চলেছে। লোকটার দৃষ্টি পড়ল দেয়ালের ওপর—সেখানে টাঙানো একটা ছবি। একটা ছোট লেকে নৌকোর ওপর বসে একজন চীনা। কেবলমাত্র একবার দৃষ্টি দিল সে ছবিটায়, আর বেশী কিছু নয়। এবার মিসেস বোষ্টকের দিকে তাকানোই ভাল। মুহূর্তে বাড়িওয়ালা তার দৃষ্টি অনুসরণ করে বুঝতে পারল।

আসল কথা থেকে চট করে সরে গিয়ে বলতে লাগল—আমার স্বামী চীন থেকে ওটা এনেছে। আসলে হংকং থেকে।

লোকটা উপলব্ধি করল এই ছবিটার ওপর তার গর্ব আছে। সে বলল,

খুব চমৎকার। হয়ত এটার বেশ দামও আছে। এইসব চীনা নকসার কিছু কিছু খুব দামী বলে আমার মনে হয়।

যদিও সে জানত এই ছোট ছবিটার দু'শিলিংএর বেশী দাম নয় কিন্তু সে বোষ্টকের মনের ভাব বুঝে এক শিলিং ভাড়া কমাবার জন্যে পীড়াপীড়ি করতে লাগল। সে বুঝতে পারল তার মৃত স্বামী যে একজন জাহাজের ক্যাপ্টেন ছিল নিশ্চয়ই চুরি করে এনেছে। এটা তার কাছে এখন স্বর্ণ ডিম্বের মত, যদি সে কখনও কষ্টে পড়ে ছবিটা বিক্রি করে টাকা পেতে পারে।

সেই ঘরে থাকতে থাকতে দিনের পর দিন এই ছবিটা তার মনে কি যেন দাগ কাটে। তার গল্প ভাবতে ভাবতে প্রায়ই সে ছবিটার দিকে তাকিয়ে থাকে। ঐ টানা ঘরের দিকে পেছন করে নৌকোয় বসে দাঁড় টানছে ত; টানছেই; শান্ত লেকের জলে না তাকিয়েই দাঁড় টেনে চলেছে।

যখনই মিসেস বোষ্টক তার সঙ্গে গল্প করে মিলিগানের দৃষ্টি তার ওপরে না দিয়ে ছবিটার দিকে ফেলে রাখে। সে বলে, আপনার ছবিটা আমার খুব ভাল লাগে। এমন জীবনযাপন করা খুব সুন্দর। তার রুমাল দিয়ে ছবিটার ঝুল পরিষ্কার করে। আজকালকার দিনের থেকে এটা ভাল। আমার বলতে দ্বিধা নেই, এর কিছু মূল্যও আছে।

একবার মিলিগানের হাতে একটা চীনা বই এসেছিল। সেটা পড়ে তা থেকে সিনেমার ছবি করার মত কোন গল্প সে পায়নি। কিন্তু একটা গল্প তার বেশ মনে পড়ছে—গল্পটা হচ্ছে নৌকোয় চড়ে একটা মনোহর ছবি। একজন লোক ছবিটার মধ্যে লোকটাকে নড়াচড়া করতে দেখেছিল। লোকটা সত্যিই দাঁড় বাইতে শুরু করেছিল। শেষে লোকটা দাঁড় বেয়ে ছবিটা থেকে বেরিয়ে আসে, যেখান থেকে লোকটা দেখছিল—সেই মন্দিরে ছবির লোকটা আসে।

মিলিগান এটা একটা গাঁজাখুরি বলে উড়িয়ে দিলেও কিন্তু মন থেকে একেবারে ঝেড়ে ফেলতে পারেনি। তার মাথার মধ্যে জীবন্ত হয়ে আছে। রাস্তায় কোন চীনা লোকের দেখা পেলে এমনকি চীন অথবা জাপানের কোন টিকিট বেচার সময় এটা তার মনে পড়ত। হঠাৎ মনের মধ্যে জেগে উঠে কিছুক্ষণ থেকে আবার মিলিয়ে যেত। মিসেস বোষ্টকের ঘরে ছবিটা প্রথমে দেখে সেই গল্পটা মনের মধ্যে আবার জেগে ওঠে।

একটা ব্যাপার মিলিগানের মনে হয়েছিল, যে লোকটা গল্পটা লেখে এই ছবিটা সেটাই হতে পারে। কিছুই অসম্ভব নয়। এটা খুবই পুরনো ছবি। গল্পে যেমন বর্ণনা করা হয়েছিল ঠিক সেরকম। আশ্চর্য! কেনই বা হতে পারে না!

গ্যাসলাইট জ্বালিয়ে অনেকরাত অবধি বসে বসে লেখে মিলিগান। আলোর ছায়াটা কেঁপে কেঁপে ঘরের চারিদিকে পড়ে। কখনও কখনও ছায়াটা ছবির ওপরেও পড়ে কাঁপতে থাকে। কখনও জল কাঁপছে, নৌকো দুলছে, পিঠ

দুলছে, হাত নড়ছে বলে মনে হয়। কল্পনার মনে জলের ওপর দিয়ে চীনা দাঁড় টেনে নৌকো বাইছে।

তখন রাত দুটো। লণ্ডনের রাস্তা নিঝুম নিস্তব্ধ। সমস্ত শহর যেন কম্বলে মুড়ি দিয়ে শুয়ে রয়েছে। একটা অদ্ভুত উত্তেজনা মিলিগান অনুভব করে। তার মনের মধ্যে ছবিটা স্পষ্ট হয়ে উঠছে। হঠাৎ তার দৃষ্টি পড়ে ছবিটার ওপর।

আরে চীনাটা জীবন্ত। হা ভগবান। সে ছবিতে নড়ছে। সে জায়গা পালটেছে। মনে একটা শিহরণ সঞ্চার করছে। এই সুযোগ আমাকে নিতেই হবে।

এখান থেকেই শুরু হল মিলিগানের বিস্ময় ও ভীতিসূচক [illegible] দেশ ও চীনা জিনিসের ওপর তার একটা অদ্ভুত আকর্ষণ ক্রমেই বেড়ে উঠতে থাকে। সেই দেশ সম্বন্ধে নানা বই পড়ে, লোকদের সঙ্গে নানা বিষয়ে আলোচনা করে, ইতিহাস নাড়াচাড়া করে, সে ভালো সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হয়। [illegible] পাবার জন্যে তার মন ছটফট করতে থাকে। দিনরাত এই ভাবনা [illegible] শান্তি নেই। আসলে সময়, অর্থ ও সুযোগের অভাবে চীনযাত্রা তার পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠল। যদিও সে লণ্ডনে থাকত কিন্তু তবু যেন সে চীনে বাস করতে লাগল, কারণ মানুষের মন যেখানে ঘুরে বেড়ায় চেতনাও তাকে অনুসরণ করে।

মিলিগান তার গল্প লেখার কথা ভুলে গিয়ে একদৃষ্টিতে ছবির দিকে চেয়ে বসে থাকে। ছবিটার খুঁটিনাটি সবকিছু দেখে। এটা তার কাছে একটা প্রতীক হয়ে দাঁড়াল—তার অপূর্ব বাসনা এই ছবি দিয়েই সে মিটিয়ে নিতে চায়।

হঠাৎ ছবিটায় একটা পরিবর্তন তার নজরে পড়ল। এতদিন ধরে সে দেখে এসেছে নৌকোর ওপরের লোকটার পেছন দিকটাই দেখা যায়। একদিন রাতে মিলিগান লোকটার মুখ দেখতে পেল। মাথাটা তার ঘুরে গেছে। ঘরের দিকে সে চেয়ে রয়েছে। মিলিগানের কাছে এটা কি রকম অদ্ভুত লাগল। সে আশ্চর্য হয়ে গেল।

এই সময় থেকেই ছবির মধ্যে অদল বদল হতে লাগল। মিলিগান ধরতে পারল না ঠিক কখন এরকম অদল বদল হয়। মুখটা ঘোরানো অবস্থায় রইল, যদিও দেহটা নড়ল না। কিন্তু দাঁড় এবং নৌকো, হাতের অবস্থা, তাদের আকৃতি যেন দিনের দিন বদলাতে লাগল।

মারাত্মক দ্রুতভাবে এসবের পরিবর্তন হতে লাগল। চীনার দেহটা বড় হচ্ছে। নৌকোটাও বড় হচ্ছে। সেগুলো যেন আরো কাছে আসছে। মিলিগানের মনে ভয় হল সেগুলো আসছে যেন তাকেই নিয়ে যেতে। যখনই সেই ছবিটার দিকে সে দেখছে তখনই কিছু কিছু পরিবর্তন লক্ষ্য করে মুখে ঘাম

জমে যাচ্ছে। এটা আতঙ্কজনক হলেও তবু যেন কিছুটা আনন্দ উপভোগ করার মত।

সেই সময় মিসেস বোষ্টক অসুস্থ হয়ে বিছানায় পড়ে রয়েছে। একবারও সে ঘরে ঢোকেনি। এমনকি কোন চাকর বা তার কোন বন্ধুও আসেনি। কোন বন্ধুকে তার ঘরে ঢোকাতে সাহস পায়নি। তবে যে মেয়েছেলে ঘর পরিষ্কার করে প্রথমে সে কিছু না দেখলেও পরে আর একজনের ছবিটা নজরে এসেছিল কিন্তু তাকে কোন প্রশ্ন করার ইচ্ছা মিলিগানের হয়নি।

দিনের পর দিন সে লক্ষ্য করতে লাগল চীনা লোকটা দাঁড় বেয়ে নৌকো চালাচ্ছে—ধীরে ধীরে দাঁড় টানছে—কাছে, আরো কাছে আসছে। মিলিগান দেখছে, সেও অপেক্ষা করছে।

লোকটা দাঁড় টানতে টানতে ঘরের মধ্যে আসছে, একেবারে ঘরের ভেতর। মিলিগানকে নিয়ে যেতেই যেন সে আসছে।

কিছুক্ষণ পরে মিলিগানের মনে হল সে ছবির মধ্যে চীনা লোকটার পাশে বসে আছে, গতিহীন। পরের পর ভাড়াটে এসে তাকে দেখছে। সেই ছোট নৌকোর মধ্যে সে বসে—খুব ছোট। তুলি দিয়ে রং করা—তবু জীবন্ত। শান্ত চীনের লেকের জলে সে ভাসছে—সে ভেসেই চলবে যতক্ষণ পর্যন্ত না কাল অথবা মৃত্যু এটাকে না ধ্বংস করে।

রাত কেটে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই মিলিগানের সম্বিৎ ফিরে এল। সে এতক্ষণ নাচের ঘরে বসেছিল। ভোর চারটের সময় নিচের হলঘর থেকে তার ঘরে গেল। খুবই পরিশ্রান্ত মনে হচ্ছে নিজেকে! ঘরে ঢুকে গ্যাসের আলো জ্বালিয়ে দিল। তারপরে আয়নায় গিয়ে সে একবার নিজের চেহারা দেখল। আশ্চর্য! আয়নায় দেখল তার পেছনে সেই চীনা লোকটা আর নৌকোটা—বিরাট তাদের চেহারা। চীনা লোকটা ঘরের মেঝেয় দাঁড়িয়ে রয়েছে ম্যাণ্টেলপিসের সামনে লেকের জলে। ঘরের দেয়াল নেই—চারদিক ধোঁয়াটে হয়ে রয়েছে! চীনা লোকটার পায়ের কাছে নৌকোটা রয়েছে—দুপাশে দাঁড দুটো জলের মধ্যে—হালটা দড়ি দিয়ে বাঁধা। তার পা দুটো জলের মধ্যে, মিলিগানেরও পা জলে। তার জুতোজোড়া শুধুমাত্র জলে সপ্‌সপ্‌ করছে তাই নয়, সে শুনতে পাচ্ছে ছোট ছোট ঢেউগুলো তীরে আছড়ে পড়ছে।

মিলিগান একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। বিরাট চীনা লোকটা মৃদু হেসে তার হলদে মুখটা নাড়িয়ে তাকে ডাকছে, আর ধীরে ধীরে পিছু হটে চলেছে। মিলিগান তার ডাকে সাড়া দিল। তাকে অনুসরণ করল—নৌকোয় পা দিল। চীনা লোকটা দাঁড় তুলে নিয়ে ধীরে ধীরে বাইতে লাগল—খুব ধীরে—শান্ত লেকের জলের ওপর দিয়ে এগিয়ে যেতে লাগল—ক্রমে ক্রমে ছবির মধ্যে চলে গেল।

দশ বছর আগে চীনে থাকাকালীন আমার বন্ধু মিলিগান আমাকে এ ঘটনা

বর্ণনা করেছিল। চীন থেকে ইংলণ্ডে ষ্টীমারে ফেরবার সময় তখনও তার সেই অদ্ভুত কাহিনী আমার মনে উঁকি দিচ্ছিল। আমি এখনও দেখতে পাচ্ছি মিলিগান তার ব্যয়বহুল বাড়ির বড় ষ্টাডিরুমে বসে আছে। তার চতুর ব্যবসায়ী বুদ্ধিতে টাকা রোজগার করে এই বাড়ি তৈরি করেছে। যে-মুহূর্তে সে ছবির মধ্যে ঢুকেছে তার সমস্ত স্মৃতিশক্তি হারিয়ে ফেলেছে। তার ব্যক্তিরূপে অস্তিত্ব থাকলেও আমার মনে হয়েছিল কোথায় যেন কিছু একটা গণ্ডগোল রয়ে গেছে। প্রচুর ধনী হয়ে অনেক বছর চীনে বাস করার পর আবার তার সবকিছু ফিরে পেয়েছে। শুধু বছরের ব্যবধানটাই রয়ে গেছে।

তার গল্পটা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আমার মনে ছিল। আমার পকেট বইতে মিসেস বোষ্টকের বাড়ির ঠিকানাও লেখা ছিল। আমি ভগবানের কাছে প্রার্থনা করলাম সে যেন বেঁচে থাকে এমনকি এই দশ বছর পরেও সে যেন জড়াগল্প হয়ে বেঁচে থাকে।

ভাগ্য আমার সহায় হল। মিসেস বোষ্টকের বাড়ির সন্ধান পেলাম। সে বেঁচে আছে। ঘরগুলোয় কোন ভাড়াটে নেই। আমি ঘুরে ঘুরে ঘরগুলো দেখলাম।—ছবিটাও দেখতে পেলাম।

মিসেস বোষ্টকের বাড়ি যাওয়ার আগে আমি ব্রিটিশ মিউজিয়ামে পুরনো খবরের কাগজ দেখতে গিয়েছিলাম। দেখলাম কেবলমাত্র লেখা আছে—জেমস মিলিগান নিখোঁজ। নির্দিষ্ট কোন কারণ বা সূত্র দেওয়া নাই। নানা মিথ্যা বর্ণনা দেওয়া আছে, কেউ আবার ক্রাইমও মন্তব্য করেছে। মিলিগানের কেসটা যেন একেবারে 'নিশ্চিহ্ন ঘটনা' সেই সঙ্গে প্রতিশোধেরও ছোঁয়া আছে।

মিলিগান যেভাবে ঘরগুলো দেখেছিল, মিসেস বোষ্টক যেমন পিছু পিছু ঘুরেছিল, ঘর নেবার জন্যে পীড়াপীড়ি করেছিল, মিলিগান ছবিটা দেখে যে মন্তব্য করেছিল, তার জবাবে মিসেস বোষ্টক যা বলেছিল অবিকল তারই পুনরাবৃত্তি ঘটল।

পরের কথা বলতে গিয়ে আমার গলার স্বরটা কিছুটা কর্কশ হয়ে উঠল।

আমার কিছু চীনা চিত্রাঙ্কন সংগ্রহ করা আছে। আপনি যদি বিক্রি করতে চান, হয়ত—।

ওঃ, অনেকে এটা কিনতে চেয়েছে।

অতি সহজভাবেই সে মিথ্যা বলল, আশা করল দামটা আরো বাড়ুক। আমি পাচ পাউণ্ড দর দিলাম। ছবির মূর্তির জন্যে আরো পাচ পাউণ্ড দাম বাড়ালাম।

খুব শান্ত কণ্ঠে বললাম, ঐ মূর্তিটা এত ভাল বুঝলে কিনা। চীনা শিল্পীরা কখনও জবরজঙ ছবি করে না। এখন, ঐ একটা মূর্তির বদলে যদি দুটো মূর্তি থাকে দামটা তাহলে অবশ্যই কমে যাবে—এই বলে আমি ছবির আরো কাছে এগিয়ে গেলাম, আশা করলাম সেও আমাকে অনুসরণ করুক।

মিসেস বোষ্টক আমাকে অনুসরণ করল। আমি তার লোভ বাড়িয়ে দিলাম। এমনকি তার সত্যতাও যাচাই করলাম। আমরা পাশাপাশি ছবিটার নিচে এসে দাঁড়ালাম। দুজনে ছবিটা পরীক্ষা করতে লাগলাম।

পাঁচ পাউণ্ডের কথা বলতে মহিলাটি দেহটাকে নড়িয়ে হাঁ করে একটু শ্বাস নিল। যেটা সে আমাকে বিক্রি করতে চায় তার খুব কাছে দাঁড়িয়ে প্রথমে বোবা হয়ে গেল। হ্যাঁ, প্রথমে। কিন্তু মুহূর্তপরেই তার মুখ থেকে একটা অদ্ভুত স্বর বেরিয়ে এল, কান্নার মত হলেও সে শব্দটা আসলে শ্বাসপ্রশ্বাসের হিসহিস শব্দ। মুখটা তার হাঁ হয়ে গেল, চোখ দুটো ঠিকরে বেরিয়ে এল। টলমল করে কাঁপতে কাঁপতে একটা হাত আমার হাতের ওপর ভর দিয়ে পড়ে যাওয়া থেকে রক্ষা পেল। সে আরো কাছে এগিয়ে গিয়ে ছবিটার ওপর তার মাথা ঝুঁকিয়ে দেখতে লাগল। দৃষ্টিশক্তিক্ষীণ চোখ দুটো দিয়ে জোর করে দেখার চেষ্টা করতে লাগল। চামড়া তখনই ফ্যাকাসে হয়ে গেছে।

ওরা দুজন! ভীষণ আতঙ্কে ফিসফিস করে কথাগুলো বলল। ওরা দুজন! আমাকে বাঁচাও! ও ভগবান! অন্যটা সে!

তাকে ধরবার জন্যে আমি তৈরি হয়েইছিলাম। ভেবেছিলাম সে বুঝি অজ্ঞান হয়ে যাবে। তাকে নিজের জ্ঞান হারিয়ে ফেলবার উপক্রম হল। সে দুলতে লাগল, তার আতঙ্কিত মুখটা আমার দিকে ফেরাল।

মিঃ মিলিগান! ভয়ার্তস্বরে সে আর্তনাদ করে উঠল! তারপরই সাধারণভাবে বলল, ও মিঃ মিলিগান! এতদিন ধরে সে ওখানে আর একবারও লক্ষ্য করিনি।

সে জ্ঞান হারিয়ে ফেলল।

দ্বিতীয় মূর্তিটা ঘরের দিকে তাকিয়ে। নৌকোটা পেছনের দিকে ঠেলে নিয়ে যাওয়ার মত দেখাচ্ছে, দাঁড় টানা হচ্ছে না। মুখের আদল সন্দেহাতীত।

· আধঘণ্টা পরে আমি পিকিংয়ে টেলিগ্রাম করলাম—নৌকোয় দুটো মূর্তি।

চরম পরিণতিটা ঘটল তিনদিন পরে। যখন আমি ছবিটা অক্ষত অবস্থায় আমার ঘরে এনে বিশেষজ্ঞদের ডাকিয়ে পরীক্ষা করালাম। একজন কেমিষ্ট, একজন অভিজ্ঞ ব্যবসায়ী ও মনোবিদ্যা বিষয়ক গবেষণায় অভিজ্ঞ—এই তিনজন আমার পৌঁছবার আগেই ওপরের ঘরে বসেছিল।

ছবিটা আমার শোবার ঘরে ছিল। ঘণ্টার পর ঘণ্টা আমি নিজে সেটা পরীক্ষা করলাম—মিলিগানের মুখ ও দেহ পরীক্ষা করলাম—ভয়ে আমার গায়ের চামড়া কুঁকড়ে উঠছে, মাথার চুল খাড়া হয়ে উঠছে। আমার অতিথিরা বসার ঘরে অপেক্ষা করছে—চাকর এসে খবর দিল সেইসঙ্গে একটা টেলিগ্রাম আমার হাতে দিল। আমার তিন বন্ধুরা পরস্পরকে চিনত। আমার দেরি হওয়ার জন্যে তাদের কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে নিয়ে ছবিটা তাদের সামনে একটা ছোট টেবিলের ওপর রাখলাম। সেটা দেখার পর তাদের আমি কাহিনীটা শোনাতে

চেয়েছিলাম। অন্য দুজন চলে গেলে আমি তাদের পেছন থেকে সেটা দেখেছিলাম।

ছবিতে একটা মূর্তিই দেখা যাচ্ছে—সেটা হচ্ছে চীনা লোকটির। একাকী ছোট নৌকোয় বসে রয়েছে। দাঁড় টানছে, পেছনে ঠেলছে না। ঘরের দিকে সে পেছন করে আছে।



ব্যবসায়ী বলল ছবিটার এক শিলিংয়ের বেশী দাম নয়। কেমিষ্ট কিছু বলল না। আমিও চুপ করে রইলাম। কিন্তু গবেষক হঠাৎ ঘুরে নালিশ জানাল আমি নাকি তাকে আঘাত করছি। ব্যাপারটা ঘটেছিল যে হাতটা আমার কাছের একজনের কাঁধ চেপে ধরেছিল আর সেটা নাকি তারই। দুজন চলে যাবার পর তাকেও আমি ছেড়ে দিলাম।

ঘরে তখন আমি একা। সামনের টেবিলের ওপর সেই ভয়ঙ্কর ছবিটা পড়ে রয়েছে। সেইসময় হঠাৎ আমার টেলিগ্রামটার কথা মনে পড়ল। সেটা আমার তখনও হাতেই ধরা। এটার ওপর কৌতূহলী না হয়ে মনটাকে শক্ত করে তোলবার জন্যেই হয়ত আমার আঙুলগুলো খামটা ছিঁড়ে ফেলল। পিকিং থেকে এসেছে, মিলিগানের এক বন্ধু আমাকে পাঠিয়েছে :

মিলিগান গতকাল হৃদক্রিয়া বন্ধ হয়ে মারা গেছে।

The man who was Miligan—*Algernon Blackwood*

নিশার আলো

চাক এ্যাডামস ও তার মার জানালায় দাঁড়িয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। পাতলা কুয়াশা ধীরে ধীরে পাহাড়ের ওপর থেকে নেমে আসছে। চাদরের মত গাছপালা ঢেকে যাচ্ছে। আলো-আঁধারির মধ্যে তারা দুজন যেন হতাশায় ভেঙে পড়া ভূতের মত দাঁড়িয়ে রয়েছে। বাইরের এই অসহ্য আব-হাওয়ায় মনমরা হয়ে চাক জানালা থেকে সরে গেল।

তার মাও তার পাশে এসে মৃদুহাস্যে বলল, বৃষ্টি, কুয়াশা আর হেরিং মাছ। আমি ভেবে পাচ্ছি না স্কটল্যাণ্ডের এইসব দ্বীপগুলোয় সূর্যের মুখ দেখা যাবে কি না। বাছা, আবার কি আমি লং আইল্যাণ্ড দেখে খুশি হব।

একটু থেমে আবার বলল, তবে সেরকম কিছু খারাপ মনে হয় না, চাক। হেব্রাই ডিস-এর বাসিন্দারা যারা সারা বছর এখানে থাকে অন্তত এ আব-হাওয়াকে কিছু ভয় করে না। তাছাড়া তোমার বাবার সরকারের তরফ থেকে জরিপ হওয়া পর্যন্ত আমরা ত এখানে কয়েক সপ্তাহ মাত্র আর আছি।

এই অবস্থাতেই বাবা তাড়াতাড়ি কাজ সেরে উঠতে পারবে না। বাজে কথা বলছি না, আচ্ছা তুমি কি এমন ঝিমুনো জায়গা কখনও দেখেছ?

সত্যিই জায়গাটা খুব শান্ত, চাক। আর হেরিং-এর জিনেদের পক্ষে ত নয়ই। তোমার বাবাকে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট হেরিং মাছ ধরার ও সংরক্ষণ করার প্রণালী বাতলাবার জন্যে আমন্ত্রণ জানিয়েছে। এর অর্থ স্কটল্যাণ্ডের লোকেরা আরো বেশী মাছ পাবে।

তারা আমার ভাগটাও নিতে পারে, যেকোন সময়। বেশ একটু বিরক্তিভরে কথাগুলো বলে সে জানালায় গিয়ে বাইরের নিরানন্দ দৃশ্যের দিকে হতাশভাবে তাকিয়ে রইল।

কুয়াশা কিছুটা দূর হয়েছে, ধূসর মেঘগুলো প্রবল বেগে ছুটে চলেছে, পাহাড়ের মাথার থেকে সাপের মত এঁকেবেঁকে কুয়াশা আকাশের দিকে উঠছে। কি জায়গা!

হঠাৎ চাক লক্ষ্য করল একটা ছেলে সরু পথ দিয়ে তাদের বাড়ির দিকে আসছে। সে তার মায়ের দিকে হাসিমুখে তাকাল।

স্যাণ্ডি ম্যাকলান আসছে সাপ্তাহিক কাগজ নিয়ে। কি করে খবর ভর্তি করে কাগজে ভেবে আমি শিউরে উঠি।

সে দরজা খুলে কাল চুলওলা যুবককে অভ্যর্থনা জানাল।

বেশ হাসিখুশির দিন তাই না? শান্ত পাহাড়ী স্বরে স্যাণ্ডির সুর ওঠানামা করল। এই আমেরিকান ছেলেটা যেমন ভেবেছিল সব স্কটদের মত তার

প্রাদেশিক ভাষা বোঝা শক্ত কিন্তু তার কাছে কিছু শক্ত মনে হল না।

হাসিখুশির দিন? চমকে উঠে চাক পুনরাবৃত্তি করল। স্রাকাক্ষণ বৃষ্টি হচ্ছে!

স্কট ছেলেটাব ঠোঁটে হাসি এসে মিলিয়ে গেল। হ্যাঁ, কিন্তু এখনই সূর্য দেখা দেবে, চাক। বাতাস, রৌদ্র, বৃষ্টি; এই দ্বীপে নানা প্রাকৃতিক পরিবর্তন দেখতে পেয়ে আমরা ভাগ্যবান।

চাক মনে মনে ভাবল, এর সঙ্গে তর্ক করা বৃথা। সে মোটেই বুঝবে না। তাছাড়া সে সত্যিই খুব খারাপ ছেলে নয। তার হাবভাব একটু বাশভারী তবে খুব মিশুকে। তারদিকে একবার আড়চোখে তাকিয়ে চাক দেখল ছেলেটা বেশ গাট্টাগোট্টা, চওড়া কাঁধ, উলের জামা গায়ে, মোটা শক্ত আঙুলে কাগজ ধরে রয়েছে।

স্যাণ্ডি, নতুন কিছু আছে? কাগজটা হাতে নিয়ে সামনের পাতায় চোখ বুলিয়ে জানতে চাইল চাক। মাঝে মধ্যে কিছু এখানে ঘটে নিশ্চয়ই।

হ্যাঁ একজন নতুন মন্ত্রী শীঘ্রই এখানে আসবেন, কিছু একটা হবে মনে হয।

চাক ক্লান্তভাবে মাথা নেড়ে কাগজটা টেবিলের ওপর ছুঁড়ে দিল। অন্যমনস্কভাবে বলল, আমি বুঝতে পারছি। স্কট বালকটি তাকে নীরবে লক্ষ্য করছে দেখে সে সঙ্গে সঙ্গে সজাগ হয়ে উঠল। খারাপ কিছু নয়, স্যাণ্ডি, স্কটল্যাণ্ড সমুদ্রতীরে একটা ছোট্ট দ্বীপ। এখানে এমন কি ঘটতে পারে মনে করি, এই যা। সে ভাবল সে তাকে কিছু আঘাত দেয়নি।

স্কট বালকটির চোখটা একটু চকচক করে উঠল। আজ এই দ্বীপে কিছু ঘটবে, সে শান্তভাবে বলল। যা সমস্ত আমেরিকান ওরকম হবে না।

কি ব্যাপার? চাক বিস্মিত হয়ে জানতে চাইল।

ওঃ ব্যাপার, যেমন ধর ভূতুড়ে ব্যাপার, বেশ চালাকীর সঙ্গে কথাগুলো বলল স্যাণ্ডি।

ভূত? তীক্ষ্মস্বরে বেরিয়ে এল চাকের মুখ থেকে। সে কি ঠিক শুনেছে?

স্কট বালক মাথা নেড়ে সায় দিল। তার চোরা রহস্যময়ভাবটা ঢেকে শান্ত, গলদেশীয় গর্বে ফুলে উঠল।

হাঁ, এমন অনেক কম জায়গা আছে যা কাল জনের ভূত সম্বন্ধে গর্ব করতে পারে।

তুমি আমাকে বলতে চাইছ না যে তুমি ভূত বিশ্বাস কর? চাক তার বিস্ময়ভাব চাপতে পারল না।

আজ থেকে তিনশ' বছর আগে ব্ল্যাক জন তার ছেলেকে সমুদ্রে যেতে দেখেছিল। সে আর ফিরে আসেনি। কিন্তু বুড়ো লোকটা বিশ্বাস করতে পারেনি তার ছেলে মারা গেছে। হ্যাঁ, তার শেষ কপর্দক পর্যন্ত তার ছেলের খোঁজে খরচ করেছিল। গরীব ও নিঃসঙ্গ অবস্থায় মারা গেলেও, সে বিশ্বাস-

ঘাতকতা করেনি। এখনও তার ভূতুড়ে দেহটা সমুদ্রের ধারে কবরে, জড়ানো কাপড় গায়ে, হাতে একটা লণ্ঠন নিয়ে রাতের বেলায় ছেলেকে ঘরে ফেরার জন্যে অন্ধকারে ঘুরে বেড়ায়।

সে একটু থামল, চোখে তার গর্বের ভাব। আবার বলল, আমি নিজে তাকে দেখেছি।

স্যাণ্ডির কথা শুনতে শুনতে বিস্ময়ে চাকের চোয়াল কেঁপে উঠতে লাগল।

তুমি ভূত বিশ্বাস কর? এর বেশী আর কিছু সে বলতে পারল না।

ব্ল্যাক জনের ভূত নিশ্চয়ই।

চাক ভাবল এ ব্যাপারে বেশী কথা বলা পাগলামী। প্যাণ্টের পকেটে হাত ঢুকিয়ে মুখে শিষ দিতে দিতে জানালার কাছে চলে গেল।

তুমি ভাবছ চাক, ব্ল্যাক জনের কোন অস্তিত্ব নেই? শান্ত চেহারার এই পার্বত্য দেশের বালকের স্বরে কোন অসন্তুষ্টি বা বিরক্তিভাব নেই। কেবলমাত্র ভেতরে চোকা চোখ দুটো চকচক করে জ্বলছে।

চাক কাঁধ ঝাঁকিয়ে কিছু বলার আগেই দরজা খুলে গেল এবং তার বাবার স্নেহভরা কণ্ঠ ভেসে উঠল।

বাছা, আমি ক্লান্ত! আজ সকালে সমুদ্রে খুব ঠাণ্ডা। জুতো খুলতে খুলতে তার দৃষ্টি পড়ল স্কট বালকটির ওপর। এই যে স্যাণ্ডি! আমাদের সঙ্গে লাঞ্চের জন্যে থাক?

ধন্যবাদ, মিঃ এ্যাডামস। কিন্তু এখন যে আমার এই কাগজগুলোর ব্যবস্থা করতে হবে। সে দরজার কাছে গিয়ে থামল। বলল, অনেকেই খবরের জন্যে উদগ্রীব হয়ে আছে। শুভদিন, বিদায়।

ধীরে ধীরে দরজা বন্ধ হয়ে যেতেই চাক হতভম্ব হয়ে মাথা চুলকাতে লাগল। তার বাবাকে উদ্দেশ করে বলল, ভাবুন তো, আজও কেউ ভূতে বিশ্বাস করে? আমি স্যাণ্ডির মনে কোন আঘাত দিতে চাইনি কিন্তু এই ব্ল্যাক জনের ব্যাপারটা! সে হতাশভাবে মাথা নাড়তে লাগল।

ব্ল্যাক জন? ভুরু কুঁচকে চাকের বাবা কথাটা বলল। আমি তার সম্বন্ধে শুনেছি। এখানকার সেই নামজাদা লোক আমার মনে হয়। এই নামজাদা লোকের ব্যাপারে আজ গ্লাসগো থেকে আমাদের গভর্ণমেণ্টের কয়েকজন ইন্সপেক্টর এসেছে। মনে হয় কিছু চোরাই কারবার হচ্ছে।

নিশ্চয়ই এখান থেকে কেউ হেরিং-য়ের চোরাই কারবার করছে। বিড়বিড় করে চাক কথাগুলো বলে তার মায়ের লাঞ্চের খাবার সাজানোর দিকে চেয়ে রইল। আমি যদি বেশী খাই তবে ওরা আমাকে টিনের মধ্যে পুরে লেবেল সেঁটে আমেরিকায় চালান দেবে। ভয়ের ভান করে সে বলল।

সেইদিন বেলার দিকে আবার তার স্যাণ্ডির সঙ্গে দেখা হল। সে তখন তার ছোট্ট গ্রামের বাসায় যাচ্ছিল, চাককে দেখে সে দাঁড়িয়ে পড়ল।

চাকও তার দিকে তাকিয়ে রইল। ঐ ভূতুড়ে ব্যাপারটা নিষ্পত্তি করার এই সময়, সে ভাবল। শোন স্যাণ্ডি, আমি তোমার মনে ব্যথা দিতে চাই না তবে আমার ইচ্ছা তুমি ঐ ভূতুড়ে গল্প বন্ধ কর।

কিন্তু আমি নিজের চোখে দেখেছি বেন-য়ে-গ্রোর পাহাড়ের ওপর ভাঙা দুর্গ থেকে তাকে হেঁটে যেতে দেখেছি। স্যাণ্ডির মুখের শান্তভাব কেটে গিয়ে প্রতিবাদের ভাব ফুটে উঠল। হয়ত তুমি এখানে আগন্তুক বলে নিজে দেখতে ইচ্ছুক নও।

চাকের দেহের মধ্যে একটা রাগের ঝলক খেলে গেল।

ঠাকুরমার গল্পে ভয় পাব? যেকোন সময় তোমার পোষা ভূতের কাছে যেতে চাও, আমাকে জানিও স্যাণ্ডি।

তাহলে আজ রাতেই যাওয়া যাক। ঠোঁটে তার কৌতুকের হাসি মাখিয়ে তার কাছ থেকে বিদায় জানাল।

ঠিক আছে আজই রাতে। চাক গম্ভীরভাবে বলল। স্কট ছেলেটা তার সামনে থেকে লম্বা লম্বা পা ফেলে খুব সহজ ভঙ্গিতে বাড়ির মধ্যে ঢুকে গেল। ব্যাবিলনের লং আইল্যাণ্ডে যত ভূত আছে তার একটাও যে হেব্রাডিস-এ নেই সেটা স্যাণ্ডিকে বিশ্বাস করাবার আনন্দে চাকের মন নেচে উঠল।

সমুদ্রের ওপর থেকে ভারী কুয়াশার স্তর সরে গেছে, রাতটা বেশ পরিষ্কার এবং ঠাণ্ডা। চাক ও স্যাণ্ডি নিঃশব্দে ঝোপঝাড় পেরিয়ে কুয়াশার পর্বত বেন-য়ে-গ্রোর দিকে এগোচ্ছে। মেঘের ফাঁকে ফাঁকে চাঁদ দেখা যাচ্ছে। আলো-আঁধারীর পথে তারা এগিয়ে চলেছে। দূরে সমুদ্রের জল রূপোর মত চকচক করছে। নির্জন নিস্তব্ধ পাহাড়ের ধার ঘেঁসে যেতে যেতে আটলান্টিক সমুদ্রের ঢেউ ভাঙার শব্দ চাকের কানে এসে মাঝে মাঝে ধাক্কা মারছে। সে কেঁপে কেঁপে উঠছে।

তুমি ঠিক জানো স্যাণ্ডি বুড়ো জন আজ রাতে বাড়ি থাকবে? সে গলার স্বরটা স্বাভাবিক করার চেষ্টা করল। কিন্তু সে ভালভাবেই মালুম পাচ্ছে তার বুকের মধ্যে উত্তেজনায় হাতুড়ি পেটানো শুরু হয়ে গেছে।

হয়ত, আমরা দেখতে পাব।

স্কট ছেলেটা আর কোন কথা বলল না। চাকও কোন কথা না বলে তাকে নীরবে অনুসরণ করতে লাগল। কালো পাহাড়ের সরু দুর্গম পথ দিয়ে তারা উঠতে লাগল। হঠাৎ একবার চাক ভয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। তাদের পথ থেকে মাত্র এক ফুট পাশে এক বিরাট অতল গহ্বর। সেইদিকে চেয়ে সে আঁতকে উঠল। মাথা ঘুরে গেল। অতি কষ্টে সেদিক থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে চলার পথের ওপর রাখল। পায়ের তলায় টুকরো পাথর ভরা পথ শেষ হয়ে সমান্তরাল পথে এসে পড়ল। তারা পাহাড়ের মাথায় এসে পৌছল।

সেইসময় নিঃশব্দে স্যাণ্ডি চাককে টেনে বসিয়ে নিয়ে আঙুল দিয়ে একদিকে

দেখাল। চাকের দৃষ্টিতে যা পড়ল সেটা তার কাছে অবিশ্বাস্য মনে হল।
চাঁদের আলোয় স্পষ্ট দেখা গেল কালো ছায়ার এক প্রতিমূর্তি মাত্র



একশ' গজ দূরে একটা বিরাট কালো পাথর উঁচু হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। একসময় যেটা নামকরা হেব্রিডিয়ান দুর্গ ছিল আজ সেটা একটা ঝোপ জঙ্গলে ভরা, ভাঙা

পাথরের স্তূপ হয়ে পড়ে আছে। কিন্তু তার তিনটে বিরাট দেয়াল এখনও তার বাহ্যিক চাল প্রকাশ করছে। চারটে চূড়ার একটা সমুদ্রের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে। কিছু ধ্বংসের বিষণ্ণতা, কিছু ভয়াবহ ও অশুভ ইঙ্গিত কনকনে ঠাণ্ডার মধ্যেও চাকের কপালে বিন্দু বিন্দু ঘামের সৃষ্টি করেছে।

ব্ল্যাক জনের বাড়ি, চাপা উত্তেজনায় স্তাণ্ডির গলার স্বর কম্পিত। সেই দুর্গ থেকে অবর্ণনীয় ভয়াবহতাকে চাক আবার দমন করবার চেষ্টা করল। আবার সে কেঁপে উঠল।

তারা নিঃশব্দে বুকের ওপর ভর দিয়ে ছোট বাগানটা পেরিয়ে জড় করা পাথরের দিকে ধীরে ধীরে এগোতে লাগল। তিনশ বছর আগে এখান থেকেই ব্ল্যাক জন তার ছেলেকে বিদায় জানিয়েছিল। হঠাৎ দুর্গের চূড়ায় একঝলক আলো দেখা গেল। যেমন হঠাৎ দেখা গিয়েছিল তেমনি হঠাৎ চলে গেল।

ওটা দেখলে? চাকের চাপা দাঁতের ফাঁক দিয়ে কথাগুলো হিসহিস শব্দে বেরিয়ে এল।

স্তাণ্ডি নীরবে মাথা নাড়ল। এই হচ্ছে ব্ল্যাক জন, তার লণ্ঠন দিয়ে আলো দেখাচ্ছে। ফিসফিস করে সে বলল। ভয়ে আতঙ্কে চাকের দেহের চামড়া কুঁকড়ে উঠলো। জীবনে এমন ভয় সে কখনও পায়নি।

আবার একঝলক আলো দেখা গেল। তবে এবার সেটা দুর্গের চূড়া থেকে নয়, সমুদ্রের দিকের দেয়ালের একটা ছিদ্র থেকে।

তার ছেলের জন্যে সে এবার নিচে নেমে আসছে। চাকের হাতটা ধরে স্তাণ্ডি বলল।

চাক নীরবে মাথা নাড়ে। কথা বলতে তার ভয় হল পাছে উত্তেজনা তাকে বিশ্বাসঘাতকতা করে।

এই যে সে আসছে! ফিসফিস করে স্তাণ্ডির গলার আওয়াজ হল।

আবার চাক মাথা নেড়ে ঝোপের তলায় গুড়ি মেরে পড়ে রইল। আলোটা নড়তে নড়তে দুর্গ থেকে তাদের দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। ক্রমে ক্রমে একটা রোগা আকারহীন মূর্তি দেখা গেল। মূর্তিটার গায়ে লম্বা কালো, কবরের আচ্ছাদন জড়ানো—ব্ল্যাক জনের প্রেতমূর্তি!

সেই লম্বা মৃত পাহাড়ী সর্দার ধীরে ধীরে সমুদ্রের দিকে এগোতে লাগল—যে সমুদ্র তিনশ' বছর আগে তার ছেলেকে কেড়ে নিয়েছে, যে ঝোপের নিচে ছেলে দুটো লুকিয়েছিল সেখান থেকে কয়েক ফুট দূর দিয়ে সে হেঁটে গেল, শীর্ণ হাড় বেরকরা হাতে তার লণ্ঠন ধরা।

চল আমরা যাই, সেই ছায়ামূর্তি চলে যাবার পর স্তাণ্ডি ফিসফিস করে বলল। একটা মানুষের কষ্ট দেখা অশুভ। সে থামল। তারপর হঠাৎ বলল, শুনছ!

প্রথমে আস্তে আস্তে, পরে ক্রমশ উচ্চস্বরে হতাশায় ভরা একটা কাঁপা

আর্তনাদ পাহাড়ের ধারে দাঁড়ানো সেই রোগা মূর্তির মুখ থেকে ভেসে উঠছে।

ব্ল্যাক জন তার মরা ছেলেকে ডাকছে। এটা খুব খারাপ, চল আমরা যাই। স্যাণ্ডি চাপা স্বরে বলল।

এক মিনিট, স্যাণ্ডি। ভয় ও আতঙ্ক সত্ত্বেও চাক একটু অপেক্ষা করল। কিছুক্ষণ আগে ব্ল্যাক জনের প্রেতমূর্তি যাবার একটা কিছু তার নজর পড়েছিল। লণ্ঠনধরা হাড় বের করা আঙুলের মধ্যে একটা ছোট নীল আলো জ্বলজ্বল করছিল।

আচ্ছা স্যাণ্ডি, ব্ল্যাক জন যদি তার ছেলের জন্যে শেষ কপর্দক খরচ করেছিল, তবে সে আঙুলে হীরের আংটি পরে আছে কেন?

হীরের আংটি? স্যাণ্ডি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল। চাক ইসারায় তার আঙুলটা স্যাণ্ডির হাতে খোঁচা দিয়ে দেখাল।

দেখ স্যাণ্ডি, সে সমুদ্রে কাকে যেন সঙ্কেত করছে।

তারা আবার মাটিতে বুক দিয়ে একটা পাথরের আড়ালে লুকিয়ে রইল। খুব বেশী হলে দশ গজ দূরে কালো পোশাকে মুড়ি দেওয়া ব্ল্যাক জন লণ্ঠন দোলাচ্ছে।

ক্রমে ক্রমে মিনিট পার হতে লাগল। ছেলে দুটো অবাক বিস্ময়ে সেই ভূতুড়ে মূর্তির কাজ দেখছে। মাঝে মাঝে ব্ল্যাক জনের ভূতুড়ে আর্তনাদ সেই নিস্তব্ধতাকে ভেঙে টুকরো টুকরো করে দিচ্ছে। এই চীৎকার চাকের দেহের রক্ত হিমশীতল করে দিচ্ছে।

কিছুক্ষণ পর সেই ব্ল্যাক জন আবার ফিরে চলল দুর্গের দিকে। ছেলে দুটোও তাকে খুব সন্তর্পণে পেছনে অনুসরণ করে চলল। দুর্গের বাগানের মধ্যে সেই মূর্তিটা এসে কোথায় মিলিয়ে গেল। সেইসময় আকাশে চাঁদ মেঘমুক্ত হল। চাঁদের আলোয় তারা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে বাগানের চারধার দেখতে লাগল। কিন্তু কোথাও সেই মূর্তি দেখতে পেল না। আর সেখানে থাকার মত তাদের সাহস হল না। চাঁদের আলোয় পথ দেখে তারা দুজন লাগাল ছুট। সেই যে দৌড় দিল আর কোথাও না থেমে একদমে একেবারে চাকের বাড়ি এসে পৌছাল।

Ghost of Black John—*William Mackellar*

ক্যানটারভাইল ভুত

অ্যামেরিকান মিনিস্টার মিঃ হিরাম বি. ওটিস 'ক্যানটারভাইল চেস বাড়াটি কিনে যে নির্বুদ্ধিতার কাজ করেছেন এই কথাটা ঘরে পরে সবাই তাঁকে বলেছিল। কারণ বাড়ীটি যে ভূতুড়ে সেবিষয়ে কারও কোন সন্দেহ ছিল না। এমন কি ন্যায়নিষ্ঠ লর্ড ক্যানটারভাইল নিজে ও মিঃ ওটিস তাঁর সঙ্গে দরদস্তুর করতে এলে তাঁকে এবিষয়ে সাবধান করে দিয়েছিলেন।

লর্ড ক্যানটারভাইল বললেন—আমরা নিজেরাই ওই বাড়ীটা বাসের উপযুক্ত বলে মনে করি নি। একবার আমার বিধবা পিতামহী বোলটনের ডাচেস ডিনারের জন্যে পোশাক পালটাচ্ছিলেন, এমন সময় দুটি কঙ্কাল হাত এসে তাঁর কাঁধের ওপরে পড়ে। এই দেখেই ভয়ে তিনি মূর্ছা যান। আরও একটা কথা আপনাকে আমার বলা দরকার, মিঃ ওটিস: আমাদের সংসারের অনেকেই ওই ভূতটাকে দেখেছে, এমন কি স্থানীয় গির্জার রেকটর এবং কেম্ব্রিজের কিংস কলেজের ফেলো রেভা. অগস্টাস ড্যামপিয়রও বাদ যান নি। ডাচেসের সেই দুর্ভাগ্যজনক দুর্ঘটনার পর থেকে আমাদের ছোকরা চাকরদের কেউ আর আমাদের সঙ্গে ওই বাড়ীতে থাকতে রাজি হয় নি, আর রাত্রিতে বারান্দা আর লাইব্রেরীর দিক থেকে যে সমস্ত অদ্ভুত অদ্ভুত শব্দ আসতো সেই সব শব্দ শোনার পরে লেডী ক্যানটারভাইলেরও রাত্রে ঘুম হোত না।

মিনিস্টারটি উত্তর দিলেন—মি লর্ড, আসবাবপত্র আর ভূত দুজনকেই বাড়ীর সঙ্গে দাম দিয়ে আমি কিনে নেব। আমি যে দেশ থেকে আসছি সেটা হচ্ছে আধুনিক। সেখানে টাকা দিয়ে সবকিছু কেনা যায়। আজকাল ছোকরারা পুরনো পৃথিবীটাকে লাল রঙে চিত্র-বিচিত্র করে আর সেরা অভিনেত্রী আর নর্তকীদের তুলে নিয়ে গিয়ে বাহোবা লুটছে। আমার ধারণা যেরোপে ভূত বলে যদি কোন পদার্থ থেকেই থাকে তাহলে অতি শীঘ্রই আমরা তার জন্যে জনসাধারণকে আনন্দ দেওয়ার উদ্দেশ্যে হয় যাদুঘরের ব্যবস্থা করে দেব আর নয়ত রাস্তায় নিয়ে খেলা দেখাবো।

লর্ড ক্যানটারভাইল একটু হেসে বললেন—আমার বিশ্বাস ভূত রয়েছে, যদিও সে আপনাদের অতি উদ্‌যোগী সংগঠকদের প্রস্তাব হয়ত নাকচ করে দিয়েছে। তিনশ বছর ধরে ও এখানে বাস করছে—১৫৮৪ সাল থেকেই এক-রকম বলতে পারেন—এবং আমাদের সংসারে কারও মৃত্যুর আগেই সব সময়ে ও দেখা দিয়েছে।

লর্ড ক্যানটারভাইল, কারও মৃত্যুর আগে বাড়ীর ডাক্তারও তো আসেন। কিন্তু স্যার, ভূত বলে কোন বস্তু নেই। আমার ধারণা ব্রিটিশ অভিজাত

সম্প্রদায়কে খুশি কবার জন্যে প্রকৃতি তার কর্তব্যকর্মে অবহেলা করবে না।

মিঃ ওটিসের শেষ মন্তব্যটি অনুধাবন করতে না পেরে লর্ড ক্যানটারভাইল বললেন—আমেরিকাতে আপনারা খুব স্বাভাবিক অবস্থায় দিন কাটান, আর বাড়ীতে আপনি যদি ভূতের অস্তিত্ব স্বীকার না করেন তাহলে আমার অবশ্য বলার কিছু নেই। কেবল মনে রাখবেন এবিষয়ে আপনাকে আমি আগেই সাবধান করে দিয়েছি।

সপ্তাহ খানেকের ভেতরেই বাড়ি কেনার কাজ শেষ হয়ে গেল, মাসের শেষ নাগাদ মিনিস্টার আর তাঁর সংসারের সবাই সেই বাড়ীতে উঠে এলেন। মিসেস ওটিস এখন মধ্যবয়স্কা রমণী, চোখ দুটি আর চেহারা বড়ই সুন্দর। ইনি ছিলেন প্রাক-বিবাহিতা জীবনে ওয়েস্ট তিপ্পান্নতম স্ট্রীটের নিউ ইয়র্কের প্রখ্যাতা নর্তকী মিস লুক্রেসিয়া আর টাপান। দেশ ছাডার পরে অনেক অ্যামেরিকান মহিলাদের স্বাস্থ্যভঙ্গ হযে যায়—এককথায় তাঁরা হযে পড়েন চিররুগ্ন, তাঁরা মনে করেন এইটাই বুঝি য়েরোপীয় শালীনতা। কিন্তু মিসেস ওটিস সে ভুল কবেন নি। তাঁর স্বাস্থ্যটি বড চমৎকার ছিল। জৈব প্রেরণায় তিনি ছিলেন উদ্দাম। সত্যি কথা বলতে কি অনেকদিন থেকেই তিনি ছিলেন ইংরাজ রমণী। আজকাল এক ভাষা ছাডা অ্যামেরিকার সঙ্গে আমাদের যে অদ্ভুত একটা মিল রয়েছে তিনি ছিলেন তারই একটি উজ্জ্বল নিদর্শন। জাতীযতাবাদের উৎসাহে বাপ-মা তাঁদের বড ছেলের নাম দিয়েছিলেন ওয়াশিংটন। এর জন্যে অনুশোচনা তাঁরা কম করেন নি। ছেলেটির চুলগুলি বড় চমৎকার—দেখতেও মোটামুটি ভালই। পরপর তিনটি বছর নিউপোর্ট ক্যাসিনোতে জার্মানদের হারিয়ে অ্যামেরিকান কূটনীতিতে সে যথেষ্ট দক্ষতা অর্জন করেছিল। এমন কি লণ্ডনেও বেশ ভাল নাচিয়ে হিসাবে সে বেশ নাম করেছিল। মিস ভার্জিনিযার বয়স পনের—চঞ্চলা, হরিণ শিশুর মত সুন্দর, দুটি বড বড নীল চোখ—স্বাধীন আর বেপরোয়া। শক্তির দিক থেকেও একেবারে রণদুর্মদা। একবার টাট্টু ঘোড়ার ওপরে চেপে সে বৃদ্ধ লর্ড বিলটনের সঙ্গে দু'দুবার পার্কের চারপাশে দৌড়ে অ্যাকিলিসের প্রতিমূর্তির ঠিক সামনে হারিয়ে দিয়েছিল। এই দেখে চেশায়ারের যুবক ডিউক আনন্দে এতই উত্তেজিত হয়ে ওঠে যে সে সেখানেই তাকে বিয়ের প্রস্তাব করে। ফলে তার অভিভাবকেরা সেই রাত্রিতেই তাকে ইটনে পাঠিয়ে দেন। ডিউক কাঁদতে-কাঁদতে চলে যায় ইটনে। ভার্জিনিয়ার পরে দুটি যমজ ছেলে হয়। তারা সব সময় বন্‌বন্ করে ঘুরতো বলে তাদের নাম দেওয়া হয়েছিল 'দি স্টারস আর স্ট্রাইপস' বড় সুন্দর ছেলে দুটি। একমাত্র মিঃ ওটিস ছাড়া সেই পরিবারের ওরাই ছিল একমাত্র রিপাবলিকান।

ক্যানটারভাইল চেস সব চেয়ে কাছের রেল স্টেশন অ্যাস্কট থেকে সাত মাইল দূরে। মিঃ ওটিস একটা খোলা গাড়ীর জন্যে টেলিগ্রাফ করেছিলেন।

সবাই বেশ স্ফূর্তি ক'রে হইচই করতে-করতে গাড়ীতে উঠে বসলেন। জুলাই মাসের একটি সুন্দর সন্ধ্যা—পাইন বনের গন্ধে বাতাস একেবারে মাতোয়ারা। মাঝে-মাঝে বুনো পায়রার ডাক শোনা যাচ্ছিল। বীচ গাছের ভেতর দিয়ে তাঁদের দিকে তাকিয়ে দেখতে লাগল বাচ্চা কাঠবিড়ালেরা। ক্যানটারভাইল চেস-এর রাস্তায় ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে আকাশ হঠাৎ মেঘাচ্ছন্ন হয়ে গেল। নেমে এল বাতাসে একটা থমথমে ভাব। মাথাব ওপর দিয়ে একদল দাঁড়কাক নিঃশব্দে উড়ে গেল। বাড়ীতে পৌছানোর আগেই কয়েকটা বড়-বড় বৃষ্টির ফোঁটা ঝরে পড়লো।

একটি বৃদ্ধা মহিলা সিঁড়ির ওপরে নেমে এসে তাঁদের অভ্যর্থনা জানালেন। পরিধানে তাঁর কালো সিল্কের একটি পরিচ্ছন্ন পোশাক, মাথায় সাদা টুপী, আর পায়ে সাদা এপ্রোন। ইনি হচ্ছেন গৃহকর্ত্রী মিসেস উমনে। লেডী ক্যাণ্টারভাইলের অনুরোধে তাঁকেই মিসেস ওটিস তাঁর পূর্ব পদে বহাল রাখতে রাজি হয়েছিলেন। তাঁর পিছু পিছু তাঁরা সবাই সুন্দব টিউডর যুগের হলঘর পেরিয়ে লাইব্রেরী ঘরে এসে ঢুকলেন। ঘরটা হচ্ছে লম্বা, নিচু, কালো ওক গাছের প্যানেল দেওয়া ঘর। এখানেই চা-এর বন্দোবস্ত হয়েছিল। জামা খুলে তারা সবাই বসে চারপাশে তাকিয়ে দেখতে লাগলেন। মিসেস উমনে দাঁড়িযে-দাঁড়িয়ে করতে লাগলেন তদারকি।

হঠাৎ মিসেস ওটিস লক্ষ্য করলেন ফায়ার প্লেসের পাশে মেঝেব ওপরে হালকা ধরনের একটা লাল দাগ পড়ে রয়েছে! এর অর্থটা কী বুঝতে না পেরে তিনি মিসেস উমনেকে বললেন—ওখানে সম্ভবত কোন রঙ পড়েছে।

মিসেস উমনে নিচু স্বরে বললেন—হাঁ, মাদাম। ওখানে রক্তের ছিটে পড়েছে।

মিসেস ওটিস চীৎকার করে উঠলেন—কী বিপদ! বসার ঘরে ওরকম রক্তের দাগ আমি মোটেই বরদাস্ত করতে পারি নে। এখনই ওটা মুছে ফেলতে হবে।

বৃদ্ধাটি হেসে আগের মতই রহস্যজনক স্বরে বললেন—ওটা হচ্ছে লেডি এলিনোর দ্য ক্যানটারভাইলের রক্ত। ১৫৭৫ সালে ঠিক এই জায়গাতেই স্বামী স্যার সাইমন দ্য ক্যানটারভাইল তাঁকে হত্যা করেছিলেন। স্যার সাইমন তারপরে নটি বছর বেঁচেছিলেন। তারপরেই একদিন রহস্যজনকভাবে হঠাৎ তিনি নিরুদ্দেশ হয়ে যান। তাঁর দেহটিকে আজও খুঁজে পাওয়া যায় নি। তাঁরই প্রেতাত্মা এখন-ও এই বাড়ীতে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বিদেশী পর্যটক এবং আরও অনেকে এই রক্ত চিহ্নটির খুবই প্রশংসা করেছেন; আর ওটিকে আজ পর্যন্ত মুছে ফেলা সম্ভব হয় নি।

ওয়াশিংটন ওটিস চীৎকার করে বলল—যত সব আবোল-তাবোলের কথা! পিনকারটর চ্যাম্পিয়ন স্টেন রিমোভার এবং প্যারাগন ডিটারজেন্ট লাগালেই ও-রঙ উঠে যাবে।

সেই ভয়ার্ত গৃহকর্ত্রী কিছু বলার আগেই সে হাঁটু মুড়ে বসে কালো কসমেটিক এর মত একটা চিটচিটে বস্তু দিয়ে মেঝেটা ঘসতে সুরু করল। কয়েকমুহূর্তের মধ্যেই সেই দাগ উঠে গেল।

বিজয়গর্বে সে চেঁচিয়ে উঠলো—'আমি জানতাম এতেই কাজ হবে।' কিন্তু এই কথা বলার সঙ্গে-সঙ্গে হঠাৎ একটা বিদ্যুৎ চমকে উঠলো, সেই থমথমে ঘরের মধ্যে বিদ্যুতের ঝিলিক খেলে গেল—আর ভীষণ একটা বজ্রাঘাত তাঁদের সবলের আপাদমস্তক কাঁপিয়ে দিয়ে গেল। মিসেস উমনে তো সেই শব্দে ভিমি গেলেন।

অ্যামেরিকান মিনিস্টার শান্তভাবে বললেন—'সত্যিই কি ভয়ঙ্কর আবহাওয়া!' এই বলে তিনি লম্বা একটা চুরুট ধরালেন!—আমার ধারণা, এই পুরনো অঞ্চলটির লোকসংখ্যা এতই বেশী হয়ে গিয়েছে যে প্রত্যেকে ভাল আবহাওয়া পাচ্ছে না। আমি সব সময়েই বলে এসেছি এই সমস্যা সমাধানের একমাত্র উপায় হচ্ছে এদেশ থেকে জনতাকে বিদেশে পাঠিয়ে দেওয়া।

মিসেস্ ওটিস বললেন—প্রিয় হিরাম, যে মহিলা মূর্ছা যান তাঁকে নিয়ে আমরা কী করব?

ভাঙা জিনিসপত্রের মত ব্যবহার কর—তাহলে আর উনি মূর্ছা যাবেন না।

কিছুক্ষণের মধ্যেই মিসেস্ উমনের জ্ঞান ফিরে এল। তিনি যে বেশ বিব্রত হয়ে পড়েছিলেন সেবিষয়ে কোন সন্দেহ ছিল না। তিনি কঠোরভাবে মিঃ ওটিসকে এই বলে সাবধান করে দিলেন যে এই সংসারের ওপরে বিষম একটা বিপদ ঘনিয়ে আসছে।

তিনি বললেন—নিজের চোখে আমি অনেক জিনিস দেখেছি, স্যার। সেই সব দেখে যেকোন ক্রীশ্চানের শরীরেই রোমাঞ্চ জেগে উঠবে। এখানে যেসব ভয়ঙ্কর জিনিস ঘটেছে সেইসব দেখে রাত্রে আমি ঘুমোতে পারি নে।

মিঃ ওটিস এবং তাঁর স্ত্রী অবশ্য সেই সৎ মহিলাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন যে ভূতটুতকে তাঁরা ভয় করেন না। তাঁর নতুন মনিব-পত্নীর ওপরে ঈশ্বরের আশীর্বাদ বর্ষিত হোক এই প্রার্থনা করে আর সেই সঙ্গে মাইনে বাড়ানোর ব্যবস্থা করে বৃদ্ধা গৃহকর্ত্রী টলতে টলতে নিজের ঘরের দিকে এগিয়ে গেলেন।

সারারাত্রি ধরেই ভীষণ ঝড় চললো; কিন্তু বিশেষ কোন ঘটনা ঘটে নি। পরের দিন সকালে কিন্তু মেঝের ওপর আবার সেই রক্তের দাগটা দেখা গেল। ব্রেকফাস্টের সময় সবাই নিচে নেমে এসে ব্যাপারটা লক্ষ্য করল। ওয়াশিংটন বলল—'আমার মনে হচ্ছে এর জন্যে প্যারাগন ডিটারজেণ্টের দোষ নেই। এটা নিয়ে আমি অনেক পরীক্ষা করেছি। 'এর জন্যে নিশ্চয় ওই ভূতটাই দায়ী'। আবার সে ঘষে-ঘষে রক্তের দাগটা মুছে ফেললো; কিন্তু পরের দিন সকালে আবার সেই একই ব্যাপার ঘটলো। যদিও লাইব্রেরী ঘরে যথারীতি তালা দেওয়া ছিল, তৃতীয় দিন সকালেও সেই রক্তের দাগ দেখা দিল। এই দেখে সবাই বেশ কৌতূহলী হয়ে উঠলো। মিঃ ওটিস ভাবলেন ভূত নেই এ-বিষয়ে তাঁর

ধারণা কিছুটা বাড়াবাড়ি হয়ে পড়েছিল। মিসেস ওটিস মনে করলেন প্রেতাত্মা নিয়ে যাঁরা গবেষণা করেন তাঁদের দলে তিনি নাম লেখাবেন। অপরাধের সঙ্গে জড়িত রক্তচিহ্নের স্থায়িত্ব নিয়ে মেসার্স মেয়ারস আর পড়মোর কোম্পানীকে দীর্ঘ একটি চিঠি লেখার পরিকল্পনা গ্রহণ করল ওয়াশিংটন। সেই রাত্রিতেই ভূতের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সকলের সন্দেহ চিরদিনের জন্য দূর হল।

সারাটাদিনই যেমন রোদ উঠেছিল তেমনি ছিল গরম। সন্ধ্যায় সবাই মোটরে চড়ে বেড়াতে গিয়েছিল। রাত্রি ন'টার আগে কেউ ফেরে নি সেদিন। ফিরেই সামান্য আহার করেছিল সবাই। সেদিন ভূত নিয়ে কোন আলোচনা হয় নি। সুতরাং ভূতের অস্তিত্ব সম্বন্ধে ধারণা করার প্রাথমিক কোন শর্তও সেদিন ছিল না। মিঃ ওটিসের কাছে আমি শুনেছিলাম সেদিন তাঁদের আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল বিভিন্ন ধরনের, বিশেষ করে অবস্থাপন্ন অ্যামেরিকানরা যেসব বিষয় নিয়ে সাধারণত আলোচনা করে—যেমন, অভিনেত্রী হিসাবে সারা বার্ণদোতের চেয়ে মিস ফ্যান ড্যাভোনপোর্টের শ্রেষ্ঠতা, এমন কি অবস্থাপন্ন ইংরাজদের বাড়িতে সবুজ শস্য, বাকহুইট কেক, দুধে সেদ্ধ ভুট্টাচূর্ণের দুষ্প্রাপ্যতা; পৃথিবীর আত্মাকে বাঁচানোর জন্যে বোষ্টন বন্দরের প্রয়োজনীয়তা, রেল-ভ্রমণে গাঁটরি পরীক্ষা করার সুবিধা, লণ্ডনের বিরক্তিকর উচ্চারণের তুলনায় নিউ ইয়র্কের উচ্চারণের মিষ্টতা ইত্যাদি। অতি-প্রাকৃত ঘটনার সম্বন্ধে কোন আলোচনাই সেদিন হয় নি, এমন কি গল্পচ্ছলে স্যার সাইমন স্ত ক্যানটারভাইলের নাম উচ্চারণও কেউ করেন নি। রাত্রি এগারটার সময় সবাই শুয়ে পড়লেন; এবং সাড়ে এগারটার মধ্যেই ঘরের আলো সব নিভে গেল। কিছুক্ষণ পরে ঘরের বাইরে বারন্দার ওপরে একটা অদ্ভুত শব্দে মিঃ ওটিসের ঘুম ভেঙ্গে গেল। শব্দটা শুনে মনে হল ধাতুতে ধাতুতে ঠোকাঠুকির শব্দ। আরও মনে হল শব্দটা ক্রমশ তাঁর ঘরের দিকেই এগিয়ে আসছে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি বিছানা থেকে উঠে দেশলাই জ্বালিয়ে সময়টা দেখে নিলেন। ঘড়িতে তখন কাঁটায় কাঁটায় একটা বেজেছে। বেশ শান্তভাবেই নিজের নাড়ীটা দেখে নিলেন। না; এতটুকু বেচাল হয় নি নাড়ী। সেই অদ্ভুত শব্দটা তখনও হচ্ছিল। তিনি বেশ স্পষ্টই শুনতে পেলেন কেউ যেন পা ঠুকে ঠুকে তাঁর দিকে এগিয়ে আসছে। চটি পরে তিনি তাঁর 'ড্রেসিং কেস' থেকে লম্বাটে একটা ফাইল বার ক'রে দরজাটা খুললেন। ম্লান চাঁদের আলোতে তিনি দেখলেন তাঁরই সামনে ভয়ঙ্কর চেহারার একটি বৃদ্ধ দাঁড়িয়ে রয়েছে! তার চোখ দুটো জ্বলন্ত কয়লার মত জ্বলছে। জটার মত লম্বা ধূসর চুলগুলো ঝাঁপিয়ে পড়েছে তার কাঁধের ওপরে। তার পরিধানে প্রাচীন কালের পোশাক; সেগুলি যেমন নোংরা, তেমনি ছেঁড়া। তার হাতের কব্জি আর পায়ের গাঁট থেকে বেশ ভারি আর মরচে-পড়া শেকল ঝুলছে।

মিঃ ওটিস বলেন—প্রিয় মহাশয়, ওই শেকলগুলিতে তেল দেওয়ার জন্তে

বাধ্য হয়েই আমি আপনাকে অনুরোধ জানাচ্ছি। আর সেইজন্যেই 'তামানী রাইসিং সাব লিউবিকেটর'-এর একটা ছোট শিশি আমি এনেছি। একবার লাগালেই কাজ হবে এতে। এর গুণ কত সে সম্বন্ধে প্রশংসাপত্র-ও এর গায়ে সাঁটা রয়েছে। শোয়ার ঘরের বাতির কাছে এটা আমি রাখছি। প্রয়োজন হলে এই জাতীয় আরও তেল আমি আপনাকে আনন্দের সঙ্গেই সরবরাহ করব।

এই বলে যুক্তরাষ্ট্রের মন্ত্রী মহোদয় মার্বেল টেবিলের ওপর শিশিটি রেখে দরজা বন্ধ করে শোয়ার জন্যে প্রস্থান করলেন।

স্বাভাবিক একটা ঘৃণা আর বিরক্তিতে ক্যানটারভাইলের ভূত একমুহূর্ত চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। তারপরে সেই পালিশ করা মেঝের ওপরে সজোরে শিশিটাকে আছাড় দিয়ে শুকনো আর্তনাদ করতে করতে আর ভৌতিক সবুজ একটা আলো ছড়াতে ছড়াতে ভূতটি বারান্দা দিয়ে পালিয়ে গেল। ঠিক যখন সে ওকে কাঠের বিরাট সিঁড়িটার ওপরে গিয়ে দাঁড়িয়েছে এমন সময় একটা ঘরের দরজা হাট হয়ে খুলে গেল; দুটি ক্ষুদে সাদা পোশাক-পরা মূর্তির আবির্ভাব হল। আর সেই সঙ্গে একটা লম্বা বালিশ তার মাথার ওপর দিয়ে হুইশ-হুইশ শব্দ ক'রে উড়ে গেল। নষ্ট করার মত সময় আর না থাকায় ভূতটি ঝটিতি চতুর্থ ডাইমেনশনের সাহায্যে কাঠের তক্তার ভিতর দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। তারপরে শান্ত হল বাড়ীটি।

বাড়ীটার বাঁ দিকে ছোট একটা গোপন কক্ষে ঢুকে চাঁদের রশ্মির পিঠে হেলান দিয়ে বসে সহজভাবে সে নিঃশ্বাস নিতে লাগলো। সেইখানে বসেই নিজের অবস্থাটা ভাল ক'রে বোঝার চেষ্টা করল সে। বিগত তিনশ বছরের গৌরবোজ্জ্বল এবং নিরবচ্ছিন্ন জীবনে এইভাবে অপমানিত সে আর কোনদিন হয় নি। বিধবা ডাচেসের কথা তার মনে পড়লো। লেস আর মুক্তা হাতে নিয়ে যখন তিনি আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন সেই সময় ভয় দেখিয়ে সে তাঁকে জ্ঞান হারাতে বাধ্য করেছিল। একটা খালি ঘরের পর্দা তুলে সে স্রেফ ভেংচি কেটে যে চারটি পরিচারিকাকে উন্মাদ করে তুলেছিল তাদের কথা মনে হল তার। মনে হল স্থানীয় গির্জার রেকটরের কথা। একদিন বেশী রাত্রি ক'রে লাইব্রেরী থেকে তিনি যখন ফিরছিলেন এমন সময় সে তাঁর বাতিটা নিভিয়ে দিয়েছিল। তারপর থেকে ভদ্রলোক স্যার উইলিয়ম গাল-এর চিকিৎসাধীনে ছিলেন। বলতে গেলে স্নায়ু বৈকল্যেই তিনি শেষ পর্যন্ত আত্মদান করেন। মনে পড়ে গেল বৃদ্ধা মাদাম দ্য ট্রিমোলিক-এর কথা। ভদ্রমহিলা একদিন প্রত্যূষে উঠে দেখেন আগুনের ধারে একটি আরাম কেদারায় বসে একটি কংকাল তাঁর নিজের ডায়েরী পড়ছে! এর ফলে তিনি ছ'সপ্তাহ মানসিক রোগে বিছানায় পড়েছিলেন। সেরে উঠে তিনি গির্জায় চলে গেলেন। তারপর থেকে কুখ্যাত নাস্তিক ম'সিয়ে দ্য ভলতেয়রের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ত্যাগ করেন। সেই ভয়ঙ্কর রাত্রির কথা তার মনে পড়ে গেল

যেদিন গলার ভেতরে মুক্তার মালা ঢুকিয়ে অসৎচরিত্র লর্ড ক্যানটারভাইলকে দম বন্ধ অবস্থায় তার ড্রেসিং রুমে পড়ে থাকতে দেখা গেল। মৃত্যুর ঠিক আগে সে স্বীকার করেছিল যে তাসের ভেলকি দেখিয়ে চার্লস জেমস ফক্সকে সে পঞ্চাশ হাজার পাউণ্ড ঠকিয়েছিল; আর ভূতই যে তাকে ওই মালটা গিলতে বাধ্য করেছিল সেকথাও স্বীকার করতে দ্বিধা করে নি সে। সেইসব বিরাট বিরাট কৃতিত্বের কথা মনে পড়ে গেল তার। মনে পড়ল বাটলারের কথা। জানালার কপাটের ওপরে সবুজ একটা হাতকে ঠুক ঠুক করতে দেখে বেচারা নিজেকেই নিজে গুলি করে হত্যা করল। সেই সুন্দরী লেডী স্টাটফিল্ডের কথাও সে ভুলতে পারল না। তাঁর সেই শ্বেতকণ্ঠের ওপরে পাঁচটা আঙুলের দাগ চিপে বসে যে ক্ষতের সৃষ্টি করেছিল সেই ক্ষত ঢাকার জন্যে তিনি সবসময় একটা কালো ভেলভেটের বন্ধনী গলার ওপরে জড়িয়ে রাখতেন। তারপরে একদিন তিনি পুকুরে ডুবে আত্মহত্যা করলেন। সত্যিকার কলাবিদের আত্মম্ভরিতার উৎসাহে সে তার জীবনের কৃতিত্বপূর্ণ অধ্যায়গুলি নিয়ে আলোচনা করল। এইসব কৃতিত্ব দেখানোর পরে কোথা থেকে হতভাগা একটা অ্যামেরিকান এসে তাকে 'রাইসিং সান লিউব্রিকেটর' দিতে চায়! তার মাথা লক্ষ্য ক'রে বালিশ ছুঁড়ে দেয়! অহোভাগ্যম! অসহ্য, অসহ্য! তাছাড়া, কোন ভূত যে নশ্বর মানুষের কাছে এইভাবে অপমানিত হয়েছে এর নজির ভূতদের ইতিহাসে আর কোথাও নেই। সেইজন্যে, প্রতিহিংসা চরিতার্থ তাকে করতেই হবে। সেই চিন্তাতেই সারাদিনটা সে মশগুল হয়ে বসে রইল।

পরেরদিন সকালে ওটিসরা ব্রেকফাস্টের টেবিলে বসে ভূতের বিষয়ে কিছু আলোচনা করলেন। তাঁর উপহার ভূতটি গ্রহণ করেনি এটা দেখে যুক্তরাষ্ট্রের মিনিস্টার স্বাভাবিকভাবেই কিছুটা বিরক্ত হলেন। তিনি বললেন—ভূতের শারীরিক কোন ক্ষতি করার ইচ্ছে আমার নেই, কিন্তু যে দীর্ঘ সময় ধরে ভূতটি এখানে বাস করছে সেই কথা ভেবে এটা বলতে আমি বাধ্য যে তাকে লক্ষ্য ক'রে বালিশ ছোঁড়াটা ভদ্রতাসূচক হয় নি।

যথার্থ মন্তব্য: কিন্তু দুঃখের সঙ্গে বলছি যে এই কথা শুনে দুটি যমজ ভাই একেবারে হো-হো করে হেসে উঠলো।

মিঃ ওটিস বলে গেলেন—অন্য পক্ষে 'রাইসিং সান লিউব্রিকেটর' নিতে ওর যদি সত্যিই কোন আপত্তি থাকে তাহলে ওর শেকলগুলি আমাদের খুলে নিতে হবে। কারণ ঘরের বাইরে এই ধরনের শব্দ হ'লে রাত্রিতে ঘুমের ব্যাঘাত হ'তে বাধ্য।

সপ্তাহের বাকি ক'টা দিন অবশ্য তারা নির্ঝঞ্ঝাটেই কাটিয়েছেন। ভূতটি কোন রকম অদ্ভুত কাজ করার চেষ্টা করে নি। লাইব্রেরীর মেঝেতে সেই রক্তের দাগটাই কেবল প্রতিদিন দেখা যাচ্ছিল—আর সেইটাই সকলকে বেশ উত্তেজিত ক'রে রেখেছিল। ব্যাপারটা সত্যিই বড় অদ্ভুত। মিসেস ওটিস নিজে প্রতিদিন

রাত্রিতে ওই ঘরটা চাবি দিয়ে বন্ধ করে দিতেন ; সেই সঙ্গে খুব শক্ত ক'রে বন্ধ



করা হোত জানালাগুলি। অবাক হওয়ার একমাত্র কারণ হচ্ছে এই যে ঘরটা

বহুরূপী। কোন কোনদিন সকালে ওটা ফিকে [প্রায় ভারতীয়] লাল, কোন কোনদিন সিঁদুরের মত, কোন কোনদিন বা বেগনে। হঠাৎ একদিন প্রার্থনা থেকে ফিরে এসে তাঁরা দেখেন রঙটা হয়েছে উজ্জ্বল পান্নার মত সবুজ। রঙের এই দ্রুত পরিবর্তনে স্বাভাবিকভাবেই তাঁরা বেশ আমোদ পেতেন; আর এর আসল চরিত্রটা যে কী তাই নিয়ে বাজি ধরতেও তাঁরা দ্বিধা করতেন না। এঁদের মধ্যে একমাত্র ভার্জিনিয়াই ওঁদের তর্ক ও আলোচনা থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখতো। এই রক্তের দাগ দেখে বেশ কষ্ট হোত তার। যে সকালে রক্তটা পান্নার মত সবুজ হয়ে দাঁড়াল সেদিনই আর একটু হলে সে প্রায় কেঁদেই ফেলত।

রবিবার রাত্রিতে ভূতটির দ্বিতীয় আবির্ভাব হল। সবাই শুয়ে পড়ার একটু পরেই হঠাৎ হল ঘরের মধ্যে কিছু একটা ভেঙ্গে পড়ে যাওয়ার শব্দ হল। সেই ভীষণ শব্দে সবাই বেশ ভয় পেয়ে গেলেন। সবাই দৌড়ে নিচে নেমে এসে দেখলেন একটা জায়গায় কতকগুলি পুরনো বর্ম ঝোলানো ছিল, সেগুলি স্থানচ্যুত হয়ে শান-বাঁধানো মেঝের ওপরে পড়ে গিয়েছে। আর উঁচু পিঠওয়ালা চেয়ারে বসে রয়েছে ক্যানটারভাইল ভূত। বসে-বসে হাঁটু দুটো সে ঘষছে; আর ভীষণ যন্ত্রণায় বিকৃত করছে তার মুখ। যমজ ভাই দুটি তাদের খেলার বন্দুক সঙ্গে নিয়ে এসেছিল। ভূতের মাথা লক্ষ্য করে অভ্রান্তভাবে তারা দুটো ছররা ছুঁড়লো; আর ক্যালিফোরনিয়ান ভদ্রতা অনুযায়ী যুক্তরাষ্ট্রের মন্ত্রী রিভলভার উঁচিয়ে ভূতটিকে মাথার ওপরে হাত দুটো তুলতে নির্দেশ দিলেন। রাগে বিকট একটা চীৎকার ক'রে ভূতটি লাফিয়ে উঠলো; তারপরে ধোঁয়ার মত সেখান থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল। যাওয়ার সময় ওয়াশিংটন ওটির বাতিটা নিভিয়ে দিয়ে চারপাশ অন্ধকারে ঢেকে দিয়ে গেল। একেবারে থামলো সিঁড়ির ওপরে গিয়ে। সেখানে দাঁড়িয়ে সে তার বিখ্যাত দৈত্যসুলভ হাসিটি হাসতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হল। কয়েকবারই সে দেখেছে এই হাসিটি তার বড়ই কাজে লেগেছে। শোনা যায় এই দানবীয় হাসি শুনে একরাত্রিতেই লর্ড বেকারের অমন ঝাঁকড়া-ঝাঁকড়া কালো চুল পেকে সাদা হয়ে গিয়েছে। আর মাস শেষ হওয়ার আগেই লেডী ক্যানটারভাইলের ফরাসী গভর্নেসরা চাকরি ছাড়ার নোটিশ দিতে বাধ্য হয়েছিল। সেই ভেবে সেই দানবীয় হাসিটি সে হাসলো; পুরনো বাড়ীর খিলানে খিলানে সেই ভয়ঙ্কর হাসিটি উন্মত্ত কলরবে প্রতিধ্বনিত হ'তে লাগলো; কিন্তু সেই প্রতিধ্বনি মিলিয়ে যেতে না যেতেই সামনের একটা দরজা খুলে গেল, আর ফিকে নীল একটা ড্রেসিং গাউন পরে বেরিয়ে এলেন মিসেস ওটিস; বললেন—আমার ধারণা আপনার শরীরটা ভাল নেই। সেইজন্যে আমি এক বোতল ডাক্তার দোবল-এর তৈরি মিকচার নিয়ে এসেছি। যদি বদহজম হয়ে থাকে তাহলে এতে আপনার যথেষ্ট উপকার হবে।

এই শুনে রাগে গরগর করতে করতে ভূতটি তাঁর দিকে ক্যাঁট-ক্যাঁট করে

তাকিয়ে রইল ; তারপরে ঠিক করল একটা বড় কালো কুকুরের বেশ ধরবে সে। এই কাজে তার দক্ষতা সত্যিই ছিল অগাধ। কিন্তু সেইসময় তার দিকে এগিয়ে আসার পদশব্দ পেয়েই সে তার সেই ভয়ঙ্কর পরিকল্পনা কার্যকরী করবে কিনা ভাবতে লাগলো। সুতরাং সে ঈষৎ অগ্নিশিখায় রূপান্তরিত হয়েই সন্তুষ্ট হল ; তারপরে গভীর একটা কবরখানার আর্তনাদ করেই সে অদৃশ্য হয়ে গেল। ঠিক সেই সময় যমজ দুটি ভাই কাছে এসে পড়লো।

নিজের ঘরে এসে সে একেবারে ভেঙে পড়লো। একটা তোলপাড় সুরু হয়ে গেল তার মনের মধ্যে। যমজ ভাই দুটির অসভ্যতা, আর মিসেস ওটির জঘন্য বস্তুবাদ স্বাভাবিকভাবেই তার কাছে বড়ই বিরক্তিকর মনে হল। কিন্তু যেটা তার কাছে বিষম কষ্টদায়ক হল সেটা হচ্ছে এই যে সে বর্মটাকে পরতে পারলো না। সে ভেবেছিল ভূত বর্ম পরে বসে রয়েছে এই দৃশ্য দেখে আধুনিক অ্যামেরিকানেরও তাক লেগে যাওয়ার কথা। এর পেছনে অন্য কোন সুবোধ্য কারণ না থাকলেও, তাদের জাতীয় কবি লঙ্ ফেলোর সম্ভ্রমের জন্যেই তার চমকে যাওয়া উচিৎ ছিল। ক্যানটারভাইলরা যখন শহরে যেতেন তখন সারাদিনের মধ্যে একটি ক্লান্ত ঘণ্টা সে নিজেও লঙ ফেলোর কবিতার বই-এর পাতা অনেকবার উলটিয়েছে। কেনিলওয়ার্থ টুর্ণামেণ্টে সে নিজে এই বর্মটি বেশ সাফল্যের সঙ্গেই পরেছে ; আর তাই দেখে অনূঢ়া রাণী নিজেই তাঁকে কত প্রশংসা করেছেন। তবু আজ যখন সে এই বর্মটি পরতে গেল তখন তার বিষম ভার বইতে না পেরে মেঝের ওপরে সে হুড়মুড় ক'রে পড়ে গেল, পড়ে যাওয়ার ফলে তার ডান হাতের আঙুলের গাঁটগুলি ক্ষতবিক্ষত হল, হাঁটুর ওপরে বসে যন্ত্রণায় সে কুকুরের মত চীৎকার করে উঠলো।

এর পরে কয়েকটা দিন সে ভীষণ রকম অসুস্থ হয়ে উঠলো। সেই রক্তাক্ত দাগটিকে যথাস্থানে বসিয়ে দেওয়া ছাড়া নিজের ঘর থেকে সে বাইরে প্রায় বেরোল না বললেই হয়। যাই হোক, খুব সাবধানে থাকার ফলে সে সুস্থ হয়ে উঠলো ; সুস্থ হয়েই যুক্তরাজ্যের মন্ত্রী আর তাঁর পরিবারবর্গকে শায়েস্তা করার জন্যে সে তৃতীয় পরিকল্পনা গ্রহণ করতে কৃতসংকল্প হল। তার পুনরাবির্ভাবের দিন ঠিক করল শুক্রবার, ১৭ই আগস্ট। সেদিনের বেশীর ভাগ সময়টাই সে তার পোশাক রাখার আলমারিটা ঘাঁটলো। অনেক ঘেঁটে ঘুঁটে সে একটা লাল পালক দেওয়া খোলসের তৈরি টুপী বার করল ; সেই সঙ্গে বার করল মরচে-পড়া একটা ছোরা। সন্ধ্যের দিকে ভয়ঙ্কর ঝড়ের সঙ্গে সুরু হল বৃষ্টি। এত জোরে বাতাস বইতে লাগলো যে পুরনো বাড়ীর জানালা-দরজাগুলো সব খটাখট করে শব্দ করতে লাগলো। সত্যি কথা বলতে কি এইরকম একটা আবহাওয়াকেই সে পছন্দ করত বেশী। তার পরিকল্পনাটা হচ্ছে এই রকম—। ওয়াশিংটন ওটির ঘরে সে নিঃশব্দে প্রবেশ করবে। বিছানার কাছে পায়ের দিকে দাঁড়িয়ে তার দিকে তাকিয়ে সে বিড় বিড় করে কথা বলবে ; তারপর মৃদু একটা সঙ্গীতের

স্বরের তালে-তালে নিজের গলার মধ্যে তিনবার ছোরাটা বসিয়ে দেবে। ওয়াশিংটন ওটিস-ই 'পিঙ্কারটনের প্যারাগন ডিটারজেন্ট' দিয়ে বারবার সেই রক্তের দাগটা মুছে দিচ্ছে। এই জন্যে তারই ওপরে তার রাগটা ছিল বেশী। সেই বেপরোয়া আর মূর্খ যুবকটিকে ভয়ে একেবারে উত্থানশক্তিরহিত করে দিয়ে সে ঢুকে যাবে সেই ঘরে যেখানে যুক্তরাষ্ট্রের মন্ত্রী আর তাঁর স্ত্রী ঘুমোচ্ছেন। মিসেস ওটিসের কপালের ওপরে তার চিটচিটে হাতটা রেখে কবরখানার ভয়ঙ্কর গোপন রহস্যের কথা ফিসফিস করে মিঃ ওটিসের কানের কাছে আওড়াবে। ভার্জিনিয়ার মেয়েটার ব্যাপারে সে এখনই কিছুই ঠিক করে উঠতে পারে নি। মেয়েটি বেশ শান্তশিষ্ট। এখনও পর্যন্ত সে তাকে কোন অপমান করে নি। ওয়ার্ডোবের ভেতর থেকে কয়েকটা শূন্যগর্ভ আওয়াজই তার পক্ষে যথেষ্ট হবে। তাতেও যদি তার ঘুম না ভাঙে তাহলে সে কাঁচের জানালাটা বাগিয়ে ধরে একটু আঁচড়াবে। আর ওই যমজ ভাই দুটো, তাদের সে বেশ একটু শিক্ষা দেবেই। প্রথমেই অবশ্য সে তাদের বুকের ওপরে গিয়ে বসবে। তাদের মনে হবে দুঃস্বপ্ন দেখে তাদের দম বন্ধ হয়ে আসছে। তারপরে তাদের বিছানা কাছাকাছি বলেই, সে সবুজ বরফের মত ঠাণ্ডা কনকনে মৃতদেহের মত তাদের দুটি বিছানার মাঝখানে দাঁড়াবে; এতেই তারা ভয়ে জমে যাবে। শেষকালে, বিছানার চাদর দুটো তুলে সাদা ব্লিচ করা হাড় আর ঘূর্ণায়মান চোখ বার করে সে ঘরময় হামাগুড়ি দেবে। 'ডাম্ব ড্যানিয়েল' অথবা 'সুইসাইড স্কেলিটনের' অভিনেতার মতই দেখতে হবে তাকে। এই চরিত্রে অনেকবারই সে উন্নতধরনের পরিবেশের সৃষ্টি করেছে। 'মার্টিন দি ম্যানিয়্যাক' অথবা 'দি মাস্কড্ মিষ্ট্রি'-তে যে বিখ্যাত চরিত্রটি সে অভিনয় করেছিল এই অভিনয়টি মোটামুটি তারই কাছাকাছি যাবে।

সাড়ে দশটার সময় সবাই শুতে গেল। সে শব্দ সে শুনতে পেল। যমজ ভাই দুটোর উন্মত্ত চীৎকারে কিছুক্ষণ সে একটু অস্থিরতার মধ্যে রইলো। তার মনে হল, স্কুলের ছাত্রদের মত ছেলে দুটো ঘুমানোর আগে হালকা হাসিঠাট্টায় মেতে উঠেছে। কিন্তু সওয়া এগারটায় সব শান্ত হয়ে এল। বারটা বাজার সঙ্গে সঙ্গে সে বেরিয়ে পড়লো। কাঁচের জানালার পাশে পেঁচারা পাখার শব্দ করল, পুরনো ইউ গাছের ওপর থেকে চীৎকার করে উঠলো দাঁড়কাকের দল, আর হারিয়ে যাওয়া আত্মার মত আর্তনাদ করতে করতে বাতাস ছোটাছুটি করতে লাগলো চারপাশে। কিন্তু নির্বিকারভাবে ওটিসের পরিবার ঘুমে বিভোর। তাদের কপালে যে কী লেখা রয়েছে সে কথা তারা ভাবতেও পারলো না। ঝড়-জলের শব্দ ছাপিয়ে মন্ত্রীমহোদয়ের নাসিকাগর্জন তার কানে এসে ঢুকলো। তার সেই নিষ্ঠুর বলিরেখায় ভরা মুখের ওপরে কদর্য একটা হাসি ফুটিয়ে সে বেরিয়ে পড়লো চুপি চুপি। মেঘের ভেতরে চাঁদ লুকিয়ে পড়লো; যে বিরাট 'ওরিয়েল' জানালার পাশে তার আর তার নিহত স্ত্রীর অস্ত্রগুলির নক্সা সোনার রঙে খোদাই করা ছিল সেখান দিয়ে সে পেরিয়ে এল। অমঙ্গল ছায়ার মত সে

এগোতে লাগলো। মনে হল অন্ধকারও তাকে দেখে ঘৃণায় মুখ সঙ্কুচিত করছে। একবার মনে হল কার যেন ডাক শুনতে পাচ্ছে সে। মনে হতে সে থেমে গেল। না, ওটা হচ্ছে কুকুরের ডাক। ষোড়শ শতাব্দীতে প্রচলিত অদ্ভুত অদ্ভুত অভিশম্পাতের শব্দ ফিসফিস ক'রে আওড়াতে আওড়াতে সে এগোতে লাগলো। মাঝে মাঝে মধ্যরাত্রির বাতাসের বুকে সেই মরচে-পড়া ছোরাটা লাগলো দোলাতে। অবশেষে যে বারান্দা দিয়ে হতভাগ্য ওয়াশিংটনের ঘরে ঢোকা যায় সেই বারান্দায় হাজির হল সে। মুহূর্তের জন্যে একটু দাঁড়ালো। বাতাসে তার সাদা চুলগুলোকে ওলটপালট করিয়ে দিয়ে সেই কদর্য মৃত লোকটার ভয়ঙ্করতা আরও বাড়িয়ে দিল। তারপরে সওয়া বারটার ঘণ্টা বাজলো। সে বুঝতে পারল এবার সময় হয়েছে। মনের আনন্দে একটা চুক-চুক শব্দ করে সে কোণের দিকে ঘুরে গেল। কিন্তু মুখটা ঘোরানোর সঙ্গে সঙ্গে একটা করুণ ভয়ার্ত চীৎকার করে সে থমকে দাঁড়ালো, তারপরে সাদা ফ্যাকাসে মুখটা তার লম্বা হাড়ের দুটো হাত দিয়ে ঢেকে দিল। ঠিক তার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে একটা ভয়ঙ্কর অশরীরী মূর্তি। চুপচাপ খোদাই করা মূর্তির মত—উন্মাদের স্বপ্নের মত ভয়াল। তার মাথাটা ন্যাড়া, বার্নিশ করা। তার মুখটা গোল, মোটা আর সাদা। মনে হল, একটা শাশ্বত ভ্রূকুটির ভেতর দিয়ে ভয়াল একটা অট্টহাসি ফেটে-ফেটে পড়ছে। তার চোখ দুটোর ভেতর থেকে একটা উজ্জ্বল লাল আলো ছিটকে পড়ছে। মুখটা যেন একটা আগুনে চুল্লী। অতিকায় দৈত্যের মত চেহারার ওপরে তারই পরিধেয়র মত বিশ্রী ভয়াল একটা পোশাক ঝুলছে। তার বুকের ওপরে একটা প্রাচীরপত্র সাঁটা। তার ওপরে প্রাচীন অক্ষরে কী যেন অদ্ভুত একটা লেখা। মনে হল ওর ওপরে লেখা রয়েছে কারও লজ্জার কাহিনী, কোন উদ্দাম পাপের কাহিনী, কোন পাপের ইতিহাস, তার ডান হাতে উঁচু করে ধরা রয়েছে চকচকে ইস্পাতের একটা কুকরী।

এর আগে কোন ভূত না দেখার ফলে সে স্বাভাবিকভাবেই ভীষণ ভয় পেয়ে গেল। তারপরে সেই ভয়ঙ্কর ভৌতিক প্রাণীটির দিকে তাড়াতাড়ি আর একবার তাকিয়ে নিয়েই সে তার ঘরের মধ্যে পালিয়ে গেল; পালানোর সময় তার লম্বা চাদরটা ফেলে গেল বারান্দার ওপরে; আর মরচে-পড়া ছোরাটা প'ড়ে গেল মন্ত্রী মশায়ের জুতোর ভেতরে। পরেরদিন সকালে বাটলার সেটা কুড়িয়ে পায়। একবার নিজের নির্জন ঘরে হাজির হয়েই সে ঘরের বিছানার ওপরে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল; তারপরে কাপড়ের ভেতরে ঢুকিয়ে ফেললো নিজের মুখ। যাই হোক, কিছুক্ষণ পরে সেই সাহসী ক্যানটারভাইল ভূতটি তার স্বাভাবিক অবস্থাটা ফিরিয়ে নিয়ে এল। তারপরে ঠিক করল সকাল হলেই সে নেমে গিয়ে দ্বিতীয় ভূতটির সঙ্গে কথা বলবে। সেই পরিকল্পনা অনুসারে ঠিক ভোর হয়-হয় এইরকম সময় সে সেই জায়গায় ফিরে গেল। ভাবলো, একজন ভূতের চেয়ে দুজন ভূতের শক্তি অনেক বেশী, দুজনে মিলে তারা ওই যমজ ভাই দুটিকে অনায়াসেই কায়দা

করতে পারবে। যথাস্থানে হাজির হয়ে একটা ভয়ঙ্কর দৃশ্য তার চোখে পড়লো। ছায়ামূর্তিটির নিশ্চয় কিছু একটা হয়েছে ; কারণ তার সেই শূন্য চক্ষুর কোটরে সেই লাল জ্যোতি আর নেই, সেই চকচকে কুকরীটা পড়ে গিয়েছে তার হাত থেকে ; আর অসহায়ভাবে দেওয়ালের গায়ে সে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে কোনরকমে। দৌড়ে গিয়ে হাত দুটো দিয়ে সে তাকে ধরলো ; সভয়ে দেখলো ধরার সঙ্গে সঙ্গে তার মাথাটা ঘাড় থেকে বিচ্যুত হয়ে মেঝের ওপরে গড়িয়ে পড়লো ; দেহটার কোমর গেল ভেঙে। সে দেখলো তু-সুতোর তৈরি একটা সাদা বিছানার চাদরকে সে জড়িয়ে ধরেছে। এই অদ্ভুত পরিবর্তনের অর্থটা হৃদয়ঙ্গম করতে না পেরে সে তাড়াতাড়ি সেই বিজ্ঞাপনটাকে মুঠোর মধ্যে ধরে প্রভাতের আলোয় পড়তে লাগলো। বাপরে, বাপ! বিশ্বের এই একটিমাত্র ভূত ছাড়া আর সব ভূতই মেকী। অতএব সাবধান। ঠকবেন না। ক্যানটারভাইল ভূত তো রেগে কাঁই। আর সব ভূত মেকা। বিদ্যুতের মত সব ব্যাপারটা তার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল। তার সঙ্গে ফাজলামি করা হয়েছে, তাকে ধাপ্পা দেওয়া হয়েছে, প্রতারণা করা হয়েছে তার সঙ্গে। বৃদ্ধ ক্যানটারভাইলের চোখে তার স্বাভাবিক দৃষ্টি ফিরে এল। ফোকলা মাড়ি দুটো চিপে ধরলো সে। শীর্ণ হাত দুটো আকাশের দিকে উঁচিয়ে প্রাচীনতম যুগের রীতি অনুসারে চমৎকার বাক্ বিন্যাসের ভিত্তিতে সে প্রতিজ্ঞা করল—মোরগ যখন আনন্দের সঙ্গে দু'বার ডাকবে তখনই রক্তাক্ত কাজ সংগঠিত হবে ; নিঃশব্দ পদসঞ্চারে তখনই মৃত্যু গুটি গুটি বেরিয়ে যাবে প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার জন্যে।

এই ভয়ঙ্কর শপথ গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে লাল টালির ছাদ দেওয়া দূরের কোন বাড়ি থেকে মোরগ ডেকে উঠলো। একটা তিক্ত দীর্ঘ চাপা হাসি হেসে সে অপেক্ষা করতে লাগলো। আধ ঘণ্টা ধরে সে অপেক্ষা করল ; কিন্তু কোন অজ্ঞাত কারণে, মোরগটা আর ডাকলো না। অবশেষে সাড়ে সাতটার সময় বাড়ির চাকরাণীরা এসে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সে আর সেখানে অপেক্ষা করতে পারলো না। ব্যর্থ আশা আর ব্যর্থ উদ্দেশ্যের কথা ভাবতে ভাবতে কোনরকমে সে তার ঘরে ফিরে এল। সেখানে গিয়ে প্রাচীন বীরত্বের ওপরে লেখা কয়েকটা বই ঘেঁটে সে দেখলো। এই বইগুলি তার খুব প্রিয় ছিল। প্রতিটি ক্ষেত্রেই যখন সে ওই জাতীয় কোন প্রতিজ্ঞা করেছে তখনই মোরগ নিয়ম ক'রে দুবার ডেকেছে। সে রেগে গজগজ করতে করতে বলল—দুষ্টু মোরগটা জাহান্নামে যাক। আমার সে-দিন থাকলে আমার সেই শক্ত বর্শাটা নিয়ে ব্যাটাকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে এমন চীৎকার করাতাম যে মনে হোত ব্যাটা মরণ আর্তনাদ করছে।

পরেরদিন ভূতটি বেশ দুর্বল আর ক্লান্ত হয়ে পড়লো। বিগত চারটি সপ্তাহের ভয়ঙ্কর উত্তেজনার ফল ফলতে সুরু করল। একেবারে বিপর্যস্ত হয়ে গেল তার স্নায়ুগুলি। সামান্য একটু শব্দেই সে চমকে উঠতে লাগলো। পাঁচটি

দিন সে ঘরের মধ্যে বসে রইল ; তারপরে ঠিক করল লাইব্রেরী ঘরের মেঝেতে আর সে সেই রক্ত চিহ্নটি বসিয়ে আসবে না। ওটিস-এর পরিবারবর্গ ওটা যদি পছন্দ না করে স্পষ্টতই ও-জিনিসটি না দেখার অধিকার তাদের রয়েছে। মনে হয় ওরা নিচু বাস্তব স্তরের মানুষ। ইন্দ্রিয়জ ঘটনার যে একটা সাংকেতিক মূল্য রয়েছে তা হৃদয়ঙ্গম করতে ওরা অক্ষম। সপ্তাহে একবার আবির্ভূত হওয়া আর মাসের প্রতি প্রথম আর তৃতীয় শুক্রবার জানালার পাশে গিয়ে মুখ ভেঙানোই তার প্রধান কাজ। সে বুঝতে পারল না এই কর্তব্যে সে অবহেলা করবে কেমন করে? কথাটা সত্যি যে তার জীবনটা বড় নোংরা ছিল ; কিন্তু আবার অন্য দিক থেকে যা কিছু অতিপ্রাকৃতের সঙ্গে জড়িত তাদের সম্বন্ধে তার বিবেকটা ছিল বড় সজাগ। সেইজন্যে পরের তিনটি শনিবার যথারীতি সে বারান্দায় বেরিয়েছিল ; কিন্তু কেউ তাকে দেখতে অথবা তার পায়ের শব্দ শুনতে না পায় সেবিষয়ে খুব সতর্ক ছিল। এই উদ্দেশ্যে সে বুট খুলে ফেললো, ঘুণ-ধরা কাঠের তক্তার উপরে খুব আস্তে আস্তে হাঁটলো, বেশ বড় কালো একটা ভেলভেটের আলখাল্লায় নিজেকে রাখলো ঢেকে, আর শেকলগুলোকে মসৃণ করার জন্যে, যদিও এটা করতে তার খুবই কষ্ট হয়েছিল, তবুও সে 'রাইসিং সান লিউব্রিকেটর' ব্যবহার করল। একাজ করতে প্রথমে সে অপমান বোধ করেছিল ; কিন্তু এই তেলের উপকারিতা বোঝাব মত জ্ঞান তার হয়েছিল। এতসব করাব পরেও বারবার তাকে অপদস্থ হতে হল। প্রায় বারান্দার ওপরে দড়ি বেঁধে রাখতো তারা। তার ফলে অন্ধকারে তাকে লাফিয়ে লাফিয়ে চলতে হোত। একবার যমজ ভাই দুটি এমন এক কৌশল করেছিল যার ফলে তাকে ভীষণভাবে পড়ে যেতে হয়েছিল। এই শেষ অপমানটি তার এত বেশী লেগেছিল যে সে ঠিক করল—আর না, এবার তার লুপ্ত গৌরব ফিরিয়ে আনার জন্যে তাকে এবার শেষ করতে হবে। সে ঠিক করে ফেললো পরের রাত্রিতে 'রেকলেশ রুপার্ট' অথবা 'দি হেডলেস আর্ল'-এর যে বিখ্যাত ভূমিকায় সে অভিনয় করেছিল সেই বেশে ইটন-এ পড়া ওই দুটি উদ্ধত যুবককে একটা চরম শাস্তি সে দেবে।

সত্তর বছরেরও বেশী সে এই ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় নি। সত্যি কথা বলতে কি সুন্দরী লেডী বারবারা মোদিসকে সে যেদিন ভয়ে মূহ্যমান করে দিয়েছিল সেদিনই সে এই ভূমিকায় শেষ অভিনয় করেছিল। সেই ভয়েই সে বর্তমান লর্ড ক্যানটারভাইল-এর পিতামহের সঙ্গে বিয়ে ভেঙে দিয়ে সুন্দর যুবক জ্যাক ক্যাসলটনের সঙ্গে গ্রেটনা গ্রীন-এ পালিয়ে গিয়েছিল ; বলেছিল, সন্ধ্যে আর ভোরে যে বাড়ীর বারান্দায় ভূত ঘুরে বেড়ায় সে-বাড়ীতে সে কিছুতেই বিয়ে করবে না। পরে ওয়াণ্ডওয়ার্থ কমন নামে জায়গায় দ্বন্দ্বযুদ্ধে বেচারা জ্যাককে লর্ড ক্যানটারভাইল গুলি করে হত্যা করেছিলেন। তারই ফলে এক বছরের ভেতরেই ভগ্নহৃদয়ে লেডী বারবারা টার্নব্রিজ ওয়েলস-এ মারা গিয়েছিল। তবে সাজগোজটা বড়ই কঠিন। সেই সাজ সাজতে তার পুরো তিনটি ঘণ্টা লাগলো।

অবশেষে সাজগোজ শেষ হলে নিজের চেহারা দেখে সে বেশ খুশিই হল। একটা বেজে পনের মিনিটের সময় সে তার কুঠরী থেকে নিঃশব্দে বেরিয়ে গুঁড়ি দিয়ে বারান্দার ওপরে এসে দাঁড়ালো। নীল পর্দা ঝোলানো থাকায় যেঘরে যমজ ভাই দুটি থাকতো তাকে 'ব্লু বেড চেম্বার' বলা হোত। ভালভাবে ঢোকার জন্যে সে ধাক্কা দিয়ে কপাটটা খুলে দিল। খুলে দেওবার সঙ্গে সঙ্গে একটা ভারি জলের কুঁজো তার ওপরে পড়ে গেল; জল পড়ে তার চামড়া পর্যন্ত গেল ভিজে; ইঞ্চি দুয়েকের জন্যে তার বাঁ কাঁধটা কোনরকমে বেঁচে গেল। আর ঠিক সেই-মুহূর্তেই বিছানার ওপর থেকে চাপা গলার হাসি ভেসে এল। সমস্ত ব্যাপারটা তার স্নায়ুগুলিকে এমনভাবে বিকল করে দিল যে সে অত্যন্ত দ্রুতবেগে তার ঘরে ফিরে এল। পরেরদিন প্রচণ্ড ঠাণ্ডা লেগে সে শুয়ে রইলো। তার একমাত্র সান্ত্বনা হল মাথাটাকে সে সঙ্গে করে নিয়ে যায় নি; গেলে কী সাংঘাতিক বিপদ ঘটতো তা ঈশ্বরই জানেন।

সেই অভদ্র অ্যামেরিকানদের ভয় দেখানোর বাসনা অতঃপর সে পরিত্যাগ করল। শব্দহীন স্লিপার পায়ে দিয়ে বারান্দায় গুঁড়ি দিয়ে ঘুরে বেড়িয়েই সে খুশি হল; এই বেড়ানোর সময় ঠাণ্ডা লাগার ভয়ে গলায় সে একটা লাল মাফলার জড়াতো; পাছে যমজ ভাইরা তাকে আক্রমণ করে এই ভয়ে হাতে সে রাখতো সেকেলে একটা বন্দুক। শেষ ধাক্কা খেল সে ১৯শে সেপ্টেম্বর। কোন-রকম অপমানিত হওয়ার বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা নেই এই মনে ক রে নিচের বিরাট ঘরে ঢোকার জন্যে সেদিন সে গিয়েছিল। যুক্তরাষ্ট্রের মন্ত্রী আর তার স্ত্রীর যে দুটি ফটোগ্রাফ ছিল—কিছুদিন আগেও ওখানে টাঙানো থাকতো ক্যানটার-ভাইল বংশের ছবি, সেইদিকে তাকিয়ে সে ঠাট্টা করছিল তাঁদের। তার পরনে ছিল কবরখানার ধাঁচের পরিচ্ছন্ন অথচ লম্বা পোশাক; চোয়ালটা বাঁধা ছিল বেগনে রঙের কাপড়ের টুকরো দিয়ে, হাতে ছিল কবর খননকারীর কোদাল। সত্যি কথা বলতে কি 'জোনাস দি গ্রেঙলেশ, অথবা চার্টসে বার্ন-এর করপস ক্যাচার'-এর ভূমিকায় যে পোশাক পরেছিল এটা সেইরকম। তার এই অভিনয় ক্যানটারভাইলসদের মনে রাখার কথা; কারণ এই থেকে প্রতিবেশী লর্ড রুফোর্ড-এর সঙ্গে তাদের সত্যিকারের বিবাদ সুরু হয়। রাত্রি প্রায় দুটো বেজে পনের হয়েছে। যতদূর সে জানত তখন কারও ঘুরে বেড়ানোর কথা নয়। রক্তের কোন দাগ পড়েছে কিনা দেখার জন্যে সে যখন লাইব্রেরী ঘরের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছিল ঠিক সেই সময় অন্ধকার থেকে দুটি মূর্তি অকস্মাৎ তার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে উন্মত্তের মত মাথার ওপরে হাত তুলে তার কানের কাছে চীৎকার ক'রে বলল—বু—বু!!

অত্যন্ত ভয় পেয়ে গেল সে; এবং সেই অবস্থায় ভয় পাওয়াটাই তার কাছে অত্যন্ত স্বাভাবিক। ভয় পেয়ে সে সিঁড়ির দিকে দৌড়ে গেল; কিন্তু দেখল মিঃ ওটিস তার বিরাট 'গার্ডেন সিরিঞ্জ' নিয়ে তার জন্যে অপেক্ষা করছেন। এইভাবে

দুপাশে শত্রুর দ্বারা অবরুদ্ধ হয়ে, আর পালানোর কোন প্রশস্ত পথ না পাওয়ার ফলে সে বিরাট লোহার স্টোভের ভেতরে অদৃশ্য হয়ে গেল। তার ভাগ্য ভাল যে স্টোভটা নেভানো ছিল। চিমনীর ভেতর দিয়ে কালিঝুলি মেখে এক কিম্ভুত-কিমাকার অবস্থায় শেষ পর্যন্ত নিজের ঘরে গিয়ে পৌঁছলো সে।

এরপরে আর কোনদিন সে রাত্রিতে বেড়াতে বেরোত না। যমজ ভাই দুটি অনেকবার তার জন্যে অপেক্ষা করে বসে থাকত; আর গোটা বারান্দাটায় সুপুরী ছড়িয়ে রাখত। এতে তাদের বাবা, মা আর চাকর-বাকর সবাই বিরক্ত হোত। কিন্তু তাদের কাজ তারজন্যে ব্যাহত হয় নি। বেশ স্পষ্টই বোঝা যায় ওদের ব্যবহারে সে এতই মর্মাহত হয়েছিল যে সে কিছুতেই বাইরে বেরোতে পারে নি। ফলে মিঃ ওটিস তাঁর অসমাপ্ত কাজ ডেমোক্র্যাটিক পার্টির ইতিহাস লিখতে সুরু করলেন; মিসেস ওটিস তাঁর অপরূপ সাংস্কৃতিক আসর বসানোর আয়োজন করলেন। ছেলেরা সব নানাজাতীয় খেলায় মেতে উঠলো, ভার্জিনিয়া তার টাট্টু ঘোড়ায় চেপে ঘুরতে লাগল রাস্তায় রাস্তায়, আর চেসায়ারের যুবক ডিউক তার ছুটির শেষ সপ্তাহটা কাটাতে এল ক্যানটারভাইল চেস-এ। সবাই ভাবলো ভূতটি বাড়ী ছেড়ে চলে গিয়েছে; এবং মিঃ ওটিস লর্ড ক্যানটার-ভাইলকে এবিষয়ে দীর্ঘ একটি পত্র লিখলেন। উত্তরে লর্ড তাঁর স্ত্রীকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানালেন।

সেদিক থেকে ওটিস প্রতাড়িত হয়েছিলেন। কারণ অকেজো হলেও, ভূত বাড়ি ছাড়ে নি। বরং একথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে যখনই সে শুনল চেসায়ারের যুবক ডিউক ওখানে অতিথি হিসাবে আসছে তখনই সে আর একবার গা-ঝাড়া দিয়ে উঠলো। এরই বাবার কাকা, লর্ড ফ্রানসিস স্টিলটন ক্যানটারভাইলের ভূতের সঙ্গে পাশা খেলবে বলে কর্নেল বারবারির সঙ্গে একবার একশ গিনি বাজি ধরেছিলেন। পরেরদিন সকালে তাস খেলার ঘরে মেঝের ওপরে তিনি অসহায় অবস্থায় পক্ষাঘাতে পড়েছিলেন। তারপরে যদিও তিনি অনেক বছর বেঁচেছিলেন তবু আর কোনদিন তিনি 'ডবল সিকসেস' ছাড়া আর কিছু বলতে পারেন নি। যদিও এই ঘটনাটা তখনকার দিনে অনেকেই জানত তবু দুটি অভিজাত বংশের সম্মানের জন্যে ঘটনাটাকে চাপা দেওয়ার উদ্দেশ্যে সব রকম ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল। স্টিল-টনদের ওপরে তার যে প্রভাব এখনও রয়েছে সেটা প্রমাণ করার জন্যেই সে স্বাভাবিকভাবেই ব্যাকুল হয়ে উঠলো। সেইজন্যে সে ঠিক করল ভার্জিনিয়ার প্রেমিকের কাছে সে 'ভাম্পায়ার মঙ্ক' অথবা 'ব্লাডলেশ বেনিডিকটাইন'-এর বেশ ধরে দেখা দেবে। এই অভিনয়টি লেডী স্টারটাপ ১৭৬৪ সালের নববর্ষের রাত্রিতে দেখেছিলেন; দেখেই ভয়ে চীৎকার করতে করতে তাঁর ফিট হল; আর তাতেই তিন দিনের দিন তিনি মারা গেলেন। মারা যাওয়ার সময় নিকট আত্মীয় ক্যানটারভাইলসদের তাঁর সমস্ত সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত ক'রে তিনি তাঁর সব সম্পত্তি তাঁর লণ্ডনের ওষুধ

বিক্রেতাকে দিয়ে গেলেন। কিন্তু শেষকালে যমজ ভাইদের ভয়ে সেই পরিকল্পনা তাকে ছাড়তে হল।

এরই কয়েকদিন পরে একদিন ভার্জিনিয়া আর তার কোঁকড়ানো চুল-ওয়ালা প্রেমিক দুজনে বিকেলে মাঠের দিকে ঘোড়ায় চড়ে ঘুরতে গেল। একটা বুনো ঝোপ পেরোতে গিয়ে ভার্জিনিয়া তার পোশাক এমন বিশ্রীভাবে ছিঁড়লো যে বাড়ি ফিরে সে ঠিক করল যাতে কেউ তাকে ওই অবস্থায় দেখতে না পায় সেই জন্যে সে পেছনের সিঁড়ি দিয়ে ঢুকবে। এই ভেবে সে ট্যাপেস্ট্রি চেম্বারের পাশ দিয়ে ছুটতে সুরু করল। চেম্বারের দরজাটা সামান্য একটু খোলা ছিল। তার মনে হল ভেতরে কেউ রয়েছে। তার মায়ের পরিচারিকা মাঝে মাঝে ওইখানে বসে তার কাজকর্ম করত। সে ভাবলো তাকেই সে তার পোশাকটা সেলাই করে দিতে বলবে। এই ভেবে ঘরের ভেতরে উঁকি দিল। উঁকি দিয়েই একেবারে অবাক হয়ে গেল। স্বয়ং ক্যানটারভাইল ভূত বসে রয়েছে সেখানে। জানালার ধারে বসে বসে ইয়োলো গাছের শুকনো সোনালা ফুলগুলির দিকে তাকিয়ে রয়েছে। সোনালী ফুলগুলি বাতাসে উড়ছে; ঝড়ের আবেগে লাল পাতাগুলি উন্মত্ত আবেগে দীর্ঘ পথের ওপরে বেড়াচ্ছে নেচে। একটা হাতের ওপরে মাথাটা রেখে সে বসে রয়েছে। দেখলেই মনে হবে তার সারা সত্তার ওপরে মারাত্মক রকমের একটা অবসাদ নেমে এসেছে। একেবারে নিঃসঙ্গ পরিত্যক্ত মনে হল তাকে। এ-অবসাদ তার আর সারার নয়। ভূতটিকে ওই অবস্থায় দেখে প্রথমেই তার মনে হয়েছিল ছুটে পালিয়ে গিয়ে নিজের ঘরে ঢুকে পড়া, কিন্তু তারপরেই কেমন যেন দয়া হল তার। তাকে সান্ত্বনা দেওয়ার বাসনায় ভার্জিনিয়া উদ্বুদ্ধ হয়ে হালকা পায়ে তার দিকে এগিয়ে গেল। ভূতটি দুঃখ আর হতাশায় এতই মুহ্যমান হয়ে পড়েছিল যে কথা না বলা পর্যন্ত ভার্জিনিয়ার উপস্থিতি সে টেরই পায় নি।

ভার্জিনিয়া বলল—আপনার জন্যে আমি দুঃখিত; কিন্তু আমার ভাইরা কালই ইটন এ পড়তে চলে যাচ্ছে। এরপর থেকে আপনি যদি ভালভাবে চলাফেরা করেন তাহলে আপনাকে আর কেউ বিরক্ত করবে না।

সেই সুন্দরী মেয়েটি যে তার সঙ্গে কথা বলবে এটা ভাবতে না পেরে অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে ভূত বলল—আবোল-তাবোল বলে তো লাভ নেই—ভালভাবে চলাফেরা করার কথা—সে অসম্ভব—যা হয় না তাই, উদ্ভট ব্যাপার। আমাকে শেকলের শব্দ করতে হবে, ঝাঁঝরির ভেতর দিয়ে গোঙাতে হবে—রাত্রিতে বারান্দায় বারান্দায় ঘুরে বেড়াতে হবে। অবশ্য ভালভাবে চলাফেরা বলতে এই যদি তুমি বোঝাতে চাও সেটা হল অন্য কথা। আমার অস্তিত্বের কারণ একমাত্র ওইগুলিই।

উঁহু। অস্তিত্ব বজায় রাখার ওটা কারণই হ'তে পারে না। তাছাড়া, আপনি যে খুব দুষ্ট প্রকৃতির ছিলেন তা আপনি নিজেও জানেন। যেদিন আমরা

এখানে প্রথম এলাম সেইদিনই মিসেস উমনে আমাদের বলেছেন যে আপনি আপনার স্ত্রীকে খুন করেছিলেন।

ভূত বিরক্ত হয়ে বলল—সেকথা আমিও স্বীকার করি। কিন্তু সেটা আমার ঘরোয়া ব্যাপার। সেবিষয়ে আর কারও কিছু বলার এক্তিয়ার নেই।

নীতির কথা সুরু হলে ভার্জিনিয়া মাঝে মাঝে একটু গম্ভীর হয়ে পড়ে। এই কথা শুনে সে বলল—কাউকে হত্যা করাটা অন্যায়।

বস্তুনিরপেক্ষ নীতির সস্তা বাড়াবাড়িটাকে আমি ঘৃণা করি। আমার স্ত্রী ছিল একেবারে অকর্মা। সে কোনদিন আমার জামার কলারে মাড দিত না; আর রান্নার ব্যাপাবে সে ছিল একেবারে অপদার্থ। তোমাকে বলব কী, একবার 'হোগলে' বনে আমি একটা খরগোস শিকার করেছিলাম। কি অদ্ভুত মাংস তার। তুমি জান সেটা কি বিশ্রী রান্না করল সে। একেবারে অখাদ্য। সেসব কথা থাকগে। সেসব চুকে বুকে গেছে। কিন্তু তাদের বোনকে খুন করলেও তার ভাইদেব উচিৎ হয়নি আমাকে অনাহারে মেরে ফেলা।

অনাহারে মেরে ফেলা! হায় মিস্টাব ভূত, অর্থাৎ, স্যার সাইমন, আপনার কি ক্ষিদে পেয়েছে? আমার ব্যাগে স্যানডউইচ রয়েছে। খাবেন?

না, ধন্যবাদ। আজকাল আমি আর কিছু খাই নে। তুমি যে বললে এতেই আমি খুশি। তোমাদের ওই বর্বর, অসৎ ভয়ঙ্কর আব যাচ্ছেতাই রুচির পরিবারবর্গের তুলনায় তুমি অনেক ভাল।

ভার্জিনিয়া মেঝেব উপর পা ঠুকে বলল—চুপ। আপনি নিজেই বর্বব, ভয়ঙ্কর আর যাচ্ছেতাই। আর অসৎ হওয়ার কথা যদি বলেন তা হলে বলতে হয় আপনিই আমার রঙের বাক্স থেকে রঙ চুরি ক রে লাইব্রেরী ঘরে ওই রক্তের দাগ এঁকেছিলেন। আমরা তো হেসে মরে যাই। প্রথমে আপনি নিলেন সিঁদুর-শুদ্ধ সব লাল রঙ। ফলে, সূর্যাস্তের ছবি আঁকা আমার বন্ধ হয়ে গেল। তারপরে আপনি চুরি করলেন আমার এমারেল্ড-গ্রীন আর ক্রোম ইয়োলো। শেষকালে পড়ে রইল কেবল ইনডিগো আর চাইনিস হোয়াইট। এখন আমি চাঁদনী রাতের ছবি ছাড়া আর কিছুই আঁকতে পারি নে। এই দৃশ্য কেবল যে মনটাকে ভারাক্রান্ত করে তোলে তা-ই নয়, আঁকাও বড কষ্টকর! যদিও আমি খুবই বিরক্ত হয়েছিলাম তবু এবিষয়ে আপনাকে আমি কিছু বলি নি। তাছাড়া, সমস্ত ব্যাপারটাই বড হাস্যকর। কারণ, রক্তের রঙ এমারেল্ড গ্রীন হবে একথা কেউ কোনদিন শুনেছ?

ভূতটি শান্ত আর বিনয়ের সঙ্গেই বলল—তা বটে। কিন্তু আমার করারই ব কী ছিল? আজকাল সত্যিকার রঙ পাওয়া মুস্কিল। তাছাড়া, তোমার ভাই যখন 'পারগান ডিটারজেন্ট'-এর সাহায্য নিলে তখন তোমার রঙ চুরি করতেই বা আমার দোষটা কোথায়? আর রঙের কথা যদি বল ওটা হচ্ছে রুচির কথা। ক্যানটারভাইলদের ধমনীতে নীল রক্ত বইছে—ইংলণ্ডে সবচেয়ে

গাঢ় নীলও বলতে পারে—; কিন্তু আমি জানি তোমরা যারা অ্যামেরিকান তাদের ওসব বালাই নেই।

আপনি কিছুই জানেন না। আপনার উচিৎ অ্যামেরিকা গিয়ে নিজের মানসিক বৃত্তির উন্নতি করা। অ্যামেরিকায় বিনা খরচে যদি যেতে চান তাহলে আমার বাবা আপনাকে খুশি হয়েই সাহায্য করতে পারেন। যদিও ওখানে সব রকম "স্পিরিটের" ওপরেই বেশ মোটা শুল্ক রয়েছে তবু কাস্টমস-এর হাত থেকে রেহাই পেতে খুব একটা অসুবিধে হবে না। কারণ, ওই বিভাগের অফিসাররা সবাই ডেমোক্র্যাট। একবার নিউ ইয়র্কে হাজির হলেই আপনি নিশ্চয় উন্নতি করবেন। আমি জানি সেখানে এমন অনেক লোক রয়েছে যারা পিতামহ সংগ্রহ করার জন্যে এক লক্ষ ডলার দিতে রাজি হবে; আর ঘরোয়া ভূত পেলে তো কথাই নেই।

না—না। অ্যামেরিকা আমার ভাল লাগবে না।

ভার্জিনিয়া ব্যঙ্গের সুরে বলল—মনে হচ্ছে আপনার কোন ধ্বংসও নেই, কোন কৌতূহলও নেই।

ধ্বংসও নেই! কৌতূহলও নেই! তোমাদের আছে নৌবিভাগ আর আচার!

আমি চললাম। বাবাকে গিয়ে বলি যমজ ভাইদের জন্যে যেন তিনি আরও এক সপ্তাহের ছুটির জন্যে দরখাস্ত করেন।

ভূত চিৎকার ক'রে উঠলো—না, না। আমি বড়ই নিঃসঙ্গ, বড় দুঃখ আমার। কী যে করি বুঝতে পারছি নে। আমি ঘুমোতে চাই; কিন্তু ঘুমোতে পারছি নে।

কী কথা যে বলেন! ঘুমোতে হলে স্রেফ বিছানায় শুয়ে বাতিটা নিভিয়ে দিন। মাঝে-মাঝে জেগে থাকাটা বড় কষ্টকর মনে হয়, বিশেষ ক'রে গির্জায়। কিন্তু ঘুমোতে কোন অসুবিধে নেই। এমন কি শিশুরাও ঘুমোতে জানে। তাদের যে বেশী বুদ্ধি রয়েছে সেকথা আপনিও স্বীকার করবেন না।

ভূত খুব দুঃখের সঙ্গে বলল—তিনশ বছর আমি ঘুমোই নি।

কথাটা শুনে ভার্জিনিয়ার সুন্দর চোখ দুটি অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল।

ভূত বলে গেল—তিনশ বছর আমি ঘুমোই নি। আমি বড় ক্লান্ত।

ভার্জিনিয়া বলল—হতভাগ্য, হতভাগ্য ভূত! তোমার কি ঘুমানোর কোন জায়গা নেই?

নিচু স্বপ্নালু স্বরে ভূত বলল—দূরে···দূরে পাইনবন ছাড়িয়ে ছোট একটা বাগান রয়েছে। সেখানে লম্বা লম্বা ঘাস ঘন হয়ে জন্মেছে। সাদা হেমলক ফুলের সমারোহ জেগেছে সেখানে। সারা রাত ধরে নাইটিংগেল পাখি সেখানে গান করে। সেখানে ঘুমন্ত আত্মার মাথার ওপরে ইউ গাছগুলি তাদের বিরাট বিরাট হাতগুলি দেয় ছড়িয়ে।

জলে ভার্জিনিয়ার চোখ দুটি ভিজে গেল; হাত দিয়ে মুখ ঢাকলো সে। আস্তে আস্তে সে বলল—মৃত্যুর উদ্যানের কথা বলছ?

হ্যাঁ, মৃত্যু। মৃত্যু সত্যিই বড় মধুর। নরম তামাটে মাটির তলায় শুয়ে থাকা; মাথার ওপরে ঘাসগুলি বীজন করবে, কান পেতে শুনবে স্তব্ধতার বাণী। ভূত ভবিষ্যৎ বলে কিছু থাকবে না আর। সময়ের জ্ঞান যাবে হারিয়ে; জীবনকে ক্ষমা করা, নিজের মধ্যে শান্তিকে অনুভব করা কী মধুর! তুমি আমাকে সাহায্য করতে পার? মৃত্যুর দ্বার আমার জন্যে তুমি খুলে দিতে পার। কারণ প্রেম তোমার সঙ্গী। আর মৃত্যুব চেয়ে প্রেমের ক্ষমতা অনেক বেশী।

কেমন যেন তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে গেল ভার্জিনিয়া। মনে হল সে একটা ভয়ঙ্কর স্বপ্ন দেখছে।

তারপরে আবার কথা বলল ভূত। বাতাসের দীর্ঘশ্বাসের মত শোনালো তার স্বর: লাইব্রেরীর জানালার ওপর পুরনো যে একটি ভবিষ্যৎবাণী লেখা রয়েছে তা কি তুমি পড়েছ?

মেয়েটি ওপব দিকে চোখ তুলে বলল—খুব পড়েছি। ভালভাবেই পড়েছি। অদ্ভুত কালো অক্ষরে লেখা। পড়া খুবই কষ্টকর। মাত্র দুটো লাইন লেখা রয়েছে। সোজা কথায় বললে দাঁড়ায়—'কোন সোনালী মেয়েকে দেখে পাপীর মুখ থেকে যেদিন প্রার্থনার বাণী উচ্চারিত হবে, যেদিন বন্ধ্যা বাদাম গাছে ফুলের সমারোহ জাগবে, যেদিন কোন শিশু তার চোখের জল ফেলবে সেইদিনই সারা বাড়ীটা স্তব্ধ হয়ে যাবে—শান্তি নেমে আসবে ক্যানটারভাইলে।' কিন্তু এর অর্থ যে কী তা আমি জানি নে।

সে দুঃখের সঙ্গে বলল—অর্থ হচ্ছে আমার পাপেব জন্যে তোমাকে কাঁদতে হবে। কাবণ, আমার চোখে কোন জল নেই, আমার আত্মার জন্যে আমার সঙ্গে তোমাকে প্রার্থনা করতে হবে। কাবণ, আমার কোন বিশ্বাস নেই। তারপর আমাব সঙ্গে যদি তুমি মিষ্টি আর সদয় ব্যবহার করে থাক তাহলে মৃত্যুর দেবদূত আমাকে দয়া কববেন। অন্ধকারে তুমি ভয়াল ছায়াদের ঘুরে বেড়াতে দেখবে, অমঙ্গলের স্বর তোমার কানে-কানে ফিস ফিস ক'রে অনেক কিছু বলবে; কিন্তু তারা তোমাব কোন ক্ষতি করতে পারবে না, কারণ নরকের শক্তি শিশুর পবিত্রতা নষ্ট করতে পারে না।

ভার্জিনিয়া কোন উত্তর দিল না। তার দিকে তাকিয়ে গভীর নৈরাশ্যে ভূতটি তার নিজের হাত দুটো মোচড়াতে লাগলো। হঠাৎ ভার্জিনিয়া বিবর্ণ মুখে উঠে দাঁড়ালো। তার চোখের ভেতর থেকে একটা অদ্ভুত আলোর জ্যোতি বেরোতে লাগলো। সে শক্ত হয়ে বলল—আমি ভয় পাই নে; তোমার ওপরে দয়া দেখাতে দেবদূতকে আমি বলব।

একটা ক্ষীণ আনন্দের ধ্বনি তুলে সে উঠে দাঁড়ালো; তারপরে তার হাতট ধরে পুরনো যুগের ভঙ্গিমায় চুমু খেল। তার আঙুলগুলি বরফের মত ঠাণ্ডা,

ঠোঁট দুটো আগুনের মত গরম। ভার্জিনিয়া কাঁপলো না। সে তাকে হাত ধরে অন্ধকারাচ্ছন্ন ঘর দিয়ে নিয়ে গেল। বিবর্ণ দেওয়াল চিত্রের উপর ক্ষুদে ক্ষুদে শিকারীদের চিত্র আঁকা রয়েছে। তারা তাদের শিঙা ফুঁকে তাকে সরে যাওয়ার ইঙ্গিত করল। "ক্ষুদে ভার্জিনিয়া চলে যাও, চলে যাও"। কিন্তু ভূত তার হাত শক্ত করে ধরে রইল। সে বন্ধ করে রইলো তার চোখ দুটো। ভীষণ জানোয়াররা লোলুপ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল তার দিকে। "সাবধান, ছোট ভার্জিনিয়া, সাবধান। আর হয়ত আমরা তোমাকে দেখতে পাব না।" কিন্তু ভূতটি তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেল; এবং ভার্জিনিয়া তাদের কথায় কান দিল না। ঘরের শেষে গিয়ে সে থেমে কী যেন বলল। ভার্জিনিয়া তা বুঝতে পারলো না। চোখ খুলে সে দেখলো ঘরের দেওয়ালটা কুয়াশার মত মিলিয়ে যাচ্ছে। তার সামনেই বিরাট একটা গর্ত। কনকনে ঠাণ্ডা বাতাস বইছে। যেন তার পোশাক ধরে টানছে। ভূতটি বলল—তাড়াতাড়ি। তা না হলে বড় দেরি হয়ে যাবে।

মিনিট দশেক পরে চা খাওয়ার ঘণ্টা পড়লো। ভার্জিনিয়া না আসায় মিসেস ওটিস তাকে ডেকে আনার জন্যে চাকর পাঠালেন। কিছুক্ষণ পরে চাকরটি ঘুরে এসে জানালো তাকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। ডিনার টেবিলের জন্যে ভার্জিনিয়া প্রতিদিন বাগানে ফুল তুলতে যেতো। সেইজন্যে মিসেস ওটিস প্রথমে বিশেষ ভয় পান নি। কিন্তু ছটা বাজার পরেও যখন ভার্জিনিয়া এলো না। তখনই তিনি বেশ উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন। উদ্বিগ্ন হয়েই ছেলেদের পাঠিয়ে দিলেন তাঁর খোঁজে, আর মিঃ ওটিস-এর সঙ্গে নিজে প্রতিটি ঘর তন্ন তন্ন করে খুঁজতে লাগলেন। সাড়ে ছটা নাগাদ ছেলেরা ফিরে এসে জানালো তাকে কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না। তারা সকলেই উত্তেজিত হয়ে উঠলো; এবং সেই বিশেষ ক্ষেত্রে কী করা উচিৎ সে সম্বন্ধে কেউ কিছু ঠিক করতে পারলেন না। ঠিক এই সময় হঠাৎ মিঃ ওটিসের মনে পড়লো যে দিন-কয়েক আগে একদল জিপসীকে তাঁর পার্কে তাঁবু ফেলতে অনুমতি দিয়েছিলেন। সেইজন্যেই বড় ছেলে আর দুটি চাকরকে নিয়ে তিনি 'ব্ল্যাকফেল হলো'র দিকে এগিয়ে গেলেন। তিনি জানতেন জিপসীরা ওখানেই তখন রয়েছে। বাচ্চা ডিউক তো মরীয়া হয়ে বলল সেও সঙ্গে যাবে। কিন্তু মারামারি বাঁধতে পারে এই ভয়ে মিঃ ওটিস রাজি হলেন না। সেইখানে উপস্থিত হয়ে তিনি দেখলেন জিপসীরা চলে গিয়েছে—আর চলে গিয়েছে হঠাৎ। ওয়াশিংটন আর দুটি চাকরকে চারপাশ খুঁজতে বলে তিনি তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে এসে দেশের সর্বত্র পুলিশকে টেলিগ্রাম ক'রে দিলেন এই বলে যে জিপসীরা একটা বাচ্চা মেয়েকে নিয়ে পালিয়ে গিয়েছে। তারপরে তিনি ঘোড়া থামাতে বলে স্ত্রী আর তিনটি ছেলেকে ডিনারে বসতে বললেন। তারপরে একটা চাকরকে সঙ্গে নিয়ে তিনি ঘোড়া ছুটিয়ে দিলেন অ্যাসকট রোড-এর দিকে। মাত্র দুমাইলও তিনি যান নি

এমন সময় তাঁর মনে হল কে যেন ঘোড়ায় চেপে তাঁর পেছনে-পেছনে আসছে। ঘুরে চেয়ে দেখলেন টাট্টুতে চেপে ডিউক দৌড়ে আসছে। হাঁপাতে হাঁপাতে এসে ছেলেটি বলল—আমি অত্যন্ত দুঃখিত, মিঃ ওটিস; কিন্তু ভার্জিনিয়াকে না খুঁজে পাওয়া পর্যন্ত আমি খেতে পারলাম না। আমার ওপরে দয়া করে রাগ করবেন না। গতবছর আমাদের বিয়েতে আপনি যদি রাজি হতেন তাহলে এসব ঝামেলা বাঁধতো না। আপনি আমাকে ফিরিয়ে দেবেন না ত? আমি যেতে পারি নে। আমি যাব না।

মন্ত্রী সেই সুন্দর সব-সময় বিপদাপন্ন যুবকটির দিকে চেয়ে না হেসে পারলেন না। ভার্জিনিয়ার ওপরে তার এই আকর্ষণ দেখে মুগ্ধও হলেন একটু। সেইজন্যে ঘোড়া থেকে একটু ঝুঁকে পড়ে বললেন—ঠিক আছে সিসিল। ফিরে যেতে না চাইলে নিশ্চয় তুমি আমার সঙ্গে আসবে। কিন্তু অ্যাসকট-এ গিয়ে তোমার জন্যে একটা টুপী কিনে দেব চল।

এই বলেই দুজনে ঘোড়ায় চড়ে রেল স্টেশনের দিকে ছুটলেন। সেখানে স্টেশন মাস্টারকে জিজ্ঞাসা করলেন ভার্জিনিয়ার চেহারার কাউকে স্টেশনে দেখা গিয়েছে কি না। কিন্তু সেখানে তার কোন সংবাদ পাওয়া গেল না। স্টেশন মাস্টার অবশ্য চারপাশে তার পাঠিয়ে দিয়ে জানালেন যে চারপাশে তাকে খুঁজে বার করার জন্যে তীক্ষ্ণ প্রহরী রাখা হবে। এই শুনে ডিউকের জন্যে একটা টুপী কিনে মিঃ ওটিস বেকসলের দিকে ছুটলেন। জায়গাটা ওখান থেকে মাইল চারেক দূরে একটা গ্রাম। তিনি শুনেছিলেন জায়গাটার পাশেই বিরাট একটা মাঠ থাকায় জিপসীরা সাধারণত ওইখানে ডেরা পাততে ভালবাসে। সেখানে গিয়ে তাঁরা গ্রাম্য চৌকিদারকে ডেকে তুললেন; কিন্তু ভার্জিনিয়ার কোন সংবাদ সে দিতে পারল না। কোথাও কোন সংবাদ না পেয়ে ভীষণ ক্লান্ত হয়ে তাঁরা বাড়িতে ফিরে এলেন। লণ্ঠন নিয়ে গেটের কাছে ওয়াশিংটন আর দুটি যমজ ভাই তাঁদের জন্যে অপেক্ষা করছিল। ভার্জিনিয়ার কোথাও কোন সংবাদ নেই। আবার অন্বেষণ সুরু হল; কিন্তু সব চেষ্টাই ব্যর্থ হল তাঁদের। স্পষ্টই বোঝা গেল অন্তত সেই রাত্রির মত ভার্জিনিয়াকে তাঁরা হারিয়ে ফেলেছেন। খুব দুঃখের সঙ্গে ঘোড়াদুটিকে সহিসের হাতে তুলে দিয়ে মিঃ ওটিস ছেলেদের নিয়ে পায়ে হেঁটে ঘরের ভেতরে ঢুকলেন। ঘরে এসে সবাই দেখলেন চাকররা সব ভয়ে জড়সড় হয়ে বসে রয়েছে। মিসেস ওটিস একটা সোফার ওপরে শুয়ে রয়েছেন। উদ্বেগে তিনি অস্থির হয়ে উঠেছেন। একটি পরিচারিকা তাঁর কপালে ও-ডি-কোলন দিচ্ছে। মিঃ ওটিস মুখে কিছু দেওয়ার জন্যে তাঁকে বারবার অনুরোধ ক'রে আর সকলের জন্যে ডিনার তৈরি করতে নির্দেশ দিলেন। খুবই দুঃখের-সঙ্গেই আহারপর্ব সমাধা হল তাঁদের। খাওয়ার সময় কেউ কোন কথা বলল না। খাওয়া শেষ হওয়ার পরে সকলের অনুরোধ উপেক্ষা করেই সবাইকে তিনি ঘুমাতে যাওয়ার হুকুম দিলেন। যেহেতু তাঁদের দিক থেকে করণীয় কিছু নেই সেই হেতু

তিনি ঠিক করলেন একজন ডিটেকটিভকে পাঠিয়ে দেওয়ার জন্যে। পরেরদিন সকালেই তিনি স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে টেলিফোন করবেন। ডাইনিং রুম থেকে বেরিয়ে আসার সময়ে গম্বুজের ঘড়িতে বারোটা বাজার শব্দ হল; আর বারোটার শেষ ঘণ্টাটি পড়ার সঙ্গে-সঙ্গে হঠাৎ যেন কিছু একটা ভেঙে পড়ে যাওয়ার শব্দ এলো; সেই সঙ্গে শোনা গেল অকস্মাৎ তীব্র একটা আর্তনাদ। ভয়ঙ্কর বজ্রপাতে কেঁপে উঠলো বাড়ি, অপার্থিব সঙ্গীতের একটা সুর ছড়িয়ে পড়ল বাতাসে, বিকট শব্দে সিঁড়ির মাথার ওপরে একটা কাঠের তক্তা ভেঙে পড়ল; আর তারই ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো বিবর্ণ মুখে ভার্জিনিয়া। তার হাতে একটা ছোট বাক্স। মুহূর্তের মধ্যে সবাই তার দিকে ছুটে গেলেন। মিসেস ওটিস দুহাতে জড়িয়ে ধরলেন তাকে, ডিউক তাকে চুম্বনে চুম্বনে অস্থির করে তুলল, আর সকলকে ঘিরে যমজ ভাই দুটি উন্মাদের মত নাচতে সুরু করল।

সকলের সঙ্গে ভার্জিনিয়া এতক্ষণ রসিকতা করছিল এই মনে করে মিঃ ওটিস রাগ করে বললেন—হা ঈশ্বর! এতক্ষণ তুমি কোথায় ছিলে? আমরা তোমার খোঁজে সারা দেশটা ঘুরে বেড়ালাম। তোমার মা তো ভয়ে আধমরা হয়ে গিয়েছেন। আর কোনদিন এইরকম বাস্তব ঠাট্টা তুমি করবে না—বলে দিচ্ছি।

নাচতে-নাচতে যমজ ভাই দুটি বলল—অবশ্য এক ভূতের ওপরে ছাড়া।

ভার্জিনিয়া শান্তভাবে বলল—বাবা, আমি ভূতটির কাছেই এতক্ষণ ছিলাম। সে মারা গিয়েছে। তোমরা তাকে দেখবে চল। সে সত্যিই বড় পাপ করেছিল। তারজন্যে সে অনুতপ্ত হয়েছে। মারা যাওয়ার আগে সে আমাকে এই সব মণিমুক্তো দিয়ে গিয়েছে।

তার সেই গম্ভীর থমথমেভাব দেখে সবাই তার দিকে বিস্মিত দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন। ঘুরে দাঁড়িয়ে সে তাঁদের ভাঙা দেওয়ালের ভেতর দিয়ে সরু একটা গোপন বারান্দায় নিয়ে এলো। বাতি জ্বালিয়ে ওয়াশিংটন তাঁদের পিছু পিছু চলতে লাগলো। অবশেষে তাঁরা একটি ওক কাঠের বিরাট দরজার সামনে উপস্থিত হল। সেই দরজার গায়ে মরচে-পড়া পেরেক গাঁথা রয়েছে। ভার্জিনিয়া তার গায়ে হাত দিতেই সেটা হাট হয়ে খুলে গেল। তাঁরা একটা চোরা কুঠরীর মধ্যে হাজির হলেন। এর ছাদ নিচু। একটা মাত্র জাফরি দেওয়া ছোট জানালা সেই ঘরে রয়েছে। দেওয়ালের সঙ্গে গাঁথা রয়েছে বিরাট একটা লোহার বালা। তার সঙ্গে শেকল দিয়ে বাঁধা একটা শীর্ণ কঙ্কাল। মেঝের ওপরে লম্বা হয়ে শুয়ে রয়েছে কঙ্কালটি। তার কাছ থেকে একটু দূরে নাগালের বাইরে একটা পুরনো খাবারের পাত্র আর কলসী বসানো। দেখে মনে হল কঙ্কালটি তার শীর্ণ হাত দিয়ে সেই দুটি পাত্রকে ধরার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করছে। ওই কলসীতে সম্ভবত একদিন জল ছিল। সেই জলের সবুজ দাগ এখনও তার ভেতরে লেগে ছিল। ভার্জিনিয়া সেই কঙ্কালের সামনে হাঁটু মুড়ে বসে হাত দুটি জড় করে নিঃশব্দে প্রার্থনা করল। বাকি সবাই সেই করুণ ঘটনাটির দিকে স্তব্ধ হয়ে

তাকিয়ে রইলেন। এই ঘটনাটি তখনও পর্যন্ত অনাবিষ্কৃতই ছিল।

ওই কুঠরীটা বাড়ীর কোন্ অংশে তা জানার জন্যে যমজ ভাই দুটি এতক্ষণ জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে ছিল। তাদের মধ্যে একজন হঠাৎ চীৎকার করে উঠলো—দেখ, দেখ ; ওই শুকনো বাদাম গাছে ফুল ফুটেছে। এখান থেকে আমি তা স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি।

দাঁড়িয়ে উঠলো ভার্জিনিয়া। তার মুখের ওপরে ছড়িয়ে পড়লো একটি স্বর্গীয় দ্যুতি। সে বলল—ঈশ্বর ওঁকে ক্ষমা করেছেন।

ডিউক চেঁচিয়ে বলল—তুমি একজন দেবকুমারী ভার্জিনিয়া।

এই বলে ভার্জিনিয়াকে জড়িয়ে ধরে সে তাকে চুমু খেল।

এই অদ্ভুত ঘটনার চারদিন পরে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার আয়োজন হল। শবযাত্রা স্বরু হল ক্যানটারভাইল চেস থেকে রাত্রি প্রায় এগারটার সময়। আটটি কালো ঘোড়া শবাধারটিকে টেনে নিয়ে গেল। ঘোড়ার মাথায় ছিল উটপাখির পালকের নিশান। সীসের কফিনের ওপরে ঢাকা ছিল লাল কাপড়ের একটা আবরণ; তার ওপরে আঁকা ছিল ক্যানটারভাইল কোর্ট-অফ-আর্মস। শবাধারবাহী গাড়ীর আশে পাশে মশাল জ্বালিয়ে চলছিল চাকর-বাকরদের দল। সমস্ত শোভাযাত্রাটিই বেশ জাকজমকপূর্ণ ছিল। প্রধান শোককর্তা ছিলেন লর্ড ক্যানরটারভাইল। ওয়েলস থেকে বিশেষ ক'রে এই শোভাযাত্রায় অংশ গ্রহণ করতেই তিনি এসেছিলেন। ভার্জিনিয়ার সঙ্গে তিনি বসেছিলেন প্রথম গাড়ীটিতে। তারপরে ছিলেন সস্ত্রীক যুক্তরাষ্ট্রের মন্ত্রী, তারপরে ওয়াশিংটন; তিনটি ছেলে তারপরে। সকলের শেষে ছিলেন মিসেস্ উমনে। তাঁর জীবনের পঞ্চাশটি বছর ভূতটি তাকে বিব্রত করেছিল বলেই তিনি যে তার শেষ-কৃত্যটি দেখবেন এটা ধরে নেওয়া যেতে পারে। গির্জার এক কোণে বৃদ্ধ একটি ইউ গাছের তলায় গভীর গর্ত খোড়া হল। রেভা. অগাস্টাস ড্যামপিয়ার বেশ গম্ভীর পরিবেশের মধ্যে প্রার্থনার পদগুলি পড়লেন। অনুষ্ঠান শেষ হলে ক্যানটারভাইল বংশের প্রথা অনুযায়ী চাকররা তাদের মশালগুলি নিভিয়ে দিল। কফিনটাকে মাটির তলায় নামানোর সময় ভার্জিনিয়া এগিয়ে গিয়ে সাদা আর ফিকে রঙের বাদামের ফুল দিয়ে তৈরি করা বড় একটা ক্রুশ তার ওপরে রাখলে মেঘ কেটে গিয়ে আকাশে চাঁদ উঠলো আর সেই ছোট গির্জার কবরখানাতে ছড়িয়ে দিল রূপোর আলো। দূর থেকে গান করতে লাগলো একটি নাইটিংগেল পাখী।

পরেরদিন সকালে লর্ড ক্যানটারভাইল শহরে ফিরে যাওয়ার আগে ভূতটি ভার্জিনিয়াকে যে মুক্তোর বাক্সটি দিয়েছে সে সম্বন্ধে মিঃ ওটিস তাঁর সঙ্গে আলোচনা করতে বসলেন। মুক্তোর গয়নাগুলি ষোড়শ শতাব্দীর; মূল্য আর শিল্পকলার দিক থেকে সেগুলি অনবদ্য। তাই সেগুলি গ্রহণ করতে মিঃ ওটিসের বিবেকে লাগছিল। তিনি বললেন—মি লর্ড, এদেশে দানপত্রের সঙ্গে জমি আর

ছোট-খাটো অলঙ্কার দেওয়ার প্রথা রয়েছে। আর এটা আমার কাছে খুবই পরিষ্কার যে ওইসব অলঙ্কারগুলিই নীতিগতভাবে উত্তরাধিকারসূত্রে আপনারই বংশের প্রাপ্য। সেইজন্যে বিশেষ একটি অজ্ঞাত পরিস্থিতিতে আবিষ্কৃত ওই রত্নগুলি সঙ্গে নিয়ে লণ্ডনে যেতে আপনাকে আমি অনুরোধ করছি। আমার মেয়ের কথা যদি বলেন তাহলে বলব ও হচ্ছে বাচ্চা। তাছাড়া, ওইরকম অলঙ্কার নিয়ে অলস বিলাসীতায় জীবন কাটাতেও সে অভ্যস্ত বা উৎসুক নয়। মিসেস ওটিসের আর্টের বিষয়ে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা রয়েছে। কারণ বাল্য বয়সে কয়েকটি শীত তিনি বস্টনে কাটিয়েছিলেন। তিনি আমাকে বলেছেন যে ওই অলঙ্কারগুলি বিক্রি করলে অনেক দাম পাওয়া যাবে। এই সব কারণে লর্ড ক্যানটারভাইল, আপনি বেশ বুঝতে পারছেন ওইগুলি আমার পরিবারে কেন রাখতে আমি রাজি হচ্ছি নে। আর সত্যি কথা বলতে কি এই সব মূল্যবান জমকালো অলঙ্কার ব্রিটিশ অভিজাত সম্প্রদায়ের কাছে যতই গৌরবজনক বলে মনে হোক না কেন আমাদের মত যারা রিপাবলিকানের সাধারণ আর অমর নীতিতে মানুষ হয়ে উঠেছে তাদের কাছে ওদের কোন দাম নেই। অবশ্য একথাটা আমি উল্লেখ করতে চাই যে আপনার হতভাগ্য আর বিপথগামী পূর্বপুরুষের স্মৃতিচিহ্ন হিসাবে ওই বাক্সটি নিজের কাছে রাখতে পারলে ভার্জিনিয়া খুশি হবে। বাক্সটা অতি পুরাতন আর সেই সঙ্গে সংস্কারের বাইরে চলে গিয়েছে বলেই আমার ধারণা। আমার অনুরোধ রাখাটা আপনার কাছে কষ্টকর হবে না। আমার কথা যদি বলেন তাহলে একথা বলতে আমি বাধ্য যে আমার কোন সন্তানের মধ্যযুগীয় কোন জিনিসের ওপরে যে আকর্ষণ রয়েছে তা জানতে পেরে আমি সত্যিই বিস্মিত হয়েছি। এর একমাত্র কারণ সম্ভবত এই যে মিসেস ওটিস এথেন্স থেকে ফেরার পথে লণ্ডনের একটি শহরতলীতে দিনকতক যখন অবস্থান করেছিলেন সেইসময়েই ওর জন্ম হয়েছিল।

এই সম্মানিত মন্ত্রীর কথাগুলি বেশ গভীরভাবেই মুচকি মুচকি হাসতে-হাসতে লর্ড ক্যানটারভাইল শুনছিলেন। মন্ত্রী মহোদয়ের কথা শেষ হওয়ার পরে তিনি বেশ হৃদ্যতার সঙ্গে তার করমর্দন করে বললেন—প্রিয় স্যার, আপনার সুন্দরী কন্যা আমার হতভাগ্য পূর্বপুরুষ স্যার সাইমনের যথেষ্ট উপকার করেছে। সেদিক থেকে তার এই সাহসের জন্যে আমি এবং আমার বংশের সকলেই তার কাছে কৃতজ্ঞ। ওই অলঙ্কারগুলি ন্যায়ত তারই প্রাপ্য। তাছাড়া, হৃদয়হীনের মত ওই অলঙ্কার-গুলি আমি যদি তার কাছ থেকে নিয়ে চলে যাই তাহলে আমার বিশ্বাস সেই দুষ্ট বৃদ্ধটি একপক্ষের মধ্যেই তার কবরখানা থেকে উঠে আমার একেবারে প্রাণান্ত করে ছেড়ে দেবে। উত্তরাধিকারের কথা যদি বলেন তাহলে বলতে পারি যে উইল-এ যা লেখা নেই তা কখনও উত্তরাধিকারের প্রাপ্য নয়। ওই রত্নগুলির অস্তিত্ব আমরা কেউ জানতাম না। সেদিক থেকে বিচার করলে ওই রত্নগুলির ওপরে আমার যদি কোন অধিকার থাকে, তাহলে আপনার হেড বাবুটিরও

সেই একই অধিকার রয়েছে। তাছাড়া, মিঃ ওটিস আপনি হয়ত ভুলে যাচ্ছেন যে সভূত বাড়ীটাকেই আপনি কিনেছিলেন ; সুতরাং ভূতের যদি কোন সম্পত্তি থেকে থাকে সে-সম্পত্তিও আপনারই। কারণ স্যার সাইমন রাত্রিতে বারান্দায় ওপরে ঘুরে বেড়ালেও, আইনের দিক থেকে তিনি মৃত, এবং দাম দিয়েই আপনি তাঁর সম্পত্তি কিনে নিয়েছিলেন।

লর্ড ক্যানটারভাইলের এবম্বিধ প্রত্যাখ্যানে মিঃ ওটিস খুবই মর্মাহত হলেন, তাঁর মতটা পুনর্বিবেচনা করার জন্য অনুরোধও আর একবার তাঁকে করলেন ; কিন্তু সৎ-বুদ্ধিসম্পন্ন লর্ড তাঁর মতে অবিচল হয়ে রইলেন। ভূতের সম্পত্তি রেখে দেওয়া ছাড়া মিঃ ওটিসের আর কোন উপায় রইলো না।

১৮৯০ সালের বসন্তকালে যখন চেশায়ারের যুবতী ডাচেসের বিবাহ উপলক্ষে তাকে রাণীর প্রথম ড্রয়িংরুমে নিয়ে যাওয়া হল তখন সবাই তার অলঙ্কারগুলি দেখে একেবারে ধন্য-ধন্য করে উঠলো। ভার্জিনিয়া আর যুবক ডিউকের বিয়েতে সবাই আনন্দিত হল ; কারণ, এমন রাজযোটক মিল নাকি সহজে কারও চোখে পড়ে না। খুশি হলেন না কেবল ডাম্বলটনের মারশনেস। ভদ্রমহিলার সাতটি অবিবাহিতা কন্যা ছিল। তাদের একটিকে ডিউকের ঘাড়ে চাপানোর জন্যে তিনি তিনবার বেশ মোটা খরচ ক'রে ডিনার পার্টি দিয়েছিলেন, আর সবচেয়ে আশ্চর্যের ঘটনা হচ্ছে সেই পার্টিতে মিঃ ওটিসকেও তিনি নিমন্ত্রণ করেছিলেন। মিঃ ওটিস ডিউককে খুবই পছন্দ করতেন ; কিন্তু নীতিগতভাবে তার ওই খেতাবটি তার কাছে ছিল বড়ই অবান্তর। কিন্তু আপত্তি শেষ পর্যন্ত তাঁর ধোপে টেকে নি। আমার মনে হয় বর আর বধূ হাত ধরাধরি করে যখন সেন্ট জর্জ গির্জার বেদীর কাছে ঘুরছিল তখন ইংলণ্ডের মধ্যে মিঃ ওটিসের মত গর্বিত মানুষ আর কেউ ছিল না।

বিবাহ বাসর উদ্‌যাপন ক'রে ডিউক আর ডাচেস ক্যানটারভাইল চেস-এ যেদিন ফিরে এলো তার পরেরদিন বিকেলের দিকে তারা হাঁটতে হাঁটতে পাইন বনে ঘেরা নির্জন সমাধির কাছে হাজির হল। স্যার সাইমনের সমাধি ফলকটি খুঁজে বার করতে তাদের কষ্ট হয়েছিল যথেষ্ট। ডাচেস সঙ্গে নিয়ে এসেছিল কয়েকটি সুন্দর গোলাপ। সেইগুলি সে সমাধির ওপরে ছড়িয়ে দিল। কিছুক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়ে তারা ধ্বংসপ্রায় সমাধিগুলির চারপাশে ঘুরে বেড়াতে লাগলো। সেইখানে একটি ভাঙ্গা স্তম্ভের ধারে ডাচেস বসে পড়লো, সিগারেট খেতে-খেতে ডিউক তার পায়ের কাছে বসে তার সুন্দর চোখ দুটির দিকে রইলো তাকিয়ে। ডিউক হঠাৎ তার সিগারেটটা ছুঁড়ে ফেলে ডাচেসের হাতটা ধরে বলল—ভার্জিনিয়া, কোন স্ত্রীর তার স্বামীর কাছ থেকে কিছু লুকিয়ে রাখা উচিত নয়।

প্রিয় সিসিল, আমি তো কিছু লুকিয়ে রাখি নি।

ডিউক হেসে বলল—রেখেছ। ভূতের সঙ্গে ঘরের মধ্যে থাকার সময় তোমার কী কথা হয়েছিল সেকথা তো বল নি।

ভার্জিনিয়া গম্ভীরভাবে বলল—সেকথা আমি কাউকে বলিনি।

আমি তা জানি; কিন্তু আমাকে বলতে পার।

দয়া করে আমাকে তা বলতে বলো না, সিসিল। আমি তা বলতে পারব না। হতভাগ্য স্যার সাইমন! তাঁর কাছে আমি সত্যিই বড় ঋণী। হেসো না, সত্যিই বলছি ঋণী। তাঁর কাছ থেকেই আমি বুঝতে পেরেছি জীবন কী জিনিস, মৃত্যু বলতে কী বোঝায়; আর প্রেম ওদের চেয়ে কেন মহত্তর।

তোমার ওই হৃদয়টা যতক্ষণ আমার থাকবে ততক্ষণ ওই কথাটা তুমি গোপন করেই রেখো।

আমার হৃদয় চিরকাল তোমারই থাকবে, সিসিল।

আমাদের সন্তানদের সেই কথাটা একদিন তুমি বলবে—বলবে না?

লজ্জায় ভার্জিনিয়ার মুখটা লাল হয়ে উঠলো।

The Cantervile Ghost—*Oscar Wilde*

মরা হাত

প্রায় মাস আষ্টেক আগে একদিন সন্ধ্যায় আমার একটি বন্ধু লুই আর কয়েকটি কলেজের বন্ধুকে নিমন্ত্রণ করেছিল। আমরা খানা-পিনা করলাম, ধূমপান করলাম, সাহিত্য আর কলা নিয়ে আলোচনা করলাম, আর পাঁচজনে একসঙ্গে মিশলে যেসব আজগুবী গল্প ক'রে সেই ধরনের গল্প করলাম। এমন সময় দরজা খুলে গেল। বলা নেই কওয়া নেই, আমার একটি সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু ঝড়ের মত বেগে ঘরের মধ্যে ঢুকে এল। এসেই প্রশ্ন করল—কোথা থেকে আসছি বলত? একজন বলল—নিশ্চয় ম্যাবিল থেকে। আর একজন বলল—উঁহু! তোমাকে খুব স্ফূর্তিবাজ দেখাচ্ছে। নিশ্চয় এইমাত্র কারও কাছ থেকে তুমি টাকা ধার করেছ, অথবা, কোন কাকাকে কবর দিয়ে এসেছ, অথবা তোমার হাত-ঘড়িটা বন্ধক দিয়েছ

বন্ধুটি বলল—কোনটাই ঠিক নয়। আমি আসছি নরম্যাণ্ডি থেকে। সেখানেই আমি সপ্তাহখানেক ছিলাম। আসার সময় আমার সম্মানিত একটি ক্রিমিন্যাল বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে এসেছি। অনুমতি হলে, সেটিকে এখনই তোমাদের আমি দেখাতে পারি।

এই বলেই পকেটের ভেতর থেকে সে একটা হাতের কঙ্কাল বার ক'রে আনল। উঃ—কী বীভৎস তার চেহারা! কালো, শুকনো, চিমসে, আর লম্বাটে। অদ্ভুত ক্ষমতাশালী মাংসপেশী হাতের পেছন আর তালুর মধ্যে একটা

চামড়া দিয়ে আটকানো রয়েছে। বেগুনে রঙের সঙ্কীর্ণ নখগুলি আঙুলের ডগায় আটকে রয়েছে। অনেক দূর থেকে দেখলেও বোঝা যায় এ হাত নিঃসংশয়ে কোন ক্রিমিন্যালের।

আমার বন্ধুটি বললেন—দেখছ? এই সেদিন বৃদ্ধ একটি যাদুকরের সব সম্পত্তি বিক্রী হয়ে গেল। লোকটি গ্রামাঞ্চলে বেশ পরিচিত ছিল। প্রতি শনিবার রাত্রিতে লোকটি ঝাঁটার ওপরে চেপে স্যাবাথে যেত। নানারকম যাদু দেখাত সে। যাই হোক, এই হাতটার ওপরে বুড়োটার খুব মায়া ছিল। সেই বলতে হাতটা হচ্ছে একটি বিখ্যাত আর সম্মানিত ক্রিমিন্যালের। ১৭৩৬ সালে সেই লোক তার আইনসঙ্গত স্ত্রীর মাথা কেটে কুয়োর মধ্যে ফেলে দিয়েছিল, তারপরে, যে পাদরী তাদের বিয়ে দিয়েছিল তাকে জবাই করে গির্জার চূড়ায় গেঁথে রেখেছিল। এই দুটি বীরত্বের পরিচয় দিয়ে সে পৃথিবী পরিক্রমায় বেরিয়ে গেল। তার সেই স্বল্প আর ব্যস্ত কর্মজীবনে বারটি ভ্রমণকারীর অর্থ চুরি করল, একটি মঠে গিয়ে কুড়িটি পাদরীকে ধোঁয়া করে দিল, আর মঠটিকে তার হারেমে পরিণত করল।

আমরা চীৎকার করে উঠলাম—তা তো করল। কিন্তু ওটিকে নিয়ে তুমি কী করবে?

কেন? পাওনাদারদের তাড়ানোর জন্যে আমি এটিকে আমার কলিঙ বেলের সঙ্গে বেঁধে রাখব।

আর একটি বন্ধু বলল—আমার ধারণা এটি একটি ভারতীয় মাংসের টুকরো, একটি নতুন প্রক্রিয়ায় এটিকে রাখা হয়েছে। তুমি বরং এটিকে স্যুপ তৈরি করে খেয়ে ফেল।

আমাদের একটি বন্ধু ছিল ডাক্তার। সে বেশ গম্ভীরভাবেই বলল—ভদ্রমহোদয়গণ, ঠাট্টা করবেন না। পেয়ারী, আমার উপদেশ যদি নাও তাহলে খৃশ্চানদের রীতি মত এটির একটি পরিচ্ছন্ন অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার ব্যবস্থা কর। অন্যথায়, এর সত্যিকার অধিকারী হয়ত তোমার কাছ থেকে এটি দাবি করার জন্যে ফিরে আসবে। তাছাড়া, সম্ভবত, এই হাতটিরও কিছু কুঅভ্যাস জন্মেছে। 'একবার যে চোর হয় সে সব সময়েই চোর—এই প্রবাদ বাক্যটির কথা হয়ত তুমি জান।

তারপরে সবাই আমরা মদ খেতে সুরু করলাম। এক পেয়ালা মদ উঁচুতে ধরে পেয়ারী সেই হাতটিকে অভিবাদন করে বলল—তোমার প্রভুর পরবর্তী আগমনের উদ্দেশ্যে আমি মদ খাচ্ছি।

তারপরে আসর ভেঙে গেল। যে যার বাড়ি চলে গেলাম আমরা।

পরের দিন বেলা প্রায় দুটোর সময় আমি তার বাড়ীর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম। তাই ভেতরে ঢুকে গেলাম। পেয়ারী তখন ধূমপান করতে করতে বই পড়ছিল।

জিজ্ঞাসা করলাম—কেমন আছ হে?

ভালই।

তোমার সেই হাতটির খবর কী?

আমার হাত? ও! আমার কলিঙ বেলের সঙ্গে বাঁধা রয়েছে দেখ নি? কাল রাত্রিতেই বেঁধে রেখেছি। ভাল কথা, মনে পড়েছে। কাল রাত্রিতে, নিশ্চয় আমাকে বিরক্ত করার জন্যে, কে যেন বেল বাজাচ্ছিল। কে বেল বাজাচ্ছে জিজ্ঞাসা করলাম; কিন্তু কেউ কোন উত্তর দিল না। আমি আবার ঘুমিয়ে পড়লাম।

ঠিক সেই সময়ে কলিঙ বেলটা বেজে উঠল। বাড়ীওয়ালা বেল বাজাচ্ছিল। লোকটা অসভ্য আর উদ্ধত। আমাদের কোনরকম সম্ভাষণ না করেই সে ঘরের ভেতরে ঢুকে এল। তারপর আমার বন্ধুকে বলল—ওই চিমসে হাতটাকে এখনই সরিয়ে ফেলার জন্যে আপনাকে আমি অনুরোধ করছি। অন্যথায় এই বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়ার জন্যে আপনাকে অনুরোধ করতে আমি বাধ্য হব।

পেয়ারী বেশ গম্ভীরভাবেই বলল—স্যার, আপনি হাতটির অপমান করছেন। আরও ভদ্র ব্যবহার পাওয়ার যোগ্যতা ওর রয়েছে। জেনে রাখুন ওটি একটি সম্ভ্রান্ত মহোদয়ের হাত।

আর কিছু না বলেই বাড়ীওয়ালা যেমন এসেছিল তেমনি বেরিয়ে গেল। পেয়ারী তার পিছু পিছু বাইরে গিয়ে হাতটা খুলে এনে তার ঘরের ভেতরে যে বেল ছিল তার সঙ্গে বেঁধে রাখলো।

সেদিন রাত্রিতে আমার ভাল ঘুম হয় নি। কেমন যেন ভয়-ভয় লাগছিল আমার। ঘুমোতে ঘুমোতে আমি থেকে-থেকে চমকে উঠছিলাম। মনে হচ্ছিল একটা লোক যেন আমার ঘরের মধ্যে চলাফেরা করছে। তারপরে ভোর ছ'টা নাগাদ তন্দ্রাটি আসার সঙ্গে-সঙ্গে দরজায় ভীষণ ধাক্কা হতে লাগল। লোকটি আর কেউ নয়, আমারই বন্ধুর চাকর। প্রায় উলঙ্গ অবস্থায়, বিবর্ণমুখে কাঁপতে কাঁপতে এসে সে বলল—'আমার মনিবকে কারা যেন মেরে ফেলেছে।' কথাটা শুনে কোনরকমে পোশাক জড়িয়ে আমি পেয়ারীর বাড়ির দিকে ছুটলাম।

বাড়ির চারপাশে লোক গিজ-গিজ করছে। নানারকম আলোচনাও করছে তারা। অনেক কষ্টে আমি ঘরের ভেতরে ঢুকলাম। চারজন পুলিশ অফিসার ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে ফিস-ফিস করে নিজেদের মধ্যে কথা বলছিলেন। একটা খাতা খুলে কী যেন সব লিখছিলেনও। যে বিছানায় পেয়ারী অচৈতন্য অবস্থায় পড়েছিল সেইখানে দাঁড়িয়ে দুজন ডাক্তার আলাপ করছিলেন। না, পেয়ারী মারা যায় নি। তবে তার চেহারাটা ভয়ানক রকমের বীভৎস হয়ে উঠেছিল। সে ভয়ার্ত চোখে তাকিয়েছিল, চোখের তারাগুলি হয়ে উঠেছিল বিস্ফারিত। একটা অদ্ভুত আর ভয়ঙ্কর বস্তুর দিকে সে যেন অবর্ণনীয়

আতংকে তাকিয়েছিল। তার গলায় পাঁচটি আঙুলের বীভৎস দাগ রয়েছে। কেউ যেন শক্ত আঙুল দিয়ে এত জোরে গলা টিপে ধরেছিল যে তার মুখ দিয়ে রক্ত বেরিয়ে এসেছিল। ঠিক সেই সময় একটা দিকে আমার লক্ষ্য পড়ল। ঘরের চারপাশে তাকিয়ে দেখলাম। সেই চিমসে হাতটাকে দেখতে পেলাম না। জনসাধারণের মনে বিশ্রী একটা প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে এই ভয়েই ডাক্তারেরা নিশ্চয় ওটাকে সরিয়ে ফেলেছেন। ওটার কী হল সেকথা কাউকে আমি জিজ্ঞাসা করি নি।

পরের দিন খবরের কাগজে পুলিশের তরফ থেকে এবিষয়ে তদন্তের যে রিপোর্ট বেরিয়েছিল তার কিছুটা অংশ আমি এখানে উদ্ধৃত করছি—

"গত রাত্রিতে মঁসিয়ে পেয়ারী বি—নামে একটি যুবক আইনের ছাত্রের ওপরে ভীষণ ধরনের অত্যাচার হয়েছে। ভদ্রলোক নরম্যাণ্ডির একটি সম্ভ্রান্ত বংশের সন্তান। ভদ্রলোক রাত্রি দশটার সময় বাড়িতে ফিরে আসেন। বিশেষ ক্লান্ত ছিলেন ব'লে তিনি ভৃত্য ববিনকে শুতে ব'লে নিজেও ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়েন। মধ্যরাত্রির কাছাকাছি কোন একসময়ে এই ভৃত্যের ঘুম ভেঙে যায়। তখন ঘরের মধ্যে প্রচণ্ড জোরে কলিঙ বেল বেজে যাচ্ছিল। ভয় পেয়ে আলো জেলে সে অপেক্ষা করতে থাকে। তারপরে মিনিটখানেক বন্ধ থাকার পর আবার এমন জোরে বেল বাজতে সুরু করে যে সে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দরোয়ানকে ডাকতে ছুটে যায়। দরোয়ান পুলিশকে সংবাদ দেয়। মিনিট পনের পরে পুলিশ হাজির হয়।

"একটি বীভৎস দৃশ্য তাদের চোখে পড়ে। আসবাবপত্র লণ্ডভণ্ড। মনে হল আততায়ীর সঙ্গে তাঁর ভীষণ একটা ধ্বস্তাধ্বস্তি হয়েছে। ঘরের মেঝেতে পেয়ারী ওপর দিকে মুখ করে নিঃসাড়ে পড়ে রয়েছেন। ভয়ে তাঁর মুখ বিবর্ণ হ'য়ে উঠেছে। বীভৎস রকম বিস্ফারিত হয়ে উঠেছে চোখ দুটি। তাঁর গলার চারপাশে পাঁচটি আঙুলের দাগ বেশ গভীরভাবে রয়েছে। অনতিবিলম্বেই ডাক্তারকে ডাকা হয়। তিনি বলেন আততায়ী অমিতবলশালী; আর তার আঙুলগুলি অদ্ভুত রকমের সরু আর পেশীবহুল; কারণ, সেগুলি গলার ওপর গভীর ক্ষতের সৃষ্টি করেছে। মনে হচ্ছে সেগুলি বুলেটের ক্ষত। এই অত্যাচারের কারণ অথবা অত্যাচারীর পরিচয় কী তা এখনও খুঁজে বার করা যায় নি।"

পরের দিন একই কাগজে আর একটি খবর বেরোল—

"গতকাল যে যুবকটির কথা আমরা বলেছি সেই পেয়ারী বি—ডাক্তারের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে—দু ঘণ্টা পরে জ্ঞান ফিরে পান। তিনি এখন বিপন্মুক্ত; তবে পুনরায় তিনি প্রকৃতিস্থ হ'তে পারবেন কিনা সেবিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। অপরাধীর কোন চিহ্ন পাওয়া যায়নি।"

কথাটা সত্যি। আমার হতভাগ্য বন্ধুটি উন্মাদ হয়ে গিয়েছে। সাত মাস

ধরে প্রতিটি দিন আমি হাসপাতালে তার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছি। জ্ঞান ফিরে আসার বিন্দুমাত্র চিহ্ন আমার চোখে পড়ে নি। উন্মাদের মত বিকারের ঘোরে অদ্ভুত অদ্ভুত কথা তার মুখ থেকে বেরিয়ে এসেছে। কেউ যেন তার পেছনে ঘুরে বেড়াচ্ছে এইরকম একটা ভয় তার মনে কায়েমী হ'য়ে বসেছে। একদিন আমাকে তাড়াতাড়ি ডেকে পাঠানো হ'ল। পেয়ারীর অবস্থা নাকি খারাপের দিকে। আমি যখন হাজির হলাম তখন সে প্রায় মরণোন্মুখ। ঘণ্টা দুই সে চুপচাপ পড়ে রইল; তারপরে আমার সমস্ত চেষ্টাকে ব্যর্থ ক'রে সে বিছানার ওপরে উঠে বসে হাত নেড়ে দূরের দিকে ভয়ার্ত চোখে তাকিয়ে চীৎকার ক'রে বলল—'নিয়ে যাও, নিয়ে যাও। ও আমার গলা টিপে ধরেছে। সাহায্য কর, আমাকে সাহায্য কর।' এই বলেই ঘরের মধ্যে চীৎকার করতে-করতে বার দুই ছোটাছুটি করল; তারপরে মুখ থুবড়ে প'ড়ে মারা গেল।

তার মৃতদেহ নিয়ে আমি নরম্যাণ্ডিতে গেলাম। তার বাবা-মাকে যেখানে কবর দেওয়া হয়েছিল, তাঁদেরই পাশে তাকেও কবরস্থ করা হবে। এই গ্রাম থেকেই সে সেই চিমসে হাতটা নিয়ে সেদিন আমাদের ক্লাবে গিয়েছিল। যে বৃদ্ধ পাদরীটি তাকে লেখাপড়া শিখিয়েছিলেন তারই সঙ্গে কফিনের মধ্যে তার দেহটি পুরে গভীর দুঃখে চারদিন পরে আমরা কবরখানায় হাজির হলাম। কবর খোলা হল। আবহাওয়াটি বেশ সুন্দর ছিল। ঝোপের ভেতর থেকে পাখী গান করছিল। এখানে ব্ল্যাকবেরী খেতে ছেলেরা আসে। আমরাও এমনি ক'রে একদিন এখানে ব্ল্যাকবেরী খেয়ে ঠোঁট কালো করে ফিরে আসতাম। খনকদের কবরখানা কাটার শব্দ কানে আসছিল।

হঠাৎ তারা আমাদের ডাক দিল। পাদরী তাঁর প্রার্থনার বইটি বন্ধ করে দেন। তাদের ডাকে এগিয়ে গেলাম আমরা। তারা একটা কফিন পেয়েছে। শাবলের ঠোক্কর দিয়ে অনায়াসেই তারা কফিনটাকে খুলে ফেলল। দেখা গেল তার ভেতরে অস্বাভাবিক দীর্ঘ একটা কঙ্কাল রয়েছে। পিঠটা নিচে রেখে শূন্য চোখে সে অগ্রাহ্যভরে আমাদের দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

একজন হঠাৎ বলে উঠল—দেখুন, দেখুন; দুষ্ট লোকটার একটা হাত কাটা। এই দেখুন।

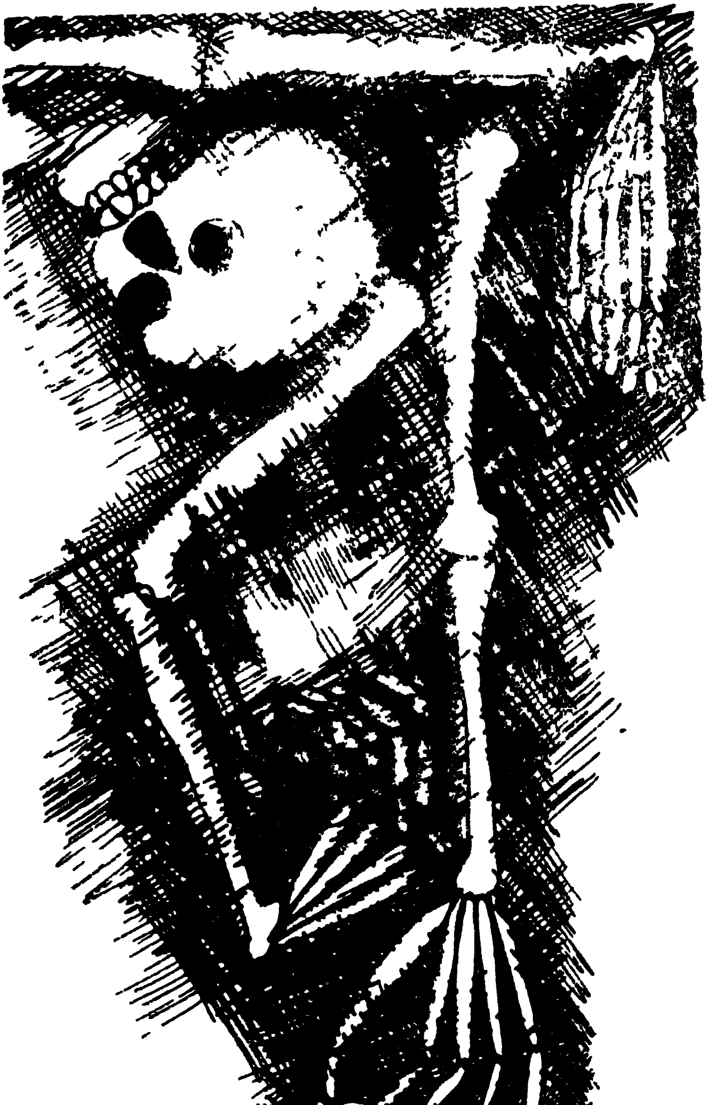
এই ব'লে কঙ্কালের পাশে প'ড়ে থাকা একটা কাটা হাত তুলে সে আমাদের দেখাল।

আর একটি লোক হেসে বলল—দেখ, দেখ। কঙ্কালটা তোমার দিকে কটমট করে তাকাচ্ছে। মনে হচ্ছে ও যেন বলছে—আমার হাতটা ফিরিয়ে দাও। না হলে, তোমার গলা টিপে ধরব।

পাদরীটি বললেন—চলে এস। মৃত কঙ্কালটিকে শান্তিতে থাকতে দাও। বন্ধ করে দাও কফিন। ম'সিয়ে পেয়ারীর জন্যে অন্য একটা ঠিক কারগে চল।

পরের দিনই সব মিটে গেল। প্যারিসের দিকে যাত্রা করলাম আমি। যাত্রা

করার আগে বৃদ্ধ পাদরীকে পঞ্চাশটি ফ্রাঁ দিয়ে এলাম। বলে এলাম যার কবরটাকে আমরা বিবক্ত করেছি তার আত্মার তৃপ্তির জন্যে যেন ঐ টাকা দিয়ে



একটা প্রার্থনা সভার আয়োজন করা হয়।

The dead hand—*Maupassant*

স্বপ্নলোকের বধূ

ভাইরে, তুমি প্রশ্ন করেছ আমি কখনও ভালবেসেছি কি না। হঁ্যা, আমি ভালবেসেছি। সে গল্প যেমন অসাধারণ তেমনই ভয়ংকর। ছেষট্টি বছর বয়সেও সে স্মৃতির ভস্মাবরণকে নাড়া দিতে আমাব সাহস হয না।

তোমাকে আমার অদেয় কিছুই নেই, তোমার চাইতে নরম মনের কাউকে আমি কোনদিন এ গল্প বলতে পারতাম না। ঘটনাগুলি এতই অদ্ভুত যে আমার জীবনেই তারা ঘটেছিল একথা যেন বিশ্বাসই হয না। তিনটি বছব এক শয়তানের হাতছানিতে আমি ভুলে ছিলাম। তিনটি বছর ধরে আমি দিনে ছিলাম এক গ্রাম্য গির্জার পাদ্রি, আব রাতে স্বপ্নের মধ্যে (ঈশ্বর করুন সেগুলি যেন স্বপ্নই হয।) আমি ছিলাম এই জগতের সন্তান, এক বিপথগামী সন্তান!

এক নারীর মুখের দিকে মাত্র একটিবার দৃষ্টিপাতের ফলে আমার আত্মার ধ্বংস হতে বসেছিল, কিন্তু ঈশ্বরের সহাযতায ও আমাব আশ্রযদাতা সন্তের কৃপায় শেষ পর্যন্ত সেই শয়তানের কবল থেকে আমি নিজেকে মুক্ত করতে পেরেছিলাম।

রাতে ও দিনে তখন আমার ছিল এক দ্বৈত জীবন। সারাদিন আমি প্রভুর এক পবিত্র পুরোহিত, আমার দিন কাটে প্রার্থনায় ও পবিত্র কর্মের অনুষ্ঠানে, কিন্তু ঘুমে দুই চোখ বুজে এলেই হযে উঠি এমন এক যুবক নাইট— যে নারীকে ভালবাসে, ভালবাসে ঘোড়া ও শিকারী কুকুর, যে মদ খায়, পাশা খেলে, পাপ কথা বলে; আবার প্রত্যুষে ঘুম ভাঙলেই মনে হয়, আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, কিন্তু স্বপ্নের মধ্যেও একজন পাদ্রিই ছিলাম। সেইসব স্বপ্নের কিছু কিছু স্মৃতি এখনও আমার মনে আছে, এমন সব কথা ও বস্তুর স্মৃতি যা কখনও স্মৃতির অতলে তলিয়ে যাবে না আরে, যদিও আমি কখনও আমার পল্লীযাজকের বাসভবনের বাইরে যাই নি তবু আমার কথা যে শুনেছে সেই মনে করবে যে আমি এমন একজন মানুষ যে এই পৃথিবীতে একদিন ছিল, আর এখান থেকে চলে গেছে ধর্মকে বুকে নিয়ে মৃত্যুকে বরণ করতে, ঈশ্বরের কোলে শুয়ে তার দুর্যোগভরা দিনগুলিকে শেষ করে দিতে। এই জগৎ থেকে অনেক দূরে এক গভীর জঙ্গলের মধ্যে একটা পরিত্যক্ত গির্জার পুরোহিত হয়েই সে যে বৃদ্ধ হয়েছে একথা কেউ মনে করবে না।

হঁ্যা, আমি ভালবেসেছি, এমন ভাল কোন মানুষ কোনদিন বাসে নি— এক উন্মাদ ভালবাসা, ভয়ংকর ভালবাসা; তার ফলে আমার বুকটা যে ফেটে চৌচির হয়ে যায় নি তাতেই আমি বিস্মিত। আহা, অনেককাল

আগের সেই রাতগুলি! শৈশব থেকেই পুরোহিত হবার ডাক আমি অনুভব করতাম! আমার সব পড়াশুনার সেটাই ছিল একমাত্র লক্ষ্য; চব্বিশ বছর পর্যন্ত আমার দিনগুলি ছিল এক দীর্ঘ শিক্ষণ-কাল। ধর্মশাস্ত্রের পাঠ শেষ করে অনেকগুলি ছোট ছোট উপাধি পেলাম, এবং শেষ পর্যন্ত পবিত্র সপ্তাহের শেষে আমার ধর্মযাজকের পদে নিয়োগের লগ্ন সমাগত হল।

এ জগতে আমি আগে কখনও পদার্পণ করি নি; আমার জগৎ ছিল কলেজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। মেয়েরা আছে এইটুকুই শুধু জানতাম, কিন্তু তাদের কথা কখনও ভাবি নি। আমার অন্তর ছিল একান্ত পবিত্র; এমন কি আমার বৃদ্ধা অথর্ব মাকে পর্যন্ত আমি বছরে মাত্র দু'বার দেখতে যেতাম; অন্য কোন আত্মীয়স্বজন আমার ছিল না।

অলঙ্ঘনীয় শপথ গ্রহণ করে আমি কখনও অনুতাপ করি নি, বা তা নিয়ে কোনরকম ইতস্তত করি নি; বরং এক ধৈর্যহারা আনন্দের মধ্যে যেন ডুবে ছিলাম। কোন যুবক বর কখনও এমন আগ্রহের সঙ্গে তার বিয়ের জন্য দিন গোণে নি। ঘুমের মধ্যেও প্রার্থনা করার স্বপ্নই দেখতাম। আমার কাছে পুরোহিত হওয়াটাই ছিল জগতের মহত্তম কাজ; কবি বা রাজা হবার মর্যাদাকেও আমি হয়তো ঘৃণা করতাম। শুধু পুরোহিত হতে চাই! এর চাইতে মহত্তর উচ্চাকাঙ্খা আমার ছিল না।

এসব কথা তোমাকে বলছি যাতে তুমি বুঝতে পার, আমার ভাগ্যে যা ঘটেছিল সেটা মোটেই আমার প্রাপ্য ছিল না; যে মোহ আমাকে পরাভূত করেছিল সে যে কত দুর্জ্ঞেয় সেটা বুঝতে পার।

সেই পরম লগ্নটি এল; আমি গির্জায় গেলাম যেন দুই পাখায় উড়ে, অথবা বাতাসের উপর দিয়ে হেঁটে। একটা পরম স্বর্গীয় সুখ অনুভব করলাম; সঙ্গী সাথীদের বিষণ্ন, চিন্তিত মুখগুলি দেখে অবাক হয়ে গেলাম।

সারাটা রাত প্রার্থনায় কাটল। আমি যেন আনন্দে আচ্ছন্ন হয়ে গেলাম। পরম শ্রদ্ধেয় বৃদ্ধ বিশপ যেন আমার চোখে ঈশ্বর হয়ে দেখা দিলেন; মনে হল, বড় গির্জার খিলানের ওপাশে বুঝি স্বর্গের দরজা খুলে গেছে।

অনুষ্ঠানটা তুমি জানই: প্রার্থনা, উভয়বিধ শেষ ভোজনানুষ্ঠান, দুই হাতে মন্ত্রপূত তেল মালিশ, এবং সর্বশেষ বিশপের সঙ্গে একযোগে পবিত্র আচারানুষ্ঠান।

এসব কথা বেশী বলব না, কিন্তু হায়, জোবের কথাগুলি কত সত্য— নিজের চোখের সঙ্গে যে মানুষ চুক্তিবদ্ধ না হয় সে কত বড় মূর্খ! হঠাৎই মাথাটা তুলতেই আমার সামনেই তাকে দেখলাম; এত কাছে যে মনে হল আমি তাকে ছুঁতে পারি, যদিও আসলে সে বেশকিছুটা দূরেই ছিল; দেখলাম একটা রেলিংয়ের শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে একটি তরুণী; রাণীর পোশাক পরিহিতা একটি অতুলনীয়া সুন্দরী।

আমি যেন নতুন দৃষ্টি লাভ করলাম ; কোন অন্ধ যখন হঠাৎ দৃষ্টিশক্তি ফিরে পায় তারই মত হল আমার অবস্থা। একমুহূর্ত আগে যে বিশপ ছিল এত চমৎকার সে যেন ম্লান হয়ে গেল ; সারা গির্জাটা অন্ধকারে ঢেকে গেল ; ভোরের আকাশের তারার মত সোনার বাতিদানে মোমবাতির আলোও বিবর্ণ হয়ে এল।

চতুর্দিকের বিষণ্নতার মাঝখানে সেই মনোরমা যেন স্বর্গীয় দীপ্তিতে জ্বল্ জ্বল্ করছে ; সে যেন সমস্ত আলোর উৎসস্বরূপা।

চোখ নামিয়ে নিলাম ; প্রতিজ্ঞা করলাম দ্বিতীয়বার চোখ তুলব না ; কিন্তু মনের জোর টিকল না, কি করছি তা নিজেই বুঝতে পারি নি। মুহূর্ত-কাল পরেই চোখ মেলে তাকালাম ; চোখের পাতার ফাঁক দিয়ে দেখলাম একটা আলোর বৃত্তের মাঝখানে তার মূর্তিটি জ্বল্ জ্বল্ করছে ; ঠিক সূর্যের দিকে তাকালে যেরকম হয়। আহা, সে কী সুন্দরী !

বড় বড় চিত্রকর যারা আদর্শ সৌন্দর্যের সন্ধানে স্বর্গের দিকেই তাকিয়েছে আর পৃথিবীকে উপহার দিয়েছে "আমাদের জননী"র প্রতিকৃতি, তারাও তো এই অপরূপ দৃশ্যের কাছাকাছিও পৌছতে পারে নি। সে দীর্ঘাঙ্গী, চলনে দেবীর মহিমা। তার সোনালী চুলের রাশি ভুরুর উপর দিয়ে ছড়িয়ে পড়েছে। চওড়া সাদা কপাল, ঘন কালো ভুরু। মুকুটধারিণী রাণীর মত সে দাঁড়িয়ে আছে : দুই চোখে সবুজ সমুদ্রের উজ্জ্বলতা ও জীবনের আভাষ ; তার একটি কটাক্ষপাত মানুষের ভাগ্যকে গড়তে পারে, আবার ভাঙতেও পারে। সে চোখে বিস্ময়কর দীপ্তি ও প্রখরতা যেন তীরের মত বিচ্ছুরিত ; মনে হল সে কটাক্ষ যেন সোজা আমার অন্তরকে লক্ষ্য করেই ছুটে আসছে। সে অগ্নিশিখা স্বর্গ থেকে আসছে, না নরক থেকে, তা আমি জানি না, কিন্তু এ দুইয়ের যেকোন একটা জায়গা থেকে নিশ্চয় আসছে। সে হয় দেবদূত, অথবা শয়তান, অথবা দুইই ; এই নারী আমাদের সকলের মাতৃসমা ইভের সন্তান কখনও হতে পারে না। হাসলে তার সাদা দাঁতে ঝিলিক খেলে, মুখ নড়লেই গোলাপী গালে ছোট ছোট টোল খায়, আবার মিলিয়ে যায়। আধ-ঢাকা কাঁধের মসৃণ, চকচকে চামড়ায় সোলেমানি পাথরের উজ্জ্বলতা ; গলা থেকে বুক পর্যন্ত ঝোলানো বড় বড় মুক্তোর হারটি তার গলার চাইতে বেশী সাদা নয়।

তার মাথাটা থেকে থেকে সাপের মত দুলছে, আর তার ফলে তার পোশাকও কেঁপে কেঁপে উঠছে। তার পরিধানে আগুন-রং ভেলভেটের পোশাক, সাদা পাড় বসানো আস্তিনের ভিতর থেকে সুন্দর দুখানি হাত একবার বেরিয়ে আসছে আবার ঢুকে যাচ্ছে ; সে দুখানি হাত বুঝি উষার আঙুলের মতই স্বচ্ছ। তারদিকে তাকিয়ে মনে হল, আমার মনের যে দ্বার এতদিন অর্গলবদ্ধ ছিল তা যেন খুলে গেল ; চোখের সামনে

দেখা দিল অজ্ঞাত ভবিষ্যতের আকস্মিক দৃশ্য; সমস্ত জীবনটাই যেন পাল্টে গেল; মনে জাগল নতুন চিন্তা। একটা ভয়ংকর ব্যথা আমাকে পেয়ে বসল; প্রতিটি মুহূর্তকে যুগপৎ একটি মুহূর্ত ও একটি যুগ বলে মনে হতে লাগল। অনুষ্ঠান সমানে চলছে, আর আমিও যেন এ জগৎ থেকে অনেক দূরে চলে যাচ্ছি; আমার নতুন বাসনারা যেন সে জগতের দুয়ারে মাথা কুটছে। যখন আমি বলতে চাইছি "না," জিহ্বায় যে শব্দ উচ্চারিত হচ্ছে সমস্ত মন যখন তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করছে, তখন আমি মুখে বলছি "হ্যাঁ"। একটা গোপন শক্তি যেন আমাকে সবকিছু থেকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে।

অনুষ্ঠান যত এগিয়ে চলেছে, সেই অজ্ঞাত মনোরমার মুখের ভাবও ক্রমেই বদলে যাচ্ছে। প্রথমে যা ছিল নবম আদরে ভরা, তাই হয়ে ওঠে তাচ্ছিল্য ও ঘৃণায় পরিপূর্ণ। পাহাড়-টলানো শেষ প্রচেষ্টায় চীৎকার করে বলতে চাইলাম আমি পুরোহিত হতে চাই না; কিন্তু বৃথা চেষ্টা, আমার জিভ থেকে কোন চীৎকার বের হল না, এমন কি ইঙ্গিতেও কোন আপত্তি জানাতে পারলাম না। সম্পূর্ণ জাগ্রত অবস্থায় আমার মনে হল আমি যেন সেই দুঃস্বপ্নের কবলে পড়েছি যখন সেই কথাটি কিছুতেই উচ্চারণ করা যায় না যার উপর নির্ভর করে জীবন-মরণ। আমার যন্ত্রণা সে বোধ হয় বুঝতে পারল; স্বর্গীয় করুণা ও প্রতিশ্রুতিভরা দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাল।

যেন বলতে চাইল, "তুমি আমার হও, আমি তোমাকে ঈশ্বরের চাইতেও বেশী সুখী করব, স্বর্গ ও দেবদূতরাও তোমাকে ঈর্ষা করবে। যে শবাচ্ছাদন তোমাকে বেঁধেছে তাকে ছিঁড়ে ফেল, কারণ আমিই রূপ, যৌবন ও জীবন, আমার কাছে চলে এস, দুজনে আমরা ভালবাসা হব। তোমার যৌবনের বিনিময়ে জিহোভা তোমাকে কী দিতে পারে? আমাদের জীবন বয়ে চলবে স্বপ্নের মত একটি চুম্বনের অন্তহীনতার পথ ধরে। ঐ পাত্র থেকে মদটা ফেলে দাও, তাহলেই তুমি মুক্ত হবে, আর আমি তোমাকে নিয়ে যাব সেই অজ্ঞাত দ্বীপে; রূপোলি চন্দ্রাতপের নীচে সোনার শয্যায় তুমি ঘুমবে আমার বুকে, কারণ আমি তোমাকে ভালবাসি, সাগ্রহে তোমাকে নিয়ে যাব তোমার সেই ঈশ্বরের কাছ থেকে অনেক দূরে যাঁর কাছে অনেক মহৎ হৃদয় তাদের ভালবাসাকে ধূপের মত পুড়িয়েছে, অথচ ঈশ্বরের স্বর্গরাজ্যে পৌঁছবার আগেই সে ধূপ নিঃশেষে নিভে গেছে।"

এই কথাগুলি যেন মধুরতম সুরে আমার কানে বাজতে লাগল, তার দৃষ্টির সেই বাণী এমনভাবে আমার অন্তরের মধ্যে প্রতিধ্বনিত হতে লাগল যেন কেউ আমার আত্মার কানে কানে সেগুলি বলছে। শপথ করে ঈশ্বরকে পরিত্যাগ করতে তখন আমি প্রস্তুত, তবু সব অনুষ্ঠানই যথারীতি পালন করতে লাগলাম। সে আর একবার আমার দিকে তাকাল; মিনতি ও হতাশায় ভরা সে দৃষ্টি; আমার মনে হল, স্বয়ং দুঃখের দেবী যত না

অস্ত্রে বিদ্ধ হয়েছে তার চাইতে বেশী অস্ত্র বিদ্ধ করছে আমার অন্তর।

অনুষ্ঠান শেষ হল। আমি পুরোহিত হলাম। আমার তখনকার মত এত তীব্র দুঃখ বুঝি কোনদিন কোন মানুষ পায় নি; একটি মেয়ের বাকদত্ত স্বামী যখন তার পাশেই মারা যায়, মা যখন দেখে তার শিশুর দোলনা শূন্য হয়ে গেছে, ইভ যখন দেখে সে ইডেনের দরজায় দাঁড়িয়ে আছে, কৃপণ যখন তার সঞ্চিত ধনের সন্ধানে এসে দেখে শুধু একখণ্ড পাথর, তাদের দুঃখও এত তীব্র, এত সান্ত্বনার অতীত নয়। মেয়েটির সুন্দর মুখ থেকে সব রক্ত সরে গেল: হাত দুখানি অসহায়ভাবে ঝুলে পড়ল, দাঁড়াবারও শক্তি নেই, কোনরকমে একটা থামে হেলান দিয়ে দাঁড়াল। স্খলিত পায়ে দরজার দিকে এগিয়ে গেলাম, মুখ বিবর্ণ, চোখে জল, শ্বাস রুদ্ধপ্রায়, গির্জার সব ভার যেন আমারই মাথায় চেপে বসেছে। চৌকাঠ পার হতে গিয়েই কে যেন আমার হাতটা চেপে ধরল। একটি নারীর হাত, সে হাত শীতল হলেও আমার হাতে যেন পোড়া কাঠের ছ্যাঁকা লাগল।

"আহা বেচারি, এ তুমি কি করলে?" আমার কানে কানে কথাগুলি বলেই সে নারী ভিড়ের সঙ্গে মিশে গেল।

বুড়ো বিশপ থামলেন, কঠোর দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালেন, সে দৃষ্টি বড় করুণ—কখনও লাল, কখনও ম্লান, কখনও বিস্মিত, কখনও অস্পষ্ট। একটি সহকর্মী দয়া করে আমাকে সঙ্গে করে বাড়িতে পৌঁছে দিল। আমি একা যেতেই পারতাম না। রাস্তার একটা কোণে পৌঁছে তরুণ পুরোহিতটি মাথাটা ঘোরাতেই অদ্ভুত পোশাক পরা একটি কৃষ্ণকায় বালকভৃত্য আমার কাছে এগিয়ে এসে সোনার কাজ-করা একটা ছোট চামড়ার থলে আমার হাতে দিয়ে ইসারায় লুকিয়ে রাখতে বলল। সেটাকে আস্তিনের মধ্যে ঢুকিয়ে দিলাম; একাকি নিজের ঘরে না ফেরা পর্যন্ত সেখানেই থলেটাকে রেখে দিলাম। তারপর খুললাম। তাতে শুধু এই কথাগুলি লেখা ছিল:

ক্লারিমোঁদে

পালাজ্জো কন্‌সিনি-তে

পৃথিবীর খবর আমি এত কম রাখতাম যে তার অনেক সুখ্যাতি সত্ত্বেও ক্লারিমোঁদের নাম আমি কখনও শুনি নি, পালাজ্জো কন্‌সিনি কোথায় তাও জানি না। অনেকরকম অনুমান করলাম, কিন্তু তাকে আর একবার দেখতে পাবার আশায় ক্লারিমোঁদে কোন সম্ভ্রান্ত মহিলা, অথবা কোন দুষ্টা নারী তা

নিয়ে মোটেই মাথা ঘামালাম না। মাত্র এক ঘণ্টার মধ্যে জন্ম নিয়েও সে ভালবাসা আমার অন্তরে এমনভাবে শিকড় গজিয়েছে যে তাকে ত্যাগ করার স্বপ্ন দেখাও আমার পক্ষে অসম্ভব। এই নারী আমাকে একান্তভাবেই তার করে নিয়েছে। একটি কটাক্ষপাতেই আমাকে বদলে দিয়েছে, তার ইচ্ছাই এখন বলবতী, আমি বেঁচে আছি তারই জন্য, নিজের জন্য নয়।

অনেক পাগলের মত কাণ্ড আমি করতে লাগলাম: তার হাত আমার হাতের যেখানে স্পর্শ করেছিল সেখানে চুমো খেলাম। ঘণ্টার পর ঘণ্টা তার নাম ধরে ডাকলাম—ক্লারিমোঁদে, ক্লারিমোঁদে। চোখ বুজলেই দেখি, সে যেন সশরীরে আমার সামনে উপস্থিত। তারপরই অস্ফুট কণ্ঠে সেই কথাগুলি উচ্চারণ করি গির্জার খিলানের নীচে যে কথাগুলি সে আমাকে বলেছিল: "আহা বেচারি, এ তুমি কি করলে?"

আমি তখন যে অবস্থায় পড়েছি তার আতংক মর্মে মর্মে অনুভব করলাম; জীবনের যে ভয়ঙ্কর মৃত দিকটাকে আমি বেছে নিয়েছি সেটা আমার কাছে উদ্‌ঘাটিত হল। পুরোহিত হলাম! কখনও ভালবাসব না, যৌবনের আহ্বান কাকে বলে কোনদিন তা জানব না। সুন্দরের দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে থাকব, দুই চোখ বুজে মঠ বা গির্জার শীতল ছায়ায় হামাগুড়ি দিয়ে চলব। মৃত মানুষ ছাড়া কারও দিকে তাকাব না, মৃতদেহের পাশে জেগে থাকব, যে যাজকের পোশাক পরিয়ে ওরা আমাকে একদিন কবর দেবে সারা জীবন সেটাই পরতে হবে!

তখনই বন্যাস্ফীত নদীর মত আমার বুকের মধ্যে জীবন যেন উদ্বেল হয়ে উঠল, শিরায় শিরায় রক্তে জাগাল বিদ্রোহ, মুহূর্তের মধ্যে আমার যৌবন যেন প্রস্ফুটিত হয়ে উঠল। আবার কেমন করে ক্লারিমোঁদের দেখা পাব? গির্জা ছেড়ে যাবার কোন অজুহাত আমার ছিল না, কারণ শহরে কাউকে আমি চিনি না; আসলে কোন পল্লী-গির্জায় নিয়োগের জন্যই আমি সেখানে অপেক্ষা করছিলাম।

জানালার শিক খুলে ফেলার চেষ্টা করলাম, কিন্তু মই ছাড়া সেখান থেকে নিচে নামা অসম্ভব। তাছাড়া, একমাত্র রাতের বেলাতেই পালানো সম্ভব, কিন্তু তখন পালালে তো শহরের পথের গোলকধাঁধায় নিজেই পথ হারিয়ে ফেলব। এসব অসুবিধা অন্যের কাছে হয় তো কিছুই নয়, কিন্তু অভিজ্ঞতা, অর্থ, ও জাগতিক জ্ঞানবিহীন প্রথম প্রেমে পড়া একটি অসহায় পুরোহিতের কাছে এসবই যে প্রচণ্ড বাধা।

আহা! আমি যদি পুরোহিত না হতাম তাহলে হয় তো প্রতিদিন তাকে দেখতে পেতাম। তার প্রেমিক হতে পারতাম, স্বামী হতে পারতাম—অন্তরের অন্ধ আবেগে এইসব কথাই নিজেকে বললাম। একটা জোব্বায় শরীরটাকে না ঢেকে তরুণ নাইটদের মত পরতে পারতাম রেশম ও ভেলভেট,

সোনার চেন, তরবারি ও পালক। আমার মাথা মুড়ানো হত না, গুচ্ছ গুচ্ছ সুবাসিত কোঁকড়া চুল গলার চারদিকে ছড়িয়ে পড়ত। কিন্তু বেদীর সামনে একটি ঘণ্টা সময় আর কিছু অসংলগ্ন উক্তি আমাকে জীবন্ত মানুষের দল থেকে ছাঁটাই করে দিয়েছে। নিজের হাতে আমার অতীত জীবনের সমাধির উপর আমি পাথর চাপিয়ে দিয়েছি, আমার কারাকক্ষের তলায় ঘুরিয়ে দিয়েছি চাবি।

জানালার কাছে হেঁটে গেলাম। আকাশ স্বর্গীয় নীলে ভরা, গাছগুলি সব বসন্তের সাজে সেজেছে, গোটা প্রকৃতির মুখে যেন পরিহাসের হাসি। স্কোয়ারটা লোকজনের আসা-যাওয়ায় পরিপূর্ণ: সুন্দর তরুণরা, সুন্দরী তরুণীরা জোড়ায় জোড়ায় বাগানের দিকে হেঁটে চলেছে।

মজুররা চলেছে গান গেয়ে। চারদিকের জীবন, গতি ও ফূর্তি শুধু আমার দুঃখ ও নির্জনতাকে বাড়িয়ে দিচ্ছে। ফটকের সিঁড়িতে একটি তরুণী মা ছেলের সঙ্গে খেলা করছে, তার ছোট্ট গোলাপী মুখখানাকে চুমোয় চুমোয় ভরে দিচ্ছে।

অদূরে সুখী বুকের উপর দুই হাত ভাঁজ করে রেখে বাবাটি তাদের দিকে তাকিয়ে মৃদু মৃদু হাসছে। দেখে আমার কষ্ট হল, জানালাটা বন্ধ করে দিলাম। তীব্র ঈর্ষা ও ঘৃণায় বিছানার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লাম, ক্ষুধার্ত বন্য পশুর মত আঙুল দিয়ে বিছানার চাদরটা ছিঁড়তে লাগলাম।

সেভাবে কতক্ষণ শুয়েছিলাম জানি না, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ক্রোধের বশে মুখ ফিরিয়েই দেখলাম মঠাধিকারী সেরাপিয়ন কৌতুকের সঙ্গে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। লজ্জায় মাথা নীচু করে দুই হাতে মুখ ঢাকলাম।

তিনি বললেন, "বন্ধু রোমল্ড, একটা বিচিত্র অবস্থায় তুমি পড়েছ। শয়তান তোমার উপর ভর করেছে, ক্রুদ্ধ সিংহের মত সে ঘুরে বেড়াচ্ছে তোমাকে খাবার জন্য। সাবধান হও, প্রার্থনার বক্ষস্ত্রাণে নিজেকে সুরক্ষিত কর, সেটাই মরণশীল মানুষের একমাত্র কর্ম। ভয় পেয়ো না। নিরুৎসাহ হয়ো না, কারণ যাদের হৃদয় অত্যন্ত দৃঢ় এবং একান্তভাবে সুরক্ষিত তাদের সামনেও এরকম দুঃসময় এসেছে। প্রার্থনা কর, উপবাস কর, ধ্যান কর, তাহলেই শয়তান তোমাকে ছেড়ে যাবে।"

সেরাপিয়ন বললেন, সি—র পুরোহিত মারা গেছেন, তার জায়গায় বিশপ আমাকেই নিয়োগ করেছেন, কালকের মধ্যেই আমাকে যাবার জন্য তৈরি হতে হবে। মাথা নেড়ে সম্মতি জানালাম, মঠাধিকারী চলে গেলেন। ধর্মগ্রন্থ খুলে পড়তে চেষ্টা করলাম, কিন্তু অক্ষরগুলো এলোমেলোভাবে কাঁপতে লাগল, আর পুঁথিখানাও অজান্তেই হাত থেকে পড়ে গেল।

পরদিন সেরাপিয়ন আবার এলেন; আমাদের যৎসামান্য মালপত্র নিয়ে দুটো খচ্চর ফটকে দাঁড়িয়ে আছে। যথাসম্ভব ভালভাবে তাতেই চেপে

বসলাম। পথ দিয়ে যেতে যেতে প্রতিটি বারান্দায় ও জানালায় ক্লারিমোঁদের সন্ধান করলাম। কিন্তু অত সকালে শহরটিই তখনও ঘুমিয়ে আছে। ফটক পার হয়ে পাহাড়ে উঠবার আগে শেষবারের মত যেদিকে ফিরে তাকালাম সেখানেই ক্লারিমোঁদের বাড়ি। শহরের উপর একটা মেঘের ছায়া পড়েছে, লাল ছাদ ও আকাশের নীল একই কুয়াশার মধ্যে মিশে গেছে। মাঝে মাঝে ধোঁয়ার সাদা কুণ্ডলী উঠছে। কুয়াশাঢাকা ছাদগুলির ভিতর থেকে সোনালী রঙের একটা উঁচু বাড়ি চোখে পড়ল। বাড়িটা এক লীগ দূরে হলেও মনে হল যেন খুব কাছে—সবকিছুই পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে; গম্বুজ, বারান্দা, ছাদের আলসে, এমন কি হাওয়া-পাখিটা পর্যন্ত।

সেরাপিয়নকে জিজ্ঞাসা করলাম, "সূর্যের আলোয় দূরে ঐ যে প্রাসাদটা দেখা যাচ্ছে ওটা কি?"

হাত দিয়ে চোখটাকে ঢেকে সেদিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, "ওটা তো সেই পুরনো রাজপ্রাসাদ যেটা প্রিন্স কন্‌সিনি ক্লারিমোঁদেকে দিয়েছেন। সেই থেকে ওখানে ভয়ংকর ব্যাপার ঘটে।

ঠিক সেইমুহূর্তে—এটা স্বপ্ন না কল্পনা তা আমি জানি না—আমার মনে হল একটি শ্বেতবরণা সুন্দরী ছাদটা পার হয়ে একবার তাকিয়েই অদৃশ্য হয়ে গেল। সে ক্লারিমোঁদে।

আহা! সে কি জানত, যে বন্ধুর পথ আমাকে তার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল তার চূড়া থেকেও সেইসময় আমি অস্থির চিত্তে ও অধীর আগ্রহে সেই প্রাসাদের দিকেই তাকিয়েছিলাম যেখানে সে বাস করে, তাকিয়েছিলাম তারই সন্ধানে? মরীচিকা অথবা আলো-ছায়ার মায়া যেকোন কারণেই হোক প্রাসাদটাকে খুবই কাছে মনে হল, মনে হল প্রাসাদটা যেন আমাকে ডাকছে তার ভিতরে ঢুকে সবকিছুর প্রভু হয়ে বসতে। সে যে সবই জানত তাতে কোন সন্দেহ নেই, কারণ আমাদের দুজনের হৃদয় তখন একসূত্রে বাঁধা। তাইতো রাতের পোশাকেই সে এই কুয়াশা-ঢাকা ভোরে প্রাসাদের ছাদে উঠে এসেছে। ছায়ামূর্তি প্রাসাদের উপর থেকে মিলিয়ে গেল, পড়ে রইল শুধু নিশ্চল ছাদের সারি। সেরাপিয়ন তার বাহনটিকে খোঁচা দিল, আমার বাহনটিও গতি বাড়িয়ে দিল, আর রাস্তাটা একটা বাঁক নিতেই এস্—শহরটি চিরদিনের মত আমার কাছ থেকে হারিয়ে গেল, আর কোনদিন আমার সেখানে ফেরা হবে না। নিরানন্দ মাঠের ভিতর দিয়ে তিন দিন পথ চলার পরে গাছপালার অনেক উপরে আমার পল্লী-গির্জার চূড়াটা দেখতে পেলাম। অনেক আঁকাবাঁকা গলি, দুই পাশে কুটীর ও বাগান, তারপরেই যে বাড়িটাতে আমরা পৌঁছে গেলাম তাতে জাঁকজমক বিশেষ কিছু নেই। কয়েকটি ছাঁচের মূর্তিসহ একটা খিলান, চুনাপাথরে খোদাই-করা দু'তিনটে স্তম্ভ, টালির ছাদ—বাস্, ঐ পর্যন্ত। বাঁ

দিকে লম্বা ঘাসের ভিতরে একটা কবরখানা, মাঝখানে একটা লোহার ক্রুশ। ডান দিকে গির্জার ছায়ায় পুরোহিতের বাড়ি। সরলতা আর সরলতর হতে পারে না, পরিচ্ছন্নতাও ন্যূনতম মানের। বাড়িতে আছে একটা পুরনো কুকুর ও একটি বয়স্কা গৃহকর্ত্রী; সে যখন জানল যে দুজনই আমার চাকরিতে বহাল থাকবে তখন তার আনন্দ আর ধরে না।

আমাকে কাজে বসিয়ে দিয়ে সেরাপিয়ন কলেজে ফিরে গেলো। আমি একা পড়ে গেলাম।

সাহায্য করার কেউ নেই, সান্ত্বনা দেবারও কেউ নেই; এ অবস্থায় ক্লারিমোঁদের চিন্তা আবার আমাকে পেয়ে বসল; সবরকম চিন্তা সত্ত্বেও তার স্মৃতিকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারলাম না। একদিন সন্ধ্যায় আমার ছোট বাগানের চৌখুপি রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে মনে হল গাছগাছালির মধ্যে যেন একটি নারীমূর্তিকে দেখতে পেলাম; আমার সব গতিবিধির উপর তার নজর। পাতার ফাঁকে ফাঁকে চকচক করছে তার সবুজ দুটি চোখ। তার চোখে সমুদ্রের সবুজ দীপ্তি, কিন্তু সেটা কল্পনা ছাড়া আর কিছু নয়। কারণ বাগান পার হয়ে গলির অপর প্রান্তে পৌঁছেও বালির উপর একটি ছোট পায়ের ছাপ ছাড়া আর কিছুই দেখতে পেলাম না—আর সেটা একটি শিশুর পায়ের ছাপ। বাগানটা উঁচু প্রাচীর দিয়ে ঘেরা, কিন্তু অনেক খুঁজেও প্রাচীরের ভিতরে কোন জীবিত প্রাণীকে দেখতে পেলাম না। এ ঘটনার কোন ব্যাখ্যা আমি কোনদিন পাই নি; অবশ্য এর পরে যেসব বিচিত্র ঘটনা ঘটল তার তুলনায় এটা কিছুই নয়।

এইভাবে একটা বছর কেটে গেল: যাজকের সব কর্তব্যই যথারীতি পালন করতে লাগলাম—প্রচার, প্রার্থনা, উপবাস, রোগীর সেবা, জীবনের যেসব প্রয়োজনীয় জিনিস গরীবদের দেওয়া যায় তা থেকে নিজেকে বঞ্চিত করা—সব কিছু। কিন্তু আমার ভিতরটা শুষ্ক, অনুর্বর—লাবণ্যের উৎস যে অবরুদ্ধ। একটা মহৎ কর্তব্য পালনের সচেতনতা থেকে যে সুখের জন্ম তা আমি ভুলে গেছি। আমার মন পড়ে আছে অন্যত্র; ইচ্ছার বিরুদ্ধে মানুষ যে কাহিনী উচ্চারণ করে, ঠিক সেইরকম ক্লারিমোঁদের কথাগুলিও আমার ঠোঁটে লেগে আছে। ভাইরে, একটা কথা ভেবে দেখ! একটি নারীকে দেখতে চোখ তুলে তাকাবার জন্য বছরের পর বছর কত জ্বালা আমি সয়েছি, আমার জীবনটাই দুঃখে ভরে আছে।

এইসব জয়-পরাজয়ের গল্প বলে তোমাকে আর আটকে রাখব না; এবার আসা যাক নবজীবনের সূচনায়।

একদিন রাতে আমার ফটকে প্রচণ্ড ধাক্কার শব্দ হল। বৃদ্ধা গৃহকর্ত্রীটি সেটা খুলে দিতে গেল। তার লণ্ঠনের আলোয় দেখা গেল দামী পোশাক পরিহিত বাদামী রংয়ের একটি মানুষ তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে; হাতে

একটা লম্বা ছোরা। সে ভীষণ ভয় পেয়ে গেল ; কিন্তু আগন্তুক তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল যে আমার কর্তব্যকর্মের ব্যাপারে সে তৎক্ষণাৎই আমার সঙ্গে দেখা করতে চায়। বারবারা তাকে দোতলায় আমার ঘরে নিয়ে এল। সেই ঘরেই আমি তখন শুতে যাচ্ছিলাম। সেখানেই লোকটি আমাকে বলল যে তার উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন কর্ত্রীঠাকরুণ মৃত্যুশয্যায় একজন পুরোহিতের দর্শন-প্রার্থিণী। জবাবে তাকে জানালাম যে আমি তার সঙ্গে যেতে প্রস্তুত, এবং চরম অনুষ্ঠানের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সঙ্গে নিয়ে তড়িৎগতিতে নীচে নেমে গেলাম। দরজায় দুটো ঘোড়া দাঁড়িয়েছিল ; রাতের মত কালো রং, তাদের নিঃশ্বাস বেরিয়ে আসছে বাষ্পের সাদা মেঘের মত। লোকটি আমার



রেকাবটা ধরলে আমি ঘোড়ায় চড়ে বসলাম। লোকটি ছোরার হাতলে হাত রেখে লাফিয়ে অন্য ঘোড়ায় চড়ল। দুই হাঁটুর মধ্যে ঘোড়াটাকে চেপে ধরে সে মাথাটা এগিয়ে দিল। তীরগতিতে শুরু হল যাত্রা ; আমার ঘোড়াটাও তার সঙ্গে তাল রেখে ছুটতে লাগল। ছুটতে ছুটতে আমরা যেন রাস্তাটাকে গিলে খাচ্ছি ; কালো কালো গাছগুলো অন্ধকারের মধ্যে পালিয়ে যাচ্ছে পরাজিত সৈন্যদের মত। একটা বন পার হয়ে গেলাম। এমন জমাট-বাঁধা ঠাণ্ডা যে আমার শিরায় শিরায় কুসংস্কারাচ্ছন্ন ভীতির শিহরণ বইতে লাগল। ঘোড়ার ক্ষুর থেকে ছিটকে বেরুচ্ছে আগুনের ফুল্‌কি, সারাপথ একটা অগ্নি-রেখা যেন আমাদের অনুসরণ করছে। এ অবস্থায় যেকেউ আমাদের দেখছে তারাই নির্ঘাৎ ভাবছে যে আমরা স্বপ্নের ঘোড়ায় সওয়ার দুই প্রেতাত্মা। পথের দুধারে জ্বলছে আলেয়ার আলো ; বনের গভীরে রাত-জাগা পাখিরা ডাকছে, মাঝে মাঝেই দেখতে পাচ্ছি বনবেড়ালের জ্বলন্ত চোখের ঝিলিক। বাতাসে উড়ছে ঘোড়ার ঘাড়ের লোম, শরীর থেকে ঘাম

ঝরছে, ঘনঘন নিঃশ্বাস পড়ছে সজোরে। যেই তাদের গতি একটু শ্লথ হচ্ছে অমনি সহিস এমনভাবে চীৎকার করে তাদের ডাকছে যে শব্দ কোন মানুষের গলা থেকে বের হতে পারে না; সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়া দুটিও আবার প্রচণ্ড বেগে ছুটছে। অবশেষে তাদের ঝড়ের গতি লক্ষ্যস্থলে পৌছে দিল; হঠাৎ আমাদের সামনে দেখা দিল অন্ধকারের স্তূপ; তার মাঝে মাঝে আগুনের বিন্দু। একটা টানা-সেতুর উপর আমাদের ঘোড়ার ক্ষুরের খটাখট শব্দ উঠল; দুটো দৈত্যাকার দুর্গের মাঝখানে হাঁ-করা খিলানওয়ালা ফটকের ভিতর দিয়ে ঝড়ের গর্জন তুলে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলাম। দুর্গের মধ্যে সবই কেমন যেন গোলমেলে অবস্থা—জ্বলন্ত মশাল হাতে চাকররা এঘরে-ওঘরে ছুটাছুটি করছে; সিঁড়িতে আলোগুলি বাড়ছে-কমছে. দেখতে পেলাম একটা প্রকাণ্ড বাড়ি, স্তম্ভ, খিলান, বারান্দা, আল্‌সে: কোন রাজকীয় অথবা স্বপ্নের প্রাসাদের এক বিস্ময়কর জগৎ। যে নিগ্রো চাকরটা আমার হাতে দিয়েছিল ক্লারিমোঁদের চিঠি, একবার দেখেই তাকে চিনতে পারলাম; সেই আমাকে ঘোড়া থেকে নামতে সাহায্য করল। কালো ভেলভেটের পোশাক পরা গলায় সোনার চেন ঝোলানো, হাতির দাঁতের লাঠি হাতে নায়েবমশায় এগিয়ে এসে আমার সঙ্গে দেখা করলেন। বড় বড় অশ্রুর ফোঁটা তার দুই গাল বেয়ে বরফ-সাদা দাড়ির উপর ঝরে পড়ছে।

বললেন, "বড় বেশী দেরি হয়ে গেছে পুরোহিত মশায়, বড় বেশী দেরি হয়ে গেছে! কিন্তু যথাসময়ে এসে তাকে বাঁচাতে না পারলেও দয়া করে মৃতার দুঃখী দেহটাকে একবার ভাল করে দেখুন।"

তিনি আমার হাত ধরলেন, যেখানে শবদেহ রাখা আছে সেই হলে নিয়ে গেলেন; এই মৃতা ক্লারিমোঁদে ছাড়া অন্য কেউ নয় বুঝতে পেরে আমিও তার মতই অঝোরে কাঁদতে লাগলাম। পাগলের মত তাকে যে বড় বেশী ভালবেসেছি! বিছানার পাশে রয়েছে একটা শ্যামাদান: পিতলের প্রদীপ থেকে একটা নীল শিখা কেঁপে কেঁপে উঠে ঘরময় একটা অদ্ভুত আলো ছড়িয়ে দিয়েছে, এখানে-ওখানে ছায়াগুলো কাঁপছে।

টেবিলের উপর কারুকার্যময় ফুলদানিতে একটিমাত্র শ্বেত গোলাপ ঝরে গেছে; ডাঁটার সঙ্গে লেগে আছে মাত্র একটি পাপড়ি; বাকিগুলো ঝরে গেছে সুগন্ধি অশ্রুবিন্দুর মত; ফুলদানির পাশেই পড়ে আছে। চেয়ারগুলোর উপর স্তূপীকৃত হয়ে আছে একটা ভাঙা কালো মুখোশ, একখানি পাখা, ও নাচগানের নানাবিধ উপকরণ; দেখলেই বোঝা যায়, এই চমৎকার বাড়িটাতে মৃত্যুর আবির্ভাব ঘটেছে অপ্রত্যাশিত ও ঘোষণাহীনভাবে। বিছানার দিকে দৃষ্টিপাতের সাহস হল না; হাঁটু ভেঙে বসে একান্তভাবে প্রার্থনা করতে লাগলাম; ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানালাম এই কারণে যে এই নারী ও আমার মাঝখানে তিনি একটা কবর রচনা করে দিলেন; তার ফলে

তার নাম এখন আমার কাছে আকাশের মত উঁচু হয়ে উঠল, আমার প্রার্থনায় সন্তদের সঙ্গে তার নামটিও উচ্চারণ করতে পারব।

ধীরে ধীরে এ উৎসাহ কমে এল; আবার আমি স্বপ্নের মধ্যে ডুবে গেলাম। যাই হোক না কেন, এ ঘরে তো মৃত্যু-পুরীর পরিবেশ নেই। এ ধরনের নৈশ-প্রতীক্ষায় যে শবগন্ধবাহী বাতাসে প্রশ্বাস নিতে আমি অভ্যস্ত তার বদলে এ ঘরের মৃদু হাওয়ায় ভেসে বেড়াচ্ছে প্রাচ্য গন্ধদ্রব্য, নারী ও প্রেমের সৌরভের আতপ্ত বাষ্প। বাতির ম্লান কম্পিত শিখাকে মৃতের পাশে জ্বালিয়ে রাখা মোমবাতির হলুদ আলোর পরিবর্তে সুখের গোধূলি-আলো বলেই মনে হচ্ছে। মনে পড়ল, যেমুহূর্তে আমি ক্লারিমোঁদেকে চিরদিনের মত হারিয়েছি ঠিক তখনই একটা আকস্মিক বিপদ আমাকে তার পাশে এনে হাজির করেছে; বুকের ভিতর থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস উঠে এল। মনে হল, পিছন থেকে কে যেন দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল; নিজের অজ্ঞাতেই মুখ ফেরালাম। একটা প্রতিধ্বনিমাত্র; কিন্তু মুখটা ফেরাতেই আমার চোখ পড়ল সেই বিছানাটার উপর যেখানে ক্লারিমোঁদে রাজকীয় মহিমায় শুয়ে আছে। অন্য সকলেই ঘর থেকে চলে গেছে। সোনার দড়ি দিয়ে ঝোলানো ফুলে-সাজানো লাল মশারির ভিতর দিয়ে মৃতাকে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে; দুই হাত বুকের উপর রেখে টান-টান হয়ে শুয়ে আছে। খুব সাদা চকচকে একটা সুতীর অবগুণ্ঠনে ঢাকা, গাঢ় লাল রংয়ের পর্দার জন্য আরও বেশী সাদা মনে হচ্ছে। শব-আবরণীটা এত সূক্ষ্ম যে সুন্দর দেহটা যেন তার ভিতর দিয়ে ফুটে বেরুচ্ছে; হাঁসের গলার মত ঢেউ-খেলানো নরম, মধুর দেহ-ভঙ্গিমাকে মৃত্যুও কঠিন করে তুলতে পারে নি। সে যেন কোন রাণীর সমাধির জন্য নিপুণ শিল্পীর হাতে খোদাই-করা মর্মর-মূর্তির মতই সুন্দরী, সদ্য ঝরা বরফের নীচে নিদ্রামগ্ন তরুণীর মতই সুন্দরী।

আমি আর সহ্য করতে পারলাম না। প্রেম-নিকুঞ্জের এই বাতাস, ঝরে-পড়া গোলাপের সুবাস আমাকে মাতাল করে তুলল। ঘরময় ঘুরে বেড়াতে লাগলাম, প্রতিবার বাঁক নেবার আগে একবার করে চোখ পড়ছে স্বচ্ছ শব-আবরণে ঢাকা সেই মৃত সুন্দরীর দিকে। নানা বিচিত্র চিন্তা মাথায় আসছে। মনে মনে ভাবলাম, সে হয়তো সত্যি মারা যায় নি, আমাকে তার দুর্গের ভিতরে নিয়ে আসার এবং আমাকে তার প্রেমের সব কথা বলার এটা হয়তো একটা কৌশলমাত্র। এমন কি, একবার মনেও হল, সাদা আবরণীর নীচে তার পাটা বোধ হয় নড়ে উঠল, শব-আচ্ছাদনের শক্ত রেখাটা যেন একটু ভেঙে গেল।

নিজেকে প্রশ্ন করলাম, "এ কি সত্যি ক্লারিমোঁদে? তার কি প্রমাণ আমার আছে? কৃষ্ণকায় চাকরটি তো অন্য কোন মহিলার কাছেও চাকরি নিয়ে থাকতে পারে। কেন আমি এভাবে পাগলের মত নিজেকে বিচলিত করছি।"

কিন্তু আমার বুকের ঢিপ্-ঢিপ্ শব্দই যেন জবাব দিল।

"এ সেই…এ সেই!"

বিছানার আরও কাছে এগিয়ে গেলাম; নতুন মনোযোগ দিয়ে তাকে দেখলাম। স্বীকার করব কি? মৃত্যুতে পরিম্লান ও পবিত্র হয়ে ওঠা সত্ত্বেও তার অপরূপ সৌন্দর্য আমার অন্তরকে উদ্বেল করে তুলল; দীর্ঘ বিশ্রামের ফলে তাকে দেখাচ্ছে নিদ্রামগ্ন কোন জীবন্ত নারীর মত। ভুলে গেলাম যে আমি সেখানে এসেছি একটি শবদেহকে পাহারা দিতে; স্বপ্নের ঘোরে আমার মনে হল, আমি যেন অবগুণ্ঠিতা, অর্ধ-লুক্কায়িত কোন বধূর শয়ন-কক্ষের দ্বারে সমাগত এক তরুণ বর!

দুঃখে ভগ্নহৃদয়, আনন্দে উন্মত্ত, ভয়ে ও বাসনায় কম্পমান অন্তরে সেই স্বপ্নলোকের বধূর উপর ঝুঁকে পড়ে তার আচ্ছাদনের একটি কোণ তুলে ধরলাম। তুললাম অতি সন্তর্পণে শ্বাসরুদ্ধ করে, পাছে তার ঘুম ভাঙিয়ে ফেলি। রক্তের স্রোত এমন তীব্রগতিতে বইতে লাগল যে কপালের শিরার ভিতরে যেন তার কল্লোল-ধ্বনি শুনতে পেলাম। ভুরু ঘামে ভিজে উঠল, আমি যেন একটা পাতলা চাদর তুলি নি, তুলেছি একটা ভারি পাথর।

ওই তো শুয়ে আছে ক্লারিমোঁদে, যেদিন আমি পুরোহিতপদে অভিষিক্ত হয়েছিলাম সেদিনও ঠিক এমনি দেখতে ছিল। তার বিবর্ণ গাল, মৃত ঠোঁট দুটির প্রবাল বর্ণ, মর্মরশুভ্র গালের উপর নিমিলিত চোখের পাতার বাদামী আঁখিপক্ষ—সবকিছু মিলিয়ে ফুটে উঠেছে একটি বিষণ্ণ পবিত্রতার ভাব বিষাদময় ধৈর্যের এক সহর্ষ যাদুর শক্তি! ছোট ছোট নীল ফুল ছড়ানো দীর্ঘ খোলা কেশরাশির উপর মাথাটা শায়িত, তাতে ঢাকা পড়েছে ঘাড়ের নরম মাংসের শ্বেত সৌন্দর্য। সুন্দর দুখানি হাত ভাঁজ করা। বাহুর হাতির দাঁতের উজ্জ্বলতা ও কমনীয় ডৌলটি মৃত্যুতেও যেন পরম আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে।

নীরবে তার দিকে তাকিয়ে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করলাম; যত দেখছি ততই মনে হচ্ছে এই সুন্দর দেহ থেকে জীবন হয়তো চিরতরে বিদায় নেয় নি। দৃষ্টি-বিভ্রম নাকি আলোর প্রতিফলন তা জানি না, কিন্তু মনে হল তার মৃত্যুপাণ্ডুর মাংসের নীচে যেন রক্তের স্রোত আবার বইতে শুরু করেছে; অথচ সে তো অনন্তকালের জন্য অনড়, অচল হয়েই শুয়ে আছে। তার হাতখানা স্পর্শ করলাম, হাতটা ঠাণ্ডা, কিন্তু সেদিন গির্জার বারান্দায় যখন তার হাতে হাত ছুঁয়েছিল তখনকার চাইতে বেশী ঠাণ্ডা তো নয়।

পুরনো অভ্যাসমত আবার তার মুখের উপর ঝুঁকে দাঁড়ালাম; আমার চোখের জলের তপ্ত শিশিরবিন্দুগুলো তাকে বৃষ্টিধারার মত ভিজিয়ে দিল। হায়, অক্ষমতা ও হতাশার কী তিক্ততা! হায়, এই মৃত্যু-প্রতীক্ষা কী তীব্র যন্ত্রণাময়! রাত বাড়ছে। বুঝতে পারলাম অনন্ত বিচ্ছেদ সমাসন্ন; যে দুটি

মৃত ওষ্ঠ আমার সব ভালবাসাকে ধরে রেখেছে তাতে একটি চুম্বন এঁকে দেবার শেষ বিষণ্ণ সুখ থেকে নিজেকে বঞ্চিত করতে পারলাম না।

আহা, কী অলৌকিক ঘটনা! একটি হাল্কা প্রশ্বাস মিশে গেল আমার নিঃশ্বাসের সঙ্গে; আমার স্পর্শের প্রতিদান দিল ক্লারিমোঁদে! সে চোখ মেলল; তা থেকে ঝরে পড়ল নরম আলো। সে দীর্ঘশ্বাস ফেলল, দুই হাত ছড়িয়ে দিল, মুগ্ধ উল্লাসে আমার গলা জড়িয়ে ধরল,—

"আঃ, রোমন্ড, তুমি!" সে কথা বলল; বেহালার শেষ কম্পমান সুরের মত মিষ্টি ও বিলীয়মান সে কণ্ঠস্বর। "আঃ, রোমন্ড, তুমি কেন এখানে এসেছ? তোমার জন্য দীর্ঘ প্রতীক্ষার পরে আজ আমি মৃত। তবু এখন আমরা বাকদত্ত, মিলনে অঙ্গীকারবদ্ধ; এখন আমি তোমাকে দেখতে পারি, তোমার সঙ্গে দেখা করতে পারি। বিদায় রোমন্ড, বিদায়! আমি তোমাকে ভালবাসি। শুধু এই কথাটাই তোমাকে বলার ছিল; একটি চুম্বনের সঙ্গে যে জীবন তুমি আমাকে দান করেছ আবার আমি সে জীবন তোমাকেই দিলাম। অচিরেই আবার আমাদের দেখা হবে।"

তার মাথাটা ঝুলে পড়ল, কিন্তু হাতদুটি আমাকে জড়িয়ে ধরেই থাকল, যেন সে চিরদিন আমাকে ধরে রাখবে। একঝাপ্টা দুরন্ত হাওয়া জানালাটাকে খুলে ফেলে ঘরের মধ্যে ঢুকল। শ্বেত গোলাপের শেষ পাপড়িটি পাখির ডানার মত ডাঁটার উপরে কাঁপতে লাগল, তারপর ঝরে পড়ে খোলা জানালা দিয়ে উড়ে গেল; সঙ্গে করে নিয়ে গেল ক্লারিমোঁদের আত্মাকে।

বাতিটা নিভে গেল; সুন্দর শবদেহের বুকের উপর আমি মূর্ছিত হয়ে পড়লাম।

যখন জ্ঞান ফিরে এল তখন পুরোহিতের বাসভবনে আমার ছোট ঘরটাতেই আমি শুয়ে আছি। হাতটা চাদরের ভিতর থেকে বাইরে ঝুলে পড়েছে, আর বুড়ো কুকুরটা সেটা চাটছে। বারবারা কাঁপতে কাঁপতে ঘরময় ছুটে বেড়াচ্ছে, একটার পর একটা টানা খুলছে আর বন্ধ করছে, গুঁড়ো ওষুধ গ্লাসে ঢেলে ঝাঁকাচ্ছে। আমাকে চোখ মেলতে দেখে বৃদ্ধা আনন্দে চীৎকার করে উঠল। কুকুরটা ঘেউ ঘেউ শব্দ করে লেজ নাড়তে লাগল; কিন্তু আমি তখন এত দুর্বল যে একটা কথা বলার বা সামান্য নড়াচড়া করার শক্তিও আমার নেই। পরে জেনেছিলাম, তিন দিন আমি এই একইভাবে শুয়েছিলাম, ন্যূনতম শ্বাস-প্রশ্বাস ছাড়া জীবনের আর কোন লক্ষণই আমার মধ্যে ছিল না। এই তিনটে দিন আমার জীবনের গণনার মধ্যে আসে না; সেই তিনটে দিন আমার আত্মা যে কোথায় ঘুরে বেড়িয়েছিল তা আমি জানি না, তার তিলমাত্র স্মৃতিও আমার নেই। বারবারা আমাকে বলেছে, তামাটে রংয়ের যে লোকটি রাতে আমাকে নিতে এসেছিল পরদিন সকালে সেই আমাকে একটা ঢাকা পাল্‌কিতে করে ফিরিয়ে এনে সঙ্গে সঙ্গেই চলে গিয়ে-

ছিল। চিন্তার ক্ষমতা ফিরে পাওয়ামাত্রই সেই মারাত্মক রাতের প্রতিটি ঘটনাকে আমি বিচার করতে লাগলাম। প্রথমে মনে হল, কোন সুকৌশল যাদুবিদ্যা আমাকে ভুলিয়ে নিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু অচিরেই কতকগুলি প্রকৃত বাস্তব ঘটনা সে ধারণাকে নস্যাৎ করে দিল। আমি যে স্বপ্ন দেখছিলাম তাও বলতে পারি না, কারণ আমার মতই বারবারাও দুটি কয়লা-কালো ঘোড়াসহ সেই লোকটিকে দেখেছিল এবং তার যথাযথ বর্ণনাও সে দিল। অথচ যে দুর্গের মধ্যে আমি ক্লারিমোঁদেকে পুনরায় দেখেছিলাম এতদঞ্চলে সেরকম কোন দুর্গের কথা কেউ জানে না।

একদিন সকালে সেরাপিয়ন আমার ঘরে এলেন; বারবারার চিঠিতে আমার অসুস্থতার সংবাদ পেয়ে তিনি অতি দ্রুত চলে এসেছেন।

যদিও এতে আমার প্রতি তার স্নেহ প্রকাশ পেল, তবু তিনি আমাকে দেখতে আসায় আমি মোটেই খুশি হলাম না। সেরাপিয়নের চোখের দৃষ্টি এমনই সপ্রশ্ন ও অন্তর্ভেদী যে তার উপস্থিতিতে নিজেকে অপরাধী বলে মনে হতে লাগল। আমার মনের এই গোপন চাঞ্চল্যকে তিনিই প্রথম ধরতে পেরেছিলেন; এতটা স্বচ্ছদৃষ্টির অধিকারী হওয়ায় তার প্রতি আমি কিছুটা বিরূপই হয়েছিলাম।

তিনি যখন মধুমাখা কপটতার সঙ্গে আমার স্বাস্থ্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করছিলেন তখনও তার সিংহের মত হলুদ দুটি চোখ আমার অন্তরের গভীরে কি যেন খুঁজে বেড়াচ্ছিল।

একসময় তিনি তীক্ষ্ণ স্বরে বললেন, "বিখ্যাত বারবণিতা ক্লারিমোঁদে মারা গেছে—মারা গেছে আটদিনব্যাপী এক হৈ-হুল্লোড়ের শেষে। বেল্‌বাজার অথবা ক্লিওপেট্রার স্মরণে একটা ভোজসভার আয়োজন করা হয়েছিল। হা ঈশ্বর, কী দিনকালই না পড়েছে! কালো কালো ক্রীতদাসরা অতিথিদের খাবার পরিবেশন করেছে; তারা যে ভাষায় কথা বলেছে তা কোন মানুষ বোঝে না; তারা যেন অন্ধকার গহ্বর হতে উঠে আসা প্রেতাত্মার দল। তাদের মধ্যে যে সকলের নীচে তার সাজপোশাক দেখেও মনে হবে যেন কোন সম্রাটের রাজ্যাভিষেক হচ্ছে। এই ক্লারিমোঁদে সম্পর্কে অনেক কথাই রচনা করা হয়ে থাকে; তার প্রেমিকরা সকলেই শোচনীয়ভাবে বা নৃশংসভাবে নিহত হয়েছে। লোকে বলে সে একটি প্রেতাত্মা, রক্তচোষা বাদুড়, কিন্তু আমার বিশ্বাস সে স্বয়ং শয়তান।"

তিনি থামলেন। আমাকে দেখতে লাগলেন। ক্লারিমোঁদের নাম শুনে আমি হঠাৎ চমকে না উঠে পারি নি।

কঠোর দৃষ্টিতে তাকিয়ে সেরাপিয়ন বললেন, "শয়তানের থাবা বড় লম্বা; আজ পর্যন্ত অনেক কবর থেকে শব খোয়া গেছে। ক্লারিমোঁদের কবরে তিন-ডবল শিল-মোহর করতে হবে, কারণ লোকে বলে এই প্রথমবার তার

মৃত্যু হয়নি। ঈশ্বর তোমার সহায় হোন রোমন্ড।"

এই পর্যন্ত বলে সেরাপিয়ন ধীর পদক্ষেপে চলে গেলেন।

* * *

দিন কাটে।

আমি আবার ভাল হয়ে উঠেছি। এখন মনে হয়, সেরাপিয়নের আশংকা এবং আমার আতংক দুইই বড় বেশী হয়ে গিয়েছিল। এমন সময় একদিন রাতে আমি স্বপ্ন দেখলাম·· ঘুমের পাত্র থেকে স্বল্প কয়েকটি ফোঁটা সবে মুখে ঢেলেছি এমন সময় আমার বিছানার মশারী ফাঁক হয়ে যাবার শব্দ শুনতে পেলাম, আর ঘণ্টাগুলো বেজে উঠল। হাতের উপর ভর দিয়ে উঠে যাকে দেখলাম তাকে সরাসরিই ক্লারিমোঁদে বলে চিনতে পারলাম।

তার হাতে একটা ছোট বাতি যা সাধারণত কবরে রাখা হয়। বাতির আলো পড়ে তার সুন্দর আঙ্গুলগুলোতে যে গোলাপী আভা ফুটে উঠল সেটা ধীরে ধীরে তার হাতের দুগ্ধশুভ্র রংয়ের সাথে মিশে গেল।

যে চাদরের শবাচ্ছাদনে ঢাকা অবস্থায় সে শুয়েছিল তার পরনে সেটা ছাড়া আর কিছুই নেই। তাকে এত সাদা দেখাচ্ছে যে বাতির ম্লান আলোয় তার শবাচ্ছাদন ও তার শরীর যেন এক হয়ে মিশে গেছে।

এইরকম সূক্ষ্ম বস্ত্রের আবরণে ঢাকা থাকায় তার দেহের প্রতিটি রেখা স্পষ্টভাবে চোখে পড়ছে; ফলে তাকে দেখে একটি জীবন্ত নারীর পরিবর্তে স্নানরতা কোন মহিলার মর্মর-মূর্তি বলেই মনে হচ্ছে। মৃত হোক আর জীবিত হোক, মূর্তি হোক আর নারী হোক, বিদেহী আত্মা হোক আর রক্ত-মাংসের মানুষ হোক, তার রূপ কিন্তু সেই একই রকম আছে, শুধু সমুদ্র-সবুজ চোখের ঝিলিক কিছুটা নিষ্প্রভ হয়েছে—শুধু লাল মুখখানিতে লেগেছে তার শ্বেত গোলাপী গালের মতই ঈষৎ গোলাপী ছোঁয়া। তার চুলে যে ছোট ছোট নীল ফুলগুলো দেখেছিলাম সেগুলো এখন শুকিয়ে গেছে; তাদের ফোটার বাহার আর নেই; তথাপি সে এতই আকর্ষণীয়া, এত বেশী মনোহারিণী যে তার এই বিচিত্র অভিযান, আমার ঘরে এই দুর্বোধ্য আগমন সত্ত্বেও আমি মুহূর্তের জন্যও ভয় পেলাম না।

টেবিলের উপর বাতিটা রেখে সে আমার বিছানার পায়ের দিকটাতে বসল। তারপর যে নরম রূপোলি উচ্চারণ একমাত্র তার দুটি ঠোঁট ছাড়া আর কোথাও কোনদিন শুনি নি সেই ভঙ্গীতে সে বলতে লাগল—

"তোমাকে আমি দীর্ঘকাল প্রতীক্ষায় রেখেছি; তুমি হয়তো ভেবেছিলে আমি তোমাকে ভুলে গেছি। কিন্তু দেখ, আমি এসোছি, বহু দূর থেকে এসেছি—এমন কি এসেছি সেই দেশ থেকে যেখান থেকে কোন যাত্রী কোন-দিন ফিরে আসে না। যেদেশ থেকে আমি এসেছি সেখানে সূর্যের আলো নেই, চাঁদ নেই, আছে শুধু ছায়া ও মহাশূন্য। সেখানে পায়ের কোন বিশ্রাম

নেই, পথ চলার নেই কোন শেষ ; তথাপি আমি এখানে এসেছি—আমাকে দেখ, কারণ প্রেম মৃত্যুকেও জয় করতে পারে। আহা, আমার যাত্রাপথে কত বিষণ্ণ মুখ ও ভয়ংকর চোখ আমি দেখেছি। আমার দেহকে খুঁজে বের করতে এবং তার মধ্যে নতুন করে বাসা বাঁধতে আমার আত্মাকে কত কষ্টই না করতে হয়েছে! আমাকে ঢেকে দিতে যে পাথরখানা তারা বসিয়েছিল সেটাকে তুলতে কী কষ্ট! দেখ, সেকাজ করতে গিয়ে আমার হাত দুটি ক্ষত-বিক্ষত হয়েছে! প্রিয় আমার, সে হাতে তুমি চুমো খাও, ক্ষত সারিয়ে দাও।" ঠাণ্ডা হাত দুটি সে আমার মুখের উপর রাখল, তাতে আমি অনেক চুমো খেলাম, অবর্ণনীয় এক সুখের মাধুর্যভরা হাসি হেসে সে আমার দিকে তাকাল।



লজ্জার সঙ্গেই একথা বলছি যে মঠাধিকারী সেরাপিয়নের উপদেশ ও আমার কর্তব্যের পবিত্র স্বরূপকে আমি সম্পূর্ণ ভুলে গিয়েছিলাম। প্রথম আক্রমণেই আমি বিনা বাধায় ধরাশায়ী হলাম। না, সে প্রলোভনকারিণীকে দূরে সরিয়ে দেবার কোন চেষ্টাই আমি করি নি, ক্লারিমোঁদের সুন্দর দেহের তাজা মিষ্টি গন্ধের কাছে বিনা সংগ্রামেই পরাজয় স্বীকার করেছি। আহা বেচারি! যা কিছুই ঘটে থাকুক না কেন, আমি এখনও বিশ্বাস করি না যে

সে সত্যি ছিল শয়তান; তার আচরণে শয়তানীর কোন লক্ষণই ছিল না। শয়তান আগে কখনও তার থাবা ও শিংকে এত ভালভাবে লুকিয়ে রাখতে পারে নি। উদাসীন অথচ আকর্ষণীয় ভঙ্গীতে গোড়ালির উপর ভর রেখে সে আমার বিছানার পাশে উপুড় হয়ে বসেছে। ছোট হাতখানি দিয়ে বারবার আমার মাথার চুলে বিলি কাটছে, যেন চুলের কোন্ ভঙ্গীটা আমার মুখের সঙ্গে মানায় সেটাই পরীক্ষা করে দেখছে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে তার এই আশ্চর্য কাণ্ডকারখানায় আমি মোটেই বিস্মিত হইনি—বরং স্বপ্নে যেমন অত্যন্ত অদ্ভুত ঘটনাও আমাদের বিস্ময় উদ্রেক করে না তেমনি গোটা সাক্ষাৎকারটাই আমার কাছে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক বলে মনে হয়েছে।

"প্রিয়তম রোমল্ড, তোমাকে দেখার আগেই আমি তোমাকে ভালবেসেছি; সর্বত্র তোমাকে খুঁজে বেড়িয়েছি। তুমি ছিলে আমার স্বপ্ন; তারপর সেই চরম মুহূর্তে গির্জায় তোমার দেখা পেলাম। নিজের মনেই বললাম, 'এই তো সে', আর যে ভালবাসা দিয়ে তোমাকে এতদিন ভালবেসেছি, এখনও বাসছি, চিরদিন ভালবাসব, সেই ভালবাসায় পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে তোমার দিকে তাকালাম; সে দৃষ্টি যেকোন প্রধান পুরোহিতের আত্মার সর্বনাশ ঘটাতে পারত, যেকোন রাজা পারিষদবর্গসহ আমার পায়ে নত হতে পারত।

"কিন্তু তুমি বিচলিত হলে না; আমার ভালবাসার উপরে স্থান দিলে ঈশ্বরের প্রতি ভালবাসাকে।

"হায়, সেই ঈশ্বরকেই তো আমি ঈর্ষা করি—যে ঈশ্বরকে তুমি ভালবাস, আমার চাইতেও বেশী ভালবাস।"

"হতভাগিনী নারী আমি! কখনও তোমাকে সম্পূর্ণ আমার করে পাব না—শুধুই আমার করে, যে আমিকে তুমি জাগিয়ে তুলেছ একটিমাত্র চুম্বনে; যে আমি শুধু তোমারই জন্য কবরের দুয়ার ভেঙে বেরিয়ে এসেছি, বেরিয়ে এসেছি সেই জীবন তোমাকে দিতে যা আমি পুনরায় লাভ করেছি শুধু তোমাকে সুখী করতে।"

এইভাবে সে কথা বলতে লাগল, আর প্রতিটি কথার সঙ্গে উন্মাদ-করা আদরে আদরে আমাকে অভিভূত করে ফেলল, আমার মাথা ঘুরতে লাগল, আর তাকে সান্ত্বনা দিতে ভয়ংকর এক অপবিত্র ভাষা ব্যবহার করতেও আমার ভয় হল না; বললাম—তার প্রতি আমার ভালবাসা ঈশ্বরের প্রতি ভালবাসাকেও অতিক্রম করে গেছে।

নতুন করে জ্বলে উঠল তার চোখের অগ্নিশিখা; গোমেদ মণির মত জ্বল্ জ্বল্ করতে লাগল।

দুই হাত বাড়িয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরে সে বলল, "ঈশ্বরের প্রতি তোমার যে ভালবাসা সেই ভালবাসা দিয়ে তুমি আমাকে ভালবেসেছ। তাহলে তো

আমার সঙ্গে তোমাকে আসতেই হবে, যেখানে আমি যাব তোমাকেও সেখানেই যেতে হবে। ছেড়ে ফেলতে হবে এই কুৎসিত কালো পোশাক, তুমি হবে সব নাইটের সেরা নাইট, সকলের গর্ব ও ঈর্ষার পাত্র। যে ক্লারিমোঁদে পোপকেও প্রত্যাখ্যান করেছে তুমি হবে তার স্বীকৃত প্রেমিক! আহা, কী সুখের দিন, আহা, কী সোনালী দিন আমরা পাব। বল তো, কখন আমরা ঘোড়ায় চেপে যাত্রা করব?"

"আগামীকাল," উন্মাদের মত চেঁচিয়ে বললাম।

সে বলল, "আগামীকাল। পোশাক বদলাবার সময়টা পাওয়া যাবে? এ পোশাকটা অপর্যাপ্ত, ভ্রমণের উপযোগী নয়। অনুচরদেরও সব কথা বলতে হবে; তারা তো আমাকে মৃত বলেই ধরে নিয়েছে, সাধ্যমত আমার জন্য শোক করছে! অর্থ, যানবাহন, পোশাক পরিবর্তন—তোমার জন্যও সব ব্যবস্থাই করা হবে; কাল ঠিক এইসময় আমি তোমাকে খুঁজে নেব। বিদায় প্রিয়তম!" ওষ্ঠদ্বয় দিয়ে সে আমার ভুরু স্পর্শ করল, বাতিটা অন্ধকারে মিলিয়ে গেল, পর্দাগুলি নেমে এল, সীসের মত ভারী হয়ে ঘুম নামল আমার চোখে—স্বপ্নহীন ঘুম। স্বপ্নের স্মৃতি নিয়ে ঘুম ভাঙল অনেক দেরিতে; শেষ পর্যন্ত সে স্বপ্নকে রাতের অপচ্ছায়া বলেই মনে হল। তবু মনের ভয় গেল না; ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানালাম, আমার ঘুমের পবিত্রতা যেন তিনি রক্ষা করেন।

আবার গভীর ঘুমে তলিয়ে গেলাম; আবার এল সেই স্বপ্ন। পর্দা সরে গেল, সামনে দাঁড়িয়ে ক্লারিমোঁদে; বিবর্ণ শবাচ্ছাদনে ঢাকা ম্লান মূর্তি নয়, গালে নেই মৃত্যুর বেগুনী আভা; সে এখন আনন্দিত, উজ্জ্বল, চমৎকার; সোনালী পাড় বসানো সবুজ ভেলভেটের ভ্রমণের পোশাক; একপাশে সাটিনের তলবাস দেখা যাচ্ছে। আশ্চর্য সাদা পালক বসানো মস্ত বড় কালো বীভার হ্যাটের নীচ থেকে গুচ্ছ গুচ্ছ সুন্দর কোঁকড়ানো চুলের রাশি নেমে এসেছে; মাথায় সোনালী বাঁশি বসানো একটা ছোট চাবুক তার হাতে। সেটা দিয়ে আস্তে আমাকে ছুঁয়ে বলল—

"ঘুমন্ত সুন্দর, জাগো! এইভাবে কি তুমি যাত্রার জন্য প্রস্তুত হচ্ছ? আমি তো ভেবেছিলাম তোমাকে প্রস্তুতই দেখব। ওঠ, শীঘ্র ওঠ; নষ্ট করার মত সময় আমাদের নেই!"

বিছানা থেকে লাফ দিয়ে উঠলাম।

হাতের ছোট প্যাকেটটা দেখিয়ে বলল, "এস, পোশাক পরে নাও, রওনা হতে হবে। ফটকে ঘোড়া দুটো পা ছুঁড়ছে, দাঁত কামড়াচ্ছে। এখান থেকে দশ লীগ দূরে যেতে হবে।"

সে নির্দেশ দিতে লাগল, নাইটের নানারকম সাজ-পোশাক আমার হাতে তুলে দিল, আর আমি তালগোল পাকিয়ে ফেলায় হাসতে লাগল।

তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নিলাম। সে আমার চুল আঁচড়ে দিল, সবকিছু হয়ে গেলে রূপো-বাঁধানো একটা ছোট ভেনিস পকেট-আয়না দিয়ে বলে উঠল—

"এখন নিজেকে কেমন মনে হচ্ছে? এবার আমাকে তোমার শয়ন-কক্ষের দাসী করে নেবে তো?"

আয়নায় নিজের মুখ আমি চিনতে পারলাম না, কাটার আগেকার পাথর যেমন মূর্তির মত থাকে না, আমিও যেন আর আমার মত নেই। সুন্দর হয়ে উঠেছি, এ পরিবর্তনের জন্য গর্ব বোধ করছি। সোনালী কাজ-করা বীরের পোশাক আমাকে অন্য মানুষ করে তুলেছে; বিশেষ কৌশলে সাজানো কয়েক গজ কাপড়ের এই যাদুর খেলা দেখে আমার বিস্ময়ের শেষ রইল না। এই পোশাকের চরিত্রই যেন আমার চরিত্র হয়ে গেছে, দশ মিনিটের মধ্যেই যথেষ্ট দাম্ভিক হয়ে উঠেছি। যেন নতুন পোশাকটা পরীক্ষা করে দেখার জন্যই ঘরময় হাঁটতে লাগলাম, ক্লারিমোঁদে মাতৃসুলভ স্নেহে আমাকে দেখতে লাগল। তারপর—

সে চেঁচিয়ে বলল, "চল; যথেষ্ট ছেলেমানুষী হয়েছে। রোমুল্ড আমার, এবার ঘোড়ায় চড়ে ছোটা। আমাদের অনেক দূর যেতে হবে, কোনদিন পৌছনো হবে না।"

সে আমার হাত ধরে টেনে নিয়ে চলল। তার ছোঁয়ায় ফটক খুলে গেল কুকুরটার পাশ দিয়ে গেলাম, তার ঘুম ভাঙল না।

ফটকে দেখলাম, সহিস তিনটে ঘোড়া নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, আগেকার ঘোড়ার মতই স্পেনীয় ঘোড়া, বাতাসের বেগে ছুটতে পারে। ইতিমধ্যে আমরা একটা মাঠে পৌছলাম; সেখানে একখানা গাড়ি ও চারটে ঘোড়া আমাদের জন্যই অপেক্ষা করে আছে। কোচয়ান দুরন্ত বেগে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল। এক হাতে জড়িয়ে ধরলাম ক্লারিমোঁদের কোমর, তার মাথা আমার কাঁধে, তার বুক চেপে রইল আমার দেহে। তখন থেকেই শুরু হল আমার দ্বৈত জীবন; আমার মধ্যে বাস করতে লাগল এমন দুটি মানুষ যারা পরস্পরকে চেনে না—একটি পুরোহিত যে স্বপ্ন দেখে যে রাতে সে হয়ে যায় একজন সম্ভ্রান্ত পুরুষ, আবার সম্ভ্রান্ত পুরুষটি স্বপ্ন দেখে যে রাতে সে হয়ে যায় একজন পুরোহিত।

অবশ্যই আমি তখন ছিলাম ভেনিসে, গ্র্যাণ্ড ক্যানালের উপরে একটি মস্ত বড় প্রাসাদে, অন্তত আমি তাই মনে করতাম। ক্লারিমোঁদে বিলাসবহুল জীবন পছন্দ করে। চিরাচরিত প্রথা তাকে সাধারণ করে তুলতে পারে নি। তাকে ভালবাসা মানেই এককুড়ি প্রিয়াকে ভালবাসা। আমার ভালবাসাকে সে শতগুণ করে ফিরিয়ে দেয়। একসময় সে কিছুদিন অসুস্থ ছিল, সেই-সময় একদিন আমি হাতটা কেটে ফেললাম; সঙ্গে সঙ্গে সে আমার ক্ষতস্থান

থেকে রক্তটা চুষে নিল।

সোচ্চারে বলল, "আমি মরব না! আমি মরব না! এখনও অনেক কাল আমি তোমাকে ভালবাসব, কারণ আমার জীবন তো তোমার জীবনের মধ্যেই বেঁচে আছে। তোমার রক্তই তো আমার জীবন ফিরিয়ে দিয়েছে!"

এই ঘটনা ও তার বিচিত্র আতংক অনেকদিন পর্যন্ত আমাকে তাড়া করে ফিরেছে।

সেরাপিয়ন প্রায়ই আমাকে বকেন। একদিন তিনি বললেন—

"যে দানবী তোমাকে ভর করেছে তাকে তাড়াবার একটিমাত্র উপায় আছে। আমি জানি ক্লারিমোঁদেকে কোথায় কবর দেওয়া হয়েছে। তাকে মাটি খুঁড়ে তুলতে হবে; মৃত্যুর কীট ও ধুলোর দৃশ্য দেখলেই তুমি আবার আত্মস্থ হতে পারবে।"

দ্বৈত জীবন নিয়ে এতই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম যে তার প্রস্তাব আমি গ্রহণ করলাম, আর মধ্যরাত্রে তার কবরের শিলালিপি খুঁজে বের করলাম। তার উপরে এই কথাগুলি পড়লাম:

Ici Git Clarimonde,
Qui Fut Dc Son Vivant
La Plus Belle Du Monde

শেষ পর্যন্ত সেরাপিয়নের গাঁইতি শবাধারের ঢাকনাটা খুলে সেটাকে তুলে



ধরল, আর আমি দেখলাম ক্লারিমোঁদেকে—তার পাণ্ডুর মুখের উপর এক-ফোঁটা রক্ত চিকচিক করছে।

সেরাপিয়ন সক্রোধে চীৎকার করে উঠলেন—

"আঃ, এখানেই তুমি আছ·· শয়তান, বারজীবিনী, রক্তচোষা বাদুড় ; তুমিই মানুষের রক্ত চুষে খাও !"

এই কথা বলে তিনি তার উপর পবিত্র বারি ছিটিয়ে দিলেন, আর সঙ্গে সঙ্গে সে ধুলো হয়ে গুঁড়িয়ে গেল।

তিনি বললেন, "স্যার রোমল্ড, ওই তোমার প্রিয়া শুয়ে আছে ; এবার যাও, তোমার সুন্দরীকে নিয়ে লিভোতে গিয়ে খেলা করোগে।"

মাথা নীচু করলাম। অন্তরের মধ্যে শুধুই ধ্বংসস্তূপ. আমার অতি সাধারণ পুরোহিতের বাড়িতে ফিরে গেলাম। প্রেমিক রোমল্ড পুরোহিতকে বিদায়-সম্ভাষণ জানাল। কিন্তু পরদিন রাতে আবার ক্লারিমোঁদেকে দেখলাম !

চীৎকার করে সে বলল, "হতভাগ্য পুরুষ, এ তুমি কী করলে ? কেন ঐ মূর্খ পুরোহিতের কথায় কান দিলে ? আমি তোমার কি ক্ষতি করেছি যে তুমি আমার কবরকে অপবিত্র করলে ? এখন থেকে আমাদের দেহ ও আত্মার বন্ধন ছিন্ন হয়ে গেল। তবু তুমি আমাকে কামনা করবে। বিদায় !"

তারপর সে মহাশূন্যে মিলিয়ে গেল। আর কোনদিন তাকে দেখতে পাই নি।···হায় ! সে তো সত্য কথাই বলেছিল ; আজও তাকে আমি কামনা করি। বড় বেশী দামে আমার মুক্তিকে কিনেছি, আমার প্রভুর ভালবাসা তো তার ভালবাসার ক্ষতিপূরণ করতে পারে নি।

ভাইরে, এই আমার যৌবনের কাহিনী।

তোমার চোখ যেন কোন নারীকে না দেখে। পথ চলবে শুধু মাটির দিকে চোখ রেখে। কারণ, যত পবিত্র ও শান্তই হও না কেন, একটি মুহূর্ত তোমাকে অনন্তকালের জন্য অভিশপ্ত করে তুলতে পারে।

The Dreamland Bride—Theofil *Gotier*

কালো কফি

অধ্যাপক জার্ভিস নানা তথ্যসম্বলিত বইয়ের স্তূপের মধ্যে বসে আছেন ; নানা মন্তব্য ও টুকিটাকি লেখা কাগজপত্র চারদিকে ছড়িয়ে আছে ; কলমের খস্‌খস্‌ শব্দ ছাড়া একটা নিরবচ্ছিন্ন নীরবতা তাকে ঘিরে রয়েছে।

অধ্যাপক জার্ভিস সবরকম হৈ-হল্লাকেই ঘৃণা করেন, কারণ যে অবিচ্ছিন্ন চিন্তা, প্রমাণিত ঘটনাবলী থেকে প্রাথমিক অনুমানে যাওয়ার যে প্রস্তুতিকে তিনি বেঁচে থাকার প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বলে মনে করেন, হৈ-হল্লা তাকে নষ্ট করে দেয় ; তাই তিনি থাকেন বাড়ির ত্রিশ তলায়।

প্রায় একমাস হল খানসামা জন ছাড়া আর কাউকে তিনি চোখে দেখেন নি ; এই বড় শহরটার একেবারে মাথায় রাতের পর রাত জেগে বসে থেকে তিনি সেই কাজটির মধ্যেই ডুবে আছেন অনেক বছর ধরে যার স্বপ্ন তিনি দেখছেন—"দর্শনের উচ্চতর নীতিশাস্ত্র" বিষয়ক একখানি গ্রন্থ রচনার কাজ, আর সে কাজটি প্রায় সমাপ্তির মুখে। গত কয়েক সপ্তাহ যাবৎ কাজের নেশা যেন তাকে পেয়ে বসেছে. সে নেশা শয়তানের মত নিষ্ঠুর, নির্দয়,—জটিল চিন্তা ও স্নায়ুছিন্নকারী পরিশ্রমের চাপের হাত থেকে সে নেশা তিলমাত্র রেহাই দেয় না , তাই রাতের পর রাত অধ্যাপক কেবল লিখেই চলেছেন ; ইদানীং যৎসামান্য ঘুম ও অনেক বেশী কালো কফি নিয়েই তার দিন কাটছে।

আজ রাতে কিন্তু তিনি একটা বিচিত্র ক্লান্তি বোধ করছেন। কলমটা নামিয়ে রেখে ধুক-ধুক করা কপালটাকে দুই হাতের মধ্যে ধরে উদ্দেশ্যহীন দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন সামনে রাখা পাণ্ডুলিপির পাতার দিকে।

এইভাবে ঝুঁকে বসে গত কয়েকদিন যাবৎ যে বমির ভাবটা মাঝে মাঝেই দেখা দিচ্ছে সেটাকে থামাবার চেষ্টা করতে গিয়ে ঠাসাঠাসিভাবে লেখা দীর্ঘ পংক্তিগুলো যেন তার চোখে জীবন্ত "বস্তু" হয়ে দেখা দিল ; সে-গুলি যেন হাজার পা মেলে সাদা কাগজের উপর ইতস্তত হেঁটে বেড়াচ্ছে।

অধ্যাপক জার্ভিস চোখ বুজে ক্লান্তিসূচক নিঃশ্বাস ফেললেন। নিজের মনেই বললেন, "এবার একটু ঘুমতেই হবে। কখন যে শেষ ঘুমিয়েছি কে জানে ?" বলতে বলতে তিনি শরীরটাকে টান করে একটা হাই তুলতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু পারলেন না। উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরতে ঘুরতে তার দৃষ্টি টেবিলের উপরকার বাতির উপরে এসে থেমে গেল ; সেদিকে তাকিয়ে দেখলেন, সেই "বস্তুগুলি" কাগজের উপর থেকে উঠে এসে এঁকেবেঁকে সবুজ ঢাকনাটা বেয়ে উঠছে। তিনি আবার একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন ; বৈদ্যুতিক ঘণ্টাটার জন্য পাশের কাগজপত্রগুলি হাতড়াতে লাগলেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তার মনে হল, বাতিটার আলোর পিছনে দণ্ডায়মান ছায়ার ভিতর থেকে জনের অস্পষ্ট দূরাগত কণ্ঠস্বর যেন তার কানে এল।

অধ্যাপক বললেন, "তুমি যদি সত্যি ওখানে এসে থাক তাহলে দয়া করে সুইচটা জ্বালিয়ে দাও। আচ্ছা জন, আমি শেষ কখন ঘুমিয়েছিলাম বল তো ?"

"সে কি স্যার ? আজ এক সপ্তাহ হল আপনি তো ঠিকমত ঘুমোন নি ; কখনও-সখনও কোচে বসে একটু ঝিমুনি দিয়েছেন মাত্র ; কিন্তু স্যার সেটা তো কিছুই না ; দেখুন স্যার, আমার কথা যদি শোনেন তো বলি, এইমুহূর্তে ঘুমতে যাওয়াটাই আপনার পক্ষে সবচাইতে ভাল কাজ।"

"হুম !" অধ্যাপক বললেন। "তোমার পরামর্শের জন্য ধন্যবাদ জন ; পরামর্শটা ভাল হলেও অবাস্তব। এখন আমি শেষ অধ্যায়টি লেখার কাজে

ব্যস্ত ; সেটা শেষ না করে ঘুমনো অসম্ভব।"

জন আবার বলতে শুরু করল, "আপনার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিয়েই বলছি স্যার, পোশাক ছেড়ে যদি ভাল মত ঘুমবার একটু চেষ্টা—"

তার শান্ত স্বভাবের সঙ্গে নেহাৎই বেমানানভাবে হঠাৎ রেগে গিয়ে অধ্যাপক চেঁচিয়ে বললেন, "বোকার মত কথা বলো না জন! তুমি কি মনে কর ঘুমতে পারলে আমি ঘুমতাম না? দেখতে পাচ্ছ না, আমি ঘুমতেই চাইছি। তোমাকে বলছি, ঘুমতে পারলে নিশ্চয়ই ঘুমতাম, কিন্তু পারছি না—আমি জানি বইটা শেষ না করা পর্যন্ত আমার কপালে বিশ্রাম নেই, আর শেষ করতে প্রায় ভোর হয়ে যাবে।" অধ্যাপক তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে জনের দিকে তাকালেন, তার ঘন ভুরু দুটি কুঁচকে যাচ্ছে, ডিমের মত পাণ্ডুর মুখে চোখ দুটি জ্বলছে অপ্রীতিকর দীপ্তিতে।

"এত বেশী কালো কফি খাওয়াটা যদি ছেড়ে দিতেন স্যার, লোকে বলে ওটা স্নায়ুর পক্ষে খুবই খারাপ—"

চিরদিনের মত শান্ত গলায় অধ্যাপক এবার বললেন, "আমিও মনে করি তারা ঠিকই বলে। হঁ্যা, আমি তাই মনে করি। যেমন ধর, এই মুহূর্তে আমার মনে হচ্ছে ঐ পর্দাটার আড়ালে একটা হাত কি যেন হাতড়ে বেড়াচ্ছে। অথচ এই মানসিক অবস্থাটা আমার শেষ অধ্যায়ের বিষয়বস্তুর সঙ্গে বেশ মিলে যাচ্ছে, সেখানেও প্রকৃতির মানস শক্তির কথাই বলা হয়েছে। জন, আমি বিশেষ করে নিম্নোক্ত অংশটির উল্লেখ করছি :

'যে রহস্যময় শক্তিকে অনেকে আত্মা বলে, যথেষ্ট শিক্ষণলাভ করলে সে কিছু সময়ের জন্য এই রক্ত-মাংসের দেহটাকে ছেড়ে বাতাসের ঘাড়ে চেপে, সমুদ্র ও নদীর বুকের উপর দিয়ে হেঁটে অন্তহীন মহাশূন্যে পাড়ি জমাতে পারে, এবং যারা অনেকদিন আগে মারা গেছে তাদের দেহের মধ্যেও নতুন করে বাসা বাঁধতে পারে, অবশ্য সেসব দেহ যদি নিষ্কলুষ থাকে। অধ্যাপক তার চেয়ারে হেলান দিয়ে সোচ্চার চিন্তার মতই বলতে লাগলেন :

"অনেক শতাব্দী আগে মানুষ এসব জানত, বিশেষ করে আইসিস ও আদি চেল্ডীয়রা তো জানতই, আজও কোন কোন অঞ্চলে ভারতবর্ষের ফকিররা এবং তিব্বতের লামারা এসব অনুশীলন করে থাকে ; অথচ অজ্ঞান জগৎ এসব কাজকে সস্তা চালবাজী ছাড়া আর কিছুই মনে করে না।" হঠাৎ জনের উপস্থিতি সম্পর্কে সচেতন হয়ে বলে উঠলেন, "ভাল কথা, তুমি কি আগামীকাল পর্যন্ত ছুটি চেয়েছিলে?"

"হঁ্যা স্যার, তা চেয়েছিলাম," জন স্বীকার করল, 'তবে পরে ভাবলাম ছুটিটা এখন থাক, কারণ আপনি এখন এত—এত ব্যস্ত স্যার।"

'বাজে কথা। আজকের সন্ধ্যাটা নষ্ট করো না, এতেই যথেষ্ট দেরি হয়ে গেছে। শোন জন, সামোভারে আরও কিছুটা কফি তৈরি করে রেখে

তারপরই তুমি চলে যেতে পার।" কিছুটা ইতস্তত করেও অধ্যাপকের চোখের দিকে তাকিয়ে জন হুকুম মতই কাজ করল। ধূমায়মান সামোভারটাকে টেবিলের উপর মনিবের হাতের কাছে রেখে দিয়ে এবং ঘরটাকে ঠিকঠাক করে দিয়ে সে দরজার দিকে মুখ ফেরাল।

"সকাল আটটায় আমি ফিরে আসব স্যার।"

কফিতে চুমুক দিতে দিতে অধ্যাপক বললেন, "খুব ভাল কথা জন। শুভরাত্রি।"

প্রত্যুত্তরে "শুভরাত্রি স্যার" বলে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে মাথাটা নাড়তে নাড়তে জন একমুহূর্ত দাঁড়াল। অস্ফুট স্বরে বলল, "ওকে একলা রেখে যাওয়া উচিত নয়, কিন্তু আমি তো সকাল আটটার আগেই ফিরে আসব; হ্যাঁ, আটটার আগেই ফিরতে যথেষ্ট চেষ্টা করব।" এই কথা বলে সে ধীরে ধীরে বারান্দা ধরে এগিয়ে গেল।

২

অধ্যাপক অনেকসময় তার ডেস্কের উপর উপুড় হয়ে বসে রইলেন, অথচ বিগত আধ ঘণ্টার মধ্যে সামনের খোলা পাতায় একটি শব্দও লেখেন নি, কারণ তার মস্তিষ্কের ভিতরে কোথায় যেন একটা ছোট হাতুড়ি ধীরে, নিয়মিতভাবে, আস্তে আস্তে ঠুক-ঠুক শব্দ করে চলেছে, ফলে তার চারপাশের স্তব্ধতা আরও নিবিড় হয়ে উঠেছে। ক্রমে ক্রমে তার মনের মধ্যে একটা অর্থহীন একান্ত প্রত্যাশা যেন হাতুড়ির প্রতিটি আঘাতের সঙ্গে সঙ্গে একটা কিছু তার দিকে এগিয়ে আসছে, নিকট হতে নিকটতর হচ্ছে—এমন কিছু যা তিনি ধারণা করতে পারছেন না। আবার ঠেকাতেও পারছেন না, শুধু বুঝতে পারছেন যে সেটা আসছে, আসছে. একটা অজানাকে জানবার আশায় তিনি কান খাড়া করে অপেক্ষা করতে লাগলেন।

সহসা যেন নীচের জগতের অনেক দূর থেকে একটা ঘড়িতে মধ্যরাতের ঘণ্টা বেজে উঠল, তার শেষ শব্দটা মিলিয়ে যাবার আগেই বাইরের বারান্দায় দ্রুত পায়ের শব্দ শোনা গেল, একটা টোকা, কে যেন হাতলটা খুঁজছে। অধ্যাপক উঠে দাঁড়াতেই দরজাটা খুলে গেল, আর একটি বেঁটে মত, শক্তসমর্থ মানুষ দ্রুত পা ফেলে ঘরে ঢুকল। গোলাকার লাল মুখ ও খাড়া-খাড়া পাকা চুলই তার প্রধান বৈশিষ্ট্য। অধ্যাপকের সঙ্গে কর-মর্দন করতে করতে সেইরকম দ্রুততালে ধাক্কা দিয়ে দিয়ে লোকটি কথা বলতে লাগল যেটা ম্যাগ্‌নাস ম্যাকমেনাস-এর বৈশিষ্ট্য। গত দশ বছর যাবৎ মিশরের নিম্নাঞ্চল ও নীলনদের তীর বরাবর অনুসন্ধান কার্য চালাবার ফলে ম্যাগ্‌নাস ম্যাকমেনাস-এর নামটা বিখ্যাত হয়ে উঠেছে।

তিনি বলতে শুরু করলেন, "প্রিয় ডিক, আরে, তোমাকে এরকম অসুস্থ

দেখাচ্ছে কেন ? ভয়ের কথা—যথারীতি পরিশ্রম করছ তো ?"

অধ্যাপক সোল্লাসে বলে উঠলেন, "আরে, ম্যাগ্‌নাস! আমি তো জানতাম তুমি এখনও মিশরেই আছ ?"

"ঠিকই জানতে—তাই ছিলাম—একটা নমুনা নিয়ে গত সপ্তাহে ফিরেছি—তিনদিন নিউইয়র্কে ছিলাম—এখনই নীলনদের তীরে ফিরে যেতে হবে—গতকাল টিকিট কেটেছি—জাহাজ ছাড়বে আগামীকাল—দুপুরে। কি জান ডিক," ঘরময় ছুটতে ছুটতেই ম্যাগ্‌নাস বললেন, "তারাস্তের কাছ থেকে একটা তার পেয়েছি—তারান্তকে তুমি তো জান, আমাদের খনন-কার্যের ওভারসীয়ার; লিখেছে, তারা একটা এক-প্রস্তর স্তম্ভ পেয়েছে—তাতে কপ্টীয় লিপি—আশ্চর্য—গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে—খুব ?"

"ঠিক," অধ্যাপক মাথা নাড়লেন।

"তাই তো তোমার কাছে এসেছি ডিক—তোমাকে বলতে এসেছি যে-নমুনাটি সঙ্গে করে এনেছি সেটা তোমার কাছেই রেখে যাব। আশাকরি আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত সেটা তোমার কাছে রাখতে আপত্তি করবে না।"

"নিশ্চয় রেখে যাবে, অবশ্য রেখে যাবে," অধ্যাপক অন্যমনস্কভাবে জবাব দিল।

"নিঃসন্দেহে এটি এ যুগের মহত্তম আবিষ্কার, ম্যাগ্‌নাস বলতে লাগল, "বিরাট ব্যাপার—মিশরের ইতিহাসের উপর নতুন আলোকপাত করবে—যতদূর জানা যায় সারা পৃথিবীতে এরকম আর একটা মমিও নেই।"

"কি বললে ?" অধ্যাপক চেঁচিয়ে বলল, "মমি ?"

ম্যাগ্‌নাস ঘাড় নাড়লেন, "নিশ্চয। তবে শব্দটা বোধহয় ঠিক হল না।—সাধারণ শুকনো মমির চাইতেও এটা স্বতন্ত্র কিছু।"

"তুমি—তুমি কি সেটাকে সঙ্গে করে এনেছ ম্যাগ্‌নাস ?"

"নিশ্চয়—বাইরের বারান্দাতেই রয়েছে।"

অকারণেই অধ্যাপক ভীষণভাবে কাঁপতে শুরু করলেন, বমির ভাবটা আবার দেখা দিল।

"এমন অসময়ে এখানে নিয়ে এসেছ—তুমি তো জান ওটাকে সরানো—নড়ানো খুব অসুবিধা।"—অধ্যাপক কথা বলতে বলতেই ম্যাগ্‌নাস ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। বাইরে অনেকের গলা শোনা গেল, একটা ভারী জিনিস বয়ে আনার মত অনেক মানুষের হৈ-চৈ ও পায়ের শব্দ হতে লাগল। আর সেসব ছাপিয়ে কানে এল ম্যাগ্‌নাসের উত্তেজিত কণ্ঠস্বর।

"আস্তে—কোণটা সাবধান—আস্তে, আস্তে, ঝাঁকি লাগিও না; এবার আস্তে—ঠিক আছে।" ম্যাগ্‌নাস ঘরে ঢুকলেন, তার পিছনে চারটি লোক প্যাকিং-বাক্স ও শবাধারের মাঝামাঝি আকারের একটা কিছু বয়ে নিয়ে

ঢুকল; ম্যাগ্‌নাসের নির্দেশমত ঘরের একটা সুবিধাজনক কোণে সেটাকে সাবধানে নামিয়ে রাখল।

লোকগুলি চলে গেলে পকেট থেকে একটা ছোট স্ক্রু-ড্রাইভার বের করে ম্যাগ্‌নাস বললেন। "এবার তোমাকে এমন কিছু দেখাব যাতে নিজের চোখকেই তুমি বিশ্বাস করতে পারবে না—প্রথমে আমিও পারি নি—একটা বিস্ময়কর জিনিস ডিক—যত সমিতি—প্রতিষ্ঠান আছে সব একেবারে বোকার মত হাঁ করে ঢোক গিলতে থাকবে।

ম্যাগ্‌নাস একটার পর একটা ঢাকনার স্ক্রুগুলো খুলতে লাগল, আর অধ্যাপক চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে রইল—অপেক্ষাই করতে লাগল।

শেষ স্ক্রুটা খুলতে খুলতে ম্যাগ্‌নাস বলল, "এই নমুনাটি সুগন্ধি তেলে মৃতদেহ রক্ষার কলাকৌশলের উপর নতুন আলোকপাত করবে। এটা কোন খড়ভর্তি, শুকিয়ে-যাওয়া মানুষের বুড়ো নয়। একাজ যে করেছে সে একটি প্রতিভা—নির্ঘাৎ—এক্ষেত্রে পেট থেকে নাড়িভুঁড়িও বের করা হয় নি—এই স্ক্রুটা তো জালাল দেখছি—এর ভিতর থেকে জীবন যখন প্রথম বেড়িয়ে গিয়েছিল দেহটা আজও ঠিক তেমনি আছে—আমার কথা শোন ডিক—এটা কম করেও ছ' হাজার বছরের পুরনো—হয় তো আরও বেশী পুরনো। আমি বলছি, এটা সব বিস্ময়ের অতীত, কিন্তু এই তো দেখতে পাচ্ছ—এবার নিজেই বিচার কর!" এই কথা বলে স্ক্রু-ড্রাইভারটা একপাশে রেখে ম্যাগ্‌নাস ভারী ঢাকনাটা তুলে একপাশে সরে দাঁড়াল।

সামনে কাঁচ-লাগানো শবাধারের মধ্যে যে বস্তুটি শুয়ে আছে—অথবা বলা যায় দাঁড়িয়ে আছে, তার দিকে তাকিয়ে অধ্যাপক একটা দীর্ঘশ্বাস টেনে নিলেন, কাঁপা আঙুল দিয়ে হাতল-চেয়ারটাকে চেপে ধরলেন।

তিনি যা দেখলেন তা কালো চুলের মাঝখানে একখানি ডিমের আকারের মুখ, একটুও কুঁচকে যায় নি, অথচ বীভৎস ছাই-ছাই ধূসর রং, পাতলা, খাড়া, বাঁকা নাকে দুটি সুস্পষ্ট নাসারন্ধ্র, মুখের ঠোঁট দু'খানি নীল, তার পরিপূর্ণ নিষ্ঠুর রেখায় এমন একটা ভৌতিক পরিহাস লুকিয়ে আছে যার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে একটা নামহীন আতংক।

ম্যাগ্‌নাস বললেন, "একসময় বেশ সুন্দরী ছিলেন। খুবই সুন্দরী—নাক, চোখ, মুখ সবই ভাল—একেবারে খাঁটি মিশরীয় ছাঁদ, কিন্তু…"

অধ্যাপক তাড়াতাড়ি যোগ করলেন, "কেমন-কেমন যেন শয়তানের মত মুখ। ওই দুটি আঁখি-পল্লবের নীচে কি আছে জানি না, মনে হচ্ছে যেকোন মুহূর্তে ও দুটি খুলে যেতে পারে, আর তা যদি ঘটে—ওঃ, সে তো ভয়ঙ্কর ব্যাপার হবে।"

ম্যাগ্‌নাস হাসলেন। "জানতাম, এই সুন্দরী তোমাকে চমকে দেবে—বিজ্ঞানকে করবে মূক-বধির—সেবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। আর এই যে

পাথরগুলো," তিনি যেন পরিতৃপ্তির সঙ্গেই বলতে লাগলেন, "ওর গলায় জড়ানো রয়েছে—আস্ত মরকত মণি—এ তো পঞ্চম রাজবংশের আমলের—অথচ ওর বুকের উপরকার ঐ জোনাকি-মূর্তিটা. ওটা তো মনে হয় আরও প্রাচীনকালের—ওর জামার জরির কাজ তো আমাকেও হার মানিয়েছে—আর বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের আংটিটার আকৃতি দেখে তো মনে হয় ওটা পঞ্চদশ রাজবংশের আমলের। সব মিলিয়ে ইনি এক বিচিত্র রহস্যময়ী। আর একটা অদ্ভুত ব্যাপার হচ্ছে ঐ মুখ ও নাসারন্ধ্র—একধরনের সিমেণ্ট দিয়ে বন্ধ করা—সেগুলো ছাড়াতে অনেক সময় লাগবে।"

তিনি বলেই চললেন, "পাথরের শবাধারের উপর যে শিলা-লিপি লেখা আছে তাতে ওকে এইভাবে বর্ণনা করা হয়েছে: 'রমন কাউ রা-র রাজত্বকালে রা-বংশের রাজকুমারী হাস্থয়েরা।' রমন কাউ রা সম্ভবত দ্বিতীয় সেতি-র অন্য উপাধি। আমি আরও পেয়েছি একটা প্যাপিরাস-পাতা—খুবই গুরুত্বপূর্ণ—ও কয়েকটা শিলালিপি, কোনরকমে সেগুলোতে একবার চোখ বুলিয়েছি মাত্র—কিন্তু তাতে যতটুকু বুঝতে পেরেছি তাতে মনে হয় এই হাস্থয়েরার অনেক সুখ্যাতি ছিল—সে ছিল সেমিরামিস, ক্লিওপেত্রা ও মেসালিনার যোগফলের তিনগুণ। তার অন্যতম প্রেমিক ছিলেন জনৈক পত্তোমেস, ওরিসিস মন্দিরের প্রধান পুরোহিত, বলা হয়ে থাকে তিনি 'আইসিস ও উচ্চ কোটির দেবতাদের কলা-কৌশল ও গুপ্ত রহস্যের ব্যাপারে খুবই ওয়াকিবহাল ছিলেন।' প্রথম যখন এই পাথরের শবাধারটি খুললাম, তখন এলোমেলো আবরণগুলো দেখে মনে হয়েছিল ইনি বোধহয় নড়াচড়া করেছেন, যে সোনার মৃত্যু-মুখোশটি এর মুখে আঁটা ছিল সেটাও খুলে পড়েছিল—সেটাও তো অদ্ভুত, খুবই অদ্ভুত। মুখোশটা পরীক্ষা করে—কপাল বরাবর একটা শিলা-লিপি পেয়েছি—দিনের পর দিন সেটা আমাকে ভাবিয়েছে—কিন্তু অর্থটা হঠাৎই পেয়ে গেলাম—বিছানায় শুয়ে—অসম ছন্দের হাসির কবিতায় অনুবাদ করলে অর্থটা এইরকম দাঁড়াতে পারে:

'আইসিস ক্ষণ তরে শ্বাসরোধ করেছে আমার,
আমাকে যে জাগাইবে সেই হবে মৃত্যুর শিকার।'

এটাও তো খুব অদ্ভুত, কি বল? আরে, কী আশ্চর্য, তোমার কী হয়েছে?" এই প্রথম বন্ধুর দিকে তাকিয়ে ম্যাগ্‌নাস নিজের কথা থামিয়ে প্রশ্ন করলেন।

সেই গাঢ়স্বরে অধ্যাপক বললেন, "কিছু হয় নি। শুধু এটাকে ঢেকে ফেলো—ঈশ্বরের দোহাই, ঢেকে ফেলো!"

ম্যাগ্‌নাস বললেন, "নিশ্চয়—অবশ্যই। এটা দেখে তুমি এতটা বিচলিত হবে ধারণা করতে পারি নি। তোমার স্নায়ুগুলি একেবারে তচ্‌নচ্‌ হয়ে গেছে, নিজের আরও যত্ন নেওয়া তোমার উচিত ডিক; ওই বাক্সে কালো

কফি খাওয়া বন্ধ করে দাও।"

শেষ স্ক্রুটা আটকে দেওয়া হতেই অধ্যাপক ঈষৎ উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠলেন। "আঠারোটা স্ক্রু আছে, প্রতিটা প্রায় আড়াই ইঞ্চি লম্বা, কি বল ম্যাগ্‌নাস?'

"ঠিক," বলেই ম্যাগ্‌নাস আবার একদৃষ্টিতে তাকালেন।

সেই একই বিস্ময়কর হাসি হেসে অধ্যাপক বললেন, "ভাল।" ম্যাগ্‌নাস যেন জোর করে হাসলেন।

বললেন, "আরে ডিক, তুমি এমনভাবে কথা বলছ যেন ধরেই নিয়েছ—'

অধ্যাপক তাকে বাধা দিয়ে বললেন, "ওই দুটি চোখ আমাকে ভয় পাইয়ে দিয়েছে। ও দুটি যেন এমন একজনের চোখ যে আচম্বিতে তোমাকে আক্রমণ করার জন্য অপেক্ষা করে আছে, চোখ দুটি যেন পিছন থেকে তোমার উপর নজর রেখেছে, তোমাকে অনুসরণ করছে—''

ম্যাগ্‌নাস তখনই চেঁচিয়ে বলে উঠলেন, "ফুঃ। যতসব বাজে কথা ডিক। এসব কল্পনা ছাড়া কিছুনা—স্রেফ কল্পনা! এখনই তোমার কোথাও বেড়াতে যাওয়া উচিত, নইলে এরপরে তুমি মতিভ্রম-রোগে ভুগবে।"

"চুপ করে বসে শোন," বলে অধ্যাপক সামনে খোলা পাণ্ডুলিপি থেকে পড়তে শুরু করলেন :

'যে রহস্যময় শক্তিকে অশেষ আত্মা বলে, যথেষ্ট শিক্ষণ লাভ করলে সে কিছুসময়ের জন্য এই রক্ত-মাংসের দেহটাকে ছেড়ে বাতাসের ঘাড়ে চেপে সমুদ্র ও নদীর বুকের উপর দিয়ে হেঁটে অন্তহীন মহাশূন্যে পাড়ি জমাতে পারে, এবং যারা অনেকদিন আগে মারা গেছে তাদের দেহের মধ্যেও নতুন করে বাসা বাঁধতে পারে, অবশ্য সেসব দেহ যদি নিষ্কলুষ থাকে।''

"হুম!'' পায়ের উপর পা তুলে ম্যাগ্‌নাস বললেন "তারপর?"

"অবশ্য সেসব দেহ যদি নিষ্কলুষ থাকে,' কথাগুলি আর একবার বলে অধ্যাপক হঠাৎ হাত তুলে ঘরের কোণটা দেখিয়ে বলে উঠলেন, "ওটা তো মৃত্যু নয়।"

ম্যাগ্‌নাস লাফিয়ে উঠলেন ; চেঁচিয়ে বললেন, "আরে বাবা, তুমি দেখছি এক পাগল। কি বলতে চাইছ তুমি?''

"জীবনের সাময়িক বিরতি!'' অধ্যাপক বললেন।

অনেকক্ষণ পর্যন্ত একেবারে চুপচাপ ; দুজন দুজনের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন ; ম্যাগ্‌নাসের মুখ থেকে অনেকখানি রং মুছে গেছে, আর অধ্যাপকের আঙুলগুলো তখনও হাতল-চেয়ারটার গায়ে নড়াচড়া করছে। হঠাৎ ম্যাগ্‌নাস হেসে উঠলেন, সম্ভবত কিছুটা উচ্চকণ্ঠেই হাসলেন।

"বাজে কথা!'' ম্যাগ্‌নাস বললেন, ''কী বোকার মত কথা বলছ ডিক? তোমার এখন দরকার হবে এক গ্লাস ব্র্যাণ্ডি, আর তারপরে একটা বিছানা।'' পুরনো বন্ধুর মতই সবজান্তা স্বাধীনভাবে কোণের আলমারির

কাছে গিয়ে একটা ডিকেন্টার ও গ্লাস নিয়ে এসে তুটো গ্লাসে পুরো এক পেগ করে ঢাললেন।

"তার মানে, আমার সঙ্গে তুমি একমত নও ম্যাগ্নাস?"

একচুমুকে নিজের ব্র্যাণ্ডিটা গিলে ম্যাগ্নাস বললেন, "একমত, না। সবই স্নায়ুর ব্যাপার। ওসব কথা থাক।"

অধ্যাপক মাথা নাড়লেন। "স্বর্গে ও মর্ত্যে এমন অনেক কিছুই আছে—"

"হ্যাঁ—হ্যাঁ, আমি জানি—ঐ একই উদ্ধৃতির জন্য শেকস্পীয়ারকে আমি প্রায়ই গালমন্দ করে থাকি।"

"কিন্তু ম্যাগ্নাস, কয়েকবছর আগে মিশরীয়দের কৃত্রিম মোহাচ্ছন্নতার অনুশীলন সম্পর্কে তুমি নিজেই তো একটা প্রবন্ধ লিখেছিলে।"

ম্যাগ্নাস প্রতিবাদ জানিয়ে বললেন, "দেখ ডিক, ঈশ্বরের দোহাই, যুক্তি-পূর্ণ কথা বল! কোন মোহাচ্ছন্নভাব কি ছ' সাত হাজার বছর থাকা সম্ভব? অত্যন্ত অযৌক্তিক কথা। চল, বুদ্ধিমান ছেলের মত শোবে চল—জন কোথায়?"

"আগামীকাল পর্যন্ত তাকে ছুটি দিয়েছি।"

"এটা কি করেছ?" অস্বস্তির সঙ্গে ঘরের চারদিকে তাকিয়ে ম্যাগ্নাস বললেন। "যাক গে, তার জায়গাটা না হয় আমিই নেব—তোমাকে বিছা-নায় নিয়ে যাব, আরও সব কাজই করব।"

মাথা নাড়তে নাড়তে অধ্যাপক বললেন, "ধন্যবাদ ম্যাগ্নাস, কিন্তু তাতে কোন লাভ নেই। এই শেষ অধ্যায়টা লিখে সম্পূর্ণ না করা পর্যন্ত আমি ঘুমতে পারছি না; আর সে কাজটা করতে আর বেশী সময়ও লাগবে না।

নিজের ঘড়িটা দেখে ম্যাগ্নাস বললেন, "হা ঈশ্বর, একটা বাজে! আমাকে এক্ষুণি যেতে হবে ডিক—হোটেলে—তুমি তো জান কালই জাহাজ ছাড়ছে।"

অধ্যাপক শিউরে উঠে দাঁড়ালেন। কর-মর্দন করে বললেন, "বিদায় ম্যাগ্নাস। আশাকরি তোমার এক-প্রস্তর স্তম্ভটি একটি ভাল আবিষ্কার বলেই প্রমাণিত হবে। বিদায়।"

বন্ধুর হাতে চাপ দিয়ে ম্যাগ্নাস বললেন, "ধন্যবাদ। কিন্তু মনে রেখো, ঐ বিষময় কফি চলবে না।" এই বলে দরজা পর্যন্ত গিয়ে মাথাটা নেড়ে বেরিয়ে গেলেন।

অধ্যাপক ভুরু কুঁচকে একমুহূর্ত বসে রইলেন; তারপর হঠাৎ উঠে দরজার কাছে গিয়ে হাতলটা ঘোরালেন, বারান্দায় আবছা আলোয় উঁকি মেরে দেখলেন।

"ম্যাগ্নাস," চাপা কর্কশ স্বরে ডাকলেন। "ম্যাগ্নাস।"

"বল?" জবাব এল।

"তাহলে এটা যে চোখ মেলে তাকাবে তা তুমি মনে কর না, কি বল ম্যাগ্‌নাস ?"

"হা ঈশ্বর—না !"

"আঃ !" বলে অধ্যাপক দরজাটা বন্ধ করে দিলেন।

৩

কলমটা হাতে নিয়ে অধ্যাপক বললেন, "মনে হচ্ছে জনকে যেতে না দিলেই ভাল করতাম, আজ রাতটা বড্ড একলা লাগছে, জন খুবই কাজের লোক," এই বলে তিনি আবার উপুড় হয়ে লিখতে শুরু করলেন। মাথাটা অসাধারণ রকমের ঝকঝকে ও পরিষ্কার লাগছে, সব শক্তিগুলোই যেন উচ্চতম গ্রামে বাঁধা হয়েছে, পূর্ণতার একটা অনুভূতি তাকে ভর করছে। ধারণাগুলো ঝলসিত হয়ে উঠছে, জটিল চিন্তাগুলো সুসংবদ্ধ হয়ে উঠছে, একটা সূক্ষ্ম শক্তি ও সাবলীলতায় কথাগুলি যেন কলমের মুখ দিয়ে আপনা-থেকেই বেরিয়ে আসছে।

তথাপি কোন আপাত কারণ না থাকা সত্ত্বেও একটা পংক্তির মাঝখানে পৌছেই হঠাৎ তার মনে তীব্র বাসনা জাগল। মাথাটা ঘুরিয়ে ঘরের কোণে রাখা বস্তুটিকে একবার দেখলেন। অনেক চেষ্টা করে সে বাসনাকে চাপা দিলেন; আবার কলমের খস্‌খস্‌ শব্দ হতে লাগল, অবশ্য সর্বক্ষণই তিনি বুঝতে পারছেন যে সেই বাসনা ক্রমেই বাড়ছে। আগে হোক আর পরে হোক একসময় তাকে পরাস্ত করবেই। তিনি যে অস্বাভাবিক কিছু দেখার আশা করছেন তা নয়, সেটা তো একান্তই অবাস্তব। তিনি স্মরণ করতে চেষ্টা করলেন, যে ঢাকনা দিয়ে সেই বস্তুটিকে চাপা দেওয়া হয়েছে তাতে কতগুলি স্ক্রু আছে—হঠাৎ অধ্যাপক মাথাটা ঘোরালেন। হাতের কলমটা সামনে বাড়িয়ে নিজের মনেই অস্পষ্ট স্বরে স্ক্রুর চকচকে মাথাগুলি গুণতে শুরু করলেন।

"এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ, ছয়—প্রত্যেক দিকে ছ'টা করে, উপরে ও নীচে তিনটে করে—মোট আঠারোটা। স্ক্রুগুলো সবই ইস্পাতের; এক-চতুর্থ ইঞ্চি মোটা, আর আড়াই ইঞ্চি লম্বা, স্ক্রুগুলি যথেষ্ট শক্ত হবারই কথা, তবে আঠারোটা স্ক্রু মোটেই বেশী নয়, কেন যে ম্যাগ্‌নাস আরও কিছু বেশী স্ক্রু ব্যবহার করেনি, তাহলে তো আরও মজবুত"—অধ্যাপক নিজেকে সংযত করে কাজে মন দিলেন। কিন্তু বৃথাই লেখার চেষ্টা করলেন, একটা আবেগ তাকে পেয়ে বসেছে, প্রতিমুহূর্তেই জোরদার হচ্ছে; সে আবেগের অন্তরালে আছে ভয়, আর সে ভয় পিছনে চলাফেরা করছে এমন কিছুকে নিয়ে। "হ্যাঁ, পিছন দিকে—সে যে কেন এটাকে চেয়ারের ঠিক পিছন দিকের কোণটাতেই রেখে গেল ?" তিনি উঠলেন, ডেস্কটাকে টানাটানি করলেন, কিন্তু সেটা খুব

ভারী, সরাতে পারলেন না ; তবু শারীরিক পরিশ্রমটা কোন কাজে না এলেও তার ফলে মনটা কথঞ্চিৎ শান্ত হল। কিন্তু সেই মহাগ্রন্থ শেষ করার কাজে যতই মন দিতে চেষ্টা করছেন কিছুতেই তাতে মন বসছে না ; আঙুলের ফাঁকে ধরা কলমটা কাজের উপর অলস কল্পনার ছবি ও অর্থহীন হিজিবিজি লিখতে লাগল ; তাই কলমটাকে একপাশে ঠেলে দিয়ে দুই হাতে মুখটা ঢাকলেন।

এটা কি সম্ভব হতে পারে যে আঠারোটি স্ক্রু দিয়ে আঁটা ঢাকনার নীচেকার অন্ধকারে সেই চোখ দুটি এখনও বন্ধই আছে, না কি চোখ দুটি—? অধ্যাপক শিউরে উঠলেন। আহা, সে যদি জানত, যদি নিশ্চিত হতে পারত—জন থাকলে বড় ভাল হত, জন খুব কাজের লোক—সে বসে বসে এটাকে পাহারা দিতে পারত—হ্যাঁ। জনকে যেতে দিয়ে খুবই বোকামি করেছি। অধ্যাপক দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, চোখ মেলে তাকালেন, একেবারে নিশ্চুপ—একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন সামনে ফুলস্কেপ কাগজখানার দিকে—তাকিয়ে রইলেন তার উপর এবড়ো-খেবড়ো বড় হরফে লেখা দুটি অসমান পংক্তির দিকে—সে পংক্তি দুটি তার নিজের হাতে লেখা নয় :

"আইসিস ক্ষণতরে শ্বাসরোধ করেছে আমায়,
আমাকে যে জাগাইবে সেই হবে মৃত্যুর শিকার।"

একটা আকস্মিক তীক্ষ্ণ শব্দ, একটা অট্টহাসি তাকে চমকে দিল—"এ শব্দ কি তার নিজের ঠোঁট থেকেই বেরিয়েছে ?" তিনি নিজেকেই প্রশ্ন করলেন, আর তিনি জানেন যে সেটাই ঠিক ? তিনি বসে আছেন ; তার প্রতিটি স্নায়ু ঝন্‌ঝন্ করছে—আশা করলেন, প্রার্থনা করছেন যে একটা কিছু এসে এই নীরবতাকে ভেঙে দিক—একটা পায়ের শব্দ—একটা চীৎকার—একটা আর্তনাদ—এই অট্টহাসি ছাড়া অন্য যা কিছু ; অপেক্ষা করে থাকতেই আবার সেই হাসি তার কানে এল—আরও জোরে, আরও দুর্বার হয়ে। এবার সে শব্দ তার দাঁতে দাঁতে কাঁপুনি ধরিয়ে দিল, গলার মধ্যে গড়্-গড়্ করে উঠল, তাকে ঝাঁকুনি দিতে লাগল। অধ্যাপকের চোখ পড়ল তার পায়ের কাছে ইতস্তত ছড়ানো ছেঁড়া কাগজের উপর। কাঁপা হাতে ডেস্কের উপরকার তাক থেকে পাইপটা নামিয়ে নিলেন। সেটাতে তামাক ভরাই ছিল, আগুন ধরালেন। তামাকের ধোঁয়াটা ভাল লাগল, জোরে টান দিলেন, পাকানো নীল ধোঁয়া মাথার উপর দিয়ে উঠতে লাগল, হাল্কা মেঘের মত ভাঙতে লাগল ; শেষ পর্যন্ত তার খেয়াল হল যে সব ধোঁয়া একইদিকে ভেসে গিয়ে একটা জায়গায় পর্দার মত ঝুলে আছে, আর সেই চলমান পর্দার ও-পাশেই সেই ছায়া-ঢাকা "জিনিসটি" যেন এঁকেবেঁকে নড়ছে।

অধ্যাপক স্খলিতপায়ে উঠে দাঁড়ালেন।

অস্ফুট স্বরে বললেন, "ম্যাগনাস ঠিকই বলেছে। আমি অসুস্থ, ঘুমবার চেষ্টা করতে হবে—করতে হবে—করতেই হবে—করতেই হবে।" কিন্তু

টেবিলের কোণায় কাঁপা হাত রেখে তিনি সেখানেই দাঁড়িয়ে রইলেন। যে অন্ধ ভয়, অহেতুক ত্রাসের বিরুদ্ধে তিনি সারা রাত বৃথাই লড়াই করেছেন তা যেন একটা দুর্বার ঢেউয়ের মত এসে তাকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল, দম বন্ধ হয়ে এল, একটা জঘন্য ভয়ে পা থেকে মাথা পর্যন্ত কাঁপতে লাগল, অথচ সারাক্ষণ সেই বড় সাদা বাক্সটার উপর থেকে দৃষ্টি ফেরাতে পারলেন না, বাক্সটার ছোট স্ক্রুর মাথাগুলো ছোট ছোট অনুসন্ধানী চোখের মত তার দিকে যেন হাঁ করে তাকিয়ে আছে। পাশে মেঝের উপর কি যেন চকচক করছে। কোন কিছু বোঝবার আগেই তিনি স্ক্রু-ড্রাইভারটা তুলে নিলেন। অস্থিরভাবে সেটাকে ঘোরাতে লাগলেন, মাত্র একটা স্ক্রু বাকি, একটু থেমে গালের উপর থেকে ঘামটা মুছতে গিয়েই তিনি অবাক হয়ে গেলেন—অনেক বছর আগে কলেজ-জীবনে একটা গানের আসরে শোনা একটা গান তিনি নিজেই গাইছেন, তারপরই শেষ স্ক্রুটা খুলে যেতেই তিনি দম বন্ধ করে দাঁড়ালেন।

কালো চুলের কুয়াশার মাঝখানে সেই ডিমের মত মুখ, ভারী আঁখি-পল্লবের নীচে সেই দীর্ঘায়ত চোখ, খাড়া নাক, নাসারন্ধ্রের নিষ্ঠুর রেখা, কামার্ত মুখের পরিপূর্ণ ওষ্ঠদ্বয় আর তার চিরন্তন বিদ্রূপ, সবই তিনি আগেই দেখে-ছেন, তবু সেদিকে তাকিয়ে একটা পরিবর্তন তার নজরে পড়ল, সে পরিবর্তন স্পষ্ট হলেও ভয়ঙ্কর, সে পরিবর্তনের স্বরূপ তিনি ঠিক ধরতে পারছেন না। অথচ সে পরিবর্তন তাকে মন্ত্রমুগ্ধ করে রেখেছে ... জোর করে চোখ ফিরিয়ে নিলেন, ঢাকনাটা বসিয়ে দেবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু পারলেন না। চারদিকে তাকিয়ে ভারী থলের মুক্ত একটা কম্বল টেনে নিয়ে সেই ভয়ঙ্কর জিনিসটাকে ঢেকে দিলেন।

আবার বলে উঠলেন, "ম্যাগনাস ঠিকই বলছে ... আমাকে ঘুমতে হবেই।" কোচের কাছে গিয়ে ধপাস করে শুয়ে পড়ে কুশনের মধ্যে মুখ ঢাকলেন।

অনেকক্ষণ পর্যন্ত সেখানে শুয়ে রইলেন, কিন্তু ঘুম এল না, কিছুতেই, আবার সেই হাতুড়ির শব্দ কানের মধ্যে বাজতে লাগল, এবার আরও জোরে, মনে হল হাতুড়িটা যেন তার মস্তিষ্কের মধ্যেই ঘা দিচ্ছে। হাতুড়ির আঘাতের আড়াল থেকে আরও একটা শব্দ আসছে—সেটা কিসের শব্দ? কোন পায়ের শব্দ কি? উঠে কান পাতলেন, আর তখনই খেয়াল হল যে কম্বলের ঝালরটা নড়ছে। বিশ্বাস না হওয়ায় চোখ দুটো কচলে দিলেন, আর ঠিক তখনই ঢেউয়ের মত গতিতে আরও একটা কিছু এসে সেটাকে নাড়িয়ে দিল। উঠে কাঁপতে কাঁপতে হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে গিয়ে কম্বলটাকে দু' ফালা করে ছিঁড়ে ফেললেন। আর তখনই তিনি সেই পরিবর্তনটাকে দেখতে পেলেন, বুঝতে পারলেন যা আগে তার কাছে দুর্বোধ্য মনে হয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে সব বিদ্যাবুদ্ধি, পুরুষত্বের সব শক্তি যেন তাকে ছেড়ে গেল;

অধ্যাপক জার্ভিস দুই হাতে মুখ ঢেকে ছোট শিশুর মত বিচিত্র নাকি সুরে ঘ্যান্‌-ঘ্যান্‌ করতে করতে শরীরটাকে এদিক-ওদিক দোলাতে লাগলেন ; মুখের ছাই-ধূসর রংটাও মিলিয়ে গেল ; কালো ঠোঁট দুটি হয়ে উঠল রক্ত-লাল। কিছুক্ষণ এইভাবে চলার পরে অধ্যাপক সহসা এক বিচিত্র উন্মাদ ভঙ্গীতে দুই হাত সবেগে মাথার উপরে ছুঁড়তে লাগলেন।

চীৎকার করে বললেন, "হে ঈশ্বর! আমি যে পাগল হয়ে যাচ্ছি—আমি পাগল, ওঃ, কিন্তু না। পাগল ভিন্ন অন্য কিছু—পাগল নয়, পাগল নয়—আমি পাগল নই—না।" হঠাৎ আয়নার মধ্যে নিজেকে দেখতে পেয়ে মাথা নাড়তে নাড়তে মুচকি হাসলেন। নিজের প্রতিবিম্বকেই ফিস্‌ফিস্‌ করে বললেন, "পাগল নই, না, না।" পুনরায় বাক্সটার কাছে গিয়ে কাঁচটার উপর হাত বুলিয়ে টোকা দিতে লাগলেন।

"হে মৃত্যুর আঁখি, তোমার দুটি পাতা খোল, যে রহস্য সেখানে লুকিয়ে আছে তাকে আমি জানতে চাই। আমি না হয় সেই পুরোহিত পতোমেসই হলাম যে তোমাকে এভাবে মন্ত্রমুগ্ধ করে রেখেছে ; কিন্তু তাতে কি হয়েছে, তবু তো আবার আমি তোমার কাছেই ফিরে এসেছি প্রিয়তমা, সেদিনের থিবিসের মতই আমার আত্মা আজও তোমাকে ডাকছে। হে মৃত্যুর আঁখি, তোমার দুটি পাতা খোল, যে রহস্য সেখানে লুকিয়ে আছে তাকে আমি জানতে চাই। তোমার আত্মা এতকাল ঘুমিয়ে ছিল, আর গমনাতীত বছর ধরে আমার আত্মা তোমাকেই খুঁজে ফিরেছে, এতদিনে সে প্রতীক্ষার অবসান হল। হে মৃত্যুর আঁখি, তোমার দুটি পাতা খোল, যে রহস্য সেখানে লুকিয়ে আছে তাকে আমি জানতে চাই। হায় ঈশ্বর," হঠাৎ তিনি চীৎকার করে বলে উঠলেন, "সে তো জাগবে না—আমি তাকে জাগাতে পারি না।" নিজের আঙ্গুলগুলি সজোরে মোচড়াতে লাগলেন। সঙ্গে সঙ্গে তার চেহারা বদলে গেল, ধূর্ত হাসিতে বেঁকে গেল মুখ, হামাগুড়ি দিয়ে দেয়ালে ঝোলানো ছোট আয়নাটার কাছে এগিয়ে গেলেন, দ্রুত হাতে সেটাকে কোটের নীচে লুকিয়ে নিয়ে ডেস্কের কাছে গিয়ে আয়নাটাকে তার উপর রেখে নিজের সামনে ধরলেন।

নিজের দিকেই তাকিয়ে মাথা নেড়ে বললেন, "যতক্ষণ আমি এর দিকে তাকিয়ে আছি, এর জন্য অপেক্ষা করছি, ততক্ষণ ঐ দুটি চোখের পাতা খুলবে না। সে দুটি চোখ যে সেই মানুষের যে তোমাকে অতর্কিতে আক্রমণ করার অপেক্ষায় আছে। যে পিছন থেকে তোমার উপর নজর রেখেছে, তোমাকে অনুসরণ করছে ; তবু সে চোখকে আমি দেখব, হ্যাঁ, আমি দেখবই।"

নীচের জগৎ থেকে নদীবক্ষের স্টিমারের একটানা হুইস্‌লের শব্দ ভেসে এল ; অস্পষ্ট ও অনেক দূরের হলেও সেই শব্দে বুঝি অধ্যাপকের বুদ্ধি-বিবেচনায় ফিরে এল।

হাসবার চেষ্টা করে তিনি বলে উঠলেন, "হা ঈশ্বর, আমি কি এতই বোকা যে করুণার :পাত্র একটি মৃত মানুষ আমাকে ভয়ে আধা-পাগল করে তুলেছে, আর তাও নিউ ইয়র্ক শহরে। এ যে ধারণারও অতীত।" এই কথা বলে অধ্যাপক ব্র্যাণ্ডির দিকে এগিয়ে গেলেন, ইচ্ছা করেই পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে ধীরে ধীরে গ্লাসটা খালি করলেন; তখনও কিন্তু তার মনে হতে লাগল যে সেই দুটি চোখ তাকে দেখছে, সর্বত্র তাকে অনুসরণ করছে; অনেক কষ্টে তিনি ঘুরে দাঁড়ানো থেকে নিজেকে নিবৃত্ত করলেন। সেই একই লৌহ-কঠিন ইচ্ছা-শক্তির দ্বারা বিদ্রোহী স্নায়ুগুলোকে দমন করে তিনি কাগজপত্র গুছিয়ে কলমটা তুলে নিলেন।

মানুষের শরীরে বোধ হয় খেঁকি কুকুরের স্বভাবটা আছে, মনিব, মন, যতই তাড়াক, সে ঠিক পিছন পিছন চলতে থাকে, হুকুম করলেই তা পালন করবে। কাজেই অধ্যাপক আসনে বসলেন, চোখ মুছলেন, হাত শক্ত করে পাশের আয়নাটার দিকে না তাকিয়েই আর একটা কাগজ খুলে নিলেন।

একটু থেকে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলেন, জানালায় রুগ্ন, পাণ্ডুর ঊষার আবির্ভাব হয়েছে। ধীরে ধীরে বললেন, "আর আধ ঘণ্টা, তাহলেই আমার কাজ শেষ, সমাপ্ত,—" কথাটা তার ঠোঁটেই শেষ হয়ে গেল; হঠাৎই তার চোখ পড়ল আয়নার উপর, চোখ দুটি সম্পূর্ণ খোলা। একটি দীর্ঘ মুহূর্ত সে দুটি চোখ তার চোখের দিকে তাকিয়ে রইল, তারপরই সে চোখের পাতাগুলি কাঁপতে কাঁপতে বন্ধ হয়ে গেল।

অধ্যাপক আর্তনাদ করে উঠলেন, "আমি ভুল দেখেছি, মতিভ্রম রোগে ভুগছি। এটাও অনিদ্রার ফল। জন ফিরে এলে বেঁচে যাই, জন খুব কাজের লোক—"

তার পিছনে একটা শব্দ হল, নরম, শান্ত শব্দ, গাছের ফাঁকে বাতাসের ফিসফিস বা দেয়ালের গায়ে পর্দার খস্‌খস্‌ শব্দের মত—শব্দটা যেন তার পিছন দিক দিয়ে মেঝেটা পার হয়ে চলেছে। মৃত্যুর শীতল স্রোত বয়ে গেল তার ভিতর দিয়ে; মূক আতংক কাকে বলে তা তিনি বুঝতে পারলেন।

চোখ তুলে তাকাতে সাহস হল না; প্রত্যাশার আতংকে মন উঠল ভরে, তিনি আয়নাটার দিকে তাকালেন। পিছনের বাক্সটা খালি; দ্রুত মুখ ফেরালেন, আর ঐ তো সে, এত কাছে যে প্রায় ছোঁয়া যায়, সেই "জিনিস" যাকে তিনি বলেছেন করুণার পাত্র একটি মৃত মানুষ। ধীরে ধীরে, এক ইঞ্চি এক ইঞ্চি করে, শক্ত পোশাকের খস্‌খস্‌ শব্দ তুলে সে তার দিকে এগিয়ে আসছে:

'আইসিস ক্ষণতরে শ্বাস রোধ করেছে আমার,
আমাকে যে জাগাইবে সেই হবে মৃত্যুর শিকার।'

আর্তনাদ ও অট্টহাসির মাঝামাঝি একটা অদ্ভুত চীৎকার করে তিনি লাফ দিয়ে সেটার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন; একটা আঘাত ও খাবি খাওয়ার

শব্দ হল ; অধ্যাপক জার্ভিস মেঝের উপর পড়ে গেলেন , হাত দুখানি ছড়ানো, কম্বলের ভাঁজের মধ্যে মুখটা ঢাকা।

* * *

পরদিন সংবাদপত্রের একটি অনুচ্ছেদে এই কথাগুলি প্রকাশিত হল :

বিচিত্র মৃত্যু

"বিখ্যাত বিজ্ঞানী অধ্যাপক জার্ভিসকে গতকাল তার—স্ট্রীটের ঘরে মৃত অবস্থায় পাওয়া গেছে , সম্ভবত হৃদ রোগেই তার মৃত্যু ঘটেছে। ঘটনাটির একটি অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য হল, ঘরের বিপরীত দিকের কোণে দাঁড় করানো একটা ভ্রমণোপযোগী বাক্সের মধ্যে যে মমিটা ছিল সেটাকে অধ্যাপকের মৃতদেহের পাশেই শায়িত অবস্থায় পাওয়া গেছে।"

Black Coffee—John Jafire Farnol

কালো খেয়া

কলেজের প্রথম সেশনের পড়া শেষ করে বাড়ি ফিরছি। কয়েকদিন ধরেই অস্বাভাবিক রকমের বৃষ্টি হচ্ছে। প্রতিটি নালা ও খালের জল তীর ছাপিয়ে গেছে, মাঠ-ঘাট ডুবে গেছে, নদীর জল বাড়তে বাড়তে উচ্ছ্বসিত হেলেস্পণ্টে পৌঁছে গেছে , ফলে ভরা জোয়ারের একঘণ্টা আগে ও পরে ছাড়া অন্য সময় খেয়া পারাপার একেবারেই অসাধ্য।

সারাটা দিন যেমন বৃষ্টি তেমনই ঝড় , ফলে পড়ন্ত বিকেল পর্যন্ত আমি সরাইখানায় আটক হয়ে পড়লাম। খেয়াঘাটে পৌঁছবার আগেই অন্ধকার হয়ে গেল . মাঝ রাতের আগে পারাপারের উপযুক্ত জোয়ার পাবার আর কোন আশাই নেই। অগ্নিকুণ্ডের পাশে বসে অপেক্ষা করা ছাড়া আর কোন উপায় নেই। বেশ অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম, কারণ খেয়ার মাঝিটি বৃদ্ধ ও অথর্ব , তার ছেলে ডিকই সাধারণত রাতের বেলায় নৌকো চালায়, সেও তখনও আসে নি, কারণ আবহাওয়ার যা অবস্থা তাতে রাত করে নদী পার হয়ে কোন যাত্রী আসার কোন আশাই নেই।

অবশ্য ডিকের উপস্থিতি একান্ত প্রয়োজনীয় ছিল না ; নদীর মাঝখানে নোঙর-করা একটা দড়ির সাহায্যে নৌকোটাকে এপার-ওপার টেনে নিয়ে যাওয়া যায় , স্রোত বেশী হওয়ায় আরও একটা দড়ি এ-পার থেকে ওপার টেনে দেওয়া হয়েছে, যাতে যাত্রীরা অন্য কারও সাহায্য ছাড়া নিজেরাই নৌকোটাকে টেনে নিয়ে যেতে পারে ; একাজে যারা দক্ষ তাদের কাছে

কাজটা খুবই সহজ, কিন্তু আমার একটা হাত ঝুলিয়ে বাঁধা থাকায় আমার পক্ষে কাজটা সহজ নয়।

অগ্নিকুণ্ডের পাশে বসে মাঝি ও তার বৌয়ের সঙ্গে কথা বলতে বলতেই একটি চটপটে সুদর্শন গ্রামের ছেলে ঘরে ঢুকল, তার মাথায় নবনিযুক্ত সৈনিকের ফুল-বসানো টুপি, সঙ্গে আসন্নপ্রসবা একটি তরুণী। খেয়ার অবস্থা তাদের জানানো হল, বলা হল সৈনিকটি যদি নিজে নৌকো টেনে ওপারে নিয়ে যেতে না পারে তাহলে ডিক ফিরে আসা পর্যন্ত তাদের অপেক্ষা করতে হবে।

মাত্র সেইদিনই তাদের বিয়ে হয়েছে, একটি রেজিমেণ্টে যোগ দিতেই তারা চলেছে। নবনিযুক্ত সৈনিক ছেলেটির নাম রাল্‌ফ্‌ নক্টন, সেইদিনই সে সেনাদলে ভর্তি হয়েছে, আর গ্রাম-গির্জার পুরোহিতরা তাদের বিয়েটা দিয়ে দিয়েছে। তাদের আগেকার ভালবাসা ও ঘনিষ্ঠতা কতদূর কি ছিল জানিনা, কিন্তু এখানে মাত্র কয়েক মিনিট থাকার পরেই ছেলেটি মেয়েটির প্রতি অপ্রসন্ন ও রুষ্ট হয়ে উঠল, আর মেয়েটিও যে ছেলেটির প্রতি খুব প্রসন্ন তা মনে হল না। সে কথা বলছে সামান্যই, প্রায়ই মেয়েটির দিকে তাকাচ্ছে ক্ষুব্ধ দৃষ্টিতে, আর মেয়েটিও ছেলেটিকে তিরস্কার করছে এত তাড়াতাড়ি সেনাদলে ভর্তি হয়ে তাকে ও তার অজাত সন্তানকে ছেড়ে চলে যাবার জন্য আবার সেইসঙ্গে শোনাচ্ছে যে ক্ষমতা থাকলে সে কখনও স্বামীর কাছ থেকে দূরে চলে যেত না।

মেয়েটির রূপ আছে, আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব আছে, সে-কথা অস্বীকার করা যায় না, তবু তার মধ্যে একটা অকারণ কলহপ্রিয়তাও আছে। তাই যখন শুনলাম যে নক্টন অনিচ্ছার সঙ্গে তাকে বিয়ে করেছে তখন আমি বিস্মিত হই নি, আমার শুধু এই ভেবে দুঃখ হল যে গ্রাম্য গির্জার লোকগুলি এমন সহানুভূতিহীন ও বিবেকহীন কেমন করে হল যার ফলে এই বেচারিকে সারা জীবনের জন্য একটা দুর্ভাগ্যকে বয়ে বেড়াতে হবে, অথচ অজাত সন্তানের ভারকে গ্রাম্য গির্জার ঘাড়েও চাপিয়ে দিতে পারবে না।

খেয়ার মাঝি ও তার স্ত্রী তাদের অনেক বোঝাল, তারা যেন তাদের ভাগ্যকে মেনে নেয়। নবনিযুক্ত সৈনিকটি কিছুটা বেপরোয়া ও উদার স্বভাবের; সে অনেকটা শান্ত হল বলে মনে হল; কিন্তু তার অবলা সঙ্গিনীটি যেমন খেয়ালী, তেমনই খিটখিটে প্রকৃতির। একবার তো জলের একটা প্রচণ্ড ঝাপ্টা এসে জানালার গায়ে আছড়ে পড়তেই সে কোনরকম ভদ্রতার-ভব্যতার পরোয়া না করেই চীৎকার করে বলে দিল যে সে রাতে সে আর এক পাও নড়বে না।

নক্টন বলল, "তোমার যা ইচ্ছা তাই করতে পার মেরি ব্লেক, কিন্তু আমাকে যেতেই হবে, কারণ কাল সকালেই সেনাদল যাত্রা শুরু করবে।

তুমি যাতে আমার সঙ্গে যাবার জন্য গোছগাছ করে নিতে পার সেইজন্যই ক্যাপ্টেন আমাকে এত বেশী সময় শহরে থাকার অনুমতি দিয়েছেন।"

মেয়েটি অবশ্য তবু তীব্র ভাষায় বলতে লাগল যে তার এই অবস্থায় আর এই আবহাওয়ার মধ্যে সে যে তাকে জোর করে পথে বের করেছে এটা তার নিষ্ঠুরতারই পরিচয়। নক্টন তার কোন কথায়ই কান দিল না, বরং তার হাসিখুশি স্বভাবের সম্পূর্ণ বিপরীতভাবেই কিছুটা একগুঁয়েমির সঙ্গেই জানিয়ে দিল যে "যদিও এর মধ্যেই বৌ তাকে সর্বস্বান্ত করেছে, তবু সে-বিশ্বাস করে যে বৌয়ের এখনও এত ক্ষমতা হয় নি যে তাকে রেখে সেনাদলে চলে যেতে সে তাকে বাধ্য করতে পারবে।"

সে বেরিয়ে গেল; কিছুক্ষণ একলা কাটাল। যখন ফিরে এল, তখন তার চেহারার আশ্চর্য পরিবর্তন ঘটেছে, মুখটা ছাইয়ের মত বিবর্ণ, চোখ দুটি উজ্জ্বল, জ্বরতপ্ত ও উদগ্র। কথা বলার সময় তার ঠোঁট কাঁপতে লাগল:

"চলে এস মেরি, আমি আর অপেক্ষা করতে পারি না; নৌকো প্রস্তুত, নদী তত ভয়ংকর নয়, আর বৃষ্টি থেমে গেছে।"

মেয়েটি বৃথাই প্রতিবাদ করল, ছেলেটি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, হয় স্বামীর সঙ্গে যেতে হবে, না হয় তো এখানেই পড়ে থাকতে হবে—এছাড়া কোন তৃতীয় পথ মেয়েটির সামনে খোলা নেই। বুড়ো মাঝি তাদের সঙ্গে করে নৌকোর কাছে নিয়ে গেল, নৌকোয় চড়তে সাহায্য করল, দড়িটা ধরে কিভাবে এগোতে হবে সেবিষয়ে সৈনিকটিকে কিছু নির্দেশও দিল, কারণ নদীতে জোয়ার সবে এসেছে।

ঘরে ফিরে বুড়ো মাঝি তার বৌকে রসিকতা করে বলল, "সব সময়ই ছেলেগুলোকেই কেন যে দোষ দেওয়া হয়, আর সব করুণা জমা রাখা হয় সুন্দরীদের জন্য আমি তো তা কিছুতেই বুঝতে পারি না।"

ঠিক সেইমুহূর্তে বৃষ্টি ও ঝড়ের শন্-শন্ ঝর-ঝর শব্দ ছর্‌রাগুলির মত এসে জানালার উপর আছড়ে পড়ল; বিদ্যুতের একটা ঝলকানির সঙ্গে সঙ্গে এমন প্রচণ্ড শব্দে বজ্র গর্জন করে উঠল যে সেরকমটা আমি কখনও শুনি নি।

বুড়ি চমকে উঠে বলল, "ঐ শোন! কে যেন আর্তনাদ করে উঠল না?" আমরা কান পাতলাম, কিন্তু সে আর্তনাদ দ্বিতীয়বার শোনা গেল না; দরজার কাছে ছুটে গেলাম, কিন্তু নদীর জলোচ্ছ্বাস ও সমুদ্রের ঢেউয়ের গর্জন ছাড়া আর কিছুই শুনতে পেলাম না।

একটু পরেই ডিক বাড়ি ফিরল। ইতিমধ্যে নৌকোটা আগের জায়গায় ফিরে এসেছে; তাকে সঙ্গে নিয়ে আমি নৌকোয় উঠলাম, ওপারের সরাই-খানায় পৌঁছে তাড়াতাড়ি শুতে চলে গেলাম। সবে বালিশে মাথাটা রেখেছি এমন সময় একটা আকস্মিক, দুর্বোধ্য আতংক আমাকে পেয়ে বসল; অজ্ঞাত ত্রাসে আমি কাঁপতে লাগলাম; মনে হল, অদৃশ্য কেউ যেন আমার চারপাশে

ঘুরে বেড়াচ্ছে; অনেক কষ্টে বাড়ির লোকজনদের জাগিয়ে তোলা থেকে নিজেকে নিবৃত্ত করলাম। শেষ পর্যন্ত একসময় ঘুমিয়েও পড়লাম; ঘুম ভাল হল না; অদ্ভুত সব স্বপ্ন আর অস্পষ্ট সব ভয়ে ঘুম ভেঙে ভেঙে যেতে লাগল; স্বপ্নে দেখলাম, একটি নারীকে হত্যারত একটি সৈনিকের ভয়ংকর মূর্তি, মুখ খোলা কবর, আর বাতাসে দোদুল্যমান ফাঁসির দড়ি। সেরকম দ্বিতীয় কোন রাতের কথা আমার স্মরণে আসে না।

সকালে আমার মনের উপর থেকে মেঘ সরে গেল. যথাসময়েই ঘুম থেকে উঠলাম, খুশি মনেই যাত্রা শুরু করলাম। সকালবেলাটা বেশ উজ্জ্বল, উদয়-সূর্যের আলোয় সবকিছু ঝলমল্ করছে, নবনিযুক্ত সৈনিক ও তার বৌয়ের কথা একেবারেই ভুলে গেলাম; তাদের কথা আর মনেও এল না।

কিন্তু পরেব বছর যখন সেইদিনটি ফিরে এল, তখন একটা অকারণ মন-মরা ভাব আমাকে পেয়ে বসল, আমার উপর চেপে বসল; সে ভাবকে সরিয়ে ফেলতে চেষ্টা করলাম, কিন্তু পারলাম না, মনটাই যেন রোগে আক্রান্ত হয়েছে; শরীর যেমন চেষ্টা করলেও জ্বরকে ছাড়াতে পারে না, তেমনই অনেক চেষ্টা করেও মনের অস্বস্তিকে কাটাতে পারলাম না। মন-মরা অবস্থাতেই শুতে গেলাম, তবু একসময় ঘুমিয়ে পড়লাম। কিন্তু হায়, মধ্যরাতে একটা বীভৎস, অবর্ণনীয় আতংকে আমার ঘুম ভেঙে গেল। আগেকার বর্ণনামত যেধরনের অভিজ্ঞতা পূর্বেও একবার হয়েছিল সেই একই ধরনের অভিজ্ঞতাই আবার হল। অস্পষ্টভাবে মনে হল, এক অদৃশ্য অতিথি যেন আমার আশেপাশেই ঘুরে বেড়াচ্ছে; আর ঠিক সেইমুহূর্তে আবার মনে পড়ে গেল নর্টন ও মেরি ব্লেকের কথা; দেখলাম—অপচ্ছায়া ছাড়া আর কিছু দেখেছিলাম বলে আমি এখন মনে করি না—সেই অসুখী দম্পতি পরস্পরের উপর দোষারোপ করছে।

চোখের দৃষ্টির সততা সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে আর একবার তাকাতেই হতভাগিনী বধূটি ঘুরে আমার দিকে তাকাল। একদিন যে রক্তিম সুন্দরীকে দেখেছিলাম তার পরিবর্তে যখন দেখলাম কবরে-রাখা একটা ক কালের মূর্তি তখন আমার সে আতংককে আমি কেমন করে বর্ণনা করব! চমকে উঠে এমন ভয়ার্ত কণ্ঠে চীৎকার করে উঠলাম যে বাড়ির সব লোকজন আলো হাতে নিয়ে আমার ঘরে ছুটে এল—যা দেখেছি লজ্জায় তা বলতে পারলাম না, হাসবার চেষ্টা করে সব দোষ একটা দুঃস্বপ্নের ঘাড়ে চাপিয়ে দিলাম।

ঘটনাটা ঘটেছিল পশ্চিম উপকূলের একটি খনিজ জলের স্বাস্থ্যকেন্দ্রে। কয়েকটি অপরিচিত লোকের সঙ্গে একটা বোর্ডিং হাউসে ছিলাম। সেখানে অন্যদের মধ্যে ছিলেন একটি জার্মান ভদ্রলোক; দীর্ঘকায়, পাণ্ডুর মুখ, দেহ-গঠন বেশ আকর্ষণীয়। তার মত বুদ্ধিমান ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টিসম্পন্ন লোক আমি আর দেখি নি; তার চাতুর্য ছিল অসাধারণ। সকালে প্রাতরাশের টেবিল

থেকে উঠতেই তিনি আমার হাত ধরে বাড়ির সামনেকার লনে নিয়ে



গেলেন, দলের অন্য সকলের কাছ থেকে যেন কিছুটা দূরে যাবার পরে তিনি বললেন :

"ক্ষমা করবেন মশাই, একটা অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্ন করছি। সত্যি কি কাল রাতে একটা দুঃস্বপ্ন দেখেই আপনি ভয় পেয়েছিলেন ?"

"আপনার প্রশ্নের খোলাখুলি জবাব দিতে আমার কোন আপত্তি নেই, কিন্তু আগে বলুন, এ প্রশ্ন করছেন কেন ?"

"খুবই যুক্তিপূর্ণ কথা। আমার একটি চিত্রকর বন্ধু ছিল; প্রকৃতি কোন্ রহস্যমূর্তিতে দেখা দেবে সেটা বুঝবার মত যে কল্পনা-শক্তি তার ছিল তেমনটি আমি আর কারও মধ্যে দেখি নি। ক্রটাসের অশুভ প্রতিভা যখন তাকে ফিলিপ্পিতে নিয়ে গিয়েছিল সেই দৃশ্যটি আমার চিত্রকর বন্ধুর একখানি ছবির বিষয়বস্তু ছিল, আর কী আশ্চর্যের কথা ক্রটাসের চেহারার সঙ্গে আমার বেশ মিল আছে। অন্য সকলের সঙ্গে কাল রাতে যখন আপনার ঘরে ঢুকলাম তখন আপনাকে এত বেশী সেই ছবির ক্রটাসের মত দেখাচ্ছিল যে আমি শপথ করে বলতে পারি যে একটা ভূতকে দেখেই আপনি চমকে উঠেছিলেন।"

তোমাকে যা বলেছি সেইসব কথা তাকেও বললাম'।

তিনি বললেন, "আশ্চর্য কথা, কী এক ধারণাতীত সহানুভূতি এইসব দুঃখী মানুষের ভাগ্যের সঙ্গে আপনাকে জড়িয়ে ফেলেছে। এই নতুন আবির্ভাবের মধ্যে স্বপ্নের অপচ্ছায়ার চাইতেও বেশী কিছু অবশ্যই আছে।"

কথাগুলি যেন একটা অস্বস্তিকর ভয়ের অনুভূতি নিয়ে আমাকে ছোবল মারল; কিছুক্ষণের জন্য আমার শরীরের মাংস যেন হাড়ের উপর কুঁকড়ে যেতে লাগল। কিন্তু অচিরেই সে ভাবটা কেটে গেল, সবকিছুই সম্পূর্ণ ভুলে গেলাম।

বছর ঘুরে সেইদিনটি আবার যখন এল তখনও মনের সেই ভার ও অকারণ-ত্রাস আমাকে পেয়ে বসল। বিছানায় যাবার আগে পর্যন্ত নানা রকম অশুভ লক্ষণ আমার উপর ঝুলতে লাগল, এবং প্রথম ঘুমের পরে তৃতীয় বার সেই একই রহস্যময় সন্ত্রাশ আবার আমার ঘুম ভাঙিয়ে দিল। অবশ্য এবার দৃশ্যটা হল একটু অন্য রকম। এবার দেখলাম শুধুমাত্র নর্টনকে, আহত পাণ্ডুর অবস্থায় সে বিছানায় শুয়ে আছে; গায়ের চাদরের উপর পড়ে আছে একজোড়া নতুন হস্তত্রাণ, যেন এইমাত্র কাগজের মোড়ক থেকে খোলা হয়েছে।

সাত বছর ধরে প্রতি বছর আমি এই যন্ত্রণা ভোগ করেছি। প্রতি বছর নতুন নতুন দৃশ্য দেখা দিতে লাগল, কিন্তু মেরি ব্লেককে আর কোনদিন দেখি নি। চতুর্থ বছরে দেখলাম, এ-ডি-কংয়ের ইউনিফর্ম পরিহিত অবস্থায় নর্টন একটা টেবিলে বসে আছে; তার সামনে ভোজ-উৎসবের প্রথামাফিক দ্রব্যাদি সাজানো রয়েছে; সেধরনের একটা দৃশ্যের অংশবিশেষ আয়নার মধ্যে যেরকম দেখা যায়।

পঞ্চম বছরে মনে হল তরবারি হাতে নিয়ে সে একটা কামানশ্রেণীর প্রাচীর বেয়ে উঠছে; পিছনে সূর্য অস্ত যাচ্ছে; কোন প্রাচ্য দেশের গম্বুজ ও প্যাগোডাসহ বিচিত্র সব ছায়া ও মূর্তি চারদিকে ছড়িয়ে আছে: এক-খানি-ছবি হলেও যেকোন ছবির চাইতে অনেক বেশী স্পষ্ট ও জীবন্ত।

ষষ্ঠ বছরে সে আবার দেখা দিল একটা কোচে শায়িত অবস্থায়; মুখ-খানি নিষ্প্রভ, আঘাতের ফলে নয়, রোগে; বিছানার পাশে বসে আছে একজন পদস্থ অফিসার, বুকে একটি তারকা; দেখে মনে হল, নিস্তেজ হলেও অফিসারটির সঙ্গে কথা বলে সে খুশি বোধ করছে।

সপ্তম ও শেষবারের মত সেই ভয়ংকর দৃশ্য যখন দেখা দিল তখন তাকে দেখলাম রণক্ষেত্রে ঘোড়ার পিঠে; তার দিকে চেয়ে থাকতে থাকতেই এক-খানি তরবারি তার মুখে সজোরে আঘাত করল; তার সামরিক পরিচ্ছদের উপর রক্ত ঝরতে লাগল।

বছরের পর বছর কেটে গেল, তার মধ্যে আর কোন অশরীরী এসে হানা দিল না। আমার মন ও স্মৃতি আবার তাদের সুস্থ অবস্থা ফিরে পেল। অতীতের অন্য অনেক কথার মতই নক্টন ও মেরি ব্লেকের কথা মাঝে মাঝে মনে পড়ে, অদ্ভুত অতীন্দ্রিয় ঘটনা হিসাবে প্রতি বছর তাদের ফিরে ফিরে দেখা দেওয়ার গল্পও বন্ধুদের কাছে বলি। আর একটা অদ্ভুত যোগাযোগের ফলে যখনই কাউকে আমার সেই সব স্বপ্নের কথা বলি তখনই আমার জার্মান বন্ধুটি সেখানে হাজির থাকেন। ফাঁক পেলেই তিনি আমাকে নানান প্রশ্ন করেন, কিন্তু তাকে সঠিক জবাব দিতে পারি না, কারণ আমার স্মৃতি তখন বেশ অস্পষ্ট হয়ে এসেছে। তার বেলায় কিন্তু সেরকমটা ঘটে নি। আমি যা কিছু বলেছি সব তিনি স্পষ্ট করে একটা বইতে লিখে রেখেছেন; স্বপ্নের মধ্যে আমি যা কিছু দেখেছি তার সব বিবরণ তিনি লিখে রেখেছেন। তার নাম উল্লেখ করছি না, কারণ তিনি একজন অবসরপ্রাপ্ত বিনয়ী মানুষ, স্বাস্থ্য খারাপ, অনেককাল ধরে নির্জন জীবন যাপন করছেন। কিন্তু তিনি উচ্চ-মর্যাদার অধিকারী, আর তাই নামের উল্লেখ করলেই তাকে অনেক অবাঞ্ছিত কৌতূহলের সম্মুখীন হতে হবে। কিন্তু আমার গল্পেই ফিরে যাই।

ঠিক চৌদ্দ বছর—সাত দু' গুণে চৌদ্দ—আমার স্পষ্ট মনে আছে, কারণ সাত বছর আমাকে যে ভূতে পেয়েছিল তাতো আগেই বলেছি, তারপরে আরও সাত বছর আমার জীবন কেটেছে নিরুপদ্রবে, শান্তভাবে। এই চৌদ্দ বছর পরে আমার সেই জার্মান বন্ধুটি এখানে এসে আমার সঙ্গে দেখা করলেন। তিনি এলেন সকালবেলার দিকে, দুজনে সারাটাদিন বেশ ভালই কাটালাম, কারণ নানা দুর্জ্ঞেয় বিষয়ে তিনি ছিলেন প্রগাঢ় পণ্ডিত। নানাবিধ গুহ্য বিদ্যায় তার মত পারদর্শী মানুষ আমি আর দেখি নি।

তিনি ছিলেন একজন সত্যিকারের জ্যোতিষী, কারণ তার কাছে জ্যোতিষশাস্ত্র কোন ভাঁওতাবাজী নয়, একটা বিজ্ঞান; একজন দার্শনিকের মতই কোষ্ঠি-ঠিকুজি ও ভবিষ্যদ্বক্তাদের তিনি ঘৃণা করেন, কিন্তু প্রকৃতিতে যে পারস্পরিক নির্ভরতা বিরাজ করে সেবিষয়ে তার ধারণা খুবই সুন্দর। কারণ অনুসন্ধানে ব্যাপৃত না থেকে অত্যন্ত উজ্জ্বল ও যুক্তিনিষ্ঠ ভাষায় তিনি

ফলাফলের কথা বলেন। চাঁদের ভিন্ন ভিন্ন বলার সঙ্গে সমুদ্রের জোয়ারের কথা তিনি আমাকে সুন্দর বুঝিয়ে বললেন; কিন্তু সেগুলি যে চাঁদের পরিবর্তনেরই ফল নিউটনের এই মতকে তিনি স্বীকার করেন না। সূর্য কখন মেষরাশিতে প্রবেশ করে, এবং রাশিচক্রের অন্য সব লক্ষণও তিনি আমাকে বোঝালেন; সেইসঙ্গে গাছ ও ফুল, বিভিন্ন জন্তু ও মানুষের আবেগ, রোগ ও অনুভূতির উপর তাদের প্রভাবের কথাও বললেন; কিন্তু নক্ষত্রগুলি যে সৌরজাগতিক ঘটনার চাইতে বেশী কিছু সে ধারণাকে তিনি প্াগলের প্রলাপ বলেই মনে করেন।

রসায়নগত স্পর্শমণিতত্ত্ব সম্পর্কে তার পাণ্ডিত্যও সমান প্রগাঢ়। মৃতসঞ্জীবনীর কল্পনায় তার হাসি পায়, আবার পরশ পাথরের পৌরাণিক তথ্যকে তিনি নীতিশাস্ত্রের মূল কথা বলে মনে করেন। মৃতসঞ্জীবনীকে তিনি একটি রূপক বলে মনে করেন, অধ্যবসায়, পরিশ্রম, সদিচ্ছা ও ঈশ্বরের অনুগ্রহই খ্যাতি অর্জনের মূল উপাদান।

পরশপাথর সম্পর্কে তার জ্ঞান আরও সুন্দর। সে প্রসঙ্গে তিনি রোসিক্রুসীয়দের লেখার উল্লেখ করেন, সব গোপন তত্ত্বকেই তারা কতকগুলি কৃত্রিম প্রতীকের সাহায্যে প্রকাশ করত। তার মতে সেই সম্প্রদায়ের ঋষিরা মূর্খ ছিলেন না। তিনি বলেন, আত্মত্যাগ, ধৈর্য, বিনয়, ঈশ্বরে বিশ্বাস—যে-কোন যুবকের পক্ষে সম্পদ ও সম্মান অর্জনের পথে এইসব গুণই একান্ত প্রয়োজনীয়।

সব কথাকে অত্যন্ত সরল করে বোঝবার এবং নানা বিচিত্র বিষয়ের উপর স্পষ্ট আলোকপাত করার যে ক্ষমতা তার মধ্যে দেখেছি তাতে আমি অবাক হয়ে গেছি। মুখ দেখে চরিত্র নির্ণয়ের বিদ্যা, হস্তরেখাগণন বিদ্যা, এমন কি যাদুবিদ্যা ও ডাইনীবিদ্যাও তার ব্যাখ্যায় একটা দার্শনিক বিশ্বাসযোগ্যতা লাভ করে।

এইসব বিষয় নিয়েই আলোচনা চলতে লাগল। তিনি একজন সুদক্ষ সঙ্গীতশিল্পীও বটে। পিয়ানোফর্টিতে তার বাজনায় সরলতা ও চর্চার অভাব দেখা গেলেও তার প্রতিটি সুর অত্যন্ত সুন্দর ও গম্ভীর, একটা গভীর আবেগ তাতে মূর্ত হয়ে ওঠে।

সারাটাদিন মাঠে মাঠেই কাটল। গাছপালা, লতাপাতা, প্রকৃতির ঋতুচক্র ইত্যাদির সাহায্যে তিনি আমাকে জ্যোতিষ শাস্ত্রের অনেক তথ্য বোঝালেন। সন্ধ্যায় শোনালেন তার সেই অলৌকিক সঙ্গীত। রাত যত বাড়তে লাগল ততই আমার মনে হতে লাগল যে তিনি সেই বিরল মানুষদের একজন যারা আত্মার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারে, আর পারে দত্যিদানাদের উপর প্রভুত্ব করতে।

সবেমাত্র আমাদের অতি সাধারণ রাতের খাবারের সামনে বসতে যাব

এমন সময় খেয়ার সেই বুড়ো মাঝির ছেলে ডিক এসে হাজির হল। বেশ কয়েক বছর হল বুড়ো মাঝি মারা গেছে। ডিক আমার সঙ্গে গোপনে কিছু কথা বলতে চাইল। জানাল, সেইরাতেই বহুদূর দেশ থেকে আগত একজন অফিসার ভদ্রলোককে সে খেয়া পার করে এনেছে, তার স্বাস্থ্যের অবস্থা খারাপ, খেয়াঘাটের বাড়িতে তার থাকার যথাযোগ্য ব্যবস্থা সে করতে পারে নি।

ডিক বলল, "সরাইখানাটা অনেক দূরে, আর লোকটি খোঁড়া, উরুতে একটা হাঁ-করা ঘা। তাই তাকে সাহস করে এখানে নিয়ে এসেছি, আমি জানি আপনি সানন্দে রাতের মত তার একটা শোবার ব্যবস্থা করে দেবেন। তার চাকরটি আমাকে বলেছে, ভারতবর্ষের মহীশূরে তিনি ছিলেন সব চাইতে সাহসী অফিসার।"

তার আবেদন উপেক্ষা করা অসম্ভব। দরজার দিকে এগিয়ে গেলাম, ভদ্রলোক সেখানেই অপেক্ষা করছিলেন। আন্তরিকভাবেই তাকে জানালাম, আমার বাড়িতে তার কোনরকম আরামের ব্যবস্থা করতে পারলে আমি খুশিই হব।

যে ঘরে জার্মান বন্ধুটি বসেছিলেন সেখানেই তাকে নিয়ে গেলাম। তার আচরণের ভদ্রতা ও সরলতায় আমি খুবই খুশি হলাম।

সুদর্শন মধ্যবয়স্ক ভদ্রলোক, স্বাস্থ্যবান ও সুগঠিত দেহ, মুখশ্রী একসময় সুন্দরই ছিল, কিন্তু একটা ক্ষতের ফলে বিকৃত ও সামঞ্জস্যহীন হয়ে গেছে কথাবার্তায় বিশেষ বুদ্ধির কোন ছাপ ছিল না। কিন্তু সারাটাদিন দার্শনিক সঙ্গীটির সঙ্গে উচ্চ বুদ্ধিদীপ্ত আলোচনার উত্তেজনার পরে তার সঙ্গে কথা বলে বেশ ভালই লাগল।

খেতে খেতে অনেকবারই মনে হল, আগে তাকে কোথাও দেখেছি, কিন্তু কোথায় বা কখন সেটা কিছুতেই স্মরণ করতে পারলাম না, লক্ষ্য করলাম, যেন স্মৃতির পথ খুঁজতে খুঁজতে তিনিও একাধিকবার আমার দিকে তাকালেন শেষ পর্যন্ত যখন দেখলাম যে তার দুই চোখ অশ্রুজলে ঝাপসা হয়ে এসেছে, তখনই বুঝতে পারলাম যে তিনি আমাকে চিনতে পেরেছেন। কিন্তু তিনি স্বেচ্ছায় যেটুকু বললেন তার চাইতে বেশী কিছু জানতে না চাওয়াটাই আতিথেয়তার রীতি বলেই আমি মেনে নিলাম।

বুঝতে পারলাম, জার্মান বন্ধুটি এর মধ্যেই আমাদের দুজনের উপরই নজর রেখেছেন, কিন্তু হঠাৎই তার আগ্রহ থেমে গেল, তিনি চিন্তায় ডুবে গেলেন, তখন অতিথিকে আপ্যায়নের চেষ্টা আমাকেই করতে হল। সেই প্রসঙ্গেই তার কর্মস্থলের কথা জানতে চাইলে তিনি বললেন যে অনেক বছর তিনি ভারতবর্ষে কাটিয়েছেন।

বললেন, "আট বছর আগে ঠিক এইদিকে আমি বক্সপ্‌নৌ-য়ের যুদ্ধে

লিপ্ত ছিলাম, আর সেখানে আঘাত পাওয়ার ফলেই আমার মুখটা এরকম বিকৃত হয়ে গেছে।”

ঠিক সেইমুহূর্তে হঠাৎই জার্মান বন্ধুটির উপর চোখ পড়ল—যে দৃষ্টিতে তিনি আমার দিকে তাকালেন তাতে আমার মাথা থেকে পা পর্যন্ত শিউরে উঠল, নবনিযুক্ত সৈনিক নর্টন ও মেরি ব্লেকের কথা মনে পড়ে গেল। ইতিমধ্যে বন্ধুটি তার সঙ্গে ভাসা-ভাসাভাবে কথা বলতে লাগলেন, কিন্তু আমার কাছে তাই মনে হল ভয়ংকর ও দৈববাণীস্বরূপ। অপরিচিত লোকটির সঙ্গে তিনি নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা করলেও ঘুরিয়ে ফিরিয়ে, হয় তো অসদুদ্দেশ্য ছাড়াই, একটা কথাতেই ফিরে যেতে লাগলেন ; বললেন, সেই একই দিনে তারও একটা আকস্মিক ভাগ্য-বিপর্যয় ঘটেছিল।

অপরিচিত লোকটিকে তিনি বললেন, “অনেকদিন ধরেই এ ধরনের ঘটনা আমি পর্যবেক্ষণ করে আসছি, একটা খাতায় সেসব লিখেও রেখেছি। খাতাটা এই বাড়িতেই আছে , আমার শোবার ঘর থেকে নিয়ে আসছি , তারপর দেখব আপনার ভাগ্যের অন্যান্য ব্যাপারের সঙ্গে এই দিনটিতে আপনার জীবনে যেসব দুর্ঘটনা ঘটেছে তার কতটা মিল আছে।”

বুঝতে পারলাম, এই প্রস্তাবে অপরিচিত লোকটির মুখখানা ম্লান হয়ে গেল , মনে মনে বেশ বিচলিত হলেও বাইরে সেভাব প্রকাশ না করে নির্বিকারভাবেই বললেন যে সকালে সেটা দেখবেন। কিন্তু দার্শনিক বন্ধুটি নাছোড় বান্দা। আমারও কি যে হল, তাকে খাতাটা নিয়ে আসতেই বললাম। এতে অপরিচিত লোকটি আরও বিচলিত বোধ করলেন, আর তার সেইভাবই যেন আমাকে প্ররোচিত করতে লাগল খাতাটাকে আনিয়ে নিতে, কারণ আমার যেন মনে হল, অতীতে অনেকবার যে আশ্চর্য আতঙ্কের অভিজ্ঞতা আমার হয়েছে সেটাই যেন আবার আমাকে ভর করছে , যে পরিবেশের জন্য অনেক বছর ধরে মনের অনেক যন্ত্রণা আমাকে সইতে হয়েছে তার একটা ব্যাখ্যা খুঁজে পাবার দুর্বার বাসনা আমাকে যেন সেই কাজের দিকেই ঠেলে দিতে লাগল।

নবাগত লোকটি যখন বুঝতে পারলেন যে আমরা দুজনই এটা চাইছি, তখন তিনি আর বাধা দিয়ে কালক্ষয় করতে চাইলেন না ; কিন্তু বোঝা গেল যে তিনি মোটেই স্বস্তি বোধ করছেন না। বরং তার অস্বস্তি এতই বৃদ্ধি পেল যে জার্মান বন্ধুটি খাতা আনতে চলে গেলে তিনি আবার শুতে যাবার প্রস্তাব করলেন, কিন্তু আমি ঠাট্টা করে তাকে অপেক্ষা করতে বলায় তিনি আর উচ্চবাচ্য করলেন না।

বন্ধুটি অচিরেই খাতা নিয়ে ফিরে এলেন। খাতাটা বেশ উল্লেখযোগ্য, চামড়া দিয়ে বাঁধানো, তিনটে পিতলের আংটা দিয়ে আটকানো, আর একটা অদ্ভুত ধরনের তালা লাগানো। খাতাখানা দেখতে অদ্ভুত, অতি প্রাচীন,

ঐন্দ্রজালিক। কোণগুলো পেতলের বোতাম দিয়ে আঁটা, মাঝখানে একটা আয়না বসানো, তার চারদিক ঘুরিয়ে টিউটনিক ভাষায় যা লেখা আছে তার অর্থ "আমি তোমাকে দেখাব তোমার সত্তাকে।" তালাটা খুলবার আগে বন্ধুটি খাতাখানা নবাগতের হাতে দিলেন, প্রচ্ছদের কিছু কিছু প্রতীক্ষা চিত্রকে ব্যাখ্যা করলেন, বিশেষ করে আয়নার চারদিককার কথাগুলিকে ভাল করে বুঝিয়ে দিলেন।

কোন উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়েই হোক, আর প্রতীকগুলোর প্রয়োজনেই হোক, আমার বন্ধুর ব্যাখ্যাগুলি খুবই রহস্যময় ও দুর্বোধ্য মনে হল ; বুঝতে পারলাম, তার ফলে অপরিচিত লোকটি এতদূর বিচলিত বোধ করলেন যা অনেক কষ্টে তিনি নিজেকে সংযত রাখতে পারলেন। তার মুখ থেকে সব রং মুছে গেল ; একটা বিকৃত বীভৎসতা ফুটে উঠল ; খাতাটা ফিরিয়ে দেবার সময় তার হাতটা থর্থর্ করে কাঁপতে লাগল। দার্শনিক সেটা হাতে নিয়ে বললেন :

"এই খাতায় এমন অনেক কিছু আছে যা সকলের চোখে পড়বে না, তবু সেসবের তাৎপর্য যারা না বুঝবে তাদের কাছে এসবই অর্থহীন চিহ্নমাত্র বলে মনে হবে।"

তারপর তালায় চাবি ঘুরিয়ে তিনি খাতাখানা খুলে ফেললেন। স্পষ্ট শুনতে পেলাম, আমার নবাগত অতিথিটি ঘন ঘন শ্বাস টানছেন। জার্মান ভদ্রলোক চামড়া কাগজের পাতাগুলি সযত্নে উল্টে দেখতে লাগলেন। আমার সর্বশেষ অপচ্ছায়া দেখার বিবরণটি খুঁজে পেয়ে উচ্চৈঃস্বরে পড়তে শুরু করলেন। যে অবস্থায় আমি নক্টনকে দেখেছিলাম শুধু যে তার বিবরণই সেখানে লেখা ছিল তাই নয়, আরও অনেক কিছুই ছিল, ভুলে-যাওয়া ছবির স্থিরচিত্র তাকে বলা যেতে পারে ; অন্য অনেক কিছুর সঙ্গে যে বৃদ্ধ সেনা-পতিটিকে আমি বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিলাম তার একটা সুন্দর বিবরণও তাতে লেখা ছিল।

নবাগত লোকটি চীৎকার করে উঠলেন, "যা কিছু পবিত্র তার নামে বলছি, এ যে বৃদ্ধ ক্রিপ্‌লিংটন স্বয়ং—তার চুলের সিঁথিও ছিল ঠিক এই রকম বাঁকানো, কারণ বিরক্ত হলেই চুল ধরে টানা ছিল তার স্বভাব—এ বিবরণ আপনি কোথায় পেলেন ?"

আমি তো ভয়ে একেবারে কাঠ ; পাথরের মূর্তির মত নিশ্চল হয়ে বসে রইলাম ; কিন্তু একটা ভয়ংকর কাঁপুনি আমার সারা শরীরটাতে শিহরণ তুলতে লাগল।

আমার বন্ধুটি আবার খাতার মধ্যে চোখ রেখে আমার ষষ্ঠ অপচ্ছায়া-দর্শকের বিবরণটা খুঁজে পেলেন। নবাগত লোকটার বিবরণ মতই যে যুদ্ধে তার মুখে আঘাত লেগেছিল সেই সংকটের বিবরণই সেখানে লেখা ছিল।

এতে তিনি আগের চাইতে অল্প বিচলিত হলেও তার মুখের পরিবর্তন সহজেই নজরে পড়ল।

পঞ্চম অপচ্ছায়া—দর্শনের বিবরণ আরও সুস্পষ্ট আতংকের সৃষ্টি করল। বিবরণটি ছিল অতিমাত্রায় সুস্পষ্ট—তরবারি হাতে দুর্গ-প্রাচীরে নক্টনের আবির্ভাব—আক্রমণের জীবন্ত চিত্র, গম্বুজ ও প্যাগোডা শোভিত উজ্জ্বল প্রাকৃতিক দৃশ্য—সবই একজন শিল্পীর আঁকা ছবির মত ফুটে উঠেছে শব্দ-চিত্রের ভিতর দিয়ে। মনে হল, নবাগত লোকটি তার উৎকণ্ঠাকে ভুলে গিয়ে অতীত স্মৃতির রোমন্থনের ফলে খুশি হয়ে উঠলেন।

কিন্তু চতুর্থ অপচ্ছায়া-দর্শকের বিবরণ যখন পড়া হল, যেখানে নক্টনকে এড-ডি-কংয়ের পোশাকে সজ্জিত হয়ে ভোজের টেবিলে উপবিষ্ট অবস্থায় বর্ণনা করা হয়েছে। তখন নিজের কথার অর্থ না বুঝেই তিনি চীৎকার করে বললেন:

"সেই রাতেই তো জার্মান সেনাপতির সঙ্গে ডিনার খাবার সম্মান আমি প্রথম লাভ করেছিলাম।"

নির্মম দার্শনিক তবু থামলেন না, পড়তে লাগলেন নক্টনের সেই বিবরণ যা আমি তাকে বলেছিলাম—পাণ্ডুর মুখে আবৃত অবস্থায় নক্টন টান-টান হয়ে বিছানায় শুয়ে আছে, নতুন স্কন্ধত্রাণ ছড়ানো রয়েছে তার গায়ের চাদরের উপর। নবাগত লোকটি আসন থেকে চমকে উঠে ভয়ার্ত ফাঁকা গলায় চীৎকার করে বললেন,

"এটা তো জীবনের পুঁথি।"

জার্মান ভদ্রলোক দ্বিতীয় দর্শনের পাতাটা উল্টে শোকার্ত স্বরে ধীরে ধীরে পড়তে লাগলেন, বিশেষ করে মেরি ব্লেকের সমাধিস্থ চেহারা দেখে আমার নিজের মনোভাবের বর্ণনাটিই তিনি পড়লেন। নবাগত লোকটি আতংকে হাঁপাতে লাগলেন, যেন সুতীব্র এক হাহাকারের মত বলে উঠলো:

"সেই রাতে আমার শিবিরে বসে আমারও মনে হয়েছিল তার আত্মা এসে যেন আমাকে তিরস্কার করছে।"

আমার মুখে কথাটি নেই, কিন্তু আমার জার্মান বন্ধু আসন থেকে উঠে খাতাখানাকে বাঁ হাতে স্পর্শ করে নবাগতের দিকে কঠিন দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন:

"এই খাতায়, এবং আপনার বিবেকের পাতায়, সেই সব সাক্ষ্য রয়েছে যা প্রমাণ করছে যে আপনিই রাল্‌ফ্‌ নক্টন, আর সাত দুগুণে চৌদ্দ বছর আগে ঠিক এই রাতেই আপনি মেরি ব্লেককে খুন করেছিলেন।"

অসহায় নবাগত লোকটি সব সংযম হারিয়ে ফেললেন, বিষম আতংকে চীৎকার করে বললেন:

"ঠিক তাই। নদীতে গর্জন উঠল; বৃষ্টি ও ঝড় এল ধেয়ে; তীক্ষ্ণ

ভাষায় সে আমাকে ভৎর্সনা করতে লাগল ; আমি তাকে নৌকো থেকে ছুঁড়ে ফেলে দিলাম ; বিদ্যুৎ চমকাল, গর্জে উঠল বাজ—ওঃ। সে বজ্রের গর্জনও তার ডুবে যাবার আগেকার অভিসম্পাতের মত ভয়ংকর নয়।"

তার এই আত্মদোষ-স্বীকৃতির কোন জবাব দেবার আগেই তিনি টলতে টলতে সেখান থেকে পা বাড়াতে চেষ্টা করলেন, আর প্রায় সেইমুহূর্তেই মেঝের উপর ঢলে পড়ে মারা গেলেন।

The Black Ferry—John Galt

ডরোথি ডিংলে-র ভূত

এই বছরের গোড়ার দিকে এই লন্‌চেস্টন শহরে একটা রোগ দেখা দিল, আর আমার কয়েকটি ছাত্র তাতে মারা গেল। এই রোগে যারা মারা গেল তাদের মধ্যে একজন হল ট্রেহার্স-এর এডোয়ার্ড ইলিয়ট, এস্কোয়ারেব বড় ছেলে জন ইলিয়ট। ছেলেটির বয়স বছব ষোল, কিন্তু অসাধারণ ক্ষমতা ও বুদ্ধির অধিকারী। বিশেষ অনুরোধে ১৬৬৫-র ২০শে জুন তারিখে তার অন্ত্যেষ্টিকার্যে আমিই পৌরোহিত্য করলাম। বক্তৃতা প্রসঙ্গে এই যুবকটির সম্পর্কে কিছু প্রশংসার কথা আমি বললাম, উদ্দেশ্য, যারা তাকে জানত তাদের কাছে তার স্মৃতি যাতে প্রিয়তর হয়, এবং যেসব ছাত্র তার সঙ্গে স্কুলে আসত আর তারপরেও যারা স্কুলে আসবে, তাদের সকলের কাছেই সে যেন দৃষ্টান্তস্বরূপ হয়ে থাকে। আমার কথাগুলি শুনে গির্জার একজন প্রবীণ ভদ্রলোক খুবই অভিভূত হয়েছিলেন। বক্তৃতায় ভার্জিলের যে উক্তিটি আমি ব্যবহার করেছিলাম সেদিন সন্ধ্যায়ই তাকে বার বার সেটি আবৃত্তি করতে শোনা গেল :

Et peur ipse fuit cantari dignus.

এই ছাত্রটির ব্যাপারে গম্ভীর ভদ্রলোকটির এতটা অভিভূত হবার কারণ সম্পর্কে তিনি তার নিজের একটি ছেলে সম্পর্কে কিছু কথা বললেন। ছেলেটি একই বয়সী, কয়েক মাসের বড়। মিঃ ইলিয়টের চরিত্রের যে বিবরণ আমি দিয়েছি তার ছেলেটিও তার অযোগ্য নয়। কিন্তু একটা বিচিত্র দুর্ঘটনার ফলে তাকে নিয়ে এখন বাবা-মার সব আশা-আকাংখা একেবারেই নষ্ট হতে বসেছে।

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া শেষ হলে আমি গির্জার বাইরে আসামাত্রই এই বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি অত্যন্ত ভদ্রভাবে আমাকে ডাকলেন ; এবং অস্বাভাবিক আগ্রহাতিশয্যের সঙ্গে আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধেই জোর করে সেই রাত্তেই আমাকে তার

বাড়িতে নিয়ে যেতে চাইলেন। আর মিঃ ইলিয়ট যদি মাঝখানে পড়ে না বলতেন যে সারাটাদিন আমি তার সঙ্গে কাটাব বলে কথা দিয়েছি, এবং কোনমতেই তিনি সে কথার নড়চড় হতে দেবেন না, তাহলে হয়তো সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোকটির হাত থেকে আমি কিছুতেই রেহাই পেতাম না।

এর ফলে তখনকার মত ছাড়া পেলাম বটে, কিন্তু আমাকে বাধ্য হয়ে কথা দিতে হল যে পরবর্তী সোমবারে তার বাড়িতে গিয়ে আমি তার সঙ্গে দেখা করব। তখনকার মত তাতেই তিনি সন্তুষ্ট হলেন, কিন্তু সোমবার আসার আগেই তিনি নতুন করে অনুরোধ জানিয়ে চিঠি লিখলেন, সম্ভব হলে আমি যেন রবিবারেই সেখানে যাই। সেটা আমার পক্ষে সুবিধা হবে না এবং আমার নিজের লোকজনের প্রতি আমার কর্তব্যের দিক থেকেও সেটা অসুবিধাজনক—এই কথা বলে তার দ্বিতীয় প্রচেষ্টাকেও ঠেকিয়ে দিলাম।

ভদ্রলোক কিন্তু সেখানেই থামলেন না, রবিবারে আর একটা চিঠি পাঠিয়ে জানিয়ে দিলেন, আমি যেন কোন কারণেই সোমবারে যাওয়াটা বন্ধ না করি, এবং এমনভাবে কাজকর্মের ব বস্থা করে যাই যাতে অন্তত দু' তিনটে দিন তার সঙ্গে কাটাতে পারি। বিনা কারণে এত আগ্রহ এবং যাওয়ার জন্য এত তাড়ার বহর দেখে সত্যি আমি বিস্মিত হলাম, মনে সন্দেহ দেখা দিল যে এত অতি-ভদ্রতার অন্তরালে নিশ্চয় কোন অভিসন্ধি আছে। কারণ এই ভদ্রলোক বা তার পরিবারের সঙ্গে অ.মার কোনরকম ঘনিষ্ঠতা ছিল না; এমন কি সাধারণ পরিচয়টুকুও নয়; হঠাৎ কোথা থেকে এই বন্ধুত্বের উচ্ছ্বাস গজিয়ে উঠল তাও ভেবে পেলাম না।

কথামত সোমবার সেখানে গেলাম এবং আমন্ত্রণ যেরকম উচ্ছ্বাসপূর্ণ ছিল অভ্যর্থনাও পেলাম তদনুরূপ প্রচুর ও পরিপূর্ণ। সেখানে একজন প্রতিবেশী পাদরির সঙ্গেও দেখা হল; তিনি হঠাৎই এসে পড়ার ভান করলেও পরবর্তী ঘটনা থেকে আমার অন্যরূপ ধারণাই হল। ডিনারের পরে ভদ্রলোকটি আমাকে বাগান দেখাতে নিয়ে গেলেন। সেখানে বেড়াতে বেড়াতেই তিনি আমার কাছে এই পুরো ব্যাপারটির প্রথম রহস্যটি উদঘাটন করলেন।

প্রথমে তিনি সাধারণভাবে পরিবারের দুর্ভাগ্যের বিবরণ দিয়ে শুরু করলেন, তারপরে দৃষ্টান্তস্বরূপ ছোট ছেলের কথা উল্লেখ করলেন। ওকে নিয়ে সকলের কত আশা ছিল, ছেলেটি কত ফূর্তিবাজ ছিল; কিন্তু ইদানীং কেমন যেন মন-মরা আর আধ-ভোলা হয়ে পড়েছে। তখন থেকেই কেমন যেন কান্নাকাটি করে, যুক্তি-বুদ্ধিও হারিয়ে ফেলছে; কারণ, সে নিজেই বলেছে, তাকে নাকি ভূতে পেয়েছে; সে জোর দিয়েই বলে যে, একটা বিশেষ পথ দিয়ে যতবার সে স্কুলে যায় ততবারই এখান থেকে আধ মাইল দূরের একটা বিশেষ মাঠে তার সঙ্গে একটা ভূতের দেখা হয়।

আমাদের কথার মাঝখানেই বুড়ো ভদ্রলোক ও তার স্ত্রী এসে হাজির হলেন। পাদরিটিও সামনের কুঞ্জবনটি দেখিয়ে আগেকার কথাই বলতে শুরু করলেন, আর তারাও (যুবকটির বাবা-মা) তার বক্তব্যকে সমর্থন করে



বিস্তারিতভাবে আরও অনেকক্ষণ ধরে সব কথাই আমাকে শোনালেন। অবশেষে তারা তিনজনই এব্যাপারে আমার মন্তব্য ও পরামর্শ চাইলেন।

তাদের বক্তব্য সম্পর্কে হঠাৎই কোনরকম মন্তব্য করা আমার পক্ষে সম্ভব হল না; শুধু এইটুকু বললাম যে ছেলেটি তাদের যা বলেছে সেটা অদ্ভুত হলেও অবিশ্বাস্য নয়, আর এবিষয়ে এক্ষুণি আমি কিছু ভাবতে বা বলতে পারছি না, কিন্তু ছেলেটি যদি আমার সঙ্গে মন খুলে কথা বলে এবং আমার পরামর্শ শোনে তাহলে পরদিন তাদের আমার মতামত জানাতে পারব বলে আশা করি।

কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গেই বুঝতে পারলাম, এই দম্পতিটি আমার জন্য যে জালটি পেতে রেখেছিল আমি তার মধ্যেই পা দিয়ে ফেলেছি; বৃদ্ধা মহিলাটি তার অধৈর্যকে মোটেই চেপে রাখতে পারলেন না, তখনই ছেলেকে ডেকে আবার প্রস্তাব করে বসলেন। বাধ্য হয়েই সে প্রস্তাব মেনে নিয়ে সম্মতি জানালাম, আর মহিলাটিও আমাদের ফেলে নিকটবর্তী একটি বাগানে গিয়ে নিজেই ছেলেকে সঙ্গে করে এনে আমার হাতে তুলে দিলেন।

তিনজনের বক্তব্যের একটাই মূল সুর: তারা আমাকে বোঝাতে চাইলেন, হয় ছেলেটি আলস্যপরায়ণ এবং যেকোন ছুতো করে স্কুল পালাতে চায়, অথবা কোন মেয়ের প্রেমে পড়েছে, কিন্তু সেটা স্বীকার করতে লজ্জা পাচ্ছে

অথবা বাবার উপর চাপ দিয়ে কিছু টাকা ও নতুন জামাকাপড় বাগাবার তালে আছে, যাতে লণ্ডনে তার যে দাদা থাকে তার কাছে পাড়ি জমাতে পারে; তাই তারা আমাকে অনুরোধ করলেন আমি যেন আসল ব্যাপারটা খুঁজে বের করতে চেষ্টা করি এবং তদনুযায়ী ছেলেটিকে এসব করা থেকে নিবৃত্ত করি, সৎপরামর্শ দেই, বা তিরস্কার করি; মোট কথা, যেভাবেই হোক তার মাথা থেকে এই ভূত-প্রেতের চিন্তাটা যেন দূর করে দেই।

অচিরেই যুবকটির সঙ্গে একটি গোপন বৈঠকে বসে গেলাম। প্রথমেই সে যাতে আমার প্রতি বিরূপ না হয় সেবিষয়ে সতর্ক হলাম, মিষ্টি কথায় মন ভিজিয়ে তার মনের মধ্যে ঢুকতে চেষ্টা করলাম, কারণ আমার সন্দেহ ছিল যে সে হয় তো আমাকে বিশ্বাস করবে না, বা মুখই খুলবে না। কিন্তু প্রথম পর্বটা পার হয়ে আসল কাজের কথা শুরু করার আগেই বুঝে ফেললাম যে তার মনের মধ্যে ঢুকতে কোনরকম কৌশল অবলম্বনের দরকারই হবে না; কারণ বেশ অনুগতভাবেই সে খোলাখুলিই বলল যে সে তার পুঁথিপত্রই ভালবাসে এবং একটি ভাল ছাত্র হওয়া ছাড়া আর কিছুই চায় না; তার মা যাই বলুক, কোন মেয়েছেলের প্রতিই তার কোন টান নেই; বাবা মার কাছে তার শুধু একটিই অনুরোধ, "হায়ারভ্রম কোয়ার্টার্স্—"এর মাঠে যে স্ত্রীলোকটি তাকে বিরক্ত করছে তার সম্পর্কে বার বার সে যা বলছে সেকথা তারা বিশ্বাস করুক। অনেক চোখের জলে ভেসে সে একেবারে খোলাখুলিই আমাকে বলল যে, তার বন্ধুরা তার প্রতি নিষ্ঠুর ও অন্যায় ব্যবহার করছে; তারা তার কথা বিশ্বাস করে না, তার প্রতি কোন সহানুভূতি দেখায় না; যে কেউ আমার সঙ্গে একবার সেখানে গেলেই বুঝতে পারবে ব্যাপারটা সত্য, ইত্যাদি।

ততক্ষণে সে বুঝতে পেরেছে যে আমি তার প্রতি সহানুভূতিশীল, তার কথাগুলি মন দিয়ে শুনছি, আর তাই সে বলতে লাগল:

"যে স্ত্রীলোকটি আমাকে দেখা দেয় সে এখানে আমার বাবার প্রতিবেশী ছিল; আট বছর আগে মারা গেছে; নাম ডরথি ডিংলে; এইরকম উঁচু, এইরকম বয়স, আর এইরকম গায়ের রং। সে কখনও আমার সঙ্গে কথা বলে না, তাড়াতাড়ি আমাকে পাশ কাটিয়ে চলে যায়, সব সময়ই ফুটপাতটা আমাকে ছেড়ে দেয়, এবং মাঠটা পার হবার মধ্যে সাধারণত দু'বার কি তিন বার আমাকে দেখা দেয়।

"এইভাবে মাস দুই চলার পরে ব্যাপারটা আমার নজরে এল; মুখের আদলটা মনে থাকলেও তার নামটা তখন মনে পড়ে নি; কাজেই এ নিয়ে বেশী মাথা না ঘামিয়েই ধরে নিয়েছিলাম যে এই স্ত্রীলোকটি হয় তো কাছাকাছি কোথাও থাকে, আর মাঝে মাঝেই তাকে এহ পথ দিয়ে চলাফেরা করতে হয়। অন্যরকম কোন কল্পনা আমার মাথায়ও আসে নি। কিন্তু ক্রমে

সকালে ও সন্ধ্যায় অনবরত তার সঙ্গে আমার দেখা হতে লাগল ; সবসময় ঐ একই মাঠে, আর অনেক সময় মাঠটা পাড়ি দেবার পথেই দুই কি তিন বার করে।

"এই স্ত্রীলোকটির প্রতি প্রথম আমার নজর পড়ল প্রায় এক বছর আগে, তখনই আমার সন্দেহ হল, বিশ্বাস হল যে এটা একটা ভূত ; কিন্তু তাতে ভয় পাবার ছেলে আমি নই ; বেশ কিছুদিন ব্যাপারটা নিজের মনের মধ্যেই চেপে রাখলাম, অনেক ভাবলাম। অনেক সময় তার সঙ্গে কথা বলতে চেষ্টা করেছি, কিন্তু কখনও জবাব পাই নি। তারপর আমি কথাটাই বদলে ফেললাম ; স্কুলে যেতে লাগলাম আণ্ডার হর্স রোড ধরে ; আর তখন সেও আমাকে দেখা দিত কোয়ারি পার্ক ও নার্সারির মাঝখানের সরু গলিটাতে। সেটা তো আরও খারাপ ব্যাপার।

"শেষ পর্যন্ত আমার ভয় করতে লাগল . অনবরত ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতাম, হয় এর হাত থেকে আমাকে মুক্তি দাও, আর না হয় তো ব্যাপারটা আমাকে বুঝতে দাও। রাতে ও দিনে, নিদ্রায় ও জাগরণে, মূর্তিটা সব সময় আমার মনের মধ্যে ছুটে বেড়ায়, ধর্মগ্রন্থের এই জায়গাটা আমি বার বার আবৃত্তি করি (পকেট থেকে একখানি ছোট বাইবেল বের করল), জোব vii, ১৪ : 'স্বপ্নে তুমি আমাকে ভয় দেখাও, আর অপচ্ছায়া দেখিয়ে সন্ত্রস্ত কর।' আর ডিউটেরনমি, xxviii, ৬৭ : 'সকালে তুমি বলবে, ঈশ্বরের ইচ্ছায় এখন যদি সন্ধ্যা হত ; আর সন্ধ্যায় তুমি বলবে, ঈশ্বরের ইচ্ছায় এখন যদি সকাল হত ; কারণ মনের ভয় থেকেই তোমার ভয়ের জন্ম, আর চোখের দৃষ্টির জন্যই তুমি সব কিছু দেখতে পাও।"

ধর্মগ্রন্থের সংশ্লিষ্ট অংশগুলিকে তার অবস্থানুযায়ী প্রয়োগ করার ব্যাপারে ছেলেটির সূক্ষ্ম বুদ্ধির পরিচয় পেয়ে আমি খুব খুশি হলাম ; তাকে আরও সব কথা বলতে বললাম।

সে বলতে লাগল : "ধীরে ধীরে আমি এতদূর মনমরা হয়ে পড়লাম যে সেটা বাড়ির সকলেরই চোখে পড়ল ; তারপর নানা প্রশ্নের জবাবে আমার ভাই উইলিয়ামকে ব্যাপারটা বললাম। সে গোপনে বাবা ও মাকে কথাটা জানাল, আর তারাও কিছুদিন পর্যন্ত কথাটা নিজেদের মধ্যেই চেপে রাখল।

"এই জানাজানির একটি মাত্র ফল হল ; তারা কখনও আমাকে দেখে হাসে, কখনও বকে, কিন্তু সব সময় স্কুলে যাবার হুকুম করে এবং এই সব আবোল তাবোল ধারণা মাথা থেকে দূর করতে বলে। ফলে আমি প্রায়ই স্কুলে যেতাম, আর সব সময়ই পথে স্ত্রীলোকটির সঙ্গে দেখা হত।"

বাগানে বসে এই কথা এবং একই রকমের আরও অনেক কথা হল প্রায় দু-ঘণ্টা ধরে। অবশেষে আমি প্রস্তাব করলাম, কোনরকম গোপন না করেই পরদিন সকালে ছটা নাগাদ আমি তাকে সঙ্গে নিয়ে হেঁটে সেই জায়গাটায়

যাব। কথাটা বলতেই সে আনন্দে লাফিয়ে উঠল; বলল, "সত্যি যাবেন স্যার? সত্যি তো স্যার? ঈশ্বরকে ধন্যবাদ! এখন আশা হচ্ছে আমি স্বস্তি পাব।"

এই সিদ্ধান্ত নিয়ে আমরা বাড়ির ভিতরে গেলাম।

ভদ্রলোক, তার স্ত্রী, ও মিঃ শ্যাম ঘটনাটা জানবার জন্য এতই অস্থির হয়ে পড়েছিলেন যে আমাদের সঙ্গে দেখা করতে তারা বৈঠকখানা থেকে হলঘরে বেরিয়ে এলেন। ছেলেকে বেশ উৎফুল্ল দেখে বৃদ্ধ লোকটিই প্রথম প্রশংসা-বাণী উচ্চারণ করলেন, "আসুন মিঃ রুডল্, ওর সঙ্গে কথা বলবেন; আশাকরি এবার তার সুবুদ্ধি হবে। ছেলেটা অলস! ছেলেটা অলস!"

একথা শুনে কোন জবাব না দিয়েই ছেলেটি তার নিজের ঘরে যাবার সিঁড়ির দিকে ছুটে গেল; আমিও এই বলে তিনটি অপেক্ষমান প্রাণীর কৌতূহলকে নিবৃত্ত করলাম যে আমি কথা দিয়েছি চুপ করে থাকব, আর সে কথা রাখতে আমি কৃতসংকল্প; যথাসময়ে তারা সব কিছুই জানতে পারবেন। বর্তমানে তারা যেন আমার কথার উপর ভরসা রাখেন, আমি সাধ্যমত তাদের সেবা করতে চেষ্টা করব, তাদের ছেলের যাতে ভাল হয় তাই করব। একথায় তারা চুপ করে গেলেন; সন্তুষ্ট হলেন একথা বলতে পারব না।

পরদিন সকাল পাঁচটার আগেই শ্রীমান আমার ঘরে এসে হাজির। বেশ চটপটে ভাব। আমিও উঠে তার সঙ্গে চললাম। যেমাঠে সে আমাকে নিয়ে গেল আমার অনুমান সেটা বিশ একর, চারদিক খোলা, সব বাড়িঘর প্রায় তিন ফার্লং দূরে! মাঠে ঢুকে এক-তৃতীয়াংশ যাবার আগেই স্ত্রীরূপধারী সেই ছায়ামূর্তি—আকস্মিক আবির্ভাব ও প্রস্থান সমেত হুবহু শ্রীমানের দেওয়া বর্ণনারই অনুরূপ—এসে আমাদের পাশ দিয়ে চলে গেল। আমিও কিছুটা অবাক হয়ে গেলাম। যদিও মনে মনে স্থির করেই গিয়েছিলাম যে তার সঙ্গে কথা বলব, তথাপি পিছন ফিরে তাকাবার শক্তি বা সাহস কোনটাই আমার হল না; তবু আমার ছাত্র তথা পথপ্রদর্শকের সামনে কোনরকম ভয়ের লক্ষণ প্রকাশ করলাম না। তাকে শুধু জানালাম, তার কথার সত্যতায় আমি সন্তুষ্ট। আমরা মাঠটার শেষ পর্যন্ত গেলাম, আবার ফিরে এলাম, কিন্তু ভূতটি একবারের বেশী আমাদের দেখা দিল না। ছেলেটির মধ্যে বিস্ময়মিশ্রিত একধরনের সাহসিকতা লক্ষ্য করলাম; তার সাহসের কারণ অবশ্যই আমার উপস্থিতি এবং তার কথার সত্যতার প্রমাণ, আর বিস্ময়ের কারণ ছায়ামূর্তির আবির্ভাব।

এককথায়, আমরা বাড়ি ফিরে গেলাম: আমি কিছুটা বিচলিত, আর ছেলেটি উত্তেজিত। আমরা ফেরামাত্রই কৌতূহলী ভদ্রমহিলাটি আমাদের সঙ্গে কথা বলার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। সুযোগমত তাকে বললাম, আমার

মতে তার ছেলের অভিযোগ উপেক্ষা করা বা অবিশ্বাস করার মত নয়; তবু এব্যাপারে আমার মতামত এখনও স্থির করতে পারি নি। তাকে সতর্ক করে দিলাম, কথাটা যেন প্রচার না হয়, তাহলে সেবিষয়ে আমরা এখনও নিশ্চিত হতে পারি নি তা নিয়ে গ্রামে হৈ-চৈ পড়ে যাবে।

ঠিক সেইসময় আমাব এমন কাজ পড়ে গেল যাতে আর অপেক্ষা করতে



পারলাম না, সেই সন্ধ্যায়ই লণ্ডন যাত্রা করলাম, তবে কথা দিয়ে গেলাম যে পরের সপ্তাহে আবার তাদের সঙ্গে দেখা করব। তবু একটা বিশেষ কারণে

আটকা পড়ে গেলাম ; সেই সপ্তাহেই আমার স্ত্রী এক প্রতিবেশীর বাড়ি থেকে অসুস্থ অবস্থায় ফিরে এল। যাই হোক, সেই অভিযানের নেশাটা আমার মন থেকে গেল না। ব্যাপারটা নিয়ে অনেক ভাবনা-চিন্তা করলাম, এবং ঈশ্বরের ইচ্ছায় একটা হেস্তনেস্ত করার সংকল্প নিয়ে তিন সপ্তাহ পরে আবার সেখানে ফিরে গেলাম।

পরদিন ১৬৬৫-র ২৭শে জুলাই তারিখ সকালে আমি একাই সেই ভূতুড়ে মাঠে হাজির হলাম এবং সারা মাঠ হেঁটেও কারও দেখা পেলাম না। ফিরে এসে অন্য একটা পথ ধরলাম ; এবার কিন্তু প্রেতমূর্তিটা দেখা দিল, আগের বার ছেলেটিকে সঙ্গে নিয়ে সেটাকে যেখানে দেখেছিলাম অনেকটা সেই জায়গাতেই। মনে হল, এবার সেটা আগেকার চাইতে দ্রুতগতিতে আমার ডান পাশে প্রায় দশ ফুট দূর দিয়ে চলে গেল ; তাই আগে থেকে মনস্থির করে এলেও আমি কথা বলার মত সময়ই পেলাম না।

সেদিন সন্ধ্যায় বাবা-মা, ছেলে ও আমি নিজে আমার শোবার ঘরে সমবেত হবার পরে আমি প্রস্তাব করলাম যে পরদিন সকালে আমরা সকলে একসঙ্গে সেখানে যাব, এবং এতে যে কোন বিপদের সম্ভাবনা নেই সেবিষয়ে কিছু কথাবার্তার পরে সেটাই স্থির হল। সকাল হলে পাছে চাকর-বাকররা ভয় পেয়ে যায় তাই একটা গমের ক্ষেত দেখতে যাবার অছিলায় তারা তিনজন বেরিয়ে গেল, আর আমি একটা ঘোড়া আনিয়ে অন্য পথ ধরে একটা কম্পাস নিয়ে গেলাম এবং পূর্ব নির্দিষ্ট সিঁড়িটার কাছে তাদের সঙ্গে মিলিত হলাম।

সেখান থেকে চারজন ধীরে ধীরে কোয়ার্টার্লস্-এর দিকে হাঁটতে লাগলাম এবং অর্ধেক মাঠ পার হবার আগেই ভূতের দেখা পেলাম। সিঁড়ির উপর দিয়ে সেটা ঠিক আমাদের সামনে এসে হাজির হল, আর তারপরেই এত দ্রুত চলতে শুরু করল যে আমরা ছ' সাত পা যেতে না যেতেই সেটা আমাদের ছাড়িয়ে চলে গেল। আমিও সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে গিয়ে ছেলেটিকে সঙ্গে নিয়ে তার দিকে ছুটতে লাগলাম ; দেখলাম, যে সিঁড়ি দিয়ে আমরা ঢুকেছিলাম সেটার উপর দিয়ে সে চলে গেল ; বাস্, আর কিছুই দেখতে পেলাম না। এক জায়গায় আমি একটা বেড়ার উপর উঠলাম, আর সে আর একটার উপর, কিন্তু কিছুই দেখতে পেলাম না ; আমি জোর দিয়ে বলতে পারি— ইংলণ্ডের দ্রুততম ঘোড়াও এত অল্প সময়ের মধ্যে দৃষ্টির আড়ালে চলে যেতে পারত না। তার এদিনকার আবির্ভাব সম্পর্কে দুটো জিনিস আমি লক্ষ্য করলাম। ১। যে শিকারী কুকুরটা আমাদের অগোচরে আমাদের অনুসরণ করছিল সেটা কিন্তু প্রেতমূর্তিটাকে চলে যেতে দেখে ঘেউ ঘেউ করতে করতে পালিয়ে গিয়েছিল ; তা থেকে সহজেই অনুমান করা যায় যে প্রেতমূর্তিটা আমাদের ভয় অথবা কল্পনার সৃষ্টি নয়। ২। প্রেতমূর্তিটার চলন পা ফেলে ফেলে একটার পর একটা ধাপে ধাপে নয়, অনেকটা ভেসে চলার মত, ঠিক

যেভাবে ছেলেমেয়েরা বরফের উপর দিয়ে চলে, অথবা কোন নৌকো যে-ভাবে খরস্রোতা নদীর উপর দিয়ে চলে; প্রাচীনকালের লেখকরা (হেলিও-ডোরাস) প্রেতাত্মাদের চলার যে বিবরণ দিয়েছেন ঠিক তার মত।

কিন্তু আমার কথায়ই ফিরে যাই। নিজেদের চোখে এইসব দেখে বৃদ্ধ দম্পতি ছেলের কথায় যেমন বিশ্বাস করল তেমনই খুব ভয়ও পেল; কারণ এই ডরোথি ডিংলেকে তার জীবিতকালে তারা চিনত, তার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় উপ-স্থিত ছিল, আর এখন এই প্রেতমূর্তির মধ্যে অবিকল তার মূর্তিই দেখতে পেল। আমি সাধ্যমত তাদের উৎসাহ দিলাম, কিন্তু তারা আর অগ্রসর হতে চাইল না। যাইহোক, আমি স্থির করলাম শেষ পর্যন্ত দেখব, এবং এ ধরনের অস্বাভাবিক ঘটনার ক্ষেত্রে ঈশ্বর যেসব আইনসম্মত পন্থা আবিষ্কার করছেন, আর পণ্ডিত লোকরা যাকে সাফল্যের সঙ্গে প্রয়োগ করেছেন তারই সাহায্য নেব।

পরদিন বৃহস্পতিবার। খুব ভোরে উঠে আমি একাই গেলাম। কোয়া-র্টিল্‌স্‌-এর ঠিক পাশের মাঠটাতে মনে মনে প্রার্থনা করতে করতে আধ ঘণ্টা ধরে হাঁটলাম। পাঁচটার পরেই আমি সিঁড়ি বেয়ে সেই ভূতুড়ে মাঠে পা ফেললাম, আর ত্রিশ বা চল্লিশ পা যেতে না যেতেই পরের সিঁড়িতে ভূতটা দেখা দিল। এসব ক্ষেত্রে যেরকম করতে হয় সেইভাবে কয়েকটি বাক্য উচ্চারণ করে তাকে ডাকলাম, আর সেটাও ধীরে ধীরে এগোতে লাগল, এবং আমি যখন কাছে গেলাম তখন আর সেটা নড়ল না। আবার কথা বললাম, সে জবাব দিল, কিন্তু তার কথা স্পষ্ট শোনাও গেল না, বোঝাও গেল না। আমি কিন্তু মোটেই ভয় পেলাম না, কথা চালিয়ে গেলাম, আর শেষ পর্যন্ত সেও কথা বলল, আমি খুশি হলাম। কিন্তু তখন সব কাজটা শেষ করা গেল না; সেদিন সন্ধ্যায় সূর্যাস্তের এক ঘণ্টা পরে সেই একই জায়গায় সেটা আবার আমার সঙ্গে দেখা করল, আর দু'পক্ষেরই কিছু কথা-বার্তার পরে সেটা ধীরে ধীরে অদৃশ্য হয়ে গেল। সেই থেকে আর কোনদিন সে দেখা দেয়নি, বা কোন মানুষের ক্ষতি করে নি। আমাদের সকাল বেলা-কার আলোচনাটা প্রায় পৌনে এক ঘণ্টা ধরে চলেছিল।

এরা সত্য, আর তাই আমি জানি; চোখ ও কান যতটা নিশ্চয়তা দিতে পারে ততটা নিশ্চিতভাবেই জানি; আর যতদিন না আমি বুঝব যে আমার ইন্দ্রিয়গুলি আমাকে প্রতারিত করে, আর সেই বোঝার ফলে খ্রীস্টধর্মের প্রতি আমার অবিচল বিশ্বাস থেকে আমি বিচ্যুত না হব, ততদিন আমি জোরের সঙ্গেই বলব যে এখানে যা কিছু লেখা হল সেসবই সত্য।

এব্যাপারে আমার কার্যক্রম নিয়ে লজ্জিত হবারও কোন কারণ দেখি না, কারণ যারা নীতিবান, সুবিবেচক ও প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের অধিকারী সেইসব মানুষের কাছে আমি এটা প্রমাণ করতে পারি, যদিও এক্ষেত্রে প্রকৃত ব্যাপার

সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হতে পেরেই আমি [illegible]ছি, অন্যকে বিশ্বাস করাবার লাভবিহীন কষ্টের দায় বহন করতে চাই নি; কারণ এধরনের অসাধারণ ঘটনাকে বিশ্বাস করানো যে কত কঠিন তা আমি ভাল করেই জানি। এ-ধরনের গল্প যে বলে তার কপালে ডাকাতদের হাতে পোলাণ্ডের পথিকের মত আচরণই জুটে থাকে : যথা, আগে খুন করে তারপর তল্লাসী—প্রথমে মিথ্যা-বাদী হিসাবে দণ্ড দিয়ে তারপর অনেক বিলম্বে তার যুক্তি ও প্রমাণগুলি পরীক্ষা করে দেখা। এই অবিশ্বাসের অনেকগুলি কারণ হতে পারে :

১. পোপতন্ত্রের অন্ধকার যুগে জনসাধারণের সীমাহীন অপপ্রয়োগ এবং চতুর সন্ন্যাসী ও ফকির কর্তৃক তাদের বিশ্বাসের উপর নানাভাবে চাপসৃষ্টি, ইত্যাদি, কারণ তারা খুশিমত অপচ্ছায়া সৃষ্টি করে নিজেদের কৌশলে গড়া সেইসব অসাধারণ শক্তিকে শান্ত করে টাকা ও বাহবা দুইই আদায় করত।

২. সেইসময়ে প্রচলিত বস্তুতন্ত্র ও হব্‌সের বিধান, যা নাকি সাড্‌ডুচিদের (সন্দেহবাদীদের) মতবাদেরই পুনরাবির্ভাব স্বরূপ; আর যেহেতু সে মতবাদ প্রকৃতিকেই অস্বীকার করে, সেইহেতু প্রেতমূর্তিকে স্বীকার করে নিতে পারে না, এই প্রসঙ্গে "লেভিয়াথান", পুঃ ১, সি ১২ দ্রষ্টব্য।

৩. আত্মার সঙ্গে মানুষের যোগাযোগ বিষয়ক দর্শন ও ধর্মের এই বিশেষ রহস্যময় অধ্যায় সম্পর্কে আমাদের যুগের মানুষের অজ্ঞতা। দশ হাজারে একজন পণ্ডিত ও (অন্যক্ষেত্রে চমৎকার জ্ঞানের অধিকারী হলেও) এবিষয়ে কিছুই জানে না, অথবা কিছু করতেও পারে না। যা হয়তো মানবজাতির অতুলনীয় কল্যাণ করতে পারত, এই অজ্ঞতার ফলে তার প্রতি জন্ম নিয়েছে আতংক ও ঘৃণা।

কিন্তু যেহেতু আমি একজন পাদরি ও বয়স্ক যুবক, এবং এ অঞ্চলে অপরিচিত, তাই নীরবতা ও গোপনীয়তাকেই আমি আমার শ্রেষ্ঠ নিরাপত্তা বলে মনে করি।

The Ghost of Dorothy Dingley—*D*anial Defoe

বাগানের মালী

আমার দুই বন্ধু হিউ গ্রেইঞ্জার ও তার স্ত্রী বড়দিনের ছুটি কাটাবার জন্য যে বাড়িটা একমাসের জন্য নিয়েছিল সেখানে অদ্ভুত সব ঘটনার সাক্ষী আমাদের হতে হয়েছিল। তাদের সঙ্গে একপক্ষকাল কাটিয়ে আসার আমন্ত্রণ পাওয়ামাত্রই আমি তাদের সোৎসাহ সম্মতি জানিয়ে দিলাম। ঝোপ-ঝাড়ে ভরা সেই সুন্দর গ্রামাঞ্চলের কথা আমি ভাল করেই জানতাম, এবং

সেখানকার মনোরম গল্‌ফের ম্যাঠের ছোট-খাট বিপদের সঙ্গেও আমার যথেষ্ট ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। আমাকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে গল্‌ফ নিয়েই হিউ ও আমার গোটা দিন কাটবে, আর যেহেতু মার্গারেট খেলাটাকে মোটেই পছন্দ করে না, তাই যেসব যন্ত্রপাতি দিয়ে খেলাটা খেলতে হয় তাতে তাকে কখনই হাত দিতে দেওয়া হবে না।

সেখানে যখন পৌঁছলাম তখনও দিনের আলো আছে; বাড়ির মালিকরা তখনও বাইরেই থাকায় আমি চারদিকটা ঘুরে দেখতে লাগলাম। দক্ষিণমুখী একটা উঁচু জায়গার উপর বাড়ি ও বাগানটা অবস্থিত; তার নীচে একর দুই ঘাসের জমি একটা আঁকাবাঁকা স্রোতধারার দিকে নেমে গেছে; সেটাকে পার হবার জন্য আছে একটা পায়ে চলার মত সেতু, আর তার পাশেই রয়েছে সব্জি-বাগানে ঘেরা একটা খড়ের বাড়ি। তার ঠিক পাশ দিয়ে ঘাস-জমির ভিতর দিয়ে একটা রাস্তা চলে গেছে বাগানের বাঁশের ফটকের দিকে; রাস্তাটা পায়ে চলার সেতুটার উপর দিয়ে চলে গেছে, এখানকার ভৌগোলিক অবস্থান যতটা স্মরণে আছে তা থেকেই বুঝলাম যে এটাই আধ মাইল দূরের গলফের মাঠে যাবার সোজা পথ। কুটিরটা ছোট জমিদার বাড়ির জমিতেই অবস্থিত; তাই আমি সঙ্গে সঙ্গেই ধরে নিলাম যে এটাই মালীর ঘর। কিন্তু এই সহজ অনুমানে একটা খটকা দেখা দিল, কারণ কুটিরে কোন লোক নেই। সন্ধ্যাটা বেশ ঠাণ্ডা, অথচ চিমনি দিয়ে ধোঁয়ার কুণ্ডলি উঠছে না; আরও কাছে যেতেই মনে হল কুটিরটাকে ঘিরে এমন একটা ভাব রয়েছে যেটা আমরা সাধারণত পোড়ো বাড়ির ক্ষেত্রে কল্পনা করে থাকি। কুটিরের কোথাও জীবনের চিহ্নমাত্র নেই, যদিও তার ছিমছাম অবস্থা দেখে মনে হয় যে নতুন ভাড়াটের জীবন-স্পন্দনের জন্য সেটা সম্পূর্ণ তৈরি হয়ে আছে। বাগানের নতুন রং-করা পরিষ্কার খুঁটিগুলোও সেই একই কাহিনীর সাক্ষী; ফুলের কেয়ারিগুলোর কোন যত্ন নেওয়া হয় নি, আগাছাগুলি কেউ তুলে ফেলে নি; সামনের দরজায় পাশের একসারি ক্রিসেন্থিমামের বোঁটাগুলি শুকিয়ে গেছে। কিন্তু এসবই মুহূর্তের ধারণামাত্র, কুটিরের পাশ দিয়ে যাবার সময় আমি সেখানে থামলাম না, পায়ে-চলা সেতুটা পেরিয়ে ঝোপঝাড়ে ঢাকা মাঠ বেয়ে উপরে উঠতে লাগলাম। জায়গাটা চিনতে আমার ভুল হয় নি, কারণ আমার ঠিক সামনেই ক্লাব-হাউসটা দেখতে পেলাম। বিকেলের ভ্রমণ সেরে হিউ নিশ্চয় এখনই ফিরে আসবে, আর আমরা একসঙ্গেই ফিরে যেতে পারব। কিন্তু ক্লাব-হাউসে পৌঁছতেই ভাণ্ডারী জানাল যে পাঁচ মিনিটও হয় নি মিসেস গ্রেইঞ্জার গাড়ি নিয়ে স্বামীর খোঁজ করতে এসেছিলেন; কাজেই আমি যে পথে এসেছিলাম সেইপথ ধরেই ফিরে চললাম। কিন্তু একজন গল্‌ফ-খেলোয়াড়ের মতই আমি একটু ঘুরে সপ্তদশ ও অষ্টাদশ গর্তের পথটা চিনতে পারি কি না দেখবার জন্য অন্য একটা পথ ধরলাম।

শীত-সন্ধ্যার আলো দ্রুত মিলিয়ে যাচ্ছে ; ফিরবার পথে যখন পায়ে-চলা সেতুটা পার হলাম তখন অন্ধকার ঘন হয়ে আসছে। আমার ডান দিকে পথের পাশেই কুটিরটা ; সূর্যাস্তের আলোয় তার চুনকাম-করা সাদা দেয়াল চকচক করছে ; চোখ ফিরিয়ে সেতুর সংকীর্ণ কাঠের দিকে দৃষ্টিপাত করতে গিয়ে মনে হল যেন কুটিরের জানালা দিয়ে আলো দেখা যাচ্ছে ; আর তাই কুটিরে কেউ বাস করে না বলে আমার যে ধারণা হয়েছিল সেটা ভুল প্রমাণিত হল। কিন্তু পুনরায় সেদিকে ভাল করে তাকাতেই বুঝলাম যে আমারই ভুল হয়েছে ; পশ্চিম আকাশ থেকে সূর্যাস্তের লাল আলো কাঁচের উপর প্রতিফলিত হয়ে আমাকে ঠকিয়েছে, কারণ গোধূলির অস্পষ্ট আলোয় কুটিরটা আগের মতই জনশূন্য দেখাচ্ছে। তবু আমি নীচু খুঁটিওয়ালা বাঁশের ফটকটার পাশেই দাঁড়িয়ে পড়লাম, কারণ যদিও বাইরে থেকে দেখে মনে হচ্ছে যে বাড়িটা ফাঁকা, তবু অকারণেই একটা দুর্বোধ্য অনুভূতি আমাকে পেয়ে বসল যে সেটা ঠিক নয়, কেউ না কেউ ওখানে বাস করে। অবশ্য লোকজন কাউকেই দেখা যাচ্ছে না, তবু আমার মনে একটা অবাস্তব ধারণা জন্মাল যে হয়তো কুটিরটার পিছনে কেউ বাস করে, কুটিরটা সামনে থাকায় আমি সেটা দেখতে পাচ্ছি না ; আর তার চাইতেও যুক্তিহীন একটা ধারণা আমাকে পেয়ে বসল : ওখানে কেউ থাকে কি না সেটা আমাকে দেখতেই হবে। এই কৌতূহলের স্বপক্ষে আমার মন বলল। যদি কাউকে সেখানে পাই তো তার কাছ থেকেই জেনে নিতে পারব যে আমার অভীষ্ট বাড়িতে যাবার এটাই সোজা পথ কি না। এইসব ভেবেই বাগানটা পার হয়ে দরজায় টোকা দিলাম। কোন জবাব এল না ; দ্বিতীয়বার টোকা দিয়ে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে দরজাটার দিকে তাকিয়ে দেখলাম সেটা তালাবন্ধ ; অগত্যা বাড়িতে ফিরে গেলাম। অবশ্যই সেখানে কেউ থাকে না ; মনে মনে বললাম, আমার অবস্থা সেই লোকটির মত যে বিছানার নীচে চোর খুঁজতে গিয়ে সেখানে তাকে পেয়ে গেলে সাতিশয় অবাক হয়ে যায়।

যখন বাড়ি পৌঁছলাম তখন মালিকরা দুজনই ফিরে এসেছে। ডিনারের আগে দুটি ঘণ্টা গল্প-গুজবে বেশ আনন্দেই কেটে গেল। গল্‌ফ, রাজনীতি, রাশিয়ার প্রয়োজন, রান্না, ভূতপ্রেত, মাউণ্ট এভারেস্ট জয়ের সম্ভাবনা, আয়কর—যেকোন বিষয় নিয়েই আলোচনা হোক গ্রেইঞ্জার দম্পতির সব কিছুতেই সমান আগ্রহ। নানা ধরনের কথার জাল বুনতে বুনতে যেকোন একটা বিষয়কে জোরদার করে তোলা খুবই সোজা, আর আমাদের কথাবার্তার মধ্যে বারবারই ভূতের কথা এসে পড়ল।

একসময় হিউ মন্তব্য করল, "মার্গারেট তো পাগল হতেই চলেছে, কারণ সে প্ল্যাঞ্চেট ব্যবহার করতে শুরু করেছে। শুনেছি, তুমি যদি ছ'মাস প্ল্যাঞ্চেট ব্যবহার কর, তাহলে অত্যন্ত সাবধানী ডাক্তারও সজ্ঞানে তোমাকে উন্মাদ

বলে সার্টিফিকেট দেবে। তার অবশ্য বেড্‌লাম যেতে এখনও পাঁচ মাস বাকি আছে।"

"ওতে কি কোন কাজ হয়?" আমি শুধালাম।

মার্গারেট বলল, "হ্যাঁ, অনেক মজার মজার কথা বলে। এমন সব কথা বলে যা কখনও আমার মাথায়ই আসে নি। আজ রাতে একবার পরীক্ষা করব।"

হিউ বলে উঠল, "না, আজ রাতে নয়। একটা সন্ধ্যা বাদ দেওয়া হোক।"

মার্গারেট একথা মানল না।

বলতে লাগল, "প্ল্যাঞ্চেটকে প্রশ্ন করে কোন লাভ নেই, কারণ কোন না কোন জবাব তোমার মনের মধ্যে থাকেই। ধরা যাক, যদি প্রশ্ন করি কাল দিনটা পরিষ্কার থাকবে কি না তাহলে হয় তো—ইচ্ছা করে ঠেলে না দিলেও—আমিই পেন্সিলটা ঘুরিয়ে লিখে ফেলি হঁ্যা।"

"আর সেদিনই বৃষ্টি হয়," হিউ বলল।

"সবসময়ই নয়; বাধা দিও না। আসল মজা হল পেন্সিলটাকে তার খুশিমত লিখতে দেওয়া। প্রায়ই পেন্সিলের মুখে ফাঁস, ও বাঁকা লাইন আঁকা পড়ে—যদিও তার কোন অর্থ থাকতেও পারে—আর প্রায়ই এমন একটা শব্দ আসে যার অর্থই আমি জানি না, সুতরাং সেটা আমার মনের কথা হতেই পারে না। দৃষ্টান্ত হিসাবে, কাল সন্ধ্যায় আমি বার বার লিখেছি 'মালী'। তার অর্থ কি হতে পারে? এখানকার মালীটি মেথডিস্ট গির্জার লোক, তার থুত্‌নিতে ক্ষুর আছে। প্ল্যাঞ্চেট কি তার কথাই বলেছে? আরে, প্রসাধনের সময় হয়ে গেছে। দয়া করে দেরি করবেন না, ঝোলের ব্যাপারে আমার রাঁধুনিটি বড়ই খুঁতখুঁতে।"

উঠে পড়লাম; "মালী", কথাটার সঙ্গে কিছু ধারণা আমার মনের মধ্যে গেঁথে রইল।

জিজ্ঞাসা করলাম, "ভাল কথা, পায়ে-চলা সেতুর পাশের এই কুটিরটা কিসের? ওটাই কি মালীর ঘর?"

"তাই ছিল," হিউ বলল। "কিন্তু ক্ষুর-দাঁড়ি এখন আর সেখানে থাকে না: আসলে কেউ থাকে না। ওটা খালি। আমি যদি এখানকার মালিক হতাম তাহলে ক্ষুর-দাঁড়িকে এখানেই রেখে তার মাইনে থেকে ভাড়াটা কেটে নিতাম। অনেকেরই ব্যয়-হ্রাসের কোন ধারণা থাকে না তো। কিন্তু একথা জিজ্ঞাসা করছ কেন?"

দেখলাম, মার্গারেট সাগ্রহে আমার দিকে তাকিয়ে আছে!

"কৌতূহল," আমি বললাম। "নেহাৎই কৌতূহল।"

"আমি বিশ্বাস করি না," মার্গারেট বলল।

"কিন্তু সত্যি তাই," আমি বললাম। "বাড়িটাতে কেউ থাকে কি না সেটা

জানবার একটা অর্থহীন কৌতূহল। ওটার পাশ দিয়ে ক্লাব-হাউসে যাবার সময় ওটাকে খালি বলেই মনে হয়েছিল, কিন্তু ফিরবার সময় ওখানে কেউ থাকে বলে এত বেশী মনে হল যে দরজায় পর্যন্ত টোকা দিয়েছিল, আর শেষ পর্যন্ত ফিরেই এসেছি।"

হিউ ততক্ষণে উপরে উঠে গেছে; মার্গারেট দাঁড়িয়ে পড়ল।

শুধাল, "সেখানে কেউ ছিল না? আশ্চর্য: এব্যাপারে আমার ধারণাও কিন্তু ঠিক আপনার মত।"

আমি বললাম "প্ল্যাঙ্কেটে বারবার 'মালী' কথাটা লেখার ব্যাপারটাও ওতেই পরিষ্কার বোঝা গেল। মালির কুটিরটার কথা সর্বদাই আপনার মনের মধ্যে ছিল।"

"কী বুদ্ধি!" মার্গারেট বলল। "তাড়াতাড়ি পোশাক পরে নিন।"

সেরাতে যখন বিছানায় শুতে গেলাম তখন আমার জানালার পর্দার ফাঁক দিয়ে উজ্জ্বল চাঁদের আলো এসে পড়ায় বাইরে তাকালাম। আমার ঘরের সামনেই বাগান আর সেই মাঠটা বিকেলে যেটা আমি পার হয়ে এসেছি। সবকিছুই পূর্ণ চাঁদের আলোয় আলোকিত হয়ে উঠেছে। ছোট নদীটার পাশে সাদা দেয়ালের কুটিরটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে; জানালার কাঁচের উপর আলো পড়ায় আরও একবার মনে হল যেন ঘরের ভিতরে আলো জ্বলছে। একইদিনে দু'বার এই ভ্রান্ত দর্শন ঘটাটা আমার কাছে অদ্ভুত মনে হল, কিন্তু এবার অধিকতর অদ্ভুত একটা ব্যাপার ঘটল। আমি দেখতে দেখতেই আলোটা নিভে গেল।

রাতটা পরিষ্কার থাকায় পরদিন সকালটাও পরিষ্কার থাকবে বলে যে আশা করা গিয়েছিল সেটা হল না। ঘুম ভাঙতেই দেখি বাইরে বাতাস হাহাকার করছে, আর দক্ষিণ-পশ্চিমদিক থেকে বৃষ্টির ছাট এসে আমার জানালার কাঁচের উপর আছড়ে পড়ছে। গল্‌ফ্‌ খেলার কোন প্রশ্নই ওঠে না; যদিও বিকেলের দিকে ঝড়ের বেগ কিছুটা কমল, তবু একটানা বৃষ্টি পড়েই চলল। ঘরের ভিতরে বসে বসে হাঁপিয়ে উঠলাম, অপর দু'জন বাইরে পা বাড়াতে কিছুতেই রাজী না হওয়ায় খোলা হাওয়ায় একটু শ্বাস নিতে গায়ে ম্যানিন-টোশ্‌ চাপিয়ে আমি একাই বেড়িয়ে পড়লাম। বেড়াতে বেরিয়ে মাঠের ভিতর-কার কর্দমাক্ত সোজা পথটার বদলে গল্‌ফের মাঠের রাস্তাটা ধরলাম; মনের ইচ্ছা, পরদিন সকালের জন্য হিউ ও আমার দুটো বক্স ঠিক করে রাখব। ধূমপানের ঘরে বসে ছবিওয়ালা পত্রিকাগুলি নিয়ে সময় কাটাতে লাগলাম। পড়ার মধ্যে কতক্ষণ ডুবে ছিলাম মনে নেই, কিন্তু অস্তসূর্যের কিরণ এসে হঠাৎ আমার পাতাটাকে আলোকিত করে দিল; চোখ তুলে তাকিয়ে দেখলাম। বৃষ্টি থেমে গেছে, আর সন্ধ্যা নেমে আসছে দ্রুত পায়ে। তাই আবারও ঘোরা পথে না গিয়ে মাঠের ভিতরকার পথটা ধরেই বাড়ির দিকে

পা বাড়ালাম। সেটাই দিনের মত সূর্যাস্তের শেষ রশ্মি, আর চব্বিশ ঘণ্টা আগের মতই আবার আমি সেতুটা পার হয়ে এগোতে লাগলাম। যতদূর মনে পড়ে, সেই সময় পর্যন্তও সেতুর কথাটা আমি একবারও ভাবি নি, কিন্তু কাল রাতে সেখানে যে আলোটাকে হঠাৎ নিভে যেতে দেখেছিলাম সেই কথাটা চকিতে মনে পড়ে গেল, আর সেইমুহূর্তে আমার মনে দুর্জয় প্রত্যয় জাগল যে ঐ কুটিরে মানুষ বাস করছে। এই কথাগুলি ভাববার সঙ্গে সঙ্গেই সেদিকে তাকিয়ে দেখলাম, দরজার পাশে একটি মনুষ্য মূর্তি দাঁড়িয়ে আছে। গোধূলির আলোয় মুখটা চিনতে পারলাম না। শুধু এইটুকু বুঝলাম যে লোকটি দীর্ঘকায়, মজবুত গড়ন। সে দরজাটা খুলল, ভিতর থেকে বাতির একটা আবছা আলো বেরিয়ে এল ; ঘরে ঢুকে সে দরজাটা বন্ধ করে দিল।

তাহলে আমার ধারণাই ঠিক। অথচ আমাকে পরিষ্কার বলা হয়েছে যে কুটিরটা খালি : তাহলে যেন বাড়িতেই ফিরেছে এমনভাবে কে ভিতরে ঢুকল ? আর একবার, এবার ঈষৎ ভয়ের সঙ্গেই, দরজায় টোকা দিলাম, মনের ইচ্ছা দু'একটা সাধারণ প্রশ্ন করব , আবার টোকা দিলাম, এবার বেশ জোরে, যাতে আমার ডাক না শোনার কোন প্রশ্নই উঠতে না পারে। কিন্তু তথাপি কোন জবাব না আসায় শেষ পর্যন্ত দরজায় হাতলটা লক্ষ্য করলাম। সেটা তালাবন্ধ। তারপর অনেক কষ্টে ক্রমবর্ধমান ভয়কে সংযত করে কুটিরের চারদিকটা ঘুরলাম। প্রতিটি খোলা জানালা দিয়ে ভিতরে উঁকি দিলাম। ভিতরে সব অন্ধকার, অথচ দু'মিনিট আগে খোলা দরজা দিয়ে একঝলক আলো বেড়িয়ে আসতে দেখেছি।

যেহেতু আমার মনের মধ্যে অনেকরকম অনুমান গড়ে উঠছিল তাই এই বিচিত্র অভিযানের কথা কাউকে বললাম না। ডিনারের পরে হিউর প্রতিবাদের মধ্যেই মার্গারেট সেই প্ল্যাঞ্চেটটা বের করল যেটা অনবরত "মালী" কথাটা লিখে যাচ্ছে। আমার অনুমানটা অবশ্য খুবই অদ্ভুত, কিন্তু মার্গারেটকে কোনরকম ইঙ্গিত করতে আমি চাইলাম না···অনেকক্ষণ যাবৎ পেন্সিলটা তার কাগজের উপর নড়েচড়ে কতকগুলি ফাঁস, বাঁকা রেখা ও আবহাওয়ার চার্টের মত উঁচু-নীচু চড়াই এঁকে চলল, আর এই পরীক্ষা চালাতে চালাতে কোন সুসংবদ্ধ শব্দ গড়ে ওঠার আগেই ক্লান্তিতে হাই তুলতে তুলতে মার্গারেটের মাথাটা সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ল , মনে হল সে বুঝি ঘুমিয়েই পড়েছে।

বই থেকে মুখ তুলে হিউ আমার কানে কানে বলল, "কালও এইভাবেই ঘুমিয়ে পড়েছিল।"

মার্গারেটের চোখ বুজে এল, ঘুমন্ত মানুষের মত নিঃশ্বাস পড়তে লাগল, তারপর আশ্চর্য দৃঢ়তার সঙ্গে তার হাতটা নড়তে লাগল। মস্ত বড় কাগজখানার উপর সোজা এক পংক্তি লেখা হয়ে গেল ; একেবারে শেষে

গিয়ে তার হাতটা একটা ঝাঁকুনি খেয়ে থেমে গেল ; সে জেগে উঠল।

কাগজটার দিকে তাকাল।

বলল, "হ্যালো! তোমাদের মধ্যে একজন আমার সঙ্গে চালাকি করেছ!"

সেটা যে সত্যি নয় সেকথা তাকে বোঝালাম ; যা লিখেছে সেটা সে পড়ল।

লেখাটা এইরকম : "মালী, মালী, আমিই মালী। আমি ভিতরে আসতে চাই। তাকে এখানে দেখতে পাচ্ছি না।'

"হায় প্রভু, আবার সেই মালী!" হিউ বলল।

কাগজ থেকে চোখ তুলে দেখলাম, মার্গারেটের দুই চোখ আমার উপর স্থিরনিবদ্ধ ; সেকথা বলার আগেই আমি তার মনের কথা বুঝতে পারলাম।

"আপনি কি খালি কুটিরটার পাশ দিয়ে বাড়ি এসেছিলেন ?" মার্গারেট প্রশ্ন করল।

সে নীচু গলায় বলল, "এখনও খালি আছে? অথবা—অথবা অন্য কিছু ?"

আমি সত্যি যা দেখেছি—অথবা দেখেছি বলে আমার ধারণা—সেটা তাকে বলতে চাইলাম না। যদি অদ্ভুত কিছু, দেখার যোগ্য কিছু ঘটে, সেক্ষেত্রে আমাদের নিজ নিজ ধারণা যাতে পরস্পরকে সমর্থন না করে সেটাই তো ভাল।

বললাম, "আবার টোকা দিয়েছিলাম, কিন্তু কোন জবাব পাই নি।"

ইতিমধ্যে শুতে যাবার প্রস্তাব হল : মার্গারেটই কথাটা তুলল ; সে উপরে চলে যাবার পরে হিউ ও আমি আবহাওয়ার খোঁজ করতে সামনের দরজায় গেলাম। পরিষ্কার আকাশে চাঁদ উঠেছে, আমরা বাড়ির সামনেকার ঘাসে ঢাকা পথ ধরে হাঁটতে লাগলাম। হঠাৎ দ্রুত ঘুরে গিয়ে হিউ বাড়ির কোণের দিকে আঙুল তুলে বলল, "ওটা কে ? দেখ। ওখানে! ঐ তো মোড়টা ঘুরে গেল।"

শক্ত-সমর্থ গড়নের একটি ঢ্যাঙা লোককে মুহূর্তের জন্য দেখতে পেলাম।

হিউ শুধাল, "দেখতে পাও নি ? আমি ঘুরে যাচ্ছি, ওকে ধরতেই হবে। রাতের বেলায় কেউ আমাদের চারধারে ঘোরাঘুরি করবে সেটা আমি চাই না। তুমি এখানেই অপেক্ষা কর, লোকটি যদি ওদিক থেকে ঘুরে এখানে আসে তো সে কি জন্যে এসেছে জিজ্ঞাসা করো।"

হিউ চলে গেল ; সামনের খোলা দরজাটার কাছেই আমি অপেক্ষা করতে লাগলাম। সে সবে দৃষ্টির বাইরে চলে গেছে এমন সময় দ্রুত অথচ ভারী পায়ের শব্দ স্পষ্ট শুনতে পেলাম ; উল্টোদিক থেকে সে শব্দ আমার দিকেই এগিয়ে আসছে। কিন্তু কাউকেই দেখা গেল না। অদৃশ্য পায়ের শব্দ ক্রমেই এগিয়ে আসতে লাগল। তারপরই আমি আতংকে কেঁপে উঠলাম, মনে হল

অদৃশ্য কেউ আমাকে ধাক্কা দিয়ে চৌকাঠ পার হয়ে গেল। কেঁপে উঠলাম—ভূতের ভয়ে নয়, কারণ আমার হাতে তার বরফ-ঠাণ্ডা ছোঁয়া আমি অনুভব করেছি। অদৃশ্য অতিথিটিকে ধরতে চেষ্টা করলাম, কিন্তু সে পিছনে চলে গেল। আর পরমুহূর্তেই ভিতরকার মেঝের কার্পেটের উপর পায়ের শব্দ শুনতে



পেলাম। ভিতরকার একটা দরজা খুলেই বন্ধ হয়ে গেল, তারপর আর কোন শব্দ শুনতে পেলাম না। পরমুহূর্তেই যেদিক থেকে পায়ের শব্দ এসেছিল বাড়ির সেই কোণের দিক থেকে হিউ ছুটতে ছুটতে এল।

জানতে চাইল, "কিন্তু সে কোথায়? আমার থেকে বিশ গজের বেশী দূরে তো ছিল না—একটি বড়, ঢ্যাঙা লোক।"

আমি বললাম, "কাউকে দেখতে পাই নি। রাস্তায় তার পায়ের শব্দ শুনেছি, কিন্তু কিছুই দেখতে পাই নি।"

"তারপর?" হিউ শুধাল।

বললাম, "সে যেই হোক আমাকে ঠেলে বাড়ির ভিতর ঢুকেছে।"

ওক কাঠের সিঁড়িতে পায়ের শব্দ হয় নি। বাড়ির একতলার এঘর থেকে ওঘর আমরা অনেক খুঁজলাম। খাবার ঘর ও ধূমপানের ঘরের দরজা তালা-বন্ধ, বৈঠকখানা ঘরে ঢুকবার দরজাটা খোলা; একমাত্র যে দরজাটা দেখলে খুলে আবার বন্ধ করা হয়েছে বলে মনে হতে পারে সেটা হল রান্নাঘর ও চাকরদের ঘরে যাবার দরজা। সেখানে খোঁজ করেও কোন ফল হল না; রান্নাঘর, বাসন মাজার ঘর, জুতোর ঘর, চাকরদের—সর্বত্র খোঁজ করা হল, কেউ কোথাও নেই, সব ফাঁকা। আগুনের পাশে একটা দোলনা-চেয়ার পাতা.

আছে; সেটা তখনও দুলছে, যেন কেউ সেটাতে বসেছিল, এইমাত্র উঠে গেছে। চেয়ারটা ধীরে ধীরে দুলছে, মনে হচ্ছে কেউ সেখানে আছে, কিন্তু এখন অদৃশ্য। মনে পড়ছে, এগিয়ে গিয়ে সেটাকে থামিয়ে দিতে চেয়েছিলাম, কিন্তু আমার হাতটাই যেন সেদিকে যেতে চাইল না।

যা দেখেছিলাম, এবং বিশেষ করে যা দেখতে পাই নি, অধিকাংশ মানুষের ঘুম কেড়ে নেবার পক্ষে সেটাই যথেষ্ট, আর নিশ্চয়ই আমি খুব শক্ত মনের লোক নই। খোলা চোখে ও খোলা কানে অনেকক্ষণ বিছানায় শুয়েছিলাম; তারপর একসময় যখন ঘুমের কোলে ঢলে পড়লাম তখন ঘরের মধ্যে সঞ্চরমান একটি মানুষের অস্পষ্ট অথচ অভ্রান্ত শব্দ আমাকে ঘুমের দেশের সীমান্ত থেকে তুলে নিয়ে এল। আমার মনে হল, হিউ হয়তো একা একাই খোঁজ করতে এসেছে, আর এগুলো তারই পায়ের শব্দ, কিন্তু তখনই আমাদের দুই ঘরের মাঝখানের দরজায় একটা টোকার শব্দ হল, আর আমার প্রশ্নের জবাবে মনে হল যে আমিই এখন অস্বস্তির সঙ্গে কথা বলছি কি না জানবার জন্যই হিউ এসেছে। আমরা যখন কথা বলছি তখনই পায়ের শব্দটা আমার দরজাটা পার হয়ে গেল, এবং উপরে যাবার সিঁড়িতে মচমচ শব্দ শোনা গেল। পরমুহূর্তেই ছাদের কোন ঘরে আমাদের ঠিক মাথার উপরে পায়ের শব্দ হতে লাগল।

হিউ বলল, "ওখানে তো চাকরদের শোবার ঘর নয়। ওখানে কেউ ঘুমোয় না। চল তো, দেখে আসি : নিশ্চয় কেউ এসেছে।"

মোমবাতি জ্বালিয়ে পা টিপে টিপে উপরে উঠতে লাগলাম। আর যেই একেবারে উপরের সিঁড়িটায় পা দিয়েছি অমনি আমার ঠিক এক পা আগে থেকে কিন্তু হঠাৎ তীক্ষ্ণ গলায় কথা বলে উঠল।

"কিন্তু কে যেন আমার পাশ দিয়ে চলে গেল!" বলেই সে বাতাসকেই আঁকড়ে ধরল। আমারও সেই একই অনুভূতি হল, আর পরমুহূর্তেই আমাদের নীচের দিককার সিঁড়িতে মচ্‌মচ্‌ শব্দ উঠল; অদৃশ্য মানুষটি নেমে গেল।

সারারাত ধরে সেই পায়ের শব্দ বারান্দায় ঘুরে বেড়াতে লাগল, কেউ যেন সারাবাড়িটা খুঁজে ফিরছে। শুয়ে শুয়ে সেই শব্দ শুনতে শুনতে মার্গারেটের আঙুল থেকে প্ল্যাঞ্চেটের পেন্সিলের মুখে যেকথা লেখা হয়েছিল সেটা আমার মনে পড়ে গেল। "আমি ভিতরে যেতে চাই। তাকে এখানে দেখতে পাচ্ছি না।"...সত্যি, কেউ একজন এসেছে, সর্বত্র খোঁজ করছে। মনে হতে পারে, তাহলে তো সেই মালী। কিন্তু অদৃশ্য অনুসন্ধানকারী এ কোন্ মালী, আর কাকেই বা সে খুঁজছে?

কোন শারীরিক ব্যথা সেরে গেলে যেমন ব্যথাটা ঠিক কি রকম ছিল সেটা মনে করা বেশ শক্ত, ঠিক সেইরকম পরদিন সকালে পোশাক পরতে

পরতে গতকালের নৈশ অভিযানের সঙ্গে যুক্ত প্রেতাত্মার ভয়ের ব্যাপারটাকে অনেক চেষ্টা করেও সঠিকভাবে মনে করতে পারলাম না। শুধু মনে আছে, আবার রাতে দোল্না-চেয়ারটাকে দুলতে দেখে এবং বাইরের সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শুনে আমার ভিতরটা কেমন যেন দুর্বল হয়ে পড়েছিল, এবং আমার গায়ে যে অদৃশ্য ছোঁয়া লেগেছিল তাতেই বুঝেছিলাম যে একজন কেউ বাড়িতে ঢুকেছিল। কিন্তু এখন এই সুন্দর, শান্ত সকালে, শীতের সূর্যস্নাত সারাটা দিনমানে কিছুতেই বুঝতে পারছি না সেটা কি ঘটেছিল। শারীরিক ব্যথার মতই সেটা উপস্থিত থাকলেই তবেই তাকে বোঝা যেত, কিন্তু সারাটা দিন সে তো অনুপস্থিত। হিউয়েরও সেই একই অবস্থা, বরং ব্যাপারটা নিয়ে সে হাসি-ঠাট্টাই শুরু করে দিল।

বলল, "দেখ, সে যেই হোক, আর যাকেই খুঁজুক, সে কিন্তু দেখতে ভাল। ভাল কথা, মার্গারেটকে কিন্তু একটি কথাও বলো না। এই চেয়ারের দুলুনি বা আবির্ভাবের কথা সে কিছুই শোনে নি। আর যাই হোক, সে কিছুতেই মালী নয়; কে কবে শুনেছে যে মালী সারাক্ষণ বাড়িময় ঘুরে বেড়ায়?"

সেদিন বিকেলে মার্গারেট গাড়ি নিয়ে তার কোন বন্ধুর বাড়ি চা খেতে গিয়েছিল; ফলে হিউ ও আমি খেলার শেষে ক্লাব-হাউসেই কিছু খেয়ে নিলাম, আর পরপর এই তৃতীয় দিন চুনকাম-করা কুটিরের পাশ দিয়ে বাড়ি ফিরলাম। কিন্তু আজ রাতে কেউ সেখানে আছে বলে মনে হল না; কুটিরটা ভয়ানক নির্জন, ভাড়াটেবিহীন খালি বাড়ি যেরকম হয়ে থাকে, জানালা দিয়ে কোন আলো অথবা আলোর মত কিছুও দেখা গেল না। হিউকে আমার অভিজ্ঞতার কথা বলায় সে তাকেও রাতের স্মৃতির মতই হেসে উড়িয়ে দিল; বাড়ির দরজায় যখন পৌঁছে গেল তখনও সে ব্যাপারটা নিয়ে ইয়ার্কি করেই চলেছে।

বলল, "আরে বাবা, এও একধরনের মনের রোগ। মাথায় ঠাণ্ডা লাগাবার মত। আরে, দরজা যে তালাবন্ধ!"

সে কড়া নাড়ল, দরজায় টোকা দিল, ভিতর থেকে চাবি ঘোরানো ও হুড়কো তোলার শব্দ এল।

যে চাকরটি দরজা খুলে দিল তাকে হিউ শুধাল, "দরজায় তালা কেন?"

"লোকটি এক পা থেকে অপর পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াল। বলল, "আধ ঘণ্টা আগে ঘণ্টা বেজেছিল স্যার; তা শুনে এসে দেখি একটি লোক বাইরে দাঁড়িয়ে আছে, আর—"

"আচ্ছা?" হিউ বলল।

"তার চাউনি আমার ভাল লাগে নি স্যার; তার কি কাজ জানতে চাইলাম। তিনি কিছুই বললেন না, আর তার পরেই চটপট সরে পড়লেন; আর তাকে দেখতে পেলাম না"

আমার দিকে তাকিয়ে হিউ শুধাল, "তিনি কোন্‌দিকে গেলেন বলে মনে হল ?"

"ঠিক বলতে পারব না স্যার। ঠিক চলে গেলেন বলে মনে হল না। কেউ যেন আমার পাশ দিয়ে ছিটকে বেরিয়ে গেল।"

"ঠিক আছে," হিউ শক্ত গলায় বলল।

মার্গারেট তখনও বাড়ি ফেরে নি। একটু পরেই যখন তার মটরের চাকার শব্দ শোনা গেল তখন হিউ আর একবার আমাকে স্মরণ করিয়ে দিল যে আমাদের অভিজ্ঞতার কথা যেন কিছুই তাকে না বলা হয় ; ইতিমধ্যেই তো সে অভিজ্ঞতার একজন তৃতীয় অংশীদার জুটেছে। চোখে-মুখে প্রচুর উত্তেজনা নিয়ে মার্গারেট ঘরে ঢুকল।

বলল, "আমার প্ল্যাঞ্চেট নিয়ে আর কখনও হাসবে না। মড অ্যাশ্‌-ফিল্ডের মুখে একটা অসাধারণ গল্প শুনে এলাম—ভয়ঙ্কর, কিন্তু কি নিদারুণ-ভাবে আকর্ষণীয়।"

"ওসব কথা থাক," হিউ বলল।

"শোন, এখানে একজন মালী ছিল। পায-চলা সেতুটার পাশের ঐ ছোট কুটিরটায় সে থাকত ; পরিবারের লোকজন যখন লণ্ডন চলে যেত, তখন সে আর তার স্ত্রী বাড়িটার দেখাশুনা করত আর এখানে থাকত।"

হিউয়ের সঙ্গে আমার দৃষ্টি-বিনিময় হল, তারপর সে চলে গেল। তখন আমি যা ভেবেছি সেও যে ঠিক তাই ভেবেছে এ-কথা আমি হলফ করে বলতে পারি।

মার্গারেট বলতে লাগল, "বিয়ে করেছিল নিজের চাইতে অনেক কম বয়সের একটি মেয়েকে, ধীরে ধীরে সে স্ত্রীর প্রতি ভয়ানক ঈর্ষাকাতর হয়ে উঠল। একদিন রাগের মাথায় নিজের হাতে স্ত্রীকে গলা টিপে মেরে ফেলল। কিছুক্ষণ পরে একজন কুটিরে এসে দেখল সে স্ত্রীকে ধরে কাঁদছে, তাকে বাঁচাতে চেষ্টা করছে। সকলে পুলিশ ডাকতে গেল, কিন্তু তারা আসার আগেই সে নিজের গলা কেটে ফেলল। কী ভয়ংকর, তাই না ? কিন্তু এটাও তো অবাক ব্যাপার যে প্ল্যাঞ্চেট বলে, 'মালী। আমি মালী। আমি মালী। আমি ভিতরে আসতে চাই। এখানে তাকে খুঁজে পাচ্ছি না।' জানেন, এসব কিছুই আমি জানতাম না। আজ রাতে আবার প্ল্যাঞ্চেটে বসব। আরে, আধ ঘণ্টার মধ্যেই তো ডাক চলে যাবে, আর আমাকে তো একগাদা চিঠিপত্র পাঠাতে হবে। কিন্তু হিউ, ভবিষ্যতে আমার প্ল্যাঞ্চেটকে সম্মান দিয়ে চলো।"

মার্গারেট চলে গেলে আমরা ব্যাপারটা নিয়ে কথা বললাম ; নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিশ্বাস করলেও হিউ কিন্তু এই "প্ল্যাঞ্চেটের বুজরুকি"র পিছনে

ঘটনার আকস্মিক যোগাযোগ ছাড়া অন্য কিছু স্বীকার করতে চাইল না। কিন্তু তবু সে আবারও বলল, "গত রাতে এই বাড়িতে আমরা যা শুনেছি ও দেখেছি, এবং আজ সন্ধ্যায়ই পুনরায় যে বিচিত্র অতিথিটি এসেছিল তার কথা যেন মার্গারেটকে কিছুই বলা না হয়।"

সে বলল, "সে বেচারি ভয় পাবে, আর আজেবাজে কল্পনা করতে শুরু করবে। আর প্ল্যাকেটের কথা, ওতে হিজিবিজি লেখা ও ফাঁস আঁকা ছাড়া আর কিছুই হবে না। ওটা কি ?—হ্যাঁ ; ভিতরে আসুন !"

ঘরের ভিতর কোন এক জায়গা থেকে একটা তীক্ষ্ণ, দৃঢ় ঠোকরের শব্দ এল। শব্দটা দরজার কাছ থেকে এল বলে আমার মনে হল না, কিন্তু হিউ যখন দেখল যে তার আসতে বলার জবাবে কেউ সাড়া দিল না তখন সে লাফিয়ে গিয়ে দরজাটা খুলে ফেলল। বাইরের হল ঘরে কয়েক পা গিয়েই ফিরে এল।

"শুনতে পাচ্ছ না ?" সে শুধাল।

"পাচ্ছি। ওখানে কেউ নেই ?"

"একটি প্রাণীও না।"

হিউ অগ্নিকুণ্ডের কাছে ফিরে এল, বিরক্তির সঙ্গে সদ্য ধরানো সিগারেটটা আগুনের মধ্যে ছুঁড়ে দিল।

বলল, "শব্দটা কী বিশ্রী। যদি জানতে চাও আমি আরাম বোধ করছি কি না তাহলে তোমাকে বলি, এর চাইতে কম আরাম আমি জীবনে কখনও পাইনি। যদি জানতে চাও তো বলি, আমি ভয় পেয়েছি, আর আমার বিশ্বাস তুমিও ভয় পেয়েছ।"

একথা অস্বীকার করার তিলমাত্র ইচ্ছা আমার ছিল না ; সে আবার বলতে লাগল।

"আমাদের খুব সংযত হয়ে চলতে হবে। ভয়ের মত সংক্রামক আর কিছু নেই। আমাদের কাছ থেকে ভয় যেন মার্গারেটকে না ধরে। কিন্তু তুমি তো জান, আমাদের ভয়ের চাইতেও বড় কিছু আছে। একটা কিছু এ বাড়িতে ঢুকেছে, আর আমরাও তার পিছনে লেগেছি। আগে কখনও আমি এসব জিনিসে বিশ্বাস করতাম না। এক মিনিটের জন্য এটার মুখোমুখি হওয়া যাক। আসলে এটা কি ?"

আমি বললাম, "আমি এটাকে কি মনে করি যদি জানতে চাও তো বলি, আমি বিশ্বাস করি যে-লোকটি স্ত্রীকে গলা টিপে মেরে ফেলে তারপর নিজের গলা কেটেছিল, এটা তারই আত্মা। কিন্তু এটা আমাদের কেমন করে আঘাত করতে পারে তা আমি বুঝি না। আসলে নিজেদের ভয়কেই আমরা ভয় করছি।"

হিউ বলল, "কিন্তু আমরা তো এর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছি। তাহলে এ কি

করবে ? হে ঈশ্বর, শুধু যদি জানতাম এ কি করবে, তাহলে তো কোন কথাই থাকত না। কিন্তু এই যে না জানা…আরে, পোশাক পরার সময় হয়ে গেছে।”

ডিনারের সময় মার্গারেটের মন-মেজাজ খুবই ভাল ছিল। গত চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে যেসব আবির্ভাব ঘটেছে তার কিছুই জানে না বলে তার প্ল্যাঞ্চেট মালীর সম্পর্কে যে “অনুমান” (ভাষাটা তারই) করেছে সেই চিন্তায়ই সে মসগুল হয়ে আছে; সেই আলোচনা থেকেই সে বিষয় পরিবর্তন করে একটা নতুন ধরনের তিনজনে মজার পেশেন্স খেলার কথা বলতে লাগল; খেলাটা সে তার বন্ধুর কাছ থেকে শিখে এসেছে, এবং তাকে কথা দিয়েছে যে ডিনারের পরে আমাদের দুজনকেও শিখিয়ে দেবে। তাই সে করল; আর আমরা দুজনই যে প্ল্যাঞ্চেটকে এড়িয়ে যেতেই চাইছি সেটা না জেনেই সে খেলা নিয়ে মেতে উঠল। কিন্তু হঠাৎ তার খেয়াল হল যে রাত অনেক হয়ে গেছে; তাড়াতাড়ি সে সব তাস গুটিয়ে ফেলল।

বলল, “এবার আধ ঘণ্টার জন্য প্ল্যাঞ্চেটে বসা যাক।”

হিউ বলল, “আহা, আরও একটা হাত কি খেলা যায় না ? অনেকদিন পরে একটা ভাল খেলা দেখলাম। এ খেলার পরে প্ল্যাঞ্চেট একেবারেই জমবে না।”

মার্গারেট বলল, “লক্ষীটি, মালীটি যদি আবার ধরা দেয়, তাহলে বেশ জমবে।”

“কিন্তু এসব তো প্রলাপ,” হিউ বলল।

“তুমি এত কঠোর ! তাহলে বই পড় গে।”

হিউ উঠে পড়ল। মার্গারেটও ততক্ষণে তার যন্ত্র ও একতা কাগজ বের করে ফেলেছে।

হিউ বলল, “মার্গারেট, আজ রাতে দয়া করে প্ল্যাঞ্চেটে বসো না।”

“কিন্তু কেন ? তোমার তো থাকার দরকার নেই।”

“দেখ, তবু বলছি, আজ ওটা থাক,” হিউ বলল।

মার্গারেট তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে তাকাল।

বলল, “হিউ, তোমার মনে যেন কিছু আছে। সেটা ঝেড়ে ফেল। মনে হচ্ছে তুমি ভয় পেয়েছ। ভাবছ, এরমধ্যে রহস্যময় কিছু আছে। সেটা কি ?”

বুঝতে পারলাম, কথাটা বলবে কি বলবে না তাই নিয়ে হিউ ইতস্তত করছে। কিন্তু প্ল্যাঞ্চেটে কিছু হিজিবিজি লেখা হোক এটাই সে শেষ পর্যন্ত বেছে নিল।

বলল, “বেশ, তাহলে শুরু করে দাও।”

মার্গারেট ইতস্তত করতে লাগল; হিউকে বিরক্ত করতে সেও চায় না। কিন্তু হিউয়ের এই পীড়াপীড়ি তার কাছে খুবই যুক্তিহীন বলে মনে হচ্ছে।

বলল, "বেশ, ঠিক দশ মিনিট ; কথা দিচ্ছি, মালীদের কথা মোটেই ভাবব না।"

বোর্ডের উপর হাত রাখা মাত্রই মার্গারেটের মাথাটা সামনে ঝুলে পড়ল, আর যন্ত্রটা চলতে শুরু করল। আমি তার খুব কাছেই বসেছিলাম ; সেটা কাগজের উপর ঘুরতে লাগল আর লেখাটা পরিষ্কার ফুটে উঠল।

লেখা হল : "আমি ভিতরে এসেছি, কিন্তু তবু তাকে খুঁজে পাচ্ছি না। তোমরা কি তাকে লুকিয়ে রেখেছ ? তোমরা যেখানে আছ সে ঘরটা আমি খুঁজে দেখব।"

আরও কি লেখা প্ল্যাঞ্চেটের তলায় চাপা পড়েছিল তা আমি জানি না, কারণ সেই মুহূর্তে একটা বরফ-ঠাণ্ডা বাতাসের স্রোত ঘরের মধ্যে বয়ে গেল, আর প্রচণ্ড জোরে দরজায় একটা ধাক্কা পড়ল। এবার আর ভুল হবার কোন সুযোগ নেই। হিউ লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল।

বলল, "মার্গারেট, জাগ , কি যেন আসছে।"

দরজাটা খুলে গেল , একটি মনুষ্য মূর্তি দেখা দিল। ঠিক দরজায় দাঁড়িয়ে সে মাথাটাকে সামনে গলিয়ে এদিক ওদিকে নাড়তে লাগল , মনে হল, দুটি চোখের একাগ্র ও একান্ত বিষণ্ণ দৃষ্টি দিয়ে সে ঘরের প্রতিটি কোণ খুঁজে ফিরছে।

হিউ আবার চেঁচিয়ে ডাকল, "মার্গারেট, মার্গারেট।"

কিন্তু মার্গারেটের চোখ দুটিও বিস্ফারিত , এই ভয়ংকর অতিথির উপর স্থিরনিবদ্ধ।

মার্গারেট উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে চাপা গলায় বলল, "শান্ত হও হিউ।" ভূতটি এখন সরাসরি তারদিকেই তাকিয়ে আছে। মরচে-রঙের পুরু দাঁড়ির উপরকার ঠোঁটটা একবার মাত্র নড়ল, কিন্তু কোন শব্দ বের হল না , শুধু মুখটা নড়ল, আর লালা গড়িয়ে পড়ল। ভূতটা মাথা তুলল, আর—ত্রাসের উপর ত্রাস—আমি দেখলাম তার গলার একটা দিকে একটা লাল, চকচকে ঘা হাঁ করে আছে ·

তিনজনই অনড়, জমাট হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম ; একটা মারাত্মক নিশ্চলতা আমাদের না দিল নড়তে, না দিল কথা বলতে। এ অবস্থায় কতক্ষণ ছিলাম জানি না ; মনে হয় খুব বেশী হলে দশ সেকেণ্ড। তারপরই অপচ্ছায়াটা ঘুরে দাঁড়াল, যেমন এসেছিল তেমনই চলে গেল। কার্পেট-পাতা মেঝের উপর দিয়ে তার চলমান পায়ের শব্দ শুনতে পেলাম ; সামনের দরজার হুড়কো খোলার শব্দ হল, আর বাড়ি-কাঁপানো শব্দ করে দরজাটা আবার বন্ধ হয়ে গেল।

"সব শেষ হয়ে গেল," মার্গারেট বলল। "ঈশ্বর আমাদের প্রতি করুণা করুন।"

মৃত্যুর দেশ থেকে এই আবির্ভাবের যেকোন ব্যাখ্যা পাঠকরা খুশিমত করতে পারেন। এটাকে যে মৃত্যুর দেশ থেকে আবির্ভাব বলেই মনে করতে হবে তারও কোন কথা নেই। তিনি একথাও বলতে পারেন, যেখানে এই হত্যা.ও আত্মহত্যার ঘটনা ঘটেছিল সেখানে এমন কোন আবেগদীপ্ত প্রমাণ রয়ে গেছে যেটা কোন বিশেষ পরিবেশে দৃশ্য ও অদৃশ্য মূর্তিতে রূপান্তরিত হতে পারে। ইথারের ঢেউ, অথবা অন্য অনেক কিছুই, এ ধরনের দৃশ্যের ছাপ ধরে রাখতে পারে; সমস্যার সমাধানের জন্য এও বলা যায় যে সেইসব ছাপ যেকোন সময়েই বাস্তবে রূপান্তরিত হবার যোগ্য। অথবা পাঠক একথাও বলতে পারেন যে মৃত মানুষটির আত্মা সত্যি সত্যি আত্মপ্রকাশ করেছিল; যেস্থানে যে অপরাধটি করেছিল আত্মিক প্রায়শ্চিত্ত ও অনুশোচনার জন্য সেখানেই ফিরে এসেছিল। স্বভাবতই কোন বস্তুবাদীই মুহূর্তের জন্যও এই ব্যাখ্যাকে মেনে নেবেন না; আবার একজন বস্তুবাদীর মত একগুঁয়ে যুক্তিহীন মানুষও তো দ্বিতীয়টি নেই। একটা ভয়ংকর ঘটনা যে সেখানে ঘটেছিল সেটা তো সন্দেহের অতীত, আর মার্গারেটের শেষ উক্তিটিও অপ্রাসঙ্গিক নয়।

The Gardener—Edward Fredrick Benson

লাল ঘর

বললাম, "আমি আপনাকে নিশ্চিত করেই বলতে পারি, ভূতটা একেবারে আমার সামনে এসে না দাঁড়ালে আমাকে ভয় দেখাতে পারবে না।" গ্লাসটা হাতে নিয়ে অগ্নিকুণ্ডের পাশে দাঁড়ালাম।

"বিশ্বাস করা না করা তোমার ইচ্ছা," শুষ্ক, বিশীর্ণ হাতওয়ালা লোকটি বলল, তারপর আমার দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল।

আমি বললাম, "আটাশ বছর আমি বেঁচে আছি, কিন্তু আজ পর্যন্ত একটা ভূতও দেখি নি।"

ম্লান চোখ দুটি মেলে বৃদ্ধাটি অগ্নিকুণ্ডের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল। সে বলে উঠল, "বটে; তুমি আটাশ বছর বেঁচে আছ, অথচ এরকম আর একটা বাড়িও তো কখনও দেখ নি। মাত্র আটাশ বছর বয়সে মানুষের অনেক কিছু দেখা বাকি থাকে।" বুড়ি ধীরে ধীরে মাথাটা নাড়তে লাগল। "আরও অনেক কিছু দেখতে হবে, অনেক দুঃখ পেতে হবে।"

আমার মনে কিছুটা সন্দেহ জাগল যে বারবার একই কথা বলে বুড়ো-

বুড়ি তাদের বাড়ির ভৌতিক সন্ত্রাশটাকে বাড়িয়ে তুলতে চেষ্টা করছে। খালি গ্লাসটা টেবিলের উপর নামিয়ে রেখে ঘরের চারদিকে তাকালাম; শেষ প্রান্তে রাখা একটা অদ্ভুত পুরনো আয়নার মধ্যে আমার একটা অসম্ভব ছোট ও মোটা ছবি দেখতে পেলাম। বললাম, "বেশ তো, আজ রাতে যদি কিছু দেখি তাহলে তো আমার জ্ঞানই বাড়বে। কারণ খোলা মন নিয়েই আমি এসেছি।"

বিশীর্ণ হাতওয়ালা লোকটি আবার বলল, "সেটা তোমার ইচ্ছা।"

বাইরের বারান্দার টালির উপর একটা লাঠি ও লেঙচে চলা পায়ের শব্দ শুনতে পেলাম; কজার ক্যাঁচ-কাঁচ শব্দ করে দ্বিতীয় বৃদ্ধ ঘরে ঢুকল; এ লোকটি আগের বুড়োটির চাইতেও বেঁকে গেছে, চামড়া আরও কুঁচকে গেছে, বয়স আরও বেশী। একটি মাত্র ক্রাচে সে ভর দিয়ে আছে, চোখ দুটো একটা আবরণ দিয়ে ঢাকা, ক্ষয়ে যাওয়া হলদে দাঁতের নীচ থেকে বিবর্ণ, লালচে নীচের ঠোঁটটা অর্ধেক ঝুলে পড়েছে। টেবিলের উল্টো দিকের হাতল-চেয়ারটার দিকে সোজা এগিয়ে গিয়ে এলোমেলোভাবে বসে পড়েই কাশতে শুরু করল। বিশীর্ণ হাতওয়ালা লোকটি নবাগতের দিকে যেভাবে তাকাল তাতে তার অসন্তুষ্টিই স্পষ্ট প্রকাশ পেল; বুড়ি তো তার দিকে ফিরেও তাকাল না; একদৃষ্টিতে অগ্নিকুণ্ডের দিকেই তাকিয়ে রইল।

কিছুক্ষণের জন্য কাশিটা থামলে বিশীর্ণ হাতওয়ালা লোকটি বলল, "বলেছি তো—সেটা তোমার ইচ্ছা।"

"সেটা আমার ইচ্ছা," আমি জবাব দিলাম।

এই প্রথম চোখ-ঢাকা লোকটি আমার উপস্থিতি সম্পর্কে সজাগ হল, আমাকে দেখার জন্য মাথাটাকে মুহূর্তের জন্য পিছনে ঠেলে দিয়ে কাৎ করল। চকিতে তার চোখ দুটি দেখতে পেলাম—ক্ষুদে, উজ্জ্বল, যেন জ্বলছে। সে আবার কাশতে কাশতে থুথু ফেলতে লাগল।

বীয়ারটা তার দিকে ঠেলে দিয়ে শুকনো হাতওয়ালা লোকটি বলল, "একটু খেয়ে নাও না।" চোখ-ঢাকা লোকটি কাঁপা হাতে এক গ্লাস ভর্তি বীয়ার ঢালতে গিয়ে আরও অর্ধেকটা টেবিলের উপরেই ফেলে দিল। সে যখন বীয়ার ঢেলে নিয়ে খেতে লাগল তখন তার একটা দানবীক ছায়া দেওয়ালের উপর পড়ে যেন তার মদ ঢেলে খাওয়া কাজটাকেই ঠাট্টা করতে লাগল। স্বীকার করছি, এইসব অদ্ভুত বাসিন্দাদের আমি এখানে আশা করি নি। বার্ধক্যকে আমি কিছুটা অমানবিক বলেই মনে করি; মনে হয় পুরুষানুক্রমিক কোন রোগ যেন ওৎ পেতে আছে; নিজেদের অজ্ঞাতেই দিনের পর দিন বুড়োদের ভিতর থেকে মানবিক গুণগুলি যেন ঝরে পড়তে থাকে। এই তিন মূর্তির নীরবতা, কুব্জ দেহ, আমার প্রতি এবং পরস্পরের প্রতি তাদের অমিত্র-সুলভ আচরণ—সব কিছুতেই আমি অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম।

বললাম, "আপনাদের বাড়ির ভুতুড়ে ঘরটা যদি আমাকে দেখিয়ে দেন তো সেখানে গিয়ে একটু আরাম করতে পারি।"

কেশে বুড়োটি হঠাৎ এমনভাবে মাথাটা পিছনে ঠেলে দিল যে আমি চমকে উঠলাম; ঢাকনার নীচ দিয়ে লাল চোখে সে আবার আমার দিকে তাকাল; কিন্তু কেউ কোন জবাব দিল না। তাদের দিকে পর পর তাকিয়ে মিনিটখানেক অপেক্ষা করলাম।

একটু জোরেই বললাম, "আপনাদের ভুতুড়ে ঘরটা যদি দেখিয়ে দেন তো আমাকে দেখাশুনা করার দয়া থেকে আপনাদের মুক্তি দিতে পারি।"

শুকনো হাতওয়ালা লোকটি বলল, "দরজার বাইরে পাথরের উপর একটা মোমবাতি আছে," বলতে বলতে সে আমার পায়ের দিকে তাকাল। "কিন্তু তুমি যদি আজ রাতে লাল ঘরে যাও—"

("সব রাত ফেলে আজকের রাতেই!" বুড়ি বলল।)

"তোমাকে একলা যেতে হবে।"

"ঠিক আছে," আমি জবাব দিলাম। "কোন্‌দিকে যাব?"

সে বলল, "বারান্দা দিয়ে কিছুটা গেলেই একটা দরজা পাবে, দরজা দিয়ে ঢুকলেই একটা ঘোরানো সিঁড়ি আছে, আর সিঁড়ি দিয়ে অর্ধেকটা উঠলেই একটা চাতাল ও পশমী পর্দায় ঢাকা একটা দরজা আছে। সেখান দিয়ে ঢুকে লম্বা বারান্দা দিয়ে শেষ পর্যন্ত চলে যাবে; সেখান থেকে সিঁড়ি দিয়ে উঠলেই তোমার ডান দিকে লাল ঘর।"

তার নির্দেশের পুনরাবৃত্তি করে বললাম, "ঠিক বলেছি তো?" একটা বিষয়ে বুড়ো আমাকে শুধ্‌রে দিল।

চোখ-ঢাকা লোকটি তৃতীয়বার আমার দিকে তাকিয়ে মুখটাকে অদ্ভুত ও অস্বাভাবিকভাবে কাঁপিয়ে বলল, "তুমি কি সত্যি সত্যি যাচ্ছ?"

("সব রাত ফেলে আজকের রাতেই!" বুড়ি বলল।)

"এইজন্যেই তো আমি এসেছি," বলে দরজার দিকে পা বাড়ালাম। চোখ-ঢাকা বুড়োটি উঠে লেঙ্‌চে লেঙ্‌চে টেবিলটার ওপাশে গিয়ে অন্যদের এবং অগ্নিকুণ্ডের কাছাকাছি দাঁড়াল। দরজার কাছে গিয়ে মুখ ফিরিয়ে তাদের দিকে তাকালাম: আগুনের প্রেক্ষাপটে তিনটি কালো মূর্তি পাশাপাশি দাঁড়িয়ে বার্ধক্যজীর্ণ মুখে একাগ্রভাব ফুটিয়ে আমার দিকেই তাকিয়ে আছে।

দরজাটা খুলে বললাম, "শুভ রাত্রি।"

শুকনো হাতওয়ালা লোকটি বলল, "যেমন তোমার ইচ্ছা।"

মোমবাতিটা ভাল করে জ্বলে ওঠা পর্যন্ত দরজাটা খোলাই রাখলাম, তারপর বন্ধ করে দিয়ে ঠাণ্ডা, প্রতিধ্বনিমুখর বারান্দা দিয়ে হাঁটতে লাগলাম।

স্বীকার করছি, মাননীয়া মহিলাটি এই যে তিন পেন্সনধারী বুড়োবুড়ির

উপর তার দুর্গ-নিবাসের দেখাশুনার ভার দিয়েছেন তাদের অদ্ভুত আচরণ, এবং গাঢ় রঙের পুরনোকালের আসবাবপত্রে ভর্তি যে ঘরটাতে তারা জমায়েত হয়েছিল, সেসব কিছুই আমার উপর বেশকিছুটা প্রভাব বিস্তার করেছিল। তারা যেন অন্য যুগের, প্রাচীনতর যুগের মানুষ; সে যুগে ভৌতিক ব্যাপারগুলো আমাদের একালের চাইতে ভিন্নতর ছিল; যে যুগে মানুষ অলক্ষণ ও ডাইনীতে বিশ্বাস করত, আর ভূতের অস্তিত্ব ছিল অন-স্বীকার্য। তাদের অস্তিত্বই ছিল অপচ্ছায়ার মত; তাদের পোশাকের নমুনা ও ফ্যাশন জন্ম নিত মৃতদের মস্তিষ্ক থেকে। তাদের ঘরের অলংকরণ ও সুযোগ-সুবিধাগুলিও ভৌতিক—সেইসব অদৃশ্য মানুষের চিন্তাপ্রসূত যারা আজকের জগতের অংশীদার না হয়েও তাকে জুড়ে থাকে। কিন্তু অনেক চেষ্টা করে এসব চিন্তাকে আমি মন থেকে সরিয়ে দিলাম। ভূগর্ভস্থ স্যাঁতসেঁতে লম্বা বারান্দাটা ঠাণ্ডা ও ধুলোময়; হাতের মোমবাতির শিখাটা কাঁপছে, আর ছায়াগুলোও দুলছে। ঘোরানো সিঁড়িটার উপর-নীচে প্রতিধ্বনি ঘুরছে; একটা ছায়া পিছন থেকে আমাকে তাড়া করছে, আর একটা ছায়া আমার সামনে থেকে মাথার উপরকার অন্ধকারে পালিয়ে যাচ্ছে। চাতালে পৌঁছে একমুহূর্ত সেখানে দাঁড়ালাম, মনে হল যেন একটা খস্‌খস্‌ শব্দ শুনতে পেলাম; পরে যখন বুঝতে পারলাম যে, চারদিকে পরিপূর্ণ নীরবতা বিরাজ করছে তখন রেশমী পর্দায় ঢাকা দরজাটা খুলে বারান্দায় দাঁড়ালাম।

ফল দাঁড়াল অপ্রত্যাশিত; বড় সিঁড়ির বড় জানালা দিয়ে আসা চাঁদের আলো সবকিছুকে স্পষ্ট কালো ছায়ায় অথবা রূপোলি আলোয় ফুটিয়ে তুলল। সবকিছুই যথাস্থানে সাজানো, আঠারো মাস আগের পরিবর্তে বাড়িটা যেন সবে গতকাল পরিত্যক্ত হয়েছে। শামাদানের গর্তে গর্তে মোমবাতি বসানো রয়েছে, কার্পেটের উপর অথবা পালিশ-করা মেঝের উপর যে ধুলো জমেছে সেটা এতই সমানভাবে সব জায়গায় জমেছে যে চাঁদের আলোয় তা চোখেই পড়ছে না। এগোতে গিয়েও আমি হঠাৎ থেমে গেলাম। চাতালের উপরেই একটা ব্রোঞ্জের ভাস্কর্য রাখা ছিল; দেয়ালের আড়াল পড়ায় আমি সেটা দেখতে পাই নি; কিন্তু তার ছায়াটা এমন আশ্চর্য স্পষ্ট সাদা দেয়ালের উপর পড়েছে যে আমার মনে হল আমাকে আক্রমণ করার জন্য কেউ বুঝি লুকিয়ে ওৎ পেতে আছে। হয় তো আধ মিনিটের জন্য আমি কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম। তারপর পকেটের রিভলবারের উপর হাতটা রেখে কিছুটা এগিয়েই বুঝতে পারলাম, গেনিমিড ও একটি ঈগলের মূর্তি চাঁদের আলোয় চকচক করছে। এই ঘটনায় আমার স্নায়ুর জোর ফিরে এল; আর তাই পরে পিতলের টেবিলের উপর রাখা চীনে মাটির চীনা মূর্তিটার পাশ দিয়ে যাবার সময় তার মাথাটাকে নিঃশব্দে নড়তে দেখেও আমি মোটেই চমকে উঠি নি।

লাল ঘরের দরজা এবং সেখানে উঠবার সিঁড়ি একটা ছায়াচ্ছন্ন কোণে অবস্থিত। দরজাটা খুলবার আগে হাতের মোমবাতিটাকে এদিক-ওদিক ঘুরিয়ে দেখে নিলাম আমি ঠিক কোথায় আছি। মনে হল, এখানেই আমার পূর্ববর্তী আগন্তুককে পাওয়া গিয়েছিল। সেই গল্পটা মনে পড়ায় বুকটা হঠাৎ ভয়ে কেঁপে উঠল, ঘাড় ফিরিয়ে চাঁদের আলোয় গেনিমিডের দিকে তাকালাম, তারপর চাতালের পাণ্ডুর নিস্তব্ধতার দিকে মুখটা অর্ধেক ফিরিয়ে একটু দ্রুত হাতেই লাল ঘরের দরজাটা খুলে ফেললাম।

ঘরে ঢুকে সঙ্গে সঙ্গে দরজাটা বন্ধ করে দিলাম, ভিতরের তালার মধ্যেই চাবিটা পেয়ে সেটাকে ঘুরিয়ে দিলাম, এবং মোমবাতিটাকে তুলে ধরে লোরেন দুর্গের সেই মস্ত বড় লাল ঘরটাকে ভাল করে দেখতে লাগলাম যেখানে তরুণ ডিউকের মৃত্যু হয়েছিল। বরং বলা উচিত, যে ঘরে তার মৃত্যু শুরু হয়েছিল, কারণ সে দরজাটা খুলেছিল এবং যে সিঁড়ি বেয়ে আমি এইমাত্র উঠে এসেছি তার উপর দিয়ে সপাটে গড়িয়ে পড়েছিল। এইভাবেই তার জাগরণের অবসান ঘটেছিল, অবসান ঘটেছিল এখানকার ভূতুড়ে ইতিহাসকে জয় করার দুঃসাহসী প্রচেষ্টার। আমার মনে হল, সন্ন্যাস রোগ আর কখনও বুঝি কুসংস্কারকে এমনভাবে সমর্থন করে নি। এই ঘরকে ঘিরে আরও অনেক পুরনো গল্পও আছে: সেসবের একেবারে শুরুতে আছে একটি অর্ধ-বিশ্বাসযোগ্য কাহিনী—একটি ভীরু স্ত্রীকে ভয় দেখাতে গিয়ে স্বামীর শোচনীয় মৃত্যুর কাহিনী। ছায়াচ্ছন্ন জানালাসমন্বিত মস্ত বড় ঘরটা, তার নানা ফাঁক-ফোকর ও কুলুঙ্গির দিকে তাকালেই এই ঘরটার কালো কালো কোণে ও অন্ধকারের ভিতরে যেসব কাহিনী জন্ম নিয়েছে তার অর্থ পরিষ্কার বোঝা যায়। এই বিরাট ঘরের মধ্যে আমার মোমবাতির আলোক-জিহ্বাটি এতই ছোট যে ঘরের অপর প্রান্ত পর্যন্ত পৌছয় না; তাতে যেটুকু আলোক দ্বীপ গড়ে উঠেছে তার বাইরে রয়েছে রহস্য ও ইঙ্গিতের এক অসীম সমুদ্র।

স্থির করলাম, এই মুহূর্তেই জায়গাটাকে ভাল করে পরীক্ষা করে নেব; এখানকার অস্পষ্টতার সুযোগে যেসব কল্পনার জাল বোনা হয়েছে সেগুলো আমার উপর প্রভাব বিস্তার করার আগেই তাদের মন থেকে মুছে ফেলতে হবে। দরজাটা ঠিক মত বন্ধ আছে কিনা সেটা ভাল করে দেখে নিয়ে ঘরময় হাঁটতে শুরু করলাম, প্রতিটি আসবাবকে খুঁটিয়ে দেখলাম, বিছানা ওল্টালাম, পর্দা সরিয়ে দিলাম। ঘরের মধ্যে দুটো আয়না আছে, প্রত্যেকটিতে একজোড়া করে মোমবাতি বসাবার গর্ত; তাছাড়া তাকের উপর চীনামাটির মোমবাতিদানে আরও অনেকগুলো মোমবাতি। একটা একটা করে সবগুলো মোমবাতি জ্বালিয়ে দিলাম। বুড়ো মানুষটির কাছে অপ্রত্যাশিত হলেও অগ্নিকুণ্ডটা সাজানোই ছিল। যাতে শীতে কাঁপতে না হয় সেজন্য সেটা জ্বালিয়ে দিলাম। আগুনটা ভাল করে জ্বলে উঠলে সেটার

দিকে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে ঘরটাকে আর একবার লক্ষ্য করলাম। ছিট-কাপড়ে ঢাকা হাতল-চেয়ার ও একটা টেবিল টেনে এনে আমার সামনে একটা অবরোধ সৃষ্টি করে রিভলবারটাকে হাতের কাছেই রেখে দিলাম। সবকিছু দেখে নেওয়ার ফল ভালই হল; তবু জায়গাটার দূরবিস্তার অন্ধকার ও পরিপূর্ণ স্তব্ধতাকে নতুন করে কোন কল্পনাকে জাগিয়ে তোলার পক্ষে যথেষ্ট মনে হতে লাগল। নড়াচড়ার শব্দ ও আগুনের ফট্‌ফট্ আওয়াজ আমাকে কোন সান্ত্বনাই দিতে পারল না। বিশেষ করে একেবারে শেষ প্রান্তের কুলুঙ্গির ছায়াটা দেখলেই মনে হয় ওখানে বুঝি কোন বর্ণনাতীত জীবন্ত প্রাণী লুকিয়ে আছে। শেষ পর্যন্ত নিশ্চিন্ত হবার জন্য একটা মোমবাতি হাতে নিয়ে হেঁটে সেখানে গিয়ে তবে বুঝতে পারলাম যে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কোন কিছু সেখানে নেই। মোমবাতিটাকে সেই কুলুঙ্গির ভিতর বসিয়ে রেখে দিলাম।

এর মধ্যেই আমার স্নায়ুর উপর বেশ চাপ পড়তে শুরু করেছে, যদিও তার যথেষ্ট কোন কারণ ছিল না। অবশ্য আমার মনটা বেশ পরিষ্কার ছিল। অসংকোচেই ধরে নিলাম যে অতিপ্রাকৃত কোন কিছুই ঘটবে না; তাই সময় কাটাতে একটা স্থানীয় লোকগাথার সুর বাজাতে লাগলাম। কিছুটা জোর গলায় উচ্চারণও করলাম, কিন্তু তার প্রতিধ্বনিটা ভাল লাগল না। ভূত বা ভূতে-পাওয়া বলে যে কিছু নেই এতক্ষণ পর্যন্ত তা নিযে নিজের মনেই যে-সব কথা বলছিলাম, ওই একই কারণে তাও ছেড়ে দিলাম। মন আবার ফিরে গেল নীচের ঘরের তিনটি বৃদ্ধ, বিকৃত মানুষের চিন্তায়। ঘরের গম্ভীর লাল ও কালো রং আমাকে অস্বস্তিতে ফেলল; সাতটা মোমবাতি থাকা সত্ত্বেও জায়গাটা নেহাৎই আবছা। কুলুঙ্গির মোমবাতিটা বাতাসে কাঁপছে, আর তার ফলে তার চারদিককার ছায়া ও উপচ্ছায়া অনবরত নড়ছে। এ অবস্থার একটি প্রতিকারের কথা ভাবতেই মনে পড়ে গেল যে বারান্দায অনেকগুলি মোমবাতি দেখেছি, সামান্য চেষ্টাতেই একটা মোমবাতি হাতে নিয়ে দরজাটা খোলা রেখে চন্দ্রালোকিত বাইরে বেরিয়ে গেলাম, এবং একটু পরেই দশটা মোমবাতি নিয়ে ফিরে এলাম। ঘরের মধ্যে যেসব চীনা-মাটির টুকিটাকি জিনিস ছিল তাতে একটা করে মোমবাতি বসিয়ে আগুন জ্বেলে দিয়ে যেখানে যেখানে ছায়া গাঢ় হয়ে জমেছে সেইসব জায়গায় বসিয়ে দিলাম; কোনটা মেঝেতে, কোনটা কুলুঙ্গিতে; ফলে আমার সতেরোটি মোমবাতি এমনভাবে রাখা হল যাতে ঘরের এমন এক ইঞ্চি জায়গাও রইল না যেখানে যেকোন একটা মোমবাতির আলো সরাসরি পড়ছে না। আমার মনে হল, এবার ভূত এলে তাকে সাবধান করে দেব যেন মোমবাতির উপর পা না ফেলে। ঘরটা এখন বেশ ভালভাবে আলোকিত হয়েছে। এই ছোট ছোট অগ্নিশিখাগুলি আমাকে স্ফূর্তি ও আশ্বাস এনে দিল, মোমবাতিগুলোর পোড়া সল্‌তে কেটে দেওয়া আমার একটা কাজ হল, আর সময় কাটাবারও

একটা ভাল উপায় পাওয়া গেল।

অবশ্য এসব সত্ত্বেও এইভাবে অধীর প্রত্যাশায় রাত জেগে বসে থাকতে বেশ কষ্ট হতে লাগল। মাঝরাতের পরে কুলুঙ্গির মোমবাতিটা হঠাৎ নিভে গেল, আর একটা কালো ছায়া যেন লাফিয়ে সেখানে আস্তানা নিল। মোমবাতিটাকে নিভে যেতে আমি দেখি নি; শুধু মুখ ঘুরিয়ে অন্ধকারটাই দেখতে পেলাম; ঠিক যেভাবে মানুষ হঠাৎ চমকে উঠে কোন অপরিচিত মানুষের অপ্রত্যাশিত উপস্থিতিটা টের পায়। জোর গলায় বলে উঠলাম, "হায় জোভ! খুব জোর বাতাস তো!" টেবিল থেকে দেশলাইটটা নিয়ে কোণের আলোটা নতুন করে জ্বালিয়ে দিতে ধীরে সুস্থে মেঝেটা পার হয়ে গেলাম। প্রথম কাঠিটা ধরল না, দ্বিতীয়টা জ্বলে উঠতেই মনে হল আমার সামনের দেয়ালে কে যেন চোখ মিটমিট করছে। অজান্তেই মাথাটা ঘুরিয়ে দেখলাম, অগ্নিকুণ্ডের পাশে রাখা ছোট টেবিলটার উপরকার মোমবাতি দুটোও নিভে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ালাম।

বললাম, "ভারী অদ্ভুত! অন্যমনস্কভাবে নিজেই এ কাণ্ডটা করি নি তো?"

ফিরে এসে আর একটা মোমবাতি জ্বালালাম, আর জ্বালাতে জ্বালাতেই দেখলাম একটা আয়নার ডান দিককার গর্তে বসানো মোমবাতিটা কাঁপতে কাঁপতে নিভে গেল, আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই অপরটিও তাই করল। একেবারে নির্ভুল। শিখাটা এমনভাবে নিভল যেন কেউ হঠাৎ একটা আঙুল ও বুড়ো আঙুলের মধ্যে সল্‌তেটা চেপে দিয়েছে; ফলে সল্‌তেটা জ্বলছে না, ধোঁয়াও বের হচ্ছে না, একেবারে কালো হয়ে গেছে। হাঁ করে তাকিয়ে থেকেই দেখলাম, বিছানার পায়ের কাছের মোমবাতিটাও নিভে গেল, আর ছায়াগুলো যেন আমার দিকে আরও এক পা এগিয়ে এল।

"এসব চলবে না!" বলতে বলতেই তাকের উপরকার প্রথমে একটা, তারপর আর একটা বাতি নিভে গেল।

"ব্যাপার কি?" চেঁচিয়ে বললাম; গলা দিয়ে একটা অদ্ভুত স্বর বের হল। আলমারির উপরকার মোমবাতিটা নিভে গেল; যেটা নতুন করে জ্বালিয়েছিলাম সেটাও সেই পথ ধরল।

"মাথা ঠিক রাখ!" আমি বললাম। "মোমবাতিগুলো দরকার," তাকের উপরকার মোমবাতিদানের কাছে দেশলাইটা হাতড়াতে হাতড়াতে আধা-বিকৃত স্বরে বলে উঠলাম। হাত দুটো এমনভাবে কাঁপছে যে দু'দুবার দেশলাই বাক্সের ঠিক জায়গায় কাঠিটা ঠুকতে পারলাম না। তাকটা দৃষ্টিগোচর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই জানালার শেষ প্রান্তের দুটো মোমবাতি নিভে গেল। কিন্তু সেই দেশলাইটা দিয়েই বড় আয়নার মোমবাতিগুলো ও মেঝেতে রাখা দরজার পাশের মোমবাতিগুলোকে আবার জ্বালিয়ে দিলাম।

তখন মনে হল মোমবাতি নেভার উপরে এক হাত নিয়েছি। কিন্তু তারপরেই এক ফুৎকারে ঘরের বিভিন্ন কোণের চারটে বাতি একসঙ্গে নিভে গেল; অতি দ্রুত আর একটা দেশলাই-কাঠি জ্বালালাম, কিন্তু সেটা নিয়ে কোন্‌দিকে যাব তাই নিয়ে দ্বিধায় পড়ে গেলাম।

মনস্থির করতে না পেরে দাঁড়িয়ে আছি এমন সময় একটা অদৃশ্য হাত যেন টেবিলের সবগুলি মোমবাতি ঝেঁটিয়ে ফেলে দিল। ভয়ে চীৎকার করে উঠে কুলুঙ্গির দিকে, তারপর কোণের দিকে, ও পরে জানালার দিকে ছুটে গেলাম; তিনটে বাতিই নতুন করে জ্বালিয়ে দিলাম, আর তখনই অগ্নিকুণ্ডের পাশে রাখা দুটো বাতি নিভে গেল। তখন একটা ভাল উপায় মনে পড়ায় দেশলাইটাকে লোহার সিন্দুকটার উপর ফেলে রেখে শোবার ঘরের বাতিদানটাকে হাতে নিলাম। এর ফলে দেশলাই জ্বালাবার সময়টা বাঁচানো গেল; কিন্তু এসব সত্ত্বেও বাতি নেভার পালা চলতেই থাকল; আর যেসব ছায়াকে আমি ভয় করে দূর করে দিতে চাইছিলাম তারাই ফিরে এল; কখনও এ-পাশ থেকে, কখনও ও-পাশ থেকে গুড়ি মেরে এগিয়ে আসতে লাগল। ঝড়ের ফলে ছিন্ন মেঘ যেমন তারাগুলোকে মুছে ফেলে ঠিক সেইরকম। মাঝে মাঝে একটা তারা দেখা দেয়, আর তখনই হারিয়ে যায়। আসন্ন অন্ধকারের ভয়ে আমার তখন প্রায় উন্মাদ হবার মত অবস্থা; আত্ম-সংযম সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেলেছি। বাতি নেভার বিরুদ্ধে ব্যর্থ সংগ্রাম চালাতে আমি তখন একটা মোমবাতি থেকে অন্য মোমবাতিতে হাঁপাতে হাঁপাতে লাফিয়ে বেড়াচ্ছি।

টেবিলে লেগে আমার উরু ছড়ে গেল, একটা চেয়ার উল্টে দিলাম, ধাক্কা খেয়ে পড়ে গেলাম, আর টেবিলের ঢাকনাটা মেঝেয় পড়ে গেল। মোমবাতিটা হাত থেকে ছিটকে গেল; উঠতে উঠতেই আর একটা মোমবাতি হাতে নিলাম। টেবিল থেকে সেটাকে একঝটকায় তুলে নিতে গিয়ে বাতাসের টানে সেটাও হঠাৎ নিভে গেল, আর সেই সঙ্গে বাকি দুটোও সেই পথেই গেল। কিন্তু ঘরে তখনও একটা আলো আছে, একটা লাল আলো, আর সেই আলোই ছায়াগুলোকে আমার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছে। আগুন! অবশ্য তখনও আমি অগ্নিকুণ্ডের শিকের ফাঁক দিয়ে ঢুকিয়ে দিয়ে মোমবাতিগুলো জ্বালিয়ে নিতে পারি!

জ্বলন্ত কয়লার ফাঁকে ফাঁকে যেখানে আলোর শিখাগুলি নেচে বেড়াচ্ছে এবং আসবাবগুলোর উপর লাল আলোর ঝলকানি ফেলছে, সেদিকে ফিরে ঝাঁঝরির দিকে দু'পা এগোতেই শিখাগুলো কমতে কমতে নিভে গেল, আলো নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল, ঝলকানিগুলো একসঙ্গে দুটো এসে মিলিয়ে গেল, আর হাতের মোমবাতিটাকে শিকের ফাঁকে ঢুকিয়ে দিতে দিতেই চোখের নিমেষে অন্ধকার এসে আমাকে ঘিরে ধরল, শ্বাসরোধকারী আলিঙ্গনে জড়িয়ে ধরল, আমার দৃষ্টিকে ঢেকে দিল, আমার মস্তিষ্ক থেকে চিন্তার শেষ চিহ্নটুকুও

বিলুপ্ত করে দিল। মোমবাতিটা হাত থেকে পড়ে গেল। সেই ভয়ংকর কালো অন্ধকারকে দূরে ঠেলে রাখতে বৃথাই হাতদুটিকে সামনে বাড়িয়ে দিলাম; আর গলা তুলে সব শক্তি একত্র করে চীৎকার করে উঠলাম—



একবার, দু'বার, তিনবার। মনে হয়, তারপরই স্খলিত পদক্ষেপে এগিয়েছিলাম। হঠাৎ চন্দ্রালোকিত বারান্দার কথা মনে পড়ে গেল, আর মাথাটা নীচু করে দুই হাতে মুখ ঢেকে দরজার দিকে ছুটে গেলাম।

কিন্তু দরজাটা ঠিক কোথায় আছে সেটা ভুলে যাওয়ায় বিছানার কোণের সঙ্গে প্রচণ্ড ধাক্কা খেলাম। স্খলিত পায়ে পিছন ফিরে এগোতেই আবার একটা ভারী আসবাবের গায়ে ধাক্কা খেলাম। আজও আবছা মনে পড়ে, অন্ধকারে এইভাবে এদিক-ওদিক ছুটেছিলাম, হাত-পা ছুঁড়েছিলাম, ছুটতে ছুটতে উদ্‌ভ্রান্তের মত চীৎকার করেছিলাম। শেষ পর্যন্ত প্রচণ্ড একটা আঘাত লেগেছিল কপালের উপর, মাটিতে পড়ে যাওয়ায় এমন ভয়ঙ্কর একটা অনুভূতি হয়েছিল যার কথা আজও ভুলতে পারি নি, পায়ের উপর দাঁড়িয়ে থাকার একটা উন্মাদ চেষ্টা করেছিলাম, তারপর—আর কিছু মনে নেই।

দিনের আলোয় চোখ মেললাম। মাথায় ভারী ব্যাণ্ডেজ বাঁধা ; বিশীর্ণ হাতওয়ালা লোকটি আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। চারদিকে তাকিয়ে প্রকৃত ঘটনা মনে করতে চেষ্টা করলাম, কিছুক্ষণ কিছুই মনে পড়ল না। চোখ ঘুরিয়ে ঘরের কোণে তাকালাম ; দেখলাম, বৃদ্ধাটি একটি ছোট নীল শিশি থেকে কয়েক ফোঁটা ওষুধ গ্লাসে ঢালছে।

জিজ্ঞাসা করলাম, "আমি কোথায় আছি ? মনে হচ্ছে আপনাকে চিনি, কিন্তু আপনি কে তা স্মরণ করতে পারছি না।"

তারা তখন সব কথা বলল, আর আমিও গল্প শোনার মত লাল ঘরের ভূতুড়ে কাহিনী শুনলাম। বুড়ো বলল, "ভোরবেলা তোমাকে দেখতে পেলাম ; কপালে ও ঠোঁটে রক্ত লেগে আছে।

খুব ধীরে ধীরে সব কথা মনে পড়ল। বুড়ো বলল, "ঘরটা যে ভূতুড়ে সে-কথা এখন বিশ্বাস হচ্ছে তো ?" তার কথায় এখন আর অনধিকার প্রবেশ-কারীর প্রতি বিরূপতার সুর নেই, আছে আহত বন্ধুর জন্য সমবেদনার সুর।

বললাম, "হ্যাঁ ; ঘরটা ভূতুড়ে।"

"তুমি তো সবই দেখেছ। অথবা এখানে সারা জীবন কাটিয়েও আমরা দেখতে পাই নি। কারণ দেখার সাহসই আমাদের হয়নি···আচ্ছা, বল তো বুড়ো জমিদার কি সত্যি সত্যি—"

"না," আমি বললাম ; "সেটা ঠিক নয়।"

গ্লাসটা হাতে নিয়েই বুড়ি বলল, "আমি তো তোমাকেও তাই বলেছি। তার তরুণী কাউণ্টেসটিই তো ভয় পেয়েছিলেন—"

"তাও নয়," আমি বললাম। "ওঘরে জমিদারের ভূতও নেই, কাউণ্টেসের ভূতও নেই ; কোন ভূতই নেই ; কিন্তু তার চাইতে খারাপ, আরও খারাপ—'

"বটে ?" সকলে বলল।

আমি বললাম, "যেসব বস্তু অসহায় মানুষগুলোকে তাড়া করে তার মধ্যে সবচাইতে খারাপ হল উলঙ্গ ভয় ! যে ভয় আলো বা শব্দের ধার ধারে না ! বিচার-বিবেচনা মানে না, যা শুধু বধির করে দেয়, অন্ধ করে দেয়, অভিভূত

করে ফেলে। সেই তো বারান্দায় আমাকে তাড়া করেছিল, ঘরের মধ্যে আমার সঙ্গে লড়াই করেছে—"

হঠাৎ থেমে গেলাম। সব চুপচাপ। আমার হাতটা ব্যাণ্ডেজকে স্পর্শ করল।

চোখ-ঢাকা লোকটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "ঠিক তাই, আমিও তাই জানতাম। অন্ধকারের এক মহাশক্তি। একটি নারীর উপর এ কী অভিশাপ! সব সময় ওৎপেতে থাকে। দিনের বেলায়, এমন কি গ্রীষ্মকালের উজ্জ্বল দিন-মানেও তাকে অনুভব করা যায়—ঝোলানো ঝাড়-লণ্ঠনের আড়ালে, পর্দার পিছনে, যতই মুখোমুখি হতে চেষ্টা কর সে ঠিক আড়ালে সরে যাবে। অন্ধকার নেমে এলে সে হামাগুড়ি দিয়ে বারান্দায় নেমে আসবে, তোমাকে অনুসরণ করে, কিন্তু মুখ ফেরাবার সাহস তোমার হবে না। কাউণ্টেসের ঐ ঘরে বাস কবে ভয—কালো ভয়, আর এই পাপের বাড়ি যতদিন থাকবে ততদিনই ভযও থাকবে।"

The Red Room—H. G. Wells

সীমান্ত রক্ষী

এলেস্‌বরো-তে ল্যাণ্ডারের সঙ্গে এক রাউণ্ড গল্‌ফ্‌ খেলে বাড়িটার দিকে হাঁটতে হাঁটতে ব্রিণ্টন বলে উঠল, "কী চমৎকার ছোট বাড়িটা!"

"হাঁা, বাইরে থেকে দেখতে," ল্যাণ্ডার জবাব দিল।

"কেন—ভিতরে কি ব্যাপার—প্লাম্বিংযের কাজকর্ম সবই সেকেলে নাকি?"

'তা নয়, ঝকঝকে না হলেও সাধারণভাবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। স্পেঙ্গ্‌লার হয় তো সবকিছুকে লিংকনের মৃত্যুর সমসাময়িক বলেই বর্ণনা করবেন। কিন্তু ব্যাপারটা তা নয—বাড়িটা ভূতুড়ে।"

চোখ তুলে তাকিয়ে ব্রিণ্টন বলল, "সত্যি বলছ? রাণী আনের সময়কার এমন সুন্দর ছোট বাড়িটার কপালে এই বাজে দুর্ণাম রটেছে—এটা ভাবা যায়। বাড়িটা খালি দেখছি।"

"সাধারণত তাই থাকে," ল্যাণ্ডার জবাব দিল।

"এ সম্পর্কে সব কথা বল।"

"ডিনারের সময় বলব। মনে হচ্ছে, তিনতলার ঐ জানালাগুলো সম্পর্কে তোমার খুব আগ্রহ জেগেছে।" ব্রিণ্টন দু'এক মুহূর্তের জন্য উপরে তাকিয়েই তার আমন্ত্রণকারীর সঙ্গে নিঃশব্দে হাঁটতে শুরু করল।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই তারা ল্যাণ্ডারের কটেজে পৌঁছে গেল। বেশ বড়সড় তিনতলা বাড়ি; মাঝে মাঝেই কিছু কিছু সংযোজন করে বাড়িটাকে আধুনিক করে তোলা হয়েছে; আগে নাম ছিল "দি ওল্ড ভাইকারেজ," এখন নতুন নাম দেওয়া হয়েছে "লেমার্স"। সাদা-কালো রঙের উপর লতা তুলে দেওয়া হয়েছে; গোলাপ গাছ ও নরম ঘাসের একটা ছোট্ট পরিচ্ছন্ন বাগান, ছুটো লেবু গাছ, আর দুরারোহ ও রহস্যময় একটা প্রকাণ্ড ইউ গাছ! ছোট বাগানটা বহুদূর বিস্তৃত একটা চাষের ক্ষেতের সঙ্গে মিশে গেছে। সেখান থেকে দূরের উঁচু জমিটার দৃশ্য ভারী মনোরম। গোটা পরিবেশ ল্যাণ্ডারেরই উপযুক্ত, কারণ সে একজন ঔপন্যাসিক—অথবা সঠিক বলতে গেলে ঔপন্যাসিক হতে চাইছে; সে উচ্চাকাংখা অতি সাধারণস্তরের এবং অবিবেচনাপ্রসূত হলেও তার টাকা আছে, তাই অপেক্ষা করে থাকতে সে পারে।

জেমস ব্রিণ্টন তার খুব পুরনো বন্ধু এবং এক সপ্তাহের জন্য তার অতিথি। সম্প্রতি মেফেযার-এ একটা ছবির প্রদর্শনী নিয়ে খুব ব্যস্ত। প্রদর্শনীটা খুবই ছোট—সঠিক বলতে গেলে একটা ছোট ঘরমাত্র, কিন্তু তার রুচি খুবই প্রশংসনীয় হওয়াতে তাতেই অর্থাগম ঘটেছে।

ছু'ঘণ্টা পরে তারা ডিনারে বসল। মিসেস ডাংকলি স্যুপটা এনে দিলে ব্রিণ্টন বলল, "এবার তাহলে বাড়িটার কথা বল।"

ল্যাণ্ডার বলতে লাগল, "দেখ, তুমি তো জান এধরনের জায়গার অভিজ্ঞতা অন্য অনেকের চাইতে আমার বেশী, আর আমি মনে করি, আজ পর্যন্ত যত জায়গার কথা শুনেছি, পড়েছি, বা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় জেনেছি তার মধ্যে পেইণ্টন হচ্ছে নিকৃষ্ট অথবা শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত। এটা একটা 'খুনে' জায়গা। অধিকাংশ ভুতুড়ে বাড়ি মানুষের কোন ক্ষতি করে না, যে বিশেষ শক্তিকে সঞ্চয় করে তারা ছড়িয়ে দেয় তা জীবনের প্রতি বিরূপ নয়। কিন্তু অন্য অনেকক্ষেত্রে সে শক্তি অনিষ্টকর ও মারাত্মক। গত বারো বছরে পেইণ্টন পাঁচবার ভাড়া হয়েছে; প্রতিবারেই বাড়ির চার দেয়ালের ভিতরে ভাড়াটেদের কারও না কারও ভয়ংকরভাবে মৃত্যু হয়েছে। এ বাড়িটা আদপেই ভাড়া দেওয়া ন্যায়সঙ্গত কি না সেবিষয়ে আমার অন্তত কোন দ্বিমত নেই। বাড়িটাকে ভেঙে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া উচিত।"

"ভাড়াটেরা সাধারণত কতদিন বাড়িটাতে থাকে?"

"সব চাইতে বেশী ছ' সপ্তাহ, আর সে রেকর্ড করেছিল পেণ্ডেক্সটাররা। সেটা তিন বছর আগেকার কথা। পেণ্ডেক্সটারকে আমি চিনতাম। লোকটি সাহসী ও দৃঢ়সংকল্প। একদিন রাতে তার মেয়েটিকে সিঁড়ি থেকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে খুন করা হয়। ক্রোধে ও শোকে অধীর হয়ে যেভাবে সে আমাকে ঘটনাটা বলেছিল তা আমি কোনদিন ভুলব না। সে ঘটনার আগে ভৌতিক আবির্ভাব ও আওয়াজের আঠারোটি ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টান্তের সে সাক্ষী—তার

মধ্যে কয়েকটি বেশ অনিষ্টকর। সে পরিবারটি একটি দিনের জন্যও কোন রকম অস্বাভাবিক ঘটনার হাত থেকে রেহাই পায় না।"

"বাড়িটাতে শেষ কবে লোক এসেছিল?" ব্রিণ্টন শুধাল।

"আজ এক বছর বাড়িটা খালি পড়ে আছে; আমার ধারণা খালিই থাকবে। কেউ বাড়িটা দেখতে এলেই আমরা কেউ না কেউ দু'এক কথায়ই তাকে বিদায় করে দেই।"

"বাড়িটা কি তোমাকে খুব বিচলিত করে?"

"আমি কখনও ওবাড়িতে পা দেই নি।"

"সে কি? তুমি পা দাও নি!"

"প্রিয় জিম, ঐ একই কারণে। যখন প্রথম ভেবেছিলাম আমি একটি আধ্যাত্মিক মাধ্যম, তখন বেশ গর্ব বোধ করেছিলাম, নানাবিধ অভিজ্ঞতা লাভের জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠেছিলাম। কিন্তু অচিরেই সেভাব পরিবর্তন করলাম। বুঝতে পারলাম, সুযোগ না খুঁজেই অনেক অভিজ্ঞতা লাভ করেছি। আজও করছি। মাঝেমাঝেই ডিনারের পরে কোন অতিথি এসে হাজির হয়—অনিমন্ত্রিত অতিথি। সেটা আগাগোড়াই ঘটেছে। অনেকবার এমন অনেক কিছু আমি শুনেছি যাকে ঠিক ভৌতিক ঘটনা বলে ব্যাখ্যা করা যায় না। আবার সেটাকে মেনেও নেওয়া যায় না। ভয়টা হয় তো কেটে যায়, কিন্তু মনের অস্বস্তিটা তো অনিবার্য। আমার মত গুণ যারই আছে, আর আমার মতই যে কষ্ট পায় সেও এই একই কথাই বলবে। অনেকসময়ই মনে হয়, আমি যেন এইসব আবির্ভাবকে বাস্তবায়িত করতে ও আহ্বান করতে, তাদের এবং যে জগতে আমি বাস করছি তার মধ্যে একটা যোগসূত্র স্থাপন করতে সাহায্য করছি; আমি যেন এক ধরনের অস্বস্তিকর বিদ্যুৎ-পরিবাহক।"

"এর কি কোন ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব?"

"দেখ, একটা ব্যাখ্যা আমি তৈরি করেছি, কিন্তু সেটা বোঝাতে অনেক সময় লাগবে, আর সেটা সম্পূর্ণ ভ্রান্তও হতে পারে। মোট কথা, পেইণ্টনের মত জায়গায় যাবার কোন দরকার কখনও আমার হয় নি, আর সেসব জায়গাকে আমি সাধ্যমত এড়িয়েই চলি।"

"দু' এক মিনিটের জন্য বাড়িটাতে ঢুকতে তোমার কি খুব আপত্তি আছে?"

"কেন?'

"দেখ, এই ভূতের ব্যাপার নিয়ে সারা জীবন আমি অনেক ঘাটাঘাটি করেছি, কিন্তু একটা ভূতও দেখতে পাই নি। এক অর্থে, 'ওদের অস্তিত্বেই আমি বিশ্বাস করি না,' অথচ আমার দৃঢ় বিশ্বাস তুমি অনেক ভূত দেখেছ। মনের এই দ্বিধা আমাকে প্রায় পাগল করে তুলেছে। মনে হয়, একবার যদি

ঐ ধরনের কারও সংস্পর্শে আসতে পারি তাহলে আমি প্রচণ্ড স্বস্তি পাব।"

"তাই তুমি চাও আমি তোমাকে পেইণ্টনে নিয়ে যাই?"

"অবশ্য তুমি যদি খুব অসুবিধা বোধ না কর।"

ল্যাণ্ডার হেসে বলল, "বিপদের ঝুঁকিটা কিন্তু তোমার।"

"ঝুঁকি নিতে আমি রাজী!"

"কখনও মনে ভেব না যে এরকম একটা ভূতুড়ে জায়গায় গেলেই দশ মিনিটের মধ্যে তুমি দশটা ভূত দেখতে পাবে। পেইণ্টনের মত কর্মচঞ্চল মৌচাকও মাঝেমাঝে শান্ত মূর্তি ধারণ করে; আবার এমন অনেক লোক আছে যারা 'ভূত দেখতেই পায় না।' তোমার বাসনা পূর্ণ না হবার সম্ভাবনাই সমধিক, যদিও তুমি যদি ভৌতিক ভরগ্রস্ত লোক হও তাহলে সে জায়গার আবহাওয়া সঙ্গে সঙ্গে তোমাকে পেয়ে বসবে।"

"কেমন করে?"

"দেখ, এমন লোকের কথা তুমি হয় তো অনেক শুনেছ যারা কোন রহস্যময় অথচ অভ্রান্ত শক্তির বলে বুঝতে পারে যে ঘরের মধ্যে একটা বিড়াল আছে। ঠিক সেইরকম। যাই হোক, তোমাকে একটা সুযোগ আমি অবশ্যই দেব। তাতে আমার ভয়ংকর কষ্ট কিছু হবে না। যে মেয়েটি এই বাড়ির দেখাশুনা করে সকালেই তার কাছ থেকে চাবিটা চেয়ে নেব। বলাই বাহুল্য, সে এ বাড়িতে ঘুমোয় না। পাহারা দেবার কোন লোকেরও দরকার হয় না। একবার একটা চোর ঢুকেছিল, কিন্তু সকালে দেখা গেল চোরটা খাবার ঘরে মরে পড়ে আছে। সেই থেকে কোন সিঁধেল চোর এ বাড়ি মাড়ায় না।"

"তাহলে তো বাড়িটা খুব বিপজ্জনক?"

"তোমার সুবুদ্ধি ফিরে আসছে দেখছি?"

"না, তুমি সঙ্গে থাকলে কোন ভয় নেই।"

"খুব ভাল কথা। গল্‌ফ্‌ খেলার পরে বাড়িটা দেখতে যাব। পাঁচটা নাগাদ অন্ধকার হয়ে আসবে, আমরা ছ'টা নাগাদ অভিযানে বের হব। অন্ধকার হবার পরেই তোমার কৌতূহল পূর্ণ হবার সম্ভাবনা বাড়বে। তোমাকে বরং অন্য কিছু কথা বলি। এই সব জায়গা আমাকে যে কিভাবে প্রভাবিত করে সেটা আমি ঠিক বুঝতে পারি না। এখন পর্যন্ত, আমি কেমন যে অচৈতন্য হয়ে পড়ি, আমার উপর যেন একটা ভর হয়। স্থান-কালের জ্ঞান হারিয়ে ফেলি, অবশ্য এ আশ্বাস তোমাকে দিতে পারি," সে হেসে বলল, "যে সে অবস্থায় আমি কখনও বিপজ্জনক হয়ে উঠি না। তাছাড়া, এমন এক ধরনের অস্তিত্বের সঙ্গে পরিচিত হবার জন্য তোমাকে তো প্রস্তুত থাকতেই হবে যাদের বেলায় অস্তিত্বের সাধারণ নিয়ম-কানুনগুলি একেবারেই অচল। বিয়ার্স তার বিখ্যাত ভৌতিক গল্পের বইটির নাম দিয়েছেন, 'এরা কি সত্যি

আছে ?' নিশ্চয় আছে। এবার আমি বোধ হয় পুরোহিতদের মত বড় বড় কথা বলছি, কিন্তু তোমাকে সতর্ক করে দেওয়া দরকার। কাল সকালে এই বাড়ির ফটকে পা দেওয়া মাত্রই আমি তোমার অপরিচিত লোক হয়ে যেতে পারি; ভিতরে ঢোকা মাত্রই সীমান্ত অতিক্রম করে এমন একটা রাজ্যে আমরা প্রবেশ করব, স্থান-কালের ব্যাপারে যার নিজস্ব নিয়ম-কানুন আছে, যেখানে আপাত অসম্ভব অনেক কিছুই ঘটতে পারে। আমার কথাগুলি ভালকরে বুঝবার পরেও কি তুমি যেতে চাও ?"

"হঁা, সব জেনেও," ব্রিস্টন বলল।

ল্যাণ্ডার বলল, "ঠিক আছে। এবার দাবার ঘুঁটিগুলো বের করি; কাল রাতে রেতি-র প্রথম চাল দিয়ে তুমি যে তুমি আমার উপর লাফিয়ে পড়েছিলে, আজ তার উপযুক্ত জবাব দিতে চাই, তুমি তাহলে সাদা ঘুঁটি নেবে তো ?"

২১শে নভেম্বর দিনটা ছিল অলস, ঘুম-ঘুম, ও নির্মেঘ; সকাল থেকে মাটির উপর ছড়িয়ে ছিল ঘন কুয়াশা, সূর্য যত উঠতে লাগল সেটা ততই গলতে লাগল, আর এলেস্‌বরোর গাছপালা কতকগুলো ধ্বংসের চেহারা নিল। ফলে ব্রিস্টন অথবা ল্যাণ্ডার কেউই খুব ভাল গল্‌ফ্‌ খেলতে পারল না। তাতে ব্রিস্টন মোটেই বিচলিত হল না, কারণ সে তখন অনেক বেশী ভাবছে তার আসন্ন অগ্নি-পরীক্ষার কথা—কয়েক ঘণ্টা পরেই পেইন্টনের ফটক পার হবার কথা। দ্বিতীয় রাউণ্ড খেলা শেষ হতেই একটা কুয়াসা দৈত্যাকার মাকড়শার জালের মত ছড়িয়ে পড়তে লাগল, মনে হল, বাকিংহামশায়ারের মাঠের সমতল-রেখাটাই যেন ক্রমেই উপরে উঠে যাচ্ছে। তারা যখন বাড়ির পথ ধরল, তখন কুয়াসাটাও কুকুরের মত একটু দূরে থেকে তাদের পিছু নিল; কখনও এগিয়ে আসছে, আবার সরে যাচ্ছে, কিন্তু কখনও সঙ্গ ছাড়ছে না।

তারা যখন লেমার্স-এ পৌছল তখন ঠিক পাঁচটা বাজে, চা প্রস্তুত। ল্যাণ্ডার হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল, "তুমি কি এখনও যেতে চাও জিম ?"

"নিশ্চয় !" ব্রিন্টন হাল্কাস্বরে জবাব দিল।

ল্যাণ্ডার হেসে বলল, "এই দেখ চাবি—ভয়ংকর ঘরের যাদু-চাবি। বৈদ্যুতিক আলোর সংযোগ কেটে দেওয়া হয়েছে, যেটুকু আলো পাও সেটা আমার টর্চের। একটা শেষ পরামর্শ দেই—একটা শিহরণ লাভের সেরা সুযোগ যদি পেতে চাও, মনটাকে সম্পূর্ণ ফাঁকা রাখতে চেষ্টা করো—তোমাকে যখন পথ দেখিয়ে নিয়ে যাব, তখন একটি কথাও বলো না। কোন কিছুতে মন না দেবার দিকেই মন দিও।"

"তোমার বক্তব্য আমি বুঝতে পেরেছি," ব্রিন্টন বলল।

"বেশ, তাহলে আর একটা চাল হোক," ল্যাণ্ডার বলল।

হঠাৎ একটা কথা ব্রিণ্টনের মাথায় এল। "তুমি যদি কখনও এ বাড়িতে না ঢুকে থাক তাহলে আমাকে সব কিছু দেখাবে কেমন করে?"

"তা নিয়ে তোমাকে মাথা ঘামাতে হবে না।" ল্যাণ্ডার জবাব দিল।

কুয়াশা আরও ঘন হয়ে নেমেছে। দুদিকের উঁচু বেড়ার চাপা গলির পথ ধরে পেইণ্টনের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে তাদের মনে কিছুটা ইতস্ততভাব দেখা দিল। সেখানে পৌঁছে ব্রিণ্টন চোখ তুলে তিনতলার জানালা-গুলির দিকে তাকাল। আর তখনই ল্যাণ্ডার এগিয়ে গিয়ে তালায় চাবিটা লাগাল।

দরজাটা খুলে যেতেই যে কুয়াশা এতক্ষণ তার পায়ের কাছে ঘাপ্‌টি মেরে ছিল সেটা একলাফে সামনে এগিয়ে গেল এবং তার সঙ্গেই ভিতরে ঢোকামাত্রই কি যেন তার সামনে এসে দাঁড়াল। বারান্দার বাঁদিকের দরজাটা খুলে ভিতরে টর্চের আলো ফেলল। সেখানেও কুয়াশা। বুঝতে পারল, জিম তার গা ঘেঁসে দাঁড়িয়েছে।

"এখানেই তারা চোরটাকে দেখেছিল—এটাই খাবার ঘর।"

তার কণ্ঠস্বর যেন তার নিয়ন্ত্রণে নেই। "ঘরটা আরামদায়ক, তবে একটু নোংরা গন্ধ আছে।" আলোর ছোট রেখাটা চেয়ার থেকে ডেস্কের উপর সরে গিয়ে মুহূর্তের জন্য এখানে-ওখানে পড়তে লাগল। দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে বারান্দা ধরে যেতে যেতে ছোট আলোর রেখায় যে সিঁড়িটা দৃষ্টিগোচর হল সেটা বেয়েই সে উঠতে লাগল। তখনও শুনতে পেল, ব্রিণ্টনের পায়ের শব্দ তার পিছন পিছনই আসছে। দোতলায় উঠে আর একটা দরজা খুলল। বলল, "এটা বৈঠকখানা। ১৯২১ সালে প্রক্টরের রাঁধুনিকে এখানে মৃত অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিল। আলোর ছোট রেখাটা চেয়ার, টেবিল, ডেস্ক ও পর্দার উপর ঘুরতে লাগল। দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে সে আরও একটা সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগল। শুনতে পেল, জিম তখনও পা ফেলে ফেলে তার পিছন পিছন আসছে। তিনতলায় উঠে সে আরও একটা দরজা খুলল। "প্রিয় জিম, এটাই সেই খারাপ সিঁড়ি; এখান থেকে পড়েই এমি ডেক্সটার তার গলাটা ভেঙেছিল।"

তার গলার স্বর ঈষৎ উঁচু হয়েছে; কথা বলছে দ্রুতলয়ে। আবার টর্চের আলো ফেলল চেয়ার, টেবিল, পর্দার উপরে, এবং আরও দূরে।

"আচ্ছা জিম, কোন প্রতিক্রিয়া বুঝতে পারছ? পারছ কি? এবার কথা বলতে পার।" কোন জবাব এল না; সে মুখ ফেরাল; তার ঠিক পিছনের লোকটির উপর টর্চটা ঘুরিয়ে ধরল। কিন্তু তার গা ঘেঁসে যে দাঁড়িয়ে আছে সে তো ব্রিণ্টন নয়।...

ব্রিণ্টন জিজ্ঞাসা করল, "ব্যাপার কি উইলি? তুমি কি চাবির ফোকরটা খুঁজে পাচ্ছ না?" তার সামনের মূর্তিটি নিশ্চল দাঁড়িয়ে।

"চাবির ফোঁকরটা খুঁজে পাচ্ছ না?" ব্রিন্টন আরও জোর দিয়ে প্রশ্ন করল।

মূর্তিটা তখনও নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে দেখে একটা দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালিয়ে সামনে তাকাল···তারপরই টলতে টলতে পিছিয়ে এল।

চীৎকার করে বলল, "ঈশ্বরের দোহাই, বল তুমি কে?"

The Frontier Guards—H. Rassel Wakefield

মাদাম ক্রোল-এর ভূত

আজ আমি একটি বুড়ি; কিন্তু যেরাতে অ্যাপল্‌ওয়েল হাউসে এসেছিলাম সেদিন আমার বয়স সবে তেরো পার হয়েছে। পিসি ছিল সে বাড়ির গৃহকর্ত্রী; একটা এক ঘোড়ার গাড়ি লেক্সহো-তে অপেক্ষা করছিল আমাকে ও আমার বাক্সটাকে অ্যাপল্‌ওয়েল-এ নিয়ে যেতে।

লেকস্‌হোতে পৌঁছেই আমি একটু ভয় পেয়েছিলাম; গাড়ি ও ঘোড়ার চেহারা দেখেই মনে হয়েছিল মাকে নিয়ে তখনই হেজেল্‌ডেন-এ ফিরে যাই। "শে"—তে চড়েই—গাড়িটাকে আমরা ঐ নামেই ডাকতাম—আমি কাঁদতে শুরু করলাম, আর বুড়ো কোচয়ান ভাল মানুষ জন মুল্‌বেরি আমাকে খুশি করার জন্য গোল্ডেন লায়ন-এ এক মুঠো আপেল এনে দিল; মুখে বলল, সেই বড় বাড়িতে পিসির ঘরে আমার জন্য অপেক্ষা করছে গরম-গরম কিসমিস দেওয়া কেক, চা ও শূকর-মাংসের চপ। জ্যোৎস্নালোকিত সুন্দর রাত; শে-র জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আমি আপেল খেতে লাগলাম।

আমার মত একটি অসহায় বোকা শিশুকে ভয় দেখানো ভদ্রলোকদের পক্ষে অবশ্যই লজ্জার কথা। মাঝে মাঝে মনে হয়, ওটা ওদের চালাকি। আমার পাশেই দুটি ভদ্রলোক বসেছিল। রাতে চাঁদ উঠবার পরে তারা আমাকে প্রশ্ন করল, আমি কোথায় যাচ্ছি। আমি বললাম, লেক্সহো-র নিকটবর্তী অ্যাপেল্‌ওয়েল হাউসের আরাবেলা ক্রোল ঠাকরুণের সঙ্গিনী হতেই আমি সেখানে যাচ্ছি।

একজন বলে উঠল, "তাই বুঝি; বেশীদিন সেখানে টিকতে পারবে না।"

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তার দিকে তাকালাম।

সে বলল, "কারণ—যদি বাঁচতে চাও তো এ-কথা কাউকে বলো না—তাকে তো শয়তানে ভর করেছে; তিনি নিজেই তো আধা ভূত। তোমার সঙ্গে বাইবেল আছে তো?"

"হ্যাঁ স্যার," আমি বললাম। আমার বাক্সটাতে মা একখানা ছোট বাইবেল ভরে দিয়েছে; আমি জানি সেখানা আজও বাক্সেই আছে! আমার বুড়ো চোখের পক্ষে ছাপার অক্ষরগুলো খুব ছোট হলেও সেখানা আজও আমার কাছে আছে।

"হ্যাঁ স্যার," বলতে গিয়ে চোখ তুলে তাকাতেই মনে হল যে তার সঙ্গীকে চোখ টিপল; কিন্তু সেবিষয়ে আমি সম্পূর্ণ নিশ্চিত নই।

সে বলল, "দেখ, প্রতি রাতেই বইখানাকে অবশ্যই বালিশের নীচে রেখে দিও। তাহলেই বুড়ি খুকির নখগুলো তোমার কাছ থেকে দূরে থাকবে।"

তার কথা শুনে আমি যে কী ভয় পেয়েছিলাম তা তোমরা কল্পনাও করতে পারবে না। বৃদ্ধ মহিলাটি সম্পর্কে তাকে অনেক কিছু জিজ্ঞাসা করার ইচ্ছাও হয়েছিল, কিন্তু আমি তখন খুব লাজুক ছিলাম, আর তারা দুজনও নিজেদের কথাই বলতে শুরু করে দিল। যথাসময়ে আমি লেক্সহোতে নেমে গেলাম। অন্ধকার পথ ধরে চলতে চলতে আমার বুকের ভিতরটা টিপটিপ করতে লাগল। বড় বড় সব গাছ ঘন হয়ে দাঁড়িয়ে আছে; গাছগুলিও পুরনো বাড়িটার মতই পুরনো; চারজন লোক হাতে-হাত ধরেও সেসব গাছকে বেড় দিয়ে ধরতে পারবে না।

যাইহোক, বড় বাড়িটাকে প্রথমবারের মত দেখবার জন্য জানালা দিয়ে গলাটা বাড়িয়ে দিলাম, আর তখনই হঠাৎ গাড়িটা থেমে গেল।

মস্ত বড় একটা সাদা-কালো রংয়ের বাড়ি; বড় বড় কালো বরগা, পাশকপালিগুলো চাঁদের আলোয় কাগজের মত সাদা দেখাচ্ছে, বাড়ির ঠিক সামনে দু' তিনটে গাছের ছায়া পড়েছে, বড় হলের জানালাগুলির হীরকাকৃতি কাঁচের শার্সির উপর চাঁদের আলো পড়ে চিক চিক করছে, বাইরের দেয়াল থেকে ঝোলানো সেকেলে বড় বড় পর্দা ঝুলছে, সামনের বাকি জানালাগুলি হুড়কো দিয়ে আটকানো, কারণ বাড়ির অধিবাসী বলতে তিন চারটি চাকর ও একটি বৃদ্ধা মহিলা; অধিকাংশ ঘরই তালাবন্ধ হয়ে পড়ে আছে।

যখন বুঝতে পারলাম যে যাত্রা শেষ হয়েছে তখন আমার প্রাণটা যেন মুখের ভিতর উঠে এল।

হলে ঢুকতেই পিসি আমাকে চুমো খেল, তার ঘরে নিয়ে গেল। পিসির চেহারা লম্বা ও সরু, পাণ্ডুর মুখে দুটি কালো চোখ, কালো দস্তানা পরা লম্বা সরু হাত। বয়স পঞ্চাশ পেরিয়ে গেছে, অল্প কথা বলে, কিন্তু তার কথাই আইন। তার বিরুদ্ধে আমার কোন নালিশ নেই; কিন্তু তার মনটা বড় কঠোর; মনে হয়, তার ভাইয়ের মেয়ে না হয়ে আমি যদি তার বোনের মেয়ে হতাম তাহলে পিসি হয় তো আমার প্রতি আরও সদয় ব্যবহার করত। কিন্তু এখন আর সেকথা ভেবে লাভ কি।

জমিদারবাবু—তার নাম মিঃ শেভেনিক্স ক্রোল, ক্রোল গিন্নির নাতি—

বছরে দু' তিনবার নীচে নামতেন বৃদ্ধ মহিলার খোঁজখবর নিতে। আমি যতদিন অ্যাপল্‌ওয়েল হাউসে ছিলাম তারমধ্যে তাকে মাত্র দু'বার দেখেছি। ঠিক বলতে পারি না, তবে তার দেখাশুনা বেশ ভালভাবেই চলছিল, কারণ আমার পিসি ও দাসী মেগ ওয়াইভার্ণ দুজনেরই বিবেক ছিল, আর দুজনই তার প্রতি কর্তব্য পালন করত।

মিসেস ওয়াইভার্ণ—পিসি নিজে তাকে মেগ ওয়াইভার্ণ বলে ডাকত, আর আমার কাছে তার নাম বলত মিসেস ওয়াইভার্ণ—মোটাসোটা ও আমুদে স্বভাবের মেয়ে মানুষ, বয়স পঞ্চাশ, বেশ লম্বা-চওড়া চেহারা, সবসময় হাসি-খুশি, হাঁটা-চলা ধীরে সুস্থে। ভাল মাইনে পায়, কিন্তু কিছুটা কঞ্জুস, ভাল জামাকাপড় সব তালা-চাবি দিয়ে আটকে রাখে আর বেশীরভাগ সময় পরে থাকে চকোলেট রংয়ের সুতীর জামা, তাতে লাল-হলুদ টান, আর সবুজ পাতা ও বল আঁকা; জামাটা টেকেও খুব।

যতদিন সেখানে ছিলাম সে আমাকে কিছু দেয় নি, একটা পিতলের অঙ্গুলিত্রাণ পর্যন্ত না; কিন্তু সে ছিল খুব মজার মানুষ, আর সবসময় হাসত; চা খেতে বসে আমাকে মন-মরা হয়ে থাকতে দেখে হাসি-গল্পে মাতিয়ে তুলত। মনে হয়, পিসির চাইতে তাকেই আমি বেশী পছন্দ করতাম—একটু হাসালে বা গল্প করলেই ছোটরা বশ হয়ে যায়—যদিও পিসি আমাকে খুবই ভালবাসত, তবু কোন কোন বিষয়ে তার ব্যবহার ছিল কঠোর, কিন্তু নিঃশব্দ।

পিসি আমাকে তার শোবার ঘরে নিয়ে গেল, যাতে তার ঘরে চায়ের টেবিল সাজাবার ফাঁকে আমি একটু বিশ্রাম নিয়ে নিতে পারি। কিন্তু প্রথমেই আমার কাঁধে হাত বুলিয়ে বলল, বয়সের তুলনায় আমি তো বেশ বড়সড় হয়ে উঠেছি, আর জানতে চাইল যে আমি সাদামাঠা কাজ ও সেলাই করতে পারি কি না। আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল। তার যে ভাই মারা গেছে আমি নাকি তার মত অর্থাৎ আমার বাবার মতই দেখতে; অবশ্য সে এ আশাও প্রকাশ করল যে আমি যেন একজন ভাল খ্রীস্টানের মত চলি এবং কোন বাজে কাজ না করি।

মনে হল, তার ঘরে প্রথম পা দিয়েই কথাগুলি বড়ই কড়া লাগল।

পাশের ঘরে—অর্থাৎ গৃহকর্ত্রীর ঘরে ঢুকলাম, ঘরটা খুব আরামদায়ক, চারদিকে কেবল ওক কাঠ—সুদৃশ্য অগ্নিকুণ্ডে কয়লা, পচা ঘাস ও কাঠের আগুন জ্বলছে, টেবিলের উপর চা, গরম কেক ও ধূমায়মান মাংস; আর আছে মিসেস ওয়াইভার্ণ—মোটা সোটা ও হাসিখুশি; এক ঘণ্টায় সে যত কথা বলে পিসি এক বছরেও তা বলে না।

আমাকে চায়ের টেবিলে বসিয়ে রেখে পিসি উপরে গেল মাদাম ক্রোলকে দেখতে।

মিসেস ওয়াইভার্ণ বলল, "বুড়ি জুডিথ স্বোয়াইলেস জেগে আছে কি না দেখতেই উনি উপরে গেলেন। আমি এবং মিসেস শার্টার্স"—আমার পিসির নাম—"যখন না থাকি তখন জুডিথই মাদাম ক্রোলের পাশে বসে থাকে। মহিলাটি বড়ই গোলমেলে। তার সঙ্গে কথা বলতে হলে খুব সতর্ক থাকতে হবে, নইলে তিনি তোমাকে আগুনের মধ্যে অথবা জানালা দিয়ে বাইরে ছুঁড়ে দেবেন। তিনি যেন বিদ্যুৎগতিতে চলেন, সত্যি, বুড়ি হলেও সেই-ভাবেই চলেন।"

"তার বয়স কত মা'ম?" আমি বললাম।

"গত জন্মদিনে তার বয়স ছিল তিরানব্বই বছর, তারপর আট মাস কেটে গেছে," বলে সে হাসল। তোমার পিসির সামনে তার বিষয়ে কোন প্রশ্ন করো না—বলে দিলাম, মনে থাকে যেন, তাকে যেমনটি দেখবে, তেমনটি চলবে, বাস, তাহলেই হল।"

আমি বললাম, "আচ্ছা মা'ম, তার কাছে আমার কাজ কি হবে?"

"ওই বৃদ্ধার কাছে? দেখ, তোমার পিসি মিসেস শার্টার্সই তোমাকে সেকথা বলে দেবেন, তবে আমার ধারণা তোমার কাজ নিয়ে তোমাকে ঐ ঘরে বসে থাকতে হবে, তিনি কোন কিছুর ক্ষতি না করেন সেদিকে নজর রাখতে হবে, টেবিলে তার যেসব জিনিসপত্র আছে তাই নিয়ে তিনি যাতে মেতে থাকেন তার ব্যবস্থা করতে হবে, তার কথামত খাদ্য ও পানীয়ের ব্যবস্থা করে দিতে হবে, তাকে সবরকম ক্ষতির বাইরে রাখতে হবে, এবং তিনি বড় বেশী গোলমাল শুরু করলে সজোরে ঘণ্টা বাজাতে হবে।"

"তিনি কি কালা মা'ম?"

"না, অন্ধও নন, তার বুদ্ধি সূঁচের মত তীক্ষ্ণ, কিন্তু কোন কিছুই ঠিক-ঠিক মনে রাখতে পারেন না, আর রাজ-দরবার অথবা জাতীয় সমস্যার আলোচনায় তিনি যতটা সুখ পান ঠিক ততটাই সুখ পান দৈত্য নিধনকারী জ্যাক অথবা ভাল জুতোজোড়া'র গল্প শুনে।"

"আর গত শুক্রবারে যে ছোট মেয়েটি চলে গেছে, সে চলে গেল কেন? পিসি আমার মাকে লিখেছে যে তাকে যেতে হয়েছে।"

"হ্যাঁ; সে চলে গেছে।"

"কিসের জন্য?" আমি আবার বললাম।

"আমার মনে হয় সে মিসেস শার্টার্সের ডাকে সাড়া দেয় নি বলে। আমি ঠিক জানি না। অত কথা বলো না। তোমার পিসি বক-বক করা মেয়েকে সইতে পারেন না।"

"দয়া করে বলুন মা'ম, বৃদ্ধ মহিলার স্বাস্থ্য ভাল তো?" আমি বললাম।

"সেকথা জিজ্ঞাসা করাটা দোষের নয়। সম্প্রতি একটু ভুগছেন বটে, কিন্তু গত সপ্তাহ থেকে ভাল আছেন; আমি জোর গলায় বলতে পারি

তিনি শত বছর বেঁচে থাকবেন। হিস্! বারান্দায় তোমার পিসি আসছেন।"

পিসি ঘরে ঢুকে মিসেস ওয়াইভার্ণের সঙ্গে কথা বলতে লাগল; কিছুটা স্বস্তি বোধ করায় আমি ঘরময় ঘুরে ঘুরে এটা-সেটা দেখতে লাগলাম। কাবার্ডে সুন্দর সুন্দর পুরনো চিনে মাটির পুতুল ছিল; দেয়ালে ছবি টাঙানো; একটা দরজা খোলাই ছিল; ভিতরে একটা অদ্ভুত পুরনো চামড়ার কুর্তা ঝোলানো দেখতে পেলাম; তাতে পটি ও বকলস আঁটা; হাতদুটো খাটের ছত্রির সমান লম্বা।

ভেবেছিলাম আমার দিকে পিসির নজর নেই; কিন্তু সে হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে তীক্ষ্ণ গলায় বলল, "ওখানে কি করছ মেয়ে? তোমার হাতে ওটা কি?"

চামডার কুর্তাটা হাতে নিয়েই মুখ ফিরিয়ে বললাম, "এটা মা'ম? এটা কি আমি জানি না মা'ম।"

পিসির ম্লান গাল দুটি রাঙা হয়ে উঠল, রাগে দুই চোখ জ্বলে উঠল, মনে হল তার আর আমার মাঝখানে দু' পায়ের ব্যবধান না থাকলে সে আমাকে আচ্ছা করে ধোলাই দিত। কিন্তু আমার ঘাড ধরে একটা ঝাঁকুনি দিয়েই পিসি এক ঝট্‌কায় জিনিসটা আমার হাত থেকে কেডে নিয়ে বলল, "যতদিন এখানে থাকবে নিজের জিনিস ছাড়া অন্য কোন কিছুতে কখনও হাত দেবে না"। কুর্তাটা যেখানে ছিল সেখানেই ঝুলিয়ে রেখে পিসি সশব্দে দরজাটা বন্ধ করে তালা লাগিয়ে দিল।

মিসেস ওয়াইভার্ণ দুই হাত তুলে হাসতে লাগল; নিজের চেয়ারে একটু যেন গড়াগড়িও খেল।

আমার চোখে তখন জল এসে গেছে। পিসির দিকে চোখ টিপে নিজের চোখের জল মুছতে মুছতে—হাসতে হাসতে তার চোখে জল এসে গিয়েছিল—মিসেস ওয়াইভার্ণ বলল, "ধুৎ, মেয়েটি কোন ক্ষতি করতে চায় নি—আমার কাছে এস মেয়ে। ওটা খোঁড়াদের জন্য একটা ক্রাচ; কিন্তু মনে রেখো, কোন প্রশ্ন করো না, তাহলে আমরাও তোমাকে মিথ্যা বলব না; এখানে এসে বস; শুতে যাবার আগে এক মগ বীয়ার খেয়ে নাও।"

মনে রাখবে, আমার ঘরটা ছিল দোতালায়, বৃদ্ধা মহিলার ঘরের ঠিক পাশে, আর মিসেস ওয়াইভার্ণের বিছানা ছিল মহিলাটির ঘরে তার বিছানার কাছে। দরকার হলে ডাকার সঙ্গে সঙ্গেই সে ঘরে যাবার জন্য আমাকে প্রস্তুত হয়ে থাকতে হবে।

সেই রাত এবং আগেরদিনের কিছু সময় থেকেই বৃদ্ধা মহিলাটির মেজাজ ছিল খুবই খারাপ। মাঝেমাঝেই রাগে গোঁ ধরছেন। কখনও কাউকে পোশাক পরাতে দিচ্ছেন না, কখনও বা পোশাক ছাড়াতেও দিচ্ছেন না। সকলে বলে, সময়কালে তিনি ছিলেন অপরূপা সুন্দরী। কিন্তু অ্যাপল্‌ওয়েলের

আশেপাশে এমন কেউ নেই যে মহিলাটির যৌবনকালের কথা স্মরণ করতে পারে। কিন্তু তার পোশাকের বাতিক ভয়ংকর ; ঘন রেশম, ঘন সাটিন, ভেলভেট, লেস,—সবরকম পোশাক তার এত আছে যে অন্তত সাতটা দোকান তা দিয়ে সাজিয়ে দেওয়া যায়। তার সব পোশাকই সেকেলে ধরনের আর অদ্ভুত, কিন্তু অত্যন্ত দামী।

যাই হোক, আমি শুতে গেলাম। কিছুক্ষণ জেগে কাটল। আমার কাছে সবই নতুন ; মনে হল, আমার স্নায়ুর উপর চায়ের চাপ পড়েছে, কারণ উৎসবের দিন ছাড়া আমি চা খেতে অভ্যস্ত নই। মিসেস ওয়াইভার্ণের কথা কানে এল ; কানের কাছে হাত রেখে ভাল করে কান পাতলাম ; কিন্তু মিসের ক্রোলের কথা শুনতে পেলাম না ; তিনি একটি কথাও বলেছেন বলে মনেও হল না।

সকলেই তার খুব যত্ন নিত। অ্যাপ্‌ল্‌ওয়েলের লোকরা জানত যে তিনি মারা গেলে প্রত্যেকেরই চাকরি যাবে, আর তাদের চাকরিগুলো যেমন আয়েসের, তেমনই মাইনেও খুব ভাল।

বৃদ্ধাকে দেখতে সপ্তাহে দুদিন ডাক্তার আসেন, আর তিনি যা বলে যান সকলেই সেইমত কাজ করে। একটি কথা তিনি প্রতিবারই বলেন ; তাকে যেন কখনও কোনভাবেই বিরক্ত করা বা রাগানো না হয় ; সব ব্যাপারেই তাকে তুষ্ট ও হাসিখুশি রাখতে হবে।

কাজেই একই পোশাকে তিনি সারারাত ও পরের দিনটাও কাটালেন, একটি কথাও বললেন না ; আমি সারাটাদিন আমার নিজের ঘরে সেলাই করেই কাটিয়ে দিলাম ; নীচে গেলাম শুধু খেতে।

বৃদ্ধাকে একবার দেখার, এমন কি তার কথা শোনার বড় ইচ্ছা হল। কিন্তু আমার কাছে তিনি যেন সারাক্ষণ লণ্ডনেই কাটিয়ে দিলেন।

ডিনারের পরে পিসি আমাকে ঘণ্টাখানেকের জন্য বাইরে বেড়াতে পাঠাল। ফিরে এসে যেন বেঁচে গেলাম ; পথের দু'ধারে মস্ত বড় বড় সব গাছ, জায়গাটা অন্ধকার ও নির্জন, আকাশ মেঘে ঢাকা, একলা হাঁটতে হাঁটতে বাড়ির কথা ভেবে আমি অনেক কাঁদলাম। সেদিন সন্ধ্যায় মোমবাতি জ্বালিয়ে নিজের ঘরেই বসেছিলাম ; মাদাম ক্রোলের শোবার ঘরের দিককার দরজাটা খোলাই ছিল, পিসিও সেখানেই ছিল। এই প্রথম আমি এমন কিছু শুনলাম যেগুলি ঐ বৃদ্ধা মহিলার কথা বলেই মনে হল।

একটা অদ্ভুত আওয়াজ কানে এল ; সেটা পাখির না জন্তুর তা জানি না, তবে একধরনের সংক্ষিপ্ত ভ্যা-ভ্যা শব্দ।

যত বেশী শুনতে পারি সেইভাবে কান খাড়া করলাম। কিন্তু তার কথার একবিন্দুও বুঝতে পারলাম না। আমার পিসি কিন্তু জবাব দিল :

"প্রভুর ইচ্ছা না হলে শয়তান কাউকে আঘাত করতে পারে না।"

বিছানা থেকে সেই একই অদ্ভুত আওয়াজ এল, কিন্তু আমি তার মাথা-মুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারলাম না।

আমার পিসি আবার জবাব দিল: "ওদের মুখ ভার করতে দিন মা'ম, ওরা যা খুশি বলুক; প্রভু যদি আমাদের পক্ষে থাকেন তো কে আমাদের বিরুদ্ধে যেতে পারে?"

দরজার দিকে কান পেতে দম বন্ধ করে সব শুনতে চেষ্টা করলাম, কিন্তু সেঘর থেকে আর কোন শব্দ বা আওয়াজই এল না। প্রায় বিশ মিনিট পরে টেবিলের পাশে বসে পুরনো ঈশপের গল্পের ছবি দেখছি, এমন সময় মনে হল দরজার কাছে কি যেন নড়ছে, তাকিয়ে দেখলাম পিসি দরজার ফাঁক দিয়ে তাকিয়ে আছে; তার হাতটা তোলা।

"হিশ্!" নরম গলায় কথাটা বলে সে পা টিপে টিপে আমার কাছে এল, তারপর ফিসফিস করে বলল: "ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, শেষ পর্যন্ত তিনি ঘুমিয়ে পড়েছেন, আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত কোনরকম আওয়াজ করবে না; চা খেতে নীচে যাচ্ছি, এখনই ফিরে আসব—আমিও মিসেস ওয়াইভার্ণ; উনি ঐ ঘরেই ঘুমিয়ে থাকবেন; আমরা এলেই তুমি ছুটে নীচে চলে যাবে, আমার ঘরেই জুডিথ তোমাকে রাতের খাবার এনে দেবে।"

এই কথা বলে পিসি চলে গেল।

আগের মতই আমি আবার ছবির বইটা দেখতে লাগলাম; মাঝে-মাঝেই কান খাড়া করছি, কিন্তু কোন শব্দ বা নিঃশ্বাসের আওয়াজ কিছুই শুনতে পেলাম না; বড় ঘরটাতে বসে ক্রমেই আমার ভয়-ভয় করতে লাগল, তাই মনে বল আনতে ছবিগুলোর সঙ্গে ফিস্‌ফিস্ করতে শুরু করলাম, কথা বলতে লাগলাম নিজের সঙ্গেই।

শেষ পর্যন্ত উঠে দাঁড়ালাম, ঘরময় হাঁটতে হাঁটতে একবার এদিকে একবার ওদিকে তাকাতে লাগলাম, কোনরকমে মনটাকে প্রফুল্ল রাখা আর কি। আর শেষপর্যন্ত কি আর করা যায়, উঁকি দিলাম মাদাম ক্রোলের শয়ন-কক্ষে।

চমৎকার ঘরখানা; মস্ত বড় পালংক, সিলিং থেকে ঝোলানো ফুল-কাটা রেশমী মশারি মেঝে পর্যন্ত নেমে এসে ভাঁজ হয়ে পড়েছে। যে আয়নাটা রয়েছে তত বড় আয়না আগে কখনও দেখি নি; ঘরখানা আলোয় উদ্ভাসিত। গুণে দেখলাম বাইশটা মোমবাতির সবগুলিই জ্বলছে। এরকমটাই তার পছন্দ, তাই কেউ না বলতে সাহস করে না।

দরজার কাছে কান পাতলাম; হাঁ করে চারদিকে তাকাতে লাগলাম। একটা নিঃশ্বাসের শব্দও যখন শুনতে পেলাম না, মশারিটাকে একবারও নড়তে দেখলাম না, তখন আমার বুকে সাহস এল, পা টিপে টিপে ঘরের মধ্যে ঢুকে চারদিকে তাকালাম। তারপরই বড় আয়নাটায় নিজেকে দেখতে পেলাম,

আর তখনই আমার মাথায় ঢুকল, "বিছানায় শোয়া বৃদ্ধ মহিলাটির দিকে একবার তাকাতে দোষ কি ?"

ক্রোল ঠাকরুণকে দেখার সাধ যে আমার কত তার অর্ধেকটা জানলেও তুমি আমাকে পাগল মনে করবে ; মনে মনে চিন্তা করলাম, এখন যদি উঁকি দিয়ে না দেখি তা হলে এত ভাল আর একটা সুযোগ পেতে আমাকে হয় তো অনেকদিন অপেক্ষা করতে হবে।

তারপর বিছানার কাছে তো গেলাম, মশারিটা কত কাছে, মনের জোর একেবারেই কমে গেল ! কিন্তু সাহসে ভর করে ভারী পর্দার ফাঁক দিয়ে আঙুলটা ঢুকিয়ে দিলাম, তারপর হাতটাও। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলাম ; সবকিছু মৃত্যুর মত স্তব্ধ। কাজেই ধীরে-ধীরে মশারিটাতে টান দিলাম, আর সত্যি বলছি, চোখের সামনে দেখলাম লেক্স্‌হো গির্জার কবরের পাথরের উপর আঁকা যীশু জননীর ছবির মত টান-টান হয়ে শুয়ে আছেন অ্যাপ্‌ল্‌-ওয়েল হাউসের বিখ্যাত ক্রোল ঠাকরুণ। অপূর্ব সাজে সজ্জিত। আজকাল তুমি সেরকমটা দেখতে পাবে না। লাল ও সবুজ সাটিন ও রেশম, সোনালী লেস ; জেনের দিব্যি ! সে একটা দৃশ্য বটে। পাউডার মাখানো মস্ত বড় পরচুলা মাথার উপর বসানো, আর, আহা, এত বলী-রেখা কোথায় আছে ?—গলার ঢিলে চামড়া পাউডার ঢেলে সাদা করা হয়েছে, দুই গালে রুজ ঘসা হয়েছে, ভুরু দুটো আঁকা। তিনি শুয়ে আছেন যেমন মহিমময়ী তেমনই শক্ত হয়ে ; পরনে রেশমী পাজামা ! ওই দেখ ! তার নাকটা বেঁকে গেল, সরু হয়ে উঠল ; চোখের অর্ধেক সাদা অংশ খুলে গেল। এই পোশাক পরে হাতে একটা পাখা নিয়ে বডিসে একটা বড় ফুলের তোড়া গুঁজে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে অঙ্গ ভঙ্গী করা তার অভ্যাস। লতার বালা পরা ছোট হাত দুখানি দুপাশে পড়ে আছে ; সরু করে কাটা এরকম লম্বা নখ আমি জীবনে দেখি নি। এরকম নখ রাখা কি বড় লোক্‌দের ফ্যাশন না কি ?

দেখ, আমি মনে করি এরকম দৃশ্য দেখলে তুমি নিজেও ভয় পেতে ! মশারিটা ছাড়তে পারলাম না, এক ইঞ্চি নড়তে পারলাম না, তার উপর থেকে চোখও সরাতে পারলাম না ; হৃৎপিণ্ডটা তখন স্তব্ধ হয়ে আছে। মুহূর্তের মধ্যে তিনি চোখ মেললেন, উঠে বসলেন। সহসা ঘুরে গিয়ে লম্বা গোড়ালি দুটো মেঝের উপর ঠুকে আমার মুখোমুখি দাঁড়ালেন। কাঁচের মত চক্‌চকে দুটি বড় চোখ আমার মুখের উপর রেখে কোঁচকানো ঠোঁটে ও লম্বা নকল দাঁতে একটা দুষ্টু হাসি ফোটালেন।

দেখ, মৃতদেহ একটা স্বাভাবিক বস্তু ; কিন্তু এরকম ভয়ংকর দৃশ্য আমি কখনও দেখি নি। সবগুলো আঙুল সোজা আমার দিকে বাড়িয়ে দিয়েছেন, বয়সের ভারে কোমরটা বেঁকে গেছে। তিনি বলে উঠলেন :

"ওরে মেয়েটা ! তুই কেন বলছিস্ যে আমি ছেলেটাকে খুন করেছি ?

লা'টিপে তোকে ঠাণ্ডা করে দেব!"

পারলে সেইমুহূর্তেই আমি মুখ ফিরিয়ে ছুটে পালাতাম। কিন্তু তার উপর থেকে চোখ সরাতে পারলাম না, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তার কাছ থেকে পিছিয়ে যেতে লাগলাম; আর যেন তারের উপর দিয়ে হাঁটছেন এমনি-ভাবে খটখট শব্দ করে তিনি আমার দিকে তেড়ে এলেন; তার আঙুলগুলো আমার গলা লক্ষ্য করে উদ্যত, আর জিভ দিয়ে অনবরত একটা শব্দ করছেন —হিজ্—হিজ্—হিজ্!

যত তাড়াতাড়ি পারছি পিছিয়েই চলেছি; তার আঙুলগুলো আমার গলা থেকে আর মাত্র কয়েক ইঞ্চি দূরে; মনে হল তিনি আমাকে ছুঁলেই আমি সব জ্ঞান-বুদ্ধি হারিয়ে ফেলব।

এইভাবে পিছিয়ে পিছিয়ে ঘরের একেবারে কোণে গিয়ে পৌঁছলাম। গলা দিয়ে একটা আর্তনাদ বের হল, শুনলে মনে হবে আমার দেহ ও আত্মা পরস্পরকে ছেড়ে যাচ্ছে; আর ঠিক সেইমুহূর্তে আমার পিসি দরজা থেকেই একটা হাঁক দিল, সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধা মহিলাটি তারদিকে ঘুরে দাঁড়াল, আর আমিও সেই ফাঁকে একছুটে আমার ঘর পেরিয়ে সাধ্যমত দ্রুতগতিতে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে গেলাম।

তোমাকে বলি, নীচে গৃহকর্ত্রীর ঘরে ঢুকে প্রাণ খুলে এক চোট কাঁদলাম। সব কথা শুনে মিসেস ওয়াইভার্ণ হো-হো করে হেসে উঠল। কিন্তু বৃদ্ধা মহিলার কথাগুলি শুনেই তার গলার পর্দা নেমে গেল।

"আর একবার বল তো," সে বলল।

কথাগুলি আর একবার বললাম।

"ওরে মেয়েটা! তুই কেন বলেছিস যে আমি ছেলেটাকে খুন করেছি? গলাটিপে তোকে ঠাণ্ডা করে দেব।"

মিসেস ওয়াইভার্ণ বলল, "কি বললে, তিনি একটা ছেলেকে খুন করেছেন?

"আমি না মা'ম," আমি বললাম।

সেই থেকে জুডিস আমার উপর ক্ষেপে গেল। বয়স্ক মহিলা জুটি না থাকলে তার সঙ্গে একলা এক ঘরে থাকার চাইতে আমি বরং জানালা দিয়ে লাফিয়ে পালাতে পারলে বাঁচি।

যতদূর মনে পড়ে, এক সপ্তাহ পরের কথা; আমাকে একলা পেয়ে মিসেস ওয়াইভার্ণ মাদাম ক্রোল সম্পর্কে এমন একটা কথা আমাকে বলল যা আমি আগে জানতাম না।

পুরো সত্তর বছর আগে তিনি যখন যুবতী ছিলেন, অপরূপ সুন্দরী ছিলেন, তখন অ্যাপ্‌ল্‌ওয়েলের জমিদার ক্রোলকে বিয়ে করেন। জমিদার ছিলেন বিপত্নীক, তার ন' বছরের একটি ছেলে ছিল।

একদিন সকালে ছেলেটি নিখোঁজ হয়ে গেল ; সেই থেকে তার আর কোন খবর-বার্তা পাওয়া গেল না। তাকে বড় বেশী স্বাধীনতা দেওয়া হত ; কোনদিন হয় তো সকালেই চলে যেত শিকার-রক্ষকের ঘরে, সেখানেই প্রাতরাশ খেত, তারপর চলে যেত গো-চারণের মাঠে, সন্ধ্যার আগে বাড়ি ফিরত না ; আবার কোনদিন হয় তো হ্রদে চলে যেত, সেখানেই স্নান করত, মাছ ধরে বা নৌকো চালিয়েই সারাদিন কাটিয়ে দিত। তারপর—তার কি যে হল তা কেউ বলতে পারে না ; শুধু হথর্নের ঝোপের মধ্যে তার টুপিটা পাওয়া গেল ; সকলেই ধরে নিল যে স্নান করতে গিয়ে সে হ্রদের জলে ডুবে গেছে। পরে জমিদারের দ্বিতীয় স্ত্রী এই মাদাম ক্রোলের ছেলে জমিদার হলেন, অনেক বছর বাঁচলেন, আর তারপরেই তার ছেলে, এই বৃদ্ধা মহিলার নাতি শেভেনিক্স ক্রোল যখন জমিদার হয়ে বসলেন তখনই আমি এলাম অ্যাপ্‌ল্‌ওয়েলে।

'আমার পিসি এখানে আসার আগে এ নিয়ে এখানে অনেক কথা হত ; লোকে বলত, সৎ-মাটি অনেক কিছুই জানে, কিন্তু মুখ খোলে না। ছলাকলা ও তোষামোদ দিয়েই তিনি তার স্বামী বুড়ো জমিদারকে ভুলিয়ে রাখতেন। কিন্তু ছেলেটিকে যখন আর কোনদিনই দেখা গেল না, তখন কালক্রমে সকলে তার কথা ভুলেই গেল।

এবার তোমাকে বলব যা আমি আমার নিজের চোখে দেখেছি।

আমি সেখানে গিয়েছি ছ'মাসও হয় নি। শীতকাল। বৃদ্ধা মহিলাটি শেষবারের মত অসুস্থ হয়ে পড়লেন।

ডাক্তারের ভয় হল, আবার তার উন্মাদ-রোগ দেখা দিতে পারে। পনেরো বছর আগেও তিনি একবার উন্মাদ হয়েছিলেন ; তখন অনেক সময়ই তাকে একটা খাটো ঘাঘরা পরিয়ে কোমরবন্ধের সঙ্গে বেঁধে রাখা হত। একদিন পিসির ঘরের বাইরে সেই চামড়ার কুর্তাটাই আমি ঝোলানো দেখেছিলাম।

কিন্তু তিনি পাগল হলেন না। দিনরাত শুধু ভাবেন আর ভাবেন, উ—আঁ করেন ; শেষ পর্যন্ত চলে যাবার দু' একদিন আগে বিছানায় শুয়ে কখনও ছটফট করছেন। কখনও বক্‌-বক্‌ করছেন মনে হত একটা ডাকাত বুঝি তার গলায় ছুরি চেপে ধরেছে। এইসময় তিনি বিছানা থেকে নেমে পড়তেন, কিন্তু তখন আর হাঁটবার অথবা দাঁড়াবার মত শক্তি না থাকায় মেঝেতে পড়ে যেতেন ; অস্থিসার হাতদুটোকে মুখের সামনে বাড়িয়ে দিয়ে কেবলই ক্ষমা চাইতেন।

বুঝতেই তো পারছ তার ঘরে আমি যেতাম না ; মেঝেতে পড়ে তিনি গড়াগড়ি যেতেন, আছারি-পিছারি করতেন, মুখে এমন সব কথা বলতেন যাতে আমার চামড়া নীল হয়ে যেত ; ভয়ে নিজের বিছানায় শুয়ে থর্‌ থর্‌ করে কাঁপতাম।

আমার পিসি, মিসেস ওয়াইভার্ণ, জুডিথ স্কোয়াইল্‌স্‌, এবং লেক্স্‌হো থেকে আগত একটি স্ত্রীলোক সবসময় তার কাছে থাকত। শেষ পর্যন্ত তার বিকার দেখা দিলে সকলে তাকে বাইরে নিয়ে এল।

টি' মহাশয় (পাদ্রি) এলেন, তার জন্য প্রার্থনা করলেন, কিন্তু তখন তিনি সব প্রার্থনার অতীত। আমার মনে হল প্রার্থনা করাটাই ঠিক, কিন্তু তাতে কোন ফল হবে বলে কেউ মনে করল না। এইভাবে শেষ পর্যন্ত তিনি চলে গেলেন, সব শেষ হয়ে গেল, বৃদ্ধ ক্রোল ঠাকরুণকে শবাচ্ছাদনে ঢেকে শবাধারে শোয়ানো হল, আর জমিদার শেভেনিক্সকে চিঠি লেখা হল। কিন্তু তিনি তখন ফ্রান্সে, ফলে এত দেরি হতে লাগল যে টি' মহাশয় ও ডাক্তার দুজনই একমত হলেন যে মৃতদেহকে আর ফেলে রাখাটা ঠিক হবে না, স্থির হল, তারা দুজন আর অ্যাপ্‌ল্‌ওয়ে থেকে পিসি ও আমরা বাকি সকলেই তাকে সমাধি দিতে যাব। এইভাবে অ্যাপ্‌ল্‌ওয়েলের বৃদ্ধ মহিলাটিকে লেক্সহো গির্জার ভূগর্ভ-কক্ষে সমাহিত করা হল। জমিদার ফিরে এসে যতদিন আমাদের সম্পর্কে তার ইচ্ছার কথা না জানাচ্ছেন এবং আমাদের পাওনা-গণ্ডা মিটিয়ে না দিচ্ছেন তত'দন পর্যন্ত আমরা সেই বড় বাড়িটাতেই থেকে গেলাম।

ক্রোল ঠাকরুণ যে ঘরে থাকতেন তার দুটো দরজা পরের একটা আলাদা ঘরে আমাকে থাকতে দেওয়া হল; আর এই ঘটনাটা ঘটল জমিদার শেভেনিক্সের অ্যাপ্‌ল্‌ওয়েলে আসার আগেরদিন রাত্রে।

আমার নতুন ঘরটা বেশ বড আর চৌকো, ওক কাঠের প্যানেল করা, কিন্তু পুরো সুসজ্জিত নয়; শুধু মশারিবিহীন একটা বিছানা, একটা চেয়ার, বড় একটা টেবিল, এই আর কি, এত বড ঘরটার পক্ষে এ আসবাব যেন কিছুই নয়। যে আয়নাটায় বৃদ্ধ মহিলাটি নিজেকে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করতেন তার মৃত্যুর পরে সেটার প্রযোজন শেষ হওযায় আয়নাটাকে আমার ঘরের দেয়ালের গায়ে রেখে দেওয়া হয়েছে।

খবর এসেছে যে পরদিন সকালেই জমিদার অ্যাপ্‌ল্‌ওয়েলে পৌছে যাবেন; আমার তাতে মোটেই দুঃখ নেই, কারণ আমি ঠিক জানি যে এবার আমাকে বাড়িতে মার কাছেই পাঠিয়ে দেওয়া হবে। বরং আমার খুব আনন্দ হতে লাগল; কেবলই ভাবছি বাড়ির কথা, বোন জ্যানেট, বিড়ালবাচ্চাগুলো, কুকুর ট্রিমার ও অন্য অনেকের কথা। ফলে মন এত চঞ্চল হয়ে উঠল যে ঘুমতেই পারলাম না। ঘড়িতে বারোটা বাজল, আমি জেগেই আছি, ঘরময় গাঢ় অন্ধকার। আমার পিঠ দরজার দিকে, আর চোখদুটো বিপরীত দিকের দেয়ালে।

তারপর, বারোটা বেজে পনেরো মিনিটও হয় নি এমন সময় সামনের দেয়ালে একটা আলো দেখতে পেলাম, যেন পিছনে একটা কিছু জ্বলে উঠল,

আর সঙ্গে সঙ্গে বিছানা, চেয়ার, ও দেয়ালে ঝোলানো আমার গাউনের ছায়াগুলি যেন সিলিংএর বরগায় ও ওক কাঠের প্যানেলের উপর নাচতে শুরু করে দিল ; কোন কিছুতে আগুন লেগেছে মনে করে তাড়াতাড়ি মাথাটা ঘোরালাম।

হায় জেন, এ আমি কি দেখলাম ! এ যে সেই বৃদ্ধা মহিলা, তারই মৃত-দেহ সাটিনে-ভেলভেটে সাজানো, ঠোঁটে অর্থহীন হাসি, চোখ দুটো পিরিচের মত চওড়া, মুখটা যেন স্বয়ং শয়তানের। দেহের নীচের দিক থেকে একটা লাল আলো উঠে আসছে, যেন পায়ের চারদিকে তার পোশাকটা জ্বলছে। মূর্তিটা সোজা আমার দিকেই ছুটে আসছে, কোঁচকানো জরাজীর্ণ হাতদুটি বাড়িয়ে দিয়েছে. যেন আমার গলা টিপে ধরবে ; আমি নড়তেও পারলাম না, মূর্তিটা আমাকে পাশ কাটিয়ে চলে গেল. ছড়িয়ে গেল এক ঝলক ঠাণ্ডা হাওয়া ; তাকিয়ে দেখলাম, দেয়ালের গায়ে দরজা-খোলা একটা কুঠুরি—আগেকার দিনে সেখানেই রাজকীয় শয্যা পাতা থাকত—আর মূর্তিটি সেখানে কি যেন খুঁজছে। আগে কখনও দরজাটা দেখি নি। মূর্তি আমার দিকে ঘুরে দাঁড়াল, ঠিক যেন একটা বিন্দুর উপর দাঁড়িয়েছে ; তার দাঁত কড়মড় করছে ; তারপরেই হঠাৎ ঘরটা অন্ধকার হয়ে গেল ; বিছানার একপ্রান্তে আমি দাঁড়িয়ে আছি ; কেমন করে সেখানে গেলাম তাও জানি না ; শেষ পর্যন্ত গলায় স্বর ফুটল, চীৎকার করে বারান্দা দিয়ে ছুটতে ছুটতে মিসেস ওয়াইভার্ণের দরজাটা এক ধাক্কায় খুলে ফেলে তাকে ভয়ে একেবারে হতভম্ব করে দিলাম।

বুঝতেই পারছ সারারাত ঘুমতে পারলাম না ; ভোরের প্রথম আলো ফুটতেই প্রাণপণে ছুটতে ছুটতে পিসির কাছে গিয়ে হাজির হলাম।

আমি ভেবেছিলাম পিসি আমাকে বকবে, ধমকাবে. কিন্তু সেসব কিছুই করল না ; হাতটা ধরে কঠিন দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। বলল, আমি যেন ভয় না পাই। তারপর জিজ্ঞাসা করল :

"মূর্তির হাতে কি একটা চাবি ছিল ?"

মনে করার চেষ্টা করে বললাম, "হ্যাঁ, পিতলের অদ্ভুত হাতলওয়ালা একটা বড় চাবি।"

"একটু থাম," বলে পিসি আমার হাতটা ছেড়ে দিয়ে কাবার্ডের দরজাটা খুলে আঙুল বাড়িয়ে একটা চাবি তুলে নিয়ে শুধাল, "এইরকম চাবি কি ?"

তাড়াতাড়ি বললাম, "তাই হবে।"

চাবিটা ঘুরিয়ে পিসি বলল, "তুমি ঠিক জান ?"

বললাম, "নিশ্চয়" ; পরক্ষণেই মনে হল আমি বুঝি মূর্ছা যাব।

"ঠিক আছে, এতেই হবে," বলে পিসি চাবিটাকে আবার তালা দিয়ে আটকে রাখল।

কি যেন ভেবে আবার বলল, "আজ বারোটার আগেই জমিদার স্বয়ং এখানে আসছেন; এসব কথা তাকে অবশ্য বলবে। মনে হচ্ছে আমি শিগ্‌গিরই এখান থেকে চলে যাব; কাজেই বর্তমানে সবচাইতে ভাল ব্যবস্থা হচ্ছে তুমি আজ বিকেলেই বাড়ি চলে যাও; সুবিধামত আমিই তোমার জন্য আর একটা কাজ খুঁজে দেব।

বুঝতেই পারছ, একথা শুনে আমি খুশিই হলাম।

পিসি আমার জিনিসপত্র বাঁধাছাদা করে দিল, বাড়ি নিয়ে যাবার জন্য প্রাপ্য তিন পাউণ্ড দিয়ে দিল। জমিদার ক্রোল সেইদিনই অ্যাপ্‌লণ্ডয়েলে এলেন; সুপুরুষ, বয়স প্রায় ত্রিশ। এই দ্বিতীয়বার তাকে দেখলাম, কিন্তু এই প্রথমবার তিনি আমার সঙ্গে কথা বললেন।

গৃহকর্ত্রীর ঘরে বসেই পিসি তার সঙ্গে কথাবার্তা বলল, তাদের মধ্যে কি কথা হল আমি জানি না। জমিদারকে দেখে একটু ভয়ই পেয়েছিলাম; কত বড় ভদ্রলোক তিনি; তাই না ডেকে পাঠানো পর্যন্ত তার কাছে যাবার সাহস হয় নি। তিনি কিন্তু হেসে বললেন:

"তুমি কি দেখেছ গো মেয়ে? নির্ঘাৎ একটা স্বপ্ন দেখেছ, কারণ পৃথিবীতে ভূত-পেত্নী বলে কিছু নেই। সে যাই হোক, এখানে বসে সব কথা আগাগোড়া বলো তো মেয়ে।"

তারপর আমি সবকথা বলতেই তিনি একটু চিন্তা করে পিসিকে বললেন:

"জায়গাটা আমি ভালই চিনি। বৃদ্ধ স্যার অলিভারের সময় খোঁড়া ওয়াইণ্ডেল আমাকে বলেছিল, ঐ কুটুরির বাঁদিকে যেখানে মেয়েটি স্বপ্নের মধ্যে আমার ঠাকুরমাকে একটা দরজা খুলতে দেখেছে সেখানে সত্যি একটা দরজা ছিল। সে যখন আমাকে কথাটা বলেছিল তখন তার বয়স আশি পেরিয়ে গেছে, আর আমি তখন একটি বালকমাত্র। তারপর বিশ বছর পার হয়ে গেছে। অনেককাল আগে, পর্দা-ঢাকা ঘরের লোহার ঘরটা তৈরি হবারও আগে, সেখানেই সব মূল্যবান বাসনপত্র ও হীরে-জহরত রাখা হত। সে আমাকে বলেছিল, কুঠুরির দরজার চাবির হাতলটা ছিল পিতলের, আর আপনি বলছেন তিনি যেখানে তার পুরনো পাখাগুলি রাখতেন সেই সিন্দুকের তলায় চাবিটা পাওয়া গিয়েছিল। এবার, যদি আমরা সেখানে গিয়ে ভুল করে ফেলে-যাওয়া কোন চামচ বা হীরে দেখতে পাই তাহলে কি ব্যাপারটা খুব অদ্ভুত হবে না? তুমি আমাদের সঙ্গে চল তো মেয়ে, ঠিক জায়গাটা দেখিয়ে দেবে।"

অনিচ্ছাসত্ত্বেও মনটাকে মুখের মধ্যে নিয়ে পিসির হাতটা সজোরে চেপে ধরে সেই ভয়ংকর ঘরটাতে ঢুকলাম, তাদের দুজনকেই বুঝিয়ে বললাম, কেমন করে তিনি এলেন, আমাকে পাশ কাটিয়ে চলে গেলেন, ঠিক কোথায় তিনি

দাঁড়ালেন, আর কোথায় দরজাটা খুলে গেল বলে মনে হয়েছিল।

দেয়ালের গায়ে তখন একটা পুরনো খালি আলমারি ছিল; সেটাকে ঠেলে সরিয়ে দিতেই দেয়ালের কাঠের আচ্ছাদনের উপর একটা দরজার চিহ্ন চোখে পড়ল; চাবির ছিদ্রটাকে কাঠ দিযে বন্ধ করে র‍্যাঁদা মেরে সমান করে দেওয়া হয়েছে, আর দরজার জোড়গুলোকে পুটিং দিযে বন্ধ করে ওক কাঠের রং লাগিযে দেওয়া হয়েছে; আলমারিটা সরানোর ফলে কজার দাগটা চোখে না পড়লে কেউ বুঝতেই পারত না যে সেখানে একটা দরজা কোনকালে ছিল।

বিচিত্র হাসি হেসে জমিদার বললেন, "হ্যাঁ। সেইরকমই তো মনে হচ্ছে।"

একটা ছোট বাটালি ও হাতুড়ি এনে চাবির ছিদ্রের ভিতর থেকে কাঠটা বের করতে মাত্র কয়েকমিনিট সময় লাগল। চাবিটা ঠিক লেগে গেল; চাবিটাকে সজোরে একপাক ঘোরানো হল, ক্যাচ্ করে একটা টানা শব্দ হল, হুড়কোটা পড়ে গেল আর একটানে তিনি দরজাটা খুলে ফেললেন।

ভিতরে আর একটা দরজা, আগেরটার চাইতেও মজবুত; কিন্তু তালা না থাকায় সহজেই খুলে গেল। ভিতরে একটা ছোট মেঝে, দেওয়াল ও ইঁটের ঘর; ভিতরে কি আছে দেখতে পেলাম না, কারণ ভিতরটা ঘুরঘুট্টি অন্ধকার।

পিসি একটা মোমবাতি ধরালে জমিদার সেটা হাতে নিযে ভিতরে পা দিলেন।

পিসি পায়ের আঙুলে ভর দিয়ে তার ঘাড়ের উপর দিযে ভিতরটা দেখতে চেষ্টা করল, কিন্তু আমি কিছুই দেখতে পেলাম না।

পিছিযে এসে জমিদার বললেন, "হা। হা! ওটা কি? কয়লা ঠেলার শিকটা আমাকে এনে দিন তো—জলদি!" তিনি পিসিকে বললেন। পিসি অগ্নিকুণ্ডের খোঁজে চলে যেতেই আমি জমিদারের হাতের ফাঁক দিয়ে ভিতরে উঁকি দিলাম। দেখলাম মেঝের এককোণে সিন্দুকটার উপর বসে আছে একটা বাঁদর অথবা ছালছাড়ানো কোন জন্তু, আর তা না হলে অত্যন্ত কুঁচকে-যাওয়া শীর্ণ-বিশীর্ণ কোন বৃদ্ধ।

শিকটা জমিদারের হাতে দিযে তার ঘাড়ের উপর দিযে ভিতরে উঁকি দিয়ে সেই দুর্গন্ধ বস্তুটাকে দেখতে পেয়ে পিসি বলে উঠল, "হায় জেন! খুব সাবধান স্যার; কী করছেন আপনি? ফিরে আসুন, দরজাটা বন্ধ করে দিন!"

তিনি কিন্তু তার পরিবর্তে শিকটাকে তলোয়ারের মত তাক করে ধরে বস্তুটাকে একটা খোঁচা মারলেন, আর সেটা ধর-মাথাশুদ্ধু হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল, একগাদা হাড় ও ধুলো—একটা টুপি-ভর্তির চাইতে কিছু বেশী।

হাড়গুলো একটা শিশুর; বাকি সবটা ছোঁয়ামাত্রই ধুলোর মত গুঁড়ো

হয়ে গেল। কারও মুখে কোন কথা নেই, কিন্তু তিনি মেঝের উপরকার খুলিটার দিকে তাকালেন।

বললেন, "একটা মরা বিড়াল!" পিছিয়ে এসে মোমবাতিটা নিভিয়ে দিয়ে তিনি দরজাটা বন্ধ করে দিলেন। "মিসেস শাটার্স, আপনি ও আমি আবার এখানে আসব। এবং একটা একটা করে তাকগুলো খুঁজে দেখব। আপনার সঙ্গে অন্য ব্যাপারেও আমার কিছু কথা আছে; আর আপনিই তো বললেন, এই ছোট্ট মেয়েটি বাড়ি চলে যাচ্ছে। ওর মাইনে ও পেয়ে গেছে, আমি ওকে একটা উপহার দিতে চাই," বলে তিনি আমার কাঁধটা চাপড়ে দিলেন।

তিনি আমাকে একটা পুরো পাউণ্ড দিলেন, আর ঘণ্টাখানেক পরে লেক্স্‌হো যাত্রা করলাম; সেখান থেকে যাত্রীগাড়িতে চেপে বাড়ি পৌঁছে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলাম। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, অ্যাপ্‌লওয়েলের ক্রোল ঠাকরুণ আর কোনদিন আমাকে দেখা দেন নি—না সশরীরে, না স্বপ্নে। কিন্তু আমি বড় হয়ে উঠলে একবার পিসি লিট্‌ল্‌হাম-এ এসে একটা দিন ও রাত আমার কাছে কাটিয়েছিল; তখনই সে আমাকে বলেছিল, যে বেচারি ছেলেটি অনেকদিন নিখোঁজ হয়ে গিয়েছিল, কুৎসিত দুষ্টু বুড়িটাই যে তাকে অন্ধকার ঘরে আটকে রেখে মেরে ফেলেছিল সেবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। ছেলেটির চেঁচামেচি, প্রার্থনা, দাপাদাপি কিছুই কেউ শুনতে পায় নি; সে যে জলে ডুবেই মারা গেছে সেটা বোঝাবার জন্যই তার টুপিটা জলের ধারে ফেলে রাখা হয়েছিল; কাজটা কে করেছিল তাও কেউ জানে না। হাত দেওয়ামাত্রই তার পোশাকগুলো একমুঠো ছাই হয়ে ছড়িয়ে পড়েছিল। কিন্তু তার মধ্যে ছিল একমুঠো কালো বোতাম, সবুজ বাঁটের একটা ছুরি, আর দুটো পেনি; বেচারিকে যখন ভুলিয়ে ওখানে নিয়ে যাওয়া হয় পেনি দুটো হয় তো তখন তার পকেটেই ছিল; তারপরে সে আর কখনও আলোর মুখ দেখে নি। জমিদারের কাগজপত্রের মধ্যে একটা বিজ্ঞপ্তির কপি পাওয়া গিয়েছিল। ছেলেটি হারিয়ে যাবার পরে বিজ্ঞপ্তিটা ছাপানো হয়েছিল; বুড়ো জমিদার ভেবেছিলেন, হয় সে পালিয়ে গেছে, নয় তো জিপ্‌সিরা তাকে ধরে নিয়ে গেছে, বিজ্ঞপ্তিতে লেখা ছিল, ছেলেটির সঙ্গে সবুজ হাতলওয়ালা একটা ছুরি ছিল, আর তার বোতামগুলো ছিল জেট কেটে তৈরি। আর অ্যাপ্‌লওয়েল হাউসের বৃদ্ধ ক্রোল ঠাকরুণ সম্পর্কে আমার কথাও এখানেই শেষ।

Madam Crowl's Ghost—Josef Saridon Lee Fanu

ইতালীয় ভদ্রলোকের কাহিনী

"আপনার বন্ধুটি কী সুন্দর ইংরেজি বলেন!" আমি যখন বিদেশে ছিলাম তখন একদিন সবেমাত্র ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়া ভদ্রলোকটি সম্পর্কে আমার পরিচিত লোকটির কাছে এই মন্তব্য করেছিলাম। "ওর নামটা কি?"

"কাউণ্ট ফ্রান্সিস্কো ফেরাল্দি।"

'মনে হচ্ছে তিনি ইংলণ্ডে ছিলেন?"

"নিশ্চয়; দেশ থেকে নির্বাসিত হয়ে তিনি সেখানে ইতালীয় ভাষা পড়াতেন। তার ইতিহাসটি অদ্ভুত, আপনার ভাল লাগবে, কারণ অদ্ভুত জিনিস আপনি ভালবাসেন।"

"সে ইতিহাস আমাকে শোনাতে পারেন?"

"ঠিকমত পারব না, কারণ তার নিজের মুখ থেকে কখনও শুনি নি, কিন্তু আমার বিশ্বাস, সে ইতিহাস বলতে তার কোন আপত্তি নেই—তবে যে রাজনৈতিক ঝামেলায় তিনি জড়িয়ে পড়েছিলেন আর যার জন্য তাকে অস্ট্রেলীয় রাজ্য থেকে বের করে দেওয়া হয়েছিল সেসব কথা বাদ দিয়ে; আমার বিশ্বাস, জীবনের সে অধ্যায়ের উল্লেখ করাটা তিনি সমীচিন বলে মনে করেন না। তার সঙ্গে যদি দেখা করতে চান তো তাকে ডিনারে ডাকব, আর হয় তো তার গল্প শোনাতে তাকে রাজীও করাতে পারব।" তদনুসারেই আমাদের দেখা হল; "আঁ পেতিত্ কোমিতে"-তে আমরা ডিনার খেলাম, আর কাউণ্টও সানন্দে আমাদের অনুরোধ মেনে নিলেন; বললেন, "কিন্তু অনেকদিন আগেকার কথা দিয়ে শুরু করছি বলে আমাকে ক্ষমা করবেন, কারণ আমার কাহিনীর শুরু তিনশ' বছর আগে।"

"আমাদের পরিবার বহু প্রাচীনত্বের দাবীদার, কিন্তু দশম শতাব্দীর শেষার্দ্ধের আগে পর্যন্ত আমরা খুব বেশী সম্পদশালী ছিলাম না, ঠিক ঐ সময়েই কাউণ্ট জাকোপো ফেরাল্দি পৈত্রিক সম্পত্তিকে বহুলাংশে বাড়িয়ে ফেললেন; শুধু উপার্জনের পথেই নয়, সঞ্চয়ের পথেও—আসলে তিনি ছিলেন কৃপণস্বভাব। তার আগে পর্যন্ত ফেরাল্দিরা ছিলেন যোদ্ধা; আমাদের ইতিহাসে বর্ণিত অনেক বিখ্যাত যুদ্ধ-বিগ্রহের জন্যই আমরা গর্ববোধ করতে পারি; কিন্তু দাদার মৃত্যুতে উপাধি এবং জমিদারির উত্তরাধিকার লাভ করলেও জাকোপো তার জীবন আরম্ভ করেছিলেন পরিবারের ছোট ছেলে হিসাবেই এবং তার নিজের অংশ নিয়ে সন্তুষ্ট হতে না পেরে ব্যবসা করে সম্পত্তি বাড়াবেন বলে স্থির করলেন।

"ফ্লোরেন্স তখন এখনকার মত শহর ছিল না; ব্যবসা-বাণিজ্যের জম-

জমাট অবস্থা, ব্যবসায়ীদের যোগাযোগ ও বড় মাপের লেন-দেন ছিল ইওরোপের সব বড় বড় শহরের সঙ্গে। আমার সেই পূর্বপুরুষটি তার যৎসামান্য ধন-সম্পত্তিকে এমন সুবিবেচনা ও সৌভাগ্যের সঙ্গে ব্যবসাতে লগ্নি করলেন যে প্রথম প্রচেষ্টাতেই সেটা তিনগুণ বেড়ে গেল, আর যেহেতু যেসব মানুষ উপার্জন করে কিন্তু খরচ করে না তারাই তাড়াতাড়ি ধনী হয়ে ওঠে, তাই তিনিও অচিরেই মনের সাধ মিটিয়ে সম্পদের অধিকারী হলেন। কিন্তু তার সম্পর্কে কথাটা বলা বোধ হয় ভুল হল,—নিজের উপার্জনে কখনও তার সাধ মেটে নি, সম্পত্তি বাড়াতে তার পরিশ্রম চলতেই থাকল, কারণ ক্রমে তিনি অর্থের জন্যই অর্থকে ভালবাসতে শুরু করলেন, সে অর্থ দিয়ে যা কেনা যায় তাকে ভালবাসা নয়।

"অবশেষে তার দুই দাদা মারা গেলেন, আর তাদের কোন সন্তান না থাকায় তিনি তাদের ধন-সম্পত্তিরও উত্তরাধিকারী হয়ে পিতৃপুরুষের প্রাসাদেই বাস করতে লাগলেন, কিন্তু সম্পত্তিকে না খাটিয়ে শুধু জমাতেই লাগলেন, অত্যধিক কৃপণতার জন্য বন্ধু বান্ধব ও প্রতিবেশীদের আপ্যায়িত না করে মস্ত বড় বাড়িতে সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর মত বাস করতে লাগলেন, সম্পত্তির সুখ নিয়েই তার দিন কাটতে লাগল, সে সম্পত্তি কখনও ভোগ করলেন না। তার সবচাইতে বড় আনন্দ ও প্রধান কাজ হল টাকা গোণা, সে টাকা তিনি লুকিয়ে রাখতেন অদ্ভুত অদ্ভুত সব জায়গায়, অথবা মেঝেতে ও দেয়ালে লুকনো লোহার সিন্দুকে। কিন্তু এত সব সতর্কতা সত্ত্বেও কুকুরের মত পাহারা দেওয়া সত্ত্বেও, একদিন তিনি অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বুঝতে পারলেন যে তার দু'হাজার পাউণ্ড খোয়া গেছে, তিনি টাকাটা লুকিয়ে রেখেছিলেন খাবার ঘরের মেঝের নীচে একটা কুঠুরি বানিয়ে, যার খবর একমাত্র সেই জানত যে সেটা বানিয়েছিল, অন্তত তিনি তাই বিশ্বাস করতেন। এ টাকাটা তার সম্পত্তির তুলনায় খুবই সামান্য, তবু তিনি প্রচণ্ড আঘাত পেলেন, অপরাধীকে বিচারালয়ে টেনে নিয়ে যাবার উদ্দেশ্যে তিনি বাড়ি থেকে পাগলের মত ছুটে বেরিয়ে গেলেন, কিন্তু লোকটির দোকানে পৌঁছে দেখলেন সে শয্যাশায়ী, তার মৃত্যু আসন্ন। তার বন্ধুরা ও ডাক্তার শপথ করে জানাল যে গত এক পক্ষকাল সে বাড়ি থেকেই বের হয় নি, এককথায় তাদের হিসাবমত কাউণ্টের বাড়ির কাজ শেষ করে যেদিন সে বাড়ি ফিরেছে সেইদিনই সে অসুস্থ হয়ে পড়ে।

"একথা সত্যি হলে তো সে চোর হতে পারে না, কারণ টাকাটা সেখানে রাখা হয়েছিল তারও দিনকয়েক পরে। যদিও কাউণ্টের মনে এবিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ ছিল, তবু সকলে শপথ নিয়ে যেকথা বলেছে তাকে মিথ্যা প্রমাণ করাটা সহজ নয়, বিশেষত পরদিনই লোকটির মৃত্যু হয় এবং তার সমাধিও হয়। সে চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায় তার সব রাগ গিয়ে পড়ল দুই চাকরের উপর—

মাত্র দুটি চাকরই তিনি রাখতেন, কারণ তিনি বাস করতেন প্রাসাদের একটি ছোট অংশে। তাদের দুজনকে সন্দেহ করার অথবা গুপ্তস্থানের সন্ধান তারা জানতে পারে এধারণা করার তিলমাত্র কারণও ছিল না। তাছাড়া, টাকাটা সেখানে রেখে তিনি যেভাবে তালা লাগিয়েছিলেন তালাটাকে ঠিক সেই অবস্থায়ই পাওয়া গেছে, আর চাবিটা যে কোন সময়ই তার হাতছাড়া হয়নি সেবিষয়েও তিনি সুনিশ্চিত। তথাপি তিনি তাদের ছাড়িয়ে দিলেন, এবং নতুন কোন চাকর রাখলেন না। চোর যেই হোক সে যতখানি দক্ষতার পরিচয় রেখেছে সেকথা ভেবে তিনি ভয়ে শিউরে উঠলেন। কাজেই তিনি স্থির করলেন আর চাকর রাখবেন না। পাশের একটা খাবার দোকান থেকে নিজের খাবারটা আনিয়ে নেবেন, আর একটি লোক ঠিক করবেন যে সপ্তাহে একদিন এসে ঝাট দেবে ও ঘরদোর পরিষ্কার করবে, যাতে সে যখন কাজ করবে তখন তিনি তার উপর নজর রাখতে পারবেন। যেহেতু ডাকাতির কোন সূত্রই তাঁর হাতে ছিল না, আর যে লোকটিকে সন্দেহ করার যথেষ্ট কারণ ছিল সেও মারা গেছে, তাই এব্যাপার নিয়ে তিনি আর কিছু করলেন না, বরং পাছে তার সঞ্চিত অর্থ সম্পর্কে একটা সোরগোল পড়ে যায় এই আশংকায় চুপ করেই গেলেন, তথাপি বাইরে শান্ত ভাব দেখালেও এই ক্ষতি তার মনের উপর চেপে বসল, তার মনে মহা অশান্তি বাসা বাঁধল।

এই ঘটনার কিছুদিন পরেই তিনি তার বোনের কাছ থেকে একটা চিঠি পেলেন। কয়েক বছর হল জনৈক ইংরেজের সঙ্গে সে বোনের বিয়ে হয়েছে। বোন লিখলেন, তার স্বামী মারা গেছে, এ অবস্থায় তার একমাত্র ছেলে কোন ব্যবসায়ে ঢুকুক এটাই তার ইচ্ছা, আর সেইজন্যই তিনি ছেলেকে ফ্লোরেন্সে পাঠাচ্ছেন, তার স্থির বিশ্বাস, দাদা তাকে সুপরামর্শই দেবেন এবং যে টাকা সে সঙ্গে নিয়ে যাবে তার যথাসম্ভব সদ্ব্যবহার করবেন।

"খবরটা মোটেই সুখবর নয়, নিজের স্বার্থ ছাড়া অন্যের স্বার্থ দেখা তার স্বভাব নয়, তার মনে হল, এই যুবকটি সব সময় তার উপর নজর রাখবে, তার বাড়িতে অবাঞ্ছিত অতিথি হয়ে বাস করবে, আর সম্পত্তি-প্রত্যাশী ও লোভী উত্তরাধিকারী হিসাবে তার মৃত্যুর অপেক্ষায় দিন গুণতে থাকবে; কারণ এই বোন ও তার পরিবারই তার নিকটতম আত্মীয়। অন্যরূপ কোন উইল করে না গেলে তারাই হবে তার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী। যাই হোক, যুবকটির আসা এখন আর আটকানো যাবে না। সেকালে চিঠিপত্র চলাচল করত ধীর গতিতে, তার চিঠি যতদিনে ইংলণ্ডে পৌছবে তার আগেই ভাগ্নে সেখান থেকে বেরিয়ে পড়বে, তাই তিনি স্থির করলেন, খুবই নিরাসক্তভাবে তাকে অভ্যর্থনা জানাবেন, আর যত শীঘ্র সম্ভব তাকে ফেরৎ পাঠিয়ে দেবেন।

"এদিক যুবকটি তো পূর্ণ আশা ও বিশ্বাস নিয়ে যাত্রা করল; গন্তব্যস্থানে পৌছে সঙ্গে সঙ্গেই ধনী মামার বাড়িতে গিয়ে হাজির হল। শুধু যে নিজের

জন্যই সে অর্থবান হতে চাইছে তা নয়। তার মা ও বোন খুবই দারিদ্র্যের মধ্যে দিন কাটাচ্ছে; তাদের যৎসামান্য যা কিছু ছিল সবই এই প্রচেষ্টায় বিনিয়োগ করেছে; তাদের আশা, আত্মীয়টির সহায়তায় তাদের এই ত্যাগ একদিন পরিপূর্ণ হয়ে ফিরে আসবে।

"ঠিক বিশ বছর আগে আর্থার অ্যালেন ছিল খোলা মনের একটি চমৎকার ছেলে; এরকম মুখ, এরকম মানুষ অনেকদিন সেসব ঘরে দেখা যায় নি। সে ভালভাবে মানুষ হয়েছে, লেখাপড়াও ভালই শিখেছে. ছেলেবেলা থেকেই মায়ের চেষ্টায় সে ইতালীয় ও ইংরেজি ভাষা শিখেছিল।

"যদিও সে শুনেছিল যে তার মামা কৃপণ, তবু সে কৃপণতার পাগলামি যে কতদূর গিয়ে পৌঁচেছে তার কোন ধারণাই তার ছিল না। যেভাবে তাকে অভ্যর্থনা জানানো হল তাতেই তার সানন্দ প্রত্যাশায় অনেকখানি ভাটা পড়ল। মামার কঠিন, ধূসর চোখে ও কুঞ্চিত মুখে স্মিত হাসির একটা রেখাও সে দেখতে পেল না। তার আশংকা হল, বৃদ্ধ লোকটি হয় তো এই ভয় পেয়েছেন যে একটা ব্যবসা গড়ে তোলার কাজে সে তার কাছে প্রার্থী হয়ে এসেছে সাহায্যের আশায়; তাই সে তাড়াতাড়ি মামাকে প্রকৃত অবস্থা বোঝাতে জানিয়ে দিল যে সে দু' হাজার পাউণ্ড সংগ্রহ করে এনেছে।

মামাকে বলল, "মা অবশ্য আমার মত অনভিজ্ঞ লোকের হাতে এতগুলি টাকা বিশ্বাস করে দিতেন না, কিন্তু তার ইচ্ছা, সব টাকাটা আমি আপনার হাতেই তুলে দেই, এবং সম্পূর্ণভাবে আপনার কথামতই কাজকর্ম করি।"

"কৃপণ লোকটির নিজের ভাষায়ই বলি"—এইসব বিবরণ তার নিজের স্মৃতি-কথা থেকেই আমরা জেনেছি—'এই কথাগুলি শুনেই শয়তান এসে আমার মনে ভর করল, যুবকটিকে বললাম, পরদিনই সে যেন টাকাটা নিয়ে আসে এবং আমার সঙ্গেই ডিনার খায়।'

"আপনারা নিশ্চয়ই ভাবছেন যে শয়তান তো অনেকদিন আগেই তার মধ্যে বাসা বেঁধেছিল; যাই হোক, এতদিনে তিনি তার উপস্থিতিটা জানতে পারলেন, কিন্তু তবু তার পরামর্শমত কাজ করা থেকে তিনি বিরত হলেন না।

মামার শীতল ব্যবহারকে কিছুটা গলাতে পারায় খুশি হয়ে আর্থার পরদিন নির্দিষ্ট সময়ে টাকার থলি নিয়ে হাজির হল: একটা ভিতরের ঘরে দুজনের দেখা হল; টাকাপয়সা গুণে গেথে পরীক্ষা করে বুড়োর লোহার সিন্দুকে রাখা হল। একটু পরেই ঘণ্টার টুং-টাং আওয়াজ জানিয়ে দিল যে পাশের দোকানের ওয়েটার ডিনার নিয়ে এসেছে। সব ব্যবস্থা ঠিক করতে বৃদ্ধ ঘর থেকে চলে গেলেন। একটু পরেই ফিরে এসে অতিথিকে নিয়ে টেবিলে বসলেন। ভোজটা বড় রকমের কিছু নয়, কিন্তু এক বোতল পুরনো ল্যাক্রিমা ক্রিস্তি ছিল, আর যুবক সেটা খুব পরিতৃপ্তির সঙ্গে পান করল। কিন্তু কী

আশ্চর্য ! প্রথম গ্রাসটি গলায় ঢালবার সঙ্গে সঙ্গেই তার চোখ যেন ঠিকরে বেরিয়ে এল—গলার মধ্যে একটা ঘর্-ঘর্ শব্দ উঠল—মুখটা বেঁকে গেল—আর শরীরটা শক্ত হয়ে গেল।

"বুড়ো তার স্মৃতিকথায় লিখেছেন, 'আমি চোখ তুলে তাকাই নি, কারণ যে ছেলেটি এত খুশি মনে ডিনারে বসেছিল তার মুখটা আমি দেখতে চাই নি ; আমি খেতে লাগলাম—কিন্তু গলার শব্দটা শুনেই বুঝতে পারলাম কি হয়েছে; পাছে ডিনারের জিনিসপত্র নিযে যেতে চাকরটা এসে পড়ে তাই আমি টেবিলটাকে টেনে সরিযে দিয়ে যে কুঠুরিটা থেকে আমার দু'হাজার পাউণ্ড চুরি গিযেছিল—চোরটার সর্বনাশ হোক !—সেটা খুলে মদের বোতলটা সমেত দেহটাকেও তার মধ্যে ঢুকিয়ে দিলাম। তালা বন্ধ করে দুটো পেরেক ঠুকে দিলাম। তারপর টেবিলটাকে যথাস্থানে রাখলাম—ছেলেটার চেযার ও প্লেট সরিয়ে দিলাম, ভালভাবে এঁটে যাওযা দরজার তালাটা খুলে নিলাম, এবং আমার ডিনার শেষ করতে বসে গেলাম। তার খাওযাটা কিভাবে নষ্ট হল সেকথা ভেবে আমি মুচকি হাসি না হেসে পারলাম না।

'বাড়ির সে অংশটাই বন্ধ করে দিলাম , ভাবলাম, কোনরকম গন্ধ বের হলে লোকের নজরে পড়ে যাবে ; বারান্দার উল্টো দিকের একটা ঘরকে খাবার ঘর হিসাবে বেছে নিলাম। পরদিন পর্যন্ত ভালয় ভালয় কাটল। আমার দু'হাজার পাউণ্ড বার বার গুণলাম—সেটা হাতাতে পারার জন্ত আত্মপ্রসাদ অনুভব করলাম—মনে হল এ টাকাতো আমারই, যেখান থেকেই হোক সেটা হাতিযে নেবার অধিকার আছে। বোনকে চিঠি লিখে দিলাম যে তার ছেলে এসে পৌঁছয় নি , এসে পৌঁছলে তার অভিপ্রায় অনুযায়ী সাধ্যমত সাহায্য করব। সেদিন আমার মনটা অনেক হালকা হল—লোকে বলে সেটা খারাপ লক্ষণ।

'হ্যাঁ, এ পর্যন্ত বেশ ভালই ছিল ; কিন্তু পরদিন আবার আমরা দুজন ডিনারে বসলাম ! অথচ আমি কাউকে নিমন্ত্রণ করি নি , আর তার পরদিন—তারপর দিন—এইভাবে—চলতেই থাকল ! আমি যেই বসতে যাই, অমনি সেই অনাহুত অতিথি ঘরে ঢুকে আমার বিপরীত দিকের চেয়ারটায় বসে। বাড়িতে ডিনার খাওয়া ছেড়ে দিলাম, কিন্তু তাতেও কোন তফাৎ হল না ; যেখানেই খেতে বসি সে সেখানেই এসে বসে পড়ে। আমাকে অতিষ্ঠ করে তুলল ; কিছু মনে না করতে চেষ্টা করলাম, কিন্তু মনে না করেও উপায় নেই। যুক্তি-তর্ক বৃথা। ক্ষিদে চলে গেল, অকালে শুকিয়ে মরতে চললাম। শেষ পর্যন্ত হতাশ হয়ে ফ্রা গিসেপ্পের সঙ্গে পরামর্শ করলাম। তিনি অনুতাপ করতে বললেন, টাকাটা ফিরিয়ে দিতে বললেন। চেষ্টা করলাম, কিন্তু অনুতাপ করতে পারলাম না, কারণ টাকাটা যে আমার হাতে। ভাবলাম, টাকাটা যদি আর কাউকে দিতে পারি তাহলে হয় তো মুক্তি পাব। কাজেই একটা সুবিধাজনক-

লেনদেনের খোঁজ করতে লাগলাম। যখন শুনলাম যে বার্তোলোমিউ মাল্‌ফি খুব অর্থ কষ্টে পড়েছে তখন তার কাছেই প্রস্তাব দিলাম—তার জমিটার জন্য আমি নগদ দু'হাজার পাউণ্ড দাম দিতে রাজী আছি, যদিও আমি জানতাম যে জমিটার দাম তার তিনগুণ; আমরা চুক্তি-পত্রে সই করলাম, তারপর বাড়ি ফিরে যেঘরে টাকাটা ছিল সেই ঘরের দরজাটা খুললাম, কিন্তু এ কি! যে সিন্দুকের মধ্যে টাকাটা তালাবন্ধ আছে তার উপরে যে সেই বসে আছে; তাই টাকাটা নিতে পারলাম না। দু'তিন বার উঁকি দিলাম, সে ঠিক বসে



আছে। অগত্যা বাধ্য হয়ে অন্য টাকা দিয়ে জমিটা কিনতে হল; যদিও লেন-দেনটা লাভজনকই হল, তবু আমি বিরক্ত হলাম। বন্ধু গিসেপ্পের সঙ্গে আবার পরামর্শ করলাম; সে বলল, টাকাটা ফিরিয়ে না দিলে কিছুই হবে না—কিন্তু সেটাও তো খারাপ; কাজেই অপেক্ষা করতে লাগলাম। নিজেকে বোঝালাম, "আমি বসে খাব, সে এসে এখানে বসল কি না বসল তার তোয়াক্কা করব না।" কিন্তু তার সর্বনাশ হোক। সে যে আমার অস্থি-মজ্জা জমাট বরফ করে তুলেছে; কোনরকমেই তাকে তাড়াতে পারছি না। তাই একদিন বললাম, "আমি যদি টাকাটা নিয়ে ইংলণ্ডে যাই তো কি হয়?" সে মাথা নোয়াল।

"সেই মতে বুড়ো মানুষটি সিন্দুক থেকে টাকার থলিটা নিয়ে ইংলণ্ড যাত্রা করলেন। স্বামী জীবিত থাকতে তার বোন যে বাড়িতে থাকতেন তখনও

মেয়েকে নিয়ে সেই বাড়িতেই ছিলেন; এক কথায়, বাড়িটা নিজেদেরই ছিল; বাড়িটার উপর তাদের মায়াও পড়েছিল; আশা করেছিলেন, ছেলের ব্যবসা-বাণিজ্যে উন্নতি হলেই সে বাড়িটা রাখতে পারবেন। বাড়িটা ছোট; সামনে ফুলের বাগান; মা-মেয়েতেই বাগানের পরিচর্যা করেন। পাশেই ছিল গ্রামের গির্জা; গির্জার উঠোনটা বাগানের একেবারে গায়ে। আর্থারের পৌঁছা সংবাদ না পেয়ে দুজনেই খুব চিন্তিত হয়ে পড়ল। এদিকে বুড়ো যখন স্বয়ং হাজির হয়ে জানালেন যে আর্থারের সঙ্গে তার দেখাই হয় নি, তখন তাদের দুঃখ ও যন্ত্রণার আর শেষ রইল না, তারা পরিষ্কার বুঝতে পারল যে ছেলেটি নিশ্চয় কোন বিপদে পড়েছে, আর না হয় তো টাকাটা নিয়ে অন্য কোথাও চলে গেছে। যেটাই ঘটুক না কেন, সবদিক থেকেই আঘাতটা তাদের পক্ষে বড়ই গুরুতর, কারণ আর্থারই তাদের একমাত্র অবলম্বন, তাকে তারা খুবই ভালবাসে।

"সেই ভ্রমণে বের হবার পর থেকে বুড়ো মানুষটি সেই ভয়ংকর অতিথির সঙ্গ থেকে অব্যাহতি পেলেন, তার শরীরও একটু একটু করে ভাল হতে লাগল; কিন্তু যখনই মনে পড়ে যে দু'হাজার পাউণ্ড মূল্য দিয়ে তাকে এই অব্যাহতি কিনতে হচ্ছে তখনই তার ভীষণ যন্ত্রণা হয়। তিনি ভাবতে লাগলেন, কেমন করে এই ভূতকে ঠকানো যায়। কিন্তু এইসব কথা ভাববার সময় এমন একটা ঘটনা ঘটল যাতে সেই টাকাটার নিরাপত্তার ব্যাপারে তিনি শংকিত হয়ে উঠলেন।

"পথ চলতে গিয়ে তিনি লক্ষ্য করলেন, যখনই তিনি মালপত্র স্থানান্তরিত করেন তখনই তার সঙ্গের একটা ভারী সিন্দুকের ওজন সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে; এখানে পৌঁছবার পরে দুটি কুলিকে ডাকা হল সেটাকে বাড়ির ভিতরে বয়ে নিয়ে যেতে; সেইসময় তিনি এমন কিছু মন্তব্য শুনতে পান যাতে তার মনে হল যে সিন্দুকের মধ্যে কি আছে সে সম্পর্কে তারা একটা সঠিক অনুমান করতে পেরেছে। পরবর্তী সময়ে তিনি লক্ষ্য করলেন যে সেই দুটি লোক সন্দেহজনকভাবে বাড়ির চারপাশে ঘোরাঘুরি করছে; কাজেই পাছে সেটা লুট হয়ে যায় এই ভয়ে তিনি না পারছেন বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে, না পারছেন রাতে ঘুমতে।

"জাকোপো ফেরাল্‌দির কাছ থেকে আমরা এই পর্যন্তই জানতে পারি; কিন্তু স্মৃতিকথা এখানেই শেষ হলেও জনশ্রুতি বলে যে একদিন সকালে তাকে তার বিছানায় নিহত অবস্থায় পাওয়া যায়, তার সিন্দুকটাও লুট হয়ে যায়। পরিবারের সকলকেই, অর্থাৎ মা, মেয়ে ও একটি চাকরকে হত্যার দায়ে অভিযুক্ত করা হয়; তারা নিজেদের নির্দোষ বলে ঘোষণা করা সত্ত্বেও তাদের অপরাধী সাব স্ত করে প্রাণদণ্ড দেওয়া হয়।

"যে স্মৃতিকথা থেকে এখানে উদ্ধৃত করলাম সেখানা তার ড্রেসিং টেবিলের

উপরেই পাওয়া যায়, মনে হয় হত্যাকারীরা যখন হঠাৎ তাকে আক্রমণ করে তখনও তিনি স্মৃতিকথা লিখছিলেন, কারণ তার শেষ কথাগুলি ছিল—'মনে হচ্ছে আমি তাদের চোখে ধূলো দিতে পেরেছি, কেউ বুঝতে পারবে না—' তারপরেই একটা মস্ত কালির ফোঁটা ও টান, যেন কলমটা তার হাত থেকে ছিটকে পড়েছিল। তার মত একজন সন্দেহপ্রবণ গোপনীয়তাপ্রিয় মানুষ যে সেইসবকথাগুলিই লিখে রাখল যেটা গোপন রাখাই তার পক্ষে উচিত ছিল—সেটা খুবই আশ্চর্য মনে হতে পারে। কিন্তু এধরনের দৃষ্টান্তও নতুন কিছু নয়; অনুরূপ অন্য অনেক ঘটনায় দেখা গেছে, কোন রহস্য যখন মানুষের মনেরউপর চেপে বসে, তখন ধরা পড়বার ঝুঁকি সত্ত্বেও সেটাকে প্রকাশ করবার একটা দুর্নিবার ইচ্ছা জাগে, আর সেই সময় বিশ্বাসভাজন কাউকে কাছে না পেলে হতভাগ্য মানুষটি তখন প্রায়ই কাগজ-কলমের আশ্রয় নিয়ে থাকে।

"আর্থার আলেনের পরিবার নির্বংশ হয়ে যাওয়ায় জাকোপোর ভ্রাতুষ্পুত্র জনৈক কপর্দকহীন সৈনিক তার উপাধি ও জমিদারির উত্তরাধিকারী হয়, এবং ঘটনার পূর্ণ বিবরণসম্বলিত স্মৃতিকথাটি ইতালিতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। তখন হারানো দু'হাজার পাউণ্ডের অনেক খোঁজ করা হয়, কিন্তু কোথাও তার সন্ধান মেলে না। তখন প্রথমে সকলেই ধরে নেয় যে ঐ মহিলা দুটিও এ-ব্যাপারে জড়িত ছিল এবং টাকাগুলি সরিয়েছে। অবশ্য পরবর্তীকালে বুড়ো ইংলণ্ডে পৌছলে যে দুটি লোক সিন্দুকটা বাড়ির মধ্যে বয়ে নিয়ে গিয়েছিল তাদেরই একজন কিছু ইতালীয় সোনা ও একটা হীরের আংটি বিক্রি করতে গিয়ে ধরা পড়ে। জানা যায় যে জাকোপোই ঐ আংটিটা পরতেন। ফলে তদন্ত শুরু হয় এবং লোকটি স্বীকার করে যে সে ও তার সঙ্গীই বুড়োকে খুন করেছিল। এইভাবে মহিলা দুটি খুনের সঙ্গে জড়িত থাকার দায় থেকে অব্যাহতি পায়। সে লোকটি কিন্তু আরও বলে যে সিন্দুকের কোন জিনিস তারা লুট করতে পারে নি, কারণ তারা সেটা খুলতেই পারে নি; চাবির খোঁজ পাবার আগেই একটা কুকুর ঘেউ-ঘেউ করে তাদের দুজনকে তাড়া করে। তারা সিন্দুকটাকে বয়ে নিয়ে যেতেও ভয় পায়, কারণ অত বড় সিন্দুকটা সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করত। কাজেই বুড়ো লোকটির কাছে খুচরো টাকা-পয়সা যা ছিল এবং তার গায়ে যেসব হীরে-মুক্তো ছিল তারা কেবল সেইগুলিই লুট করেছিল। কিন্তু সেকথা কেউ বিশ্বাস করে নি, বিশেষ করে যখন জানা গেল যে তার সঙ্গী নিখোঁজ হয়ে গেছে এবং সেই ঘটনার পরেই দেশ ছেড়ে পালিয়েছে।

"প্রায় আড়াই শতাব্দী ধরে ব্যাপারটা সেখানেই থেমে ছিল। জাকোপো ফেরাল্দির জন্য কেউ শোক করল না, আলেন পরিবারের দুর্ভাগ্য নিয়েও কেউ মাথা ঘামাল না। তারপর অনেককাল কেটে গেল, পরিবারে অনেক উত্থান-পতন ঘটল; কিন্তু আমার যখন জন্ম হল তখন আমার বাবা সেই

পুরনো প্রাসাদেই বাস করতেন, আর আমাদের আর্থিক অবস্থাও তখন মোটামুটি ভাল। সেই বাড়িতেই আমার জন্ম হয়। মনে আছে, যে ঘরের মেঝের নীচেকার গোপন কুঠুরিতে জাকোপো তার অতিথিকে কবর দিয়েছিল, ছেলেবেলায় সেই ঘরটা সম্পর্কে আমার মনে অনেক কৌতূহল ছিল। অতিথির মৃতদেহটা সেখানেই পাওয়া যায় এবং খ্রীষ্টীয় বিধি অনুসারে তাকে কবরও দেওয়া হয় কিন্তু কুঠুরিটা তখনও ছিল, আর ভূতুড়ে ঘর হিসাবে ঘরটাকে বন্ধ করে রাখা ছিল। আমি কখনও অসাধারণ কিছু চোখে দেখি নি, কিন্তু রাতেরবেলায় মাঝে মাঝে সেঘর থেকে যে ভয়ার্ত আর্তনাদ ও গোঙানির শব্দ ভেসে আসত, কাউকে সঙ্গে নিয়ে বারান্দায় দাঁড়িয়ে সবিস্ময়ে ও সভয়ে তা যে নিজের কানে শুনেছি একথা আমি হলফ করে বলতে পারি। কিন্তু একলা কখনও আমি সে দরজার পাশ দিয়ে হাঁটি নি, বা সন্ধ্যার পরে কোন চাকরও সেদিকে কখনও যেত না। সে শব্দকে থামাবার জন্য দরজার সামনে দেয়াল গেঁথে দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু তাতে ফল তো কিছু হলই না, বরং সেই আর্তনাদ ও গোঙানি বিশ গুণ বেড়ে গেল। আর যেহেতু দেয়ালটা দেখতেও বিশ্রী লাগত, আর তাতে কোন কাজও হল না, তাই অশান্ত আত্মাকে তুষ্ট করতে দেয়ালটা ভেঙে দেওয়া হল।

"বুড়োর স্মৃতিকথা পারিবারিক দলিলপত্রের সঙ্গেই রক্ষিত আছে, তার ছবি এখনও বারান্দায় টাঙানো রয়েছে। অনেক অপরিচিত লোক এই অসাধারণ কাহিনী শুনে সেগুলি দেখতে চান। জনৈক অষ্ট্রীয় সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক এখন সেই প্রাসাদে বাস করেন। আজও সেই ভূত সেখানকার অধিবাসীদের তার আর্তনাদে বিরক্ত করে কি না আমি জানি না।"

কাউণ্ট ফ্রান্সেস্কো বললেন, "এবার আমার নিজের কথায় আসছি। কয়েকবছর হল রাজনৈতিক কারণে আমি সপরিবারে ইতালি ছেড়ে আসতে বাধ্য হয়েছি। সঙ্গে করে নিয়ে আসা কিছু নগদ টাকা ছাড়া আর কোন সম্বলই আমার ছিল না; তাই একসময়ে শখ করে যে সুরের চর্চা করেছিলাম এবার সেটাকেই কাজে লাগাব বলে স্থির করলাম। জনসমক্ষে গান করবার মত গলা আমার ছিল না, কিন্তু আমি গান শেখাতে পারতাম, আর ইতালিতে থাকতে অপেশাদারী শিক্ষক হিসাবে আমার বেশ নামও হয়েছিল। ইংলণ্ড প্রবাসের প্রথম দিককার বিষণ্ণ বিবরণ দিয়ে আপনাদের ক্লান্ত করে তুলতে চাই না; কোনরকম যোগাযোগ প্রতিষ্ঠার আগে একজন ভাগ্য-বিড়ম্বিত বিদেশীকে যে কতরকম অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয় সে আপনারা বুঝতেই পারেন। এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে আমার যৎসামান্য সম্বল সম্পূর্ণ ফুরিয়ে গেল, এবং প্রায়ই আমাকে, আর তার চাইতেও দুঃখের, আমার স্ত্রী-পুত্রকেও অনাহারে থাকতে হত, এবং জীবনের অত্যাবশ্যকীয় জিনিসগুলির জন্য দেশের কোন সম্পন্নতর মানুষের কাছে ঋণ করতে হত;

ক্রমেই হতাশ হয়ে পড়লাম; আমি যদি একলা হতাম তাহলে যে কি করে বসতাম তা নিজেই জানি না; একটা পরিবার আমার উপর নির্ভর করে আছে; কাজেই অসুবিধা যত বড়ই হোক তার সামনে ভেঙে পড়লে তো আমার চলবে না।

"একদিন রাতে সেণ্ট জেমস্ স্কোয়ারের একজন সম্ভ্রান্ত লোকের বাড়িতে গান করেছিলাম; সেখানে একটি যুবক আমার গানের খুব প্রশংসা করলেন। মনে হল যুবকটি ইতালীয় সঙ্গীত খুব ভালবাসেন, আর বোঝেনও। প্রথমত, সেই আসরে উপস্থিত হতে পারাটাই আমার পক্ষে সৌভাগ্যসূচক, কারণ গৃহস্বামী ছিলেন আমার সম্পূর্ণ অপরিচিত; আমার একজন পরিচিত গায়ক সিনর এ-কেই সেখানে গান গাইতে ডাকা হয়েছিল; শেষ মুহূর্তে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়ায় তিনিই একখানা পরিচয়-পত্র দিয়ে আমাকে সেখানে পাঠিয়েছিলেন।

"জানতাম যে সেরাতের কাজের জন্য আমি ভাল টাকাই পাব, তবু টাকাটা যদি সেইরাতেই পাওয়া যেত তাহলে প্রত্যাশিত টাকার অর্ধেক হলেও টাকাটা আমি সানন্দেই হাত পেতে নিতাম, কারণ আমাদের ক্ষুদ্র সঞ্চয় সেদিন ছিল সম্পূর্ণ নিঃশেষিত; পরের দিনের জন্য প্রাতরাশ কিনবার মত ছ'টা পেনিও তখন আমার হাতে ছিল না। আমার পিছনে বড় হলের দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল; আমি পথে এসে দাঁড়ালাম: একদিকে বিলাসের উজ্জ্বলতা, অন্যদিকে সবরকম নিঃস্বতাকে নিয়ে আমি একা; এই বৈপরিত্য আমাকে নির্মমভাবে আঘাত করল, কারণ একদিন আমিও ধনী ছিলাম, আলোকোজ্জ্বল রাজপ্রাসাদে বাস করতাম, একদল তকমাধারী ভৃত্য আমার হুকুম তামিল করত, সুমধুর সঙ্গীত আমার ঘরে-ঘরে প্রতিধ্বনিত হত; বেপরোয়া হয়ে উঠলাম, টুপিটাকে চোখের উপর টেনে দিয়ে স্কোয়ারের মধ্যে পায়চারি করতে করতে এই দুঃখের হাত থেকে স্বস্তিলাভ অথবা পলায়নের যত সব উদ্ভট ফন্দি আঁটতে লাগলাম। নিশ্চয়ই আমি খুব পাগলা হয়ে উঠেছিলাম, কারণ আপনারা তো জানেন ইতালীয়দের অঙ্গভঙ্গী করার অভ্যাস আছে, আর আমিও হয় তো চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে হাত-পাও নাড়ছিলাম; তাই হয় তো অনেকেরই দৃষ্টি পড়েছিল আমার উপর। কিন্তু নিজের চিন্তায় আমি এতই ডুবে ছিলাম যে সে খেয়ালই আমার ছিল না; এমন সময় একটি কণ্ঠস্বর শুনে আমি চমকে উঠলাম: 'সিনর ফেরাল্দি, এই শীতের রাতে আপনি এখনও এখানে! আপনার গলাটার জন্যও কি ভয় নেই—ও গলার যে যথেষ্ট যত্ন নেওয়া উচিত!'"

"উদ্ধত গলায় বললাম, 'কিসের জন্য? এ গলা তো আমাকে-খাওয়াবে না!'

"হঠাৎ আমার চিন্তায় বিঘ্ন না ঘটলে আমি হয়তো এরকম জবাব

দিতাম না; কিন্তু কথাগুলি কে বলল সেটা জানবার আগেই জবাবটা আমার মুখ থেকে বেরিয়ে গেল। তাকিয়ে দেখলাম, লর্ড এল্-এর বাড়িতে যে যুবকটি আমার গানের প্রশংসা করেছিলেন এ তিনিই। টুপিটা খুলে তার কাছে ক্ষমা চাইলাম। সেখান থেকে চলে যেতে উদ্যত হতেই তিনি আমার হাতটা চেপে ধরলেন।

"বললেন, 'ক্ষমা করবেন; আসুন না, একসঙ্গেই হাঁটা যাক।' একটু থেমে ক্ষমা পাওয়ার ভঙ্গীতে বললেন 'মনে হচ্ছে, আপনি এদেশে নির্বাসিত।'"

'তাই,' আমি বললাম।

"তিনি বলতে লাগলেন, 'আমার ধারণা, স্বেচ্ছায় যে গোপন কথা আপনি আমাকে বলতেন না, আপনাকে চমকে দিয়ে সেই কথাটিই আমি জেনে ফেলেছি। আপনারা যখন দেশ ছেড়ে আসতে বাধ্য হন তখন যে আপনাদের কত কষ্ট সইতে হয় তা আমি জানি; তাই আপনাকে মিনতি করে বলছি, আপনাকে যদি মন খুলে সব কথা জানাতে বলি তাহলে আমাকে স্ববিনীত বলে মনে করবেন না।'

"সেইমুহূর্তে এই সহানুভূতির কথাগুলি ছিল এতই আন্তরিক আর আমার কাছে এতই স্বাগত যে নতুন বন্ধুটির অনুরোধ রক্ষা করতে আমি কোনরকম ইতস্তত করলাম না—সব কথাই তাকে বললাম—আরও জানলাম, একদিন আমি নিশ্চয়ই নাম করতে পারব, আর তখন যে নিজের পথ নিজেই করে নিতে পারব সে সম্পর্কেও আমার কোন আশংকা নেই; কিন্তু তার আগে এখনই যে আমরা অনাহারের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছি।

"কথা বলতে বলতে আমরা স্কোয়ারের চারদিকে হাঁটতে লাগলাম; আসলে যুবকটি সেখানেই থাকতেন। তার দরজা থেকে বিদায় নেবার আগে তিনি আমার হাতে একটা উপহার তুলে দিলেন; আমি ওটাকে উপহারই বলছি, কারণ তার সে দান যে আমি কোনদিন ফিরিয়ে দিতে পারব একথা মনে করার কোন কারণই তার ছিল না; তিনি বললেন, তাকে গান শেখাবার জন্য আমি যে পারিশ্রমিক পাব এই দশ গিনি তারই অগ্রিম; তার প্রথম কিস্তির টাকাটা পরদিনই আমাকে দেওয়া হবে।

"অনেক হাল্কা মনে বাড়ি ফিরলাম; পরদিন সকালে সেই ছাত্র বন্ধুটির সঙ্গে দেখা করলাম; যেমনটি আশা করেছিলাম, ছাত্র হিসাবে যথেষ্ট উন্নতির সম্ভাবনা তার মধ্যে লক্ষ্য করলাম। তিনি খোলাখুলিভাবেই জানালেন, এখানকার শৌখিন সমাজে তার বিশেষ কোন প্রভাব-প্রতিপত্তি নেই, কারণ তারা হঠাৎ বড়লোক হয়েছে; তবে তার দুটি বোন আছে; তার মতই গান ভালবাসে; শীঘ্রই তারা লণ্ডনে আসবে এবং আমার কাছে গান শিখবে।

"আমার জীবনে এই প্রথম একটা শুভ ঘটনা ঘটল, আর সে শুভ সূচনা

পূর্ণ হতেও দেরি হল না। পরিবারের সকলে লণ্ডনে এলে তাদের কাছ থেকে আমি খুবই সদয় ব্যবহার পেলাম। তাদের গান শেখাতাম, তাদের আসরে গান করতাম, সুযোগ পেলেই তারা বন্ধুবান্ধবদের কাছে আমার নাম সুপারিশ করত।

"গানের মরশুম যখন শেষ হয়ে এল, তখন আবার ভবিষ্যতের কথা ভেবে আমার চিন্তা হতে লাগল—আর তো গানের আসর বসবে না, আমার ছাত্রীরাও শহর ছেড়ে চলে যাবে। ভালকথা, আমার নতুন বন্ধুটির নাম ছিল গ্রেটহেড; আমার জন্য একটা মতলব তাদের মাথায় এল; সেই মতলব মতই তারা আমাকে চলতে পরামর্শ দিল। তারা বলল, দেশে তাদের একটা বাড়ি আছে; তার আশেপাশে আরও অনেক বাড়ি-ঘর ও লোকজন আছে, আসলে বাড়িটা গরম জলের একটা বড় স্বাস্থ্য কেন্দ্রের কাছে অবস্থিত। গ্রীষ্মের কয়েকটা মাস যদি আমি সেখানে গিয়ে থাকি তাহলে গান শেখাবার প্রচুর সুযোগ পাব; তারা আরও বলল, "কি জানেন, এখানকার তুলনায় সেখানে আমরা আরও অনেক বড়লোক; সেখানে আমাদের প্রশংসা-পত্রে অনেক বেশী কাজ হবে।"

"বন্ধুদের পরামর্শ মতই কাজ করলাম। তারা লণ্ডন থেকে চলে যাবার কিছুদিন পরেই আমি সান্টন-এ গিয়ে তাদের সঙ্গে মিলিত হলাম; তাদের জায়গাটার নাম সান্টন। সামান্য কিছু টাকা দিয়ে স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের শহরেই রেখে এসেছিলাম; কাজেই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তাদের নিয়ে আসতে ব্যগ্র হয়ে পড়লাম। পরদিন সকালেই একটা বাসা খুঁজতে বেরিয়ে পড়লাম, এবং সেখানকার অধিবাসী ও আগন্তুকদের কাছে আমার সেখানে আসার উদ্দেশ্যের কথা জানাতে চেষ্টা করলাম। সেসব কাজ শেষ করে পথের নির্দেশ দিয়ে আমার পরিবারকে চিঠি লিখে সান্টনে ফিরে গেলাম; আমার দয়ালু পৃষ্ঠপোষকদের কথা দিয়েছিলাম, কয়েকটাদিন তাদের সঙ্গেই কাটাব।

"বাড়িটা আধুনিক; আসলে মিঃ গ্রেটহেডের ঠাকুর্দাই বাড়িটা তৈরি করান; পরিবারের সৌভাগ্যও তার হাতেই গড়া। অনেকটা জমির উপর বাড়ি, জানালার নীচেই সুন্দর একটা ঘাসে-ঢাকা মাঠ, একটা মনোরম ধ্বংস-স্তূপ, কলস্বনা ছোট নদী, চমৎকার ফুলের বাগান। প্রাতরাশে বসে যে দৃশ্য দেখতে পেলাম তার চাইতে ভাল দৃশ্য আর কিছু হতে পারে না। একটি মনোরম সুন্দর ইংরেজ পরিবারে বাস করার সেই আমার প্রথম অভিজ্ঞতা; কি বাড়ির ভিতরে, কি বাইরে, আমার সব প্রত্যাশা একেবারে কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে গেল। প্রাতরাশের পরে মিঃ গ্রেটহেড ও তার ছেলে আমাকে অনুরোধ করল তাদের সঙ্গে বাড়ির চারদিকটা একবার ঘুরে দেখতে, কারণ বাড়িটার কিছু অদল-বদল করার কথা তারা ভাবছেন।

"মিঃ জি, বললেন, "অন্য অনেক কিছুর সঙ্গে এই ছোট নদীটার পথও আমরা ঘুরিয়ে দিতে চাই ; নদীটার নতুন পথে যে গাছপালার পুরনো বেড়াটা পড়ছে সেটার প্রতি আমার স্ত্রীর একটা অদ্ভুত টান আছে, সে কিছুতেই ওটাকে ভেঙে ফেলতে দেবে না।"

"আমার মনে হল, উল্লেখিত বেড়াটা যেভাবে ফুল-বাগানের দুটো দিককে ঘিরে আছে সেটা কেমন যেন বেখাপ্পা লাগছে।

"আমি বললাম, 'কেন! এই বেড়াটার প্রতি মিসেস গ্রেটহেডের কিসের এত আকর্ষণ?'

'কেন? এটা অনেক দিনের পুরনো ; আগে তো এটাই গির্জার প্রাঙ্গণের সীমানা ছিল ; ওই যেসব ধ্বংসস্তূপ দেখছেন ওখানেই ছিল গ্রামের গির্জা ; আমার তো মনে হয়, কবরখানার উর্বরা মাটি পেয়েই ফুলের বাগানটা আরও সুন্দর হয়েছে। কিন্তু সবচাইতে আশ্চর্য ব্যাপার কি জানেন, এই বেড়ায় এবং তার পার্শ্ববর্তী বাগানের অংশটায় সবই ইতালীয় ফুল ; স্মরণাতীতকাল থেকে লোকে তাই দেখে আসছে। এটা যে কি করে হল তা কেউ জানে না, কিন্তু এখানকার মাটিতে নিশ্চয় এমন কোন পুরনো বীজ ছিল যা থেকে এই সব ফুলের গাছ জন্মেছে। বেড়ার গায়ে এই সাইক্লামেনের ঝোপটার দিকে তাকিয়ে দেখুন।'

"ডিনারের সময় বাড়ির অদল-বদলের কথাটা আবার উঠল। মিসেস গ্রেটহেড তখনও বেড়াটা ভেঙে দেওয়ায় আপত্তি করায় তার ছোট ছেলে হ্যারি বলল, 'মামণি এমনভাব দেখাচ্ছে যেন ফুলের জন্যই সে বেড়াটা ভেঙে দিতে আপত্তি করছে. কিন্তু আমি ঠিক জানি যে আসল কারণ হল, মামণি ভূতকে চটাতে ভয় পাচ্ছে।'

"মিসেস গ্রেটহেড বললেন, 'যত সব বাজে কথা হ্যারি। আপনি ওর কথা বিশ্বাস করবেন না মিঃ ফেরাল্‌দি।'

"ছেলেটি বলল, 'দেখ মামণি, তুমি যা দেখেছ সেটা কোন ভূত নয় সে-কথা যে তুমি কোনদিন স্বীকার করবে না তা তো তুমিও জান।'

"তিনি বললেন, 'সেটা কি ছিল সেকথা থাক ; ও বেড়া ভাঙতে আমি দেব না।' তারপর বললেন, 'আহা মিঃ ফেরাল্‌দি, কেউ ভূতে বিশ্বাস করে শুনলে আপনি নিশ্চয়ই হাসবেন।'

"আমি জবাব দিলাম, 'মোটেই না, বরং ঠিক উল্টো ; আমি নিজেই ভূতে বিশ্বাস করি, আর তার যথেষ্ট কারণও আছে ; আমাদের পরিবারেই একটি বিখ্যাত ভূত আছে।'

"তিনি বললেন, 'অথচ দেখুন না, মিঃ গ্রেটহেড ও ছেলেরা আমাকে ঠাট্টা করে। কিন্তু মিঃ গ্রেটহেডের ঠাকুর্দার মৃত্যুর পরে আমি যখন এখানে বাস করতে এলাম—তার বাবা কখনও এ বাড়িতে বাস করেন নি, কারণ বৃদ্ধের

মৃত্যুর আগেই দুর্ঘটনায় তার মৃত্যু হয়েছিল—তখন কিন্তু আমি ঘুণাক্ষরেও শুনিনি যে এ জায়গাটা ভূতুড়ে, আর শুনলেও হয় তো আমি সেকথা বিশ্বাসই করতাম না। কিন্তু একদিন সন্ধ্যাবেলা—ছেলেমেয়েরা তখন শুতে চলে গেছে, আর মিঃ গ্রেটহেড ও জর্জ কয়েকজন বন্ধুকে নিয়ে খাবার ঘরে বসে আছে—তখন আমি ও আমার এক বোন (সে তখন আমার কাছেই ছিল) বাগানে



হেঁটে বেড়াচ্ছিলাম। অগস্ট মাস, উজ্জ্বল তারা-ভরা রাত। একটা খুব আকর্ষণীয় কথা নিয়েই আমরা আলোচনা করছিলাম, কারণ আমার বোন সেইদিনই এক ভদ্রলোকের কাছ থেকে বিয়ের প্রস্তাব পেয়েছিল, আর পরে তাকেই সে বিয়ে করেছিল। একথা বলার উদ্দেশ্য আপনাকে বোঝানো যে কোনরকম অলৌকিক ব্যাপার নিয়ে আমরা তখন চিন্তা করছিলাম না,

বরং সম্পূর্ণ জাগতিক একটা ব্যাপারের আলোচনাতেই ডুবে ছিলাম। সাগ্রহে তার কথাগুলি শুনতে শুনতে আমি মাটির দিকেই তাকিয়েছিলাম ; হঠাৎ বোন কথা বন্ধ করে আমার হাতে হাত রেখে বলে উঠল, 'ও কে ?'

"চোখ তুলে দেখলাম, মাত্র কয়েক গজ দূরে একটি বুড়ো মানুষ দাঁড়িয়ে আছে ; শীর্ণ-বিশীর্ণ চেহারা, অদ্ভুত একটা সেকেলে পোশাক পরা, মাথায় একটা খাড়া টুপি। ফুল-বাগানের এত কাছে দাঁড়িয়ে সে কি করছে, লোকটিই বা কে হতে পারে, কিছুই বুঝতে পারলাম না ; তার দিকে তাকিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। বাগানের এক কোণে একটা পুরনো সমাধির ভগ্নস্তূপ আপনি দেখেছেন কি না জানি না। লোকে বলে, ওটা গ্রাম্য গির্জার জনৈক প্রাক্তন রেক্টরের সমাধি ; ১৫৫০ তারিখটা এখনও পড়া যায়। বুড়ো লোকটি বেড়ার এক কোণ থেকে সমাধির পাথরটা পর্যন্ত হেঁটে গেল ; মনে হল, সে যেন পা গুণে গুণে গেল। কোন জমি মাপতে হলে লোকে যেভাবে হাঁটে অনেকটা সেইরকম। তারপর থেমে গিয়ে হাতের কাগজ-পেন্সিলে মাপটা লিখে নিল বলে মনে হল ; পুনরায় সেই একই কাজ করল, বেড়ার অন্য কোণ থেকে হেঁটে সমাধি পর্যন্ত গেল ও ফিরে এল।

'সেইসময় একবার কথা হয়েছিল, বেড়াটা সরিয়ে দিয়ে পুরনো সমাধিটা খুঁড়ে ফেলা হোক। আমার মনে হল, এবিষয়ে আমার স্বামী যেন কার সঙ্গে কথা বলেছিল, সে ব্যাপারের সঙ্গেই এ লোকটির কোন যোগাযোগ থাকতে পারে ; তবু তার পোশাক ও চেহারা দেখে আমার যেন অদ্ভুত লেগেছিল। আরও আশ্চর্য যে লোকটি যেন আমাদের দেখতেই পেল না ; তাছাড়া, আমাদের খুব কাছে থাকা সত্ত্বেও তার কোন পায়ের শব্দ আমরা শুনতে পাই নি ; কিন্তু তখন এ ব্যাপারগুলো ঠিক খেয়াল হয় নি। যাই হোক, এগিয়ে গিয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করব যে সে কি চায় সেইসময় বোনটি আমার হাত ছেড়ে দিয়ে ধপাস করে মাটিতে এলিয়ে পড়ল, আর ঠিক সেইমুহূর্তে রহস্যময় বুড়ো মানুষটি অদৃশ্য হয়ে গেল, তাকে আর দেখতে পেলাম না।

"বোনটি মূর্ছা যায় নি ; সে বলল, তার হাঁটু দুটো হঠাৎ বেঁকে গেল, আর ভয় পেয়ে সে মাটিতে পড়ে গেল। আমি যে খুব স্বস্তি পাচ্ছিলাম তা নয় ; বোনকে তুলে ধরে তাড়াতাড়ি বাড়ির ভিতর চলে গেলাম এবং যা দেখেছি সব বললাম। লোকজনরা ছুটে গেল, কিন্তু কিছুই দেখতে না পেয়ে আমাদের ঠাট্টা করতে লাগল ; কিন্তু কিছুদিন পরে হ্যারির জন্ম হলে গ্রাম থেকে আমার জন্য একটি নার্স এসেছিল ; একদিন সে আমাকে জিজ্ঞাসা করল, একটি বুড়ো মানুষকে আমি কখনও হেঁটে বেড়াতে দেখেছি কি না। সেদিনকার ঘটনার কথা ভুলেই গিয়েছিলাম, তাই জানতে চাইলাম সে কোন্ বুড়োর কথা বলছে। তখন সে আমাকে বলল, অনেককাল আগে এখানে

একটি বিদেশী ভদ্রলোক খুন হয়েছিল,—অর্থাৎ এই বাড়িটা তৈরি করার সময় মিঃ গ্রেটহেডেব ঠাকুর্দা যে পুরনো বাড়িটা ভেঙে ফেলেছিলেন সেই বাড়িতে; সেই থেকেই এ জায়গাটাকে ভূতে পেয়েছে, সন্ধ্যার পরে কেউ এই বেড়া ও পুরনো সমাধির পাশ দিয়ে হাঁটে না, কারণ ভূতটা ঐটুকু জাযগার মধ্যেই ঘুরে বেড়ায়।

"আমি বললাম, 'কিন্তু আমার তো মনে হয় ও জিনিসগুলো অক্ষত না রেখে ভেঙে সরিয়ে দেওয়াই তো আপনার দিক থেকে ভাল, কারণ তাহলে হয় তো ভূতটা এখানে আসা একেবারেই বন্ধ করে দেবে।'

"জবাব দিলেন মিঃ জি, 'ঠিক উল্টো। আশপাশের লোকরা বলে, এই বাডির আগেকার মালিকও সেইরকমই ভেবেছিলেন, এবং সবকিছু ভেঙে ফেলাই স্থির করেছিলেন, কিন্তু তার পর থেকেই বুড়ো লোকটি উৎপাত শুরু করে দিল, এমন কি বাড়িতে হানা দিতে লাগল। নার্সটি তো আমাকে নিশ্চিত করেই বলেছিল যে বুড়ো মিঃ গ্রেটহেডেরও সেই ইচ্ছাই হয়েছিল, কিন্তু হঠাৎ তিনি পাল্টা আদেশ দিয়ে ভাঙচুর বন্ধ করে দিলেন; মুখে তিনি কিছু না বললেও লোকের বিশ্বাস তিনি ভূতটাকে দেখেছিলেন। একটা কথা তো ঠিক যে এই জাযগার মালিকরা সবসময়ই বেড়াটাকে অক্ষত রেখে দিয়েছেন।

"যুবকরা হাসতে লাগল, এবং মায়ের এইসব কুসংস্কারের জন্য তাকে ঠাট্টা করতে লাগল, কিন্তু মহিলাটি তার প্রতিবাদে স্থিরসংকল্প; বললেন, ভূতের ব্যাপারটা ছেড়ে দিলেও তিনি বেড়াটাকে ভালবাসেন ইতালীয ফুলগুলির জন্য, আর কবরটাকে পছন্দ করেন তার প্রাচীনতার জন্য।

"ফলে মিঃ গ্রেটহেডের পরিকল্পনার পরিবর্তন করে স্থির হল যে বেড়া ও সমাধিকে যথাযথ রেখেই নালাটার গতি-পথ বদলে দেওয়া হবে।

"কয়েকদিনের মধ্যেই আমার পরিবারের লোকজন এসে পড়ল, আর আমিও গ্রীষ্মকালের মত এস্ শহরে বাসা বাঁধলাম। আমার কাজকর্ম বেশ জমে উঠল, মিঃ ও মিসেস গ্রেটহেডের আনুকুল্যে এবং আমার ও আমার স্ত্রীর প্রতি তাদের ব্যক্তিগত সদ্ব্যবহারের ফলে বেশ আরামেই আমাদের দিন কাটতে লাগল। আমাদের লণ্ডনে ফিরে যাবার সময় হয়ে এলে তারা আমাদের আমন্ত্রণ জানালেন, চলে যাবার আগে একটা পক্ষকাল যেন তাদের সঙ্গে কাটিয়ে যাই, তাই আমাদের বাসা ছেড়ে দেবার দিনই আমরা সাণ্টনে চলে গেলাম।

"ততদিনে নালাটাকে ঘুরিয়ে দেবার কাজ শুরু হয়ে গেছে। পৌঁছবার পরেই আমি মিঃ গ্রেটহেডের সঙ্গে কাজকর্ম দেখতে বেরিয়ে গেলাম। মজুরদের মধ্যে বছর চৌদ্দ বয়সের একটি ছেলে ছিল। আমরা তার পাশেই দাঁড়িয়েছিলাম। একটা কিছু তুলে নিয়ে মিঃ জি,-র হাতে দিয়ে সে বলল, 'এটা কি

আপনার স্যার?' পরীক্ষা করে দেখা গেল সেটা ষোড়শ শতাব্দীর একটা স্বর্ণমুদ্রা—তার উপরে তারিখে লেখা ১৫৪৫। ছেলেটি তখনও খুঁড়েই চলেছে; সে আরও একটা স্বর্ণমুদ্রা পেল, তারপর আরও কয়েকটা।

"মিঃ গ্রেটহেড বললেন, 'খুব মজার ব্যাপার তো; মনে হচ্ছে আমরা কোন গুপ্তধন পেয়ে গেছি', ফিস্ ফিস্ করে বললেন, তিনি এখন সেখান থেকে যাবেন না।

"ফলে ডিনারের সময় পর্যন্ত তিনি সেখানেই রইলেন, এবং আগ্রহের বশে আমিও থেকে গেলাম। ইতিমধ্যে আরও অনেকগুলো মুদ্রা পাওয়া গেল। মিঃ গ্রেটহেড চলে যাবার সময় মজুরদের ছুটি দিয়ে দিলেন এবং জায়গাটা পাহারা দেবার জন্য একটি চাকরকে পাঠিয়ে দিলেন। পরদিন আরও কয়েকটি মুদ্রা ওঠার পরেই মনে হল যে ভাণ্ডার শেষ হয়ে গেছে। গ্রামবাসীরা যখন এই টাকা পাওয়ার কথা শুনল তখন তারা সকলেই মনে করল যে এই জন্যই বুড়ো লোকটি এই জায়গাটাতে ভর করেছিল। কোন সন্দেহ নেই যে টাকাগুলি সেই পুতে রেখেছিল, এখন দেখা যাক, টাকাটা যখন পাওয়া গেছে তখন তার অশরীরী আত্মা শান্ত হয় কি না।

"সেইসময় আমার দুটি শিশুই আমার সঙ্গে সাণ্টনে ছিল। তারা ঘুমত চারতলার একটা ঘরে। একদিন সকালে আমার স্ত্রী বলল যে ছোট মেয়েটির অসুখ করেছে, তাই তাকে দেখতে আমি উপরে উঠে গেলাম। সুন্দর খোলামেলা ঘর, দুটি ছোট সাদা বিছানা, ফ্রেমে বাঁধানো কয়েকটা পুরনো ছবির প্রিণ্ট দেয়ালে টাঙানো; সাধারণতই নার্সারিতে যেরকমটা দেখা যায়। মেয়ের সঙ্গে কিছু কথা বললাম, আমার স্ত্রী দাসীর সঙ্গে কথা বলল; তারপর দুই পকেটে হাত রেখে আমি অকারণেই চারদিকে তাকাতে লাগলাম। একটি জিনিস আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল; প্রথমে ব্যাপারটা বুঝতে পারি নি; কয়েকটি রেখা ও বিন্দু আঁকা এই বিবর্ণ পার্চমেণ্ট কাগজখানাকে কেন যে ঝকঝকে ফ্রেমে বাঁধিয়ে রাখা হয়েছে তাও বুঝি নি। এখানে-ওখানে কয়েকটি কথা লেখা আছে, কিন্তু আমি তা পড়তে পারি নি; তাই ফ্রেমটাকে পেরেক থেকে তুলে নিয়ে জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। তখন বুঝলাম যে শব্দগুলো ইতালীয় ভাষায় সেকেলে আঁকাবাঁকা হাতে লেখা; প্রথম দৃষ্টিতে মনে হয়েছিল একটা শিবিরের নক্সা বা রেখাচিত্র—কিন্তু ভালভাবে নজর করে দেখতে পেলাম একটা গির্জার প্রাঙ্গণের অংশবিশেষ; তাতে অনেক কবর দেখানো রয়েছে, আর তারই একটা কবর থেকে অনেকগুলো রেখা টানা হয়েছে ভিন্ন ভিন্ন বিন্দুর দিকে, সেই রেখাগুলোর মাঝে মাঝে সংখ্যা বসানো, আর এখানে-ওখানে ডাইনে, বাঁয়ে কিছু শব্দ। তাতে সমকোণ সৃষ্টিকারী দুটো সরলরেখা পুরো কাগজটাকে সমদ্বিখণ্ডিত করেছে। কিছুক্ষণ ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করার পরে আমার মাথায় এল, যে

গির্জার প্রাঙ্গণ ও বেড়া নিয়ে কয়েকদিন আগে এত কথা হয়েছিল এটা তারই একটা মোটামুটি মানচিত্র।

"প্রাতরাশে বসে মিঃ ও মিসেস গ্রেটহেডকে কথাগুলি বললাম; তারাও আমার কথা বিশ্বাস করলেন; পুরনো বাড়িটা ভেঙে ফেলার সময় ওটা পাওয়া গিয়েছিল, এবং পুরাবস্তু হিসাবেই ওটাকে রেখে দেওয়া হয়েছে।

"আমি শুধালাম, 'ওটা কোন্ যুগের জিনিস? আর একজন ইতালীয়ই বা ওটা তৈরি করেছিল কেন?'

"মিঃ গ্রেটহেড বললেন, 'শেষ প্রশ্নটার জবাব দিতে পারব না, কিন্তু তারিখটা তো ওটার উপরেই লেখা আছে বলে আমার বিশ্বাস।'

"আমি বললাম, 'না, আমি ভাল করে পরীক্ষা করে দেখেছি—কোন তারিখ নেই।'

"আঃ, আমার তো ধারণা ওতে তারিখ ও নাম দুইই আছে—তবে আমি নিজে কখনও ভাল করে দেখি নি।" ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলার জন্য তিনি ছেলে হ্যারিকে উপরে পাঠালেন ওটা নিয়ে আসতে; বললেন, "জানেন তো, কয়েক শতাব্দী আগে নানা ধরনের ইতালীয় স্থপতি ও নক্সাকারী এদেশে বিরল ছিল না।"

"হ্যারি ফ্রেমটা নিয়ে এল; সেটা নিয়ে অনেক কথাও হল, কিন্তু কোন তারিখ বা নাম খুঁজে পাওয়া গেল না।

"মিঃ গ্রেটহেড বললেন, 'তবু আমার মনে হচ্ছে আমি শুনেছি যে নাম ও তারিখ ছিল। ফ্রেম থেকে ওটাকে খুলে দেখা যাক।"

"কাজটা সহজেই করা গেল, আর তারিখ ও নামও পেয়ে গেলাম।"

কাউন্ট একটু থেমে আবার বললেন:

"আপনারা নিশ্চয় অনুমান করতে পারছেন?"

"জাকোপো ফেরান্দি?" আমি বললাম।

"ঠিক তাই," তিনি জবাব দিলেন; "আর সঙ্গে সঙ্গে আমার মাথায় এল, তার খুন হবার রাতে যে টাকা চুরি হয়েছিল বলে মনে করা হয়েছিল সেটা তিনিই মাটির নীচে লুকিয়ে রেখেছিলেন, আর এই নক্সাটা হচ্ছে সে জায়গাটা, পরে খুঁজে বের করবার নির্দেশিকা। তাই যে কাহিনী এখন আপনাদের বললাম সেটাই মিঃ গ্রেটহেডকেও বলেছিলাম; তাকে আরও বলেছিলাম যে আমার এই অনুমান যদি সত্য হয় তাহলে সেখানে আরও সোনা পাওয়া যাবে।

"বুড়ো লোকটির মানচিত্রটাকে নির্দেশিকা হিসাবে মেনে নিয়ে আমরা সঙ্গে সঙ্গে কাজ শুরু করে দিলাম—গোটা পরিবারই মহা উৎসাহে খোঁজার কাজে যোগ দিল; ঠিক যেমনটি আশা করেছিলাম, দেখা গেল যে বাগানের কবরের পাথরটাই হচ্ছে সেই জায়গাটি যেখান থেকে সবগুলি রেখা টানা

হয়েছে, আর বিন্দুগুলো বোঝাচ্ছে কোথায় টাকাগুলি রাখা হয়েছে। মনে হল, টাকাটা ভাগ ভাগ করে বিভিন্ন থলেয় ভর্তি করে রাখা হয়েছিল; কাল-ক্রমে থলেগুলি পচে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। স্মৃতিকথায় যত টাকার উল্লেখ ছিল তার সবটাই পাওয়া গেল; জমিদার-বাড়ির কর্তা হিসাবে মিঃ গ্রেটহেড উদারতাবশত আইনসম্মত উত্তরাধিকারী হিসাবে সব টাকাটা আমার হাতেই তুলে দিলেন, যদিও আমি মোটেই সে টাকার উত্তরাধিকারী নই, কারণ আসলে সেটা খুন ও চুরির মাল, আর ন্যায্যত অ্যালেনরাই তার মালিক। কিন্তু সে পরিবারটি নির্বংশ হয়ে গেছে; অন্তত আমাদের তাই বিশ্বাস, কারণ ভাগ্যহীনা দুটি মহিলারই প্রাণদণ্ড হয়েছিল। তাই অনেক কৃতজ্ঞতার সঙ্গে এবং শান্ত বিবেকেই সে দান আমি গ্রহণ করলাম। সেটা পেয়ে আমি আসন্ন বিপদ থেকে রক্ষা পেলাম এবং ভবিষ্যতে সুদিনের জন্য অপেক্ষা করার শক্তি পেলাম।"

আমি বললাম, "আর ভূতের কি হল? এই পরিণতিতে সে কি খুশি, না অখুশি হয়েছিল?"

কাউণ্ট জবাব দিলেন, "তা বলতে পারব না, সেই থেকে তাকে আর দেখা গেছে বলে শুনি নি, এসব ব্যাপার আমাদের চাইতে গ্রামবাসীরাই ভাল বোঝে; আমার বিশ্বাস তারা বলবে, এখন যদি ভূত বিনা বাধায় বেড়া ও সমাধিটা সরাবার অনুমতি দেয় তো তারা মোটেই অবাক হবে না; কিন্তু সে দুটি বস্তুকে এইসব অদ্ভুত ঘটনার স্মৃতি হিসাবে রেখে দেওয়াই মিঃ গ্রেটহেডের মনের বাসনা।"

The Italian's Story—Katharin Crow

গ্যাব্রিয়েল—আর্নেস্ট

"তোমাদের জঙ্গলে একটা বন্য জন্তু আছে," স্টেশনে যেতে যেতে শিল্পী কানিংহাম কথাটা বলল। গাড়িতে বসে সারাক্ষণ এই একটি কথাই সে বলল, কিন্তু ভ্যান শীল সারাক্ষণ এতবেশী বক্ বক্ করে চলল যে তার সঙ্গীর এই নীরবতা কারও নজরে পড়ল না।

ভ্যান শীল বলল, "হঠাৎ-আসা দু' একটা শেয়াল আর কয়েকটা স্থানীয় ভোঁদড়। তার বেশী জবরদস্ত কিছু নয়।" শিল্পী আর কিছু বলল না।

প্ল্যাটফর্মে পৌঁছে ভ্যান শীল শুধাল, "একটা বন্য জন্তুর কথা বলছিলে কেন?"

"ও কিছু না। আমার কল্পনামাত্র। এই তো ট্রেন এসে গেছে," কানিংহাম বলল।

সেদিন বিকেলেই ভ্যান শীল যথারীতি তার জঙ্গল মহল ঘুরে দেখতে গেল। তার পড়ার ঘরে একটা খড়-ভর্তি বক পাখি আছে; অনেকরকম বুনো ফুলের নামও সে জানে; কাজেই তার পিসি যদি তাকে একজন প্রকৃতিবিদ্ বলে মনে করে থাকে তাতে দোষের কিছু নেই। আর যাই হোক, সে খুব হাঁটতে পারে। হাঁটতে হাঁটতে সে যা কিছু দেখে তাই মনে রাখতে চেষ্টা করে। এটা তার স্বভাব। সাম্প্রতিক বিজ্ঞানকে সাহায্য করার চাইতে পরে এই নিয়ে কথা বলার উদ্দেশ্যেই সে একাজটা করে থাকে। জঙ্গলে যখন নীল রংয়ের ঘণ্টা-ফুল ফুটতে শুরু করে তখন সে সব্বাইকে সেকথা বলে বেড়ায়।

কিন্তু সেদিন বিকেলে ভ্যান শীল যা দেখতে পেল সেটা তার সাধারণ অভিজ্ঞতার অনেক বাইরে। ওক গাছের জঙ্গলের মধ্যে একটা গভীর হ্রদের উপর বেরিয়ে আসা একখানা পাথরের উপর চিৎ হয়ে শুয়ে বছর ষোল বয়সের একটি ছেলে তার ভেজা বাদামী শরীরটাকে ঝলমলে রোদে শুকিয়ে নিচ্ছে। সদ্য জলে ডুব দেবার ফলে তার পাট-করা ভিজে চুল মাথার উপর ছড়িয়ে পড়েছে, হাল্কা বাদামী চোখ দুটোতে যেন বাঘের চোখের ঝিলিক ফুটে উঠেছে। অলস চোখে সে ভ্যান শীলের দিকে তাকাল। একটি অপ্রত্যাশিত ছায়ামূর্তি যেন। কিছু বলার আগেই ভ্যান শীল ভাবতে লাগল: এই বুনো দেখতে ছেলেটা এখানে এল কোত্থেকে? দু'মাস আগে কারখানার মালিকের স্ত্রীর ছোট ছেলেটি হারিয়ে গেছে, সকলেরই ধারণা কারখানার নালার স্রোতে সে ভেসে গেছে, কিন্তু সে তো একেবারে শিশু, উঠতি বয়সের ছেলে নয়।

বলল, "তুই এখানে কি করছিস?"

"দেখতেই তো পাচ্ছ, শরীরে রোদ লাগাচ্ছি," ছেলেটি জবাব দিল।

"কোথায় থাকিস?"

"এখানে, এই জঙ্গলে।"

"জঙ্গলে তো থাকা যায় না," ভ্যান শীল বলল।

"কেন যাবে না? এ জঙ্গল তো খুব ভাল," ছেলেটির গলায় মুরুব্বিয়ানার স্বর।

"কিন্তু রাত্রে কোথায় ঘুমোস?"

"রাত্রে তো আমি ঘুমোই না; তখনই তো আমার যত কাজ।"

ভ্যান শীল বিরক্ত হয়ে বলল, "কি খাস?"

"মাংস," ছেলেটি এমনভাবে রসিয়ে কথাটা বলল যেন সত্যি মাংস খাচ্ছে।

"মাংস ? কিসের মাংস ?"

"যখন জানতে চাইছ তো বলি, খরগোস, বন-মোরগ, হাঁস, ভেড়া, পাওয়া গেলে ছোট ছেলেমেয়ে। আমি তো রাতেই শিকার ধরি, তখন তো সবকিছুই ঘরে তালা দিয়ে আটকে রাখা হয়। পুরো দু'মাস আগে একদিন শিশু-মাংস খেয়েছিলাম।"

শেষ কথাটার পরিহাসকে উপেক্ষা করে ভ্যান শীল বলল, "কিন্তু আমাদের পাহাড়ি খরগোসকে ধরা খুব সহজ ব্যাপার নয়।"

"রাত্রে আমি তো চারপায়ে শিকার ধরি," ছেলেটি পাল্টা জবাব দিল।

"মানে তুই বলতে চাস যে সঙ্গে একটা কুকুর থাকে ?"

ছেলেটির মুখে একটা বিচিত্র হাসি ফুটে উঠল : সেটাকে মুচকি হাসিও বলা যায়, আবার ভেংচিও বলা যায়।

"আমার তো মনে হয় না কোন কুকুর আমার সঙ্গী হতে রাজী হবে, বিশেষ করে রাতের বেলায়।"

ভ্যান শীলের মনে হল, বিচিত্র চোখ ও বিচিত্র জিহ্বার এই ছেলেটির মধ্যে কোথায় যেন রহস্যময় একটা কিছু লুকিয়ে আছে। বেশ কর্তৃত্বের ভঙ্গীতে বলল, "তোকে তো এই জঙ্গলের মধ্যে থাকতে দিতে পারি না।"

ছেলেটি বলল, "আমি তো মনে করি. বাড়িতে না নিয়ে আমাকে এখানে থাকতে দিলেই ভাল করবে।"

এই উলঙ্গ বুনো প্রাণীটি ভ্যান শীলের সুসজ্জিত বাড়িতে গিয়ে বাস করছে —একথা ভাবাটাই তো ভয়ংকর।

তবু ভ্যান শীল বলল, "স্বেচ্ছায় না গেলে তোকে জোর করে ধরে নিয়ে যাব।"

ছেলেটি বিদ্যুৎ চমকের মত ঘুরে বসল, হ্রদের জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল, তারপর চকচকে ভেজা শরীরটা নিয়ে হ্রদের পারে যেখানে ভ্যান শীল দাঁড়িয়ে ছিল তার কাছাকাছি তীরে গিয়ে হাজির হল। একটা ভোঁদড়ের পক্ষে ব্যাপারটা আশ্চর্য কিছু নয়, কিন্তু একটি ছেলের পক্ষে খুবই চমকে দেওয়ার মত। একটু পিছিয়ে যেতেই ভ্যান শীলের পা পিছলে গেল, হ্রদের শেওলা-ধরা পিছল তীরে সে সটান পড়ে গেল, তখন বাঘের মত হলদে চোখ দুটি তার কাছ থেকে খুব একটা দূরে নয়। আপনা থেকেই তার একটা হাত গলার কাছে উঠে গেল। ছেলেটি আবার হেসে উঠল, সে হাসির ফলে তার মুচ্‌কি হাসির আভাষ ভেংচির আড়ালে চাপা পড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে আশ্চর্য দ্রুততায় আর একটা লাফে হ্রদের জলে পড়ে সে শেওলা ও ফার্ণের জঙ্গলের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

উঠে দাঁড়িয়ে ভ্যান শীল বলল, "কী এক অসাধারণ বন্য জন্তু!" আর তখনই কানিংহামের কথাটা তার মনে পড়ে গেল, "তোমাদের জঙ্গলে একটা

বন্য জন্তু আছে।”

ধীর পায়ে বাড়ির পথে হাঁটতে হাঁটতে ভ্যান শীল মনে মনে সেইসব স্থানীয় ঘটনার কথা ভাবতে লাগল যার মধ্যে এই বিস্ময়কর অসভ্য বাচ্চাটার অস্তিত্বের একটা হদিস পাওয়া যায়।

ইদানীংকালে এসব জঙ্গলে শিকারের সংখ্যা ক্রমেই কমে আসছে, খামারে গৃহপালিত পশু হারিয়ে যাচ্ছে, অকারণেই খরগোস বিরল হয়ে আসছে, পাহাড় থেকে ভেড়াগুলোকে তুলে নিয়ে যাবার অভিযোগও শোনা যাচ্ছে। তাহলে কি এই বুনো ছেলেটাই শিকারী কুকুর সঙ্গে নিয়ে গ্রামাঞ্চলে শিকার ধরে বেড়াচ্ছে? নিজেই বলল, রাত হলে সে “চার পায়ে” শিকার করে,” অথচ আবার একথাও বলল যে “বিশেষ করে রাত্রে” কোন কুকুর তার কাছেও ঘেঁসে না। ব্যাপারটা খুবই গোলমেলে। হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ায় ভ্যান শীল পথের মাঝখানে থমকে দাঁড়াল, তার চিন্তার সুতোও কেটে গেল। দু’মাস আগে কারখানা থেকে একটা ছেলে হারিয়ে গেছে—সকলেই ধরে নিয়েছে যে সে নালার জলে ভেসে গেছে, কিন্তু তার মা বলেছে যে নালার বিপরীত দিকে পাহাড় থেকে আশা একটা চীৎকার সে শুনতে পেয়েছিল। ব্যাপারটা অচিন্ত্যনীয় হলেও দু’মাস আগে শিশু-মাংস খাবার মত বিশ্রি কথাটা ছেলেটি না বললেও পারত। পরিহাস করেও এধরনের ভয়ংকর কথা বলা উচিত নয়।

তার স্বভাববিরুদ্ধ হলেও জঙ্গলের এই আবিষ্কার সম্পর্কে ভ্যান শীল মোটেই মুখ খুলল না। সে স্বয়ং এ গ্রামের একজন কাউন্সিলর ও শান্তির অধিকর্তা; আর তার জমিদারির মধ্যেই এরকম একটি দুষ্কৃতকারী মানুষ বাস করছে এটা তার সম্মানের পক্ষে খুবই ক্ষতিকর, এমন কি এর ফলে অপহৃত ভেড়া ও হাঁস-মুরগির একটা মোটা বিলও তো লোকে তার হাতে ধরিয়ে দিতে পারে। সেরাতে ডিনারে বসে সে তাই অস্বাভাবিক রকমের চুপচাপ কাটাতে লাগল।

পিসি বলল, “তোমার গলায় কথা নেই কেন? মনে হচ্ছে যেন একটা নেকড়ে দেখেছ।”

ভ্যান শীল মনে মনে বলল, কি বোকার মত কথা! আরে, আমার জমিদারিতে একটা নেকড়ে দেখলে তো চৌদ্দ কাহন করে সেকথা বলে বেড়াতাম।

পরদিন সকালে প্রাতরাশে বসেও ভ্যান শীলের মনে হল, গতকালকার অস্বস্তিকরভাবটা তখনও মন থেকে দূর হয় নি; তাই সে স্থির করল, ট্রেনে চেপে পার্শ্ববর্তী গির্জা-শহরে গিয়ে কানিংহামকে খুঁজে বের করবে; তার কাছ থেকে জেনে নেবে কেন সে জঙ্গলে একটা বন্য জন্তুর কথা বলেছিল। এ-ব্যাপারে মনস্থির করার ফলে তার স্বাভাবিক হাসিখুশি ভাবটা আংশিক

ফিরে এল ; একটা সুর ভাঁজতে ভাঁজতে সিগারেটটা নিতে পাশের ঘরে গিয়ে ঢুকল। সঙ্গে সঙ্গে থেমে গেল সুর। গদী-আঁটা চৌকিটার উপর হাত-পা ছড়িয়ে পরম আরামে শুয়ে আছে জঙ্গলের সেই ছেলেটি। তার শরীরটা এখন শুকনো ; তাছাড়া আর কোন পরিবর্তন চোখে পড়ল না।

ভ্যান শীল গর্জে উঠল, "কোন্ সাহসে তুই এখানে এসেছিস ?"

ছেলেটি শান্ত গলায় বলল, "তুমিই তো বললে আমাকে জঙ্গলে থাকতে দেবে না।"

"কিন্তু এখানে আসতে তো বলি নি। আমার পিসি যদি দেখে ফেলে !"

সে বিপদকে যথাসম্ভব এড়াবার জন্য ভ্যান শীল তাড়াতাড়ি হাতের "মর্নিং পোস্ট" কাগজখানার ভাঁজের আড়ালে এই অবাঞ্ছিত অতিথিটিকে যথাসম্ভব লুকিয়ে রাখতে সচেষ্ট হল। ঠিক সেইমুহূর্তে পিসি ঘরে ঢুকল।

সভয়ে ছেলেটির দিকে চোখ রেখে ভ্যান শীল বেপরোয়াভাবে বলে উঠল, "এই অসহায় ছেলেটি পথ হারিয়ে ফেলেছে—স্মৃতিশক্তিও হারিয়েছে। সে কে বা কোথা থেকে এসেছে কিছুই জানে না।"

মিস্ ভ্যান শীলের মনটা নরম হল।

বলল, "মনে হচ্ছে ওর পরনেও কিছু নেই।"

"মর্নিং পোস্ট" খানাকে যথাস্থানে ধরে রাখার ব্যর্থ চেষ্টা করে ভ্যান শীল বলল, "সেসব কোথায় হারিয়ে ফেলেছে কে জানে।"

একটা উটকো বিড়াল-ছানা বা পথের কুকুর-বাচ্চাকে লোকে যেভাবে আদর করে ঠিক সেইভাবেই মিস্ ভ্যান শীলের করুণা এই গৃহহারা উলঙ্গ ছেলেটির জন্য উথলে উঠল।

বলল, "ওর জন্য সাধ্যমত সবকিছুই করতে হবে।" সঙ্গে সঙ্গে রেক্টরের বাড়িতে লোক পাঠানো হল। সেখানে একটি বালক-ভৃত্য আছে। লোকটি এক সুট জামা-কাপড়, জুতো, কলার—সব নিয়ে এসে হাজির হল। যতই পোশাক পরানো হোক, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা হোক, সাজানো-গোছানো হোক, ভ্যান শীলের চোখে তার রহস্যময়তা এতটুকু হ্রাস পেল না। পিসির কিন্তু ছেলেটিকে খুব ভাল লাগল।

বলল, "ওর আসল পরিচয় না জানা পর্যন্ত ওকে আমরা গ্যাব্রিয়েল—আর্নেস্ট বলে ডাকব। নামটা খুবই লাগসই হবে।"

ভ্যান শীল রাজী হল, কিন্তু যার গায়ে নামাবলীটা পরানো হল সে যে খুব সুবিধার ছেলে হবে সেবিষয়ে তার সন্দেহ মোটেই গেল না। আর সময় নষ্ট না করে কানিংহামের সঙ্গে দেখা করাই স্থির করল।

স্টেশনে যাবার জন্য সে যখন গাড়িতে উঠল তখন পিসি গ্যাব্রিয়েল—আর্নেস্টকে সাজিয়ে-গুছিয়ে বিকেল বেলাকার রবিবারের স্কুলের শিশু-শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে মেলামেশা করার উপযুক্ত করে তৈরি করতে ব্যস্ত।

কানিংহাম প্রথমে কিছু বলতে চাইল না।

বলল, "দেখ, আমার মা মস্তিষ্কের রোগে মারা গেছেন। তাই যদি অসম্ভব রকমের অবাস্তব কোন কিছু আমি দেখে থাকি, অথবা দেখেছি বলে মনে করি, তো সেবিষয়ে কোনরকম আলোচনা করতে যে কেন আমি চাইনা তা তো তুমি বুঝতেই পার।"

"কিন্তু তুমি কি দেখেছ?" ভ্যান শীল তবু প্রশ্ন করল।

"আমি যা দেখেছি বলে মনে করি সেটা এতই অসাধারণ যে কোন সুস্থ বুদ্ধির মানুষই সেটাকে একটা সত্যিকারের ঘটনা বলে ধরে নিতে পারে না। গত গন্ধ্যায় যখন তোমাদের ওখানে ছিলাম তখন ফল-বাগানের ফটকের গাছগাছালির বেড়াটার আড়ালে প্রায় লুকিয়ে থেকে দাঁড়িয়ে অস্তসূর্যের ম্লান রশ্মির দিকে তাকিয়ে ছিলাম। হঠাৎ একটা উলঙ্গ ছেলেকে দেখতে পেলাম; কাছাকাছি কোন হ্রদের জলে সদ্য স্নান করে এসেছে; খোলা পাহাড়ের মাথায় দাঁড়িয়ে সেও সূর্যাস্ত দেখছে। তার দাঁড়াবার ভঙ্গী দেখে আচম্বিতেই প্যাগান উপকথায় বনদেবতার কথা আমার মনে পড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে তাকে মডেল করে একটা ছবি আঁকার সাধ হল। কিন্তু পরমুহূর্তেই মনে হল তাকে কাছে ডাকি। ঠিক তখনই সূর্য দৃষ্টির আড়ালে ডুবে গেল, দৃশ্যপটের উপর থেকে কমলা ও লালের আভা মুছে গিয়ে দেখা দিল একটা ধূসর প্রেক্ষা-পট। আর ঠিক সেইমুহূর্তে আরও একটা বিস্ময়কর ঘটনা ঘটল—ছেলেটিও অদৃশ্য হয়ে গেল।

ভ্যান শীল উত্তেজিত গলায় শুধাল, "সে কি! একেবারে উধাও হয়ে গেল?"

শিল্পী জবাব দিল, "না; আর সেটাই আরও ভয়ানক, এক সেকেণ্ড আগে খোলা পাহাড়ের যেখানটায় ছেলেটি দাঁড়িয়েছিল দেখা গেল সেখানে দাঁড়িয়ে আছে একটা প্রকাণ্ড নেকড়ে, কালো রং, ঝকঝকে দাঁত, আর হলুদ, নিষ্ঠুর দুটি চোখ। তুমি হয়তো ভাবতে পার—"

কিন্তু বাজে চিন্তায় সময় নষ্ট করল না ভ্যান শীল। তীরবেগে সে ছুটল স্টেশনের দিকে। একটা টেলিগ্রাম করার কথা মনে হলেও সেটা নাকচ করে দিল। পরিস্থিতিটা বোঝাবার জন্য সে যদি তার করে—"গ্যাব্রিয়েল—আর্নেস্ট একটি নেকেড়ে-মানব"—তাহলেও সঠিক অবস্থাটা বোঝানো যাবে না। পিসি হয় তো ভাববে, আমি কোন সাংকেতিক খবর পাঠিয়েছি, কিন্তু তার নির্দেশিকাটা পাঠাতে ভুলে গেছি। এখন তার একমাত্র আশা সূর্য ডুবে যাবার আগেই বাড়ি পৌছতে হবে। রেলপথের অপর প্রান্তে যে গাড়ি-টার ব্যবস্থা আগে থেকেই করা ছিল সেটা যখন গ্রামের পথ ধরে ছুটে চলল তখন অস্তসূর্যের শেষ রাঙা আলো মিলিয়ে আসছে। যখন বাড়ি পৌছে গেল পিসি তখন ভুক্তাবশিষ্ট জ্যাম ও কেকগুলি তুলে রাখছে।

"গ্যাব্রিয়েল—আর্নেস্ট কোথায় ?" প্রায় আর্তনাদের মত স্বরে ভ্যান শীল শুধাল।"

পিসি বলল, "টুপদের ছোট ছেলেটিকে বাড়ি পৌছে দিতে গেছে। অনেক দেরি হয়ে গিয়েছিল, তাই ভাবলাম তাকে একা যেতে দেওয়াটা নিরাপদ নয়। কী চমৎকার সূর্যাস্ত, তাই না ?"

পশ্চিম আকাশের আলোর ছটার কথা ভ্যান শীল ভোলে নি, কিন্তু তা নিয়ে কোন কথা বলার জন্য সে দাঁড়াল না। সরু গলি দিয়ে বিদ্যুৎগতিতে গাড়ি ছুটিয়ে দিল টুপ-পরিবারের বাড়ির দিকে। পথের একদিকে কারখানার নালার তীব্র স্রোত, আর অন্যদিকে উঠে গেছে একটানা খাড়া পাহাড়। আকাশের বুকে অস্তসূর্যের শেষ আলোটুকু তখনও ছড়িয়ে আছে; আর একটা মোড় ঘুরলেই সেই অসম যুগলযাত্রীদ্বয়কে সে দেখতে পাবে। হঠাৎ শেষ লাল আলোটুকুও মিলিয়ে গেল, একটা ধূসর আলো কাঁপতে লাগল দিগন্ত-রেখার উপরে। একটা কর্কশ ভয়ার্ত চীৎকার ভ্যান শীলের কানে বাজল। সে গাড়ি থামিয়ে দিল।

টুপদেয় ছেলেটিকে বা গ্যাব্রিয়েল—আর্নেস্টকে আর কোনদিন দেখা যায় নি; কিন্তু গ্যাব্রিয়েল—আর্নেস্টের পরিত্যক্ত পোশাকপত্র পাওয়া গেল রাস্তার ধারে। তাই সকলেই ধরে নিল, শিশুটি নালায় পড়ে গিয়েছিল, আর ছেলেটি পোশাক খুলে নালার জলে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল তাকে বাঁচাবার ব্যর্থ চেষ্টায়। কাছাকাছি কাজ করছিল এরকম কয়েকজন শ্রমিক এবং ভ্যান শীল নিজেও সাক্ষী দিল, যেখানে পোশাকগুলি পাওয়া গেছে ঠিক সেখান থেকেই একটি শিশু-কণ্ঠের তীব্র আর্তনাদ তারা শুনতে পেয়েছিল। মিসেস টুপের আরও এগারোটি সন্তান ছিল; তাই এ শোক সে সহজেই সইতে পারল, কিন্তু মিস ভ্যান শীল তার প্রিয়পাত্রটির জন্য বড়ই শোকাকুলা হয়ে পড়ল। তার চেষ্টাতেই গ্রামের গির্জায় একটা পিতলের স্মৃতি-ফলক বসানো হল; তাতে লেখা হল: "গ্যাব্রিয়েল-আর্নেস্ট একটি অপরিচিত বালক, যে সাহসের সঙ্গে অপরের জন্য নিজের জীবন বিসর্জন দিয়েছিল।"

ভ্যান শীল প্রায় সব ব্যাপারেই পিসির কথা শোনে, কিন্তু গ্যাব্রিয়েল-আর্নেস্ট স্মৃতিরক্ষা তহবিলে চাঁদা দিতে সে সরাসরি অস্বীকার করল।

Gabriel—Ernest—Saki

কুহকিনীর কাহিনী

"দ্বৈতবাদ বিতর্ক"-এর উপর লেখা আমার পাণ্ডুলিপিটা যখন ভূমধ্য-সাগরের জলে পড়ে তলিয়ে যেতে লাগল তার চাইতে সুন্দর দৃশ্য আমি খুব অল্পই দেখেছি। একখণ্ড কালো পাথরের মত বইখানা ডুবে গেল, অচিরেই খুলে গেল, ফিকে সবুজ পাতাগুলো খুলে গিয়ে নীল জলের মধ্যে কাঁপতে লাগল। এই অদৃশ্য হয়ে গেল, আবার দেখা দিল অনন্ত সুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত একখণ্ড যাদুকরী রবারের মত, আবার হয়ে উঠল একখানি বই, সর্ববিদ্যা-সংগ্রহ পুঁথির চাইতেও বড়। সমুদ্রের একেবারে তলায় পৌঁছে বইখানা যেন আরও অলৌকিক হয়ে উঠল, একমুঠো বালুকণা যেন তাকে সাদরে গ্রহণ করে দৃষ্টির আড়ালে নিয়ে গেল। বইটা কিন্তু আবার দেখা দিল, ঈষৎ কাঁপলেও বেশ স্বাভাবিক, পাতাখোলা অবস্থায় চিৎ হয়ে পড়ে আছে, আর অদৃশ্য আঙুলগুলি সেই পাতার মধ্যে নড়াচড়া করছে

পিসি বলল, "খুবই দুঃখের কথা যে হোটেলে থাকতে তোমার বইটা শেষ করলে না। তাহলে এখন বেশ খোলা মনে বেড়াতে পারতে, আর এ ঘটনাটাও ঘটত না।"

পাদরি বলল, "কিছুই নষ্ট হবে না, সবই ফিরে আসবে আরও সমৃদ্ধ হয়ে, আরও বিস্ময় নিয়ে।" তার বোন বলল, "সে কি, বইটা যে অতলে তলিয়ে গেল!" মাঝিদের একজন হেসে উঠল, আর অপরজন মুখে কিছু না বলে উঠে দাঁড়িয়ে পোশাক খুলতে শুরু করল।

কর্ণেল চেঁচিয়ে উঠল, "পুণ্যাত্মা মোজেস! লোকটা কি পাগল?"

পিসি বলল, "ঠিক, তাকে ধন্যবাদ দিন, অর্থাৎ তাকে বলুন সে খুবই দয়ালু, কিন্তু এখন থাক।"

আমি অভিযোগের সুরে বললাম, "যাই বল, আমি চাই বইটা আমার কাছে ফেরৎ আসুক। এটা যে আমার 'ফেলোশিপের আলোচনা।' আর অপেক্ষা করলে যে ওর কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না।"

ছাতার আড়াল থেকে কোন নারী-কণ্ঠ বলে উঠল, "আমি একটা কথা বলছি। প্রকৃতির সন্তানটি বইটা তুলে আনতে জলে ডুব দিক, আর আমরা অন্য কোন 'গ্রোটো'তে (বিশ্রামশালায়) চলে যাই। তাকে এই পাহাড়ে বা অন্য কোথাও নামিয়ে দিয়ে যাব, আর আমরা যখন ফিরব ততক্ষণে সেও সেখানে হাজির থাকবে।"

প্রস্তাবটা ভালই মনে হল; তাতে কিছুটা যোগ করে আমি বললাম,

আমিও সেখানেই নেমে যাব; তাতে নৌকোটাও কিছুটা হাল্কা হবে। কাজেই ছোট গ্রোটোটির বাইরে একটি রৌদ্রস্নাত পাহাড়ের বুকে আমাদের দুজনকে ছেড়ে দেওয়া হল।

নৌকোটা ছেড়ে যেতেই বুঝলাম, আমি কত বড় অবিবেচক। একটা গড়ানে পাহাড়ের উপর আমার একমাত্র ভরসা একজন অজ্ঞাত মিসীলীর অধিবাসী। নিজেকে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে আমার হাতটা চেপে ধরে সে বলল, "গ্রোটোর শেষপ্রান্তে চলুন, আপনাকে একটা সুন্দর জিনিস দেখাব।"

তার কথামত একলাফে পাহাড় থেকে বেরিয়ে-আসা পাথরটার উপর গিয়ে দাঁড়ালাম। নীচে সমুদ্রের তরঙ্গ-গর্জন। সে আমাকে আলোর কাছ থেকে টেনে নিয়ে চলল। একেবারে শেষপ্রান্তে একটি ছোট পীরোজা-চূর্ণের মত বালুকাময় সৈকতভূমিতে গিয়ে দাঁড়ালাম। সেখানে আমার হাতে তার পোশাকপত্র দিয়ে সে দ্রুতপায়ে পাহাড়ের মাথায় উঠে গেল। মুহূর্তের জন্য উজ্জ্বল সূর্যালোকে সে উলঙ্গদেহে একবার দাঁড়াল, নীচে যেখানে বইটা রয়েছে সেদিকে তাকাল। তারপর বুকের উপর ক্রুশ-চিহ্ন এঁকে দুই হাত মাথার উপর তুলে ঝাঁপ দিল।

বইটা যদি আশ্চর্য কিছু হয়, লোকটি সব বর্ণনার অতীত। সে যেন সাগরের তলে জীবন্ত একটি রূপোলি মূর্তি, তার মধ্যে জীবনের ধারাটি কাঁপছে সবুজে-নীলে। তার সুখ অনন্ত, জ্ঞান অনন্ত—কিন্তু রোদে-পোড়া, জল-ঝরা শরীর নিয়ে "দ্বৈতবাদী বিতর্ক"-এর পুঁথিখানা দুই সারি দাঁতের ফাঁকে চেপে ধরে সে যে আবার উঠে আসবে সেটা তো একেবারেই অসম্ভব।

ডুবুরিরা সাধারণত কিছু আর্থিক পুরস্কার আশা করে। আমি যতই দেই না কেন সে নিশ্চয়ই আরও বেশী চাইবে; আর এরকম একটা সুন্দর নির্জন জায়গায় কোনরকম তর্কাতর্কি করার ইচ্ছাও আমার ছিল না। তাই কথা-প্রসঙ্গে সে যখন বলল "এরকম জায়গায় কুহকিনীদের দেখা পাওয়া যেতে পারে," তখন আমি খুবই স্বস্তি বোধ করলাম।

তার কথায় তার পরিবেশের সুর বেজে ওঠায় আমি খুশি হলাম। এখন আমরা রয়েছি সাধারণ বাস্তব জগৎ থেকে অনেক দূরে এক মায়া-জগতে; এ যেন এক নীলের জগৎ—সমুদ্র যার মেঝে, যার পাহাড়ের দেয়াল ও ছাদের ছায়া সমুদ্রের জলে পড়ে কাঁপছে। এখানে একমাত্র অলৌকিককেই সহ্য করা যায়। আর সেই মনোভাব নিয়েই আমিও তার কথারই পুনরাবৃত্তি করে বললাম, "সহজেই কুহকিনীর দেখা পাওয়া যেতে পারে।"

পোশাক পরতে পরতে সে সকৌতূহলে আমাকে দেখতে লাগল। বালির উপর বসে আমি বইয়ের লেপ্টে-যাওয়া পাতাগুলি খুলছিলাম।

অবশেষে সে বলে উঠল, "ওহো, আপনি হয় তো গত বছর ছাপানো

বইটা পড়েছেন। কে ভাবতে পেরেছিল যে আমাদের কুহকিনী বিদেশীদেরও আনন্দ দিতে পারবে!"

(আমি পরবর্তীকালে সেটা পড়েছিলাম। যুবকটির একটা কাঠ-খোদাই ছবি থাকা সত্ত্বেও বিবরণটি স্বভাবতই অসম্পূর্ণ ছিল।)

আমি বললাম, "সে তো নীল সাগরের ভিতর থেকে উঠে আসে, তাই না? আর পাহাড়ের ঠিক মুখে বসে চুল আঁচড়ায়?"

সে শুধাল, "আপনি কি কোনদিন তাকে দেখেছেন?"

"প্রায়ই তো দেখি।"

"আমি কোনদিন দেখি নি।"

"কিন্তু তুমি তার গান তো শুনেছ?"

কোটটা গায়ে দিয়ে সে অধৈর্য গলায় বলল, "জলের নীচে সে গান করবে কেমন করে? কে তা পারে? অনেকসময় সে গাইতে চেষ্টা করে, কিন্তু বড় বড় বুদ্বুদ ছাড়া আর কিছুই তার মুখ থেকে বের হয় না।"

"তার তো পাহাড়ের উপর উঠে যাওয়া উচিত।"

এবাব সে রেগে বলল, "তা কেমন করে যাবে? পুরোহিতরা তো বাতাসকে মন্ত্রপূত করে রেখেছে, সে-বাতাসে সে নিঃশ্বাস নিতে পারে না, পুরোহিতরা পাহাড়কে মন্ত্রপূত করে রেখেছে, সেখানে সে বসতে পারে না। কিন্তু সমুদ্রকে কেউ মন্ত্রপূত করতে পারে না, কারণ সমুদ্র যে অনেক বড় আর সদা পরিবর্তনশীল। তাই সে সমুদ্রেই থাকে।"

আমি চুপ।

এবার তার মুখটা শান্তভাব ধারণ করল। এমনভাবে আমার দিকে তাকাল যেন একটা কিছু তার মনে এসেছে। প্রবেশমুখের পাহাড়টায় গিযে সে বাইরের নীল সমুদ্রের দিকে তাকাল, তারপর ফিরে এসে বলল, "নিয়ম হচ্ছে একমাত্র ভাল মানুষরাই কুহকিনীকে দেখতে পায়।"

আমি কোন মন্তব্য করলাম না। একটু থেমে সে আবার বলতে শুরু করল। "সে এক আশ্চর্য ব্যাপার; পুরোহিতরাও তার ব্যাখ্যা করতে পারে না। অবশ্য সে খুব দুষ্ট। শুধু যে যারা উপবাস ও প্রার্থনা করে তাদেরই বিপদ ঘটে তা নয়। যারা দৈনন্দিন জীবনে শুধুই ভাল মানুষ, তাদেরও বিপদ ঘটে। দুই প্রজন্ম ধরে কেউ তাকে দেখে নি। আমি তাতে অবাক হই না। জলে নামবার আগে আমরা সকলেই ক্রুশ-চিহ্ন আঁকি, কিন্তু সেটা অদরকারী। আমরা ভাবতাম, গিসেপ্পি অন্য অনেকের চাইতে নিরাপদ। আমরা তাকে ভালবাসতাম সেও আমাদের অনেককেই ভালবাসত; কিন্তু তাকে তো আর ভাল হওয়া বলে না।

আমি জানতে চাইলাম, গিসেপ্পি কে।

"সেদিন—তখন আমার বয়স ছিল সতেরো আর দাদার বয়স কুড়ি;

সে ছিল আমার চাইতে অনেক বেশী শক্তিশালী ; আর যে অতিথিরা এই গ্রামকে দিয়েছে সম্পদ ও নানা রকমের পরিবর্তন সেই বছরই তারা প্রথম আসতে শুরু করেছিল। বিশেষ করে একজন ইংরেজ মহিলা এসেছিলেন ; খুব বড় ঘরের মেয়ে ; এই জায়গাটা সম্পর্কে একখানা বইও লিখেছেন ; তারই চেষ্টায় এখানে গড়ে উঠেছে ইম্প্রুভ্মেণ্ট সিণ্ডিকেট ; আর সিণ্ডিকেট একটি বিশেষ রেলপথের সাহায্যে হোটেলগুলিকে স্টেশনের সঙ্গে যুক্ত করার কাজে নেমেছে।"

"সে মহিলার কথা না হয় এখন থাক," আমি বললাম।

"সেদিন তাকে ও তার বন্ধুদের গ্রোটোগুলো দেখাতে নিয়ে গেলাম। পাহাড়ের ধার ঘেঁসে নৌকো চালিয়ে যেতে যেতে যেমন সকলেই করে থাকে আমিও তেমনি হাত বাড়িয়ে একটা ছোট কাঁকড়া তুলে নিয়ে তার দাঁড়াগুলো ভেঙে তাদের দিতে গেলাম। মহিলারা তো ভয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন, কিন্তু একটি ভদ্রলোক খুশি হয়ে টাকা দিতে চাইলেন। অনভিজ্ঞ লোক হওয়ায় আমি টাকা নিতে অস্বীকার করলাম। বললাম, তিনি যে সুখী হয়েছেন সেটাই যথেষ্ট পুরস্কার। গিসেপ্পি পিছনের দাড়ে বসেছিল ; আমার উপর খুব রেগে গিয়ে হাতটা বাড়িয়ে সে আমার মুখের কোণে এত জোরে আঘাত করল যে দাঁতে লেগে আমার ঠোঁটটা ফেটে গিয়ে রক্ত ঝরতে লাগল। আমি তাকে পাল্টা আঘাত করতে চেষ্টা করলাম, কিন্তু সে তাড়াতাড়ি সরে গিয়ে আবার আঘাত করল আমার বগলের নীচে। মহিলাদের মধ্যে হৈ-চৈ পড়ে গেল। পরে শুনেছিলাম, তারা তখনই মতলব করেছিল যে আমাকে দাদার কাছ থেকে নিয়ে হোটেলের ওয়েটার বানিয়ে তুলবেন। অবশ্য, সেটা আর ঘটে ওঠে নি।

"যখন গ্রোটোতে পৌঁছলাম—এখানে নয়, সেটা আরও বড়—তখন ভদ্রলোকটি প্রস্তাব করল, আমাদের দুজনের যেকোন একজনকে টাকার বিনিময়ে সমুদ্রে ডুব দিতে হবে। মহিলারাও তাতে সম্মতি জানাল। আমাদের জলে ডুব দিতে দেখে বিদেশীরা যে কত আনন্দ পায় গিসেপ্পি তা ভালই জানে ; তাই সে গোঁ ধরে বসল যে রূপো না পেলে সে ডুব দেবে না। ভদ্রলোকটি তৎক্ষণাৎ একটা দুই-লিবার মুদ্রা সমুদ্রে ছুঁড়ে দিল।

"জলে ঝাঁপ দেবার ঠিক আগে দাদার চোখে পড়ল যে আমি কাটা ঠোঁটটা চেপে ধরে কাঁদছি। সে হেসে বলে উঠল, 'কোন ভয় নেই রে! এবার অন্তত কুহকিনীর সঙ্গে আমার দেখা হচ্ছে না! ক্রুশ-চিহ্ন না এঁকেই সে ডুব দিল। কিন্তু কুহকিনীর দেখা সে পেল।"

কথা থামিয়ে হাত বাড়িয়ে একটা সিগারেট নিল। প্রবেশমুখের সোনা-রং পাহাড়, কম্পমান দেয়াল ও যাদুকর সাগরের দিকে তাকালাম। সেখানে অনবরত বড় বড় বুদ্বুদ উঠছে।

অবশেষে সিগারেটের গরম ছাই ঢেউয়ের উপর ফেলে সে মুখটা ঘুরিয়ে বলল, "মুদ্রাটা না নিয়েই দাদা উঠে এল। তাকে টেনে নৌকোতে তুললাম। জল খেয়ে পেট ঢাক হয়ে গেছে, এতবেশী ভিজে গেছে যে পোশাকটাও পরানো গেল না। কোন লোককে এত বেশী ভিজতে আমি কখনও দেখি নি। ভদ্রলোক ও আমি নৌকো বেয়ে ফিরে এলাম। গিসেপ্পিকে বস্তা দিয়ে ঢেকে মাস্তুলের গায়ে হেলান দিয়ে বসিয়ে দিলাম।"

আমি অস্ফুট গলায় বললাম, "সে তাহলে ডুবে যায় নি ?

লোকটি রেগে বলল, "না। সে কুহকিনীকে দেখতে পেয়েছিল। আপনাকে তো বলেছি।"

আবার চুপ করে গেলাম।

"অসুস্থ না হলেও তাকে বিছানায় শুইয়ে দিলাম। ডাক্তার এসে টাকা নিয়ে গেল। পুরোহিত এসে তার গায়ে পবিত্র জল ছিটিয়ে দিয়ে গেল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। সে তখন ভীষণ ফুলে উঠেছে—সাগরের মতই। 'সান বিয়াগো'-র বুড়ো আঙুলের হাড়ে চুমো খেল ; সন্ধ্যার আগে সে দাগ শুকোল না।"

"তখন সে কেমন দেখতে হয়েছিল ?" সাহস করে শুধালাম।

"যেকেউ কুহকিনীকে দেখলে যেমনটি হয় ঠিক সেইরকম। আপনি যদি 'প্রায়ই' তাকে দেখে থাকেন তো বুঝতে পারছেন না কেন ? সুখ ছিল না, কারণ সে সবই জানত। যা কিছু জীবন্ত তাই তার দুঃখের কারণ, কারণ সে জানত সে মরে যাবে। সে তখন কেবল ঘুমোতে চাইত।"

আমার বইটাতে মন দিলাম।

"কাজ করে না, খেতে ভুলে যায়, পোশাক পরেছে কি না তাও ভুলে যায়। সব কাজের চাপ পড়ল আমার উপরে ; বোনকেও কাজে বেরোতে হয়। তাকে ভিক্ষুক সাজাতে চেষ্টা করলাম, কিন্তু তার শক্ত-সমর্থ চেহারা দেখে কারও করুণা হত না ; বুদ্ধিহীন হলেও তার চোখে সেটা ফুটে উঠত না। রাস্তায় দাঁড়িয়ে সে লোকজনের দিকে তাকিয়ে থাকত ; যত তাকাত ততই তার দুঃখ বাড়ত। কোন শিশুর জন্ম হলে সে দুই হাতে মুখ ঢাকত। কেউ বিয়ে করলে সে তো ভয়ংকর হয়ে উঠত ; তারা যখন গির্জা থেকে বেরিয়ে আসত তখন তাদের শাসাত। তখন কে জানত যে সে নিজেই একদিন বিয়ে করে বসবে ! আর সেটা আমিই ঘটিয়ে দিলাম। হ্যাঁ, আমি। খবরের কাগজে পড়লাম, রাগুসার একটি মেয়ে 'সমুদ্রে স্নান করে পাগল হয়ে গেছে।' গিসেপ্পি উঠে দাঁড়াল, আর এক সপ্তাহের মধ্যেই মেয়েটিকে সঙ্গে নিয়ে ঘরে ফিরল।

"দাদা আমাকে কখনও কিছু বলে নি, কিন্তু আমার ধারণা সে সোজা মেয়েটির বাড়িতে গিয়ে দরজা ভেঙে তাকে তুলে নিয়ে এসেছিল। সে ছিল

এক ধনী খনি-মালিকের মেয়ে। কাজেই আমাদের বিপদটা তো বুঝতেই পারছেন। একজন নিপুণ উকিলকে সঙ্গে নিয়ে তার বাবা ছুটে এল আমাদের বাড়িতে, কিন্তু আমার চাইতে বেশী কিছুই করতে পারল না। তারা তর্ক করল, ভয় দেখাল, আর শেষপর্যন্ত ফিরে গেল। আমাদের কিছুই হল না—অর্থাৎ টাকাপয়সা ব্যয় করতে হল না। গিসেপ্পি ও মারিয়াকে নিয়ে গির্জায় গেলাম, তাদের বিয়ে দিয়ে দিলাম। উঃ! সে কী বিয়ে! পুরোহিত আর কোনদিন ঠাট্টা-তামাসা করে নি, আর গির্জা থেকে বের হতেই ছেলেরা ইট-পাটকেল ছুঁড়তে লাগল···মেয়েটিকে সুখী করতে আমি মরতেও রাজী ছিলাম; কিন্তু এক্ষেত্রে যা হয়ে থাকে, কারও কিছুই করার ছিল না।''

"তাহলে বিয়ের পরে তারা দুজনই অসুখী হয়েছিল?''

"তারা পরস্পরকে ভালবাসত, কিন্তু ভালবাসা তো সুখ নয়। ভালবাসা আমরা সকলেই পেতে পারি। ভালবাসা তো তুচ্ছ। তখন দুটো কাজের লোক রাখতে হয়েছিল, কারণ সব ব্যাপারেই যেমন দেবা তেমনি দেবী—কে যে কখন কি বলে তা কেউ জানে না। নিজেদের নৌকোটা বিক্রি করে দিয়ে এখন এই খারাপ বুড়োটার কাছে কাজ করতে হচ্ছে। সবচাইতে খারাপ কি জানেন, সকলেই আমাদের ঘৃণা করতে শুরু করল। প্রথমে ছোট ছেলেমেয়েরা—তাদের দিয়েই তো সব কিছু শুরু হয়—তারপর নারীরা, আর সবশেষে পুরুষরা। কারণ সর্ব দুর্ভাগ্যেরই কারণ তো—আপনি আবার কাউকে বলে দেবেন না তো?''

আমি কথা দিলাম কাউকে বলব না। সে আবার বলতে শুরু করল।

"মারিয়ার পেটে সন্তান এল। লোকে বলল, "তোমার আদরের ভাইপোটি কতদিনে জন্মাবে? আহা, এমন বাবা-মার কী সন্তানই না হবে!'' স্থির গলায় জবাব দিতাম," সন্তান ভালই হবে। কথায় বলে, 'দুঃখ থেকেই তো সুখের জন্ম।' আমার জবাব শুনে তারা ভয় পেল, পুরোহিতদের গিয়ে বলল, আর পুরোহিতরা আরও বেশী ভয় পেল। তারপরই কানাঘুসা শুরু হয়ে গেল যে সন্তানটি হবে খৃস্টবিরোধী। ভয়ের কোন কারণ নেই: সে কোনদিন জন্মাবে না।

"এক বুড়ি ডাইনি ভবিষ্যদ্বাণী করতে লাগল, কেউ তাকে বাধা দিল না। সে বলল, গিসেপ্পি ও মেয়েটা হল ছোট শয়তান, তারা বেশীকিছু ক্ষতি করতে পারে না। কিন্তু সন্তানটি হবে মহাশয়তান, হাসবে, খেলবে, কথা বলবে, এবং শেষপর্যন্ত সাগরে গিয়ে কুহকিনীকে এনে বাতাসে ছেড়ে দেবে আর সারা জগৎ তাকে দেখবে, তার গান শুনবে। যেই সে গান গেয়ে উঠবে অমনি সপ্ত ভাণ্ডের ঢাকনা খুলে যাবে, পোপ মারা যাবেন, মঙ্গিবেলোতে আগুন লাগবে, আর সান্তা আগাতার ঘোমটা পুড়ে যাবে। তারপর সেই ছেলের সঙ্গে কুহকিনীর বিয়ে হবে, আর তারা দুজনে মিলে চিরকাল ধরে

পৃথিবীতে রাজত্ব করবে।

"সারা গ্রামে হৈ-চৈ পড়ে গেল, হোটেলওয়ালারা মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল, কারণ যাত্রীদের আসার মরশুম সবে শুরু হতে চলেছে। তারা সকলে একজোট হয়ে স্থির করল, সন্তান না হওয়া পর্যন্ত গিসেপ্পি ও মেয়েটিকে আরও ভিতরে পাঠিয়ে দেওয়া হবে, আর সেজন্য অনেক টাকা চাঁদাও তোলা হল। যেদিন তাদের চলে যাবার কথা তার আগের রাতটা ছিল পূর্ণিমা। আকাশে ভরা চাঁদ, হঠাৎ পূব থেকে ধেয়ে এল বাতাস, সমুদ্র ফেঁপে-ফুলে উঠে কূল ছাপিয়ে পাহাড়ের মাথায় গিয়ে পৌঁছল। সে এক আশ্চর্য দৃশ্য। মারিয়া বলল, সে আর একবার দৃশ্যটা দেখবেই।

"আমি বললাম, 'তুমি যেয়ো না। আমি পুরোহিতকে ওদিকে যেতে দেখেছি। সঙ্গে আরও কেউ আছে। হোটেলওয়ালারা চায় না যে তোমাকে কেউ দেখুক। তাদের চটালে আমরা যে না খেয়ে মারা যাব।'

"মেয়েটি জবাব দিল, 'আমি যাব। সমুদ্রে ঝড় উঠেছে; এ দৃশ্য হয় তো আর কোনদিন দেখতে পাব না।'

"গিসেপ্পি বলল, 'ভাই ঠিকই বলেছে। তুমি যেয়ো না। যদি যাওই তো আমরা একজন তোমার সঙ্গে যাব।'

"আমি একলা যাব," একথা বলে, একলাই সে গেল।

"তাদের মালপত্র একটা কাপড়ে পুঁটলি বেঁধে দিলাম; কেমন যেন মনে হতে লাগল যে তাদের দুজনকেই আমি হারাব। দাদার পাশে গিয়ে বসে দুই হাতে তার গলা জড়িয়ে ধরলাম, আর সেও আমার গলা জড়িয়ে ধরল। এক বছরের উপর হয়ে গেল সে আমাকে এভাবে জড়িয়ে ধরে নি। এইভাবে কতক্ষণ যে আমরা বসেছিলাম তা মনে পড়ে না।

"হঠাৎ দরজাটা খুলে গেল। চাঁদের আলো ও বাতাস একসঙ্গে ঘরে ঢুকল। একটি শিশু-কণ্ঠ হাসতে হাসতে বলল, 'তাকে ওরা পাহাড়ের উপর থেকে সমুদ্রে ফেলে দিয়েছে।"

ছুটে টানাটার কাছে গেলাম। সেই টানার মধ্যে আমার ছোরা-ছুরিগুলো থাকে।

"বসে থাকব," গিসেপ্পি বলল। "সে মরেছে বলে অন্যকেও মরতে হবে কেন?"

চীৎকার করে বললাম, "একাজ কে করেছে আমি জানি। তাকে আমি খুন করব।"

"ঘর থেকে প্রায় বেরিয়ে গিয়েছিলাম, কিন্তু সে আমাকে জাপ্‌টে ধরল; দুটো হাত চেপে ধরে কব্জি দুটো মুচড়ে দিল—প্রথমে ডানটা, তার পর বাঁটা। গিসেপ্পি ছাড়া এ কাজের কথা আর কেউ ভাবতেও পারত না। যন্ত্রণায় আমি অজ্ঞান হয়ে গেলাম। জ্ঞান ফিরে এলে দেখলাম সে চলে গেছে।

আর কোনদিন তাকে দেখি নি।"

কিন্তু গিসেপ্পিকে আমার ভাল লাগল না।

লোকটি বলল, "আপনাকে তো বলেছি সে খারাপ লোক ছিল। সে যে কুহকিনীকে দেখতে পাবে তা কেউ আশা করে নি।"

"সে যে কুহকিনীকে দেখেছিল তা তুমি জানলে কেমন করে?"

"কারণ সে তো তাকে 'মাঝে মাঝেই' দেখে নি, মাত্র একবারই দেখেছে।"

"সে যদি খারাপ লোকই হবে তাহলে তুমি তাকে ভালবাস কেন?"

এই প্রথম সে হেসে উঠল। আর সেটাই তার একমাত্র জবাব।

"এখানেই শেষ?" আমি শুধালাম।

"যে লোক মেয়েটিকে খুন করেছিল আমি তাকে মারি নি, কারণ আমার কব্জি দুটো যখন ভাল হল ততদিনে সে আমেরিকায় পাড়ি দিয়েছে, তাছাড়া, একজন পুরোহিতকে তো খুন করা যায় না। আর গিসেপ্পির কথা? কুহকিনীকে দেখেছে এমন আর একটি মানুষের খোঁজে সে সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়াল—সে যদি পুরুষ হয় তো হোক, তবে নারী হলেই ভাল হয়, কারণ তাহলে হয়তো একটি সন্তান জন্ম নিতে পারে। শেষ পর্যন্ত সে লিভারপুলে হাজির হল; সেখানে তার কাশি হল, রক্ত-বমি হল, আর শেষ পর্যন্ত মারা গেল।

"এখনও বেঁচে আছে এমন কেউ কুহকিনীকে দেখেছে বলে আমি মনে করি না। সেরকম মানুষ এক প্রজন্মে একজনের বেশী কদাচিৎ থাকে, আমার জীবনকালে আর কোনদিন এমন দুটি নরনারীকে পাব না যাদের মিলনে সেই শিশুর জন্ম হবে, যে সমুদ্রের বুক থেকে কুহকিনীকে ডেকে আনবে, নৈঃশব্দ্যকে ধ্বংস করবে, আর পৃথিবীকে বাঁচাবে।"

"পৃথিবীকে বাঁচাবে?" আমি চীৎকার করে বললাম। সেটাই কি ভবিষ্যদ্বাণীর শেষ কথা ছিল?"

পাহাড়ের গায়ে হেলান দিয়ে সে ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলতে লাগল। সব নীল-সবুজ প্রতিবিম্বের মধ্যে আমি তাকেই দেখতে পেলাম। শুনতে পেলাম সে বলছে: "নৈঃশব্দ্য ও নির্জনতা চিরদিন থাকতে পারে না। একশ' বছর, হাজার বছর থাকতে পারে, কিন্তু সমুদ্র আরও বেশীদিন থাকবে, আর তার ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে কুহকিনী গান করবে।" তাকে আরও কিছু জিজ্ঞাসা করার ছিল, কিন্তু সেইমুহূর্তে গুহাটা অন্ধকার হয়ে গেল, আর তার সংকীর্ণ প্রবেশ-মুখে ফিরতি নৌকোটা এসে ভিড়ল।

The Story of the Siren—E. M Forster

অধরা নারী

একদা এক যুবক রোমে বেড়াতে এসেছিল।

সেটাই তার প্রথম রোমদর্শন ; সে এসেছিল একটা গ্রামাঞ্চল থেকে—কিন্তু এই সুন্দর ও বড় রাজধানী-শহরটি যে অন্য অনেক জায়গার তুলনায় অনেক ভাল ভাল জিনিস তার হাতে তুলে দেবে এমন কথা ভাববার মত অল্প বয়স বা অতি-সরলতা তার ছিল না। সে জানত, জীবনটাই মায়া, অনেক আশ্চর্য ঘটনা যেমন ঘটতে পারে, তেমনি তার ক্ষতিপূরণ হিসাবে অনেক হতাশাও দেখা দিতে পারে ; সে আরও জানত, আবার এমনও হতে পারে যে কিছুই ঘটল না। নিজের কাজে ব্যস্ত একটা বড় শহরে সেরকমটা ঘটা সব সময়ই সম্ভব।

এইসব ভাবতে ভাবতে সে স্পেনীয় সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে সম্মুখে প্রসারিত বিখ্যাত প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীর দিকে তাকিয়েছিল। সায়ংকালীন যানবাহনের ক্রমবর্ধমান কলরব শুনতে শুনতে তার চোখের সামনে রোমের স্বর্ণ-গোধূলির পশ্চাৎপটে একের পর এক আলোগুলি জ্বলে উঠল। ঝকঝকে মোটরগুলি ফোয়ারার পাশ দিয়ে দ্রুতগতিতে আলোকিত "ভিয়া কণ্ডোত্তি"তে গিয়ে ঢুকল, বাসের হলুদ জানালায় অনেক মুখের ভিড়, সকলের চোখেমুখেই কোথায় যেন যাবার তাড়া ; শহরের প্রতিটি মানুষই সায়ংকালীন কাজে ব্যতিব্যস্ত। শুধু তারই কিছু করবার নেই।

শহরের এই সব কর্মব্যস্ত মানুষের মধ্যে নিজেকে বড়ই একলা মনে হতে লাগল। অ্যাডভেঞ্চারের সন্ধান থেকে এ বোধ জন্মে নি। এরকম মনোভাব থেকে কোন লাভও হয় না। সুতরাং যুবকটি সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে লাগল, সুন্দর গির্জাটা পেরিয়ে পাহাড়ী পথ বেয়ে হোটেলের দিকে এগিয়ে চলল। সংকীর্ণ রাস্তাগুলোতে মদের দোকান ও খাবারের দোকানের ঠাসাঠাসি ভিড়। ভিত্তরিও ভেনেতো-র প্রশস্ত রাজপথের দু'ধারে বর্ঘিস্ গার্ডেনের ছায়ায় ইওরোপের সেরা কাফেগুলিতে তখন জমায়েত হয়েছে রোমের সেরা সব মানুষ। কিন্তু রাস্তাঘাটগুলি তখনও খুবই নির্জন! তাই যুবকটিও সেই-সব নির্জন, পুরনো রাস্তা ধরেই এগিয়ে চলল।

সেইরকমই একটা ফুটপাতবিহীন গলিপথ। দু'ধারে পুরনো হলুদ রংয়ের বাড়ি। নির্জন, গম্ভীর পরিবেশ। যুবকটি একাই পথ চলছে। হঠাৎ তার খেয়াল হল, একটিমাত্র নারীমূর্তি পাহাড় বেয়ে তার দিকেই নেমে আসছে।

নারী আরও কাছে এল। তার আবরণে-আভরণে সুরুচির ছাপ ; চলনে ঝরে পড়ছে গৌরব। মুখখানি অবগুণ্ঠনে ঢাকা, কিন্তু সে যে সুন্দরী

সেটা বুঝতে অসুবিধা হয় না। ঘটনাক্রমে এমন একটি সুন্দরী নারীর কাছাকাছি আসতে পেরে যুবকটির একাকিত্বের বোধটা যেন সহসা তাকে পীড়া দিতে লাগল। সৌজন্যের খাতিরে ঘাড় ঘুরিয়ে চোখ দুটি নামিয়ে নেবার আগে চকিতে একটিবার তার দিকে না তাকিয়ে পারল না।

একবার তাকিয়েই সে চমকে থেমে গেল ; তার মুখের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। না, সে ভুল করে নি। নারী মূর্তিটি হাসছে। তার আচরণও দ্বিধাগ্রস্ত। সঙ্গে সঙ্গে যুবকটির মনে হল : "বারাঙ্গণা ?" কিন্তু না, হাসিটা তো সেরকম নয়। আর কী আশ্চর্য, নারীমূর্তিই কথা বলল, "আমি—আমি জানি আপনাকে একথা বলা উচিত নয়···কিন্তু আজকের সন্ধ্যাটা এত সুন্দর···আর হয়তো আপনিও নিঃসঙ্গ, ঠিক আমার মতই ··"

নারী অপরূপা। যুবক মুখে কিছু বলতে পারল না, কিন্তু অন্তরের উচ্ছ্বসিত আনন্দ তাকে মৃদু হাসবার শক্তিটুকু যোগাল। নারী আর একবার দ্বিধাগ্রস্ত গলায় বলল, "তাই ভাবলাম···হয়তো···আমরা একসঙ্গে একটু হাঁটতে পারি, একপাত্র সুরা

এবার যুবক নিজেকে ফিরে পেল।

"তার চাইতে আনন্দের আর কী হতে পারে! আর এক মিনিট উপরে উঠলেই তো ভেনেতো।"

নারীর ঠোঁটে আবার মৃদু হাসি ফুটল।

"আমার বাড়িও ঠিক এখানেই · "

নীরবে তারা কয়েক পা নীচে নামল। যুবকটি তো একটু আগে এই মোড় দিয়েই উঠে গিয়েছে। নারী আঙুল তুলে দেখাল। প্রথম সারির ছোট ছোট বাড়িগুলো যেখানে শেষ হয়েছে তারপরেই খানিকটা খোলা জায়গা। তারা সেইখানে হেঁটে গেল। খোলা জায়গায় প্রাচীর-ঘেরা একটা বাগান, আর তার পিছনেই একটা রুচিসম্পন্ন বড় বাড়ি। স্ত্রীলোকটির মুখে একটা বিচিত্র ম্লান দীপ্তি,—স্বচ্ছ, সূক্ষ্ম ত্বক, ধূসর অথচ উজ্জ্বল দুটি চোখ, কালো ভুরু, আর উজ্জ্বল কালো চুলের একটা মিশ্র সৌন্দর্য। সে এগিয়ে গিয়ে চাবি ঘুরিয়ে বাগানের ফটকটা খুলে ফেলল।

ভেলভেটের পোশাক-পরা একটি চাকর তাদের অভ্যর্থনা জানাল। প্রকাণ্ড বৈঠকখানায় ঝাড়-লণ্ঠন ঝুলছে ; সামনের সবুজ উঠোনে জলের ফোয়ারা। ফেনায়িত সুরা পরিবেশন করা হল। দুজনে অনেক কথা হল। রোমের আতপ্ত রাতে বরফ-ঠাণ্ডা সুরা তাদের মনকেও উত্তপ্ত করে তুলল। যুবকটি মাঝে মাঝেই কৌতূহলী চোখে নারীর দিকে তাকাচ্ছে।

নারীও কটাক্ষপাতে এবং দাঁত ও চোখের চাতুরিতে অনেককিছু বোঝাতে চাইছে। যুবকটির মনে হল, তার সাবধান হওয়া উচিত। একসময় ভাবল, এবার মেয়েটিকে ধন্যবাদ জানিয়ে উঠে পড়াই ভাল—যেটুকু

বাধ্যবাধকতা জন্মেছে এখানেই তার ইতি হোক। কিন্তু মেয়েটি তাকে বাধা দিল, প্রথমে মৃদু হাসি দিয়ে, তারপর বিষণ্ণ দৃষ্টি দিয়ে। বারবার মিনতি জানাল, যুবকটি যেন কোনরকম বিব্রত বোধ না করে, সে বোঝে যে পরিস্থিতিটা একটু অদ্ভুত, এ অবস্থায় যুবকটির মনে কোনরকম দুরভিসন্ধির সন্দেহ জাগতে পারে; কিন্তু আসল সত্য এই যে সে বড় একা, আর হয়তো পথের মাঝখানে গোধূলির অস্পষ্ট আলোয় যুবকটির মধ্যে সে এমন কিছু দেখেছে যার আকর্ষণ তার কাছে দুর্বার হয়ে উঠেছে। তাই সে নিজেকে সংযত রাখতে পারে নি।

একটি পরিপূর্ণ মিলনের সম্ভাবনা—এমন একটি স্বপ্ন যা বহু অনাগত বৎসরের মোহভঙ্গের পরেও অমর হয়ে থাকবে—তাকে মনস্থির করতে সাহায্য করল। আনন্দে সেও অধীর হয়ে উঠল। মেয়েটিকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করল। তার আমন্ত্রণে দুজন একসঙ্গে আহার করল। চাকররা নানারকম সুখাদ্য পরিবেশন করল—শুক্তি, পাখির মাংস ও নরম ফল। তারপর দুজনে গিয়ে ঠাণ্ডা উঠোনের পাশে একটা সোফায় বসল। পানীয় এল। চাকররা বিদায় নিল। বাড়িটা নিশ্চুপ হল। তারা আলিঙ্গনে আবদ্ধ হল।

একটু পরে মুখে কিছু না বলে যুবকটির হাত ধরে নারী তাকে সেঘর থেকে নিয়ে চলল। কারও মুখে কোন কথা নেই। যুবকটির বুকের ভিতরটা ভীষণভাবে টিপ্ টিপ্ করছে—যেন সে শব্দ নিজের কানেই শুনতে পাচ্ছে। কিন্তু সেই উত্তেজনার মুহূর্তে তার মনে জাগল এক নতুন নিশ্চিন্ততা। মনে হল, এমন লগ্নে, এমন মনোরম সন্ধ্যায় কখনও খারাপ কিছু ঘটতে পারে না। সব কথা স্তব্ধ হয়ে গেল। দুজনে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগল।

নারীর শয়ন-কক্ষ। মশারির ফ্রেমে-আঁটা সেই নারীর রেশমী পোশাকে অর্ধ-আবরিত দেহকে ঘিরে যুবকটির ভালবাসা একেবারে উদ্বেল হয়ে উঠল: সে ভালবাসা চিরকালের, সদা পরিপূর্ণ, তাদের আশ্চর্য সাক্ষাতের মতই এক রূপকথা যেন।

ধীরে ধীরে নরম গলায় নারীও শোনাল তার ভালবাসার কথা। কোন-দিন কোন ভুল বোঝাবুঝি হবে না, কখনও বিচ্ছেদ নেমে আসবে না দুজনের মধ্যে। আস্তে আস্তে বিছানার চাদর দিয়ে সে যুবকের দেহটাকে ঢেকে দিল।

কিন্তু সহসা—যেমুহূর্তে যুবকটি তার পাশে শুয়ে নিজের ঠোঁটকে চেপে ধরবে তার ঠোঁটের উপর—তার মনে দ্বিধা জাগল।

কোথায় যেন একটা কি ভুল হয়েছে। একটা ত্রুটি যেন রয়ে গেছে। যুবক কান পাতল, বুঝতে চেষ্টা করল—আর তখনই বুঝতে পারল যে দোষটা তারই। বিছানার পাশেই রয়েছে ঢাকা-দেওয়া নরম আলো—কিন্তু সে এতই অসতর্ক যে সিলিংয়ের মাঝখানে বিদ্যুতালোকিত যে উজ্জ্বল ঝাড়-

লণ্ঠনটা ঝুলছে সেটা নিভিয়ে দিতেই ভুলে গেছে। মনে পড়ল, সুইচটা আছে দরজার পাশে। মুহূর্তের এক-ভগ্নাংশ সময়ের জন্য সে ইতস্তত করল। মেয়েটি চোখের পাতা তুলে দেখল, যুবকটি ঝাড়-লণ্ঠনের দিকে তাকিয়ে আছে; ব্যাপারটা বুঝতে পারল।

তার চোখে একটা ঝিলিক খেলে গেল। অস্ফুটে বলল:

"প্রিয়তম, চিন্তা করো না—উঠো না ·

নারী তার হাতটা বাড়িয়ে দিল। হাতটা বড় হতে লাগল, বাহুটা ক্রমেই বড় হতে লাগল; মশারির ফাঁক দিয়ে বের হয়ে, লম্বা কার্পেটটা পার হয়ে, দীর্ঘ মেঝের উপর ছায়া ফেলে, শেষ পর্যন্ত তার অতি দীর্ঘ আঙুলগুলি দরজা পর্যন্ত পৌঁছে গেল।

ক্লিক করে একটা শব্দ তুলে সে সুইচ টিপে আলোটা নিভিয়ে দিল।

A woman Seldom Found—William Sansom

হুংকার

তল্পিতল্পা নিয়ে যখন পাগলাগারদ ক্রিকেট মাঠে পৌঁছলাম তখন চিফ মেডিক্যাল অফিসার করমর্দন করতে এগিয়ে এলেন। যে বাড়িতে আমি উঠেছি সেখানে তার সঙ্গে আগেই দেখা হয়েছিল। তাকে বললাম, আজ আমি ল্যাম্প্‌টন টিমের হয়ে কেবল রান লিখব (উঁচু-নীচু পিচে উইকেট রক্ষা করতে গিয়ে আগের সপ্তাহে আমার একটা আঙুল ভেঙেছে)। শুনে তিনি বললেন, "ওহো, তাহলে তো আপনি একজন মজার সঙ্গী পাবেন।"

"অপর রান-লিখিয়ে কি?" আমি শুধালাম।

ডাক্তার জবাব দিলেন, "ক্রস্‌লি এই পাগলা গারদের সবচাইতে বুদ্ধিমান মানুষ। লোকটির অনেক পড়াশুনা, খুব ভাল দাবা খেলেন, এবং আরও অনেক গুণ আছে। মনে হয়, সারা পৃথিবী ঘুরেছেন। মতিচ্ছন্নতার জন্যই তাকে এখানে পাঠানো হয়েছে! তার সবচাইতে গুরুতর মতিচ্ছন্নতা হচ্ছে, তিনি নিজেকে একজন খুনী বলে মনে করেন; সকলকে বলে বেড়ান, অস্ট্রেলিয়ায় সিড্‌নিতে তিনি দুটি পুরুষ ও নারীকে খুন করেছেন। তার অপর মতিচ্ছন্নতা আরও হাস্যকর; তার ধারণা, তার আত্মা টুকরো টুকরো হয়ে গেছে—কথাটার যে কি অর্থ তা কে জানে। তিনি আমাদের মাসিক পত্রিকাটি সম্পাদনা করেন, আমাদের বড়দিনের থিয়েটারে রঙ্গমঞ্চের তত্ত্বাবধান করেন, আর এই তো সেদিন খুব মৌলিক কিছু যাদুর খেলাও

দেখালেন। আপনার তাকে ভাল লাগবে।

পরিচয় হল। ক্রস্‌লির বয়স চল্লিশ-পঞ্চাশ; বড়সড় মাপের মানুষ, মুখটা অদ্ভুত, কিন্তু অপ্রীতিকর নয়। রান লিখিয়েদের বক্সে তার ঠিক পাশে বসে আমার কিছুটা অস্বস্তি বোধ হতে লাগল; তার লোমশ হাতটা আমার বড় বেশী কাছে রয়েছে। কোনরকম দৈহিক আক্রমণের ভয় করি নি, শুধু-মাত্র মনে হয়েছে যে এমন একটি লোক পাশে বসে আছে যে অসাধারণ শক্তির অধিকারী, আর সেটা সম্ভবত কোন অলৌকিক শক্তি।

বড় জানালা থাকা সত্ত্বেও স্কোরিং-বক্সটা বেশ গরম।

মাস্টারি গলায় ক্রস্‌লি বলে উঠলেন, "এ ধরনের ঝড়ো আবহাওয়ায় আমাদের মত রোগীদের আচরণ আরও বেশী অস্বাভাবিক হয়ে ওঠে।"

আমি জানতে চাইলাম, কোন রোগী খেলছে কি না।

"দুজন খেলছে, প্রথম জুটির এই দুজন। ঢ্যাঙা ধরনের বি. সি. ব্রাউন তিন বছর আগে হ্যাণ্ট দলের হয়ে খেলেছে, আর অপর জন ক্লাবের হয়ে বেশ ভালোই খেলে। প্যাট স্লিংস্‌বি সাধারণত আমাদের হয়েই খেলে—অস্ট্রে-লিয়ার সেই ফাস্ট বোলারকে তো আপনি চেনেন—কিন্তু আজ আমরা তাকে বসিয়ে দিয়েছি। এ ধরনের আবহাওয়ায় সে হয় তো ব্যাট্‌স্‌ম্যানের মাথা লক্ষ্য করেই বল ছুঁড়ে বসবে। তাকে ঠিক পাগল বলা যায় না, তবে অসম্ভব রকমের বদমেজাজী। ডাক্তাররা তার কিছুই করতে পারে না।" তারপরেই ক্রস্‌লি ডাক্তারের কথা বলতে শুরু করল। "ডাক্তারের মনটা খুব ভাল, আর মানসিক হাসপাতালের ডাক্তার হিসাবেও বেশ ভালই পড়াশুনা করেছেন, আর করেন। বস্তুত বিষণ্ণ মনস্তত্ত্ব নিয়েই তিনি পড়াশুনা করেন, আর একেবারে গত পরশু পর্যন্ত সব খবরাখবর রাখেন। তার সঙ্গে আমার খুব মজা হয়। তিনি জার্মান বা ফরাসী পড়েন না; কাজেই মনস্তাত্ত্বিক ফ্যাশানের ব্যাপারে আমি সবসময়ই কিছুটা এগিয়ে থাকি; তাকে তো ইংরেজি অনুবাদের জন্য অপেক্ষা করতে হয়। আমিও নতুন নতুন স্বপ্ন তৈরি করে তাকে তার ব্যাখ্যা করতে বলি। তার ধারণা, আমার রোগটা আসলে "anti-paternal fixation"-এর ফল।"

তারপরেই ক্রস্‌লি জানতে চাইল, স্কোর লিখতে লিখতে তার একটা গল্পের দিকে আমি কান দিতে পারব কি না। বললাম, তা পারব। ক্রিকেট খেলাটা বেশ ঢিমেতালে চলছিল।

সে বলল, "আমার গল্পটা সত্য, এর প্রতিটি কথাই সত্য। অবশ্য গল্পটাকে আমি একটু নতুনভাবে বলছি। গল্পটা একই, কিন্তু মাঝে মাঝে আমি তার চরম পরিণতিটাকে বদলে দেই, এমন কি চরিত্রগুলোও পাল্টে ফেলি। এই পরিবর্তনের ফলেই গল্পটা নতুন অতএব সত্য হয়ে ওঠে। সবসময় যদি একই ফর্মুলাকে ব্যবহার করতাম তাহলে তো অচিরেই গল্পটা একঘেয়ে ও মিথ্যা

হয়ে যেত। আমি চাই গল্পটাকে বাঁচিয়ে রাখতে; এটা সত্য গল্প, প্রতিটি কথাই সত্য। এ গল্পের লোকটাকে আমি ব্যক্তিগতভাবে চিনি। তারা সকলেই ল্যাম্পটনের মানুষ।

স্থির হল, আমি শুধু রান ও অতিরিক্ত রানের হিসাব রাখব, আর ক্রস্‌লি রাখবে বোলিং-এর বিশ্লেষণ, আর প্রতিটি উইকেট পতনের পরেই পরস্পরের লেখা থেকে বাকিটা টুকে নেব। এই ব্যবস্থার ফলেই গল্প বলাটা সম্ভব হল।

একদিন সকালে ঘুম থেকে উঠেই বিচার্ড র‍্যাচেলকে বলল: "কী অস্বাভাবিক একটা স্বপ্ন!"

র‍্যাচেল বলল, "আমাকে বল লক্ষ্মীটি, কিন্তু তাড়াতাড়ি বলবে, কারণ আমার স্বপ্নটাও তোমাকে বলতে চাই।"

রিচার্ড বলল, "খুব বুদ্ধিমান একজন (না কি অনেক জন, কারণ মাঝে মাঝেই তার চেহারাটা বদলে যাচ্ছিল) লোকের সঙ্গে একটা আলোচনা করছিলাম, তার যুক্তিগুলো পরিষ্কার মনে আছে। অথচ এই সর্বপ্রথম স্বপ্নে শোনা কোন যুক্তিকে আমি স্মরণ করতে পারছি। সাধারণত আমার স্বপ্নগুলি জাগ্রত অবস্থা থেকে এতই আলাদা যে তাকে বর্ণনা করতে হলে আমাকে বলতে হয়: 'আমি যেন বেঁচে আছি আর চিন্তা করছি একটা গাছের মত, একটা ঘণ্টার মত, একটা মধ্যবর্তী C-র মত, অথবা একটা পাঁচ-পাউণ্ডের নোটের মত; আমি যেন কোনদিনই মানুষ ছিলাম না'"

র‍্যাচেল বলল, "আরে, আমারও তো সেই একই অবস্থা। মনে হয়, ঘুমের মধ্যে আমি হয় তো একটা পাথর হয়ে যাই, পাথরের পক্ষে স্বাভাবিক সব ক্ষুধা ও প্রত্যয় আমাব মধ্যে জেগে ওঠে। প্রবাদবাক্য আছে: 'পাথরের মত বোধবিহীন,' কিন্তু একটি পাথরের মধ্যে অনেক নরনারীর চাইতেই বেশী বোধ, বেশী ইন্দ্রিয়ানুভূতি, বেশী আবেগ থাকতে পারে।'

রবিবারের সকাল। কাজেই সময়ের তোয়াক্কা না করে পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে তারা বিছানায় শুয়ে থাকতে পারে, তাদের কোন সন্তান নেই, তাই প্রাতরাশও অপেক্ষা করতে পারে। স্বামী স্ত্রীকে বলল, স্বপ্নের মধ্যে সেই লোকটি বা লোকগুলির সঙ্গে সে একটা বালিয়াড়িতে হাঁটছিল, আর সেই লোকটি বা লোকগুলি তাকে বলল: "এই বালিয়াড়িগুলো না আমাদের সম্মুখস্ত সমুদ্রের অংশ, না আমাদের পিছনকার ঘাসভর্তি মাঠের অংশ এবং তারও দূরবর্তী পাহাড়শ্রেণীর সঙ্গেও সংযুক্ত নয়। তারা নিজেরাই স্বয়ংসম্পূর্ণ. বালিয়াড়ির উপর দিয়ে হাঁটতে শুরু করলেই যেকোন মানুষ বাতাসের ঘ্রাণ থেকেই সেটা বুঝতে পারে; আর সে যদি না খেয়ে ও না পান করে, না ঘুমিয়ে ও না কথা বলে, ভাবনা-চিন্তা ও কামনা-বাসনা ছাড়াই থাকতে পারে, তাহলে অনন্তকাল ধরে সে অপরিবর্তনীয়ভাবেই সেখানে থাকতে পারে।

বালিয়াড়িতে জীবন নেই, মৃত্যুও নেই। সেখানে সবকিছুই ঘটতে পারে।"

র‍্যাচেল বলল, "ওসব বাজে কথা রাখ। যুক্তিটা কি তাই বল। তাড়াতাড়ি!"

রিচার্ড জানাল, যুক্তিটা ছিল আমার গতিবিধি সম্পর্কে, কিন্তু তার তাড়া খেয়ে সেটা মাথা থেকে হাওয়া হয়ে গেছে। শুধু এইটুকু মনে পড়ছে যে লোকটি প্রথমে ছিল জাপানী, তারপর ইতালীয়, এবং শেষ পর্যন্ত হয়ে গেল একটা ক্যাঙারু।

স্ত্রীও পাল্টা তার নিজের স্বপ্ন-কাহিনী শোনাল। "আমিও বালিয়াড়ির উপর হাঁটছিলাম; সেখানে অনেক খরগোসও ছিল। জীবন ও মৃত্যু সম্পর্কে সে লোকটি যা বলেছে তার সঙ্গে মিলছে কৈ? দেখলাম, তুমি ও সেই লোকটি হাতে হাত ধরে আমার দিকে হেঁটে আসছ, আর আমি তোমাদের দুজনের কাছ থেকে দৌড়ে সরে যাচ্ছি; তার মাথায় একটা কালো রুমাল বাঁধা; সেও আমার পিছনে দৌড়তে লাগল, আমার জুতোর বকলস খুলে গেল, কিন্তু সেটা তুলে নেবার জন্য আমি অপেক্ষা করতে পারলাম না। বকলসটা সেখানেই পড়ে রইল, আর সে উপুড় হয়ে সেটা তুলে নিয়ে পকেটে পুরল।"

"সে যে একই লোক তা বুঝলে কেমন করে?" স্বামী শুধাল।

স্ত্রী হেসে বলল, "কারণ তার মুখটা ছিল কালো, আর ক্যাপ্টেন কুকের ছবির মতই তার পরনে ছিল একটা নীল কোট। তাছাড়া, এটাও তো বালিয়াড়ির ব্যাপার।"

স্বামী স্ত্রীর গলায় চুমো খেয়ে বলল, "দেখছি, আমরা যে কেবল একত্রে বাস করি, একত্রে কথা বলি এবং একত্রে ঘুমোই তাই নয়, আমরা স্বপ্নও দেখি একত্রে।"

এই বলে তারা হাসতে লাগল।

তারপর স্বামী উঠে গিয়ে স্ত্রীর প্রাতরাশ এনে দিল।

সাড়ে এগারোটা নাগাদ স্ত্রী বলল: "লক্ষ্মীটি, এবার বাইরে থেকে একটু ঘুরে এস; ফিরবার সময় এমন কিছু নিয়ে এস যা নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করতে পারি: সময়মত বাড়ি ফিরো, ঠিক একটায় ডিনার।"

মে মাসের মাঝামাঝি; সকালবেলাটা বেশ গরম। জঙ্গল পার হয়ে স্বামী উপকূলের পথ ধরল। সেখান থেকে আধ ঘণ্টা হাঁটলেই ল্যাম্পটন।

("আপনি ল্যাম্পটন ভাল চেনেন কি?" ক্রস্‌লি শুধাল। বললাম, "না। আমি এখানে শুধু ছুটি কাটাতে আসি, আর বন্ধুদের সঙ্গেই থাকি।")

অনেক হেঁটে অনেক পথ ঘুরে সে ল্যাম্পটন ছাড়িয়ে পাহাড়ের নীচে পুরনো গির্জেটায় পৌছে গেল। সকাল বেলাকার প্রার্থনা শেষ হয়ে গেছে; নরম ঘাসের উপর দিয়ে সকলে দুয়ে-দুয়ে, তিনে-তিনে গির্জা থেকে বেরিয়ে

আসছে। একদল ছেলেমেয়ে খেলা করছে। "এখানে ছুঁড়ে দাও এল্‌সি ! না, আমাকে দাও, এল্‌সি, এল্‌সি, এল্‌সি !" রেক্টর বেরিয়ে এসে বলটা পকেটে পুরে বলল, সেটা যে রবিবার সেকথাটা তাদের মনে রাখা উচিত ছিল। রেক্টর চলে গেল। ছেলেমেয়েরা তাকে ভেংচি কাটতে লাগল।

ইতিমধ্যে একটি অপরিচিত লোক এসে রিচার্ডের পাশে বসবার অনুমতি চাইল। দুজনের মধ্যে আলাপ শুরু হল। লোকটি গির্জায় এসেছিল ; সেখানে যা শুনে এসেছে তাই নিয়েই কথা বলতে লাগল। আত্মা পরপর দেহকে আশ্রয় করে বাস করে—প্রচারকের এই বাণীকে সে কিছুতেই মেনে নিতে পারছে না। আত্মা তো মস্তিষ্ক নয়, ফুসফুস নয়, পাকস্থলি নয়, হৃৎপিণ্ড নয়, মন নয়, কল্পনা নয়। সে সবকিছু থেকে স্বতন্ত্র তো ? তাহলে দেহের বাইরে না থেকে সে দেহের ভিতরে থাকবে কেন ? সে বলল, "তাছাড়া, ঠিক কোন্ মুহূর্তে জন্ম হয় আর মৃত্যু হয় তাও তো আমরা সঠিকভাবে বলতে পারি না। আমি তো জাপানে গিয়েছি, সেখানে তারা জন্মমুহূর্তেই নবজাতকের বয়স গণনা করে এক বছর, সম্প্রতি ইতালিতে একটি মৃত মানুষ—চলুন না, ঐ বালিয়াড়িতে হাঁটতে হাঁটতে কথা বলি। হাঁটতে হাঁটতে কথা বলতে আমি অনেক আরাম পাই।"

একথা শুনে রিচার্ড ভয় পেল, লোকটিকে একখানি কালো রেশমী রুমাল দিয়ে কপাল মুছতে দেখে সে আরও ভয় পেল ; বিড়বিড় করে কি যেন বলল। আর ঠিক সেইমুহূর্তে ছেলেমেয়েগুলো হঠাৎ একসঙ্গে তাদের দুজনের কানের কাছে বিকট চীৎকার করে উঠল ; তারপর হো-হো করে হেসে উঠল। নবাগত লোকটি ভীষণ রেগে গেল ; গালাগালি দিতে মুখ খুলল, মাড়ি পর্যন্ত দাঁত বেরিয়ে পড়ল। তিনটি ছেলে চীৎকার করে পালিয়ে গেল। কিন্তু যাকে তারা এল্‌সি বলে ডাকছিল সে ভয় পেয়ে পড়ে গেল, আর ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। ডাক্তার কাছেই ছিল ; মেয়েটিকে সান্ত্বনা দিতে লাগল। দুজনই শুনতে পেল, মেয়েটি বলছে : "ওর মুখটা শয়তানের মত।"

আগন্তুক ভাল মানুষের মত হেসে উঠল : "কিছুদিন আগেও আমি শয়তান ছিলাম না। ব্যাপারটা ঘটে উত্তর অস্ট্রেলিয়াতে ; সেখানে কালো মানুষদের সঙ্গে বিশ বছর কাটিয়েছি। সেখানে তারা আমাকে যে মর্যাদা দিয়েছিল তাকে ইংরেজি ভাষায় তর্জমা করলে "Devil"-এর (শয়তান) কাছাকাছিই দাঁড়ায়। আনুষ্ঠানিক পোশাক হিসাবে অষ্টাদশ শতাব্দীর বৃটিশ নৌ-বাহিনীর একটা ইউনিফর্মও তারা আমাকে দিয়েছিল। চলুন না, বালিয়াড়িতে হাঁটতে হাঁটতে আপনাকে পুরো গল্পটাই বলব। বালিয়াড়িতে হাঁটতে আমার খুব ভাল লাগে। আর সেইজন্য এ শহরে এসেছি···আমার নাম চার্লস।"

রিচার্ড বলল : "ধন্যবাদ, কিন্তু ডিনারে যোগ দিতে আমাকে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে হবে।"

চার্লস বলল, "বাজে কথা রাখুন। ডিনার একটু পরে খেলেও চলবে। অথবা, যদি বলেন তো আমিও আপনার সঙ্গে ডিনারে বসতে পারি। ভাল কথা, শুক্রবার থেকে আমি কিছুই খাই নি। পকেটে পয়সা নেই।"

রিচার্ড অস্বস্তিবোধ করতে লাগল। চার্লসকে সে ভয় পাচ্ছে ; স্বপ্ন, বালিয়াড়ি ও রুমালের কথা ভেবে তাকে ডিনারে যোগ দিতে বলার ইচ্ছাও তার নেই ; আবার, লোকটি বুদ্ধিমান ও শান্তশিষ্ট, তার পোশাক রুচিসম্মত, শুক্রবার থেকে কিছুই খায় নি ; র্যাচেল যদি জানতে পারে যে সে তাকে একবেলা খাওয়াতে অস্বীকার করেছে তাহলেই তো হাসি-ঠাট্টা শুরু করে দেবে। র্যাচেল তো রেগে গেলেই তাকে ঠাট্টা করে বলে : "ওয়ান পাইস ফাদার-মাদার।" তাই সে বলল : "বেশ তো, আসুন না ডিনারে। কিন্তু আপনার ভয়ে ছোট মেয়েটি এখনও ফুঁপিয়ে কাঁদছে। ওকে একটু সান্ত্বনা দিন না।"

চার্লস ইসারায় মেয়েটিকে কাছে ডাকল, তাকে একটিমাত্র কথা বলল ; অস্ট্রেলিয়ার একটি যাদু-শব্দ ; অর্থ "দুধ"। সঙ্গে সঙ্গে এল্সি খুশি হয়ে চার্লসের হাঁটুর উপর বসে তার ওয়েস্টকোটের বোতাম নিয়ে খেলা করতে শুরু করল। পরে চার্লস তাকে নামিয়ে দিল।

রিচার্ড বলল, "আপনার তো অদ্ভুত ক্ষমতা দেখছি।"

চার্লস জবাব দিল : "ছেলেমেয়েদের আমি ভালবাসি, কিন্তু ওদের চীৎকার শুনে চমকে উঠেছিলাম ; মুহূর্তের জন্য যা করার লোভ হয়েছিল সেটা যে করে ফেলি নি সেজন্য আমি আনন্দিত।"

"সেটা কি ?" রিচার্ড শুধাল।

"আমি নিজেও চীৎকার করে উঠতে পারতাম" চার্লস বলল।

রিচার্ড বলল, "আরে, সেটাই তো তাদের ভাল লাগত। তারা বেশ একটা খেলা পেয়ে যেত। হয়তো আপনার কাছে তারা সেটাই আশা করেছিল।"

চার্লস বলল, "আমি যদি চীৎকার করে উঠতাম তাহলে তারা হয় সরাসরি মারা যেত, আর না হয় তো পাগল হয়ে যেত। সম্ভবত মারাই যেত, কারণ তারা আমার খুবই কাছে ছিল।"

রিচার্ড বোকার মত একটু হাসল। চার্লস এমন গম্ভীরভাবে কথাগুলো বলল যে তার হাসা উচিত কি না সেটাই রিচার্ড ঠিক বুঝে ওঠে নি। বলল : "বটে, সেটা আবার কিরকম চীৎকার ? আমাকে একটু শোনান তো।"

চার্লস বলল, "আমার চীৎকারে শুধু যে ছোটরাই আঘাত পায় তা কিন্তু নয় ; তা শুনে বড়রাও ঘোর পাগল হয়ে যেত পারে ; অত্যন্ত শক্তিমান

মানুষও মাটিতে আছড়ে পড়ে। এটা একটা যাদু চীৎকার ; উত্তর দেশের প্রধান শয়তানের কাছ থেকে আমি এটা শিখেছি। আঠারো বছর ধরে এটাকে রপ্ত করেছি, অথচ এই সময়ের মধ্যে মোট পাঁচবারের বেশী এটা ব্যবহার করি নি।"

রিচার্ড তবু বলল, "ব্যাপারটা একটু দেখাবেন ?"

চার্লস বলল, "দেখছি আমার কথায় আপনার বিশ্বাস হচ্ছে না। আপনি কি আগে কখনও ভয়-দেখানো হুংকার শোনেন নি ?"

রিচার্ড একটু ভেবে বলল, "তা মনে করুন, প্রাচীন আইরিশ যোদ্ধারা শুনেছি এমন বীরত্বব্যঞ্জক হুংকার দিত যে তা শুনেই শত্রুপক্ষের সৈন্যরা পিছু হটে যেত ; আর ট্রয়ের মহাবীরও তো ভয়ংকর হুংকার ছাড়ত। গ্রীসের জঙ্গলেও হঠাৎ জোর চীৎকার শোনা যেত। বনদেবতা প্যাক নাকি সেইসব চীৎকার করত, আর তা শুনে মানুষ ভয়ে পাগল হয়ে যেত ; আসলে এই উপকথা থেকেই ইংরেজী "panic" শব্দটার সৃষ্টি হয়েছে। "মোবিনোজিয়ন"-এর লুড ও লাভ্লির গল্পেও একটা হুংকারের কথা পড়েছি। প্রতি "মে ইভ"-এ সে হুংকার শোনা যেত, তা শুনে ভয়ে পুরুষদের মুখ শুকিয়ে যেত, তাদের সব শক্তি উবে যেত, স্ত্রীলোকদের সন্তান হারিয়ে যেত, যুবক ও কুমারীদের জ্ঞান লোপ পেত, জীবজন্তু, গাছপালা, ভূমি, নদী হয়ে যেত অনুর্বর, বন্ধ্যা। আর সে হুংকার দিত একটা ড্রাগন।"

চার্লস বলল, "সে নিশ্চয় ড্রাগন জাতীয় কোন বৃটিশ যাদুকর ছিল। আমি ক্যাঙারু জাতির অন্তর্ভুক্ত। হঁা, মিলে যাচ্ছে।"

একটার সময় তারা বাড়ি ফিরল। র‍্যাচেল দরজায় দাঁড়িয়েছিল। ডিনার তৈরি। রিচার্ড বলল, "র‍্যাচেল, ইনি মিঃ চার্লস, আমি ডিনারে আমন্ত্রণ করেছি। মিঃ চার্লস মস্ত বড় পর্যটক।"

রোদ থেকে আড়াল করার জন্য র‍্যাচেল একটা হাত চোখের উপর রাখল। চার্লস্ হাতটা ধরে তাতে চুমো খেল, র‍্যাচেল অবাক হয়ে গেল।

(ক্রস্লি বলল, "র‍্যাচেলকে আপনার ভাল লাগবে ; সে মাঝে মাঝে আমার কাছে আসে।")

চার্লস সম্পর্কে কিছু বলা শক্ত : বয়স মাঝারি, লম্বা, চুল পাকা, বড় বড় দুটি উজ্জ্বল চোখ, কখনও হলুদ, কখনও বাদামী, কখনও ধূসর ; কথা বলার সময় বিষয়বস্তু অনুসারে গলার স্বর বদলে যায় ; হাত দুটি বাদামী, নীচের দিকটা লোমশ ; নখ সযত্নরক্ষিত। রিচার্ড সম্পর্কে বলা যায়, সে একজন সঙ্গীতশিল্পী, শক্তিমান নয়, কিন্তু ভাগ্যবান। ভাগ্যই তার শক্তি।

ডিনারের পরে চার্লস ও রিচার্ড একসঙ্গেই বাসনপত্র ধুয়ে ফেলল। এক-সময় রিচার্ড হঠাৎ চার্লসকে হুংকারটা শোনাতে বলল : কারণ সেটা না শোনা পর্যন্ত সে স্বস্তি পাচ্ছে না।

বাসন মোছা ঝাকড়াটা হাতে নিয়েই চার্লস বলল, "আপনার যেমন ইচ্ছা; কিন্তু এ হুংকার সম্পর্কে আমি তো আগেই আপনাকে সাবধান করে দিয়েছি। হুংকার যদি করতেই হয় তাহলে এমন একটা নির্জন স্থানে করতে চাই যেখানে অন্য কেউ সেটা শুনতে পাবে না। দ্বিতীয় ডিগ্রির হুংকার করব না, কারণ তার ফল নিশ্চিত মৃত্যু; আমি শোনাব প্রথম ডিগ্রির হুংকার, সেটার ফলে কেবল আতংক হয়। যখনই আমাকে থামাতে চাইবেন আপনার দুই হাতে দুই কান চেপে ধরবেন।"

"ঠিক আছে," রিচার্ড বলল।

চার্লস বলল, "নিছক কৌতূহল মেটাবার জন্য কখনও হুংকার দেইনি; কালো বা সাদা যেকোন শত্রুর হাতে জীবন বিপন্ন হলে তবেই হুংকার দিয়েছি। একবার যখন মরুভূমিতে একলা ছিলাম, খাদ্য-পানীয় কিছুই ছিল না, তখন বাধ্য হয়ে হুংকার ছেড়েছিলাম খাদ্যের জন্য।"

রিচার্ড ভাবল: "আমি তো ভাগ্যবান মানুষ; এ ব্যাপারেও আমার ভাগ্য অবশ্যই ভাল হবে।"

চার্লসকে বলল, "আমি ভয় পাচ্ছি না।"

চার্লস বলল, "কাল ভোরে অন্য কেউ উঠবার আগেই আমরা বালিয়াড়িতে চলে যাব; তারপর হুংকার ছাড়ব। আপনি তো বলছেনই ভয় পাবেন না।"

রিচার্ড কিন্তু আসলে বেশ ভয় পেয়ে গেল। সে ভয় আরও বেড়ে গেল এই কারণে যে কথাটা সে র‍্যাচেলকে বলতে পারল না। সে জানে, কথাটা শুনলে হয় র‍্যাচেল তাকে যেতে দেবে না, আর না হয় তো সে নিজেই সঙ্গে যেতে চাইবে। র‍্যাচেল যদি তাকে যেতে নিষেধ করে, তাহলে এই হুংকারের ভয় ও ভীরুতার বোধ চিরদিন তাকে কষ্ট দেবে; আবার সে যদি সঙ্গে যায়, তাহলে হুংকারটা যদি কিছুই না হয় তো তাকে ঠাট্টা করার একটা নতুন অজুহাত সে পেয়ে যাবে, আর হুংকারটা যদি কার্যকর হয় তাহলে র‍্যাচেল তো পাগলও হয়ে যেতে পারে। তাই রিচার্ড তাকে কিছুই বলল না।

চার্লসকে রাতটা তাদের কুটিরে কাটাতে বলা হল, এবং অনেক রাত পর্যন্ত দু'জন গল্প করে কাটাল।

র‍্যাচেল সাধারণত মদ খায় না; কিন্তু সেদিন সে দু গ্লাস খেল, আর তার ফলে আজেবাজে বকতে লাগল। বলল, "আরে, তোমাকে তো বলতেই ভুলে গিয়েছি লক্ষ্মীটি। আজ সকালে তুমি চলে গেলে বকলস লাগানো জুতো জোড়া পরতে গিয়ে দেখি একটা বকলস নেই। স্বপ্নের মধ্যেই সেটা আমি প্রথমে জানতে পেরেছিলাম। কেন জানি না আমার মনে হচ্ছে যে সে বকলসটা মিঃ চার্লসের পকেটেই আছে; আর আমার নিশ্চিত ধারণা যে এই লোকটিকেই আমরা স্বপ্নে দেখেছি। কিন্তু তা নিয়ে আমি মোটেই চিন্তিত

নই, মোটেই না।'

রিচার্ড আরও ভয় পেয়ে গেল ; তবু কালো রেশমী রুমাল, চার্লসের কাছ থেকে বালিয়াড়িতে হাঁটতে যাবার ডাক—কোন কথাই সে র‍্যাচেলকে সাহস করে বলতে পারল না। মাথাটা ঘুরিয়ে বলল, "কি জান, চার্লস অনেককিছু জানে। তুমি যদি কিছু না মনে কর, কাল ভোরে আমি তাকে নিয়ে একটু বেড়াতে যাব। প্রাতঃভ্রমণ আমার পক্ষে খুব দরকারি।"

"বেশ তো, আমিও যাব," র‍্যাচেল বলল।

রিচার্ড আপত্তি করতে পারল না ; বুঝতে পারল, বেড়াতে যাবার কথাটা বলাই তার ভুল হয়েছে। বলল, "চার্লস খুব খুশি হবে। তাহলে ভোর ছ'টায়।"

ছ'টায় রিচার্ড ঘুম থেকে উঠল ; কিন্তু মদের নেশায় চোখে ঘুমের ঘোর থাকায় র‍্যাচেল তাদের সঙ্গে যেতে পারল না। স্বামীকে চুমো খেয়ে বিদায় দিল। স্বামী চার্লসকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল।

রাতটা রিচার্ডের ভাল কাটে নি। আজেবাজে স্বপ্ন দেখেছে ; মনে হয়েছে, সে যেন র‍্যাচেলের কাছ থেকে অনেক দূরে চলে গেছে ; হুংকারের আতংক যেন তাকে কুরে কুরে খেয়েছে। খুব খিদে পেয়েছে ; শীতও করছে। পাহাড় থেকে একটা তীব্র হাওয়া বইছে সমুদ্রের দিকে। কয়েক পশলা বৃষ্টিও হয়েছে। চার্লসের মুখে কোন কথা নেই। একটা ঘাস চিবুতে চিবুতে দ্রুত হাঁটছে।

রিচার্ডের মাথাটা ঝিম্ঝিম্ করছে। চার্লসকে বলল, "এক মিনিট দাঁড়ান। আমার বাঁদিকে একটা সেলাই আছে।" দুজনই থামল। রিচার্ড ঢোক গিলে বলল "হুংকারটা কি ধরনের? খুব জোরালো, না কর্কশ? কেমন করে করা হয়? লোককে পাগলই বা করে কেমন করে?"

চার্লস চুপ। বোকার মত হেসে রিচার্ড বলতে লাগল: "অবশ্য শব্দ একটা অদ্ভুত জিনিস। মনে পড়ে, আমি যখন কেম্ব্রিজে ছিলাম তখন একবার কিংস কলেজের একজনের পালা পড়েছিল সন্ধ্যাকালীন পাঠটা পড়াবার। সে দশটা শব্দও উচ্চারণ করে নি এমন সময় একটা আর্তনাদ শোনা গেল, কট্-কট্, ক্যাচ্-ক্যাচ্ শব্দ উঠল, আর ছাদ থেকে কাঠের টুকরো ও ধূলো-বালি ঝরতে শুরু করল। কাজেই সে পড়া থামিয়ে দিল, না হলে হয়তো ছাদটাই ভেঙে পড়ত। আবার ধরুন বেহালায় একটা সুর বাজিয়ে আপনি একটা মদের গ্লাসকে ভেঙে ফেলতে পারেন।"

চার্লস জবাবে বলল: "আমার হুংকার স্বরক্ষেপন বা বায়ুর প্রকম্পনের ব্যাপার নয়, কিন্তু এমন একটা কিছু যাকে ঠিক বোঝানো যায় না। এ হুংকার একান্তই ক্ষতিকর, সরগমের কোন নির্দিষ্ট স্কেলে সেটা বাঁধা নয়। এটা একান্তভাবেই ভয়ের ব্যাপার, আর আপনাকে বলাই বাহুল্য যে আমার

নিজের কোন বিশেষ উদ্দেশ্য না থাকলে আপনাকে হুংকার শোনাতে আমি আপত্তি করতাম।"

রিচার্ড স্বভাবতই ভীতিপ্রবণ; হুংকারের এই নতুন বিবরণ শুনে সে আরও ঘাবড়ে গেল; তার মনে হল, এর চাইতে বিছানায় শুয়ে থাকাই ভাল ছিল; আরও ভাল হত চার্লস যদি দুই মহাদেশ জুড়ে থাকত। কিন্তু তার আকর্ষণও বাড়ছে। পথ ছাড়িয়ে এবার তারা ঘাসের ভিতর দিয়ে চলতে শুরু করল; ঘাসের ডগা তার মোজার ভিতর দিয়ে পায়ে বিঁধছে; মোজা ভিজে উঠেছে।

এবার তারা ন্যাড়া বালিয়াড়ির উপর পৌঁচেছে। সবচাইতে উঁচু টিবিটা থেকে চার্লস চারদিকে তাকাল; সমুদ্র-সৈকত প্রায় দু'মাইল বা তারও বেশী-দূর পর্যন্ত বিস্তৃত। কোথাও কাউকে দেখা যাচ্ছে না। রিচার্ড দেখল, চার্লস তার পকেট থেকে কি যেন বের করে অন্যমনস্কভাবে সেটাকে নাড়াচাড়া করছে এক আঙুলের ডগা থেকে অন্য আঙুলের ডগায় নিল, আবার একটা আঙুল ও বুড়ো আঙুলে ধরে সেটাকে হাতের পিছনে নিয়ে গেল। সেটা র‍্যাচেলের জুতোর বক্‌লস।

রিচার্ডের ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়তে লাগল, বুকের মধ্যে টিপ টিপ করতে লাগল, প্রায় বমি করার মত অবস্থা। শীতে কাঁপছে, আবার ঘামও হচ্ছে। তারা বালিয়াড়ির একটা খোলা জায়গায় সমুদ্রের ধারে গিয়ে পৌঁছল। উঁচু তীরের উপর কিছু জলজ শেওলা ও সামান্য ঘাস জন্মেছে; চারদিকে পাথর ছড়িয়ে আছে; মনে হচ্ছে, সমুদ্রের ঢেউয়ে অনেকবছর আগে পাথরগুলি এখানে এসেছে।

"আপনি প্রস্তুত?" চার্লস শুধাল।

রিচার্ড ঘাড় নাড়ল।

একটা সাগর-ঈগল বালিয়াড়ির টিপিটার মাথায় নেমেই তাদের দেখতে পেয়ে ডাকতে ডাকতে আবার উড়ে গেল। শুকনো গলায় রিচার্ড বলল, "আপনি সবুজ শেওলার উপর দাঁড়ান, আর আমি দাঁড়াচ্ছি এই পাথরগুলোর মধ্যে একটু দূরে। আমি হাত তুললে আপনি হুংকার ছাড়বেন, আর কানে আঙুল দিলেই সঙ্গে সঙ্গে থেমে যাবেন।"

চার্লস বিশ পা হেঁটে শেওলার দিকে এগিয়ে গেল। তার চওড়া পিঠ ও পকেট থেকে বেরিয়ে-থাকা কালো রেশমী রুমাল রিচার্ড দেখতে পেল। তার মনে পড়ে গেল স্বপ্নের কথা, জুতোর বক্‌লসের কথা, এল্‌সির ভয় পাবার কথা। তার মানসিক দৃঢ়তা ভেঙে পড়ল: তাড়াতাড়ি পকেটের ভাঙা মোমবাতির টুকরোটাকে ভেঙে দু' টুকরো করে দুই কানে গুঁজে দিল। চার্লস সেটা দেখতে পেল না।

সে ঘুরে দাঁড়াল। রিচার্ড হাত তুলে সংকেত জানাল।

চার্লস অদ্ভুতভাবে সামনে ঝুঁকল, থুত্‌নিটা সামনের দিকে এগিয়ে গেল, দাঁতগুলো বেরিয়ে পড়ল। মানুষের মুখে এমন ভয়ার্ত দৃষ্টি রিচার্ড আগে কখনও দেখে নি। এরজন্য সে প্রস্তুতও ছিল না। চার্লসের মুখটা সাধারণত নরম ও পরিবর্তনশীল, মেঘের মতই অনিশ্চিত, কিন্তু এখন সে মুখ পাথরের মুখোশের মত কঠিন ; প্রথমে সে মুখ একদম সাদা, তারপর চোয়াল থেকে শুরু করে ক্রমেই লাল হতে আরও লাল, তারপর একেবারে কালো, যেন দম বন্ধ হবার উপক্রম। ধীরে ধীরে মুখটা সম্পূর্ণ খুলে গেল, আর রিচার্ড দুই হাতে কান চেপে ধরে উপুড় হয়ে পড়ে মূর্ছা গেল।

যখন জ্ঞান ফিরে এল তখন সে পাথরগুলোর মধ্যে একলা পড়ে আছে। উঠে বসল ; এভাবে কতক্ষণ পড়ে আছে সেটাই ভাবতে লাগল। খুব দুর্বল ও অসুস্থ লাগছে ; শরীরের চাইতেও একটা বড় রকমের কাঁপুনি ধরেছে বুকের মধ্যে। কিছু ভাবতেও পারছে না। হাতের উপর ভর দিয়ে উঠতে গেল ; হাতটা পড়ল একটা পাথরের উপর ; সে পাথরটা আশেপাশে ছড়ানো অন্য সব পাথরের চাইতে অনেক বড়। পাথরটা তুলে নিয়ে অন্যমনস্কভাবেই তাতে হাত বুলোতে লাগল। মনে অনেকরকম চিন্তা এল। প্রথমেই মনে এল জুতো তৈরির কথা, অথচ সেকাজের কিছুই সে জানে না ; কিন্তু এখন সবরকম মুচির কাজই তার কাছে পরিচিত বলে মনে হল। গলা খুলেই বলে উঠল : "নিশ্চয় আমি একজন মুচি।"

তারপরই নিজেকে সংশোধন করে বলল : "না, আমি একজন সঙ্গীত-শিল্পী। আমি কি পাগল হয়ে যাচ্ছি?" সে পাথরটাকে ছুঁড়ে মারল। আর একটা পাথরে লেগে সেটা ছিটকে পড়ল।

নিজেকেই প্রশ্ন করল : "আচ্ছা, কেন বললাম যে আমি একজন মুচি? একমুহূর্ত আগে মনে হয়েছিল যে জুতো তৈরির সবরকম কাজই আমি জানি, আর এখন দেখছি সেকাজের কিছুই জানি না। এখনই বাড়িতে র‍্যাচেলের কাছে ফিরে যাব। কেন এভাবে বেরিয়ে এলাম?"

তারপরেই চোখে পড়ল, শ'খানেক গজ দূরে একটি বালির ঢিবির উপর দাঁড়িয়ে চার্লস সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে আছে। সে যে ভয় পেয়েছিল সেকথা মনে হতেই হাত দিয়ে দেখল মোমের টুকরো দুটি কানের মধ্যেই আছে। সে দেখল, বালির উপর একটা ঘূর্ণি উঠেছে, আর তার পাশেই একটা খরগোস পড়ে কাতরাচ্ছে। রিচার্ড সেদিকে এগিয়ে যেতেই ঘূর্ণিটা থেমে গেল : খরগোসটা মরে গেছে। চার্লসের দৃষ্টির আড়াল হয়ে রিচার্ড একটা বালিয়াড়ির পিছন দিয়ে ছুটতে ছুটতে বাড়ির পথ ধরল, বিশ পা যাবার আগেই সাগর-ঈগলটাকে দেখতে পেল। পাখিটা বোকার মত বালির উপর দাঁড়িয়ে আছে ; তাকে দেখে উড়েও গেল না ; ধপ্‌ করে পড়ে মরে গেল।

কেমন করে বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছল তা রিচার্ড জানে না ; কিন্তু খিড়কির

দরজা খুলে হাত-পায়ে ভর রেখে হামাগুড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে গেল। কানের ভিতরকার মোমবাতির টুকরো বের করে ফেলল।

র‍্যাচেল বিছানায় বসে আছে। মুখ বিবর্ণ, ভয়ে কাঁপছে। বলল, "ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, তুমি ফিরে এসেছ। একটা দুঃস্বপ্ন দেখেছি; এত খারাপ স্বপ্ন জীবনে দেখি নি। ভয়ংকর স্বপ্ন। স্বপ্নে দেখলাম, আমি যেন পাথর হয়ে গেছি, আর তুমি আমার পাশেই রয়েছ সহজ ও স্বাভাবিক অবস্থায়। তুমি খুব ভয় পেয়ে গেছ, কিন্তু আমি তোমাকে সাহায্য করতে পারছি না, তুমি যেন একটা কিছুর জন্য অপেক্ষা করে আছ, কিন্তু সেই ভয়ংকর কিছু তোমার বেলায় ঘটল না, ঘটল আমার উপরে। সেটা যে কি তা তোমাকে বলতে পারব না, কিন্তু মনে হল আমার সবগুলি স্নায়ু যেন যন্ত্রণায় একসঙ্গে চীৎকার করে উঠল, একটা তীব্র অশুভ আলোর রেখা যেন আমাকে খান্ খান্ করে কেটে ফেলল; শরীরের ভিতরটা তালগোল পাকিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল। ঘুম ভেঙে গেল; বুকটা এত জোরে ধড়ফড় করছে যে শ্বাস নিতেও কষ্ট হতে লাগল। তোমার কি মনে হয় আমি হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়েছিলাম? লোকে বলে তাতেও ঐরকম হয়। তুমি কোথায় ছিলে লক্ষ্মীটি? মিঃ চার্লসই বা কোথায়?"

রিচার্ড বিছানায় বসে হাতটা বাড়িয়ে দিল। বলল, "আমারও একটা খুব খারাপ অভিজ্ঞতা হয়েছে। চার্লসের সঙ্গে সমুদ্রের ধারে গিয়েছিলাম; তিনি এগিয়ে গিয়ে সবচাইতে উঁচু বালির ঢিবিটায় উঠতেই আমি মূর্ছিত হয়ে কতকগুলো পাথরের উপর পড়ে গেলাম; যখন জ্ঞান ফিরে এল তখন দেখি ভয়ে ঘামে আমার সর্বাঙ্গ ভিজে গেছে; ছুটতে ছুটতে একাই বাড়ি চলে এলাম। সম্ভবত আধ ঘণ্টা আগে ঘটনাটা ঘটেছে।"

সে র‍্যাচেলকে এর বেশী কিছু বলল না।

র‍্যাচল বলল, "আমিও তোমার মতই অসুস্থ"। অথচ তাদের দুজনের মধ্যে একটা সমঝোতা আছে যে র‍্যাচেল অসুস্থ হলে রিচার্ডকে সুস্থ থাকতেই হবে।

"তুমি অসুস্থ নও," বলেই রিচার্ড আবার মূর্ছা গেল।

র‍্যাচেল কোনরকমে তাকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে পোশাক পাল্টে ধীরে ধীরে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল। কফি ও শূকর-মাংসের গন্ধ নাকে এল। ওই তো চার্লস। উনুন ধরিয়ে ট্রেতে দুটো প্রাতরাশ সাজিয়েছে। প্রাতরাশের ঝঞ্ঝাট এড়াতে পেরে র‍্যাচেল এত খুশি হল, আর এই অভিজ্ঞতার ফলে এত বিচলিত হল যে সে চার্লসকে ধন্যবাদ দিল, তাকে লক্ষ্মী বলে সম্বোধন করল, আর চার্লসও গম্ভীরভাবে তার হাতে চুমো খেয়ে হাতটা চেপে ধরল। প্রাতরাশটা র‍্যাচেলের পছন্দমতই তৈরি করা হয়েছে; কফিটা কড়া হয়েছে, আর ডিমটাকে দু'দিকেই ভাজা হয়েছে।

র‍্যাচেল চার্লসের প্রেমে পড়ে গেল। বিয়ের পর থেকে সে অনেকবার প্রেমে পড়েছে; কিন্তু এধরনের ঘটনা ঘটলেই সে রিচার্ডকে তা বলে দেয়, আবার রিচার্ডের জীবনে এধরনের ঘটনা ঘটলে সেও র‍্যাচেলকে তা বলে; তাতে মনের অবরুদ্ধ আবেগও প্রকাশিত হতে পারে, আর কোনরকম ঈর্ষারও সৃষ্টি হয় না; কারণ র‍্যাচেল বলে (আর সেকথা বলার পূর্ণ স্বাধীনতা রিচার্ডেরও আছে): "হ্যাঁ, আমি অমুকের প্রেমে পড়েছি, কিন্তু আমি ভালবাসি শুধু তোমাকেই।"

অতীতে সেইরকমই হয়েছে। কিন্তু এবার ব্যাপারটা অন্যরকম। কারণটা সে জানে না, কিন্তু যেমন করেই হোক চার্লসের প্রেমে পড়ার কথাটা সে বলতে পারল না, কারণ এখন সে আর রিচার্ডকে ভালবাসে না। অসুস্থ হয়ে পড়ার জন্য রিচার্ডকে সে ঘৃণা করে; মুখেও বলে, সে অলস, অকর্মণ্য। দুপুর নাগাদ রিচার্ড উঠে বসল, আর্তনাদ করতে করতে শোবার ঘরেই ঘুরে বেড়াল, আর শেষ পর্যন্ত র‍্যাচেল এসে তাকে বিছানায় পাঠিয়ে দিল; গোঙাতে হয় তো সেখানেই গোঙাক।

চার্লস গৃহস্থালির কাজে র‍্যাচেলকে সাহায্য করে, সব রান্না করে দেয়, কিন্তু রিচার্ডকে দেখতে উপরে ওঠে না, কারণ তাকে উপরে উঠতে বলা হয় নি। র‍্যাচেল লজ্জা পেয়েছে, রিচার্ড চার্লসকে ফেলে পালিয়ে এসেছে বলে তার কাছে ক্ষমা চেয়েছে। কিন্তু চার্লস বলেছে, সে এটাকে অপমান বলে মনে করে নি; বরং সেই সকালটা তার যেন কেমন অদ্ভুত লেগেছিল; তারা যখন বালিয়াড়িতে পৌঁচেছিল তখন বাতাসে যেন কি এক অশুভ শক্তির আবির্ভাব ঘটেছিল। র‍্যাচেলও তাকে বলেছে যে ঐ একই রকম অদ্ভুত অনুভূতি তারও হয়েছিল।

পরে সেও শুনল, সারা ল্যাম্পটন ওই একই কথা বলে বেড়াচ্ছে। ডাক্তার বলছে একটা মৃদু ভূমিকম্প হয়েছিল, কিন্তু গ্রামের লোকেরা বলছে, শয়তান এই পথে চলে গেছে। শিকার-রক্ষক সলমন জোন্স-এর কালো আত্মাকে নিয়ে যেতেই শয়তান এসেছিল, কারণ সেই সকালেই তাকে বালিয়াড়ির পাশে তার নিজের ঘরেই মৃত অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিল।

রিচার্ডের যখন নীচে নেমে একটু-আধটু হাঁটবার মত অবস্থা হল তখন র‍্যাচেল তাকে মুচির কাছে পাঠাল তার জুতোর জন্য একটা নতুন বক্‌লস আনতে। সে স্বামীর সঙ্গে বাগানের নীচ পর্যন্ত গেল। খাড়া তীর বরাবর রাস্তাটা চলে গেছে। রিচার্ডকে আবার অসুস্থ মনে হল; হাঁটতে হাঁটতে সে একটু গোঙাতে লাগল; কিছুটা রেগে, কিছুটা তামাসা করে র‍্যাচেল স্বামীকে ধাক্কা দিয়ে তীর থেকে নীচে ফেলে দিল; কাঁটা ঝোপ ও পুরনো লোহার মধ্যে সে উপুড় হয়ে পড়ে গেল। র‍্যাচেল হো-হো করে হেসে উঠে দৌড়ে বাড়িতে ফিরে গেল।

রিচার্ড একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়াল, কাঁটা ঝোপের ভিতর থেকে জুতো জোড়া খুঁজে বের করল, তারপর তীর বেয়ে উপরে উঠে ফটকটা পেরিয়ে প্রচণ্ড রোদ্দুরে ধীরে ধীরে হাঁটতে লাগল।

মুচির বাড়িতে পৌঁছে ধপাস করে বসে পড়ল। তাকে দেখে মুচি বেশ খুশি হল। বলল, "তোমাকে খারাপ দেখাচ্ছে।"

রিচার্ড বলল: "ঠিক। শুক্রবার সকালে মাথাটা ঘুরে গিয়েছিল, সবে একটু ভাল হয়ে উঠেছি।"

মুচি গলা ছেড়ে বলে উঠল, "আরে, তোমার তো মাথা ঘুরেছিল, আর আমার কি হয়েছিল? মনে হয়েছিল, কেউ যেন আমার ছাল-চামড়া ছাড়িয়ে নিচ্ছে। কেউ যেন আমার আত্মাকে ধরেই লোফালুফি করছে, ঠিক যে-রকম লোকে একটা পাথর নিয়ে করে। তারপরই আমাকে ছুঁড়ে ফেলে দিল গত শুক্রবারের সকালটা আমি কোনদিন ভুলব না।"

রিচার্ডের মাথায় একটা অদ্ভুত ধারণা ঢুকল: তবে কি সে মুচির আত্মাটাকেই পাথরের মত নাড়াচাড়া করেছিল? সে ভাবল: "হয় তো ল্যাম্পটনের প্রতিটি পুরুষ, নারী ও শিশুর আত্মাই সেখানে পাথর হয়ে পড়েছিল।" কিন্তু এসব কথা সে মুচিকে বলল না; একটা বক্‌লস নিয়ে বাড়ি ফিরে গেল।

বাড়িতেও সুখ নেই। চার্লস বাড়িতে পাকাপাকিভাবে বসে গেছে। কিছুই বলার নেই। চার্লস মৃদুভাষী, কঠোর পরিশ্রমী, আর র‍্যাচেল যখন স্বামীকে গালাগালি করে তখন সে রিচার্ডের পক্ষই নেয়। সেটা আরও দুঃখদায়ক, কারণ র‍্যাচেল তার প্রতিবাদ করে না।

(ক্রস্‌লি বলল, "গল্পের বাকি অংশটা হাসির খোরাক: রিচার্ড আবার বালিয়াড়িতে গেল, পাথরের স্তূপটাকে খুঁজে বের করল, ডাক্তার ও রেক্টরের আত্মা দুটিকে চিহ্নিত করল—ডাক্তারের আত্মার গড়ন অনেকটা হুইস্কির বোতলের মত, আর রেক্টরের আত্মা আদিম পাপের মতই কালো; আর এইভাবে সে প্রমাণ করল যে তার ধারণাটা কল্পনামাত্র নয়। কিন্তু এসব বিবরণের মধ্যে না গিয়ে সেখান থেকেই আবার আরম্ভ করছি যেখানে দু'দিন পরে র‍্যাচেল হঠাৎ রিচার্ডকে আবার আগের চাইতে অনেক বেশী করে ভালবাসতে শুরু করল।

তার কারণ চার্লস বাড়ি থেকে চলে গেছে; কোথায় গেছে তা কেউ জানে না। ফলে দু' একদিনের মধ্যেই রিচার্ড আবার সুস্থ হয়ে উঠল; সব কিছুই আগের মত চলতে লাগল। কিন্তু একদিন বিকেলে দরজাটা খুলে গেল; দরজায় দাঁড়িয়ে চার্লস।

কোন কথা না বলে সে ঘরে ঢুকল; টুপিটাকে পেরেকের সঙ্গে ঝুলিয়ে রাখল। অগ্নিকুণ্ডের পাশে বসে শুধাল: "রাতের খাবার কখন তৈরি হবে?"

ভুরু তুলে রিচার্ড র‍্যাচেলের দিকে তাকাল; কিন্তু ভাব দেখে মনে হল,

র‍্যাচেল লোকটিকে দেখেই মজে গেছে।

বলল: "আটটায়"। তারপর ঝুঁকে পড়ে চার্লসের কাদা-মাখা বুটজোড়া খুলে নিয়ে রিচার্ডের একজোড়া চটি এগিয়ে দিল।

চার্লস বলল: "বেশ। এখন সাতটা বাজে। একঘণ্টা পরে রাতের খাবার। নটার সময় ছেলেটা সান্ধ্য দৈনিক পত্রিকা নিয়ে হাজির হবে। দশটার সময়—র‍্যাচেল, তুমি আর আমি একসঙ্গে ঘুমোব।"

রিচার্ডের মনে হল, চার্লস নির্ঘাৎ হঠাৎ পাগল হয়ে গেছে। কিন্তু র‍্যাচেল শান্ত গলায় জবাব দিল, "নিশ্চয়, নিশ্চয় লক্ষ্মীটি! তারপরেই রিচার্ডের দিকে ঘুরে সজোরে তার গালে একটা চড় বসিয়ে দিয়ে বলল, "আর তুমি বেঁটে মানুষ, এখান থেকে দূর হয়ে যাও!"

গালে হাত বুলোতে বুলোতে রিচার্ড হতভম্বের মত দাঁড়িয়ে রইল। র‍্যাচেল ও চার্লস দুজনই পাগল হয়ে গেছে এটা যেহেতু বিশ্বাস করা যায় না, তাই নিশ্চয় সে নিজেই পাগল হয়ে গেছে। যাই হোক, রিচার্ড ও র‍্যাচেলের মধ্যে একটা অলিখিত চুক্তি আছে যে, দুজনের যেকোন একজন যদি কখনও বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটাতে চায় তাহলে অপরজন তাতে বাধা দেবে না। অনুষ্ঠানের চাইতে ভালবাসার বন্ধনকেই তারা জীবনের স্বীকৃতি দিতে চেয়েছে। তাই রিচার্ড যথাসাধ্য শান্ত গলায় বলল, "ঠিক আছে র‍্যাচেল, তোমাদের দুজনকে একত্র রেখেই আমি চলে যাব।"

চার্লস তার দিকে এক পাটি বুট ছুঁড়ে দিয়ে বলল, "এখন থেকে প্রাতরাশের সময় পর্যন্ত যদি এই দরজায় নাক গলাও, তাহলে এক হুংকারে মাথা থেকে তোমার কান দুটোকে আমি ছিঁড়ে ফেলে দেব।"

রিচার্ড বেরিয়ে গেল; ভয়ে নয়, শান্ত চিত্তে, পরিষ্কার মাথায়। কটক পার হয়ে গলিপথ ধরে সে মাঠে নামল। সূর্যাস্তের এখনও তিন ঘণ্টা বাকি। স্কুলের মাঠে ছেলেরা ক্রিকেট খেলছে। তাদের সঙ্গে হাসি-ঠাট্টা করল। কিন্তু র‍্যাচেলের কথা মনে হতেই চোখে জল এসে গেল। তখনই নিজেকে সান্ত্বনা দিল, "হায়, আমি যে পাগল হয়ে গেছি। আমার কী মন্দ ভাগ্য!"

শেষ পর্যন্ত সে পাথরগুলির কাছে গেল। বলল, "এবার এই পাথরের স্তূপের ভিতর থেকে আমার আত্মাকে খুঁজে বের করে এই হাতুড়ি দিয়ে তাকে একশ' টুকরো করে ফেলব—বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসার সময় কয়লা-ঘর থেকে সে হাতুড়িটা নিয়ে এসেছিল।

এবার সে নিজের আত্মাকে খুঁজতে লাগল। এখন, অন্য স্ত্রী-পুরুষের আত্মাকে চেনা যায়, কিন্তু নিজের আত্মাকে কেউ চিনতে পারে না। রিচার্ডও চিনতে পারল না। কিন্তু ঘটনাক্রমে সে র‍্যাচেলের আত্মাকে দেখেই চিনতে পারল (স্ফটিকখচিত একটা সবুজ পাথর)। তার গায়েই লেগে আছে আর একটা পাথর; কুৎসিত গড়ণের একটা ফুটকি-ফুটকি বাদামী

পাথর। রিচার্ড প্রতিজ্ঞা করল: "এটাকে আমি ধ্বংস করব। এটা নিশ্চয় চার্লসের আত্মা।"

সে র‍্যাচেলের আত্মাকে চুমো খেল, ঠিক যেন তার দুটি ঠোঁটেই চুমো খেল। তারপর চার্লসের আত্মাকে নিয়ে হাতুড়িটা তুলল। "তোকে ভেঙে পঞ্চাশ টুকরো করে ফেলব!"

সে থেমে গেল। তার খটকা লাগল। সে জানে, র‍্যাচেল তার চাইতেও চার্লসকে বেশী ভালবাসে, কাজেই সে ভালবাসাকে স্বীকৃতি দিতে সে বাধ্য। একটা তৃতীয় পাথর (সেটা নিশ্চয় তার নিজের আত্মা) চার্লসের পাথরের পাশেই পড়েছিল; একখণ্ড মসৃণ ধূসর গ্রানাইট পাথর, একটা ক্রিকেট বলের মত বড়। নিজের মনেই বলল: "আমার নিজের আত্মাকেই টুকরো টুকরো করে ভেঙে ফেলব, তাহলেই আমার অবসান ঘটবে।" পৃথিবীটা অন্ধকার হয়ে গেল, ঝাঁপসা হয়ে গেল চোখের দৃষ্টি, প্রায় মূর্ছিত হবার মত অবস্থা। কিন্তু সে সামলে নিল, তীব্র চীৎকার করে কয়লা-ভাঙা হাতুড়ি দিয়ে সশব্দে আঘাত করল সেই ধূসর পাথরটার উপর। আবার এক আঘাত।

পাথরটা চারটুকরো হয়ে গেল, বারুদের মত একটা গন্ধ বের হল। কিন্তু রিচার্ড যখন দেখল যে তথাপি সে বহালতবিয়তে বেঁচে আছে, তখন সে হো-হো করে হেসে উঠল। হাসির পর হাসি। হায়, সে পাগল হয়ে গেল, একেবারে পাগল। হাতুড়িটা ছুঁড়ে ফেলে দিল, ক্লান্ত দেহে বসে পড়ল, একসময় ঘুমিয়েও পড়ল।

যখন জাগল তখন সূর্য অস্ত যাচ্ছে। বাড়ি যেতে যেতে ভাবল: "বড়ই খারাপ স্বপ্ন; র‍্যাচেল নিশ্চয় এর হাত থেকে আমাকে উদ্ধার করতে পারবে।"

শহরের প্রান্তে পৌঁছে দেখল, ল্যাম্পপোস্টের নীচে দাঁড়িয়ে একদল লোক উত্তেজিতভাবে কথা বলছে। একজন বলছে: "আটটা নাগাদ এটা ঘটেছে, তাই না?" আর একজন বলছে: 'হাঁ।" তৃতীয় জন বলছে: "আরে, বদ্ধ পাগল। বলে কি না, 'আমাকে ছুঁয়েই দেখ, আমি হুংকার দিয়ে উঠব, আর এক হুংকারে গোটা পুলিশ বাহিনীসহ তোমাকে অজ্ঞান করে ফেলব। আমার হুংকার শুনে তোমরা পাগল হয়ে যাবে।' ···আর ইন্সপেক্টর বলল: 'ক্রস্‌লি, এবার তোমার হাতদুটো উপরে তোল, এতদিনে তোমাকে বাগে পেয়েছি।'···তখন সে বলল: 'একটা শেষ সুযোগ। আমাকে রেখে চলে যাও, নইলে এক হুংকারে আমি তোমাদের মেরে কাঠ বানিয়ে দেব।'···"

তাদের কথাবার্তা শুনতে রিচার্ড দাঁড়িয়ে পড়েছিল। বলল, "তারপর ক্রস্‌লির কি হল? সেই নারী কি বলল?"

সে নারী ইন্সপেক্টরকে বলল, 'খ্রীস্টের দোহাই, আপনি চলে যান, নইলে ও আপনাকে মেরে ফেলবে।'

"আর লোকটি কি হুংকার দিল ?"

"না, সে হুংকার দেয় নি। মুহূর্তের জন্য মুখটা কুঁচকে শ্বাসটা টানল। হা পরমেশ্বর, জীবনে এরকম বীভৎস মুখ আমি কখনও দেখি নি। পরে আমাকে তিন-চার পেগ ব্রাণ্ডি খেতে হয়েছিল। আর ইন্সপেক্টরের রিভলবারটা বাগিয়ে ধরে গুলি করল, কিন্তু কারও গায়ে গুলি বিঁধল না। তারপরেই হঠাৎ এই ক্রস্‌লি নামক লোকটির মধ্যে একটা পরিবর্তন দেখা দিল। দুটি হাত সশব্দে দুই পাশে চেপে ধরে একটু পরেই বুকের উপর রাখল, মুখটা আবার চকচক করতে লাগল। তারপরেই সে হাসতে শুরু করল, নাচতে শুরু করল, নানারকম অঙ্গভঙ্গী করতে লাগল। স্ত্রীলোকটি হাঁ করে তাকিয়ে রইল : যেন নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারছিল না। পুলিশ তাকে নিয়ে চলে গেল। লোকটা যদি পাগলও হয়ে থাকে, তখন কিন্তু একেবারেই শান্তশিষ্ট ও নিরীহ ছিল ; তাকে নিয়ে পুলিশকে কোনরকম ঝামেলাই পোহাতে হয় নি। অ্যাম্বুলেন্সে তুলে তাকে "রাজকীয় পশ্চিমাঞ্চল উন্মাদ আশ্রমে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।"

রিচার্ড তো বাড়ি ফিরে গেল ; সব কথা র‍্যাচেলকে বলল, র‍্যাচেলও তাকে সব কথা বলল, যদিও বেশী কিছু বলার ছিল না। স্ত্রী বলল, সে চার্লসের প্রেমে পড়ে নি ; রিচার্ডকে বিরক্ত করার জন্যই ওসব কথা সে বলেছিল, আসলে সে নিজেও কিছু বলে নি, বা চার্লসকেও কিছু বলতে শোনে নি ; সবটাই তার স্বপ্নমাত্র। স্বামীর দোষ ত্রুটি সত্ত্বেও তাকেই সে চিরদিন ভালবেসেছে ; অবশ্য দোষের মধ্যে তার কৃপণতা, বাচালতা, আর অপরিচ্ছন্নতা, অন্য কোন দোষ তার নেই। চার্লস ও সে চুপচাপ রাতের খাবার খেয়েছিল, তারপর সে তার সঙ্গে একটু আধটু খুনসুটিও শুরু করেছিল, তাকে নাচতে ডেকেছিল, আর তখনই দরজায় টোকা পড়ল। ইন্সপেক্টর চীৎকার করে বলল : "ওয়াল্টার চার্লস ক্রস্‌লি, অস্ট্রেলিয়ার সিড্‌নিতে জর্জ গ্র্যাণ্ট, হ্যারি গ্র্যাণ্ট ও আভা কোলম্যানকে খুন করার অভিযোগে রাজার নামে আমি তোমাকে গ্রেপ্তার করছি।" ততক্ষণে চার্লস বদ্ধ পাগল হয়ে গেছে। পকেট থেকে একটা জুতোর বক্‌লস বের করে সেটাকে বলল : "আমার হয়ে এই নারীকে বেঁধে রাখ।" তারপর পুলিশকে চলে যেতে বলল ; নইলে সে নাকি হুংকার দিয়েই তাদের মেরে ফেলবে। তারপর তাদের ভয়ংকরভাবে মুখ ভেংচে হঠাৎ একেবারে টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে পড়ল। "লোকটা কিন্তু খুব ভাল ছিল ; তাকে আমার বড় ভাল লেগেছিল ; তার জন্য সত্যি আমার দুঃখ হয়।"

"গল্পটা আপনার ভাল লেগেছে ?" ক্রস্‌লি শুধালো।

আমি তখন স্নান লিখতে ব্যস্ত। জবাব দিলাম, "হ্যাঁ, একটি সেরা

মাইলেসীয় গল্প। লুসিয়াস এপুলিয়াস, আপনাকে অভিনন্দন জানাই।"

ক্ষুব্ধ মুখে ক্রস্‌লি আমার দিকে ঘুরে বসলেন; তার মুষ্টিবদ্ধ হাত দুটি কাঁপছে। বললেন, "এর প্রতিটি শব্দ সত্যি। ক্রস্‌লির আত্মা চারটুকরো হয়ে গিয়েছিল, আর আমি পাগল হয়ে গেলাম। আহা, রিচার্ড ও র‍্যাচেলকে আমি দোষ দেই না। তারা তো ভারী সুন্দর এক বোকা দম্পতি; আমি কখনও তাদেব কোন ক্ষতি করতে চাই নি; তারা তো প্রায়ই আমাকে দেখতে এখানে আসে। যাই হোক, এখন তো আমার আত্মা ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে, তাই আমার সব ক্ষমতাও চলে গেছে। শুধু একটা ক্ষমতাই এখনও আছে, আর সেটা ঐ হুংকার।"

রান লিখতে আর গল্প শুনতে এতই ব্যস্ত ছিলাম যে কালো মেঘে আকাশ ছেয়ে কখন যে সূর্যকে ঢেকে ফেলে সবকিছু অন্ধকার করে ফেলেছে সেটা খেয়ালই করি নি। গবম বৃষ্টির ফোঁটা পডতে লাগল, একটা বিদ্যুৎ-চমক আমাদের ঝল্‌সে দিল; কানে এল বজ্রের হুংকার।

মুহূর্তের মধ্যে সব গোলমাল হয়ে গেল। মুষলধারে বৃষ্টি নামল, খেলোয়াড়রা আশ্রয়ের জন্য ছুটাছুটি করতে লাগল, পাগলরা চীৎকার-চেঁচামেচি করতে করতে লড়াই শুরু করে দিল। যে ঢ্যাঙা যুবক একসময় "হ্যাণ্ট" দলের হয়ে খেলত সেই বি, সি, ব্রাউন সব পোশাক খুলে ফেলে উলঙ্গ হয়ে দৌড়তে লাগল। স্কোরিং বক্স-এর বাইরে দাড়িওয়ালা একটি বুড়ো মানুষ বজ্রের কাছে প্রার্থনা শুরু করে দিল: "বা! বা! বা!"

ক্রস্‌লির চোখ দুটো সগর্বে ঘুরতে লাগল। আকাশের দিকে আঙুল বাড়িয়ে বললেন, "হঁ্যা, ঠিক ঐরকম হুংকার, ফলও দাঁড়ায় ঠিক ঐরকম; কিন্তু আমি ওর চাইতেও ভাল হুংকার দিতে পারি।" তারপরই হঠাৎ তিনি মুখটা নামিয়ে নিলেন; শিশুসুলভ দুঃখ ও বিরক্তি দেখা দিল তার মুখে। বললেন, "হায় ঈশ্বর, সে যে আমাকে লক্ষ্য করে আবার হুংকার দেবে, হঁ্যা, ক্রস্‌লি হুংকার দেবে। আমার মজ্জা পর্যন্ত জমিয়ে ছাডবে।"

টিনের ছাদের উপর বৃষ্টির ফোঁটা এত জোরে পড়ছিল যে তার কথা কিছুই শুনতে পেলাম না। আবার একটা বিদ্যুতের ঝিলিক, আরও জোরে। একটা বজ্রের হুংকার। তিনি আমার কানে কানে বললেন, "এটা তো দ্বিতীয় ডিগ্রির হুংকার; কেবলমাত্র প্রথম ডিগ্রির হুংকারই মানুষকে খুন করতে পারে।"

তিনি আরও বললেন, "আঃ, আপনি বুঝতে পারছেন না?" তিনি বোকার মত হাসলেন। এখন তো আমিই রিচার্ড, আর ক্রস্‌লি আমাকে খুন করবে।"

উলঙ্গ লোকটি দুইহাতে দুটো ক্রিকেট স্ট্যাম্প ঘোরাতে ঘোরাতে ছুটছে আর চেঁচাচ্ছে; সে এক কুৎসিত দৃশ্য। বুড়োর ওল্টানো টুপি থেকে জল গড়িয়ে পড়ছে তার পিঠে, আর সে কেবলই বলছে, "বা! বা! বা!"

আমি বললাম, "সব বাজে কথা! সাহস আনুন, মনে রাখবেন যে আপনি ক্রস্‌লি; এক ডজন রিচার্ডের সঙ্গে আপনি সমানে লড়তে পারেন। একবার খেলায় আপনি হেরেছেন, কারণ রিচার্ডের ভাগ্য ভাল ছিল; কিন্তু হুংকার তো এখনও আপনার আয়ত্তেই আছে।"

আমার নিজেকেই কেমন যেন পাগল-পাগল মনে হচ্ছিল। পাগলা গারদের ডাক্তার ছুটে এসে স্কোরিং বক্সে ঢুকলেন; তার ফ্লানেলের পোশাক থেকে জল ঝরছে; কিন্তু তখনও তার পরনে রয়েছে প্যাড আর ব্যাটিং গ্লাভস্‌; চশমা কোথায় ছিটকে পড়ে গেছে। আমাদের চেঁচামেচি তার কানে গিয়েছিল; আমার শরীর থেকে ক্রস্‌লির হাত দুটো জোর করে ছাড়িয়ে নিয়ে তিনি হুকুম দিলেন, "ক্রস্‌লি, এক্ষুণি তোমার ডর্মিটরিতে চলে যাও!"

ক্রস্‌লি সগর্বে বললেন, "আমি যাব না। তবে রে সাপ ও আপেলওয়ালা মানুষ!"

ডাক্তার তার কোটটা চেপে ধরে তাকে ঠেলে বের করে দিতে চেষ্টা করল।

ক্রসলিই তাকে এক ধাক্কায় ফেলে দিলেন, তার চোখ দুটি জ্বলছে। "বেরিয়ে যাও; আমাকে একা থাকতে দাও, নইলে আমি হুংকার দিয়ে উঠব। শুনতে পাচ্ছ? আমি হুংকার দেব। তোমাদের সবাইকে মেরে ফেলব। আমার হুংকারে পাগলা গারদটাই ভেঙে পড়বে। সব ঘাস শুকিয়ে যাবে। আমি হুংকার দেব।" তীব্র ত্রাসে তার মুখটা বেঁকে যেতে লাগল। দুই চোয়ালের উপর একটা করে লাল দাগ ফুটে উঠে ক্রমশ সারা মুখে ছড়িয়ে পড়তে লাগল।

দুই কানে আঙুল ঢুকিয়ে আমি স্কোরিং বক্স থেকে ছুটে বেরিয়ে গেলাম। হয় তো বিশ গজ মত ছুটেছি, এমন সময় আগুনের একটা অবর্ণনীয় যন্ত্রণা আমাকে যেন তালগোল পাকিয়ে ফেলল; বিস্ময়বিমূঢ় অবশ দেহে দাঁড়িয়ে পড়লাম। কোনরকমে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেয়ে গেলাম; সম্ভবত গল্পের রিচার্ডের মতই আমার ভাগ্যটা ভাল। কিন্তু সেই বিদ্যুতের স্পর্শে ক্রস্‌লি ও ডাক্তার দুজনই মারা গেলেন।

ক্রস্‌লির শরীরটা একেবারে পাথরের মত শক্ত হয়ে গিয়েছিল, আর ডাক্তারের শরীরটা এককোণে গুড়িমেরে পড়েছিল; দুই হাতে তার কান ঢাকা ছিল। ব্যাপারটা কেউ বুঝতে পারল না। কারণ বজ্রপাতের সঙ্গে সঙ্গেই তাদের মৃত্যু হয়েছিল, আর বজ্রের হুংকার শুনে কানে আঙুল দেবার মত লোক ডাক্তার নন।

এ গল্পের উপসংহারটি কিন্তু মোটেই সন্তোষজনক নয়। যে বন্ধুর বাড়িতে আমি উঠেছিলাম তারাই র‍্যাচেল ও রিচার্ড। ক্রস্‌লি তাদের খুব সঠিক

বিবরণই দিয়েছিল। পরে যখন তাদের বললাম যে, তাদের বন্ধু সেই ডাক্তারটি যখন বজ্রাহত হন তখন চার্লস ক্রস্‌লি নামক একটি লোকও একই-ভাবে বজ্রাহত হয়ে মারা গেছে, তখন কিন্তু ক্রস্‌লির মৃত্যুকে তারা বেশ স্বাভাবিকভাবেই গ্রহণ করল। রিচার্ডের দৃষ্টি উদাস; র‍্যাচেল বলল: "ক্রস্‌লি? আমার ধারণা সেই লোকটিই একজন অস্ট্রেলীয় যাদুকর বলে পরিচয় দিয়ে সেদিন চমৎকার কিছু যাদুর খেলা দেখিয়েছিল। একখানা কালো রেশমী রুমাল ছাড়া আর বিশেষ কোন যন্ত্রপাতি তার ছিল না। তার মুখটা আমার খুব ভাল লেগেছিল। আহা রে! কিন্তু রিচার্ডের তাকে মোটেই ভাল লাগে নি।"

"না, লোকটা সারাক্ষণ যেভাবে তোমার দিকে তাকিয়েছিল সেটা আমি মোটেই বরদাস্ত করতে পারি নি," রিচার্ড বলল।

The Shout—Rabart *Graves*

অবিশ্বাস্য ?

যে কাহিনী আমি বলতে যাচ্ছি তার ভিতর দিয়ে কোন মতবাদ উপস্থিত করা, তার বিরোধিতা করা অথবা তাকে সমর্থন করার ইচ্ছা আমার নেই। বার্লিনের পুস্তক-বিক্রেতার ইতিহাস আমি জানি, স্যার ডেভিড ব্রুস্টার লিখিত জনৈক পরলোকগত রাজ-জ্যোতিষীর পত্নীর ঘটনাটিও ভালভাবে অনুধাবন করেছি, আর আমার বন্ধুমহলের মধ্যেই ঘটেছে এরকম অনেক ভৌতিক দর্শনের উল্লেখযোগ্য ঘটনা নিয়েও বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছি। এই সর্বশেষ ঘটনাটি প্রসঙ্গে একটি কথা বলে নেওয়া দরকার যে এক্ষেত্রে যে মহিলাটি ভূতুড়ে দর্শনের শিকার হয়েছিলেন তিনি কোনদিক থেকেই আমার দূরতম আত্মীয়াও নন।

অনেকবছর আগে ইংলণ্ডের একটি হত্যাকাণ্ড সকলেরই মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল। এরকম কত হত্যাকাণ্ডই তো ঘটে; গুরুত্বের দিক থেকে একটা হত্যাকাণ্ড আগের হত্যাকাণ্ডটিকে ছাড়িয়ে যায়; আর পারলে এই বিশেষ নরপশুটির স্মৃতিকে আমি ভুলেই যেতাম, কারণ তার মৃতদেহ এখন নিউগেট জেলের কবরেই শুয়ে আছে। ইচ্ছা করেই তার কোনরকম ব্যক্তি-গত পরিচয় আমি দিচ্ছি না। হত্যাকাণ্ডটি যখন প্রথম আবিষ্কৃত হয় তখন কিন্তু পরবর্তীকালে এই হত্যার অভিযোগে যে লোকটির বিচার হয়েছিল তার উপর কোনরকম সন্দেহই পড়ে নি। যেহেতু সেসময় সংবাদপত্রে তার

উল্লেখমাত্র ছিল না, সেইহেতু তখনকার সংবাদপত্রে তার কোন বিবরণ প্রকাশিত হওয়াও সম্ভব ছিল না। এই কথাটা কিন্তু মনে রাখা দরকার।

প্রাতরাশে বসে সকালবেলাকার খবরের কাগজ খুলতেই হত্যাকাণ্ডটির প্রথম বিবরণের উপর নজর পড়েছিল; ঘটনাটি খুবই আকর্ষণীয় হওয়ায় বিশেষ মনোযোগ সহকারে সেটি পড়লাম। তিনবার না হলেও দু'বার পড়েছিলাম। খুনটি আবিষ্কৃত হয় একটি শোবার ঘরে। সবে কাগজখানা নামিয়ে রেখেছি এমন সময় চকিতে—বিদ্যুৎচমকের মত—বন্যার জলস্রোতের মত—কি যে বলব বুঝতে পারছি না—সে অবস্থার বিবরণ দেবার উপযুক্ত ভাষাই খুঁজে পাচ্ছি না—যেন দেখতে পেলাম সেই শোবার ঘরটা আমার ঘরের ভিতর দিয়ে চলে গেল, অসম্ভব হলেও ঠিক যেন খরস্রোতা নদীর বুকে আঁকা একখানি ছবির মত। ছবিটা যত দ্রুতই সরে যাক না কেন, সবকিছুই আমি স্পষ্ট দেখতে পেলাম, এত স্পষ্ট যে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে এটাও পরিষ্কার বুঝতে পারলাম যে বিছানার উপর মৃতদেহটা ছিল না।

যেখানে এই অদ্ভুত অনুভূতি আমার হয়েছিল সেটাও এমন কিছু রোম্যাণ্টিক পরিবেশ নয়—সেণ্ট জেমস্ স্ট্রীটের মোড়ের খুব কাছে পিকাডিলির একটা বাসায়। জায়গাটা আমার কাছে সম্পূর্ণ নতুন। আমি তখন একটা আরাম-কেদারায় শুয়েছিলাম, অনুভূতিটা আমাকে এমনভাবে নাড়া দিয়েছিল যে কেদারাটাও তার ফলে খানিকটা সরে গিয়েছিল। (এখানে বলা দরকার যে ক্যাস্টর-পালিশ করা মেঝেতে চেয়ার সহজেই সরে যায়।) জানালার কাছে এগিয়ে গেলাম (ঘরটা তিনতলায়, আর তাতে দুটো জানালা ছিল) নীচে পিকাডিলিতে চলমান সবকিছু দেখে চোখদুটোকে একটু তাজা করে নিতে। হেমন্তকালের উজ্জ্বল সকাল, ঝল্‌মল্ রাস্তায় খুশির মেলা। জোর বাতাস বইছে। বাইরে তাকাতেই দেখলাম, এক-ঝলক হাওয়ায় পার্কের ভিতর থেকে কিছু ঝরাপাতা উড়ে এসে একটা ঘোরানো স্তম্ভ হয়ে উঠল। স্তম্ভটা ভেঙে গেল, আর পাতাগুলোও সরে গেল; তখন দেখলাম রাস্তার ওপাশে দুটি লোক পশ্চিম থেকে পূবদিকে চলে যাচ্ছে। একজনের পিছনে আর একজন। সামনের লোকটি মাঝে মাঝেই ঘাড় বেঁকিয়ে পিছনে তাকাচ্ছে। দ্বিতীয় লোকটি বিপজ্জনক ভঙ্গীতে ডান হাতটা তুলে প্রায় ত্রিশ পা দূরে থেকে তাকে অনুসরণ করছে। প্রথমত, এরকম একটা প্রকাশ্য স্থানে এধরনের অদ্ভুত ও বিপজ্জনক ভঙ্গীটাই আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল; তারপর, আরও আশ্চর্য ব্যাপার যে সেদিকে কোন লোকেরই নজর পড়ছে না। লোক দুটি অন্য সব যাত্রীদের ভিতর দিয়ে এমন অনায়াসে পথ করে নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে যেটা ফুটপাতে হাঁটার সঙ্গে ঠিক খাপ খায় না; যতদূর দেখতে পাচ্ছি, একটি যাত্রীও তাদের পথ ছেড়ে দিচ্ছে না, তাদের স্পর্শ করছে না, বা তাদের দিকে তাকাচ্ছে না। জানালার নীচ দিয়ে যাবার

সময় তারা দুজনই চোখ তুলে আমার দিকে তাকাল। দুজনের মুখই এত স্পষ্ট দেখতে পেলাম যে পরে যেকোন জায়গায় দেখলেই আমি তাদের চিনতে পারব। তাদের মুখে যে উল্লেখযোগ্য কোন লক্ষণ দেখেছিলাম তা কিন্তু নয়; শুধু সামনের লোকটি অস্বাভাবিক রকমের ঝুঁকে চলেছে, আর পিছনের লোকটির মুখের রং ভেজাল মোমের মত।

আমি অকৃতদার; খানসামা ও তার স্ত্রীকে নিয়েই আমার সংসার। চাকরি করি একটি শাখা ব্যাংকে, আর বিভাগীয় প্রধান হিসাবে আমার কাজের চাপটা আর একটু হাল্কা হলেই আমি খুশি হতাম। আমার একটু বায়ু-পরিবর্তনে যাওয়া উচিত ছিল, কিন্তু চাকরির খাতিরে হেমন্তকালটা শহরেই আটকে গিয়েছি। আমার ঠিক কোন রোগ হয় নি, তবে ঠিক সুস্থও ছিলাম না। আমার বিখ্যাত ডাক্তারটির মতে আমি "ঈষৎ পেট-রোগা," তার উপর একঘেয়ে জীবনযাত্রার জন্যই একটা মানসিক অবসন্নতা বোধ করছিলাম। হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারটা যতই বেশী করে প্রকাশ পাচ্ছিল ততই জনসাধারণের মনোযোগ সেদিকে বেশী করে আকৃষ্ট হচ্ছিল; আমি কিন্তু সেই সার্বিক উত্তেজনার মধ্যেও যতদূর সম্ভব নিজেকে সে ঘটনা থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিলাম। কিন্তু এটা জানতাম যে অভিযুক্ত খুনীর বিরুদ্ধে স্বেচ্ছাকৃত নরহত্যার রায় পাওয়া গেছে এবং বিচারের জন্য তাকে নিউগেটে চালান দেওয়া হয়েছে। আরও জানতাম যে সাধারণ অসুবিধা এবং আসামীপক্ষের প্রস্তুতির সময়ের অভাবের জন্য কেন্দ্রীয় ফৌজদারি আদালতে মামলার বিচার এক সেশনের জন্য মুলতুবি রাখা হয়েছে। মুলতুবি মামলার বিচার ঠিক কোন্ সময় নাগাদ শুরু হবে সেটাও হয়তো আমার জানা উচিত ছিল, কিন্তু আমার বিশ্বাস আমি সেটা জানতাম না।

আমার বসার ঘর, শোবার ঘর, সাজ-ঘর—সব একই তলায় অবস্থিত। শোবার ঘরের ভিতর দিয়ে ছাড়া সাজ-ঘরে যাবার অন্য কোন পথ নেই একথা ঠিক, একসময় এই ঘরের একটা দরজা দিয়ে সিঁড়িতে যাওয়া যেত; কিন্তু বেশ কয়েকবছর হল আমার স্নান-ঘরে একটা নতুন আসবাব বসানোর জন্য সে দরজাটা বন্ধ হয়ে গেছে। সেইসময়ে এবং সেই একই ব্যবস্থা অনুসারে দরজাটাকে পেরেক দিয়ে এঁটে তার উপর চট লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে।

একদিন অনেক রাতে শোবার ঘরে দাঁড়িয়ে চাকরটিকে কিছু কাজের নির্দেশ দিচ্ছিলাম। আমার মুখটা ছিল সাজ-ঘরে যাবার একমাত্র দরজাটার দিকে, আর সেটা তখন বন্ধই ছিল। চাকরের পিঠটা ছিল সেই দরজার দিকে। তার সঙ্গে কথা বলতে বলতেই দেখলাম দরজাটা খুলে গেল, আর একটি লোক ভিতরে তাকিয়ে সাগ্রহে ও রহস্যজনকভাবে ইঙ্গিতে আমাকে ডাকল। পিকাডিলির রাস্তা ধরে যে দুটি লোক হেঁটে গিয়েছিল, এ তাদেরই দ্বিতীয় লোকটি যার মুখের রং ছিল ভেজাল মোমের মত। মূর্তিটি আমাকে

ইসারায ডেকেই পিছিয়ে গিয়ে দরজাটা বন্ধ করে দিল। শোবার ঘরটা পেরিয়ে যেতে যতটুকু সময় লাগে ঠিক ততটুকু সময় পরেই সাজ-ঘরের



দরজাটা খুলে ভিতরে তাকালাম। আগে থেকেই আমার হাতে একটা জ্বলন্ত মোমবাতি ছিল। সাজঘরে কাউকে দেখতে পাব আমার মনে সেরকম কোন প্রত্যাশা ছিল না, আর কাউকে দেখতেও পেলাম না।

যখন বুঝতে পারলাম যে চাকরটি অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে তখন তার দিকে ঘুরে বললাম, "ডেরিক, তুমি কি বিশ্বাস করবে যে ঠাণ্ডা মাথায় আমি যেন দেখতে পেলাম—" তার বুকের উপর হাতটা রাখতেই সে চমকে উঠে ভীষণভাবে কাঁপতে কাঁপতে বলে উঠল "হা প্রভু, হাঁ স্যার! একটি মরা মানুষ আপনাকে ইসারায় ডাকল!"

এই জন ডেরিক বিশ বছরেরও বেশী দিন ধরে আমার কাছে চাকরি করছে; সে অত্যন্ত বিশ্বাসী ও আমার প্রতি অনুরক্ত; আমি কিছুতেই বিশ্বাস করি না যে আমি তাকে না ছোঁয়া পর্যন্ত এই মূর্তিটিকে দেখার কোন অনুভূতি তার মনে জেগেছিল; আমি ছোঁয়ামাত্রই সে এমনভাবে চমকে উঠল যে আমার নিশ্চিত বিশ্বাস আমি ছোঁয়ামাত্রই কোন অলৌকিকভাবে এই অনুভূতি তার মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছিল।

জন ডেরিককে ব্রাণ্ডিটা আনতে বললাম; তাকে এক ড্রাম দিলাম, নিজেও এক ড্রাম খেলাম। সেরাতের ঘটনার আগে কি ঘটেছিল সেকথা ঘুণাক্ষরেও তাকে কিছু বললাম না; ব্যাপারটা নিয়ে ভাবতে বসে আমার নিশ্চিত ধারণা হল যে পিকাডিলিতে একবার ছাড়া সে মুখ আমি আগে কখনও দেখি নি। দরজা থেকে ইসারায় আমাকে ডাকার সময় তার মুখের চেহারার সঙ্গে জানালায় দাঁড়িয়ে থাকার সময় আমার দিকে তাকানোর সময়কার মুখের চেহারার সঙ্গে তুলনা করে আমার মনে হল যে প্রথম দর্শনেই সে আমার স্মৃতির উপর দাগ কেটেছে, আর দ্বিতীয়বার দেখলেই সঙ্গে সঙ্গে যাতে তাকে মনে পড়ে যায় সে ব্যবস্থাও সে পাকা করে ফেলেছে।

কেন জানি না আমার বিশ্বাস হয়েছিল, মূর্তিটা আর ফিরে আসবে না, তবু রাতটা অস্বস্তিতেই কাটল। দিনের আলোর সঙ্গে সঙ্গেই আমি গভীর ঘুমে ঢলে পড়লাম; সে ঘুম ভাঙাল জন ডেরিক নিজে এসে; তার হাতে একখানা কাগজ।

মনে হল, সেই কাগজখানা নিয়ে দরজার কাছে পত্রবাহক ও আমার চাকরের মধ্যে কিছুটা বাদানুবাদ হয়েছে। ওল্ড বেইলিতে কেন্দ্রীয় ফৌজদারি আদালতের আসন্ন অধিবেশনে আমি যাতে জুরি হিসাবে উপস্থিত থাকি কাগজখানা তারই সমন। আগে কখনও জুরি হবার ডাক আমি পাই নি, আর জন ডেরিক সেটা ভালই জানে। কারণেই হোক আর অকারণেই হোক, তার বিশ্বাস এধরনের জুরিতে সাধারণত যাদের ডাকা হয় তারা গুণের দিক থেকে আমার চাইতে নিম্নশ্রেণীর মানুষ, তাই প্রথমে সে সমনটা নিতে অস্বীকার করেছিল। যে লোক সমন জারি করতে এসেছিল সে ব্যাপারটাকে শান্তভাবেই নিয়েছিল। বলেছিল, আমার জুরিতে উপস্থিত থাকা বা না-থাকায় তার কিছু যায় আসে না; সমনটা রইল; সেটা নিয়ে আমি কি করব সে ঝুঁকি আমার, তার নয়।

সে ডাকে সাড়া দেব না অগ্রাহ্য করব, দু' একদিন সেটা স্থির করতে পারলাম না। এ নিয়ে আমার মনে বিশেষ কোন আকর্ষণ-বিকর্ষণ ছিল না। যাই হোক, জীবনযাত্রার একঘেয়েমি ভাবটা কাটাবার জন্যই শেষ পর্যন্ত জুরিতে যাওয়াই স্থির করলাম।

নির্দিষ্ট সকালবেলাটা নভেম্বর মাসের একটা অতি বাজে সকাল। পিকাডিলি জুড়ে ঘন বাদামী কুয়াশা নেমেছে; টেম্পল বারের পুবদিকটা ঘন কালো হয়ে চেপে বসেছে। আদালত-গৃহের বারান্দা ও সিঁড়ি গ্যাসের আলোয় স্বল্পালোকিত, আদালত-কক্ষেরও সেই একই অবস্থা। আমার ধারণা, অফিসাররা যখন আমাকে নিয়ে ওল্ড কোর্টে পৌঁছে দিল এবং সেখানকার ভিড়টা নিজের চোখে দেখলাম, তার আগে আমি জানতামই না যে সেইদিনই খুনীর বিচার হবে। যথেষ্ট কষ্ট করে আমাকে যখন ওল্ড কোর্টে নিয়ে হাজির করা হল তার আগে আমি জানতাম না আমার হাতের সমন দুটো আদালতের কোন্‌টাতে আমাকে নিয়ে যাবে। কিন্তু আমার এই কথাগুলিকে একেবারে আক্ষরিক অর্থে নেওয়া ঠিক হবে না, কারণ এ-ব্যাপারে আমি নিজেই খুব নিশ্চিত নই। অপেক্ষমান জুরিদের জন্যে নির্দিষ্ট জায়গায় আসন গ্রহণ করলাম এবং সেই কুয়াশার মেঘ ও ভারী বাতাসের ভিতর দিয়ে যতটা ভালভাবে সম্ভব আদালতের চারদিকটা তাকিয়ে দেখলাম বড় বড় জানালার বাইরে কালো বাষ্প অন্ধকার পর্দার মত ঝুলছে; রাজপথে ছড়ানো খড় ও কাঠের টুকরোর উপর দিয়ে চাকার চাপা শব্দ ভেসে আসছে সমবেত লোকের গুঞ্জন-ধ্বনি শোনা যাচ্ছে, আর মাঝে মাঝে তার বুক চিরে ভেসে আসছে একটা তীক্ষ্ণ শিস বা উচ্চকণ্ঠ ডাকাডাকির শব্দ। কিছুক্ষণ পরে দুজন জজ এসে তাদের আসনে বসলেন। আদালতের গুনগুনানি হঠাৎ চুপচাপ হয়ে গেল। খুনীকে কাঠগড়ায় নিয়ে আসার হুকুম হল। সে হাজির হল। আর ঠিক সেইমুহূর্তেই আমি তাকে চিনতে পারলাম—যে দুটি লোক পিকাডিলির রাস্তা ধরে হেঁটে গিয়েছিল তাদেরই প্রথম জন।

তখনই যদি আমার নামটা ডাকা হত, তাহলে আমার জবাবটা শোনা যেত কিনা সেবিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। কিন্তু আমাকে ডাকা হল তালিকার ষষ্ঠ বা অষ্টম জুরি হিসাবে, আর ততক্ষণে আমি কোনরকমে জবাব দিতে পারলাম, "এখানে!" তারপর শুনুন। আমি কাঠগড়ার দিকে এগিয়ে যেতেই বন্দী হঠাৎ খুব উত্তেজিত হয়ে ইসারায় তার এটর্নিকে ডাকল আমার কাজে বাধা দিতে বন্দীর ইচ্ছাটা এতই স্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ পেল যে কিছুক্ষণ কাজ বন্ধ থাকল; সেইসময়টা এটর্নি কাঠগড়ায় হাত রেখে তার মক্কেলের সঙ্গে ফিস্ ফিস্ করে কথা বলতে বলতে মাথা নাড়তে লাগল। পরে সেই ভদ্রলোকের কাছ থেকেই জেনেছিলাম, বন্দী প্রথমেই সভয়ে তাকে বলেছিল, 'যেকোন ঝুঁকি নিয়ে এই লোকটিকে বাধা দিন!' কিন্তু যেহেতু

তার বক্তব্যের সপক্ষে সে কোন যুক্তি দেখায় নি, এবং নিজেই স্বীকার করেছে যে আমার নাম শোনার আগে সে কোনদিন আমার নামটাও জানত না, তাই তার কথামত কাজ করা হয় নি।

আমাকেই জুরির মুখপাত্র নির্বাচিত করা হল। বিচারের দ্বিতীয় দিন দু' ঘণ্টা ধরে সাক্ষ্য গ্রহণের পরে (গির্জার ঘড়ির শব্দ আমি শুনেছিলাম) সহযোগী জুরিদের দিকে চোখ পড়তেই তাদের সংখ্যা গুণতে গিয়ে আমি একটা দুর্বোধ্য অসুবিধায় পড়ে গেলাম। পরপর কয়েকবার গুণলাম, কিন্তু একই অসুবিধা দেখা দিতে লাগল। এককথায়, প্রত্যেকবারই একজন বেশী হয়ে যাচ্ছে।

আমার ঠিক পাশে যে জুরিটি বসেছিলেন তাকে ছুঁয়ে কানে কানে বললাম, "আমরা ক'জন আছি দয়া করে গুণে দেখুন না।" আমার অনুরোধ শুনে তিনি অবাক হয়ে গেলেন, কিন্তু মাথা ঘুরিয়ে গুণতে লাগলেন। হঠাৎ বলে উঠলেন, "কেন আমরা তো তেরো—কিন্তু না, তা তো হতে পারে না। না। আমরা বারোজন।" সেদিন আমার গণনা অনুসারেও একজন একজন করে ঠিকই গুণেছি, কিন্তু একসঙ্গে গুণতে গেলেই একজন বেশী হতে লাগল। অথচ তার কোন হিসাব বা ব্যাখ্যা পাওয়া গেল না। কিন্তু আমার মনের মধ্যে এমন একটি মূর্তি ক্রমে গড়ে উঠেছে যে সেটা প্রতিবারেই এসে হাজির হতে লাগল।

জুরিদের বাসা দেওয়া হয়েছিল লণ্ডন ট্যাভার্নে। একটা বড় ঘরে আলাদা আলাদা টেবিলে আমরা সকলেই ঘুমিয়েছি; আমাদের নিরাপদে রাখার জন্য একজন অফিসার সব সময় আমাদের উপর নজর রাখতেন। অফিসারটি আসল নাম চেপে রাখার কোন কারণ আমি দেখি না। তিনি বুদ্ধিমান, অত্যন্ত বিনয়ী, সেবাপরায়ণ, এবং (শুনে খুশি হয়েছি) শহরের একজন শ্রদ্ধেয় মানুষ। তার উপস্থিতি সবসময়ই স্বাগত, সুন্দর দুটি চোখ, ঈর্ষা করার মত কালো গোঁফ, আর গম্ভীর কণ্ঠস্বর। নাম মিঃ হার্কার।

রাত হলে আমরা যখন বারোটায় বিছানায় শুতে গেলাম, তখন মিঃ হার্কারের বিছানাটা পাতা হল দরজা বরাবর। দ্বিতীয়দিন রাতে শুতে যাবার ইচ্ছা না হওয়ায় এবং মিঃ হার্কারকে তার বিছানায় বসে থাকতে দেখে আমি গিয়ে তার পাশে বসলাম, নস্যের ডিবেটা তার দিকে বাড়িয়ে দিলাম। আমার ডিবে থেকে এক টিপ নস্য নেবার সময় মিঃ হার্কারের হাতটা আমার হাতকে স্পর্শ করল; ঠিক তখনই তিনি যেন একটু শিউরে উঠলেন; বললেন, "ও কে?"

মিঃ হার্কারের দৃষ্টিকে অনুসরণ করে ঘরের মধ্যে তাকাতেই আবার সেই প্রত্যাশিত মূর্তিটাকে দেখতে পেলাম—পিকাডিলির রাস্তা ধরে যারা হেঁটে গিয়েছিল তাদেরই দ্বিতীয়জন। উঠে কয়েক পা এগিয়ে গেলাম; তারপর থেমে

মিঃ হার্কারের দিকে ঘুরে দাঁড়ালাম। তিনি কিন্তু সম্পূর্ণ অবিচলিতভাবে হাসতে হাসতে বললেন, 'মুহূর্তের জন্য মনে হয়েছিল যে বিছানা না থাকলেও একজন ত্রয়োদশ জুরি এখানে ছিলেন; কিন্তু এখন দেখছি সেটা চাঁদের আলো।"

মিঃ হার্কারকে কোন কথা না বলে তাকে আমার সঙ্গে ঘরের শেষপ্রান্তে হেঁটে যেতে অনুরোধ করলাম; মূর্তিটি কি করে দেখার ইচ্ছা হল। আমার এগারোজন সহযোগী জুরির বিছানার পাশে বালিশটাকে ঘেঁসে সে কয়েক মিনিট করে দাঁড়াল। প্রতিবারই বিছানার ডানদিক ধরে গেল এবং পরবর্তী বিছানাটার পায়ের দিক দিয়ে সেটাকে পার হতে লাগল। মাথার ভঙ্গী দেখে মনে হল, প্রতিটি শায়িত মূর্তির দিকে সে বিষণ্ণ দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে। আমার বিছানাটা ছিল মিঃ হার্কারের বিছানার সবচাইতে কাছে; সে কিন্তু আমার দিকে বা আমার বিছানার দিকে দৃষ্টিই দিল না। একটা উঁচু জানালা দিয়ে যেখানে চাঁদের আলো এসে পড়েছে সেখান দিয়ে সে বেরিয়ে গেল . মনে হল যেন বাতাসের সিঁড়ি বেয়ে সে চলে গেল।

পরদিন সকালে প্রাতরাশের সময় মনে হল, আমি ও মিঃ হার্কার ছাড়া উপস্থিত অন্য সকলেই গত রাতে নিহত লোকটিকেই স্বপ্নে দেখেছে।

এখন আমারও দৃঢ় ধারণা হল যে পিকাডিলি ধরে যাওয়া দ্বিতীয় লোকটিই খুন হয়েছিল। কিন্তু সেই ঘটনাও একদিন ঘটল, আর এমনভাবে ঘটল যার জন্য আমি মোটেই প্রস্তুত ছিলাম না।

বিচারের পঞ্চম দিনে সরকার পক্ষের সওয়াল শেষ হবার মুখে নিহত লোকটির একটি ছোট 'ছবি' প্রমাণ হিসাবে উপস্থিত করা হল। খুনের খবর জানার পরে লোকটি তার শোবার ঘর থেকে উধাও হয়ে যায় এবং খুনী যেখানে মাটি খুঁড়তে দেখা যায় সেখানকার একটা গুপ্ত স্থানে মৃতদেহ পাওয়া যায়। সাক্ষী ছবিটাকে সনাক্ত করার পরে সেটাকে আদালতের হাতে তুলে দেওয়া হল এবং সেখান থেকে জুরিদের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হল। কালো গাউন-পরা অফিসারটি যখন সেটিকে নিয়ে আমার দিকে আসছিল তখন পিকাডিলির রাস্তার দ্বিতীয় লোকটির মূর্তিটি ভিড়ের ভিতর থেকে উঠে এসে অফিসারের হাত থেকে ছবিটা তুলে নিয়ে নিজের হাতে সেটা আমার হাতে দিল, আর সেই সঙ্গে নীচু ফাঁকা গলায় বলল,—ছবিটা তখনও আমি দেখিনি কারণ সেটা ছিল একটা লকেটের মধ্যে—'তখন আমি অনেক ছোট ছিলাম আমার মুখটা তখন এত রক্তশূন্য ছিল না।' আমার পরবর্তী যে জুরি আমার ছবিটা দেবার কথা মূর্তিটি তখন আমার ও তার মধ্যে গিয়ে দাঁড়াল তারপর সেই জুরি ও পরবর্তী জুড়ির মাঝখানে গেল; এইভাবে সে ছবি আমাদের সকলের হাত ঘুরিয়ে আবার আমাকে এনে দিল। অবশ্য কেউই এই ব্যাপারটা ধরতে পারল না।

টেবিলে ফিরে এসে, এবং সাধারণত আমরা সকলে যখন বন্ধ ঘরে

হার্কারের হেপাজতে এসে জমায়েত হতাম। তখন প্রথম থেকেই মামলার দৈনন্দিন বিবরণ নিয়ে প্রচুর আলোচনা করতাম। পঞ্চম দিনে সরকার পক্ষের সওয়াল শেষ হয়ে যাওয়ায় ঘটনার একটা মোটামুটি চেহারা আমাদের সামনে পরিষ্কার হয়ে উঠল এবং আমাদের আলোচনা বেশ উত্তেজনাপূর্ণ ও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠল। আমাদের মধ্যে একজন গির্জার লোক ছিলেন—তার মত আকাট বোকা আমি আর দেখি নি, অতি পরিষ্কার সব প্রমাণ সম্পর্কেও তিনি অদ্ভুত সব আপত্তি তুলতেন, তার সমর্থক ছিলেন আরও দুজন সাকরেদ পাদরি; একই জেলা থেকে আহুত এই তিন মূর্তি সারাক্ষণ এমন হৈ-চৈ করতেন যে পাঁচ শ' খুনের দায়ে তাদের বিচার হওয়া উচিত। এই তিন অপদার্থ নির্বোধ যখন মাঝরাত নাগাদ গলা একেবারে সপ্তমে চড়ালেন, এবং আমাদের কেউ কেউ বিছানা পাততে শুরু করলেন, তখন আবার আমি সেই নিহত লোকটিকে দেখতে পেলাম। কঠোর মুখে তাদের পিছনে দাঁড়িয়ে সে আমাকে ইসারায় ডাকল। তাদের কাছে গিয়ে আলোচনায় যোগ দিতেই সে সঙ্গে সঙ্গে অদৃশ্য হয়ে গেল। তখন থেকেই সেই লম্বা ঘরটায় বার বার তার আবির্ভাব ঘটতে লাগল। সহযোগী জুরিরা যখনই তাদের মাথাগুলি একত্র করে আলোচনায় মেতে ওঠে তখনই তাদের মাঝখানে আমি দেখতে পাই নিহত লোকটির মাথা। যখনই তাদের মতামত তার বিপক্ষে যায়, তখনই সে গম্ভীরভাবে আমাকে ইসারায় ডাকে।

একটা কথা মনে রাখতে হবে যে বিচারের পঞ্চম দিনে ছোট ছবিটা হাজির করার আগে পর্যন্ত সেই মূর্তিটিকে কখনও আদালতে দেখতে পাই নি। আসামীপক্ষের সওয়াল আরম্ভ হতেই তিনটি পরিবর্তন দেখা দিল। প্রথমে তার দুটিকে একসঙ্গে উল্লেখ করব। মূর্তিটি এখন অনবরত আদালতেই দেখা দিচ্ছে, আর সেখানে আমাকে কিছু না বলে যখন যিনি সওয়াল করেন তাকে লক্ষ্য করেই কথা বলে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ: নিহত লোকটির গলাটা সরাসরি কেটে ফেলা হয়েছিল। বক্তৃতার গোড়াতেই বলা হল যে নিহত লোকটি নিজেই তার গলাটা কেটে থাকতে পারে। সেইমুহূর্তেই মূর্তিটি সেই-রকম গলা-কাটা (এটা সে আগে লুকিয়ে রেখেছিল) বক্তার হাতের কাছে দাঁড়িয়ে একবার ডান হাতে, একবার বাঁ হাতে শ্বাসনালীটার এ-পাশ ও-পাশ দেখিয়ে বক্তাকেই বোঝাতে চেষ্টা করল যে এরকম একটা ক্ষত কোন হাত দিয়েই নিজে নিজে সৃষ্টি করা অসম্ভব। আরও একটা দৃষ্টান্ত: জনৈকা সাক্ষী যখন বলল যে বন্দীর মত ভাল মানুষ হয় না, তখন মূর্তিটি সঙ্গে সঙ্গে তার সামনে দাঁড়িয়ে তার মুখের দিকে সোজা তাকিয়ে একটা হাত ও একটা আঙুল বাড়িয়ে বন্দীর কুৎসিত মুখটাকে দেখিয়ে দিল।

তৃতীয় পরিবর্তনটিই আমার কাছে অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য ও গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়েছে। আমি কোন মতবাদ তৈরি করতে চাই না; শুধু সঠিক

বিবরণ দিয়েই ছেড়ে দিচ্ছি। যদিও মূর্তিটা যাদের লক্ষ্য করে ইঙ্গিতে কিছু বলে তারা কেউই তাকে দেখতে পায় না, তবু সে যখন তাদের গা ঘেঁসে দাঁড়ায় তখন তাদেব মধ্যে একটা বিচলিতভাব ও ত্রাস দেখা দেয়। আমার মনে হয়, আমার অজ্ঞাত কোন নিযমের বশেই মূর্তিটি অপরের কাছে পুরো-পুরি আত্মপ্রকাশ করতে পারে না, অথচ স্বয়ং অদৃশ্য থেকে সে নীরবে তাদের মনের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে। আসামীপক্ষের সুদক্ষ কৌঁসুলি যখন আত্মহত্যার সম্ভাবনার কথা তুললেন এবং মূর্তিটি বিজ্ঞ ভদ্রলোকের গা ঘেঁসে দাঁড়িয়ে ভয়ংকরভাবে করাত চালানোর ভঙ্গীতে নিজের কাটা গলাটা দেখাল, একথা অস্বীকার করা যাবে না যে তপন কৌঁসুলি কেমন যেন থতমত খেযে গেলেন, কযেক সেকেণ্ডের জন্য সুকৌশল আলোচনার সূত্র হারিয়ে



ফেললেন, রুমাল দিয়ে কপাল মুছলেন, এবং অত্যন্ত বিবর্ণ হয়ে গেলেন। আরও দুটি দৃষ্টান্ত দিলেই যথেষ্ট হবে। বিচারের অষ্টম দিনে দুপুরের পরে কয়েকমিনিট বিশ্রাম ও জলযোগের বিরতির পরে জজদের আসার একটু আগেই অন্য জুরিদের নিয়ে আমি আদালতে ফিরে এলাম। চারদিকে তাকিয়ে মনে হল মূর্তিটি সেখানে নেই, কিন্তু গ্যালারির দিকে চোখ পড়তেই দেখলাম একটি সুদর্শনা নারীর গাযে ভর দিয়ে সে সামনের দিকেঝুঁকে দাঁড়িয়ে আছে, যেন সে নিশ্চিত জানতে চাইছে জজরা তাদের আসন গ্রহণ করেছেন কি না। সঙ্গে সঙ্গেই মহিলাটি আর্তনাদ করে মূর্ছিত হয়ে পড়লেন; তাকে

বাইরে নিয়ে যাওয়া হল। যে শ্রদ্ধেয়, প্রাজ্ঞ ও ধৈর্যশীল জজসাহেব বিচার পরিচালনা করছিলেন তার বেলায়ও তাই ঘটল। বিচার শেষ হয়ে গেলে তিনি কাগজপত্র নিয়ে স্থির হয়ে বসেছেন এমন সময় নিহত লোকটি জজের দরজা দিয়ে ঢুকে লর্ডশিপের ডেস্কের দিকে এগিয়ে গেল, সামনের কাগজে তিনি কি লিখছেন সেটা দেখার জন্য সাগ্রহে তার কাঁধের উপর দিয়ে তাকাল। লর্ডশিপের মুখটা কেমন যেন বদলে গেল ; তার হাত থেমে গেল ; একটা অদ্ভুত শিহরণ খেলে গেল তার দেহে ; সে শিহরণ আমি ভাল করেই চিনি ; কাঁপা গলায় তিনি বললেন, "ভদ্রমহোদয়গণ, কয়েক মুহূর্তের জন্য আমাকে ক্ষমা করুন। এখানকার দূষিত বাতাসে আমার কষ্ট হচ্ছে ;" এক গ্লাস জল না খাওয়া পর্যন্ত তিনি সুস্থ হলেন না।

সেই অন্তহীন দশদিনের ছটি দিনের একঘেয়েমির মধ্যে—আদালতে সেই একই বিচারক ও অন্য লোকজন, কাঠগড়ায় সেই একই খুনী, টেবিলে সেই একই উকিলের দল, আদালতের ছাদ-ফাটানো সেই একই প্রশ্নোত্তর, জজ-দের কলমের সেই একই খস্ খস্ আওয়াজ, একই লোকজনের আসা-যাওয়া, দিনের আলো থাকা সত্ত্বেও একই সময়ে সেই একই আলো জ্বালানো, কুয়াশা পড়লে বড় বড় জানালার বাইরে সেই একই কুয়াশার পর্দা, বৃষ্টি হলে সেই একই ঝিরঝির শব্দ, একই করাতের গুঁড়োর উপর দিনের পর দিন সেই একই তালা খোলার লোক ও বন্দীর পায়ের দাগ, একই ভারী দরজায় সেই একই চাবি লাগানো ও খোলা—সেই ক্লান্তিকর একঘেয়েমির মধ্যে আমার মনে হতে লাগল আমি যেন অনেককাল ধরে জুরিদের মুখপাত্র হয়ে আছি, পিকাডিলি যেন ব্যাবিলনের সমসাময়িক হয়ে জেগে উঠেছে, আমার চোখে নিহত লোক-টির স্পষ্টতা এতটুকু কমে নি, বা কোন সময়ই তাকে অন্য সকলের চাইতে কম স্পষ্ট মনে হয় নি। বস্তুত, একটা কথা না বললে চলে না : যে মূর্তিটিকে আমি নিহত লোক বলছি সে কিন্তু একটি বারও খুনীর দিকে তাকাচ্ছে না। বারবার অবাক হয়ে ভেবেছি, "কেন সে তাকাচ্ছে না ?" কিন্তু কখনও সে তাকায় নি।

ছোট ছবিটি উপস্থাপিত হবার পর থেকে বিচার শেষ হবার শেষ কয়েকটি মিনিট আগে পর্যন্ত সে কিন্তু আমার দিকেও তাকায় নি। রাত দশটা বাজতে সাত মিনিট আগে আলোচনা করার জন্য আমরা সকলে একত্রে বসলাম। কিন্তু গির্জার সেই বোকা লোকটি ও তার দুই সমগোত্রীয় অনুরাগী এমন অসুবিধার সৃষ্টি করতে লাগলেন যে জজ সাহেবের মন্তব্য নতুন করে পড়িয়ে শোনাবার জন্য দুবার আমাদের আদালতে যেতে হল। আমাদের মধ্যে ন'জনের সে মন্তব্য সম্পর্কে তিলমাত্র সন্দেহ ছিল না ; আমার বিশ্বাস, আদালতের কারও ছিল না ; কিন্তু সেই মাথা মোটা ত্রিমূর্তির বাধা দেওয়া ছাড়া অন্য কাজ না থাকায় অকারণেই বারবার আপত্তি তুলতে লাগলেন।

শেষ পর্যন্ত আমাদের মতই বজায় রইল, এবং বারোটা বেজে দশ মিনিটের সময় জুরি আদালতে ফিরে গেল।

নিহত লোকটি তখন আদালতের অন্যদিকে জুরিদের আসনের ঠিক বিপরীতে দাঁড়িয়েছিল। আমি আসনে বসলে গভীর মনোযোগের সঙ্গে সে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। তাকে বেশ সন্তুষ্ট মনে হল ; এই প্রথম সে হাতের উপরে একখানি বড় মাপের ধূসর অবগুণ্ঠন নিয়ে এসেছিল ; ধীরে ধীরে সেটা দিয়ে সে নিজের মাথা ও সারা শরীর ঢেকে দিল। আমি যখন রায় ঘোষণা করে বললাম, "দোষী," তখন সেই অবগুণ্ঠনটা খসে পড়ল , সব উধাও ; তার জায়গাটা ফাঁকা।

প্রথা অনুসারে জজসাহেব যখন খুনীকে জিজ্ঞাসা করলেন, মৃত্যুদণ্ড দেবার আগে তার কিছু বলার আছে কি না, তখন সে বিড়বিড় করে যা বলল, পরদিন প্রধান সংবাদপত্রগুলিতে তার বর্ণনা দিয়ে বলা হল "কয়েকটি কাটা-কাটা অসংলগ্ন, প্রায় অস্পষ্ট শব্দ যাতে সে অভিযোগ করেছে যে তার প্রতি সুবিচার করা হয় নি, কারণ জুরিদের মুখপাত্রটি আগে থেকেই তার প্রতি বিরূপ ছিলেন।" যে উল্লেখযোগ্য কথাগুলি সে বলেছিল আসলে সেটা এই :

"মাই লর্ড, জুরিদের মুখপাত্র মহাশয় যখন তার আসনে বসলেন আমি তখনই জানতাম আমার মৃত্যু অনিবার্য। মাই লর্ড, আমি জানতাম তিনি আমাকে কিছুতেই ছেড়ে দেবেন না, কারণ আমাকে বন্দী করার আগেই তিনি যেভাবেই হোক রাতে আমার বিছানার পাশে এসে আমার ঘুম ভাঙিয়েছিলেন এবং আমার গলায় একটা দড়ি পরিয়ে দিয়েছিলেন।"

To be taken with a grain of salt—Charles Dickens

তিন বোন

ত্রিশ বছর আগে হেমন্তের এক স্যাৎসেতে সন্ধ্যায় "ম্যালেটস্ লজ"-এর বাসিন্দারা বড় বোন উর্স্‌লা ম্যালো-র মৃত্যুশয্যার পাশে জড় হয়েছিল। বাড়িটাতে তিন বোনই বাস করত। সেকেলে কাঠের পালংকের পোকায় কাটা মশারীটা তোলা ছিল ; ধূমায়মান তেলের বাতির আলো পড়েছিল মৃত্যুযাত্রিনীর আশাহীন মুখের উপর। দুটি বোবা চোখ মেলে সে বোনদের দিকে তাকাল। ঘরটা নিস্তব্ধ ; শুধু মাঝে মাঝে ছোট বোন ইউনিচের ফুঁপিয়ে কান্নার শব্দ শোনা যাচ্ছে। বাইরে বিস্তীর্ণ জলাভূমির উপর অঝোরে বৃষ্টি ঝরছে।

"কিছুই যেন বদলানো না হয় ভগ্নিরা," উর্স্‌লা হাঁপাতে হাঁপাতে অপর

বোনটিকে বলল। মুখেরভাব নিরাসক্ত ও কঠিন হলেও সে-বোনের সঙ্গে বড় বোনের খুব মিল। "এই ঘরটা যেন তালাবন্ধ করে রাখা হয়; কখনও খোলা না হয়।"

"খুব ভাল কথা," তবিথা শক্ত গলায় বলল: "যদিও তাতে তোমার যে কি যায়-আসে তাতো বুঝতে পারছি না।"

বিস্ময়কর জোরের সঙ্গে তার দিদি বলে উঠল, "সত্যি যায়-আসে! আমি যে মাঝে মাঝে এখানে আসব না তা তুমি কি করে জানলে? এই বাড়িতে আমি এত বেশীদিন বাস করেছি যে আমি এ বাড়ি আবার দেখতে আসবই। আমি অবশ্য ফিরে আসব। ফিরে আসব তোমাদের দুজনকে দেখতে—যাতে তোমাদের কোন ক্ষতি না হতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে।"

তার ভালর জন্য দিদির এই আগ্রহ দেখে কোনরকম বিচলিত না হয়ে তবিথা বলল, "তুমি অসংযত কথা বলছ। তোমার মন যেন কোথায় ভেসে বেড়াচ্ছে; তুমি তো জানো ওসবে আমার বিশ্বাস নেই।"

উর্স্‌লা দীর্ঘশ্বাস ফেলল; ইউনিচ নীরবে খাটের পাশে বসে কাঁদছিল; ইসারায় তাকে কাছে ডেকে দুই হাতে তার গলা জড়িয়ে ধরে বোনকে চুমো খেল।

দুর্বল গলায় বলল, "কেঁদো না লক্ষ্মীটি। হয় তো এ ভালই হল। নিঃসঙ্গ নারীর বেঁচে থেকে কি লাভ! আমাদের কোন আশা নেই, আকাংখা নেই; অন্য নারীদের থাকে স্বামী-সন্তানের সুখের সংসার; কিন্তু এই ভুলে-যাওয়া বাড়িতে আমরা তিনজন বড় হয়েছি। আমি আগে চললাম; তোমরাও অচিরেই আসবে।"

নিজের চল্লিশ বছর বয়স ও লৌহকঠিন দেহের কথা স্মরণ করে তবিথা কাঁধে ঝাঁকুনি দিয়ে বিকৃত হাসি হাসল।

উর্স্‌লার চোখের ভারী পাতা দুটি ধীরে ধীরে বুজে এল; নতুন এক বিচিত্র স্বরে সে আবার বলল, "আমি চললাম প্রথম; কিন্তু তোমাদের জীবনের মেয়াদ যখন ফুরিয়ে যাবে তখন পর পর তোমাদের দুজনের জন্যই আমি আবার আসব। সেইমুহূর্তে আমি তোমাদের সেই পথ দেখিয়ে নিয়ে যাব যেখানে আমি আজ চলে যাচ্ছি।"

তার কথার সঙ্গে সঙ্গে কম্পিত দীপশিখাটি হঠাৎ এমনভাবে নিভে গেল যেন কেউ দ্রুতহাতে সেটাকে নিভিয়ে দিল; ঘরটা অন্ধকারে ভরে গেল। বিছানা থেকে একটা অদ্ভুত দম-বন্ধকরা শব্দ এল; দুই বোন যখন কাঁপতে কাঁপতে বাতিটা আবার জ্বালাল তখন উর্স্‌লা ম্যালোর দেহ কবরে যাবার জন্যই প্রস্তুত।

সেরাতে দুই জীবিত বোন একসঙ্গেই কাটাল। যে ছায়াচ্ছন্ন সীমান্ত-দেশ জীবিত ও মৃতের মধ্যে একটা অপবিত্র সংযোগ রক্ষা করে বলে অনেকের

ধারণা, মৃত নারীটি ছিল সে দেশের অস্তিত্বে সম্পূর্ণ বিশ্বাসী ; এমন কি-মূর্খ তবিথা গত রাতের ঘটনায় যৎসামান্য বিচলিত হলেও এধরনের একটা আশংকা থেকে সেও সম্পূর্ণ মুক্ত ছিল না যে তাদের দিদির বিশ্বাসই হয় তো ঠিক।

ভোরের উজ্জ্বল আলোর সঙ্গে সঙ্গে তাদের সব ভয় দূর হয়ে গেল। সূর্য জানালা দিয়ে লুকিয়ে ঘরে ঢুকল ; বালিশের উপর অসহায় জীর্ণ মুখখানিকে দেখে এমনভাবে তাকে স্পর্শ করল, উদ্ভাসিত করে তুলল যে সেদিকে তাকিয়ে দুই বোনই অবাক হয়ে গেল যে এমন একখানি শান্তশিষ্ট মুখ দেখে কেমন করে তারা ভয় পেয়েছিল। দুই একদিন কেটে গেল। গ্রাম্য ছুতোরের কারখানা থেকে তৈরি করা সবচাইতে সূক্ষ্ম নক্সা-কাটা একটা শক্ত শবাধারে তার দেহটাকে স্থানান্তরিত করা হল। তারপর চারজন বাহকসহ একটি ধীর, বিষণ্ণ শোকযাত্রা গম্ভীরভাবে জলাভূমি পার হয়ে শবাধারটিকে নিয়ে পুরনো ধূসর গির্জার পারিবারিক ভূগর্ভ-কক্ষে গিয়ে হাজির হল, এবং প্রায় ত্রিশ বছর আগে ঐ একই পথ ধরে এসে তার বাবা ও মা যেখানে শেষ শয্যা পেতেছিল তার পাশেই উর্স্‌লার মরদেহকেও শুইয়ে দেওয়া হল।

ধীর পদক্ষেপে বাড়ি ফেরার পথে ইউনিচের কাছে দিনটা কেমন যেন অদ্ভুত ছুটি-ছুটি মনে হতে লাগল ; বিস্তীর্ণ জলাভূমিটাকে মনে হল আরও বন্য ও পরিত্যক্ত ; সমুদ্রের গর্জন যেন আরও বেশী বিষাদময়। তবিথার কিন্তু সেরকম কিছুই মনে হল না। মৃতা নারীর সম্পত্তির বেশীর ভাগ সে দিয়ে গেছে ইউনিচকে, তাই তার লোভী মন অত্যন্ত বিরক্ত হয়েছে ; মৃতার জন্য বোনের উপযুক্ত শোকের অনুভূতি তার মনে জাগে নি।

চুপচাপ চা খেতে খেতে সে শুধাল, "এত টাকা দিয়ে তুমি কি করবে ইউনিচ ?"

ইউনিচ ধীরে ধীরে বলল, "যেমন আছে তেমনই থাকবে। আমাদের দুজনেরই তো বেঁচে থাকবার মত যথেষ্ট সংস্থান আছে ; তাই কোন শিশু হাসপাতালে কয়েকটা শয্যা চালাবার জন্য এই সম্পত্তির আয়টা দিয়ে দেব।"

তবিথা গম্ভীর গলায় বলল, "টাকাটা হাসপাতালে দেবার ইচ্ছা যদি উর্স্‌লার থাকত, তাহলে তো সে নিজেই দিয়ে যেত, তুমি তার ইচ্ছামত কাজ করছ না দেখে আমি তো অবাক হয়ে যাচ্ছি।"

"তাহলে টাকাটা দিয়ে আমি আর কি করতে পারি ?" ইউনিচ শুধাল।

চকচকে চোখে অন্য দিদি বলল, "জমাও, টাকাটা জমাও।"

ইউনিচ মাথা নাড়ল।

বলল, "না, অসুস্থ ছেলেমেয়েদের জন্যই ওটা ব্যয় হবে ; তবে মূল টাকাটায় আমি হাত দেব না, আর আমি যদি তোমার আগে মরি তো সে টাকাটা তুমিই পাবে, যেমন ইচ্ছা খরচ করতেও পারবে।"

অনেক চেষ্টায় রাগ দমন করে তবিথা বলল, "খুব ভাল ; টাকাটা তুমি এভাবে খরচ করবে সেটা উর্স্‌লার ইচ্ছা ছিল বলে আমি বিশ্বাস করি না ; আর যে টাকা এত সযত্নে সঞ্চয় করেছিল সেটা তুমি এভাবে উড়িয়ে দিলে সে যে কবরের মধ্যে চুপচাপ বসে থাকবে তাও আমি বিশ্বাস করি না।"

ম্লান ঠোঁট খুলে ইউনিচ বলল, "তুমি কি বলতে চাও ? তুমি আমাকে ভয় দেখাতে চেষ্টা করছ ; আমার ধারণা ছিল তুমি এসব জিনিসে বিশ্বাস করো না।"

তবিথা জবাব দিল না ; বোনের জিজ্ঞাসুদৃষ্টিকে এড়াবার জন্য চেয়ারটাকে অগ্নিকুণ্ডের কাছে টেনে নিল ; দুই হাত ভাঁজ করে একটু ঘুমিয়ে নেবার জন্য তৈরি হল।

পুরনো বাড়িটার জীবনযাত্রা কিছুদিন বেশ শান্তভাবেই চলতে লাগল। মৃতার ইচ্ছানুসারে তার ঘরটা বেশ ভাল করে তালাবদ্ধ করে রাখা হল, অন্য সব পরিচ্ছন্ন জানালাগুলোর পাশে এ ঘরেব নোংরা জানালাগুলো বড়ই বিসদৃশ দেখতে হল। তবিথা কোনদিন বেশী কথা বলত না, এখন যেন আরও স্বল্পবাক হয়ে পড়ল ; গোটা বাড়ি ও অবহেলিত বাগানটার মধ্যে সে অশান্ত আত্মার মত ঘুরে বেড়ায়, কপালের গভীর রেখাগুলো দেখে মনে হয় অনেক চিন্তার ঝড় বইছে তার মনে। অন্ধকার দীর্ঘ সন্ধ্যা নিয়ে শীত এল ; পুরনো বাড়িটা আগের চাইতেও নির্জন হয়ে উঠল ; রহস্য ও আতংকের একটা হাওয়া যেন বাড়িটার উপরে ছড়িয়ে আছে ; তার শূন্য ঘর ও অন্ধকার বারান্দায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। এমন সব বিচিত্র শব্দে বাড়িটার গভীর নিস্তব্ধতা ভেঙে যাচ্ছে যাকে বাতাস বা ইঁদুর দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না ; অনেক দূরের রান্নাঘরে বসে মার্থা বুড়ি সিঁড়িতে নানারকম অদ্ভুত শব্দ শুনতে পায় ; একদিন তো শব্দ শুনে ছুটে গিয়ে তার মনে হল একটা কালো মূর্তি সিঁড়ির উপর বসে আছে, অবশ্য পরে মোমবাতি ও চশমা নিয়ে গিয়ে সে কিছুই দেখতে পায় নি। ইউনিচ হৃদ্‌যন্ত্রের রোগে ভোগে ; শরীরও দুর্বল ; সেও কয়েকটা অস্পষ্ট ঘটনার সাক্ষী ; এমন কি তবিথাও বাড়িটার এই বিচিত্র পরিবেশের কথা স্বীকার করে ; যদিও অন্য কাজে ব্যস্ত থাকায় এদিকে বিশেষ নজরই দেয় না।

দিদির মৃত্যুর পর থেকে তার চলাফেরার উপর কোনরকম বিধি-নিষেধই নেই ; লোভের বশীভূত হয়ে সে অত্যন্ত কঠোর নিয়ম-কানুন মেনে চলে। তার ও ইউনিচের সাংসারিক খরচ কঠোরভাবে আলাদা করা হয়েছে ; সে অত্যন্ত সাধারণ খাবার খায়, আর পোশাকের ব্যাপারেও বাড়ির বুড়ো চাকরটি তার তুলনায় সুসজ্জিত। শোবার ঘরে একলা বসে এই কুৎসিত, কঠিন দর্শন জীবটি নিজের টাকাপয়সার মধ্যেই ডুবে থাকে ; একটা পোড়া মোমবাতিও জ্বালায় না। এই অর্থগৃধ্নুতা তাকে এতই বদলে ফেলেছে যে

ইউনিস ও মার্থা দুজনই তাকে ভয় করে; রাতের পর রাত বিছানায় জেগে থেকে তার টাকা গোণার টুং-টাং শব্দ শুনে ভয়ে কাঁপে।

একদিন ইউনিচ সাহস করে কথাটা তুলল। বলল, "তোমার টাকাটা ব্যাংকে রাখছ না কেন তবিথা? এরকম একটা নির্জন বাড়িতে এত বেশী টাকা রাখা তো মোটেই নিরাপদ নয়।"

তবিথা বিরক্ত হয়ে বলল, "এত বেশী টাকা! কী বাজে কথা বলছ? তুমি তো ভালই জান যে কোনরকমে বেঁচে থাকার মত টাকাও আমার নেই।"

বোন বলল, "এতে চোরদেরই লোভ বাড়ানো হয়। আমার নিশ্চিত বিশ্বাস গত রাতে কেউ বাড়িতে এসেছিল।"

"সত্যি?" ঢোক গিলে তবিথা বলল; তার চোখের দৃষ্টি ভয়ংকর হয়ে উঠল। "আমার তাই ধারণা। মনে হল কারা যেন উর্সুলার ঘরে ঢুকল। বিছানা ছেড়ে উঠে আমি সিঁড়িতে গিয়ে কান পাতলাম।"

"তারপর?" ইউনিচ অস্পষ্ট স্বরে বলল।

তবিথা ধীরে ধীরে বলল, "সেখানে কেউ ছিল। আমি শপথ করে বলছি, কারণ তার দরজার চাতালে দাঁড়িয়ে আমি কান পেতেছিলাম; ভিতরে কে যেন ঘরময় হাতড়ে বেড়াচ্ছিল। প্রথমে ভাবলাম বিড়াল, কিন্তু আজ সকালে গিয়ে দেখি দরজাটা তালাবন্ধই আছে, আর বিড়ালটা ছিল রান্নাঘরে।"

"ওঃ, চল আমরা এই ভয়ংকর বাড়িটা ছেড়ে চলে যাই," ইউনিস আর্ত-কণ্ঠে বলল।

তার দিদির কণ্ঠস্বর কঠিন: "কী! উর্সুলার ভয়ে? তাকে ভয় পাবে কেন? সে তো তোমার নিজের দিদি; শিশুকাল থেকে তোমাকে লালন-পালন করেছে; হয় তো সে এখনও এখানে আসে, ঘুমের মধ্যে তোমাকে দেখা দেয়।"

ইউনিচ বলে উঠল, "ওঃ! তাকে দেখলে আমি মরেই যাব। সে তো বলেছিল আসবে, মনে হচ্ছে আমার জন্যই সে এসেছিল। হা ঈশ্বর! আমাকে দয়া কর, আমি মরতে বসেছি।"

কথা বলতে বলতেই তার শরীরটা পাক খেতে লাগল; তবিথা ধরে ফেলার আগেই সে অজ্ঞান হয়ে মেঝেতে লুটিয়ে পড়ল।

মার্থা বুড়ি সিঁড়ি বেয়ে ছুটে এল। তবিথা চেঁচিয়ে বলল, "জল নিয়ে এস। ইউনিচ মূর্ছা গেছে।"

ভীরু চোখে তাকে একবার দেখেই বুড়ি চলে গেল; ফিরে এল জল নিয়ে, তার জ্ঞান ফেরাবার চেষ্টা করতে লাগল। জ্ঞান ফিরে আসতেই তবিথা তার ঘরে চলে গেল, তার বোন ও মার্থা সেই ছোট ঘরটায় বসে সভয়ে আগুনের দিকে চোখ রেখে ফিস্ ফিস্ করে কথা বলতে লাগল।

বুড়ি দাসীটি পরিষ্কার বুঝতে পারল যে এ অবস্থা বেশীদিন চলতে পারে না, এই নির্জন রহস্যময় বাড়িটা ছেড়ে চলে যেতে মনিবকে বারবার মিনতি জানাল। দিদির তীব্র আপত্তি সত্ত্বেও ইউনিচ শেষ পর্যন্ত তার কথায় রাজী হওয়ায় মার্থা বুড়ি খুব খুশি হল। আর বাড়িটা ছেড়ে যাবে এই চিন্তায়ই ইউনিচের স্বাস্থ্য ও মানসিক অবস্থার অনেক উন্নতি দেখা দিল। মোরভিল-এ একটা ছোট কিন্তু আরামদায়ক বাড়ি ভাড়া করা হল; তাড়াতাড়ি সেখানে চলে যাবার ব্যবস্থাও হল।

পুরনো বাড়িতে সেটাই শেষ রাত। জলাভূমি, বাতাস ও সমুদ্রের উন্মত্ত আত্মা যেন একযোগে অশান্ত হয়ে উঠেছে। মাঝে মাঝে বৃষ্টি থামছে, আর তখনই দূরের সৈকতভূমি থেকে ভেসে আসছে সমুদ্রের আর্তনাদ, আর তরঙ্গ-তাড়িত বয়ার ঘন্টার বিপদ-সংকেত এক বিচিত্র স্বরে তার সঙ্গে মিশে যাচ্ছে। তখনই আবার বাতাস উঠে আসছে, ঝড়ের প্রচণ্ড ঝাপটায় সমুদ্রের গর্জন ডুবে যাচ্ছে; খোলা জলাভূমিতে কোনরকম বাধা না পেয়ে ঝড়ো হাওয়া পূর্ণ বেগে আছড়ে পড়ছে বাড়িটার উপর। চিমনিগুলোর মুখে বাতাসের একটা বিচিত্র আর্তস্বর শোনা যাচ্ছে, জানালাগুলো খট্‌খট্ করছে, দরজাগুলো সজোরে আছড়ে পড়ছে, মনে হচ্ছে পর্দাগুলোও বুঝি জীবন্ত হয়ে দুলছে।

ইউনিস বিছানায় জেগেই ছিল। তেলের প্রদীপে একটা ছোট্ট নৈশ বাতির আবছা আলো ছড়িয়ে পড়ছে পোকা-খাওয়া পুরনো আসবাবপত্রের উপরে; ফলে অতি সাধারণ জিনিসগুলিও একটা বিকৃত ভৌতিক রূপ ধারণ করেছে। হঠাৎ আরও প্রচণ্ড একটা ঝাপ্টা এসে সেই আবছা আলোটাকেও নিভিয়ে ফেলার উপক্রম করল। সভয়ে সেইসব খটখট ক্যাচ্-ক্যাচ্ এবং সিঁড়িতে আরও সব শব্দ শুনে ইউনিসের মনে হল, মার্থাকে তার সঙ্গে শুতে না বলে সে খুব ভুল করেছে। কিন্তু সে ব্যবস্থাটা তো এখনও করা যেতে পারে। তাড়াতাড়ি মেঝেয় নেমে পোশাকের বড় আলমারিটার কাছে গিয়ে সবে ড্রেসিং-গাউনটা তুলে নেবে এমন সময় সিঁড়িতে একটা অভ্রান্ত পদশব্দ শোনা গেল। তার কাঁপা আঙুল থেকে পোশাকটা পড়ে গেল, বুকের ভিতরটা ঢিপ্ ঢিপ্ করে উঠল, সে আবার বিছানায় ফিরে গেল।

সব শব্দ থেমে গেল; গভীর নিস্তব্ধতা নেমে এল, অনেক চেষ্টা করেও ইউনিচ সে নিস্তব্ধতা ভাঙতে পারল না। বাতাসের একটা প্রবল ঝাপ্টায় জানালাগুলো কেঁপে উঠল, বাতিটাও প্রায় নিভে যাবার উপক্রম হল; আগুনের শিখাটা যখন আবার স্থির হয়ে জ্বলে উঠল তখন সে দেখল, দরজাটা ধীরে ধীরে খুলে যাচ্ছে, আর একটা হাতের বড় ছায়া পড়েছে দেয়াল-কাগজের উপর। তবু তার জিভে একটা শব্দও উচ্চারিত হল না। দরজাটা সশব্দে খুলে গেল, জোব্বা-ঢাকা একটা মূর্তি ঘরে ঢুকল, অবর্ণনীয় আতংকের সঙ্গে ইউনিস দেখল—মৃতা উর্সুলার তোয়ালে-জড়ানো মুখটা তার দিকে তাকিয়ে ভয়ঙ্কর-

ভাবে হাসছে। জীবনের শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে উদ্ধারের আশায় সে তার ম্লান চোখ দুটি মেলে উপরের দিকে তাকাল; মূর্তিটা নিঃশব্দে এগিয়ে এসে তার ভুরুর উপরে ঠাণ্ডা হাতটা রাখল, আর ইউনিস ম্যালোর আত্মা একটা উন্মাদ চীৎকার করে দেহটা ছেড়ে চলে গেল অনন্তের পথে।

চীৎকার শুনে মার্থার ঘুম ভেঙ্গে গেল, ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে সে দরজার দিকে ছুটে গেল, তার আতংকিত দৃষ্টি পড়ল বিছানার উপর ঝুঁকে দাঁড়িয়ে থাকা মূর্তিটার উপর। তার চোখের সামনেই মূর্তিটা ধীরে ধীরে মাথার টুপি



ও তোয়ালেটা খুলে ফেলল, বেরিয়ে পড়ল তবিথার পুরো মুখটা, ভয় ও জয়ের মিশ্র অনুভূতিতে তার মুখটা এত বেশী বিকৃত হয়ে উঠেছে যে মার্থা চিনতেই পারল না।

বুড়ির ছায়াটা দেয়ালের উপর দেখতে পেয়ে তবিথা ভয়ংকর গলায় চীৎকার করে বলল, "কে ওখানে?"

মার্থা ভিতরে ঢুকে বলল, "মনে হল যেন একটা চীৎকার শুনতে পেলাম। কেউ কি ডেকেছে?"

তার উপর ভালভাবে চোখ রেখে তবিথা বলল, "হ্যাঁ, ইউনিস। আমিও চীৎকার শুনেই ছুটে এসেছি। ওকে এমন অদ্ভুত দেখাচ্ছে কেন? ও কি মূর্ছা গেছে?"

বিছানার পাশে হাঁটু ভেঙে বসে ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বুড়ি বলল,

"হ্যাঁ, মৃত্যুর মূর্ছা। আহা, সোনা আমার, শেষ পর্যন্ত তোমার এই দশা হল, ও তো আতংকেই মারা গেছে," ইউনিসের চোখ দুটো দেখিয়ে বুড়ি বলল ; দুটি চোখে তখনও আতংক লেখা রয়েছে। নিশ্চয় ভয়ংকর কিছু দেখেছে।"

তবিথা চোখ নামিয়ে নিল। তো-তো করে বলল, "ওর তো হৃদ্‌যন্ত্রের অসুখ ছিলই ; রাতটাই ওকে ভয় দেখিয়েছে ; আমিও ভয় পেয়েছিলাম।"

মার্থা মৃতার মুখের উপর একটা চাদর টেনে দিল। তবিথা খাটের পায়ের কাছে সোজা হয়ে দাঁড়াল।

একটা দীর্ঘশ্বাস টেনে বলল, "প্রথমে উর্সুলা, তারপরে ইউনিস। আমিও এখানে থাকতে পারব না। পোশাক পরে ভোরের অপেক্ষায় থাকব।"

কথা বলতে বলতেই সে মাথাটা নীচু করে ঘর থেকে চলে গেল। বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে রইল মার্থা। খোলা চোখ দুটিকে আস্তে বন্ধ করে দিয়ে নতজানু হয়ে অনেকক্ষণ ধরে মৃত আত্মার কল্যাণে প্রার্থনা করল। শোকে ও আতংকে অভিভূত অবস্থায় সে মাথা নীচু করে অনেক সময় কাটাল। হঠাৎ তবিথার আর্ত চীৎকার কানে আসতেই সে উঠে দাঁড়াল।

দরজার দিকে যেতে যেতে বলল, "কি হল?"

"তুমি কোথায়?" তার গলা শুনে কিছুটা যেন নিশ্চিন্ত হয়ে তবিথা চেঁচিয়ে বলল।

"মিস ইউনিসের শোবার ঘরে। আপনার কি কিছু চাই?"

"এক্ষুণি নেমে এস। তাড়াতাড়ি! আমি অসুস্থ।"

তার কণ্ঠস্বর হঠাৎ যেন আর্তনাদের মত শোনাল। "তাড়াতাড়ি! ঈশ্বরের দোহাই! তাড়াতাড়ি এস, নইলে আমি পাগল হয়ে যাব।. বাড়িতে একটি অদ্ভুত নারীর আবির্ভাব ঘটেছে।"

অন্ধকার সিঁড়ি বেয়ে বুড়ি কোনক্রমে নীচে নেমে গেল। ঘরে ঢুকে বলল, "ব্যাপার কি? কে এসেছে? কি বলছেন আপনি?"

তার কাঁধে হাত রেখে হাঁপাতে হাঁপাতে তবিথা বলল, "আমি নিজে দেখেছি। তোমার কাছেই যাচ্ছিলাম, এমন সময় দেখলাম একটি নারীমূর্তি সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠছে। সে কি—উর্সুলা কি এসেছে ইউনিসের আত্মাকে নিয়ে যেতে? সে তো বলেছিল আসবে।"

"নাকি আপনার আত্মাকে নিতে?" মার্থা বলে উঠল ; কথাগুলি কেমন অদ্ভুতভাবে তার মুখে এসে গেল ; সে কিন্তু বলতে চায় নি।

তবিথার চোখে ফুটে উঠল একটা বীভৎস দৃষ্টি ; কাঁপা হাতে নিজের পোশাক আঁকড়ে ধরে কাঁপতে কাঁপতে সেখানেই বসে পড়ল। পাগলের মত চীৎকার করে বলতে লাগল, "বাতিটা জ্বালাও। আগুন জ্বালাও, একটা শব্দ কর ; ওঃ, কী ভয়ংকর অন্ধকার! আর কি দিন হবে না!"

তাকে শান্ত করার চেষ্টায় কিছুক্ষণ আগেকার বিদ্বেষকে ভুলে গিয়ে মার্থা

বলল, "এখনই, এখনই। দিনের আলো দেখা দিলে এসব ভয়ের কথা ভেবে আপনারই হাসি পাবে।"

তবিথা অসহায়ভাবে চীৎকার করে বলল, "আমি ওকে খুন করেছি। আমিই ভয় দেখিয়ে ওকে মেরে ফেলেছি। কেন ও টাকাটা আমাকে দেয় নি? ওর তো কোন কাজেই লাগছিল না। ওঃ। ওই দেখ!"

তার চোখের দৃষ্টি অনুসরণ করে মার্থা সভয়ে দরজার দিকে তাকাল, কিন্তু কিছুই দেখতে পেল না।

দাঁতে দাঁত চেপে তবিথা বলে উঠল, "ঐ তো উর্স্‌লা। ওকে দূরে রাখ, দূরে সরিয়ে রাখ!"

কোন অজ্ঞাত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ঘরের মধ্যে একটি তৃতীয় ব্যক্তির উপস্থিতি অনুভব করে বুড়ি এক পা এগিয়ে তবিথার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। আর সেই-টুকু সময়ের মধ্যেই যেন কারও হাত থেকে নিজেকে মুক্ত করার চেষ্টায় নিজের দুই হাত দোলাতে দোলাতে তবিথা বিনা বাক্যব্যয়ে তার সামনেই মেঝেতে পড়ে মরে গেল।

বুড়ির সব সাহস এবার ফুরিয়ে গেল, এই মৃত্যু ও রহস্যের পুরী থেকে পালাবার চেষ্টায় প্রচণ্ড চীৎকার করে সে ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। এতদিন আটকা থাকায় বড় দরজার হুড়কোগুলো শক্ত হয়ে গেছে; সেগুলো খুলতে সে পাগলের মত চেষ্টা করতে লাগল, বিচিত্র সব শব্দ বাজতে লাগল তার কানে। মাথাটা ঘুরতে লাগল। মনে হল, যার যার ঘর থেকে মৃতারা তাকে ডাকছে; একটা শয়তান বুঝি বাইরে সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে হাসছে আর দরজাটা চেপে ধরে আছে। তারপর প্রাণপণ চেষ্টায় সে দরজাটা খুলে ফেলল; নিজের গায়ের নৈশ-পোশাকের কথা ভুলে গিয়ে গভীর রাতেই বাইরে বেরিয়ে গেল। জলাভূমির পাশের রাস্তাটা অন্ধকারে হারিয়ে গেছে, তবু সেটাকে খুঁজে পেল। খালের উপরকার তক্তাগুলো পিছল ও সংকীর্ণ, কিন্তু সে নিরাপদেই তার উপর দিয়ে পার হয়ে গেল; শেষ পর্যন্ত রক্তাক্ত পায়ে ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে গ্রামে পৌছে একটা কুটিরের দরজায় সে যখন এলিয়ে পড়ল তখন সে জীবিত কি মৃত তাই বোঝা ভার।

The three sisters—William Wymark Jacobs

ফটক তালাবন্ধ ছিল

প্রিয় এলেন ও রব্‌বি,

তোমাদের প্রাচীন দুর্গে একটা ছুটি কাটাতে যেতে পারলে আমি খুশি হব। তোমরা এমন চমৎকার একটা চাকরি পেয়েছ বলে আমি যে তোমা-

দেয় কত ঈর্ষা করছি তা তোমরা ধারণাও করতে পারবে না। একটা সত্যিকারের দুর্গে বাস করা—তার সেইসব ভৌতিক ও পৈশাচিক পরিবেশ, আর সেখানে রাত্রে যারা ঘুরে বেড়ায় তাদের মধ্যে বাস করা—সে তো একটা আশ্চর্য অভিজ্ঞতা; অবশ্য তোমরা দুজন তো কোনদিনই সেসবে বিশ্বাস কর না।

রাত নামবার আগেই আমি পৌছতে চেষ্টা করব, যাতে পিশাচরা আমাকে পাকড়াও করতে না পারে। (আরও গল্প করে বললে, যাতে আমি পথ চিনে যেতে পারি। তোমাদের মানচিত্র দেখে তো পথটা বেশ গোলমেলেই মনে হচ্ছে।) যেহেতু ফ্রেজার পরিবার ২৯ তারিখ সকালে চলে যাচ্ছেন, আমি ঐদিনই বিকেলের দিকে তোমাদের পুরনো দরজায় করাঘাত করব।

পুনরায় ধন্যবাদ,
ভালবাসা,
জ্যানেট।

উত্তর-পশ্চিমদিকে অবস্থিত পাহাড়ি অঞ্চলের বিস্তীর্ণ অরণ্যভূমির উদ্দেশ্যে গ্লাসগো ছাড়ার এক সপ্তাহ আগে এই চিঠিটা ডাকে দেওয়া হয়েছিল। আর রব্‌বি ম্যাক্‌কিননের মানচিত্রকে সযত্নে অনুসরণ করা সত্ত্বেও আমি পথ হারিয়ে ফেলেছিলাম। রাত নেমে এল, একমুখী পথটা ঘন গাছপালায় ঢাকা, আমার গাড়ির হেডল্যাম্পটাও সেই ঘন অন্ধকারকে ভেদ করতে পারল না। তাছাড়া, আমার দৃষ্টিশক্তিও ত্রুটিপূর্ণ, সাঁঝের বেলায় একশ' গজের মধ্যে যা কিছু সবই কেমন যেন অস্পষ্ট ও ঝাপ্‌সা দেখায়। আবার অন্ধকার পুরোপুরি নেমে এলে সব ঠিক হয়ে যায়, কিন্তু গোধূলির আলোতে তা হয় না। কাজেই পথ হারিয়ে ফেলায় সতর্ক চালক হিসাবে আমি পথের পাশে গাড়িটা থামিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম।

আর তখনই গাছপালার ফাঁক দিয়ে সেটাকে দেখতে পেলাম। একটা ঝকঝকে রূপোলি উপসাগর থেকে অনেক অনেক উঁচুতে তার বুরুজ ও ছাদের খাড়া চুড়োগুলো অস্তসূর্যের রক্ত-আলোর পটভূমিকায় মসীকৃষ্ণ কালো রঙের একটা রেখাচিত্র বলে মনে হল। দুর্গ নির্মাণের কাজ যেখানে শেষ হয়েছে ঠিক সেখান থেকেই একটা খাড়া পাহাড় উঠে যাওয়ায় দুর্গের উচ্চতাটা অনেক বেশী বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলটা দাঁড়িয়েছে দর্শকের মাথা ঘুরিয়ে দেবার মত। আমার শিরদাঁড়া বেয়ে যেন একটা ছোটখাট শিহরণ বয়ে গেল। এতকাল কল্পনায় একটা দুর্গের যে ছবি এঁকেছি এটা যেন ঠিক তাই—একটা সত্যিকারের রূপকথাসুলভ পুরী। এখন আর যা দরকার তা হল একটা বাদুড়ের মত জীব কোন একটা জানালা দিয়ে বেরিয়ে এসে দুর্গের বুরুজগুলোর উপর দিয়ে পাখা ঝাপ্‌টে উড়ে বেড়াক।

তাকিয়ে থাকতে থাকতেই দেখলাম, অনেক উঁচু একটা বুরুজের ভিতর থেকে একটা ম্লান কমলা লেবু রংয়ের আলো বেরিয়ে এল। মনে মনে বললাম, "নিশ্চয় এলেন ও রব্‌বির বাসা। ঠিক যেখানে লতাগুলো উঠে গেছে।" একটা মূর্তি জানালার পাশ দিয়ে চলে গেল, ফিরে এল, একমুহূর্ত দাঁড়াল, তারপর মূর্তি ও আলো দুইই অদৃশ্য হয়ে গেল। আমি হেঁকে বললাম, "হেই। এখনই শুতে যেয়ো না!"

পুনরায় গাড়ি চালিয়ে আঁকাবাঁকা ছোট পথটা ধরে ধীরে ধীরে এগিয়ে চললাম; মনে ভরসা হল, ঠিক পথেই চলেছি।

"শেষ পর্যন্ত!" সামনেই ফটক; দেখে আরও খুশি হলাম যে ফটকটা খোলা। সেটা নিজেকেই সরাতে হবে এটা আমি নিশ্চয়ই চাই নি; ফটকটা পনেরো ফুট উঁচু, বারো ফুট চওড়া, ভারী বাঁকানো লোহার তৈরি; গ্রানিট পাথরের প্রকাণ্ড চাঁইয়ের সঙ্গে বড় বড় হুক দিয়ে আটকানো। আমার হেডলাইটের আলো পড়ে ফটকটা চিকচিক করছে। গাড়ি চালিয়ে ফটকটা পার হয়ে জোরে হাঁক দিলাম।

কোন জবাব এল না। আলো জ্বলল না, কেউ সাদর অভ্যর্থনা জানাল না, কোন হাসিমুখ বেরিয়ে এল না। কিছু না। মোটে দশটা বাজে; শুয়ে পড়ার সময় তো এখনও হয় নি। আবার হাঁক দিলাম; আরও জোরে, একটানা। ধুত্তোর! কোথাও কিছু নেই। এরই মধ্যে সব শুয়ে পড়েছে! বিরক্ত হয়ে গাড়ি থেকে নামলাম, বৈদ্যুতিক আলোটা নিয়ে এদিক-ওদিক ফেললাম। যেমনটি ভেবেছিলাম, বড় বড় দরজা সবগুলিই যথারীতি বন্ধ; কিন্তু রব্‌বি তার চিঠিতে স্টাফ-কোয়ার্টারে যাবার যে ছোট দরজাটার কথা লিখেছিল সেটাও যে বন্ধ। কাঁকর বিছানো উঠোনের রাস্তা ধরে হাঁটতে লাগলাম; জানালায় আলো ফেললাম; হাঁকডাক করলাম। হঠাৎ এক সারিতে সাতটা লম্বা জানালার উপর আলো পড়তেই ভিতরে যেন কাউকে চলতে দেখলাম, কিন্তু আলোটা এক জায়গায় স্থিরভাবে ফেলতেই দেখতে পেলাম, শ্বেত পাথরের একটি লাজুক কুমারী মূর্তি আমার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।

ঠিক সেইমুহূর্তে একটা গাড়ির ইঞ্জিনের আওয়াজ একেবারে আমার কানের কাছে শুনতে পেলাম। হঠাৎ ঘুরতে গিয়ে হাতের টর্চটা পড়ে গিয়ে নিভে গেল। সেটাকে হাতড়াতে শুরু করতেই গাড়িটা থেমে গেল, তার হেডলাইটের আলো বাঁকানো লোহার ফটকের ভিতর দিয়ে সোজা আমার উপর এসে পড়ল। গাড়ি থেকে একটি পুরুষ মানুষ বেরিয়ে এল, বড় তালাটা খুলল, ফটকটাকে সপাটে খুলে ফেলল, এবং গাড়ির দিকে পা বাড়াতেই একটি নারীকণ্ঠ বলে উঠল, "রব্‌বি! উঠোনে কে যেন দাঁড়িয়ে আছে!"

গাড়িটা ভিতরে ঢুকল, দরজাগুলো খোলা হল, রব্‌বি ও এলেন ম্যাক-

কিনন গাড়ি থেকে নামল।

এলেন চেঁচিয়ে বলল, "জ্যানেট! তুমি এখানে কি করছ?"

"আচ্ছা! অভ্যর্থনাটা পাহাড়ি দেশের উপযুক্তই বটে!"

"ওঃ, আমি সেভাবে কথাটা বলি নি, আর তা তুমি ভালই জান। তোমাকে দেখলে আমরা সব সময়ই খুশি হই। কিন্তু আমরা কোথায় আছি সে খবর তুমি পেলে কোথায়? তোমাকে চিঠি লেখার কথা আমরা ভাবছিলাম বটে, কিন্তু এত ব্যস্ত ছিলাম যে আজকের আগে কিছুতেই সময় করে উঠতে পারি নি…"

আমি বাধা দিয়ে বললাম, "তাহলে অন্য কেউ লিখেছে। আর চিঠিতে স্বাক্ষর করেছে 'এলেন ও রব্‌বি'।"

"কি বললে?" রব্‌বি কথা বলল।

আমি তিক্ত স্বরে বললাম, "তোমাদের চিঠির কথা। যে চিঠিতে আমাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে ফ্রেজাররা চলে গেলে একটা মাস তোমাদের সঙ্গে কাটিয়ে যেতে।"

এলেন স্বীকার করল, 'হ্যাঁ, তোমাকে আমরা একটা চিঠি লিখেছি জ্যানেট, কিন্তু এই তো সবে আজই লিখেছি। আজ রাতেই গ্রামে গিয়ে সেটা ডাকে ফেলেছি। যাইহোক, তুমি যে এসে গেছ তাতেই আমি খুশি। কিন্তু আমাদের মনিবের নাম, বা তিনি যে চলে গেছেন তা তুমি জানলে কেমন করে?"

রব্‌বি বলে উঠল, "আলোচনাটা ভিতরে গিয়ে করলে হত না? এখানে যে জমে যাচ্ছি, আর খিদেও পেয়েছে। এলেন, তুমি গিয়ে কফিটা বানাও, আমি গাড়িটা তুলে দিয়ে ফটকে আবার তালাটা লাগিয়ে দিচ্ছি। এক মিনিটের মধ্যেই যাচ্ছি।" আমার লাল রংয়ের মিনিটার পাশ দিয়ে যেতে যেতেই সে থেমে গেল। "কিন্তু তুমি ভিতরে ঢুকলে কেমন করে জ্যানেট?"

"গাড়িটা চালিয়ে; আবার কেমন করে? ফটকটা খোলাই ছিল, আমি শুধু…"

পরস্পরে চোখাচোখি হল; একমুহূর্ত আমরা তিনজনই হতচকিত হয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলাম। শেষ পর্যন্ত এলেন বলল, "ফটক তো তালাবন্ধ ছিল।"

আমি বিড়বিড় করে বললাম, "ঠিক। আমিই তো তোমাদের ফটক খুলতে দেখলাম। আমি তাহলে অন্য কোন ফটক দিয়ে ঢুকেছি।"

"একমাত্র এই ফটক দিয়েই একটা গাড়ি ঢুকতে পারে; এমন কি যে লাল রংয়ের কর্সেট গাড়িটা তুমি চালিয়ে এসেছ সে গাড়িও।"

রব্‌বি বলল, "দেখ, থার্মোমিটারের পারা নামছেই; এ অবস্থায় এখানে দাঁড়িয়ে থাকলে তো এ সমস্যার সমাধান হবে না। কফি চাই গো মেয়ে!

একলাফে চলে যাও।"

এলেন ও আমি চওড়া বারান্দা ধরে হাঁটতে লাগলাম। দেয়ালে নানা তৈলচিত্র এবং শুয়োর ও হরিণের পোকায়-খাওয়া মাথা ঝোলানো। আমি বললাম, "এ বাড়ির অন্য সব লোকই হয় হদ্দ কালা, আর না হয় তো রাতে দরজার কাছে আসতেই ভয় পায়। মরা মানুষকে জাগাবার মত করে হর্ন বাজিয়েছি, হাঁক দিতে দিতে গলা ছিঁড়ে ফেলেছি।"

"খুব করেছ," এলেন মুচকি হেসে বলল। "আমরা ছাড়া আর কেউ এখানে নেই। ফ্রেজারদের সঙ্গে অন্য সকলেই রোমের বাড়িতে চলে গেছে।"

"তাহলে বুরুজের আলোটা কে জ্বালাল?"

"আলো? বুরুজে? তোমাকে দেখছি কল্পনায় পেয়েছে। তোমাকে তো স্কুল থেকেই চিনি। অন্ধকারে ভয় পাবার মত কিছু না থাকলেও তুমি কল্পনায় একটা কিছু আবিষ্কার করে ফেলতে। এদিকে এস।"

সে একটা দরজা খুলল, সুইচে হাত দিল। একটা ঝকঝকে গরম রান্নাঘর; প্রকাণ্ড ইলেকট্রিক স্টোভটার উপর একটা পরিষ্কার বড় কেট্‌লিতে আস্তে আস্তে জল ফুটছে।

হাত বাড়িয়ে পেয়ালা ও চামচের টুং-টাং শব্দ তুলে এলেন বলল, "বাইরে যাবার আগে আমরা সবসময়ই কেট্‌লিটা চাপিয়ে রেখে যাই। পরে অনেকটা সময় বাঁচে। তুমি তো জান কফির জন্য রব্‌বি কেমন উতলা হয়ে ওঠে, দু মিনিটের মধ্যেই কফি চাই। রান্নাঘরটা যেমন সুন্দর, তেমনই বড়, তাই না? একটু নড়াচড়ার মত জায়গা আমার চাই। সাদা?"

"অ্যাঁ?" আমি চমকে উঠলাম। সবুজ-হলুদ রংয়ের রান্নাঘরের চারদিকে তাকালাম, সাদার তিলমাত্র চিহ্নও চোখে পড়ল না। জিজ্ঞাসু চোখ তুলে বললাম, "কি বললে?"

"কফির কথা বলছি। কালো, না সাদা?" হঠাৎ-হঠাৎ প্রসঙ্গ পাল্টে কথা বলা এলেনের অনেক দিনের স্বভাব।

"ওঃ। সাদাই দাও।" কোটটা খুলতে খুলতে আবার বললাম, "কিন্তু ঘরে তো একটা আলো ছিল। আর তোমাদের একটা চিঠিও আমি পেয়েছি। নইলে এখানে এলাম কেমন করে?"

এলেন খুশির মেজাজে বলল, "বুঝতে পারছি না। তবে আজকের আগে কোন চিঠি লিখি নি। চিনি? দেখ, আমি ঠিক জানি যে আমি লিখি নি। তুমিও তো লেখ নি, কি বল রব্‌বি?"

তার স্বামী সবে ঘরে ঢুকেছে; তার মুখ এখন গরম কফিতে ভর্তি। সে সবেগে মাথাটা এদিক-ওদিক নাড়তে লাগল। সে যে কি বলতে চাইল, "না, আমি লিখি নি," "হ্যাঁ, আমি লিখেছি," অথবা "পিটারের দোহাই, আমার মুখ এখন পুড়ে যাচ্ছে!" তা ঠিক বুঝতে পারলাম না।

এলেনই কথা বলল, "না, আমি জানি আমাকে না জানিয়ে তুমি চিঠি লিখবে না। ব্যাপারটা আমার কাছে রহস্যময় ঠেকছে জ্যানেট।"

বললাম, "চিঠি পেয়েই সেইদিনই আমি জবাব দিয়েছি।"

"সে চিঠি মোটেই এখানে পৌছে নি।"

অত্যন্ত হতাশ হলাম ; মনে মনে স্থির করলাম। পরদিনই গাড়ি চালিয়ে গ্লাসগো ফিরে যাব। কিন্তু তাকে যখন আমার জন্য রাতের মত একটা থাকার ব্যবস্থা করে দিতে বললাম তখন তো এলেন চটে লাল।

"রাতের মত! যখন এসে পড়েছ, তখন থেকেই যাবে। তোমাকে কাছে পেতেই আমরা চাই। আসলে আজ রাতে যে চিঠিটা ডাকে দিয়েছি তাতে তোমাকে আসতেই লেখা হয়েছে।"

রব্‌বি বলল, "আচ্ছা জ্যানেট, সেই চিঠিটা তোমার কাছে আছে?"

"হ্যাঁ, আছে। তুমি যে মানচিত্রটা এঁকে পাঠিয়েছ সেটাও আছে।" আমার থলি থেকে কাগজপত্রগুলো বের করে রব্‌বির পেয়ালার পাশে টেবিলের উপর রাখলাম, বন্ধুরা দু'খানা হাল্কা নীল রংয়ের চিঠির কাগজের উপর ঝুঁকে পড়ল : তার একটাতে বিনা স্কেলে আঁকা একটা রাস্তার চিত্র, আর একটা রব্‌বি ম্যাক্‌কিননের মাকড়শার ঠ্যাংয়ের মত হাতের লেখায় ঠাসা, তার নীচে এলেনের বাঁ হাতে লেখা কয়েকটা শব্দ।

"আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না," এলেন বিচলিত গলায় বলল। "আমরা তো ঠিক এই চিঠিই লিখেছি, কিন্তু আমরা তো লিখেছি সবে আজ। আর ঐ মানচিত্রটাও তো রব্‌বিরই আঁকা। এত খারাপ আঁকতে আর কেউ পারত না।"

আমি শুধালাম, "তোমরা যে এখানে এসেছ সেকথা আর কেউ জানে? মানে, আমাদের দলের আর কেউ যে আমাদের নিয়ে একটু রসিকতা করতে পারে?"

"না ; মাত্র পাঁচ সপ্তাহ আগে আমরা চাকরিটা পেয়েছি, আর খুব অল্প দিনের নোটিসে আমাদের পেইস্‌লি ছাড়তে হয়েছিল। কাউকে ফোন করবারও সুযোগ আমরা পাই নি। এখানে এসেও পা রাখবার সময় পাই নি, কারণ ফ্রেজাররা তখন চলে যাবার কাজে ব্যস্ত, আর আমাদেরও বাড়ির কোথায় কি আছে এবং তাদের অনুপস্থিতিতে কি কি করতে হবে সেসবই জেনে নিতে হচ্ছিল। আজই দলের সকলকে চিঠি লিখেছি, অবশ্য সকলকেই যে এখানে আসতে বলেছি তা নয়।"

"খামটা তোমার সঙ্গে আছে?" রব্‌বি শুধাল।

খামটা সঙ্গে করেই এনেছিলাম। তার হাতে দিলাম।

"জ্যানেট, তুমি ডাকঘরের ছাপটা লক্ষ্য করেছিলে? বা চিঠির উপরকার তারিখটা?"

"না। কেন বলতো ?"

"দেখ।" চিঠিটা আমার হাতে ফেরৎ দিল। "তারিখটা ২৯শে—মানে আজ। আর খামের উপর ডাকঘরের তারিখ ৩০শে—আগামীকাল।"

"এটা তো রসিকতা !" আমি বাধা দিলাম, কিন্তু তার কথাই ঠিক।

"আরও দেখ।" এলেন বলে উঠল। "সেই একই খাম, কারণ ডাকঘরের ছাপটা পড়েছে ভুল কোণে। তোমার মনে পড়ে রব্‌বি, আজ বিকেলেই আমি কথাটা বলেছিলাম। চিঠির তাড়ার মধ্যে এই খামটা উল্টো করে রাখা ছিল, আর আমিও ভাল করে না দেখেই টিকিটগুলো লাগিয়েছিলাম। পরে সেটা খেয়াল হয়েছিল।"

আমি বললাম, "আরে, ভালই হয়েছে। এধরনের জায়গাতে কিছু রহস্য তো থাকবেই। কিছু ভূতুড়ে, ব্যাখ্যার অতীত ঘটনা না হলে এটা তো সত্যি-কারের দুর্গ ই হত না "

এলেন আপত্তি জানাল। "কিন্তু এ বাড়িতে সেরকম কিছুই নেই। এখানে নোংরা কিছুও নেই। আসার পরে সেধরনের কিছু আশাও করে-ছিলাম—আসলে ভূতপ্রেত বা ওধরনের কোন কিছুতে বিশ্বাস না করলেও খুঁৎখুঁৎ আমারও ছিল,—কিন্তু এসে দেখছি অদ্ভুত বা ভয় পাবার মত কিছুই এখানে নেই। সেরকম কিছু যদি আশা করে থাক, তাহলে কিন্তু তোমাকে হতাশ হতে হবে। আসলে এটা খুবই শান্তিপূর্ণ, সুখের জায়গা। এমন কি ছবিগুলিও যেন সুখী , পুরনো প্রতিকৃতিতে সাধারণত যে ধরনের লম্বা, বিষণ্ণ মুখ থাকে সেরকম একখানিও নেই। তোমার মালপত্র কোথায় ?"

"ওহো, সেটা তো গাড়িতেই রয়ে গেছে।"

"আমি নিয়ে আসছি," রব্‌বি বলল , আমিও আপত্তি করলাম না। দীর্ঘ পথ গাড়ি চালিয়ে এসে বেশ ক্লান্ত লাগছে ; বিছানায় এলিয়ে পড়া ছাড়া আর কিছুই এখন চাই না।

এলেনকে সেকথা বলতেই সে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

"দোতলায় চল। বাড়তি ঘরটা সাজানোই আছে, শুধু একটা নতুন বালিশের ওয়াড় লাগালেই হয়ে যাবে, তারপরই সোজা ঢুকে যেতে পারবে। স্নান করবে কি, না সকালে করবে ? সত্যি, তোমাকে খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছে. জলের বোতল, গরম জলের বোতলগুলো যে কোথায় রাখলাম ? ও, হ্যাঁ, মনে পড়েছে, কাপড়ের কাবার্ডের মধ্যে আছে। জ্যানেট, এই হল স্নান-ঘর, আর এটা তোমার ঘর। ঠিক নিজের ঘর বলে মনে করো। আমি যাই, বোতলগুলো ভরে নিয়ে আসি।"

কিছুটা ক্লান্তিতে, কিছুটা বিভ্রান্তিতে, কিছুটা বা এলেনের বক্‌বকানিতে আমার মাথাটা ঘুরছে। এলেনের কথার সঙ্গে সঙ্গেই সিঁড়ি বেয়ে কারও উঠে আসার শব্দ শুনতে পেলাম। "তোমার মালপত্র নিয়ে রব্‌বি আসছে। আরে

এত তাড়াতাড়ি। দরজা বন্ধ করার শব্দও তো শুনতে পেলাম না।" সে ছুটে বারান্দায় বেরিয়ে গেল। বলল, "ওগুলো আমি নিচ্ছি রব্‌বি। জ্যানেট পোশাক ছাড়ছে।" সে দাঁড়িয়ে পড়ল। "আশ্চর্য! এখানে তো কেউ নেই।"

সেই সময় বাইরের দরজাটা সশব্দে বন্ধ হয়ে গেল। রব্‌বির পায়ের শব্দ শোনা গেল। সে সিঁড়ি বেয়ে উঠছে।

এলেন বলে উঠল, "হা ঈশ্বর, আমিও যেন কি সব শুনতে পাচ্ছি। জ্যানেট কারমাইকেল, তোমার সেইসব অদ্ভুত ঘটনাই বোধ হয় ঘটছে। তোমার রোগ দেখছি আমাকেও ধরেছে।"

সে আমার মালপত্র এনে দিল, বেরিয়ে গিয়ে ফিরে এল দুটো গরম জলের বোতল নিয়ে, বিছানার চাদরটা পাল্টে দিল, নরম বালিশে নতুন গোলাপী ওয়াড় পরাল। আমি ততক্ষণে ব্রা ও প্যান্ট পরে ফেলেছি।

"আচ্ছা. তোমাকে শান্তিতে রেখে যাচ্ছি। এটা বেড-লাইটের সুইচ। কাল সকালে খুব তাড়াতাড়ি বিছানা থেকে ওঠার কোন দরকার নেই। যতক্ষণ ইচ্ছা শুয়ে থেকো। শুভ রাত্রি।" সিঁড়িতে খট্‌খট্‌ শব্দ তুলে সে নীচে নেমে গেল।

ক্লান্ত দেহে কোনরকমে পাজামায় পা দুটো ঢুকিয়ে পাশের স্নান ঘরে ঢুকলাম, একটা ভেজা তোয়ালে দিয়ে মুখটা শুধু মুছে নিলাম, তারপর টলতে টলতে এসে নরম বিছানায় শরীরটা এলিয়ে দিলাম। নিশ্চয় আলো না নিভিয়েই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, কারণ কিছুক্ষণ পরে ঈষৎ জাগরণের মধ্যে দেখলাম এলেনের মুখটা আমার মুখের উপর ঝুঁকে আছে; আমার বরফ-ঠাণ্ডা হাতটাকে কম্বলের নীচে গুঁজে দিয়ে সে আলোটা নিভিয়ে দিল।

উজ্জ্বল শিশির-ঝরা সকালে সাড়ে নটায় যখন আমার ঘুম ভাঙল সূর্যের আলো পড়ে টালির ছাদ তখন প্রায় ফাটতে বসেছে। বাইরে নানান পাখি-দের কলকাকলি; আমার জানালার গোবরাটে বসে একটা চড়ুই পাখি মাথাটা এদিক-ওদিক নাড়তে নাড়তে একদৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। কম্বল সরিয়ে ফেলে একলাফে বিছানা থেকে নামলাম; অবশ্য গ্ল্যাস্‌গোতে আমি কখনও এরকম করি না। যা হোক, বেশ খানিকটা বরফ-ঠাণ্ডা জল গায়ে ঢেলে তারপর অনেকক্ষণ ধরে গরম জলে স্নান করে শরীরটা আশ্চর্য রকমের তাজা হয়ে উঠল, আর মনটাও বেশ খুশি হল। আঁটসাট লিলাক কর্ডের ট্রাউজার পরে, পলো-কলারের সাদা নরম সোয়েটার গায়ে দিয়ে, চুলে তার সঙ্গে ম্যাচ-করা লিলাক রংয়ের ফিতে বেঁধে সটান রান্নাঘরে হাজির হলাম।

এলেন তখন নানারকম ভাজা-ভাজিতে ব্যস্ত। একাজে সে যেমন দক্ষ, তেমনই উৎসাহী। আমি কিছু বুঝে ওঠার আগেই তিনটুকরো শূকর-মাংস, দুটো কাবাব ও দুটো ডিম কড়াইতে ভাজা হল। গ্রীলের নীচে টোস্ট ধীরে

ধীরে গরম হচ্ছে, আর আমার ঠিক পাশেই একপাত্র চা ফুটছে।

"এতসব আমি খেতে পারব না," আমি আপত্তি জানালাম।

"নিশ্চয় পারবে। এখন তো গ্রামে এসেছ। বেশ তো, যদি নাই পার তো রব্‌বি আছে। এখানে আসার আগে তার ক্ষিধেই হত না, এখন তো একেবারে ঘোড়ার ক্ষিধে। কিন্তু তোমার ভাল ঘুম হয়েছিল তো? এই শীল নিয়ে এক যন্ত্রণা! আচ্ছা, টোস্টটা একদিকে একটু কাল্‌চে হলে আপত্তি আছে কি? এখন কিন্তু প্রচুর দুধ খাবে।"

কোন কথাই বললাম না। একে তো ফর্ণফ্লেকে আমার মুখ ভর্তি, তার উপর আমি তো জানি কথা বলে কোন লাভ নেই। আর সেও কথাটা মিথ্যা বলে নি, সত্যি, সে যা দিল সব আমি খেয়ে শেষ করলাম। ঘোড়ার ক্ষিধেই বটে! শেষ পর্যন্ত চতুর্থ কাপ চা শেষ করে সিংক-এ গিয়ে পেয়ালা-পিরিচগুলো ধুয়ে এনে বললাম, "আমি একটু সাহায্য করতে পারি কি?" হেসে আমাকে দরজাটা দেখিয়ে দিয়ে সে বলল, "সোজা বেরিয়ে যাও, একটু ঘুরে এস। আমি তো জানি, তোমার মন সেটাই চাইছে। যে দরজাগুলো তালাবন্ধ সেগুলি ফ্রেজারদের ঘর, বাকি যেকোন ঘরেই তুমি ঢুকতে পার।"

"ও. কে.। একটু পরেই ফিরব। ওঃ, ভাল কথা, কাল রাতে কম্বলটা টেনে দেওয়া আর আলোটা নিভিয়ে দেবার জন্য ধন্যবাদ।"

"কম্বল টেনে দেওয়া? কী বলছ তুমি? রব্‌বি ও আমি যখন উপরে উঠে এলাম, তখন তো আলো নেভানোই ছিল; আর এত জোরে তোমার নাক ডাকছিল যে গোটা গ্রামেরই ঘুম ভাঙার যোগাড়—অবশ্য সে গ্রাম এখান থেকে দু মাইল দূরে।"

"কিন্তু—কাল রাতে আমি একবার জেগেছিলাম, কখন তা জানি না, তখন তুমি আমার উপর ঝুঁকে দাঁড়িয়েছিলে। হাতটাকে বাতির দিকে বাড়িয়েই আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, কারণ হাতটা জমে বরফ হয়ে গিয়েছিল, আর তুমি আমাকে ভাল করে ঢেকে দিয়ে আলোটা নিভিয়ে দিয়েছিলে।"

"আমি ওসব কিছুই করি নি। তুমি স্বপ্ন দেখেছ। এখন যাও তো এখান থেকে। লাঞ্চ তৈরি হলেই তোমাকে ডাকব।"

এরপর আর কোন কথা নয়। বাসাবাড়িটা ছাড়িয়ে কার্পেট-মোড়া বারান্দা দিয়ে হাঁটতে লাগলাম। দেয়ালে নানারকমের সব প্রাকৃতিক তৈলচিত্র। বাঁদিকে মোড় ঘুরতেই একটা লম্বা-চওড়া হল ঘর; একদিকে সাতটা লম্বা জানালা দিয়ে আলো এসে ভিতরে পড়েছে, অপরদিকে একগাদা শ্বেত পাথরের মূর্তি। সব মিলিয়ে প্রায় বাটটা হবে। তার মধ্যে গত রাতে দেখা সেই লাজুক উলঙ্গ সুন্দরীকে চিনতে আমার ভুল হল না। তবে এখন নতুন করে লক্ষ্য করলাম যে সব জিনিস ফেলে সে একটা ব্যাঙকে

বুকের কাছে ধরে আছে। আর দেখলাম একজন গ্রীক ক্রীড়াবিদের একটা আশ্চর্য মূর্তি। পায়ে স্যাণ্ডেল; একটা চাকৃতি ছোঁড়ার ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে আছে। বিপরীত দিকে জানালাগুলো তৈলচিত্রে বোঝাই। মনে হল, এ দুর্গের বুঝি এটাই বৈশিষ্ট্য।

এই মূর্তি-বোঝাই ঘরটাতে অনেকগুলো দরজা থাকায় কোন্ দিকে যাব ঠিক বুঝতে পারছিলাম না। এককোণে নজর পড়তে দেখলাম একজোড়া ভারী দরজা রয়েছে; দুটোই বন্ধ। মনে মনে "টস" করে বাঁ-হাতি দরজাটাই বেছে নিলাম। পাল্লা দুটো খুলতেই একটা লম্বা লাইব্রেরি পেয়ে গেলাম। সাহিত্য-জগতের হেন কেউ-কেটা নেই যার আসন সেখানে নেই; আর সকলেই আসীন একরকমভাবে বাঁধাই-করা গ্রন্থাবলীর মাধ্যমে: স্কট, ষ্টিভেন্সন, গ্যেটে, ভল্‌তেয়ার, দুমা, স্তাঁদাল, ইত্যাদি ইত্যাদি; সে জগতের কোন শেষ নেই। কিন্তু এ দুর্গের এটাই একমাত্র ঘর যেখানে কোন তৈলচিত্র দেখলাম না। অবশ্য নানারকম খোদাই করা মূর্তি অনেক আছে। এমন কি সিলিং থেকে এমনভাবে গুচ্ছ গুচ্ছ আপেল, কমলালেবু, বা অন্য সব ফল খোদাই করে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে যে পাছে মাথা ঠুকে যায় এই ভয়ে যেকোন দর্শকই চলতে চলতে মাথা নীচু করতে বাধ্য হবে।

জ্ঞান-সমুদ্রে আরও কিছুক্ষণ ডুবে থাকব, না বাড়িটার অন্য অংশগুলো দেখব—এই কথা ভাবতে গিয়ে শেষের পথটাই বেছে নিলাম। তখনই মৃদু বিস্ময়ে লক্ষ্য করলাম, যে দরজাগুলো আমি খোলা রেখে এসেছিলাম সেগুলো বন্ধ হয়ে গেছে। দরজার কাছে গিয়ে দেখলাম, শুধু যে পাল্লাগুলি বন্ধ হয়েছে তাই নয়, তালাও আটকে গেছে। এতে আমার বিস্ময় বেড়ে গেল। কোনরকম শব্দ করে দরজা বন্ধ হলে আমি অবশ্যই শুনতে পেতাম। দু' একবার পরীক্ষা করেও দেখলাম; দরজা খুলে তারপর ঠেলে দিয়ে ঘরের বিভিন্ন কোণে গিয়ে পিছন ফিরে কান পাতলাম। প্রত্যেক বারেই দরজা বন্ধ হবার শব্দ শুনতে পেলাম। যাই হোক, সারাজীবন আমি এটাই তো চেয়েছিলাম। এলেনও তো বলেছে, ভয় পাবার মত কিছু না থাকলে আমি একটা কিছু বানিয়ে নেই, কিন্তু এখানে বানাবার কোন দরকারই নেই।

দ্বিতীয় দরজা দিয়ে একটা প্রকাণ্ড বৈঠকখানায় ঢুকলাম। দেয়ালে হাল্কা লাল কাগজ মোড়া; ছোট ছোট বিন্দুর মত সুন্দর সব চেয়ার ও টেবিল এখানে-ওখানে পাতা; সেগুলি এত সূক্ষ্ম যে ভয় হয়, হাত দিয়ে ছুঁলেই ভেঙে গুঁড়িয়ে যাবে। শেষ পর্যন্ত সাহসে ভর করে একটা চেয়ারে বসে পড়লাম। চেয়ারটা ছোট ছোট কাঁচের টুকরো দিয়ে তৈরি। অমনি প্রতিটি দেয়াল থেকে দীর্ঘদেহ, সুন্দরী মহিলারা আমার দিকে নাক উঁচিয়ে তাকাল; তাদের কারও হাতে শুকনো গোলাপ, কারও হাতে মাকড়সা-

জালের পাখা নড়ছে।

"আমার দিকে ওভাবে পাখা নাড়বেন না ম্যাডাম!" আমি হঠাৎ বলে উঠলাম। তার হাতের পাখা আবার নড়ে উঠল। ভাল করে তাকালাম। সব স্থির। ছবি কি কখনও পাখা নাড়তে পারে? নিজেকেই শুধালাম। অবশ্যই না। কিন্তু উনি তো নাড়লেন; আমি ঠিক দেখেছি। এটা হয়তো আলোর কারসাজি। আবার চেয়ারে বসলাম। আবার নড়াচড়ার শব্দ; কারা যেন ঘরময় ঘুরছে। দ্রুত মাথা ঘুরিয়ে দেখতে চেষ্টা করলাম, কিন্তু নড়াচড়ার কোন আভাষই পেলাম না। যাই হোক, এ বৈঠকখানায় আর নয়। ঘর থেকে বেরিয়ে দরজা বন্ধ করতেই নিশ্চিত মনে হল, ভিতর থেকে স্বস্তির একটা অস্পষ্ট দীর্ঘশ্বাস যেন শুনতে পেলাম।

আবার সেই মূর্তি-ভর্তি হল-ঘর। তার একেবারে শেষপ্রান্তে একটা চওড়া সিঁড়ি উপরে উঠে গেছে। খানিকটা উঠে একটা অর্ধবৃত্তাকার চাতাল। সেখানকার একমাত্র জানালাটা একেবারেই অকেজো, কারণ নানা গাঢ় রংয়ের রঙিন কাঁচের নীতিকথামূলক মূর্তি দিয়ে সেটা তৈরি, তাই আলোর পরিবর্তে সেখান থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে নানা বিকৃত ছায়া। সিঁড়ির খাম্বাদার রেলগুলি গাঢ় আখরোট কাঠের তৈরি, তাতে নিপুণ হাতে ফুল-লতাপাতা খোদাই করা। একটা নক্সাকে ভাল করে দেখতে উপুড় হতেই একটা প্রকাণ্ড গোলাপের মাঝখানে যক্ষমূর্তির চোখে দুষ্ট কটাক্ষ দেখে চমকে উঠলাম।

পিছনে সরে শরীরের ভারসাম্য বজায় রাখতে হাতটা বাড়িয়েই আবার টেনে নিলাম, আঙুলের ডগায় ধারালো দাঁতের কামড় লাগল যেন। আর একটি যক্ষমূর্তির মুখের যেখানটায় আমার হাত লেগেছিল সেখানকার কাঠ খানিকটা ভেঙে গিয়ে ধারালো দাঁতের মত হয়ে গেছে। এই ভীরুতার জন্য নিজেকেই তিরস্কার করে উপরে উঠতে লাগলাম। তেরোটা ধাপ উঠবার পরেই মনে হল, আমার দুই কাঁধের উপর দিয়ে কে যেন তাকিয়ে আছে। মুখ ফেরাতেই সত্রাশে দেখলাম, শীর্ণ, বিশুষ্ক মুখে দুটি রক্তমাখা হাত বাড়িয়ে লেডি ম্যাকবেথ আমার দিকে এগিয়ে আসছে। ঈষৎ আর্তনাদ করে উঠে পরমুহূর্তেই বুঝতে পারলাম, একটা পূর্ণ দৈর্ঘ্যের জীবন্ত মর্মর-মূর্তির উপর জানালার রঙিন কাঁচের বিচিত্র আলো-ছায়ার ফলেই মূর্তির গতিময়তায় মায়াজাল সৃষ্টি হয়েছে। আবার উঠতে শুরু করলাম। আরও ছাব্বিশটা ধাপের মাথায় সিঁড়িটা শেষ হয়েছে। তারপরেই একটা নাচঘরের ঝকঝকে মেঝে উজ্জ্বল দিনের আলোয় ঝলমল করছে। নাচের ফলে ক্লান্ত জুটিদের বিশ্রামের জন্য দেয়াল বরাবর অনেক সোফা ও চেয়ার পাতা রয়েছে। ঝলমলে কাঁচের ঝাড়-লণ্ঠনে সিলিংটা প্রায় ঢাকা পড়ে গেছে।

"লাঞ্চ!"

ভয়ে আমি কাঠ হয়ে গেলাম ; হাঁপাতে লাগলাম ; বুকের ভিতরে টিপ্-টিপ্ শব্দ হতে লাগল ; হাতটা ভিজে উঠল।

"লাঞ্চ তৈরি জ্যানেট। দেরি করো না।"

মুখ ফেরাতেই যেন দেখতে পেলাম, নাচ-ঘরের একেবারে শেষ প্রান্তে কে যেন দ্রুত পা ফেলে বারান্দা পেরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল। নাড়ির দ্রুতগতিকে কিছুটা শান্ত করে তার পিছু নিতেই এলেনের সঙ্গে দেখা ; সে সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসছে।

"এই যে জ্যানেট। লাঞ্চ তৈরি।"

"আমি জানি। তোমার প্রথম ডাকও শুনতে পেয়েছি।"

"প্রথম ডাক! কী বলছ তুমি? আমি তো একবারই ডেকেছি।"

"তুমি দু'বার ডেকেছ। তাই তো আমি এদিকে আসছিলাম। বড় সিঁড়ি দিয়ে না নেমে তোমাকেই অনুসরণ করছিলাম।

"জ্যানেট, তুমি আবার গুল্ মারতে শুরু করেছ। তুমি আমাকে অনুসরণ করতেই পার না, কারণ আমি তো এইমাত্র এখানে এসেছি। কিন্তু এখন আমাকে অনুসরণ করতে পার। আমি বাজি ধরে বলতে পারি, রব্‌বি এতক্ষণ শুরু করে দিয়েছে। বাব্‌বা! একটা লোক এতও খেতে পারে!" যেপথে এসেছিল, এলেন বক্‌বক্ করতে করতে সেই পথেই ফিরে চলল। "ভাল কথা, সিঁড়িতে লেডি ম্যাকবেথের সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছে কি? ছবিটা খুব সুন্দর, তাই না?"

ঝল্‌সানো হরিণ-মাংস আর বাগানের টাটকা সব্জি দিয়ে তৈরি লাঞ্চ খুবই উপাদেয় লাগল। যে টেবিলে বসে আমরা খেলাম তার অন্যদিকে ডাঁই করা রয়েছে নতুন রুটি, জইয়ের পিঠে, ফল দেওয়া পাউরুটি, বিস্কুট, ডাণ্ডি কেক, আরও কত কি।

"এত অল্প সময়ে তুমি এতসব রান্না করলে কেমন করে?" আমি শুধালাম।

এলেন জবাব দিল, "আমার তো তিনটে উনুন আছে। দুটোতে রান্না চড়িয়ে দিয়ে আর একটার আয়োজন সেরে ফেলি। তোমাকে আর কি দেব?"

"কি বললে?"

"হরিণ-মাংস। একটুখানি নাও ; প্রচুর আছে ফ্রিজ-ভর্তি ; তাছাড়া, শিক-কাবাব, ছাগ-মাংস, শূকর-মাংস তো আছেই। ফ্রিজ-ভর্তি ; ফ্রেজাররা মাংস কেনে একেবারে তাল-তাল।"

"তা বটে," আমি বললাম।

আমার জন্য আরও এক পেয়ালা চা ঢেলে দিয়ে এলেন বলল, "এটা খেয়ে চল একটু বাইরে বেড়িয়ে আসি। তোমার একটু খোলা হাওয়া দরকার।"

ঠাণ্ডার জন্য ভাল করে মুড়ি-সুড়ি দিয়ে কিছুক্ষণ বাগানে পায়চারি করে আমরা পাহাড় কেটে তৈরি অনেকগুলো পিছল সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে গেলাম। সেখানে তিনটে হ্রদের মত তৈরি হয়েছে ; প্রায় একশ' ফুট উঁচু থেকে একটা সরু ঝর্ণা যেন হঠাৎ লাফ দিয়ে পাহাড়ের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসা একটা খাঁজ-কাটা ত্রিকোণ পাথরের জিভের উপর আছড়ে পড়ছে, আর তার ফলে ঝর্ণার ধারাটা দুই ভাগে ভাগ হয়ে দুটো চমৎকার ফোয়ারার সৃষ্টি করেছে।

মুগ্ধ চোখে বেশ কিছুক্ষণ সেই দৃশ্যটাই দেখলাম। একসময় বললাম, "আচ্ছা, এই পাথরের জিভটা কি প্রাকৃতিক, না কি কেউ ওখানে বসিয়ে দিয়েছে ?"

কোন জবাব পেলাম না। মুখ ফিরিয়ে দেখি, এলেন ওপাশে নেই। হঠাৎ কেমন যেন ভয় পেলাম। "এলেন !" হাঁক দিলাম। "এলেন, তুমি কোথায় ?" জবাব দিল শুধুই ঝর্ণার কলধ্বনি। শরীর ঠাণ্ডা হয়ে এল। মনে হল কেউ যেন আমার পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে, ঠিক যেরকম লেডি ম্যাকবেথ এসে দাঁড়িয়েছিল। আমি কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। ধীরে ধীরে কোনরকমে মাথাটা ঘোরালাম ; কিন্তু পাহাড়ের মুখ, গাছপালা ও নৃত্যরতা ঝর্ণাধারা ছাড়া আর কিছুই দেখতে পেলাম না। ভাঙা-ভাঙা গলায় ডাকলাম, "এলেন !"

"এই যে !"

"হা ভগবান !" চকিতে ঘুরে দাঁড়ালাম। দেখলাম, একথোকা নল-খাগড়া হাতে নিয়ে এলেন একটা ঝোপের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসছে।

সকৌতুকে আমার দিকে তাকিয়ে সে আবার বলল, "এই তো আমি।"

"এতক্ষণ তুমি কোথায় ছিলে ?"

"ও:। ফুলদানির জন্য এই নল-খাগড়া নেবার কথা হঠাৎ মনে এল। তাই একটু ঝোপের ভিতর ঢুকেছিলাম। কিন্তু তুমি 'এতক্ষণ' বলছ কেন ?"

"তোমাকে কতক্ষণ ধরে ডাকছি। অন্তত তিনবার ডেকেছি। কোন সাড়া পাই নি। দেখতেও পাই নি। কোথায় গেলে তাও বুঝতে পারি নি।"

"কোন ডাক তো আমি শুনি নি। হয়তো ঝর্ণার শব্দে চাপা পড়েছিল।"

"কিন্তু এখন তো তুমি আমার কথা শুনতে পাচ্ছ ; অথচ আমরা তো একই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছি। আর এখন আমি মোটেই চীৎকার করে কথা বলছি না।"

"ঠিক আছে ; ও নিয়ে মাথা ঘামাবার কিছু নেই। হয় তো উপুড় হবার জন্য আমার কান দুটো ঝর্ণার খুব কাছে চলে গিয়েছিল। তা তুমি আমাকে ডাকছিলে কেন ?"

"এমনি।"

"এবার কি ফিরে যাবে? আমার ঠাণ্ডা লাগছে, তাছাড়া ডিনারের ব্যবস্থাও তো করতে হবে। না কি, তুমি একটু থাকবে?"

"না। আমিও তোমার সঙ্গেই যাব।"

সে গম্ভীর হয়ে আমার দিকে তাকাল। "কী ভয়-কাতুরে মেয়ে।"

আমার সব কথাকেই সে হেসে উড়িয়ে দিচ্ছে দেখে হঠাৎ রেগে গিয়ে আমি বলে উঠলাম, "আমি যা দেখেছি সেসব দেখলে তুমিও ভয় পেতে!"

"ঠিক আছে জ্যানেট। এ নিয়ে মাথা গরম করার কিছু নেই।" হঠাৎ মুখ ঘুরিয়ে সে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগল। বাসাবাড়ির দরজায় পৌঁছনো পর্যন্ত দুজনই নিঃশব্দে হাঁটলাম। দরজার কাছে এসে একটু থেমে বললাম, "আমি দুঃখিত এলেন, ওভাবে কথাটা বলতে আমি চাই নি। আসলে কি জান···আমি এমন সব অদ্ভুত কিছু শুনছি ও দেখছি যা তুমি একেবারেই বিশ্বাস করছ না।"

"আমি বিশ্বাস করি, তুমি অনেক কিছুই শুনছ ও দেখছ বলে ভাবছ, এমন কি সেই শোনা ও দেখার ব্যাপারে তুমি খুবই নিশ্চিত, কিন্তু তোমার কল্পনার বাইরে সেসবের কোন অস্তিত্ব আছে বলে আমি বিশ্বাস করি না। আর তোমার কল্পনা যে নিরংকুশ সেকথা তুমিও জান, আমিও জানি।"

আবার পাল্টা জবাবে আমি কিছু না বুঝেই বলে উঠলাম, "তুমি কি তাহলে মনে কর যে এসবই আমি বানিয়ে বলছি? না কি আমাকে কোন ওঝা দেখাতে হবে?"

"আঃ, চল, চা খাবে চল।"

"চা! ওতে বুঝি সব রোগ সারে—এমন কি তরুণ পাগলামী পর্যন্ত!"

ভুরু তুলে একবার তাকিয়ে এলেন রান্নাঘরে ঢুকল। একপাত্র কড়া চা বানিয়ে একটা পেয়ালা আমার সামনে রেখে টানা থেকে দুটো কালো-সবুজ ক্যাপ্‌সুল বের করে আমার দিকে এগিয়ে দিল।

"ও দুটো কি?" আমি শুধালাম।

"ঘুমের ওষুধ।"

"আমার ওষুধের দরকার নেই। ধন্যবাদ!"

"জ্যানেট, তোমার মনটা বেহালার তারের মত টান-টান হয়ে আছে। এতে মন একটু শান্ত হবে, আর কোন ক্ষতিও করবে না। দোহাই তোমার।"

"ঠিক আছে। তুমি যদি খুশি হও তো নিচ্ছি।"

বাকি দিনটা চুপচাপ কাটালাম। তার মানে, এলেন ও রব্‌বির সঙ্গে সারাক্ষণ থাকলাম, পেট ভরে খেলাম, দূরদর্শন দেখলাম, আর আড্ডা দিলাম। ভিতরে ভিতরে মনটা কিন্তু টান-টান হয়ে কাঁপতেই থাকল।

সেই রাতে বেশ খেয়াল করে বাতিটা নেভালাম, হাতটা কম্বলের নীচে ঢুকিয়ে নিলাম, কিন্তু পুনরায় জেগে দেখলাম, এলেন ঝুঁকে পড়ে বাতিটা

নিভিয়ে দিল, আর আমার হাতটাকে ভিতরে ঢুকিয়ে দিল।

পরদিন প্রাতরাশের পরে সে সম্পর্কে কোনরকম উচ্চ-বাচ্য না করে দুর্গটার বাকি অংশগুলি দেখতে উপরে উঠে গেলাম।

কেমন যেন ভয়-ভয় করছে। অথচ যেরকম একটা অদ্ভুত দুর্গ দেখা আমার সারা জীবনের শখ এটা তো ঠিক সেইরকম দুর্গ। অথচ এখানে এসে কেবলই ভয় পাচ্ছি, কিছুই ঠিক উপভোগ করতে পারছি না। আসলে মুস্কিলটা হচ্ছে, প্রথম দিন সন্ধ্যায় এলেন যখন ভেবেছিল যে রব্‌বি আমার মালপত্র নিযে উপরে উঠে আসছে তখন তার পায়ের শব্দ শোনা ছাড়া আর কোন কিছুই আমি ছাড়া অপর কেউ দেখছেও না, শুনছেও না। তাহলে কি আমারই কোন গোলমাল ?

তখনই মনে পড়ে গেল ফটকের কথা। সে ঘটনার কোন ব্যাখ্যা খুঁজে না পেযে এলেন ও রব্‌বি ব্যাপারটাকে মন থেকে মুছে ফেলেছে, কিন্তু আমি কিছুতেই ভুলতে পারছি না। এলেনের সঙ্গে বেড়াতে বেরিযে পরে আমিও লক্ষ্য করেছি, মাত্র একটা ফটক দিয়েই গাড়ি ঢুকতে পারে, বাকি কোন ফটকই দুই ফুটের বেশী চওড়া নয। তাহলে, আমি ভিতরে ঢুকেছিলাম কেমন করে ?

অনেক পাযের দৌড়ে যাবার শব্দে আমার দিবাস্বপ্ন ভেঙে গেল। চমকে দেখলাম, একটা আবছা মূর্তি আমার পাশ দিয়ে চলে গেল, তারপর আর একটা ; দুজনের মুখেই ছেলেমানুষি খিল্‌-খিল্‌ হাসি। বারান্দা বরাবর একটা দরজা খুলে আবার সশব্দে বন্ধ হযে গেল ; গভীর নৈঃশব্দ্য আবার আমাকে ঘিরে ধরল।

ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে আমি দেয়ালের পাশ দিয়ে এগোতে লাগলাম ; পিঠটাকে সব সময়ই দেয়ালের গায়ে সেঁটে রেখে চললাম যাতে একটা কিছু সব সময়ই আমার পিছনে থাকে। একটা দরজা পেযে পাগলের মত হাতলটা ঘোরাতেই সেটা সবেগে খুলে গেল, আর আমি সটান বেরিয়ে যেতেই আবার সশব্দে বন্ধ হয়ে গেল। কিন্তু আমি ভুল দরজা খুলেছি। আলোকিত বারান্দার বদলে একটা সরু ঘোরানো সিঁড়ির মাথায় পৌছে গেছি। পাথরের দেয়ালের গায়ে একটি মাত্র ফোকর দিয়ে যেটুকু আলো আসছে সেটাও মাঝখানের স্তম্ভটায় ঢাকা পড়ায় পাঁচ পায়ের বেশী নজরই চলছে না। সভয়ে পিছু হটে গেলাম, কিন্তু দরজাটা খুলল না। সেটা সম্পূর্ণ নিশ্চল।

ভয়ে মুখ দিয়ে চীৎকারও বের হল না ; গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে ; দাঁতে-দাঁত লেগে যাওয়ায় ঠোঁট দুটো চেপে বসেছে। বুকের ভিতরটা ধ্বক্‌-ধ্বক্‌ করছে। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম।

কিন্তু পাথরের দেয়ালের ঠাণ্ডায় বুঝি একসময় আমার ভয়ও কেটে

গেল ; বুঝলাম, যেমন করে হোক এখান থেকে আমাকে বের হতেই হবে।

দরজা খুলছে না ; অগত্যা যেখানেই নিয়ে যাক এই সিঁড়িটাই নির্গমনের একমাত্র পথ। বুকে সাহস এনে সেই অন্ধকার ঘোরানো সিঁড়ি বেয়ে নীচে নামতে লাগলাম। চারদিকে নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। তারমধ্যেই ধাপের পর ধাপ পার হয়ে চললাম।

শেষ পর্যন্ত আর একটা দরজা পেলাম, কিন্তু সেটা খুলতেই ইচ্ছা করল না। উপরে একটা বন্ধ দরজা, আর এই ঘোরানো সিঁড়ির শেষ প্রান্তে এক অজ্ঞাত জগৎ—এই দুইয়ের মাঝখানে আমি ফাঁদে আটকা পড়েছি।

হঠাৎ মনস্থির হয়ে গেল। উপর থেকে তালা খোলার ক্লিক ও কব্জার কঁাচ-কঁাচ শব্দ ভেসে এল। সামনের দরজার দিকে ছুটে গিয়ে হাত ঘুরিয়ে একটা বড় পাথরের ঘরে ঢুকে পড়লাম, আর শুনতে পেলাম এই মাত্র যে সিঁড়িটা আমি ছেড়ে এলাম কে যেন সেই সিঁড়ি বেয়ে নীচে নামছে। আমিও সেখান থেকে বের হতে ছুটাছুটি শুরু করলাম। একপ্রান্তে একজোড়া ভারী দরজা চোখে পড়ল, কিন্তু দুটোই আগা-গোড়া ভারী হুড়কো দিয়ে আটকানো। এককোণে আর একটা ছোট দরজা চোখে পড়ল ; সেখানে ছুটে গেলাম. টানলাম, ধাক্কা দিলাম, লাথি মারলাম। সেটাও তালাবদ্ধ।

ঘোরানো সিঁড়ির নীচে একটা ছোট দরজা দেখতে পেলাম। শব্দটা প্রায় সেখানে পৌঁছে গেছে। একটা পা দেখতে পেয়েই মুখের মধ্যে হাতটা পুরে দিয়ে চীৎকার করে উঠলাম।

"ঈশ্বরের দোহাই জ্যানেট, আমি!" অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এল এলেন। "দরজায় তোমার ধাক্কার শব্দ শুনেই আমি তোমাকে বের করে দিতে এসেছি। এই দরজাটা সম্পর্কে তোমাকে সতর্ক করে দেওয়ার কথাটা আমার মনে ছিল না। তালাটা ভাঙা। অনেকসময়ই ঠিক মত কাজ করে, আবার প্রায়ই জ্যাম হয়ে যায়। রব্‌বি বলেছে একটা নতুন তালা এনে লাগিয়ে দেবে। তুমি ঠিক আছ তো?

"হঁা, এখন ঠিক আছি," জবাব দিলাম। "কিন্তু উপর থেকে তো তুমি আমার দরজায় ধাক্কা দেওয়ার শব্দ শুনতে পার না, কারণ তখন আমি ধাক্কা মারি নি। এতক্ষণ আমি ভীষণ ভয় পেয়েছিলাম। এই দরজাটায় লাথি মেরেছি ঠিকই, কিন্তু তখন তো তুমি নীচেই নেমে আসছিলে।"

"দেখ. দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দটা আমি নিশ্চয় শুনেছি। লাঞ্চের সময় যখন তোমার খোঁজ করেছিলাম তখনও শুনেছিলাম। এই হল-ঘরটার ভিতর দিয়েই তো মূল প্রবেশ-পথ। ঘরটাও চমৎকার। মূর্তিগুলোর গায়ের বর্ম-চর্ম আলোয় ঝিকমিক করে। আলো জ্বললেই সেটা দেখতে পাবে। সবকিছুই ঝল্‌মল্ করে ওঠে। ছবিগুলো সব জীবন্ত হয়ে ওঠে। কিন্তু না, এসব কথা বলা বোধ হয় ঠিক হল না।"

কাঁপা গলায় বললাম, "না বললেই ভাল করতে। কিন্তু আমরা কোন্ পথে বের হব ?"

"যেপথে এসেছি। আমিই তো ধাক্কা মেরে দরজাটা খুলেছি।"

"ওই পথেই যেতে হবে ?"

"ওটাই তো একমাত্র পথ—অবশ্য তুমি যদি এখানে অপেক্ষা করতে চাও তো আমি উপরে উঠে, বারান্দা পেরিয়ে, নাচঘরের ভিতর দিয়ে, সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে ঐ দরজাটা খুলে দিতে পারি। এতক্ষণ যে দরজাটা খুলবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছিলাম সেটাই সে হাত বাড়িয়ে দেখাল। "এই সিঁড়িটা দিয়ে বাসাবাড়ি ও নীল রংয়ের বৈঠকখানার মধ্যবর্তী বারান্দায় পৌঁছনো যায়।"

সাহস সঞ্চয় করে বললাম, "আমি · আমি তোমার সঙ্গেই যাব। কিন্তু আমরা তিনজন হলে ভাল হত।"

"কেন ?"

"তাহলে আমি মাঝখানে থাকতে পারতাম।" হাল্কাভাবে হাসতে চেষ্টা করলেও গলাটা কেঁপে উঠল। "তুমি আগে যাও।"

এলেন পা বাড়াল, আর আমিও মাঝখানেই রইলাম। আবার পিছনে পা ফেলার শব্দ দুজনই শুনতে পাচ্ছিলাম। এলেন যথারীতি সেটাকে আমাদের পায়ের শব্দ-বিভ্রম বলেই উড়িয়ে দিল, কিন্তু আমি ভাল করেই জানি যে একজন কেউ আমার ঠিক পিছনেই আসছে, তাতে আমার অস্বস্তির সীমা নেই, কিন্তু পাছে পুনরায় এলেন দৃষ্টির বাইরে চলে যায় সেই ভয়ে পিছন ফিরে তাকাতেও পারছি না।

তারপর থেকে কয়েকটাদিন আমি এলেনের পায়ে-পায়েই কাটাতে লাগলাম। একবার তার সঙ্গে সঙ্গে স্নানঘরেই ঢুকে পড়েছিলাম। তাতে এলেন হাসবে কি ভুরু কুঁচকাবে তাই বুঝতে পারল না। শেষ পর্যন্ত সে আমাকে বাগানে বেড়াতে পাঠিয়ে নিজের কাজকর্মে মন দিল। আমিও বেরিয়ে গেলাম।

মূল ফটক থেকে প্রায় সিকি মাইল দূরে গাড়ি চলার পথের মাঝখানে দাঁড়িয়েছিলাম। বাতাসে আমার চুল উড়ছে। বিরাট ডগলাস ফার গাছগুলো ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ সাগরের বুকে উঁচু মাস্তুলের মত প্রবল বেগে আন্দোলিত হচ্ছে। এমন সময় দুর্গের দিক থেকে একটা অস্পষ্ট চীৎকার ভেসে এল। চীৎকারটা ভাঙা-ভাঙা, কথাবিহীন, যেন বাতাসের চাবুক বক্তার মুখ থেকে কথাগুলি গড়ে ওঠার আগেই তাকে সজোরে ছিনিয়ে নিয়ে এসেছে। মুখ ফিরিয়ে দুটো হেমলক গাছের ফাঁক দিয়ে দেখতে পেলাম, একটি মূর্তি দুর্গের ছাদের উপর দাঁড়িয়ে আছে। মূর্তিটা পাগলের মত হাত ছুঁড়ছে, আর আমার মনোযোগ আকর্ষণ করতে সমানে লাফাচ্ছে। পরক্ষণেই চিনতে পারলাম,

বাতাসে ভেসে-আসা সে চীৎকার এলেনের।

"জ্যানেট···শিগ্‌গির···রব্‌বি···পা ভেঙেছে···জ্যানেট···তাড়াতাড়ি এস···"

ছুটতে ছুটতে ফটকে পৌঁছে হাঁপাতে লাগলাম; এলেনও সবেগে উঠোন পেরিয়ে আমার দিকে ছুটে এল।

"কি হয়েছে এলেন? রব্‌বি আঘাত পেয়েছে?"

"কি বলছ জ্যানেট?"

পরস্পরের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে দুজনই থেমে গেলাম।

বললাম, "তুমি তো ছাদ থেকে আমাকে ডাকলে।"

এলেন পাল্টা বলল, "আমি তো উপরের জানালা থেকে তোমাকে দেখলাম; শুনলাম, তুমি আমাকে ডাকছ।"

"আমি তো ডাকি নি," অস্বীকার করলাম।

"আমিও ডাকি নি।"

কয়েকটি দীর্ঘ মুহূর্ত আমরা পরস্পরের দিকে তাকিয়ে রইলাম। এলেনের বাদামী চোখে যেন অনিশ্চয়তার ঈষৎ ঝিলিক দেখতে পেলাম। সে কি যেন বলতে যাবে এমন সময় রব্‌বি শব্জি-বাগানের কয়েকটা ধাপ পেরিয়ে ছুটতে ছুটতে এসে হাজির হল।

চীৎকার করে বলল, "ব্যাপারটা কি? কি হয়েছে?"

দুজনেরই দৃষ্টি রব্‌বির দিকে ঘুরে গেল।

"আচ্ছা, কি হয়েছে? তুমি ভাল আছ তো এলেন? ঈশ্বরের দোহাই, যে কেউ আমার কথার জবাব দাও! দুজনই এমনভাবে চেঁচাচ্ছিলে কেন?"

"আমরা মোটেই চেঁচাই নি," এলেন ফিস্‌ফিস্ করে বলল।

"আঃ, বাজে কথা রাখ! আমি নিজের কানে শুনেছি। তুমি চেঁচাচ্ছ ছাদের উপর থেকে, আর জ্যানেট চেঁচাচ্ছে পথের উপর থেকে। তারপর দুজনই আমাকে ডাকতে লাগলে। তাই তো আমি এলাম। কি হয়েছে?"

"কিচ্ছু হয় নি রব্‌বি···"

"তাহলে আমাকে ডাকলে কেন?"

আমি বললাম, "আমরা তোমাকে ডাকি নি। দুজনই একে অপরকে ডাকতে শুনে ছুটে এসেছি। এখানে দেখা হতেই জানতে চেয়েছি ব্যাপার কি। কিন্তু আমরা কাউকে ডাকি নি; না তোমাকে, না অন্য কাউকে।"

"এমন তাজ্জব কথা জীবনে শুনি নি!" রব্‌বি বলে উঠল। "দেখ জ্যানেট, আমরা জানতাম তুমি এ বাড়িতে এসে অনেক কিছু শুনবে, অনেক কিছু দেখবে; এখন দেখছি সে রোগ আমাদেরও ধরেছে। আমাদের একটু কিছু গলায় ঢালা দরকার।" আমাদের দুজনের গলায় দুই হাত রেখে সে আমাদের নিয়ে রান্নাঘরে ঢুকল। আমাদের দুজনকে বসিয়ে এক বোতল

হুইস্কি বের করে তিনটে বড় গ্লাসে ঢালল।

সকলেই নিশ্চুপ। একসময় আমি বললাম, "আমার বোধহয় এখান থেকে চলে যাওয়া উচিত"

রব্‌বি ও এলেন সমস্বরে বলে উঠল, "পাগলামি করো না জ্যানেট।" আর তাতেই নিস্তব্ধতা কেটে গেল! নানারকম বিষয় নিয়ে আমরা খোশ-মেজাজে গল্প শুরু করে দিলাম। এলেন একপাত্র সর্বরোগহর চা তৈরি করল, আমরা কেক ও বিস্কুট চিবিয়ে লাঞ্চের ক্ষিধের বারোটা বাজিয়ে দিলাম, রব্‌বি তার কাজে ফিরে গেল।

প্রায় দশ মিনিট ধরে আমি ও এলেন গ্লাসগোর পুরনো বন্ধুদের কথা বললাম; তারপরেই একসময় কথা ফুরিয়ে গেল। এটা-সেটা বলবার পরে একসময় এলেন মাথা তুলে গম্ভীর গলায় বলল, "আচ্ছা জ্যানেট, ভূত-প্রেত সম্বন্ধে তুমি কি জান? আজে-বাজে গাল-গল্প নয়, সে সম্পর্কে তোমার সত্যিকারের ধারণাটা কি?"

"কিচ্ছু না। সত্যি কিচ্ছু না। এবিষয়ে অনেক পড়াশুনা করেছি বটে, কিন্তু সত্যিকারের কোন অভিজ্ঞতা কখনও হয় নি। বরং বলতে পারি, এই প্রথম বুঝি সেধরনের কিছু অভিজ্ঞতা হল। তোমাকে সত্যি কথাই বলব: প্রতিটি মুহূর্তকে উপভোগ করার আশা নিয়েই এখানে এসেছিলাম, কিন্তু তার বদলে এখন দেখছি আমি ভীষণ ভয় পেয়ে গেছি। এতকাল দুর্গ সম্পর্কে যে-সব স্বপ্ন দেখেছি এ বাড়িটা ঠিক সেইরকম, তবু কল্পনার সেই রহস্য-রোমাঞ্চের অনুভূতি যেন খুঁজে পাচ্ছি না। শুধুই রক্ত-জমানো ভয় আর ভয়। তোমাদের এই পাহাড়ি বাড়িটাকে যত ভাল লাগবে বলে ভেবেছিলাম মোটেই সেরকম লাগছে না।"

"তাই বলে তুমি এখান থেকে চলে যাবার কথা ভাবছ না তো?" এলেনের কথা শুনে আমি চমকে তাকালাম; তার চোখে মুখে ভয়ের একটা স্পষ্ট ছাপ। তাড়াতাড়ি বললাম, "না, না, আমি তো থাকছি। দুধ ও কাগজ তো এক মাসের জন্য বন্ধ করে দিয়ে এসেছি। কাজেই এখনই ফিরে যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না।"

পরের সপ্তাহটা আমরা দুজন সবসময় পাশাপাশি থেকে কাটালাম; শুধু শোবার সময় যে যার ঘরে চলে যাই। কিন্তু সে যে এখনও রোজ রাতে আমার ঘরে আসে, আমার হাতটা কম্বলের নীচে ঢুকিয়ে দেয়, ঘরের আলো নিভিয়ে দিয়ে চলে যায়—এসব কথা কিছুই তাকে বলি না। দু'জনে মিলে ঘরদোর পরিষ্কার করি, বিছানাপত্তর রোদ্দুরে দেই, চীনামাটির বাসনগুলি ধুই, রূপোর বাসনগুলি পালিশ করি; এককথায়, যতটা সম্ভব কাজকর্মের মধ্যেই ডুবে থাকি।

এখানে আসার দ্বিতীয় বৃহস্পতিবার এলেন কাজের মাঝখানে বলল,

"দেখ জ্যানেট, তুমি তো এখানে কেবল থালাবাসন ধুয়ে সময় কাটাতে আস নি, এসেছ ছুটি ভোগ করতে। এখন তো আর ভয়ের কিছু নেই; কোনরকম আজেবাজে আওয়াজও আর শোনা যাচ্ছে না, কাজেই তুমি একবার ছাদে উঠে গ্রামের চারদিকের দৃশ্যটা দেখে এস। তোমার খুব ভাল লাগবে।"

তার কথামত প্রাতরাশের পরেই ছাদে উঠে গেলাম। হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ শেওলা-ঢাকা একটা পাথর চোখে পড়ল। ভাল করে নজর করতেই মনে হল, তার উপর যেন কিছু লেখা আছে। হাঁটু ভেঙে বসে নখ দিয়ে শেওলা ও ময়লা সরিয়ে দিতেই দেখতে পেলাম, সেখানে লেখা আছে—অ্যাডাম ম্যাক্‌ভাইকার, তারিখ ১৮০৯। এখানে হঠাৎ অ্যাডাম ম্যাক্‌ভাইকারের নাম খোদাই করা কেন? সে কি এই দুর্গেরই কোন সাধারণ কর্মচারি যে ফ্রেজার-পরিবারের কোন মেয়ের প্রেমে পড়ে খুন হয়েছিল? হঠাৎ মনে পড়ল, এলেন বলেছিল যে ১৮০৯ সালে এই দুর্গের নির্মাণকার্য শেষ হয়েছিল। তাহলে কি অ্যাডাম ম্যাক্‌ভাইকার একজন রাজমিস্ত্রি? পাথরে নিজের নাম খোদাই করে চির স্মরণীয় হয়ে থাকার বাসনা কি জেগেছিল তার মনে? হায়রে দুরাশা!

বসে বসে এইসব ভাবছি, এমন সময় ছাদের অদূরে একজোড়া পায়ের শব্দে চমকে উঠলাম। হেঁটে চলার শব্দ। একজন হাঁটছে বীর, দীর্ঘ পদক্ষেপে, আর একজন হাঁটছে অস্পষ্ট পদক্ষেপে, ঈষৎ খস্‌খস্‌ শব্দ করে।

পায়ের শব্দ ক্রমেই এগিয়ে আসছে। কানে আসছে অস্পষ্ট গুঞ্জন। তার কিছু কিছু অর্থও বুঝতে পারলাম। নরনারীর ভীরু প্রেমালাপ। একটি চুম্বনের শব্দও কানে এল। ঈষৎ আপত্তি ও খুশির নিঃশ্বাস। পদশব্দ সরে যেতে লাগল।

এতক্ষণে সাহসে ভর করে উঠে দাঁড়ালাম। জুতোর গোড়ালিতে ঘসা লেগে একটা শব্দ হল। সঙ্গে সঙ্গে মনে হল, ভারী পায়ের শব্দটা আমার দিকে এগিয়ে এল।

সরোষে বলে উঠল, "কে ওখানে? বেরিয়ে এস! মুখটা দেখাও। আমার উপর এভাবে নজর রাখা আমি বরদাস্ত্‌ করব না। বেরিয়ে এস!"

ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে আমি আরও গুঁড়ি মেরে মুখটা লুকিয়ে ফেললাম। পায়ের শব্দ আমার পাশে এসে থামল।

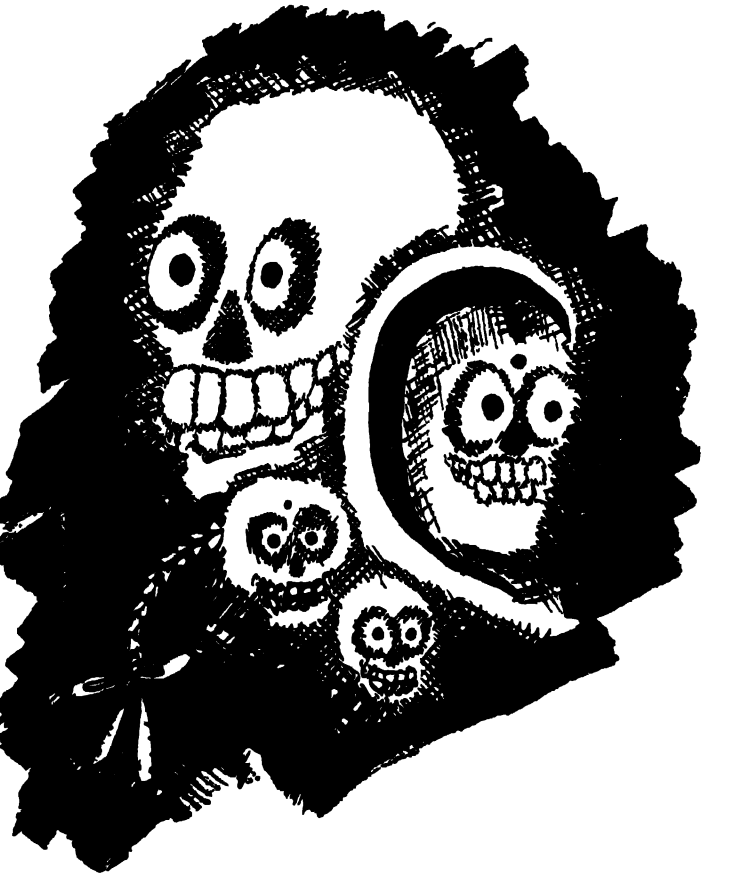
কণ্ঠস্বর আবার বলে উঠল, "কে তুমি?···কী আশ্চর্য, এইমাত্র একটা শব্দ কানে এল। অথচ কেউ কোথাও নেই। ধুত্তোর!"

পায়ের শব্দ ছাদের বুকে মিলিয়ে গেল। ভয়ে টলতে টলতে কোনরকমে ছাদ থেকে নেমে রান্নাঘরের বারান্দায় পৌঁছেই আমি অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলাম।

জ্ঞান ফিরে এলে দেখলাম, এলেন আমার উপর ঝুঁকে বসে আছে, আমার মুখে আস্তে আস্তে চাপড় মারছে, ভয়ে তার মুখ সাদা হয়ে গেছে।

"কি হয়েছিল জ্যানেট ?"

থেমে থেমে তাকে ছাদের সব ঘটনাটাই বললাম। শুনে এলেন অসহায়ের মত কেঁদে উঠল। চোখের জলে তার দুই গাল ভেসে যেতে লাগল; উলের গোলাপী জামাটা ভিজে গেল। তখন আমিই কোনরকমে উঠে বসে



তাকেই পাল্টা সান্ত্বনা দিতে লাগলাম। অনেক কষ্টে তার কান্না থামালাম। ভেজা রুমালটা দিয়ে বারবার মুখ মুছতে মুছতে সেও এবার আমাকে শোনাল আর এক বিস্ময়কর কাহিনী।

"তুমি তো ছাদে উঠে গেলে। আমি ময়দাটা মাখতে বসেছি এমন সময় দরজাটা শব্দ করে খুলে গেল। মুখ ফিরিয়ে দেখি, কেউ কোথাও নেই, দরজাটা বন্ধ। ভয় পেলাম। বুকটা কেঁপে উঠল। তখনই শুনতে পেলাম,

একটা পায়ের শব্দ টেবিলের দিকে এগিয়ে আসছে। আমি সরে গেলাম। একটা কিছু রাখার শব্দ হল, ডিসের ঠুক্‌ঠাক্ আওয়াজ, মেঝের উপর চেয়ার টানার শব্দ, কে যেন চেয়ারে বসল। ক্যাঁ-চ্ করে একটা শব্দও হল। রান্না-ঘরে আমি একা,—না, সঙ্গে এমন একজন যাকে দেখতে পাচ্ছি না। আমি একেবারে কিংকর্তব্যবিমূঢ়।

"কিছুক্ষণ চুপচাপ! ভাবলাম, যেন কিছুই হয় নি এমনিভাবে যা কর-ছিলাম তাই করে যাওয়াই ভাল। তাই আবার ময়দাটা মাখতে বসলাম, আর তখনই হঠাৎ ··হায় ঈশ্বর! কী ভয়ংকর! ওঃ জ্যানেট! এখানে এসব কী ঘটছে?"

"হঠাৎ কি এলেন? কি ঘটল?"

এলেন ঢোক গিলে বলল, "আরও কিছুটা ময়দা নেবার জন্য হাত তুলতেই দেখি · দেখি···আরও ·আরও এক জোড়া হাত ময়দাটা মাখতে শুরু করেছে! আমি স্পষ্ট দেখলাম! মানে, কোন মানুষ দেখতে পেলাম না, কিন্তু ময়দার তালের উপর আঙুলের ছাপ দেখলাম, তালটাকে সুকৌশলে ওঠানো-নামানো করতে দেখলাম। সে যেই হোক কাজটা খুব ভালই জানে। আরও বুঝতে পারলাম, সে যেই হোক না কেন দাঁড়িয়ে আছে ঠিক যেখানে আমি দাঁড়িয়েছিলাম। আর কালবিলম্ব না করে আমি ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে গেলাম ছাদের দিকে তোমাকে খুঁজতে। বেরিয়েই দেখি তুমি এখানে সটান মেঝেতে পড়ে আছ। জ্যানেট, আমি ভয় পেয়েছি, ভয়ে কাঠ হয়ে যাচ্ছি।"

বললাম. "চল, দুজনে রব্‌বিকে খুঁজে দেখি। সে এলে আমরা দুজনই অনেকটা স্বস্তি পাব।" এলেনকে ধরে তুলে দিলাম। দুজনে চুল ও পোশাক ঠিক করছি এমন সময় একধাক্কায় ও-পাশের দরজাটা খুলে রব্‌বি এসে হাজির। তাকে দেখেই দুজন একসঙ্গে আর্তনাদ করে উঠলাম; বোবার মত হাঁ করে তার দিকে তাকিয়ে রইলাম।

"হচ্ছেটা কি?" সে সদর্পে বলল। আমরা তো নিশ্চুপ। সে বলল, "উনুনে কি পুড়ছে?"

"পুড়ছে?" আমি বললাম।

"হ্যাঁ, পুড়ছে। রান্নাঘরের জানালা দিয়ে গল্‌গল্ করে ধোঁয়া বেরুচ্ছে। আমি বাগান থেকে দেখেছি। ব্যাপার কি?"

এলেন ও আমার মুখে তখনও কথা ফুটল না। দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে রব্‌বি আমাদের দুজনকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে রান্নাঘরের দিকে ছুটে গেল। দরজাটা খুলতেই একটা মিষ্টি-মিষ্টি পোড়া দম বন্ধ করা ধোঁয়া এসে আমাদের নাকে লাগল।

"আমার পুডিং।" চেঁচিয়ে বলে উঠল এলেন। দুজনই ছুটে গেলাম।

রব্‌বি সবগুলি জানালা কপাট খুলে দিল। আমরা দুজন তোয়ালে

নেড়ে ঘন ধোঁয়া বের করে দিতে লাগলাম। টেবিলটার দিকে আঙুল বাড়িয়ে সভয়ে আর্তনাদ করে উঠে এলেন আমাকে জড়িয়ে ধরল। মাখানো ময়দাটা সুন্দর করে টেবিলের একপাশে সাজানো রয়েছে। দেখেই বোঝা যায়, টেবিলটা কেউ পরিষ্কার করে রেখেছে, ময়দা-মাখার বড় পাত্রটাকে ধুয়ে-মুছে রেখেছে। এলেন ও আমি ভূত-দেখার মত সেইদিকে তাকিয়ে রইলাম। রব্‌বি অবশ্য অবাক হবার মত কিছুই দেখতে পেল না।

"উনুনে কি চাপানো আছে?" সে শুধাল। "যাই থাকুক সেটা এতক্ষণে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। সপাটে দরজাটা খুলে সে উনুনের উপর থেকে ট্রে-ভর্তি পুডিংগুলো নামিয়ে আনল। ততক্ষণে সব পুড়ে আংরা হয়ে গেছে।

"তুমি এখনও ইলেকৃট্রিক কুকার ব্যবহার করতেই শেখ নি?" রেগুলেটারে ৬৫০ ডিগ্রি দেখিয়ে সে হাসতে হাসতে বলল।

তাড়াতাড়ি রেগুলেটারের সুইচটা ঘুরিয়ে দিয়ে এলেন বিড়বিড় করে বলল, "আমি তো কুকার জ্বালাই নি। নিশ্চয় সে জ্বালিয়েছে।"

"কে? জ্যানেট?" রব্‌বি মুচকি হাসল। "জ্যানেট কারমাইকেলকে পুডিং বানাতে দেওয়া তোমার উচিত হয় নি।"

"না। জ্যানেট নয়; ও তো তখন ছাদে ছিল। আমি বলছি যে ময়দা মাখতে বসেছিল তার কথা।" বলেই এলেন আবার কাঁদতে শুরু করে দিল।

স্বামী এলেনকে শান্ত করতে লাগল। সেই ফাঁকে এলেন আমাকে যা যা বলেছিল, আর আমি নিজে যাকিছু শুনেছি সব তাকে বললাম।

সে কিন্তু ব্যাপারটাকে মোটেই হাল্কাভাবে নিল না। বলে উঠল, "ব্যাপারটা ক্রমে হাসি-ঠাট্টার সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। আমি জানতে চাই, এসব রহস্যময় ঘটনার জন্য কে দায়ী?" রব্‌বি আমার দিকে তাকাল।

আমি বললাম, "শোন রব্‌বি, আমি নিজেই ভয় পেয়ে গেছি। একটু-আধটু ঠাট্টা-তামাসা আমি পছন্দ করি তা ঠিক, কিন্তু তাই বলে এরকমটা কখনও করি না। আমি তো বুঝতেই পারছি না এসব কেন হচ্ছে, আর আমি এখানে আসার পর থেকেই বা কেন হচ্ছে। আমি তো এখান থেকে চলে যেতেই চেয়েছিলাম; তোমরা যদি চাও ···"

বিষণ্ণভাবে ঘাড় নেড়ে রব্‌বি বলল, "না, না, তুমি এখান থেকে চলে যাও সেটা আমি চাই না জ্যানেট। শুধু আগাগোড়া ব্যাপারটাই কিছু বুঝতে পারছি না; কেবলই মনে হচ্ছে এসব কিছুর নাটের গুরু একজন কেউ আছে। কে সে? আমি···আমি তোমাকে দোষ দিচ্ছি না জ্যানেট, তুমিও যে কতখানি ভয় পেয়েছ তা তো আমি দেখেছি।"

অন্যসব রাতের মতই সেদিন রাতেও এলেন আমার ঘরে এল, আমার উপর ঝুঁকে পড়ে আলো নিভিয়ে দিল, আমার ঠাণ্ডা হাতটা ঢেকে দিল। যথারীতি সকালে সেবিষয়ে আমি কোন কথাই বললাম না। কিন্তু সেদিন

এলেনকে যেন একটু মেজাজে দেখতে পেলাম। রব্‌বি বেরিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সে আমাকে শুধাল, তাদের শোবার ঘরে আমি কেন গিয়েছিলাম, আর ঘরের আলোটাই বা জ্বালানো ছিল কেন? আমি নীরবে তার দিকে তাকালাম।

অবশেষে বললাম, "একথা রব্‌বি জানে?"

"না; তাকে বলি নি; এ নিয়ে তাকে আর বিরক্ত করতে চাই নি। কিন্তু ব্যাপারটা কি? তুমি কি ঘুমের মধ্যে হাঁটছিলে, না কি কোন কিছু দেখে ভয় পেয়েছিলে? আমার তখন এত ঘুম পেয়েছিল যে তোমাকে কোন রকম সাহায্যই করতে পারি নি; সেজন্য দুঃখিত। এখন সব ঠিক আছে তো?"

"আছে। সব ঠিক আছে, শুধু কাল রাতে তোমাদের ঘরে আমি যাই নি।"

"নিশ্চয় গিয়েছিলে। আমি স্পষ্ট দেখতে পেলাম তুমি আমার উপর ঝুঁকে আছ, তারপর বাতিটা নিভিয়ে দিলে।"

"ঠিক যেরকম এখানে আসার পর থেকে প্রত্যেকটি রাতে তুমি আমার উপর ঝুঁকে পড়ে বাতিটা নিভিয়ে দাও। তোমার নিশ্চয়ই মনে আছে, প্রথম দিন সকালেই কথাটা তোমাকে বলেছিলাম? তারপর থেকে প্রতিটি রাতেই কিন্তু সেটা ঘটেছে। এসব কথা তোমাকে বলি নি তার কারণ প্রথমত তুমি বা রব্‌বি কেউই আমার কথা বিশ্বাস করতে না, আর দ্বিতীয়ত তুমিও যখন এইসব শুনতে আরম্ভ করলে তখন তোমার ভয়কে আরও বাড়াতে আমি চাই নি। কিন্তু একটা কথা ঠিক যে কাল রাতে তোমাদের ঘরে আমি যাই নি।"

তারপর দুজনে চুপচাপ প্রাতরাশের বাসনগুলি ধুলাম; এলেন যথারীতি রান্নার কাজে মন দিল, আর আমিও উপরে উঠে গেলাম। আমার ঘরটা পরিষ্কার করে খানকয়েক চিঠি লিখতে বসলাম।

প্রায় এক ঘণ্টা পরে শেষ চিঠির খামটা জিভ দিয়ে ভিজিয়ে আঁটতে আঁটতে নীচে নেমে রান্নাঘরে গেলাম এলেনকে দেখতে। এ কি! এলেন মেঝেতে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে; ময়দা, ডিম সব চারদিকে ছড়ানো। তাড়াতাড়ি একটা তোয়ালে ঠাণ্ডা জলে ভিজিয়ে তার মুখ ও গলা মুছে দিলাম। ধীরে ধীরে তার জ্ঞান ফিরে এল। চোখের পাতা খুলল, কিন্তু আমাকে চিনতে পারল না। বরং আরও জোরে কাঁদতে লাগল, আর সজোরে আমাকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে আর্তকণ্ঠে রব্‌বিকে ডাকতে লাগল। তাকে শান্ত করতে তার গালে চাপড় দিলাম; শেষ পর্যন্ত আর্তনাদ থামিয়ে সে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল, আর হিক্কা তুলতে তুলতে দুর্বল গলায় ডাকতে লাগল, "রব্‌বি, রব্‌বি, আমাকে বাড়ি নিয়ে চল। ও রব্‌বি, আমাকে বাড়ি নিয়ে চল।"

"কি হয়েছে এলেন ? কি হয়েছে ?"

"আমাকে বাড়ি নিয়ে চল রব্‌বি ; দোহাই তোমার, আমি বাড়ি যেতে চাই।" এর বেশী কিছু তার মুখ থেকে বের করা গেল না। তার ভেঙে-পড়া দেহটাকে কোনরকমে দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসিয়ে রেখে রব্‌বির খোঁজে বেরিয়ে গেলাম। অনেক খুঁজলাম, অনেক ডাকাডাকি করলাম, কোথাও তার দেখা পেলাম না। ওদিকে এলেনকে একা রেখে এসেছি। কি করব বুঝতে না পেরে বাগানের এক কোণে দাঁড়িয়ে আছি, এমন সময় একটা ঘন ঝোপের আড়াল থেকে চাপা ফোঁপানির আওয়াজ কানে এল। ভয় পেলাম। ব্যাপারটা অলৌকিক কিছু নয় ; মানুষের কণ্ঠস্বর , ঝোপের আড়ালে কে যেন কাঁদছে।

কান্নার শব্দ লক্ষ্য করে ছুটে গেলাম। ঝোপটার গোলক-ধাঁধা পেরিয়ে হঠাৎ সবিস্ময়ে দেখলাম, ভয়ার্ত শিশুর মত কাঁদতে কাঁদতে রব্‌বি অন্ধের মত ঝোপটাকে হাতড়ে বেড়াচ্ছে। তার মুখটা লাল, চোখ দুটো ফুলে উঠেছে। নাম ধরে ডাকতেই সে ধীরে ধীরে চোখ ঘুরিয়ে আমাকে দেখেই কর্কশ, তার-স্বরে চীৎকার করে উঠেই অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে গেল।

আমি তো হতভম্ব। কি করি এখন ? কয়েকমিনিট রব্‌বির জ্ঞান ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করলাম ; কোন ফল হল না। তাকে বয়ে নিয়ে যাওয়াও আমার পক্ষে অসম্ভব। অগত্যা দুর্গে ফিরে গিয়ে গ্রামের ডাক্তারকে টেলিফোন করলাম।

ডাঃ স্ট্র্যাদার্ন এসে পৌছবার আগেই শিকাররক্ষক জিম কের-এর সাহায্যে তাকে কোনরকমে রান্নাঘরে নিয়ে গেলাম। এলেন তখনও সেই একইভাবে দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসে আছে, আর বারবার বাড়িতে নিয়ে যেতে বলছে। দুজনেরই আকস্মিক আতংকের দরুণ প্রাথমিক চিকিৎসা করে বিছানায় শুইয়ে দেওয়া হল। তারপর ডাক্তার আমার সঙ্গে কিছু কথা বলতে চাইলেন।

"বলুন তো মিস · "

"কারমাইকেল।"

" · মিস্ কারমাইকেল, ওদের কি হয়েছিল সেবিষয়ে কিছু কি জানতে পেরেছেন ?"

"না ডাক্তার। আপনি এসে যেরকম দেখেছেন আমিও সেইভাবেই পেয়েছি।"

"আপনার কি ধারণা ?"

"একটা মোটামুটি ধারণা করতে পারছি। আসলে, যা ঘটেছে সেটাই আপনাকে বলতে পারি, যদিও সেটা যে ঠিক কি তা আমিও জানি না।"

"দয়া করে সব কথা খুলে বলুন মিস কারমাইকেল।"

গত কয়েকদিনের অদ্ভুত ঘটনাগুলি তাকে পরপর বলে গেলাম। শুনতে শুনতে তিনি থুত্‌নিতে হাত বুলোতে বুলোতে গম্ভীর মুখে কি যেন ভাবলেন।

বললেন, "অদ্ভুত কথা তো মিস কারমাইকেল, সত্যি খুব অদ্ভুত। এ দুর্গে তো আগে কখনও কোন অলৌকিক ঘটনার কথা শোনা যায় নি। কখনও না। বাড়িটা বহু প্রাচীন হলেও একে ঘিরে কোন গাল-গল্প কখনও প্রচারিত হয় নি। দুর্গটা প্রায় দুই শতাব্দীর পুরনো—মানে মূল দুর্গটা। এমন কি পরবর্তীকালে নির্মিত অংশগুলিও বেশ প্রাচীন। কিন্তু ভয় পাবার মত কোন কিছুই কখনও এখানে দেখাও যায় নি, শোনাও যায় নি। আপনিও তো দেখছেন, এখানকার অধিকাংশ কাজের লোকই স্থানীয় বাসিন্দা; আগাগোড়াই তাই ছিল। কাজেই কোন ভৌতিক ব্যাপার থাকলে নিশ্চয় তারা এখানে কাজ করতে রাজী হত না।"

"কিন্তু ডাক্তার, এখানে যে অদ্ভুত কিছু আছে সেবিষয়ে আমি নিশ্চিত।

"হুম। তাহলে আপনি বলতে চান যে একটা কিছু···মানে একটা অলৌকিক কিছু দেখেই এরা দুজন আলাদা আলাদাভাবে ভয় পেয়েছেন?"

"তাছাড়া অন্য কিছু আমি ভাবতেই পারি না।"

"আচ্ছা মিস কারমাইকেল, তাহলে কি ধরে নিতে পারি যে আপনি নিজে অলৌকিকে বিশ্বাস করেন?"

"অন্তত এখানে আসার পর থেকে নিশ্চয় বিশ্বাস করি।"

"মিঃ ও মিসেস ম্যাক্‌কিননও কি এবিষয়ে আপনার সঙ্গে একমত?"

"গোড়ায় একমত ছিল না। আসলে, আমার কথা শুনে ওরা হাসত, বলত এসবই আমার কল্পনা। কিন্তু পরে, যখন তারা নিজেরাও এইসব ঘটনা প্রত্যক্ষ করতে লাগল তখন নিশ্চয় তারাও ধরে নিয়েছে যে ঐরকম একটা কিছু এখানে আছে।"

"হুম। এরা ভাল হয়ে না ওঠা পর্যন্ত কিছুই সঠিক জানা যাবে না—হয় তো তখনও জানা যাবে না। যাই হোক, খুব জরুরি না হলে আমি এদের হাসপাতালে পাঠাতে চাই না; এ অবস্থায় দীর্ঘ পথযাত্রায় এদের ক্ষতিই হবে। এদের পাঠাতে হবে ইন্‌ভার্নেস-এ; আপনি তো জানেন, সেটা ১৫০ মাইলেরও বেশী দূরের পথ। গ্রাম থেকে একটি নার্স পাঠিয়ে দিচ্ছি; সেই এদের দেখাশুনা করবে। আর সকালে উঠেই আমি আবার এসে এদের দেখে যাব।"

সকালের দিকে এলেন অনেকটা সেরে উঠল, কিন্তু রব্‌বির অবস্থা আরও সংকটের দিকে মোড় নিল। ঘুমের ওষুধের ঘোরটা কেটে যেতেই সে ভয়ার্ত দৃষ্টিতে আমাদের দেখতে লাগল: ডাঃ স্ট্র্যাদার্ন, নার্স ম্যাক্‌ফি ও আমি। তার চোখ দুটো স্থির হয়ে আছে, কম্বলের নীচে গুড়িসুড়ি মেরে অবিরাম গর্জন করছে। আমাদের কোন কথাতেই কোন কাজ হল না; আতংকগ্রস্ত

শিশুর মত সে অবিরাম কাঁপছে, কাঁদছে, আর ছোট শিশুর মতই দুর্বল হাতের ঘুসি পাকিয়ে সকলকে দূরে ঠেলে দিচ্ছে।

রব.বিকে ভাল করে পরীক্ষা করে ডাক্তার স্ট্যাদার্ন বললেন, "এর অবস্থা আমার সাধ্যের বাইরে চলে যাচ্ছে। এবার একে হাসপাতালে পাঠাতেই হবে। ফিরে গিয়েই সব ব্যবস্থা করছি মিস কারমাইকেল। আপনি বরং যতটা পারেন মিসেস ম্যাক্‌কিননের কাছ থেকে ব্যাপারটা জেনে নিতে চেষ্টা করুন। কিন্তু স্বামীর অবস্থার কথা ওকে কিছুই বলবেন না, শুধু বলবেন, তিনিও একটা 'শক' পেয়েছেন, এবং তাকে এখনও ঘুমের ওষুধ খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়েছে। মিসেস ম্যাক্‌কিননকে আরও বলবেন, তিনি যেন বিছানাতেই শুয়ে থাকেন: ডাক্তারের হুকুম।

এলেনকে ভালভাবে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে বললাম, "সব কথা আমাকে খুলে বল এলেন। দেখবে, কথাগুলো বলতে শুরু করলেই তুমি অনেক ভাল বোধ করবে।"

একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে এলেন বলল, "ঠিক আছে, সবই তোমাকে বলব। তোমার নিশ্চয়ই মনে আছে, আমাকে রান্নাঘরে রেখে তুমি বেরিয়ে গেলে। তুমি ছাদে চলে যাবার অল্পক্ষণ পরেই উনুনের ভিতর থেকে একটা ট্রে বের করতে যেই উপুড় হয়েছি অমনি পিছনে একটা ঢোক গেলার শব্দ শুনে চমকে ফিরে তাকালাম। একটি স্ত্রীলোক হাঁ করে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। সে বলে উঠল, "এই তো একটা ভূত।" ক্রমে আরও অনেকে দেখা দিল, মনে হল, তারা যেন কুয়াশার ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে আমাকে ঘিরে দাঁড়াল। মোট চারটি স্ত্রীলোক, দুজন বয়স্কা, একজনের বয়স বিশ বছর, অন্যজন নেহাৎ বালিকা, বয়স বছর পনেরো। বয়স্কা দুজন ভয়ে একেবারে কাঠ হয়ে গেছে, ছোট মেয়েটির তো বিকারের অবস্থা, কিন্তু অপর মেয়েটি অকুতোভয়। আমার দিকে সোজা তাকিয়ে সে বলল, 'আপনি ঠিকই বলেছেন মাকাইভার ঠাকরুণ, এটা একটা ভূত।'

"ঠিক তখনই দরজা খুলে ঘরে ঢুকল তিনটি পুরুষ। সকলেরই পরনে গাঢ় সবুজ রংয়ের পোশাক, তাতে সোনালী কুঁচি দেওয়া। আমাকে দেখে তারা হাঁ করে তাকিয়ে রইল। তারপর তাদের মধ্যে একজন এগিয়ে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরার চেষ্টা করতেই হঠাৎ পিছিয়ে গিয়ে আর্তনাদ করে উঠল, 'এ তো ভূত!' আমি! একটা ভূত! আসলে তো ওই লোকটা এবং অন্য সকলেই ভূত!"

"তখনও আমি ঠায় দাঁড়িয়ে আছি। কি যে করব ঠিক বুঝতে পারছি না। দরজার দিকে যেতে হলে ওদের ভিতর দিয়েই যেতে হবে। সেটা সাহসে কুলোল না। সকলেই আমার দিকে তাকিয়ে আছে, আর 'ভূত-ভূত' করে চেঁচাচ্ছে।' আমি আর সহ্য করতে পারলাম না। সব সংযম



হারিয়ে ফেললাম। ডিমের বাক্সটা টেনে নিয়ে একটার পর একটা তাদের মাথা লক্ষ্য করে ছুঁড়তে লাগলাম। আমার লক্ষ্য নির্ভুল, কিন্তু সবগুলি ডিমই যেন তাদের শরীর ফুঁড়ে বেরিয়ে যেতে লাগল। ডিম শেষ হলে পেয়ালা-পিরিচ, হাঁড়ি-কুড়ি যা হাতের কাছে পেলাম তাই ছুঁড়তে লাগলাম। তাও ফুরিয়ে গেল, তারা একে একে আমাকে ঘিরে ফেলল। সকলেই আঙুল বাড়িয়ে আমাকে খোঁচা দিতে লাগল, আমি হাসতে হাসতে কেঁদে ফেললাম। আর্তনাদ করতে লাগলাম।···ওঃ, জ্যানেট, সে এক অসহ্য ভয়ংকর অবস্থা। মনে হল, আমি বুঝি পাগল হয়ে যাচ্ছি। আর তারপরেই আমি জ্ঞান হারালাম।

"জ্যানেট, এ অবস্থা আমি আর সহ্য করতে পারছি না। এখন আমি আর কিছু চাই না, শুধু গ্ল্যাসগোতে ফিরে যেতে চাই। কোথায় যাব তা জানি না, কিন্তু এখানে আর একমুহূর্তও নয়।"

সব কথা শুনে ডাঃ স্ট্র্যাদার্ন বললেন, "হুম। কি জানেন মিস কারমাই-কেল, প্রেততত্ত্ব নিয়ে আমি অনেক পড়াশুনা করেছি। ভূতের অস্তিত্বে আমি বিশ্বাস করি। আমি মনে করি, ভূতরা সব অতৃপ্ত আত্মা; যে যেখানে মারা যায় কোন না কোন সূত্রে তারা সেখানেই বাঁধা পড়ে, আর সেই বন্ধন থেকে মুক্তি লাভের আশায় ছটফট করে।"

এলেন বাধা দিয়ে বলল, "কিন্তু ডাঃ স্ট্র্যাদার্ন, তাহলে এত দীর্ঘদিন তাদের এ দুর্গের কোথাও দেখা যায় নি কেন? আর কেনই বা জ্যানেট এখানে আসার পর থেকেই তাদের আনাগোনা এভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে?"

"মিসেস ম্যাক্‌কিনন, আমার ধারণা, নতুন করে তাদের এই আবি-র্ভাবের কারণ হয়তো এ দুর্গের পরিবেশের এমন কোন পরিবর্তন হয়েছে, এমন কিছু ঘটেছে যার হদিস আমরা রাখি না, এবং যার ফলে তারা নতুন করে আত্মপ্রকাশের শক্তি ফিরে পেয়েছে।"

তবু আমি প্রশ্ন করলাম, "কিন্তু এর মধ্যে কি এমন ঘটেছে যার ফলে···"

আমাকে বাধা দিয়ে ডাঃ স্ট্র্যাদার্ন বলে উঠলেন, "বলেছি তো মিস কারমাইকেল, সেটা আমরা কেউ জানি না। তবে আমি যতটুকু জানি, অনেক প্রেতাত্মা দীর্ঘকাল ধরে যেখানে আটকা পড়ে আছে, কোনক্রমে কোন নতুন প্রেত-শক্তি যদি সেখানে আবির্ভূত হয় তাহলে তারা নতুন উৎসাহে, নতুন শক্তিতে নিজেদের মুক্তিলাভের জন্ম তৎপর হয়ে ওঠে। হয় তো···"

আমি লক্ষ্য করলাম, এলেনের চোখে-মুখে ক্রোধ ও তাচ্ছিল্য যেন মুহূর্তের জন্ম ঝিলিক দিয়ে উঠল। আর ঠিক তখনই ডাক-পিয়ন একগাদা চিঠি নিয়ে ঘরে ঢুকল।

লোকটি চলে গেলে এলেন চিঠিগুলোর উপর চোখ বুলোতে বুলোতে

হঠাৎ একটা খাম খুলে পড়তে শুরু করে দিল। তার চোখে-মুখে ফুটে উঠল বিস্ময় ও আতংক। পরক্ষণেই বিস্ফারিত দৃষ্টিতে সে হাঁ করে আমার দিকে তাকাল। তার কম্পিত আঙুলের ফাঁক দিয়ে চিঠিটা মেঝেতে পড়ে গেল। আমি তার দিকে এগিয়ে যেতেই সে আর্তকণ্ঠে একটা চীৎকার করেই জ্ঞান হারিয়ে মেঝেতে লুটিয়ে পড়ল।

ডাঃ স্ট্র্যাদার্ন চিঠিটা কুড়িয়ে নিয়ে পড়তে লাগলেন। হঠাৎ বলে উঠলেন, "হা ঈশ্বর! এ যে দেখছি যা ভেবেছি ঠিক তাই।" তাকিয়ে দেখলাম, তার মুখখানা ছাইয়ের মত সাদা হয়ে গেছে। পকেট থেকে একটা বড় সোনার ক্রুশ বের করে সেটাকে ডান হাতে বুকের উপর চেপে ধরে বাঁ হাতে তিনি চিঠিটা আমার দিকে বাড়িয়ে দিলেন। তার দুটি হাতই থর্থর্ করে কাঁপছে।

হাতের লেখাটা খুবই পরিচিত হলেও প্রথমে আমি ঠিক ধরতে পারি নি।

"প্রিয় এলেন ও রব্‌বি।

জ্যানেট যে তোমাদের কাছে গিয়ে পৌছতে পারে নি তার কারণ তোমাদের জানাতে এত বিলম্ব হল বলে আমি দুঃখিত…"

চিঠি পড়ে আমি তো অবাক। থেমে গেলাম। আমি পৌছতে পারি নি? অকস্মাৎ বুঝতে পারলাম হাতের লেখাটা আমার মার। ডাক্তারের দিকে একবার তাকিয়ে আবার পড়তে লাগলাম।

"…কারণ সে তো আগেই তোমাদের লিখে জানিয়েছিল যে সানন্দেই সে তোমাদের কাছে যাবে। তোমাদের সঙ্গে একটা ছুটিতে কাটাবার সাধ তার অনেকদিনের।"

"তোমরা তো জান, ঠিক গোধূলির সময় জ্যানেটের দৃষ্টিশক্তি খুব দুর্বল হয়ে পড়ে। আমি তাকে অনেকবার সাবধান করে দিয়েছি যেন অন্ধকারে গাড়ি না চালায়, কিন্তু সে আমার কথা কানেই তুলত না। যাই হোক, সে নির্ঘাৎ পথ হারিয়ে ফেলেছিল এবং গাড়ি চালাতে চালাতেই অন্ধকার হয়ে এসেছিল, আর পথ ভুল করে ইন্‌ভার্নেস-এর প্রায় পঞ্চাশ মাইল পশ্চিমে একটা পাহাড়ি খাদের মধ্যে গিয়ে পড়েছিল। পরদিন গাড়ির চাকার দাগ অনুসরণ করে পুলিশ দুর্ঘটনা-স্থলে পৌছে যায়। তার ঘাড়টা ভেঙে গিয়েছিল, আর মাথার পিছনটা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গিয়েছিল।

জানি আরও আগেই চিঠিটা লেখা আমার উচিত ছিল, কিন্তু আমি তা পারি নি। তোমরা যদি তার অন্য বন্ধুবান্ধবীদের খবরটা জানিয়ে দাও তো আমি খুবই কৃতজ্ঞ বোধ করব। আমার চাইতে তোমরাই তাদের বেশী পরিচিত; তাছাড়া, তাদের যে কি লিখব তাও আমি বুঝতে পারছি না। ভালবাসা নিও। জিন কারমাইকেল।"

ডাঃ স্ট্র্যাদার্ন তখনও বিড়বিড় করে বলছেন; "স্বর্গীয় পিতা, পুত্র ও পবিত্র প্রেতাত্মার নামে…"

The Gates were Locked—Morag Greer

মিঃ কেম্‌পি

সন্ধ্যাটা ছিল ঈষৎ ঠাণ্ডা। বীয়ার-ঘরের ঠেলা-দরজাটা হাট করে খোলা। কড়ি-কাঠ থেকে ঝোলানো পিতলের তেলের বাতিটা তখনও জ্বালানো হয় নি। গলির শেষ প্রান্তে গাছের সারি আর চুনকাম-করা দেয়ালের মাঝখান দিয়ে কুয়াশার মত ঝিরঝিরে বৃষ্টির ছাট বয়ে চলেছে। কাউণ্টারের পাশে টুলের উপর বসে বাইরে ঝোলানো "নীল শুয়োর"-এর সাদা বড় চোখ দুটোর দিকে তাকিয়েছিলাম।

হেমন্তকালের নানা সুবাস, দিনশেষের পরিবেশ, অবিরাম ঝিরঝির বৃষ্টি—এ অবস্থায় স্বভাবতই মানুষের চোখে ঘুমের আবেশ নেমে আসে। চারদিকটা প্রথমে অস্পষ্ট হয়ে ক্রমে মুছে যায়; আর তারপরেই—ধীরে ধীরে নেমে আসে স্বপ্নের বিচিত্র পরিবেশ। সে অভিজ্ঞতা ক্ষণস্থায়ী তা মানি। ফুটলাইট, হেডলাইট, স্কাইলাইট—সব আলো আবার জ্বলে ওঠে। স্বপ্নের দেশ দূরে মিলিয়ে যায়।

গৃহস্বামিনী তার বারের পিছনকার আধা-অন্ধকার আবাস থেকে মাঝে মাঝে বাইরে আসে; তাকে ছাড়া বীয়ার-ঘরে আমরা মাত্র তিনটি প্রাণ; আমি, একটি ছোটখাট মানুষ (তার কপালটা অস্বাভাবিক রকমের উঁচু, মুখের আদল অনেকটা বাঁদরের মত), আর পিপের আকৃতি একটি মোটা-সোটা মানুষ (গায়ে পুরনো শুটিং-জ্যাকেট ও পায়ে চামড়ার পটি; লাল নাকের দুপাশে দুটি ছোট ছোট চোখ)।

আমি ঘরে ঢুকেছি সকলের শেষে; অবশ্য তাতে আলোচনায় কোনরকম ভাঁটা পড়ে নি। এরকম আবহাওয়ায় তা হয় না। বরং দু'জনে যেখানে জমে না, তিনজন হলে তবু আড্ডাটা ভাল হয়।

কথায়-কথায় কথা জমে উঠল। ক্রমে কার জীবনে কবে, কখন, কি অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছে সেই আলোচনা শুরু হল। বাঁদরমুখো লোকটি বিচিত্র হাসি হেসে বলল, "তাহলে আমার কথাই শুনুন। একসময় আমি স্কুল-শিক্ষক ছিলাম। সকলের প্রশ্নের জবাব দেওয়াই তো আমার কাজের অঙ্গ ছিল। আমি একটা অদ্ভুত জায়গার কথা বলছি। জায়গাটা যে কোনকালে সপ্তাহ-ন্তিক যাত্রী ও সৌখীন ভ্রমণকারীদের মনের মত জায়গা হয়ে উঠবে সেবিষয়ে

আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে। বিশেষত যে সময়ের কথা আমি বলছি—আজ থেকে বিশ বছর বা তারও আগেকার কথা—সেসময় তো সেখানে ছোটখাট একটা সরাইখানাও ছিল না। ছিল শুধু এই ঘরের অর্ধেক মাপের একটা বীয়ারের দোকান, আর যৎসামান্য কিছু বাসিন্দা—পাহাড়ের নীচে পরপর কয়েকটা জেলেদের বাড়িঘর।

"অপরিচিত জায়গায় ঘুরতে ঘুরতে হাতে মানচিত্র থাকা সত্ত্বেও পথ ভুল হয়ে গেল। আমার লক্ষ্য ছিল সমুদ্রের তীর বরাবর একটা সমান্তরাল পথ ধরে এগিয়ে যাওয়া; কিন্তু চৌমাথায় গিয়ে একটা ভুল পথ ধরেছিলাম। একবার পথ হারালে যা হয়, সেই ভুল পথ ধরেই চলতে লাগলাম।

"আমার অনুরোধে একটা বাড়ির জনৈকা বৃদ্ধা আমাকে চা খাওয়াতে রাজী হল। তাকেই পথের হদিস জিজ্ঞাসা করলাম। বৃদ্ধা প্রথমে আমাকে ফিরে যেতেই বলল; আমার পক্ষে সেটাই ভাল হবে। আরও কিছু প্রশ্ন করায় শেষ পর্যন্ত পাহাড়ের আরও নীচে একটা পথের কথা সে জানাল। টেবিল-ঢাকনার উপর বাতগ্রস্ত তর্জনীটা টেনে টেনে সে আমাকে পথের হদিসটা বুঝিয়ে দিল। সেই পথ ধরে গেলেই আমি নাকি সঠিক পথটা পেয়ে যাব।

"অবশ্য সেপথ ধরে এগিয়ে যাবার কথা সে বলল না। মোটেই না। সাত মাইলেরও বেশী দূরে সেই পথ। গ্রামের লোকরা তো দূরের কথা, আমার মত হঠাৎ চলে-আসা কোন যাত্রীও কোনদিন সে পথ মাড়ায় না।"

"কেন বলুন তো?" পায়ে পট্টি-বাঁধা মোটাসোটা লোকটি প্রশ্নটা করেই সবজান্তার মত একটু কাশল।

স্কুল-শিক্ষকটি সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল, "সেই কথাতেই যাচ্ছি। কি জানেন, শেষ খবরটি দেবার সময় বৃদ্ধার চোখে একটা বিচিত্র হাসির ঝিলিক আমার চোখে পড়েছিল। মনে হল, সে আমাকে সঠিক কথা বললেও, সব কথা বলে নি। স্বভাবতই তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, সে পথের দোষটা কি; তাছাড়া, সে পথের পাশে অথবা পথের শেষে এমন আকর্ষণীয় কিছু আছে কি না যাতে এত কষ্ট করে সে পথে চলাটা পুষিয়ে যেতে পারে। বৃদ্ধা পুনরায় অনেকক্ষণ ধরে আমাকে দেখল; তারপর বলল, 'আমার তো মনে হয় আপনার হাতের মানচিত্রেও একটা পুরনো সেকেলে বাড়ি দেখানো রয়েছে।'

"তা অবশ্য ছিল; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত দীর্ঘদিনের ব্যবহারের ফলে আমার হাতের মানচিত্রটার দু'একটা অস্পষ্ট ইংরেজি অক্ষর ছাড়া আর কিছুই বোঝা যাচ্ছে না; শুধু তাই নয়, আধ বর্গ মাইল জায়গাই সম্পূর্ণ মুছে গেছে।

"বৃদ্ধার কাছ থেকে আসল সত্যটা জেনে নেওয়া খুবই বিরক্তিকর ব্যাপার। সে বাড়িটা দেখাশুনা করার কোন লোক সেখানে থাকে কি না জানতে চাইলে প্রথমে তো বৃদ্ধা মুখই খুলল না; অনেক জিজ্ঞাসাবাদের পর

শেষ পর্যন্ত বলল, 'দেখুন স্যার, অতটা পুরনো না হলেও পাশেই আরও একটা বাড়ি আছে, আর সেখানে মিঃ কেম্‌পি নামক একজন ভদ্রলোক বাস করেন।'

"মিঃ কেম্‌পির কথা ওঠার পরে ব্যাপারটা অনেক সহজ হল। একমাত্র ভজনালয়টি ছাড়া তীরভূমিসহ গোটা অঞ্চলটাই অতি প্রাচীনকাল থেকে তাদেরই পরিবারের সম্পত্তি। মিঃ কেম্‌পি এককালে গির্জারই লোক ছিলেন ; কিন্তু তার ছিল পথ চলার বাতিক। যাইহোক, অনেককাল আগে পঙ্গু স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে তিনি একদিন বাড়ি ফিরলেন।

"মিসেস কেম্‌পি মারা গেছেন ; তাদের কোন সন্তানও ছিল না। মিঃ কেম্‌পিও কিছুদিন অসুখ-বিসুখে ভুগলেন, এবং—আমাকে যে খবর দিয়েছে তার মতে—একদিন হয়তো তিনিও মারা গেলেন। বৃদ্ধার নিষ্প্রভ চোখে আবার যেন একটা রহস্যের ঝিলিক খেলে গেল—মনে হল বৃদ্ধা যেন বিশ্বাস করে যে মিঃ কেম্‌পি মৃত্যুকে জয় করার কোন পথ আবিষ্কার করেছেন। যাই হোক, আর কিছুই বৃদ্ধাটি জানে না ; সে পথে এখন কেউ চলাফেরা পর্যন্ত করে না। আরও উপরে একটা নতুন রাস্তা তৈরি করা হয়েছে সাধারণের যাতায়াতের জন্য। তাছাড়া, আর একটা কথা জানা গেল। মিঃ কেম্‌পির নির্জন নিঃসঙ্গ জীবনের অবসানের সংবাদে গ্রামবাসীদের মনের উপর কোন-রকম শোকের ছায়া পড়ে নি।

"পড়ন্ত বিকেল নেমে এল, সেই বাতাসহীন গ্রীষ্মের আবহাওযায পথ চলাটা মোটেই সুখের ব্যাপার নয। ক্লান্ত হয়েও পড়েছিলাম। আমি চাই-লেই সেই বৃদ্ধার সমুদ্রের দিকে মুখ-করা একখানি দোতলার ঘর দু'এক রাতের জন্য পেতে পারি। তবু সরু সিঁড়িটা বেয়ে তার সঙ্গে উপরে উঠতে-উঠতে স্থির করলাম, মিঃ কেম্‌পির খোঁজে আমাকে যেতেই হবে। দরকার হলে সন্ধ্যার মধ্যেই ফিরে আসব।... ঘর ভাড়া বাবদ পাঁচ শিলিং তার হাতে দিলাম ; বৃদ্ধা ম্যান্টেলপিসের উপরকার একটা অলংকারের নীচে সেটা রেখে দিল। আমি যতদূর জানি, সে পাঁচ শিলিং এখনও সেখানেই আছে। আর কোনদিন আমি সেটা দাবী করি নি।"

পায়ে পট্টি বাঁধা লোকটি আবার স্কুল-শিক্ষকের দিকে মুখটা ফেরাল, কিন্তু এবার কোন মন্তব্য করল না।

"মিঃ কেম্‌পির দেখা পেয়েছিলেন ?" আমি শুধালাম।

স্কুল-শিক্ষকটি হাসল ; তাকে যেন আগের চাইতেও একটি মানবপ্রেমিক বাঁদরের মত দেখাল।

"সঙ্গে সঙ্গে পথে নেমে এলাম ; বৃদ্ধা ফটকে দাঁড়িয়ে আমার দিকে তাকিয়ে রইল ; হাত নেড়ে বিদায়-সম্ভাষণ জানালাম। পথের বাঁকে মোড় ঘুরতেই বৃদ্ধা দৃষ্টির আড়ালে চলে গেল। কাঁটা ঝোপ ও এঁদো ডোবার পাশ

দিয়ে গেলেও রাস্তাটা চিনতে আমার ভুল হয় নি।

"কয়েক শ গজ যাবার পরেই রাস্তাটা সমুদ্রের দিকে নেমে গেছে; মাইল খানেকের মত সমুদ্রের সম-উচ্চতায় চলতে চলতে রাস্তাটা ঢুকে গেছে একটা সংকীর্ণ বালুকাময় গুহার মধ্যে—গ্রীষ্মকালেও সমুদ্রের ঢেউয়ে যত রাজ্যের আজে বাজে জিনিস সেখানে এসে জমা হয়েছে, শীতকালে যখন ঝড় ওঠে তখন যে এ গুহা কিরকম মূর্তিমান ধ্বংসের রূপ নেয় সেটা সহজেই কল্পনা করা যায়। গুহাটার মুখের কাছে গিয়ে সংকীর্ণ পথের উপর থেকে চাকার দাগগুলি সহসা মিলিয়ে গেছে, আর রাস্তাটা একটা পাহাড়ি নালার পাশ দিয়ে ও কয়েকটা অ্যাশ গাছের নীচ দিয়ে এগিয়ে গিয়ে হঠাৎই ডান দিকে বাঁক নিয়ে সোজা উত্তর দিকে চলে গেছে। সেখানে "ওরিয়ন" নামক আল্‌-কাতরা-মাখানো একটা পরিত্যক্ত নৌকো পাথরে ভর্তি হয়ে পড়ে আছে। ওই পরিবেশে সেটাই সভ্যজগতের সঙ্গে আমার শেষ যোগসূত্র।

"শান্ত সন্ধ্যাবেলা। গাছের সবুজ পাতা ও ঘাস নিঃশব্দে চিকচিক করছে, ফুলগুলি বোঁটার উপর সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে নীল আকাশের নীচে, যেন মোমের ভিতর থেকে খোদাই করে তোলা হয়েছে। মিষ্টি বাতাস বইছে, তাতে সমুদ্রের স্পর্শ লেগে আছে। সেখানে বসে ঘাসের শিস চিবুতে চিবুতে একটু বিশ্রাম নিলাম; সম্মুখে সমুদ্র যেন বন্ধুর মত কোল পেতে আছে। তারপর আবার চলতে শুরু করলাম।

"প্রায় এক ঘণ্টা একটানা হাঁটার পরে রাস্তাটা আবার উঁচুতে উঠতে লাগল। যদিও চোখে দেখতে পাচ্ছি না এবং জোয়ারের শব্দও কানে আসছে না, তবু পথটা সমুদ্রতীরের দিকেই চলেছে। দুদিকে পরিত্যক্ত ঘন জঙ্গল। বাতাসে একটা পাখি বা কীট-পতঙ্গের শব্দও ভেসে আসছে না। আমি যেন চলেছি এক কুমারী অরণ্য অঞ্চলকে আবিষ্কার করতে।

"এগিয়েই চলেছি। আমার ঠিক কতটা উপরে উপত্যকাটা আছে, আর সমুদ্রই বা রয়েছে কতটা নীচে, কিছুই পরিষ্কার বুঝতে পারছি না—যদিও মাঝে মাঝেই সমুদ্রের রূপোলি বিস্তার ও সুদূর দিগন্তটা চোখে পড়ছে। যে রাস্তা ধরে চলেছি সেটাকে পথ বললে বোধ হয় অত্যুক্তি করা হয়। যত উপরে উঠছি রাস্তাটা ততই প্রস্তরাকীর্ণ ও পা ফেলার অনুপযুক্ত হয়ে উঠছে। শেষ পর্যন্ত সমুদ্রে ঠিক উপরকার কয়েকটা খাড়া জায়গার মোড় ঘুরে যেতেই আমার পিছনে দেখা দিল সাগর-সৈকতের এক অপূর্ব দৃশ্য, যদিও আমার সামনেটা তখনও অরণ্যের অন্ধকারে অস্পষ্ট।

"ছোট গ্রামটা ইতিমধ্যেই অদৃশ্য হয়ে গেছে। যে খাড়া পাহাড়টার শেষ প্রান্তে আমি দাঁড়িয়ে আছি তার প্রায় দেড়শ' ফুট নীচে কিছু কাঁটা-ঝোপ ও কয়েকটা বেঁটে ওক গাছের ভিতর দিয়ে জোয়ারের জল পাহাড়ের গায়ে এসে আছড়ে পড়ছে।

"হাতের মানচিত্রখানাতে আর একবার চোখ বুলিয়ে একটা লম্বা শ্বাস টেনে আবার হাঁটতে লাগলাম। ধীরে ধীরে উপরে উঠছি ; এবার ভিতরের দিকে ; প্রায় উত্তর-পশ্চিমে। দুই ধারে আবার ঘন গাছপালার জঙ্গল ; বাতাসে ক্লোরোফর্মের মত একটা চাপা সুগন্ধ। নিশ্চয় সাম্প্রতিককালে এখানে একটা শীতকালীন ঝড় অথবা বিষুবরেখা-অঞ্চলীয় ঘূর্ণিবাত্যা বয়ে গেছে। মাঝে মাঝেই আমাকে ঝড়ে-পড়া বড় বড় গাছ পার হয়ে পথ চলতে হচ্ছে ; সেসব গাছের শাখায় ফুটে আছে "মরণোত্তর" বিবর্ণ সবুজ পুষ্প-কোরক। এ যেন এ জগৎ ও পরবর্তী জগতের মধ্যবর্তী এক সীমান্ত-অঞ্চল।

"সামুদ্রিক ঝড়ের এইসব চিহ্ন ছাড়াও যেসব পাখি এখানে চোখে পড়ছিল সেসবই শিকারী পাখি : প্রধানত বাজপাখির দল ; তারা যেন মহাশূন্যের বুকে এক-একটা সুতোয় ঝুলছে ; কম্পমান দুটি পাখার মাঝখানে দেখা যাচ্ছে তাদের উদ্যতচঞ্চু তীক্ষ্ণ মুখ। একবার যেন একটা কাকের কণ্ঠস্বরও কানে এল। মিনিট কুড়ি পরেই উঁচু পাড়ের উপর থেকে দ্বিতীয়বার সমুদ্রকে দেখতে পেলাম। সেদিকে তাকিয়ে কিছুক্ষণের জন্ত থমকে দাঁড়ালাম।

"সেখানে যে সত্যিকারের কোন বিপদ বা বিপদের ঝুঁকি ছিল তা অবশ্য ঠিক নয়। যেকোন সৌখীন পর্বতারোহীর পক্ষেও এ অভিযান ছেলেখেলারই সামিল। পাহাড়ের একেবারে শেষ প্রান্ত দিয়ে চলা এই পথে অগ্রসর হতে হলে উপরে বা নীচে না তাকিয়ে নড়বড়ে পাথরগুলোর উপর সতর্ক দৃষ্টি রেখে ঠিক মত পা ফেলতে পারলেই হল। যেকোন সাধারণ মানুষের পক্ষেই কাজটা সুষ্ঠুভাবে করা সম্ভব। তবু হঠাৎই আমার মনে পড়ে গেল, এসব অঞ্চলে যারা বেড়াতে আসে তারা উপরে উঠতে হলে অন্ত একটা পথ ধরেই অগ্রসর হয়ে থাকে। অতিউত্তেজনাটা সুখের ব্যঞ্জনে মশলার বাড়াবাড়িও তো ঘটাতে পারে।"

পায়ে পট্টি-বাঁধা লোকটি প্রশ্ন করল, "খুবই খাড়া বুঝি ?"

স্কুল-শিক্ষক জবাব দিল, "হ্যাঁ, খাড়া ; অবশ্য প্রাকৃতিক দৃশ্য হিসাবে দোষ ধরবার মত কিছু নয়। নীল-সবুজের ছোপ-লাগা একখণ্ড সীমাহীন পাতের মত লীগের পর লীগ সমুদ্র অস্পষ্ট দিগন্ত পর্যন্ত বিস্তৃত। একটা গাঢ় রক্তিমাভা ছড়িয়ে পড়েছে পূবের আকাশে।"

"বারেবারেই সেই অসীম অনন্তের দিকে তাকিয়ে বিশ্রাম নিচ্ছি, আর ভাবছি ফিরে যাই। কিন্তু যে রহস্যময় কুটিরটির কথা অনেকের মুখে শুনেছি তাকে দেখবার কৌতূহল এবং নিজেকে আর একটি অক্ষম পর্যটক প্রমাণ করার লজ্জাই যেন আমাকে হাতছানি দিয়ে এগিয়ে নিয়ে চলল। আবার নির্জনতারও একটা অদৃশ্য আকর্ষণ আছে ; সেও মানুষকে টানে। পায়ের চাপে যখনই একটা আল্‌গা পাথর খসে গিয়ে নীচের সীমাহীন গহ্বরের মধ্যে ছিটকে পড়ছে তখনই তার তলা থেকে কাঁটার মত লেজওয়ালা একটা বিশেষ

ধরনের পতঙ্গ উড়তে উড়তে বেরিয়ে আসছে। সেগুলিকে বাদ দিলে সেই নির্জন অঞ্চলে আমিই একমাত্র জীবিত প্রাণী। সতর্ক পদক্ষেপে আবার এগিয়ে চললাম। কিন্তু ভরসা পেলাম না; সন্ধ্যার গভীর নৈঃশব্দ্য আমার মনে জাগিয়ে তুলল একটা অবাস্তবতা ও নিঃসঙ্গতার অনুভূতি। আমার জগৎটা যেন একটা ছবিতে পরিণত হল আর সে ছবিতে আমি একান্তই অবান্তর। মনে হল আমি বুঝি কোন ভুল জায়গায় এসে পড়েছি, আর সকলেই আমাকে ভুলে গেছে।

"চলতে চলতে একসময় পাহাড়ের একেবারে শেষ প্রান্তে একটা সংকীর্ণ পথে গিয়ে পৌঁছলাম। একপাশে পায়ের দু' তিন শ' ফুট নীচে সমুদ্র; অপরপাশে একেবারে কনুই ঘেঁসে উঠে গেছে অমসৃণ পাথরের দেয়াল প্রায় শ'খানেক ফুট উপরে। মাঝখানে দাঁড়িয়ে আমি এক নিঃসঙ্গ পথিক। উপরে ও নীচে ঝড়ো-হাওয়ায় ক্ষয়ে-যাওয়া পাথরের বুকে অ্যাশ্‌ ও বার্চ গাছের ঝোপ-জঙ্গলের বাতাস ও ঢেউয়ের কানাকানি। আমি অসহায়।

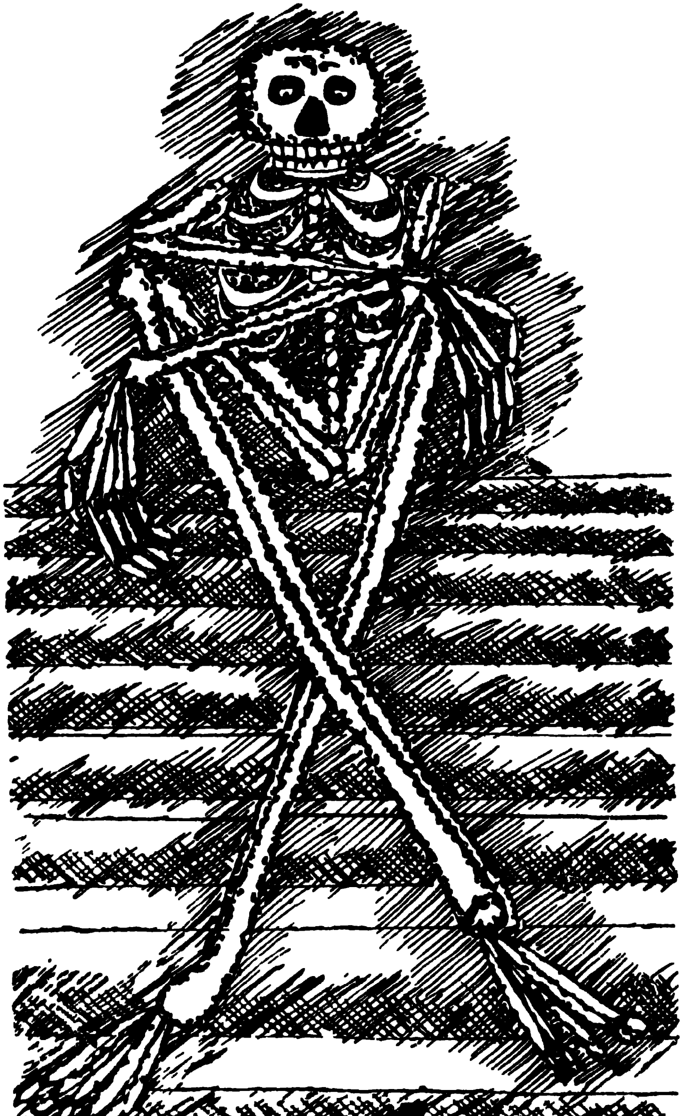
"বিমূঢ়ভাবে মনটাকে হাসি-খুশি রাখতে চেষ্টা করলাম—এমন কি একবার শিস্‌ দিতেও চাইলাম। কিন্তু আমার ঠোঁট শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে; নিঃশ্বাস নিতে পারলাম না; সব সাহস হারিয়ে ফেললাম। তবু সেই সংকীর্ণ গিরি-পথে আরও গজ বিশেক এগোতেই হঠাৎ যেন নিজের সমূহ বিপদ সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠলাম। এখন আর ফিরে যাওয়া অসম্ভব, আর এই সংকীর্ণ পথের ওপাশে কি আছে তাও অজানা। কয়েক মুহূর্তের জন্য যেন আমার অস্থি-মজ্জা ও স্নায়ু বিদ্রোহ করে উঠল; তারা যেন আর তিলমাত্র অগ্রসর হতেও নারাজ। কোনরকমে দুই হাতে পাহাড়টাকে আঁকড়ে ধরে দাঁড়িয়ে রইলাম।

"কিন্তু হেমন্তকালের মাছির মত এভাবে তো দীর্ঘকাল পাহাড়ের গায়ে লেপ্টে থাকা চলে না। গাঢ় অন্ধকারে মাত্র এক ঘণ্টা সময়; একঝলক ঝড়ো হাওয়া আমাকে কোথায় উড়িয়ে নিয়ে যাবে কে জানে। রাতের অন্ধকার নামতে এখনও কয়েক ঘণ্টা বাকি; সন্ধ্যাবেলাটা মৃত্যুর মত শান্ত, স্তব্ধ; আমার কপাল ভাল যে আকাশের জ্বলন্ত সূর্যটা আমাকে জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে খাক করে দিচ্ছে না। ভাগ্যকে সেজন্য ধন্যবাদ দিলাম—কিন্তু কাল রাতে আবার যখন ঐ দূর আকাশের তারারা দেখা দেবে তখন সারাদিনের রোদে জ্বলে-পুড়ে আমার এই দেহ-খাঁচাটা কোথায় থাকবে? মুহূর্তের মধ্যে এই সব চিন্তা আমার মনের মধ্যে বয়ে গেল। এখন আমার একমাত্র প্রয়োজন আত্মসংযম। সেটা বুঝতে কষ্ট হল না। কিন্তু ঠিক সেইমুহূর্তে আমার শরীর ঠাণ্ডা হয়ে এল; শরীর বেয়ে ঘাম ঝরতে লাগল; আতংকে ভেঙে পড়ল মন। দৃঢ় প্রত্যয় জাগল—চারদিকের এই জনহীনতার মধ্যেও একটা স্থির দৃষ্টি যেন আমার উপর দৃঢ়নিবদ্ধ—কেউ যেন আমার উপর নজর

রেখেছে।"

পুনরায় আমাদের বন্ধুটি তার আসনে নড়েচড়ে বসল।

স্কুল-শিক্ষক সঙ্গে সঙ্গে বলল, "আমিও স্বীকার করি যে কথাটা অবাস্তব



শোনাচ্ছে। কারণ কিছু সাগর-পাখি ও মেঘ ছাড়া সেখানে তখন আমিই

একমাত্র চলমান বস্তু। তবু আমার সে প্রত্যয় যে মিথ্যা নয় অচিরেই তার প্রমাণ পেলাম। সত্যি কেউ আমাকে সারাক্ষণই দেখছিল ; আর সেরকম এক জোড়া তীক্ষ্ণ, অমানুষিক চোখ আমি কখনও কোন মানুষের মুখে দেখি নি।

"অসীম সতর্কতার সঙ্গে আবার পা চালিয়ে দিলাম। পথটা ক্রমেই সহজতর হয়ে এল ; খাড়া পাহাড়ের বদলে দেখা দিল মাটি ; একটু পরেই পথের ঘাস ও শ্যাওলার উপর মানুষের পায়ে চলার চিহ্ন দেখতে পেলাম ; দেখতে পেলাম জুতোর কাঁটার দাগ।

"তাহলে তো এই নিঃসঙ্গ পথের শেষেই আছে সঙ্গী। ভিজে মাটিতে কাঁটা-মারা জুতোর দাগ দেখেই বুঝতে পারলাম, এই জুতোর মালিক সম্প্রতিকালেই অন্তত তিনবার এই পথ ধরে যাতায়াত করেছে। তাহলে আর ভয় কিসের ? তবু কেমন যেন ভয়-ভয় করতে লাগল। সেই একান্ত নির্জন পথের বুকে দাঁড়িয়েও ওই পদচিহ্নের মালিকের সঙ্গে সাক্ষাতের তিল-মাত্র বাসনাও আমার মনের মধ্যে খুঁজে পেলাম না।

"যাই হোক, আরও প্রায় আধ ঘণ্টা পথ চলার পরেই আমাকে থামতে হল। সামনেই 'একটা অতি প্রাচীন জীর্ণ' বাড়ি ; ঠিক যেরকম আমার মানচিত্রে দেখানো ছিল। দৃশ্যটা মোটেই আশাপ্রদ নয়। খানিকটা খোলা জায়গার পরেই বাড়িটার কালো দেয়াল উঠে গেছে। বাড়িটার আকৃতি গোল ; একসময় নিশ্চয় পথের পাশে কোন আশ্রম বা আশ্রয়স্থল ছিল। বাড়িটা পাথরের তৈরি, ভারী পাথরের চাই দিয়ে গড়া···ছাদ। ছাদের দক্ষিণ দিকে একটা ছোট ঘণ্টা-ঘর, আর পূব দিকে পাথরের একটা বেঁটে ক্রুশ-চিহ্ন ; তার একটা হাত ভাঙা।

"খিলানওয়ালা গোল দরজাটা কিছুতেই খুলল না। চাবির গর্তটা ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ল না। ছোট্ট জানালাটাও আমার নাগালের বাইরে। বাড়িটা যে কতদিনের পুরনো তাও বুঝতে পারলাম না। মাঝে মাঝেই ভেঙে পড়েছে, আর কোনরকমে জোড়াতালি দিয়ে কিছুটা মেরামতও করা হয়েছে।

"দেয়ালের দক্ষিণ দিকে একটা পরিত্যক্ত কবরখানা। কবরের সংখ্যা খুবই অল্প ; ঢাকনার পাথরগুলোতে একটিমাত্র নাম কোনরকমে পড়া যায়। পুরো বাড়িটাকে একনজরে ভাল করে দেখবার জন্য কিছুটা পিছিয়ে এসে দাঁড়াতেই মিঃ কেম্পির উপস্থিতিটা জানতে পারলাম। কয়েক পা দূরেই তিনি দাঁড়িয়ে আছেন ; দৃষ্টিটা আমার দিকে। 'ম্যাকবেথ' নাটকের ব্যাংকোর ভূতের মতই একটি অপ্রত্যাশিত প্রেতমূর্তি যেন। এত নিঃশব্দে তার আবির্ভাব ঘটেছে যে একটা রবিন পাখিও সেরকম নিঃশব্দে এসে হাজির হতে পারত না। গাছের একটা ডাল ভাঙে নি, একটা পাতার খস্‌খস্‌ শব্দও

হয় নি।

"লোকটির বয়স বছর ষাট; পুরনো একটা কাল্‌চে-সবুজ পাদরির পোশাক পরনে; মস্ত বড় বুটের উপর ঢিলে ট্রাউজারটা ঝুলে পড়েছে; মাথায় একটা অত্যন্ত সেকেলে খড়ের কালো টুপি। পাকা চুলের গোছা বিবর্ণ মুখের দু'পাশে ঝুলে পড়েছে; এক-মুখ জট-বাঁধা দাঁড়ি। চোখ দুটি জলের মত স্বচ্ছ—পাতা দুটি অস্বাভাবিক রকমের খোলা; সে চোখের দৃষ্টি যে কোন্‌দিকে কার উপর নিবদ্ধ সেটাও বোঝা দুষ্কর। তবে তিনি যে আমাকেই দেখছিলেন সেটা বুঝতে কষ্ট হয় না, কারণ তার মুখটা আমার দিকেই ফেরানো। একাগ্র দৃষ্টিতে দু'জন দু'জনকে দেখতে লাগলাম, শুধু কয়েক মুহূর্তের জন্য নয়, মনে হল যেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা।

"আমিই সে নিস্তব্ধতা ভাঙলাম, আবহাওয়া ও চারদিকের ধ্বংসস্তূপ সম্পর্কে কিছু কথা বললাম। প্রত্যুত্তরে যে কণ্ঠস্বর কানে এল সেটা স্বয়ং মিঃ কেম্‌পির চাইতেও বিস্ময়কর। মনে হল বুঝি অব্যবহারের ফলে তার গলায় মরচে ধরেছে; পাতলা কাঁচে চিড় ধরার মত একটা কাঁপা আওয়াজ। প্রথমে তার কথা বুঝতেই পারলাম না। তার কণ্ঠস্বর শুনে আমার মনে পড়ে গেল আলেকজাণ্ডার সেল্‌কার্কের সেই সময়কার অবস্থার কথা যখন তার উদ্ধারকারীরা জুয়ান ফার্নাণ্ডেজ দ্বীপে তাকে খুঁজে পেয়েছিল। আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে যে তারা বলেছিল, আলেকজাণ্ডার সেলকার্ক তখন তার কথাগুলি অর্ধেক-অর্ধেক মাত্র উচ্চারণ করেছিল। মিঃ কেম্‌পিও তাই করলেন। এক অজ্ঞাত সন্ন্যাসীর যে ভজনালয়ের পাশে আমাদের দেখা হয়েছে ঠিক তারই মত প্রাচীন একটি চিহ্মার ভগ্নস্তূপ থেকেই যেন তার কথাগুলি উচ্চারিত হয়েছিল।

"তথাপি আমি যেন বিড়ালের মত আতংকিত হয়ে পড়লাম। লোকটির বিস্ফারিত বিবর্ণ চোখ, অঙ্গভঙ্গী, অতি উচ্চ কণ্ঠস্বর—সবকিছু যত অদ্ভুতই হোক তার মধ্যে কোন বিদ্বেষ ছিল না, অসৌজন্যের প্রকাশ ছিল না; অনধিকার প্রবেশকারী রূপেও তিনি আমাকে কোন তিরস্কার করেন নি; বরং যেভাবে তিনি শূন্যে আঙুল নাড়তে লাগলেন তাতে পরিষ্কার বুঝতে পারলাম যে তিনি ইসারায় আমাকে ডাকছেন। অবশ্য তার সঙ্গে যাবার কোন ইচ্ছা আমার হয় নি। তখনও আমি তাকে দেখেই সময়টা কাটিয়ে দিতে লাগলাম। সময় কাটাবার জন্য আর একবার ভজনালয়টির বয়স ও স্থাপত্য সম্পর্কে তাকে প্রশ্ন করলাম—শেষ পর্যন্ত সরাসরি জানতে চাইলাম, ভিতরটা একবার দেখা যেতে পারে কি না।

"তিনি আমার প্রশ্নের কোন জবাব দিলেন না, বরং পাল্টা জানতে চাইলেন, কেমন করে আমি এই নির্জন অঞ্চলে এসেছি। বুঝলাম, তিনি আমার সঙ্গে চাতুরি করছেন, কারণ কিভাবে আমি এখানে এসেছি সেটা

তো তার কাছে অজানা থাকবার কথা নয়; তার চোখ তো আগাগোড়াই আমার উপরে ছিল।

"তবু তাকে জানালাম যে আমার পথটা 'গোলাপে ঢাকা ছিল না,' রাত নেমে আসার আগেই আমি ফিরে যেতে চাই, আর এই আশ্চর্য ধ্বংসস্তূপটা ভাল করে দেখার বাসনা ছাড়া আমার এখানে আসার অন্য কোন উদ্দেশ্যই



নেই। তার দৃষ্টি একবার পাথরের আশ্রমটির দিকে ঘুরেই আবার ফিরে এসে আমার হাতের উপরে পড়ল। এ ছাড়া তিনি দাঁড়িয়ে রইলেন সম্পূর্ণ নিশ্চুপ।

"বাতাস ফুল-পাতার গন্ধে আমোদিত; এমন যাদুকরী অন্ধকারেও চারদিক এত পরিষ্কার যে মনে হল এ বুঝি এক স্বপ্নপুরী। তবু আমার পাশে দাঁড়ানো লোকটির উপর সজাগ, সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। তাকে ঘিরে

এমন একটা আলোর ছটা বিচ্ছুরিত হচ্ছে যাকে ঠিক বর্ণনা করা যায় না। মনে হয়, লোকটি বুঝি তার দেহকে ছেড়ে অনেক দূরে চলে গেছে—জানি, এ সবই উদ্ভট কথা। কথায় বলে না—তিনি যেন ঠিক এখানে নেই। আবার আমাদের চোখাচোখি হল, পরমুহূর্তেই আমার মনে হল, কখনও কোন মানুষের মুখে এরকম তীব্র ক্ষুধার প্রকাশ আমি দেখি নি। কিন্তু কিসের ক্ষুধা? সে কথা বলা অসম্ভব।

"তিনি আমাকে বার বার তাকে অনুসরণ করতে বললেন। 'চাবি' কথাটাও একবার কানে এল, সঙ্গে সঙ্গে তিনি এগিয়ে গেলেন। অনিচ্ছা-সত্ত্বেও একবার পিছন ফিরে তাকালাম—পাথরের প্রাচীন একটা গুহা; বনস্পতি পাইনের সারি, সবুজ ঘাসে-ঢাকা কিছু স্তূপ—তারপর তার পথেই পা ফেললাম। তিনিও পিছন ফিরে আমার দিকে তাকিয়ে উৎসাহের হাসি হাসলেন।

"পাশ-কপালিওয়ালা যে বাড়িটার দিকে তিনি আমাকে নিয়ে চললেন তাতে দেয়ালের চাইতে জানালার সংখ্যাই বেশী, নীচু গম্বুজ ও ধোঁয়াহীন চিমনিগুলোর উপর অস্তসূর্যের শেষ আলো এসে পড়েছে। তার পিছনেই খাড়া হয়ে উঠে গেছে পাহাড়ের প্রাচীর, আর একটুখানি সবুজের মাঝখানে বাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে প্রেতাত্মাপরিত্যক্ত একটা মমির মত।

"পাথর-বাঁধানো উঠোনটা পার হলাম। আমার আগে আগে মিঃ কেম্‌পি কাঠের সিঁড়ি বেয়ে উঠে নীচু ছাদের একটা ঘরে ঢুকলেন। ঘরটাতে আইভি-লতায় ঢাকা একটিমাত্র জানালা, আর মেঝেটা পাথরের। দেয়ালে কোন তরুণীর একটিমাত্র অস্পষ্ট প্রতিকৃতি ঝুলছে, তাছাড়া বাকি সবটাই বইয়ের তাকে ঠাসা। চারদিকে ইতস্তত ছড়িয়ে আছে শুধু বই আর বই: টেবিলে, চেয়ারে, মেঝেতে, সর্বত্র বই-বাঁধার চামড়ার গন্ধ।

"ইসারায় আমাকে একটা চেয়ার দেখিয়ে দিয়ে অপর একটা চেয়ারের উপর থেকে বইপত্র সরিয়ে গৃহস্বামী নিজে বসলেন। ঘরটা নিশ্চয় দুপুর বেলাতেও অন্ধকার হয়ে থাকে, গোটা বাড়িটাই তো অন্ধকার। আমরা ঘরে ঢোকার পরেও দরজাটা খোলাই রইল, তার ওপাশেই নিস্তব্ধ সিঁড়িটা।

এতক্ষণে স্কুল-শিক্ষকটি থামল। "নীল শুয়োর"-এর মাল্‌কিন আর একবার তার ছোট ঘর থেকে বেরিয়ে এল, আর সঙ্গে সঙ্গে আমরা তিনজনই তিনটে খালি গ্লাস কাউণ্টারের উপর ঠেলে দিলাম।

"তারপর কি হল?" আমি শুধালাম।

পায়ে পট্টিওয়ালা লোকটি তার কচ্ছপের মত মাথাটা আমার দিকে একটু-খানি ঘোরাল মাত্র।

স্কুল-শিক্ষকটি মাল্‌কিনের অপসৃয়মান শরীরটার দিকে তাকিয়ে থেকে

তারপর আবার বলতে শুরু করল। "মিঃ কেম্‌পি কথা বলতে লাগলেন। প্রথমে অতিদ্রুত এবং প্রায় অসংলগ্ন, কিন্তু ক্রমেই তার কথার গতি কমে এল এবং কথাগুলিও মোটামুটি বোধগম্য হয়ে উঠল। বললেন, তিনি একজন নিঃসঙ্গ সংসার-বিবাগী ; ভজনালয়টি জনসাধারণের সাধন-ভজনের স্থান নয় ; তার কাছে লোকজন বড় একটা কেউ আসে না. তিনি একজন বিদ্যার্থী ; কাজেই পুঁথিপত্র ছাড়া অন্য কোন সঙ্গীর কোন প্রয়োজনও তার নেই। লম্বা হাতটা বাড়িয়ে তিনি তার অবসরক্ষণের সঙ্গীদের দেখালেন। তারপরই হঠাৎ কথার স্রোত থামিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, আমাকে কেউ সেখানে পাঠিয়েছে কি না। আমি জোরের সঙ্গেই তাকে বললাম যে আমি স্বেচ্ছায় সেখানে এসেছি এবং ভজনালয়ে ফিরে যাবার আগে তিনি আমাকে এক গ্লাস জল খাওয়াতে পারেন কি না। তিনি ইতস্তত করতে লাগলেন।

বারবার বললেন, "জল ? ওঃ, জল ?" তারপরই অদ্ভুত অঙ্গভঙ্গী করে ঘরটা পার হয়ে গিয়ে বাইরে থেকে দরজাটা বন্ধ করে দিলেন। টম-টমের উপর ছড়ির শব্দের মত সিঁড়িতে তার বুটের শব্দটা কেমন যেন ফাঁকা শোনাল। দরজায় ক্যাঁচ্ করে একটা শব্দ হল, মুহূর্তকাল পরে তিনি ঘরে ঢুকলেন, হাতে নীল বর্ডার টানা, হাতলওয়ালা একটা পেয়ালা। মাথার উপরকার ছবিটার দিকে একবার তাকিয়ে একচুমুকে বরফ-ঠাণ্ডা জলটা খেয়ে পেয়ালাটাকে দুটো বইয়ের মাঝখানে রেখে দিলাম।

"আমি উপরের রাস্তাটায় ফিরে যেতে চাই," চেঁচিয়ে বললাম।

"মনে হল তিনি যেন আশ্বস্ত হলেন। মুখ বন্ধ করে বসে বসে আমাকে দেখতে লাগলেন। "ওঃ, উপরের রাস্তাটা!"

"কিন্তু কেন ?" যেন আমি অনেক দূরে বসে আছি এমনিভাবে হঠাৎ তিনি গলা চড়িয়ে আমাকে প্রশ্ন করলেন। ভাঁজ-করা দুই হাঁটুর উপর হাত দুটো চেপে রেখে তিনি সোজা হয়ে বসলেন।

"কেন কি ?"

"কেন তুমি এখানে এসেছ ? এখানে গোয়েন্দাগিরি করার কি আছে ? এটা আমার ব্যক্তিগত সম্পত্তি। তুমি কি কর—মানে খাওয়া জোটে কি করে ? এসব করে লাভটা কি ?"

আচরণটা অস্বাভাবিক—বিশেষ করে দুজন অপরিচিত লোকের মধ্যে। তবু ব্যাপারটা মেনেই নিলাম। বয়সে তিনি আমার চাইতে অনেক বড়। বললাম, "আমি একজন স্কুল-শিক্ষক, এখন ছুটিতে আছি। নেহাৎ ঘুরতে ঘুরতেই এখানে এসে পড়েছি।"

"ঘুরতে ঘুরতে! আর আপনি একজন শিক্ষক!" চোয়াল শক্ত করে তিনি চীৎকার করে উঠলেন। "কি শেখান আপনি ? ভূরি ভূরি মিথ্যে কথা বোধ হয় ; না কি যতসব বাজে ঘটনা।" লম্বা, বিবর্ণ মুখের উপর

থেকে হাতটা নামালেন। আমার চোখ দরজার দিকে। তিনি বলতে লাগলেন, "মানুষ যদি যন্ত্রমাত্র হত তো বেশ হত। কিন্তু ওগো আমার যুবক বন্ধু, মানুষ তো যন্ত্রমাত্র নয়। তাদের দেহে যদি আত্মা বলে কিছু থাকে, তাহলে? ধর, তোমার দেহে একটি আত্মা আছে: তাহলে? আহা, তার প্রমাণ! প্রমাণ!"

স্কুল-শিক্ষকের বাঁকা ঠোঁটে স্মিত হাসি ফুটে উঠল। বলতে লাগল, "সে সন্ধ্যায় আমাদের মধ্যে যে কথাবার্তা হয়েছিল তার হুবহু বিবরণ আমি দেব না। শুধু সারাংশটাই বলছি। তাঁর জীবনে ছিল শুধু একটি লক্ষ্য, চিন্তা, ও কামনা। অবসর জীবনের সবগুলি বছর তিনি কাটিয়েছেন একটিমাত্র অনুসন্ধানে—মানুষের যে একটি আত্মা আছে সেটি প্রমাণ করতে। আরও কিছু সময় পরে আমার মনেও কিছু কিছু সন্দেহের উদয় হয়েছিল, কিন্তু প্রথম থেকেই একটা কথা আমি পরিষ্কার বুঝেছিলাম যে এই অনুসন্ধানের কাজে তিনি কাউকে রেহাই দেন নি—না নিজেকে, না মৃত স্ত্রীকে। আরও বুঝতে পেরেছিলাম যে উন্নত মস্তিষ্কের অধিকারী হলে এরকম একটা বিষয় নিয়ে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে অনুসন্ধান চালানো যায় তা তাঁর ছিল না।

"টেবিলের উপর রাখা ফুলস্কেপ কাগজে লেখা পাণ্ডুলিপির কয়েকটি অধ্যায় তিনি আমার হাতে গুঁজে দিলেন—পাণ্ডুলিপির স্তূপটা অন্তত আঠারো ইঞ্চি উঁচু তো হবেই। পাঠ্যবস্তুই বটে। পৃষ্ঠার উপরের দিকের কালি ঝাপসা হয়ে গেছে, চায়ের দাগ লেগেছে। পুঁথির সংক্ষিপ্ত নাম 'আত্মা'—অবশ্য পরে যেসব শিরোনাম বসানো হয়েছে সেগুলি কোন 'শারীর বিদ্যা'র লেখকের অনুপযুক্ত হত না।

"সেই উদ্ভট হস্তাক্ষরের দু' একটি পংক্তির বেশী আমি একসঙ্গে পড়তে পারি নি। প্রতিটি পৃষ্ঠায় বড় বেশী কাটাকুটি করা হয়েছে, পরিবর্ধন ও পরিবর্জন করা হয়েছে, শুধু যে পেন্সিলে তাও নয়, বেগুনি আর লাল কালিও ব্যবহার করা হয়েছে। বেশীর ভাগই লেখা হয়েছে লাতিন, হিব্রু ও অন্য কিছু অপ্রচলিত ভাষায়। এলোমেলোভাবে কয়েকটা পাতা ওল্টাতেই পৃষ্ঠা-শিরোনাম হিসাবে 'ধ্যান', 'স্বপ্ন', 'আত্ম-নিগ্রহ,' 'মৃতদেহ,' 'শৈশব,' ইত্যাদি শব্দগুলি চোখে পড়ল। যদিও পাণ্ডুলিপি দেখেই কোন গ্রন্থের গুণাগুণ বিচার করা উচিত নয়, তবু আমি পাণ্ডুলিপির পাতাগুলিকে সাবধানে টেবিলের উপর রেখে দিলাম।

"তিনি মনের সুখে সব কথা বলতে লাগলেন। এই সাধনার পথে তিনি নিজে যে কষ্ট সয়েছেন তার চাইতেও জীবনের শেষ ক'টি বছর মিসেস কেম্পির অবস্থার কথা ভেবেই আমি মন দিয়ে তার কথাগুলি শুনতে লাগলাম। মহিলাটি নিশ্চয় ধীরে ধীরে মৃত্যুর পথে এগিয়ে গিয়েছিলেন। যতদূর বুঝতে পারলাম, ছোট বাগানটির পরিচর্যা করতে এবং অতি সাধারণ

আহার্য প্রস্তুত করতে যেটুকু সময় লাগত তাছাড়া বাকি সময়টা তিনি কখনও মিসেস কেম্পিকে ছেড়ে যেতেন না। বেচারির দেহটা ধীরে ধীরে ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে, আর দিনের পর দিন মিঃ কেম্পির প্রাত্যহিক প্রশ্নাবলী, প্রাত্যহিক পরীক্ষা জরুরী ও বেপরোয়া হয়ে উঠেছে।

"তাই বলে এই যন্ত্রণাক্লিষ্ট বৃদ্ধ লোকটি যে তার স্ত্রীকে ভালবাসতেন সে-বিষয়েও কিন্তু কোন সন্দেহ নেই। স্ত্রীর মৃত্যুশয্যায় তাদের দুজনের মধ্যে যে কথোপকথন হয়েছিল তার বিবরণ দিতে গিয়ে বৃদ্ধের দুটি শূন্য চোখের দৃষ্টি যেরকম আবেগে নরম হয়ে এসেছিল তাতেই আমি পেয়েছিলাম গাঢ় ভালবাসার প্রমাণ।

"মিসেস কেম্পির শেষ সময়কার দু' একখানি ফটো তিনি আমাকে দেখালেন—ফটোগুলি তার সেকেলে ক্যামেরায় তোলা এবং ওঁদের ঘরেই 'ডেভেলপ' করা। আত্মাই বটে' আর কিছুই তখন অবশিষ্ট ছিল না। ফটোর আবছা মুখখানিতে ফুটে উঠেছে একটা অদ্ভুত করুণ হাসি; ফাঁকা দৃষ্টি পড়েছে যন্ত্রটার চামড়ার টুপিটার দিকে। বিবর্ণ কাগজের উপর অস্পষ্ট হয়ে আসা মুখের নাক ও চোখ এমনভাবে বসে গেছে যে সেটা যেকোন ভূতের প্রতিকৃতিও হতে পারত।

"হঠাৎ তিনি চীৎকার করে বলে উঠলেন, 'তুমি বুঝতে পারবে না—তোমরা যারা বাইরের জগতে বাস কর তারা কেউ বুঝতেও পারবে না—যে চরম প্রশ্ন আমাকে ছুটিয়ে নিয়ে চলেছে তার একটা হাঁ কি না জবাবের সঙ্গে তুলনায় এ পৃথিবীর কোন কিছুরই তিলমাত্র গুরুত্ব নেই। আমরা যদি মরণশীল জন্তু-জানোয়ারের চাইতে বেশী কিছু না হই তো আমাদের মৃত্যুই ভাল। স্বর্গ থেকে একটা আগুন নেমে এসে আমাদের পুড়িয়ে ছাই করে উড়িয়ে নিয়ে যাক। কোন কিছুকেই আমি আর ভয় করি না। সবরকম বিপদকে আমি পার হয়ে এসেছি। কোনরকম নাস্তিকতার কথা আমি বলছি না। কাউকে চ্যালেঞ্জও জানাচ্ছি না; কোন কিছু অস্বীকার করছি না—আমি এক দীন সত্যপথযাত্রীমাত্র। কিন্তু না। কিছু নয়। কিছু নয়। একটি কথাও নয়।' চেয়ার থেকে উঠে গিয়ে দরজা খুলে তিনি বাইরে তাকালেন; আবার ফিরে এলেন।

"আঙুলগুলো আমার দিকে ঘোরাতে ঘোরাতে বললেন, 'এ ধরনের নজর রাখা, গুপ্তচরের মত উঁকি-ঝুঁকি মারা আমি অপছন্দ করি—একেবারেই অপছন্দ করি। মানুষ হিসাবে বুড়ো আদমের কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে যেসব প্রাকৃতিক রহস্যকে পেয়েছি তার উপর তোমাদের এই হীন হস্তক্ষেপ—এসব বন্ধ কর! আমি বলছি এখানে আমি একজন অতিথিমাত্র। আমি বলছি'—নিজের শুকনো শুকনো কংকালসার দেহটার দিকে অঙ্গুলি-সংকেত করে তিনি বলতে লাগলেন—'এটা একটা ভাড়াটে বাড়ি মাত্র। আমি চাই

একটি প্রমাণ। জানি, যেসব হীন নাস্তিক তাদের তথাকথিত বিজ্ঞানের জন্য জীবন পর্যন্ত বিসর্জন দেয় আমার সে প্রমাণ তাদের ধমনীর গতিকে মুহূর্তের জন্যও থামিয়ে দিতে পারবে না।'

"তিনি উচ্ছ্বাসের সঙ্গে বললেন, 'আমি তো একজন দার্শনিকও নই। আমি এখানে একা, একটি মূর্খ পথিক। এই পরম রহস্যের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছি আমি একা। আমারও তো সাহায্যের দরকার!'' তার কণ্ঠস্বর থেমে গেল, দুই হাত বাড়িয়ে শূন্য দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে বসে রইলেন।

"এইভাবেই চলতে লাগল। এই চেয়ার ছেড়ে উঠছেন, বইয়ের এ-তাক থেকে ও-তাকে ঘুরছেন, পাতার পর পাতা উপ-শিরোনামগুলি দেখে পুঁথির পর পুঁথি আমার হাতে তুলে দিচ্ছেন প্রমাণ হিসাবে, আর সেইসঙ্গে অদ্ভুত অঙ্গভঙ্গী করে এমন সব ভাঙা ভাঙা মন্তব্য করছেন যা বোঝা আমার অসাধ্য। আমার চারদিকে বইয়ের ঢেউ বইতে লাগল।

"তারপব আবার চেযারে এসে বসছেন, অনভ্যস্ত ভাঙা গলায় সমানে বক্তৃতা করে চলেছেন, আর সে কণ্ঠস্বর চড়তে চড়তে আর্তনাদে পরিণত হচ্ছে।''

"আমার দিকে তাকিযে তিনি চীৎকার করে উঠলেন, 'সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, তুমি ওখানে বসে আছ, বেঁচে আছ, শ্বাস-প্রশ্বাস নিচ্ছ, তুমি একটি মানুষ; আর এই জঘন্য মুখোশধারীদের একমাত্র প্রমাণ এখনও অনিশ্চিতই রয়ে গেছে।' তিনি আকাশের দিকে হাত ছুঁড়তে লাগলেন। মহাশূন্যকে লক্ষ্য করে চীৎকার করে বললেন, 'আমার সঙ্গে এই পৃথিবীকে সমানভাগে ভোগ করবার কী অধিকার তার আছে!'

"আবার তিনি ফিরে গেলেন নীরবতার রাজ্যে, আত্ম-সংযমের মধ্যে—আবার সেই সর্বগ্রাসী একাগ্র দৃষ্টি। মনে হল, এখানে আমার উপস্থিতিটা একান্তই অবান্তর। মিঃ কেম্পি দেখছেন, কথা বলছেন তার নিজেরই ছায়ার সঙ্গে।

"আরও একবার সেই একই হুংকারের পরে তিনি যেন ক্লান্ত হয়ে মুহূর্তের জন্য চেয়ারে শরীরটা এলিয়ে দিলেন। সেই সময়ে তার হাত থেকে আরও কয়েকখানি জীর্ণ ফটোগ্রাফ কার্পেটের উপর ছড়িয়ে পড়ল। আমি তো সারাক্ষণ একাগ্র দৃষ্টিতে তার দিকেই তাকিযেছিলাম। দু'এক সেকেণ্ড পার হতে না হতেই একলাফে আমি সেগুলো কুড়িয়ে নিতে গেলাম। কিন্তু মিঃ কেম্পি ততোধিক ক্ষিপ্রতার সঙ্গে উপুড় হয়ে হাত বাড়াতেই আমাদের দুজনের মাথার খুলিতে এত জোরে একটা ঠোকাঠুকি হল যে মুহূর্তের জন্য আমি বুঝি সবকিছু ভুলে গেলাম।

"কিন্তু চোখের গতিও মনের গতির সঙ্গে তাল রেখেই চলে। ঠোকা-

ঠুকিটা যত তাড়াতাড়িই ঘটুক না কেন তার ফাঁকেই মেঝেতে পড়ে থাকা দু' একটা ফটোর উপর আমার চোখ পড়ে গেল ; সে ফটো এই বিপত্নীক বৃদ্ধেরও নয়, তার স্ত্রীরও নয়। বিদ্যুৎ-চমকের মত এই ছবিটা আমার মনের মধ্যে গাঁথা হয়ে গেল। সন্ত্রাশে খানিকটা পিছিয়ে গেলাম। তিনি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তার প্রমাণগুলো কুড়িয়ে নিতে লাগলেন, আর সেই ফাঁকে আমি দরজার দিকে ছুটে গেলাম। তার মস্ত বড় মুঠোর মধ্যে ফটো-গুলো সহজেই বন্দী হল। ভালুক যেভাবে মৌচাককে থাবার মধ্যে আটকে ধরে ঠিক তেমনিভাবে তিনি ফটোগুলোকে দুমড়ে-মুচড়ে মুঠোর মধ্যে ধরে রাখলেন। তারপর ধীরে ধীরে এলোমেলো পাকাচুলে ভর্তি মাথাটা তুলে আমার দিকে তাকালেন।

"আমি একটুক্ষণ চুপ করে রইলাম। তারপর যথাসম্ভব নরম গলায় প্রশ্ন করলাম, 'মাঝে মাঝে কোন আগন্তুক কি আপনার কাছে আসে ?'

'যুবক, কোন্ আগন্তুকের কথা তুমি বলছ তা জানতে পারি কি ?' মিঃ কেম্‌পির কণ্ঠস্বরে একটা অসাধারণ পরিবর্তন দেখা দিল ; কেমন যেন ফাঁকা আওয়াজের মত শোনাল। কিছুক্ষণ তার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রইলাম।

"তারপর একসময় জবাব দিলাম, 'এই আমার মত। যারা এখানে আসে শুধু– মানে, কৌতূহলের টানে। এখানে আসার তো আরও একটা পথ আছে, তাই না ?"

"তখন আমার একমাত্র বাসনা মিঃ কেম্‌পির চিন্তাকে যুক্তিগ্রাহ্যতার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা। তাকে একটা রাক্ষস বানিয়ে তুললে আমারই মাথা খারাপ হয়ে যাবে। তবুও এখন তাকে সেই হঠাৎ-দেখা ফটোগ্রাফগুলোর মাধ্যমেই দেখতে লাগলাম। কিন্তু কি দেখলাম ? অনেক উপর থেকে একটা মানুষের পতন দেখাটা সুখকর অভিজ্ঞতা নয়। ফটো তো আরও অনেক আছে ; আর সেগুলো তার নিজের ফটো নয়। মিঃ কেম্‌পিকে তখন এত বৃদ্ধ ও অসহায় দেখাচ্ছে—যেন ঈশ্বরপ্রেরিত কোন প্রবৃত্তির শেকলে বাঁধা একটি জন্তু। সে কী ভয়ংকর হতাশা !"

"তারপর ? যেকোনদিন সকালে সংবাদপত্রের পাতা খুললেই সংবাদের পৃষ্ঠায় কি দেখতে পাবেন : গোলাপী পেটিকোট-পরিহিতা একটি নির্দোষ মহিলার ছবি, অথবা সন্ন্যাসীর আলখাল্লায় ঢাকা একটি হাস্যকর বৃদ্ধের ছবি ?"

পায়ে পট্টিবাঁধা কচ্ছপাকৃতি লোকটি আর একবার নড়েচড়ে বসল। এবার তার ক্ষুদে চোখদুটি আমার দিকেই ঘোরানো।

স্কুল-শিক্ষকটিকে জিজ্ঞাসা করলাম, "শেষ পর্যন্ত আপনি সেখান থেকে ছাড়া পেলেন কেমন করে ?"

সে জবাব দিল, "দেখুন, আমি যেরকম সারাক্ষণ মিঃ কেম্‌পির উপর নজর রেখেছিলাম, ঠিক তেমনই তিনিও আমার উপর নজর রেখেছিলেন,

কিন্তু মনে হয়, আমি যে তার কাছ থেকে কতটা দূরে দাঁড়িয়েছিলাম সেটা তিনি ঠিকমত বুঝতে পারেন নি। আর একবার তার কণ্ঠস্বর ও গতিবিধি পাল্টে গেল। তিনি আত্মস্থ হবার ভান করলেন। আমাকে একজন বিদেশী রাজপুত্রের উপযোগী অভ্যর্থনা জানাতে জনৈক অবসরপ্রাপ্ত বৃদ্ধ পণ্ডিতের মত তিনি বললেন, 'আজকের দিনটা কী আশ্চর্য ; আমার একমাত্র দুর্ভাগ্য যে এর জন্য আমি প্রস্তুত ছিলাম না, তোমাকে উপযুক্ত আতিথেয়তার সঙ্গে স্বাগত জানাবার সঙ্গতি আমার নেই। পথে আসতে তোমার নিশ্চয় খুব কষ্ট হয়েছে। দেখ না, নিজের কাজের ধান্ধায় তোমাকে হাত-মুখ ধুয়ে নেবার কথাটা বলতেও ভুলে গেছি।'

"আপনা থেকেই আমার চোখ পড়ল তার দুখানি হাতের উপর। যেন ম্যাকবেথের হাত। তার হাতে আমি যেন রবিবারের স্কুলের একটি অক্ষম শিশুমাত্র। তাছাড়া, আমি জানতাম, তার ভেঙে-পড়া পর্যবেক্ষণ-বুরুজ থেকেই হোক, আর জঙ্গলের মধ্যে কোন গুপ্তস্থান থেকেই হোক,—আমার পথচলার উপর কারও একাগ্র দৃষ্টি অবশ্যই ছিল। তার দৃষ্টিকে এড়িয়ে দুই হাত পকেটে ঢোকালাম।

"ভারী গলায় তিনি আবার বললেন, 'এক মিনিট এখানে অপেক্ষা কর, ভজনালয়ের চাবিটা নিয়ে আমি এখনই আসছি। এরকম ভজনালয় তুমি দুটি খুঁজে পাবে না। প্রাচীনকালে সেখানে একটি কূয়োও ছিল ; এমন কি প্রত্নতাত্ত্বিকরাও সেটার কাল সম্পর্কে একমত নয়। আগে তো তারা দলে দলে সেটা দেখতে আসত, কত তর্ক-বিতর্ক হত। আরে, আমিই তো প্রমাণ করে দিতে পারি কূয়োটার অন্তত একটা অংশ নবম শতাব্দীর পরবর্তী কালের নয়। আর ভিতরকার অংশটা · কিন্তু না, দেখ বাবা, এখনই অন্ধকার হয়ে যাবে, আর—না, না,—আজ রাতে এ বাড়ি থেকে চলে যাবার কথাই ভেবো না। আমার একজন সঙ্গী দরকার, সত্যি দরকার।' আর একবার চকিতে আমার দিকে তাকিয়ে তিনি দ্রুতপায়ে দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন।

"তার সান্নিধ্যে থাকায় তখন আমার প্রচণ্ড অনীহা ; তাই তাকে পথ করে দিতে একটু সরে দাঁড়ালাম। পাকা চুলে ভর্তি মাথাটা একটুও কাৎ না করে তিনি আমাকে পাশ কাটিয়ে চলে গেলেন ; কিন্তু জানালা দিয়ে আসা ম্লান আলোয় দেখলাম, দূরবিস্তার সমুদ্রের মত তার দুটি চোখের দৃষ্টি আমার উপর নিবদ্ধ—মহাশূন্যের দুটি প্রাণহীন গ্রহ যেন।

"নিজেকে তিনি যে কত বড় মূর্খ প্রমাণ করতে চলেছেন তার পূর্বাভাষ হয়তো একটি যুবকের মনেও দেখা দিল। অবশ্য পূর্বাভাষ তিনি পেলেন অনেক দেরিতে। তিনি ঘর থেকে বেরিয়েই দরজাটা টেনে দিলেন। চাবি ঘোরাবার শব্দ শুনবার জন্য আমি অপেক্ষা করে রইলাম। হাতলটা ঘুরিয়ে দেখার চেষ্টাও করলাম না। যত দ্রুত সম্ভব জানালার দিকে স্তূপীকৃত বইয়ের উপর

আঙুলে ভর দিয়ে দাঁড়ালাম। কাঁচের পাল্লাটা নোংরা, সিট্‌কিনিটাও ভাঙা। গোব্‌রাটের ঠিক নীচে নেমে যাওয়াটা বিছানায় শুয়ে পড়ার মতই সহজ। মাত্র দশ ফুট নীচে লতাপাতার একটা জঙ্গল; কিন্তু জানালার কব্জা-গুলোতে মর্‌চে পড়ছে; ঋতু-পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কাঠও কখনও শুকিয়েছে কখনও ফুলেছে।

"দরজায় তালা লাগাবার পরে আর কোন শব্দই কানে আসে নি। মিঃ কেম্‌পি যদি পায়ের বুট খুলে না থাকেন, তাহলে নিশ্চয় দরজার বাইরে দাঁড়িয়েই বুদ্ধিতে শান দিচ্ছেন। আবার পা টিপে টিপে দরজার কাছে ফিরে গেলাম। চীৎকার করে বললাম, 'দয়া করে আমার জন্য কষ্ট ভোগ করবেন না। আমি না হয় অন্য সময় আবার আসব।'

"পরমুহূর্তেই আবার জানালার কাছে ফিরে গিয়ে কান পাতলাম। শেষ পর্যন্ত সশব্দে জবাব এল উপরের কোন ঘর থেকে। কিন্তু কিছুই বুঝতে পারলাম না—কতকগুলি অর্থহীন হ-জ-ব-র-ল যেন উচ্চারিত হল। আর ইত-স্তত করা কোনমতেই উচিত নয়। একটা কুশন তুলে নিয়ে সমস্ত শক্তি দিয়ে জানালার জীর্ণ ফ্রেমের উপর সেটাকে সজোরে চেপে ধরলাম। বিস্ফোরণের মত একটা শব্দ করে জানালাটা খুলে গেল। আমিও প্রস্তুত ছিলাম। এক-মুহূর্ত দাঁড়ালাম। তারপরই ত্বরিতে সেই গবেষণাগার, ইতস্তত ছড়ানো পুঁথিপত্র, কাগজের জঞ্জাল, কালো সিলিং, ভাঙা বাতি, আর দেয়ালে ঝোলানো একটি মহিলার প্রায় মুছে-যাওয়া অস্পষ্ট প্রতিকৃতির দিকে শেষবারের মত তাকিয়ে নিঃশব্দে জানালার গোব্‌রাটে উঠে গেলাম। তারপর একটা লাফ। নীচের লতাপাতা সম্পূর্ণ পচে গিয়েছিল, একটা ডাল ভাঙার শব্দও হল না।

"মাটিতে পা দিয়েই এই লজ্জাকর পলায়নের জন্য অনুতাপ হল। আমি একটি যুবক—বয়সে মিঃ কেম্‌পির চাইতে অন্তত ত্রিশ-চল্লিশ বছরের ছোট—আমার আত্মা থাক আর নাই থাক, একটা সক্ষম দেহ তো আছে। নিশ্চয় আমি সাহসে ভর করে রুখে দাঁড়াতে পারতাম!—জীবনের রহস্য তো একটি-মাত্র নয়। কিন্তু সে চিন্তা বেশীক্ষণ স্থায়ী হল না। যে বাড়িটা থেকে এইমাত্র বেরিয়ে এসেছি তার দিকে একবার তাকালাম, তার ঝোলানো পাশকপালি, ছিট-ছিট কালো দেয়াল নিয়ে অন্ধকার আকাশের নীচে দণ্ডায়মান বাড়িটাকে তার অধিবাসীর মতই দুঃখজনক ও অস্বস্তিকর বলে মনে হল।

"যত তাড়াতাড়ি ও নিঃশব্দে সম্ভব বাড়িটার চৌহদ্দি পেরিয়ে একটা নীচু দেয়াল পার হয়ে জঙ্গলে ঢুকলাম। ভাগ্যক্রমে চিমনিগুলোর মাথার উপরে একটা "বায়ু-লাঙল" ছিল: সেটা দেখেই বুঝতে পারলাম কোন্‌দিকটা উত্তর। নিস্তব্ধ গাছপালার নীচ দিয়ে পশ্চিম মুখে উপরের দিকে উঠতে উঠতে এক-জায়গায় থামতে হল।

"বাড়িটা দৃষ্টির আড়ালে চলে গেছে; তার মালিককে ফেলে এসেছি

তার নিজের জায়গায়, তার গবেষণার কাজের মধ্যে। পাথরের ছোট ভজনালয়টির অভ্যন্তর ভাগ, অথবা আশপাশের মাটিতে যারা চিরদিনের মত ঘুমিয়ে আছে তাদের চিরস্মরণীয় করে রাখবার জন্য কয়েকখানা পাথরের উপর যা লিখে রাখা হয়েছে—সেসব ভাল করে দেখবার কোন বাসনাই মনে জাগল না।

"সম্ভবত আমিই একমাত্র আগন্তুক নই যাকে এভাবে বিনা অনুষ্ঠানে এই উপত্যকার একমাত্র আশ্রয়স্থল থেকে বিদায় নিতে হয়েছে। অরণ্যের নিস্তব্ধতাকে বিদ্বিত করে যে উন্মাদ কান্নার ধ্বনি তখনও দূর থেকে ভেসে আসছে তার ডাকে আবার সেখানে ফিরে যাবার মত লোক যে কেউ থাকতে পারে সেটা আমি কল্পনাও করতে পারি না।"

পায়ে পট্টি-বাঁধা বন্ধুটি শুধাল, "আপনি কি বলতে চান যে বুড়ো মানুষটি কাঁদছিল?"

সরাইখানার বাইরে তখন দিনের আলো নিভে এসেছে, বৃষ্টির বেগ আরও বেড়েছে। লোকটি আবার সেই একই প্রশ্ন করল।

ঈষৎ তিক্ত স্বরে স্কুল-শিক্ষকটি বলল, "যা বলেছি ঠিকই বলেছি। আমি তো ঠিক পর্যটক নই, তাহলে আপনাকে বলতে পারতাম যে কুমীরের প্রিয়-সম্ভাষণের সঙ্গে সে শব্দের কোথায় যেন একটা মিল আছে।"

"হা ঈশ্বর!" বলে লোকটি বিদ্রূপের কাশি কাশল। তারপর মনস্থির করে আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। সরাইখানার মালকিনকে একটা "শুভ রাত্রি" পর্যন্ত না জানিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

বৃষ্টির শব্দ ছাড়া চারদিকে পরিপূর্ণ নীরবতা।

আমি সাহস করে শুধালাম, "আপনি আর কোনদিন সেখানে যান নি? অথবা—অথবা এবিষয়ে কোন কথা বলেন নি?"

স্কুল-শিক্ষকটি বলল, "কি জানেন, আমি বোকার মত কাজই করেছি। মিঃ কেম্পিকে সরলভাবে গ্রহণ করাই আমার উচিত ছিল। অভিযোগ করার মত কিছু তো ঘটে নি। তিনি তো আমাকে আমন্ত্রণ করে সেখানে নিয়ে যান নি। কোন আকস্মিক পর্যটক যদি এরকম একটা বিপদসংকুল পথ পার হতে না পেরে থাকে সেটা তো তার দোষ হতে পারে না। তিনি তো মানব জাতির সেইসব হবু কল্যাণকর্মীদের একজন মাত্র যারা ভুল পথে যায়, পথ হারিয়ে ফেলে, এবং ভুল পথে বাঁক নিয়ে বৃথাই ঘুরে মরে।" কাউণ্টারের উপর আঙুল ঘসতে ঘসতে বলল, "সৌখীন অভিযাত্রী, আপনিই বলুন তিনি কি ব্যতিক্রম?" আমাকে নয়, সে প্রশ্ন করল নিজেকেই।

মাথা নাড়লাম। "কিন্তু আপনার নিজের কি ধারণা—তিনি কি ঠিক জানতেন—মিঃ কেম্পি?"

"আত্মার কথা?"

আমি তার কথারই প্রতিধ্বনি করলাম। "হ্যাঁ, আত্মার কথা।"

কথাটা চুপি চুপি বললেও আমাদের কণ্ঠস্বর সরাইখানার মাল্‌কিনের কানে গেল। আর, হায় রে, সে তখনই দোকানের আলোটা জ্বেলে দিল।

স্কুল-শিক্ষকের মুখের উপর নেমে এল মানুষের আদিমতম পূর্বপুরুষের গাম্ভীর্য। বলল, "ঠিক বলতে পারি না। হঠাৎ কোন ভ্রমণার্থী সেখানে হাজির হলে সেই উপত্যকাটি তার কাছে কতটা ঘনবসতিপূর্ণ বলে মনে হতে পারে সেটাও তিনি জানতেন কিনা সে বিষয়েও আমি নিশ্চিত নই। তাছাড়া, তার কণ্ঠস্বর শুনে বিচার করলে বলতে হয় তিনি একটিমাত্র মানুষ নন। সেদিন সন্ধ্যায় অন্তত তিনজন মিঃ কেম্‌পি সেখানে হাজির ছিলেন। আর তাদের যেকোন একজনের সঙ্গে আবার আমার দেখা হোক—সেটা আমি কখনও চাই না।"

"তারপর? ফেরবার পথটা কি অপেক্ষাকৃত সহজ মনে হয়েছিল—পাহাড়ের উপকার নতুন পথটা?"

"অপেক্ষাকৃত বটে," স্কুল-শিক্ষক বলল। "যদিও সময় লেগেছিল বেশী। কিন্তু মে মাসের রাত তো খুব ছোট, এমন কি সে জায়গার মত জঙ্গলভরা দেশেও।"

কোন কথা না বলে তার দিকে তাকিয়ে রইলাম; আমার ঠোঁটে আরও একটি অনুচ্চারিত প্রশ্ন।

তার বন্ধুত্বপূর্ণ হাসি দেখে মনে হল সেও সেটা বুঝতে পেরেছে। কোন কথা না বলে সে আসন থেকে নামল, শূন্য গ্লাসটার দিকে একবার তাকাল। এই প্রথম আমার নজরে পড়ল যে তার দুটি নীলাভ হাতই পুরো দস্তানায় ঢাকা। বলল, "অনেক রাত হয়েছে।" অস্বীকার করার উপায় নেই। আর "নীল শুয়োর"-এর ভিতরটা যে বাইরের বর্ষণমুখর রাতের চাইতে বেশী অতিথিপরায়ণ তাও তো নয়।

মানুষ কী বিস্ময়কর! কিন্তু স্কুল-শিক্ষককে সে কথা বললাম না। এক বিষণ্ণ চিন্তার মধ্যে সে যেন ডুবে গেছে; তার মুখে অনেক বলীরেখার গোলকধাঁধা। তাকে ছাড়িয়ে—ভাঙা আয়নাটার মধ্যে—টুলে উপবিষ্ট তার ছায়াটা দেখতে পেলাম। মনে হল, যে কারণেই হোক আমি যেন তাকে ভীষণভাবে হতাশ করেছি। বেরিয়ে যাবার আগে দরজার হাতলে হাত রেখে তার দিকে আর একবার তাকালাম···

Mr. kempe—Walter De La Mare

বুটিদার পর্দা-ঢাকা ঘরটি

লেখক নিজের কানে যেরকমটি শুনেছে কলমের মুখে ঠিক সেইভাবেই নিম্নলিখিত বিবরণটি পেশ করা হচ্ছে, অবশ্য তার স্মৃতিশক্তিতে যতটা কুলিয়েছে। তাছাড়া, এই কাহিনীর সরলতাকে ক্ষুন্ন করতে পারে এরকম কোন অলংকরণকেও সযত্নে পরিহার করা হয়েছে। একটি অলৌকিক ত্রাসের গল্পকে আমি যেরকম শুনেছি এখানে তারই একটা মহলা দিচ্ছি মাত্র।

আমেরিকার যুদ্ধ তখন শেষ হবার মুখে; লর্ড কর্নওয়ালিসের বাহিনী ইয়র্ক টাউনে আত্মসমর্পণ করেছে; সেই বাহিনীর অফিসারসহ আর যারা বন্দী হয়েছিল সকলেই দেশে ফিরে এসে ক্লান্তি অপনোদন করছে, আর নিজেদের বীরত্বের কাহিনী বলে বেড়াচ্ছে। সম্ভবত কোন কাহিনীতে একজন নামহীন নায়ককে উপস্থিত করার অসুবিধাকে এড়াবার জন্যই মিস এস. তাদের একজন জেনারেল অফিসারের নাম দিয়েছিলেন ব্রাউন। তিনি একাধারে ছিলেন একজন যোগ্য অফিসার এবং উঁচুদরের ভদ্রলোক।

কোন বিশেষ কাজে পশ্চিমাঞ্চল পরিভ্রমণের সময় জেনারেল ব্রাউন একদিন হাজির হলেন একটি মফঃস্বল শহরে। শহরটির প্রাকৃতিক দৃশ্য অসাধারণ সুন্দর; যেকোন বিলেতি শহরের বৈশিষ্ট্য সেখানে অবশ্য লক্ষণীয়।

শহরটি ছোট। সুউচ্চ প্রাচীন গির্জা দীর্ঘ অতীতের সাক্ষ্য বহন করছে। চারদিকে ছোট ছোট গোচারণ ও শস্যভূমি। বিরাট সব বনস্পতি শহরের সীমান্ত-রক্ষীর মত বিরাজমান। কিছু কিছু আধুনিকতার ছাপও চোখে পড়ে। শহরটির পরিবেশে একদিকে যেমন ধ্বংসের নির্জনতা নেই অপরদিকে তেমনি নেই নতুনত্বের হট্টগোল; বাড়িগুলো পুরনো, কিন্তু মেরামতির দ্বারা সুরক্ষিত। সুন্দর ছোট নদীটি শহরের বাঁ-দিক দিয়ে কুলুকুলু শব্দে বয়ে চলেছে; তার বুকের উপর নেই কোন বাঁধের বন্ধন, বা তার পাশ দিয়ে নেই কোন চলাচলের পথ।

শহরের প্রায় এক মাইল দক্ষিণে একটা উঁচু জায়গায় প্রাচীন ওক গাছের সারি ও ঝোপজঙ্গলের ফাঁক দিয়ে যে দুর্গের গম্বুজগুলো চোখে পড়ে সেটা ইয়র্ক ও ল্যাংকাস্টার যুদ্ধের সমকালীন হলেও তাতে এলিজাবেথ ও তার পরবর্তীকালের পরিবর্তন ও সংযোজনের চিহ্ন সুস্পষ্ট। প্রাচীন সামন্ত যুগের দুর্গটি সেকালের রীতি অনুসারে চারদিকে পরীখা দিয়ে ঘেরা। ঘন গাছপালার ফাঁক দিয়ে দুর্গটির কিছু অংশ দেখেই আমাদের সামরিক পর্যটকটির মন আনন্দে নেচে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে তিনি স্থির করলেন, আরও কাছে থেকে বাড়িটাকে ভাল করে দেখতে হবে; খোঁজ নিতে হবে সেখানে

পারিবারিক চিত্রশালা এবং আকর্ষণীয় পুরা-বস্তুর সংগ্রহশালা আছে কিনা। তারপর হাঁটতে হাঁটতে একটা ভাল সরাইখানার দরজায় গিয়ে থামলেন।

যাত্রাপথের জন্য নতুন ঘোড়ার ব্যবস্থা করার আগে জেনারেল ব্রাউন ঐ দুর্গাঞ্চলের মালিকের খোঁজখবর করে জানতে পারলেন এবং জেনে বিস্মিত ও পুলকিত হলেন যে মালিকের নাম—আমরা তাকে লর্ড উড্ভিল বলেই উল্লেখ করব। কী সৌভাগ্য! ব্রাউনের স্কুল ও কলেজ-জীবনের অনেক স্মৃতিই যুবক উড্ভিলের নামের সঙ্গে জড়িত; আর কিছুটা জিজ্ঞাসাবাদ করেই তিনি নিশ্চিত হলেন সেই উড্ভিল আর এই দুর্গাধিপতি উড্ভিল একই লোক। কয়েকমাস আগে পিতার মৃত্যুতে তিনিই এখন লর্ড উপাধিতে ভূষিত হয়েছেন এবং শোক-দিবসের অবসানে এই হেমন্তকালেই পৈত্রিক সম্পত্তির দখল নিয়েছেন, আর সেই উপলক্ষ্যে দুর্গে কিছু নির্বাচিত বন্ধু-বান্ধবের সমাগম ঘটেছে।

আমাদের পর্যটকের কাছে খবরটি খুবই সুখকর। ইটন-এ ফ্রাংক উড্ভিল ছিল রিচার্ড ব্রাউনের "ফ্যান," আর ক্রাইস্ট চার্চ-এ ছিল তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু; তাদের ছিল একই আনন্দ, একই কর্তব্য। প্রথম জীবনের বন্ধুটিকে এমন একটা বাসভবন ও সম্পত্তির মালিকরূপে দেখতে পেয়ে সৎ সৈনিকটার মন আনন্দে ভরে উঠল। তিনি স্থির করলেন, অন্য সব কাজ মুলতুবি রেখেই তিনি অচিরে বন্ধুর সঙ্গে দেখা করবেন।

সুতরাং নতুন করে সংগৃহীত ঘোড়াগুলিই তার ভ্রাম্যমান গাড়িটাকে টেনে নিয়ে গেল উডভিল দুর্গে। দারোয়ান তাকে নিয়ে গেল একটি আধুনিক গথিক আবাসে; দুর্গের স্থাপত্যের সঙ্গে মিল রেখেই সেটাকে তৈরি করা হয়েছে। দারোয়ান ঘণ্টা বাজিয়ে অতিথির আগমন-বার্তা জানিয়ে দিল। জেনারেল ব্রাউন গাড়ি থেকে নামতেই যুবক লর্ড হলের ফটকে এসে দাঁড়ালেন। মুহূর্তকাল অপরিচিতের মতই বন্ধুর মুখের দিকে তাকালেন। যুদ্ধের ক্লান্তি ও ক্ষতচিহ্ন সে মুখের অনেক পরিবর্তন ঘটিয়েছে। কিন্তু অতিথির কথা শুনেই সে পরিবর্তনের আবরণ উড়ে গেল; দুই বন্ধুর সাদর সম্ভাষণ-বিনিময়ের ভিতর দিয়ে ফুটে উঠল শৈশব ও প্রথম যৌবনের অনেক আনন্দঘন দিনের স্মৃতি।

লর্ড উড্ভিল বললেন, "প্রিয় ব্রাউন, আজকের দিনে যদি আমার কিছু চাইবার থাকে তো সেটা হবে আমাদের মাঝে তোমার উপস্থিতি। যতদিন তুমি আমাদের কাছ থেকে দূরে ছিলে ততদিন আমি তোমার খোঁজ রাখিনি একথা মনেও এনো না। তোমার বিপদ, তোমার বিজয়, তোমার দুর্ভাগ্য—সবকিছুর ভিতর দিয়েই তোমার খবর আমি রেখেছি, আর এই দেখে খুশি হয়েছি যে কি জয়ে কি পরাজয়ে, আমার পুরনো বন্ধুর নামটি সব সময়েই প্রশংসার সঙ্গে উচ্চারিত হয়েছে।"

জেনারেলও যথোচিত উত্তর দিলেন, বন্ধুর নতুন মর্যাদা ও সম্পত্তি লাভের জন্য তাকে অভিনন্দন জানালেন।

লর্ড উড্‌ভিল বললেন, "আরে, এখনও তো তুমি এ বাড়ির কিছুই দেখ নি; আশা করি বাড়িটার সঙ্গে ভালভাবে পরিচিত না হয়ে তুমি এখান থেকে চলে যাবে না। অবশ্য এ কথা সত্য যে এখন বাড়িতে বেশ একটা বড়-সড় দলই জমায়েত হয়েছে, আর এই পুরনো বাড়িটাকে বাইরে থেকে দেখতে বেশ বড় মনে হলেও আসলে খুব বেশী লোকের থাকবার মত ব্যবস্থা নেই। তবু তোমাকে একটা আরামদায়ক সেকেলে ঘর আমি দিতে পারব; আশা করি, নানা যুদ্ধাভিযানে যোগদানের ফলে অপেক্ষাকৃত খারাপ বাড়িতে থাকার শিক্ষা তুমি পেয়েছ।"

জেনারেল দুই কাঁধে ঝাঁকুনি দিয়ে হেসে উঠল। বলল, "আমার তো ধারণা, একবার একটা হাল্কা বাহিনী নিয়ে যখন শত্রুর অপেক্ষায় আত্মগোপন করেছিলাম তখন যে পুরনো তামাকের বাক্সের মধ্যে আমাকে রাত কাটাতে হয়েছিল, তোমার এই দুর্গ-নিবাসের খারাপ ঘরটাও তার তুলনায় অনেক—অনেক ভাল।"

লর্ড উড্‌ভিল বললেন, "আরে, তাহলে তো কোন কথাই নেই। বাস-স্থানের ভয় যখন তোমার নেই তখন অন্তত এক সপ্তাহ তোমাকে আমার কাছে থাকতেই হবে। বন্দুক, শিকারী কুকুর, ছিপ, টোপ, এবং নানা ধরনের খেলাধূলার সরঞ্জাম আমাদের প্রচুর আছে; বরং কিছু বাড়তিই আছে। তবে তুমি যদি বন্দুকটাই পছন্দ কর, তো আমিও তোমার সঙ্গে আছি। নিজের চোখেই দেখতে চাই, কালো আদমিদের দেশে কিছুকাল কাটিয়ে আসার ফলে তোমার শিকারের হাত আরও ভাল হয়েছে কি না।"

জেনারেল সানন্দে এ প্রস্তাব গ্রহণ করলেন। সকলের সঙ্গে মিলেমিশে মহানন্দে সারাটা দিন কেটে গেল। খেলাধূলা, গান-বাজনা, পান-ভোজন—কোন কিছুরই অভাব ছিল না। পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠতে হবে বলে এগারোটার পরেই অতিথিরা যার যার ঘরে শুতে চলে গেল।

যুবক লর্ড নিজেই বন্ধু জেনারেল ব্রাউনকে তার জন্য নির্দিষ্ট ঘরে নিয়ে গেলেন। লর্ড ঠিকই বলেছিলেন, ঘরটি আরামদায়ক, কিন্তু সেকেলে ধরনের। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ পাদে ব্যবহৃত একটা অত্যন্ত ভারী পালংক, সিল্কের বিবর্ণ মশারি, তাতে জরির ভারী কুঁচি বসানো। কিন্তু বিছানার চাদর, বালিশ, কম্বল সবই মনোরম। দরজা-জানালায় ঝোলানো পুরনো বিবর্ণ পর্দা-গুলিতে কেমন যেন একটা বিষণ্ণতার আমেজ। জানালা দিয়ে আসা হেমন্তের বাতাসে পর্দাগুলি দুলছে।

লর্ড বললেন, "দেখ জেনারেল, শয়ন-কক্ষটি খুবই সেকেলে; তবে আশা করি তোমার সেই তামাকের বাক্সের চাইতে এটা খারাপ লাগবে না।"

জেনারেল উত্তরে বললেন, "থাকার জায়গা নিয়ে আমার কোনরকম মাথা ব্যথা নেই ; তবু যদি পছন্দ-অপছন্দের কথাই তোল তো বলি, তোমাদের ঐ পারিবারিক অট্টালিকার আধুনিক সব ঘরের তুলনায় এই ঘরটাই আমার বেশী পছন্দ। বিশ্বাস কর, যখনই এই ঘরের প্রাচীন ঐতিহ্যের সঙ্গে আধুনিক আরামদায়ক ব্যবস্থাকে যুক্ত করি, যখনই মনে করি যে এ সবই 'ইয়োর লর্ডশিপ'-এর সম্পত্তি, তখনই মনে হয় লণ্ডনের যেকোন সেরা হোটেলের চাইতেও এখানে আমি ভাল আছি।"

"প্রিয় জেনারেল, আমিও বিশ্বাস করি—আমি নিঃসন্দেহ যে তুমি এখানে আমার মত আশানুরূপ আরামেই থাকবে," এই কথাগুলি বলে সম্ভ্রান্ত যুবকটি আর একবার অতিথিকে শুভরাত্রি জানিয়ে কর-মর্দন করে বিদায় নিলেন।

জেনারেল আর একবার চারদিকে তাকালেন ; তারপর পোশাক ছেড়ে আরামদায়ক রাত্রি যাপনেব জন্য প্রস্তুত হলেন।

এখানে, এ ধরনের কাহিনীর প্রথা ভঙ্গ করে, জেনারেলকে পরদিন সকাল পর্যন্ত তার ঘরে রেখে আমরা তার কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি।

বেশ সকালেই সকলে প্রাতরাশে এসে হাজির হল, কিন্তু সেখানে জেনারেল ব্রাউনের দর্শন পাওয়া গেল না। এতে বারকয়েক বিস্ময় প্রকাশ করে লর্ড উড্‌ভিল শেষ পর্যন্ত একজন চাকরকে পাঠালেন তার খোঁজে। লোকটি ফিরে এসে জানাল, কুয়াসা-ঢাকা অস্বস্তিকর আবহাওয়াকে অগ্রাহ্য করে জেনারেল ব্রাউন খুব ভোরেই বাইরে বেড়াতে বেরিয়েছেন।

সম্ভ্রান্ত যুবকটি বন্ধুদের বললেন, "সৈনিকের অভ্যাস আর কি ; অনেকেরই এই অভ্যাসটি গড়ে ওঠে, কর্তব্যের ডাকে সকালে প্রস্তুত হতে হতে তারা আর ভোরের পরে ঘুমতেই পারে না।"

তথাপি এই ব্যাখ্যা লর্ড উড্‌ভিলের নিজেরই মনঃপূত হল না ; অন্যমনস্কভাবে নিঃশব্দে তিনি জেনারেলের প্রত্যাবর্তনের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন। প্রাতরাশের ঘণ্টা বাজবার প্রায় এক ঘণ্টা পরে জেনারেল ফিরে এলেন। তাকে বেশ ক্লান্ত ও অসুস্থ মনে হল। মাথার চুল এলোমেলো, পোশাক-পরিচ্ছদ এতই অবিন্যস্ত যে একজন সামরিক লোকের বেলায় সেটা সহজেই চোখে পড়ে, তার চোখের দৃষ্টিও কেমন যেন বিকৃত ও অদ্ভুত।

লর্ড উড্‌ভিল বললেন, "প্রিয় জেনারেল, আজ সকালে দেখছি তুমি আমাদের সকলের উপর টেক্কা দিয়েছ ; না কি তোমার শোবার ব্যবস্থাটা আশানুরূপ ও মনোমত হয় নি। রাতটা কেমন কাটল ?"

"ওঃ, খুব ভাল—অত্যন্ত চমৎকার—সারা জীবনে কখনও এত ভালভাবে আমার রাত কাটে নি," জেনারেল ব্রাউন তাড়াতাড়ি জবাব দিলেন ; অথচ তার কথা বলার মধ্যে এমন একটা বিব্রত ভাব ছিল যেটা তার বন্ধুর চোখে

ধরা পড়ল। তারপরই এক পেয়ালা চা গলায় ঢেলে অন্য কোন খাবার স্পর্শ না করেই কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন।

গৃহস্বামী বন্ধুটি বললেন, "জেনারেল, আজ বন্দুক নিয়ে বের হচ্ছ তো?" পরপর দু'বার একই প্রশ্ন করার পরে হঠাৎ জবাব এল, "না, আমি দুঃখিত যে আর একটি দিনও 'ইয়োর লর্ডশিপের' সঙ্গে কাটাবার সৌভাগ্য আমার হবে না, আমার ডাক-ঘোড়া আনতে বলে দিয়েছি, এখনি তারা এসে পড়বে।"

উপস্থিত সকলেই বিস্মিত, লর্ড উড্ভিল সঙ্গে সঙ্গে বললেন, "ডাক-ঘোড়ার কথা কি বলছ হে বন্ধু! তা দিয়ে কি করবে? তুমি তো আমাকে কথা দিয়েছ অন্তত একটি সপ্তাহ আমাব সঙ্গে কাটাবে?"

স্বভাবতই বেশ বিব্রতভাবে জেনারেল বললেন, "তোমার সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের আনন্দে হয় তো এখানে কয়েকদিন থাকবার কথা বলেছিলাম কিন্তু এখন দেখছি সেটা একেবারেই অসম্ভব।"

সম্রান্ত যুবকটি বললেন, "খুবই আশ্চর্যেব কথা। কালই মনে হয়েছিল তোমার হাতে কোন জরুরি কাজ নেই, আব আজই তো যাবার ডাক আসতে পারে না, কারণ শহর থেকে আমাদেব ডাকই তো এখনও আসে নি, আর তাই এর মধ্যেই কোন চিঠিও তুমি পেতে পার না।"

আর কোন কৈফিয়ৎ না দিয়ে জেনারেল ব্রাউন শুধু এইটুকুই জানালেন যে তার একটা অনিবার্য কাজ আছে, কাজেই তাকে অতি অবশ্য চলে যেতেই হবে। অগত্যা গৃহস্বামী চুপ করে গেলেন; বুঝলেন যে বন্ধুটি চলে যেতে দৃঢ়সংকল্প, কাজেই আর কোনরকম অনুরোধ করাই বৃথা।

তবু তিনি বললেন, "প্রিয় ব্রাউন, তুমি যখন একান্তই চলে যাবে, তখন আমাকে অনুমতি দাও—এ বাড়ির ছাদ থেকে চারদিকের প্রাকৃতিক দৃশ্যটা তোমাকে একবার দেখাই, যেভাবে কুযাসা উঠছে তাতে অচিরেই দৃশ্যটা ঢেকে যাবে।"

কথা বলতে বলতেই বড় জানালাটা খুলে তিনি ছাদে পা বাড়ালেন। জেনারেল যন্ত্রের মত তাকে অনুসরণ করলেন। লর্ডটি চারদিকে আঙুল বাড়িয়ে অনেককিছু দ্রষ্টব্য বস্তু দেখাতে লাগলেন, কিন্তু দেখবার মত কিছুই জেনারেলের চোখে পড়ল না। এইভাবে এগোতে এগোতে লর্ড উড্ভিল অতিথিকে সঙ্গে নিয়ে অন্য সকলের কাছ থেকে বেশ কিছু দূরে সরে গিয়ে হঠাৎ বন্ধুর দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন:

"রিচার্ড ব্রাউন, তুমি আমার অনেক দিনের পুরনো বন্ধু; এখন এখানে আমরা দুজন ছাড়া আর কেউ নেই। তাই বন্ধুর কাছে, একজন সৈনিকের কাছে আমার একান্ত মিনতি, আমার প্রশ্নের ঠিক ঠিক জবাব দাও। কাল রাতটা সত্যি তোমার কিভাবে কেটেছে?"

গম্ভীর মুখে জেনারেল জবাব দিলেন, "অত্যন্ত শোচনীয়ভাবে; সে অভিজ্ঞতা এতই মারাত্মক যে এই দুর্গ-প্রাসাদের অন্তর্ভুক্ত সব জমির বিনিময়ে তো নয়ই, এমন কি এখানে দাঁড়িয়ে যতদূর দৃষ্টি যায় সেই বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডের বিনিময়েও আমি দ্বিতীয় রাত সে ঘরে কাটাতে রাজী হব না।"

যেন নিজেকে সম্বোধন করেই লর্ড বললেন, "খুবই আশ্চর্যের কথা; তাহলে তো দেখছি ঐ ঘরটি সম্পর্কে যা শুনেছি তার মধ্যে কিছু সত্য আছে।" পুনরায় জেনারেলের দিকে ঘুরে তিনি বললেন, "প্রিয় বন্ধু, ঈশ্বরের দোহাই, মন খুলে আমাকে সব কথা সবিস্তারে বল।"

তার মিনতিভরা কথা শুনে জেনারেল দুঃখ পেলেন; একমুহূর্ত থেমে বলতে লাগলেন, "প্রিয় লর্ড, গত রাতে আমার যে অভিজ্ঞতা হয়েছে সেটা এতই অদ্ভুত ও অপ্রীতিকর যে সেকথা তোমাকে বলতে আমি কুণ্ঠিত বোধ করছি। অন্য কেউ এ কথা শুনলে ভাববে যে আমি একটি দুর্বলচিত্ত, কুসংস্কারে বদ্ধ বোকা লোক; নিজের কল্পনাই আমাকে বিভ্রান্ত করেছে। কিন্তু তুমি তো আমাকে ছেলেবেলায় ও যৌবনেও দেখেছ। তাই প্রথম জীবনে যে চারিত্রিক দুর্বলতা ও বিচ্যুতি থেকে আমি মুক্ত ছিলাম প্রাপ্ত বয়সে আমি তারই শিকার হব এ সন্দেহটা তুমি অন্তত করবে না।" জেনারেল থামলেন। তার বন্ধু উত্তরে বললেন:

"তোমার বক্তব্য যত অদ্ভুতই হোক তার সত্যতাকে আমি যে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করব সেবিষয়ে কোনরকম সন্দেহ তোমার মনে রেখো না। তোমার মনের দৃঢ়তার সঙ্গে আমি এত বেশী পরিচিত যে তুমি কখনও অবাস্তব কল্পনার শিকার হতে পার সে সন্দেহ কখনও আমার মনে জাগবে না। আমি এও জানি, তোমার সম্মানবোধ ও বন্ধুত্বের খাতিরেই তুমি যা কিছু দেখেছ তার কোন অতিরঞ্জিত বিবরণ আমাকে শোনাবে না।"

জেনারেল বললেন, "ঠিক আছে, তোমার বিশ্বাসের উপর ভরসা রেখেই সব কথা তোমাকে বলছি। তবু এও বলে রাখি, গত রাত্রের স্মৃতিকে নতুন করে মনে করার চাইতে আমি বরং একটা গোলা-বারুদের আক্রমণের মুখোমুখি হওয়াটাকেও শ্রেয়তর বলে মনে করি।"

তিনি দ্বিতীয়বার থামলেন; লর্ড উড্‌ভিলের চোখে নীরব আগ্রহ লক্ষ্য করে একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও বুটিদার পর্দায় ঢাকা ঘরটিতে তার নৈশ অভিজ্ঞতার ইতিহাস বলতে শুরু করলেন।

"কাল রাতে তুমি চলে যাবার পরেই আমি পোশাক ছেড়ে শুতে গেলাম। বিছানার সামনেই চিমনির আগুন ঝল্‌মল্‌ করে জ্বলছে। তোমার সঙ্গে অপ্রত্যাশিত সাক্ষাতের ফলে শৈশব ও যৌবনের অনেক মন-মাতানো স্মৃতি এসে ভিড় করল। তাই সঙ্গে সঙ্গেই ঘুম এল না।

"সুখের স্মৃতিতে মন আচ্ছন্ন। ধীরে ধীরে ঘুম নেমে এল চোখে। হঠাৎ

রেশমী গাউনের খস্‌খস্‌ শব্দে ও উঁচু-গোড়ালি জুতোর ঠুক্‌ঠুক্‌ শব্দে ঘুম ভেঙে গেল। মনে হল কোন নারী ঘরের মধ্যে হাঁটছে। মশারি সরিয়ে ব্যাপারটা



দেখবার আগেই একটি ছোটখাট নারীমূর্তি বিছানা ও অগ্নিকুণ্ডের মাঝখান

দিয়ে চলে গেল। মূর্তিটি আমার দিকে পিছন ফিরে ছিল; তার ঘাড় ও গলা দেখেই বুঝতে পারলাম, একটি বৃদ্ধ নারী সেকেলে গাউন পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে; ঢিলে গাউনটা মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে।

"একটি বৃদ্ধার এই উপস্থিতি যথেষ্ট অদ্ভুত মনে হলেও মুহূর্তের জন্যও এ কথা আমার মনে আসে নি যে এই নারীমূর্তি এ বাড়ির জনৈকা কাজের লোক ছাড়া অন্য কিছু হতে পারে। ঠাকুরমার আমলের পোশাক পরা হয় তো তার একটা শখ। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল, তুমি ঘরের টানাটানির কথা বলেছিলে। তাই ভাবলাম, আমার শোবার ব্যবস্থা করে দিতেই তুমি হয় তো এই বৃদ্ধার ঘরটিই আমাকে দিয়েছ, আর সেও সব কথা ভুলে গিয়ে রাত বারোটার সময় তার পুরনো ঘরেই ফিরে এসেছে। তাই তাকে আমার উপস্থিতির কথাটা জানাবার জন্য বিছানায় নড়ে চড়ে একটু কাশলাম। ধীরে ধীরে সে ঘুরে দাঁড়াল, কিন্তু—হা ঈশ্বর!—সে কী মুখ আমি দেখলাম! সে যে কে অথবা সে যে কোন জীবিত প্রাণী নয় সেবিষয়ে কোন সন্দেহই আর রইল না। মৃত মানুষের একখানি মুখের উপর কে যেন এঁকে দিয়েছে তার জীবিতকালের নীচতম ও জঘন্যতম সব পাপের ছাপ! এক ভয়ংকর অপরাধিনীর দেহ যেন কবর থেকে উঠে এসেছে, আর তাতে বাসা বেঁধেছে নরকের অগ্নিকুণ্ড থেকে ছাড়া পাওয়া একটি আত্মা যে ছিল তার অপকর্মের সঙ্গী। চমকে উঠে খাড়া হয়ে বসলাম, দুই হাতের উপর ভর দিয়ে এক-দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম সেই ভয়ংকর ছায়ামূর্তির দিকে। বীভৎস নারী-মূর্তিটি দ্রুতপদক্ষেপে আমার বিছানার কাছে এগিয়ে এল, আমার পাশেই বসে পড়ল, তার ভয়ংকর মুখটা এগিয়ে এল আমার মুখের এক হাতের মধ্যে, তার মুখের কুটিল হাসিতে ফুটে উঠল মূর্তিমতী এক শয়তানীর ঈর্ষা ও ক্রূরতা।"

জেনারেল ব্রাউন এখানে থামলেন। সেরাতের ভয়ংকর দৃশ্যকে মনে করতে গিয়ে তার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে; হাত দিয়ে মুছে ফেললেন।

"মাই লর্ড, আমি ভীরু নই। আমার পেশাগত সবরকম প্রাণঘাতী বিপদের মুখোমুখি আমি হয়েছি। কোন মানুষ কখনও বলতে পারবে না যে রিচার্ড ব্রাউন তার তরবারির অমর্যাদা করেছে। কিন্তু সেই ভয়ংকর পরিস্থিতিতে একটি মূর্তিমতী শয়তানীর একেবারে চোখের নীচে, এমন কি তার একেবারে মুঠোর মধ্যে বসে আমার মনের সব দৃঢ়তা হারিয়ে ফেললাম, আগুনের ভিতর মোমের মত আমার সব পৌরুষ গলে গেল, আমার প্রতিটি চুল খাড়া হয়ে উঠল। জীবনদানী রক্তের স্রোত থেমে গেল, ভয়ে ও ত্রাসে দশ বছরের একটি গ্রাম্য বালিকার মত মূর্ছিত হয়ে পড়ে গেলাম। সেভাবে কতক্ষণ পড়েছিলাম তা জানি না।

"দুর্গের ঘড়িতে একটা বাজার শব্দে মূর্ছা ভাঙল ; শব্দটা এত জোরে হয়েছিল যে মনে হল বুঝি ঘরের মধ্যেই বাজল। পাছে সেই ভয়ংকর দৃশ্য আবার দেখতে হয় সেই ভয়ে চোখ খুলতে বেশ কিছু সময় লাগল। যাই-হোক, সাহস সঞ্চয় করে যখন চোখ মেলে তাকালাম তখন আর তাকে দেখতে পেলাম না। প্রথমেই মনে হল ঘণ্টাটা টানি, চাকরদের জাগিয়ে তুলি, তারপর কোন চিলেকোঠায় বা খড়ের গাদায় চলে যাই যাতে দ্বিতীয়-বার তার সঙ্গে দেখা না হয়। না, আমি সত্যকেই স্বীকার করব, আমার সে সিদ্ধান্ত বদলে ফেললাম , নিজের লজ্জাকে ঢাকবার জন্য নয়, বরং এই ভয়ে যে চিমনির পাশে ঝোলানো ঘণ্টার দড়িতে হাত দিতে সেখানে যেতে গিয়ে হয় তো আবার সেই কুৎসিত শয়তানীর সামনে পড়ে যাব , আমার মনে হল, সে হয় তো তখনও ঘরের কোণে কোথাও লুকিয়ে আছে।

"একটা জ্বর-বিকারের মধ্যে বাকি রাতটা কেটে গেল। শরীর কখনও গরম, কখনও ঠাণ্ডা , মাঝে মাঝেই ঘুম ভেঙে যায়, জেগে বসে থাকি , হাজার রকমের সব ভয়ংকর দৃশ্য চোখের সামনে আসা-যাওয়া করতে লাগল।

"অবশেষে দিনের আলো দেখা দিল। অসুস্থ দেহে ও লজ্জাহত মনে বিছানা থেকে উঠলাম। মানুষ হিসাবে, একজন সৈনিক হিসাবে নিজের জন্য বড়ই লজ্জা হল ; তার চাইতে বেশী লজ্জা পেলাম এই ভূতে-পাওয়া ঘর থেকে পালিয়ে যাবার একান্ত বাসনার জন্য। কোনরকমে পোশাক পরে তোমার এই প্রাসাদ থেকে পালিয়ে গেলাম। অন্য জগতের সেই আগন্তুকের সঙ্গে এক ভয়াবহ সাক্ষাৎকারের ফলে আমার স্নায়ুতন্তুগুলো তখন একেবারেই বিধ্বস্ত হয়ে পড়েছে , খোলা হাওয়ায় সেগুলিকে কিছুটা চাঙ্গা করার জন্য ভোরেই বেরিয়ে পড়লাম। আমার অসুবিধার কথা, তোমার আতিথেয়তা-পূর্ণ প্রাসাদ থেকে হঠাৎ চলে যাবার কারণের কথা সবই তোমাকে বললাম ইয়োর লর্ডশিপ। আশা করি অন্য কোন স্থানে আবার আমাদের দেখা হবে ; কিন্তু ঐ ছাদের নীচে আর একটা রাতও কাটানোর হাত থেকে ঈশ্বর আমাকে রক্ষা করুন !"

জেনারেলের কাহিনীটি খুবই অদ্ভুত , কিন্তু যেরকম দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে তিনি সেটা বললেন তাতে এ সম্পর্কে কোনকিছু বলার আর অবকাশ রইল না। লর্ড উডভিল একবারও জানতে চাইলেন না যে সে স্বপ্নে কোন প্রেত-মূর্তি দেখেছে কি না, অথবা এ সবই তার অতি-কল্পনা বা দর্শনেন্দ্রিয়ের ফাঁকির ফল কি না। বরং মনে হল তিনি যা কিছু শুনলেন তার সত্যতা ও বাস্তবতাকে তিনি গভীরভাবে বিশ্বাসই করেছেন। বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে তিনি আন্তরিকভাবেই জানালেন যে তারই বাড়িতে এসে তার প্রথম জীবনের বন্ধুটির এই দুর্গতির জন্য তিনি খুবই দুঃখিত।

"প্রিয় ব্রাউন, তোমার এই কষ্টের জন্য আমি আরও বেশী দুঃখিত এই

জন্য যে এটা আমারই একটা পরীক্ষার দুঃখজনক অথচ অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত ফল। তোমার জানা দরকার যে অন্তত পক্ষে আমার বাবা ও ঠাকুর্দার আমল থেকেই ঐ ঘরটা সবসময়ই বন্ধ করে রাখা হত, কারণ জনশ্রুতি ছিল যে ঐ ঘরটাতে নাকি অলৌকিক সব দৃশ্য দেখা যায়, নানারকম ভৌতিক শব্দ শোনা যায়। মাত্র কয়েক সপ্তাহ আগে যখন এই সম্পত্তির দখল পেয়ে এখানে এলাম, তখনই কেন জানি আমার মনে হল যে আমার যেসব বন্ধুবান্ধব এই উপলক্ষ্যে এখানে আসবে তাদের যথোপযুক্ত স্থান-ব্যবস্থা করার মত এত বেশী ঘর এ বাড়িটাতে নেই যাতে এরকম একটা আরামদায়ক শয়নকক্ষকে অদৃশ্য লোকের অধিবাসীদের জন্য ছেড়ে দেওয়া চলে। সুতরাং ঐ বুটিদার পর্দাঢাকা ঘরটাকে, ঐ নামেই ঘরটাকে উল্লেখ করা হত, লোকজন দিয়ে খুলে ফেললাম, এবং তার প্রাচীনত্বকে কোনরকম ক্ষুণ্ণ না করে আধুনিক জীবনযাত্রার উপযুক্ত কিছু নতুন আসবাব ও জিনিসপত্র দিয়ে ঘরটাকে সাজিয়ে-গুছিয়ে দিলাম। তবু যেহেতু ঘরটা যে ভূতুড়ে সে কথাটা বাড়ির লোকজনরা ভাল করেই জানত, আশপাশের লোকজন এবং আমার কিছু কিছু বন্ধুরও সেটা অজানা ছিল না, তাই আমার আশংকা ছিল যে ঐ বুটিদার পর্দা-ঢাকা ঘরে যে লোক প্রথম রাত কাটাবে পূর্বজ্ঞাত ভূতুড়ে সংস্কারবশত সে হয়তো সেই জনশ্রুতিটাকেই নতুন করে জাগিয়ে তুলবে, আর ঐ ঘরটাকে কাজে লাগাবার যে ব্যবস্থা আমি নিয়েছি তাকেও পণ্ড করে দেবে। প্রিয় ব্রাউন, আমি অসংকোচেই স্বীকার করছি, গতকাল তোমাকে দেখেই আমার খুশি হবার অন্য অনেক কারণের মধ্যে এটাও একটা যে ঐ ঘরের দুর্নাম ঘোচাবার একটা চমৎকার সুযোগ আমার হাতে এসে গেল, কারণ তোমার সাহসিকতা সন্দেহের অতীত, আর এসব ব্যাপারে তোমার মন সবরকম সংস্কারমুক্ত। সুতরাং আমার পরীক্ষাটা চালাবার পক্ষে অধিকতর উপযুক্ত কোন লোকের কথা আমি ভাবতেই পারি নি।"

জেনারেল ব্রাউন সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন, "ইয়োর লর্ডশিপের অপার করুণা—আপনার কাছে আমার ঋণের শেষ নেই। তুমি যাকে বলছ একটা পরীক্ষা, তার ফলটা আমি কিন্তু অনেকদিন পর্যন্ত ভুলতে পারব না।"

লর্ড উড্‌ভিল বললেন, "আহা, তুমি আমার প্রতি অবিচার করছ বন্ধু। বিশ্বাস কর, যে কষ্ট তুমি ভোগ করেছ তার সম্ভাবনাটা আমি মোটেই পরিমাপ করতে পারি নি। কাল সকাল পর্যন্তও অলৌকিক আবির্ভাবের ব্যাপারে আমি ছিলাম সম্পূর্ণ অবিশ্বাসী। উপরন্তু, আমার তো স্থির বিশ্বাস যে ঐ ঘর সম্পর্কে সব কথা তোমাকে জানালে তুমি নিজে থেকেই ঐ ঘরটিকে তোমার বাসস্থান হিসাবে বেছে নিতে। তুমি যে এমন অপ্রত্যাশিতভাবে কষ্ট পেয়েছ সেটা আমার দুর্ভাগ্য, হয় তো আমার ভুল, কিন্তু সেটাকে আমার অপরাধ বলতে পার না।"

"সত্যি বিস্ময়কর ব্যাপার!" জেনারেলের মেজাজ আবার খুশি হয়ে উঠল; "নিজেকে আমি দৃঢ়চরিত্র ও সাহসী বলেই জানতাম, আর তুমিও আমাকে সেইরকম ভেবেছ বলে তোমার উপর অসন্তুষ্ট হবার কোন অধিকার আমার নেই। ঐ যে আমার ডাক-ঘোড়াগুলো এসে পড়েছে; সুতরাং তোমাকে আর আমি আটকে রাখব না।"

লর্ড উড্‌ভিল বললেন, "না বন্ধু, তুমি যখন আর একটা দিনও আমাদের সঙ্গে থাকতে পারবে না, আর সেজন্য কোনরকম পীড়াপীড়িও আমি করতে পারছি না, তাই বলছি আরও অন্তত আধ ঘণ্টা সময় আমাকে দাও। এক-সময় তুমি তো ছবি ভালবাসতে। এখানে আমার একটা প্রতিকৃতির চিত্র-শালা আছে, অনেকগুলো ভ্যান্‌ডাইকের আঁকা, একদা এই সম্পত্তি ও দুর্গপ্রাসাদ যাদের অধিকারে ছিল তাদেরই বংশধরদের সব প্রতিকৃতি। আমার ধারণা, তার অনেকগুলি তোমার ভাল লাগবে।"

কিছুটা অনিচ্ছার সঙ্গেই জেনারেল ব্রাউন আমন্ত্রণটা গ্রহণ করলেন। বন্ধুর আমন্ত্রণ তো প্রত্যাখ্যান করা যায় না।

সুতরাং লর্ড উড্‌ভিলের সঙ্গে কয়েকটা ঘর পার হয়ে জেনারেল একটা লম্বা চিত্রশালায় ঢুকলেন। অনেক ছবি ঝোলানো রয়েছে। লর্ড পরপর সেগুলি তার অতিথিকে দেখালেন, তাদের নাম বললেন, কিছু কিছু ব্যক্তিগত বিবরণও দিলেন। জেনারেল ব্রাউনের সেসব বিবরণের প্রতি বিশেষ আগ্রহ ছিল না। সচরাচর যেকোন পারিবারিক চিত্রশালায় যেরকম সব ছবি থাকে ঠিক তাই। এই হয় তো কোন নাইট যিনি জমিদারিকে প্রায় নষ্ট করেই ফেলেছিলেন, আবার এই জনৈকা সুন্দরী মহিলা যিনি ধনবান কোন "বাউণ্ডহেড"-কে বিয়ে করে সম্পত্তিকে নতুন করে গড়ে তুলেছিলেন। ওখানে ঝোলানো রয়েছে জনৈক বীরের ছবি যিনি সেণ্ট জার্মেন-এ নির্বাসিত রাজ-দরবারের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার ফলে বিপন্ন হয়েছিলেন, আবার এখানে এমন একজনের ছবি যিনি বিপ্লবের সময় উইলিয়ামের সপক্ষে অস্ত্র ধরেছিলেন, ওই সে একজন যিনি কখনও হুইগদের আবার কখনও টোরিদের দলের পাল্লা ভারী করেছিলেন।

লর্ড উড ভিল এইসব বুলি আওড়াতে আওড়াতে চিত্রশালার মাঝামাঝি পৌঁছতেই তিনি দেখতে পেলেন, জেনারেল ব্রাউন হঠাৎ চমকে উঠলেন; তার চোখে-মুখে তীব্র বিস্ময় ও আতংক ফুটে উঠল; একদৃষ্টিতে তিনি তাকিয়ে আছেন সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ পাদে প্রচলিত শৌখিন পোশাক পরিহিতা একটি বৃদ্ধ মহিলার প্রতিকৃতির দিকে।

"ঐ তো সে!" জেনারেল চীৎকার করে উঠলেন—"ঠিক সেই আকৃতি, সেই চোখ-মুখ-নাক, শুধু কাল রাতে যে অভিশপ্ত কুৎসিতদর্শনা আমার ঘরে হাজির হয়েছিল তার মুখের মত পৈশাচিক ভাব এ মুখে নেই।"

সম্ভ্রান্ত যুবকটি বললেন, "তাই যদি হয় তাহলে যে তোমার ছায়ামূর্তি দর্শনের ভয়ংকর বাস্তবতা সম্পর্কে কোনরকম সন্দেহের অবকাশই থাকতে পারে না। ঐ ছবিটা আমারই এক হতভাগিনী পূর্ব প্রজন্মের, আমাদের পারিবারিক ইতিহাস-গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়ে তার জঘন্য ও ভয়ংকর পাপের একটা তালিকা আমার সিন্দুকেই তালাবন্দী হয়ে আছে। সেসব কাহিনী বলাও ভয়ংকর, শোনাও ভয়ংকর। শুধু এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে ঐ মারাত্মক ঘরে ব্যভিচার ও নরহত্যার ঘটনা ঘটেছিল। তাই স্থির করেছি, আমার পূর্বপুরুষরা উচিত বিবেচনা করে ঐ ঘরটাকে যেভাবে তালাবন্ধ করে পরিত্যক্ত অবস্থায় রেখেছিলেন আমিও তাই করব ; যে অলৌকিক আতংক তোমার মত মানুষের সাহসকেও হার মানাতে পারে আর কেউ যাতে তার শিকার না হয় তার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা আমি করব।"

এইভাবে যে বন্ধুদ্বয় অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন তারাই পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নিলেন দুঃখের ভিতর দিয়ে—লর্ড উড্‌ভিল হুকুম দিলেন বুটিদার পর্দা-ঢাকা ঘরটার সব জিনিসপত্র সরিয়ে দরজাটা গেঁথে বন্ধ করে দেওয়া হোক ; আর জেনারেল ব্রাউন উড্‌ভিল দুর্গ-প্রাসাদের সেই বেদনাদায়ক রাতের স্মৃতিকে ভুলতে অন্য কোন গ্রামাঞ্চলে কোন অপেক্ষাকৃত অল্প মর্যাদাসম্পন্ন বন্ধুর বাড়ির খোঁজে বেরিয়ে পড়লেন।

The Tapestried Chamber—Sir Walter Scott

মেরি বার্নেট

নিম্নবর্ণিত ঘটনাগুলি সেণ্ট মেরি হ্রদের একশ' মাইলের মধ্যে একটি মেষ-পালকের বাড়িতে ঘটেছিল বলে বলা হয়ে থাকে ; কিন্তু যেহেতু সেই পরিবারের কিছু বংশধর আজও কাছাকাছি অঞ্চলে বাস করে, তাই আমি এমন সব নাম এখানে ব্যবহার করছি যাতে তাদের চিনতে না পারা যায় ; অবশ্য গল্পটা যারা আগে থেকেই জানে তাদের কথা স্বতন্ত্র।

ইন্‌ভার্লন-এর চাষীর ছেলে অ্যালানসন ছিল সুদর্শন, বাউণ্ডুলে ও বেপরোয়া চরিত্রের এক যুবক ; সে ছিল উৎসাহী, প্রেমপ্রবণ ও অ্যাড্‌-ভেঞ্চারপ্রিয় ; পুরুষ, নারী অথবা প্রেতাত্মা কাউকে সে ভয় করত না। আরও অনেকের সঙ্গে প্রেমঅভিসার ছাড়াও সে প্রেমে পড়ল কার্কস্টাইলের মেরি বার্নেটের সঙ্গে ; মেয়েটি সুন্দরী ও নিষ্পাপ ; গ্রাম্য সরলতার মধ্যেই বড় হয়ে উঠেছে। মেয়েটি ছেলেটিকে ভালবাসত, আবার ভয়ও করত ; অন্য সকলের সঙ্গে ছেলেটির সঙ্গে দেখা করতে তার কোন আপত্তি ছিল না, কিন্তু

অনেক পীড়াপীড়ি সত্ত্বেও কখনও সে একাকি নির্জনে ছেলেটির সঙ্গে দেখা করত না। একদিন "আওয়ার লেডি"-র ভজনালয়ে প্রার্থনার পরে যুবকটি সুযোগ বুঝে অনেক ভালবাসার কথা বলে, অনেক শপথ করে এমনভাবে মেয়েটিকে তার সঙ্গে একান্তে দেখা করতে অনুনয়-বিনয় করল যে শেষ পর্যন্ত মেয়েটি কথা দিল, হয় তো সে এসে তার সঙ্গে দেখা করবে।

হ্রদের একেবারে তীরে একটি নির্জন সবুজ জায়গা মিলনের জন্ত নির্দিষ্ট করা হল ; যারা মাছ ধরতে ভালবাসে তাদের কাছে জায়গাটা খুবই পরিচিত, আর এই প্রাচীন কাহিনীর লেখকের কাছেও কিছু কম পরিচিত নয়। মিলনের সময় স্থির হল ; কিংস এল্‌ওয়াণ্ড (এখন নাকি বোকার মত তাকেই বলা হয় কালপুরুষ নক্ষত্র) যখন পাহাড়ের উপরে প্রথম ছড়িয়ে দেবে তার সোনালী আলো। অ্যালানসন অনেক আগেই এসে হাজির হল, এতই আগ্রহ ও অনুরাগের সঙ্গে সে আকাশের দিকে তাকাতে লাগল যে দক্ষিণ-পূর্ব আকাশের প্রতিটি ছোট তারাকেই সে কিংস এল্‌ওয়াণ্ডের প্রথম প্রকাশ বলে মনে করতে ল্যাগল। শেষ পর্যন্ত এল্‌ওয়াণ্ড সগৌরবে আবির্ভূত হল, আর যুবকটি আবেগকম্পিত বুকে সেই উঁচু প্রান্তরের দিকেই তাকিয়ে রইল যে পথ ধরে সুন্দরী মেরি বার্নেট নেমে আসবে। কিন্তু মেরি বার্নেট এল না, কিংস এল্‌ওয়াণ্ডের পূর্ণ রূপটি আকাশপটে আঁকা পড়ল, কিন্তু মেরি বার্নেটের দেখা মিলল না।

যুবক অ্যালানসন তীব্র হতাশায় ভেঙে পড়ল ; আর, গল্পে যেরকম বলা হয়ে থাকে, মনে মনে একটা অশুভ কামনা উচ্চারণ করল—সে চাইল কোন ডাইনি বা পরী মেরিকে এমনভাবে প্রভাবিত করুক যাতে কুমারী মনের সব সংকোচ কাটিয়ে মেরি এসে তার সঙ্গে দেখা করে। হতাশ প্রেমের আবেগে এই বাসনা সে তিনবার উচ্চারণ করল। মাত্র তিনবারই সেটা উচ্চারিত হল, তার বেশী নয়, আর তখনই—কী আশ্চর্য ! দূরে দেখা গেল দ্রুত পা ফেলে মেরি এগিয়ে আসছে নির্দিষ্ট জায়গাটার দিকে। সে উত্তেজনা বুঝি অ্যালানসনেরও সহ্যের অতীত ; আনন্দে সে যেন উন্মাদপ্রায় হয়ে উঠল, পরবর্তীকালে সে নিজেই স্বীকার করেছে, প্রথম মিলনের কোন কথাই তার মনে নেই ; শুধু মনে আছে, মেরি ছিল সম্পূর্ণ নির্বাক, ভাল-মন্দ কোন কথাই সে বলে নি। কিছুক্ষণ পরেই সে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল, কোন সান্ত্বনা মানল না, মর্মভেদী স্বরে হাহাকার করে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল, আর তার-পরেই আশ্চর্য দ্রুতগতিতে ছুটে চলে গেল।

আগেই বলেছি, হ্রদের এই দিকটা অনেকেরই চেনা ; এখানে তীরের ঠিক উপরে একটা খাড়া পাহাড় ঝুলে আছে ; আকারে বেশী বড় না হলেও উপর থেকে বা নীচ থেকে কোন পথেই সেখানে যাওয়া যায় না। খুব শুকনোর সময় ছাড়া অন্ত সব সময়ই সমুদ্রের জল সেই পাহাড়ের নীচে কয়েক

গভের মধ্যেই থাকে, আর বাকি জায়গাটা থাকে উপর থেকে ভেঙে-পড়া পাথরের স্তূপে আকীর্ণ। সেই সংকীর্ণ বন্ধুর পথে মৎস-শিকারীরাও দুপুর বেলায় চলতে পারে না, আর মেরি কি না রাতের অন্ধকারে হরিণের মত দ্রুতগতিতে সেখান দিয়েই ছুটে চলল। প্রেমিক সর্বশক্তি দিয়ে তার পিছনে ছুটতে ছুটতে ডাকতে লাগল, "মেরি! মেরি! প্রিয় মেরি, থাম, আমার সঙ্গে কথা বল। আমি তোমাকে বাড়ি নিয়ে যাব, অথবা যেখানে যেতে চাও সেখানেই পৌঁছে দেব, কিন্তু এভাবে ছুটে যেয়ো না। থাম, প্রিয়তমা মেরি—থাম!"

মেরি থামল না। দৌড়তে লাগল। একসময় হ্রদের উপর বেরিয়ে-আসা এমন একটা ছোট পাহাড়ের উপর পৌঁছে গেল যার ওপারে আর পথ নেই। এবার প্রেমিক এসে তাকে ধরে ফেলবে এ-কথা বুঝতে পেরে আর একবার আর্তনাদ করে উঠেই সে হ্রদের জলে ঝাঁপ দিল। হ্রদের শান্ত জলে তার পতনের শব্দ যুবকটির কানে বাজল মৃত্যুর ঘণ্টা-ধ্বনির মত, এতক্ষণ সে ছিল প্রেমে পাগল, এবার সে হয়ে উঠল হতাশায় পাগল। দেখল, মেয়েটি ভাসতে ভাসতে ক্রমেই তীর থেকে হ্রদের গভীর জলের দিকে চলে যাচ্ছে; কিছুক্ষণের মধ্যেই ডুবতে শুরু করল, ধীরে ধীরে অদৃশ্য হয়ে গেল; একটু নড়ল না, একটিবারও চীৎকার করল না। এ ঘটনার আগেই অ্যালানসন খুলে ফেলেছিল তার টুপি, জুতো ও কোট। সেও জলে ঝাঁপ দিল। মেরি যেখানে অদৃশ্য হয়ে গেছে সাঁতরে সেখানে গেল; কিন্তু সেখানে জলে একটা বুড়বুড়িও কাটছে না; এমন কি তার প্রিয়তমা যেখানে ডুবে গেছে সেখানে শেষ নিঃশ্বাসের একটা শব্দও রেখে যায় নি। সেই সংকট-মুহূর্তে যুবকটির মনে হল, যদি বাঁচতে হয় তো প্রিয়তমার সঙ্গে বাঁচবে, আর না হয় তো তার বাহু-বন্ধনের মধ্যেই মরবে। সেও ডুব দিল। কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও না পারল হ্রদের তলদেশে পৌঁছতে, না বুঝতে পারল তলদেশ থেকে কতটা দূরে সে আছে। অবশেষে ক্লান্ত দেহে, ভগ্ন হৃদয়ে আবার সে তীরের পথই ধরল, আপাদমস্তক ভেজা অবস্থায় অর্ধ-নগ্ন দেহে সে ছুটল মেয়েটির বাবার বাড়িতে দুঃসংবাদ জানাতে। সব নিশ্চুপ। বুড়ো চাষী পরিবারটির কনিষ্ঠ ও একমাত্র কন্যা মেরি; তারা নিশ্চিন্ত আরামে ঘুমিয়ে আছে। এই দুঃসংবাদ জানাতে তাদের ঘুম ভাঙাতে হবে—এ কথা ভাবতেই প্রেমিকের চোখ জলে ভরে উঠল; কিন্তু জানাতে তো হবেই; দুঃসংবাদ হলেও তো তা জানাতেই হবে।

চাষীর জানালার কাছে গিয়ে কাতর স্বরে সে ডাকল, "অ্যাণ্ড্রু! অ্যাণ্ড্রু বার্নেট, তুমি কি জেগে আছ?"

"এত রাতে আবার অ্যাণ্ড্রু বার্নেটকে কিসের দরকার পড়ল?"

"খুব খারাপ খবর, অ্যাণ্ড্রু বার্নেট।"

"খবর যে খারাপ সে তো তোমার গলা শুনেই বুঝতে পারছি। কিন্তু খবরটা কি?"

"তোমাদের আদরেব মেয়ে—তোমাদের একমাত্র মেয়ে মেরি—"

বুড়ো চমকে উঠল, বলল, "মেরির কি হয়েছে?" মেরির মাও ভয়ে আর্তনাদ করে উঠল, "কি হয়েছে মেরির?" তাড়াতাড়ি আলোটা জ্বালালো।

প্রতিবেশী যুবকটির অর্ধ-নগ্ন দেহ থেকে তখনও জল ঝরছে; তার দৃষ্টিতে উন্মাদ হতাশা ফুটে উঠেছে। সে দৃশ্য দেখে বুড়ো-বুড়ির বুকের ভিতরটা শির্‌শির্ করে উঠল, একটা কথাও তারা বলতে পারল না। এক সময় যুবকটিই বলল, "মেরি চলে গেছে, তোমাদের ও আমার ভালবাসার মেয়েটি হারিয়ে গেছে, ঘুমিসে পড়েছে জলের নীচে, আর আমিই তাকে মেরে ফেলেছি!"

"তুমি পাগল হযেছ জন অ্যালানসন," বুড়ো তীব্র কণ্ঠে বলে উঠল, "বদ্ধ পাগল; হঁ্যা, তোমার চোখ-মুখই বলছে তুমি পাগল হয়েছ। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে তুমি পাগল হযেছ, কিন্তু তুমি তো আবার ভাল হযে উঠবে, আবার আমাদের জ্বালাবে।" হঠাৎ কি মনে পড়ায স্বর পাল্টে বলল, "কিন্তু কি সব বলছি? এখনই তো চক্ষু-কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করা যায। বৌ, মেয়ের বিছানার কাছে চল তো দেখি।"

দুঃখে ও আতংকে কম্পিত বুকে জীন লিণ্টন আলো নিযে মেরির ঘরের দিকে চলল, আর পুরুষ মানুষ দুটি চলল তার পিছু পিছু। ছোট লম্বা কুটিরটার একেবারে শেষপ্রান্তে মেরির ঘর। সে ঘরে ঢুকে তারা দেখল, মাথার উপর চাদর টেনে দিয়ে কে যেন বিছানায শুয়ে আছে। বিছানার পাশে মেরির ছোট বাক্সটার উপর তার পোশাকগুলি সুন্দরভাবে পাট করে রাখা আছে; সবসময যেমন থাকে। এ দৃশ্য দেখে বুড়ো-বুড়ির মুখে ফুটল আশার আলো, কিন্তু প্রেমিকের হৃদয় ডুবে গেল গভীরতর হতাশার মধ্যে। বাবা নাম ধরে ডাকল, কিন্তু বিছানা থেকে কোন সাড়া এল না; তবে একটা কান্নার শব্দ সকলেই শুনতে পেল। বুড়ো সাহস করে মুখের উপর থেকে চাদরটা সরিয়ে দিল, আর, কী আশ্চর্য, বিছানায় শুয়ে আছে মেরি বার্নেট; মুখখানি চোখের জলে ভিজে গেছে, কিন্তু ত্রিমূর্তির ভয়ার্ত মুখ দেখে সে মোটেই বিস্মিত হয় নি। অ্যালানসন ঢোক গিলল, এখনও সে নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছে না। মেরির পোশাকে হাত দিল; সব শুকনো, খট্‌খটে, হ্রদের জলে ডুবে যাওয়ার চিহ্নমাত্র নেই।

অ্যালানসন বিস্ময়বিমূঢ়। তবু মেরি বেঁচে আছে—তাতেই তার আনন্দ অপরিসীম। মেরির বিছানার পাশে নতজানু হয়ে সে অনুমতি চাইল একবার তার হাতে চুমো খেতে। মেরি কিন্তু ঘৃণায় তাকে সরিয়ে দিল; জোর গলায়

বলল : "তুমি দুষ্ট লোক জন অ্যালানসন, মিনতি করছি, আমার চোখের সামনে থেকে তুমি দূর হয়ে যাও। আজ রাতে যে কষ্ট আমি সয়েছি তা রক্ত-মাংসের মানুষের সহ্যের অতীত; আর সে কষ্ট আমাকে দিয়েছে তোমারই কোন দুষ্ট লোক। তাই যাঁর বিধান তুমি লংঘন করেছ তাঁর নামে তোমাকে মিনতি করছি, তুমি আমার দৃষ্টির বাইরে চলে যাও।

পরস্পরবিরোধী ঘটনার চাপে বিভ্রান্ত যুবকটি দুই হাত তুলে পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে রইল। মুখটা মরার মত সাদা হয়ে গেছে। তা দেখে বুড়ো-বুড়ির করুণা হল। মেয়ের ঘর থেকে বাইরে নিয়ে আগুন জ্বালিয়ে তার শরীরটাকে গরম করল; তারপর তীব্র কৌতূহলে একের পর এক প্রশ্ন করতে লাগল। কিন্তু তার মুখ থেকে বোধগম্য কোন কথাই বের করতে পারল না। থেকে থেকে সে শুধু কয়েকটি অসংলগ্ন উক্তিই করতে লাগল—যেমন "হে ঈশ্বর, এ সবের অর্থ কি?" অথবা "এ সবই শয়তানের ভেল্কি; অশুভ শক্তি আমার উপর ভর করেছে!"

তার কাছ থেকে কোন কথা বের করতে না পেরে বুড়ো-বুড়ি নিজেরাই নানারকম জল্পনা-কল্পনা শুরু করে দিল। জিন লিণ্টন বলল, "নিশ্চয় হ্রদের ভিতর থেকে কোন জলপরী উঠে এসেছিল মেরির বেশ ধরে ছেলেটাকে নষ্ট করতে।" তা শুনে অ্যাণ্ড্রু বার্নেট উপদেশের ছলে বলল, "এবারের মত খুব বেঁচে গেছ জন অ্যালানসন; কিন্তু বুড়ো মানুষের একটা পরামর্শ শোন—আর কখনও কোন ভাল মানুষের মেয়েকে ভুলিয়ে নিতে কখনও রাত-বিরেতে বেরিয়ো না—বেরুলে তোমার কপালে অনেক কষ্ট আছে।"

অ্যালানসন তখনও থর্‌থর্ করে কাঁপছে দেখে জিন লিণ্টন দৌড়ে ঘরের ভিতর ঢুকে দুই শিঙ-ভর্তি কড়া সুরা এনে তাকে খাইয়ে দিল; আর অ্যাণ্ড্রু তার কব্জিতে লাল সুতো বেঁধে দিয়ে একটা শক্ত লাঠি তার হাতে দিয়ে বাড়ি পাঠিয়ে দিল; যাবার আগে সেই সাবধান-বাণীটা আর একবার শুনিয়ে দিল।

পরদিন সকালে মেরি অন্য দিনের তুলনায় একটু বেশী সাজগোজ করল, কিন্তু তার সুন্দর মুখের উপর একটা গভীর বেদনার ছায়া স্পষ্ট হয়ে ছড়িয়ে পড়ল; মাঝে মাঝেই দুটি চোখে অবারণ অশ্রুধারা যেন টলমল করতে লাগল। সারা সকাল ভাল-মন্দ একটা কথাও বলল না; শুধু দুই একবার গভীর বিষণ্ন দৃষ্টিতে মার দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখা গেল। বেলা নটা নাগাদ একটা খড়ের পাকানো দড়ি কাঁধে ফেলে সে হ্রদের পূর্বপ্রান্তের মাঠে চলে গেল—বাবার খড়ের কিছু অংশ বেঁধে নেবে বলে; আগে থেকেই কথা ছিল, তার বাবা ও দাদা দুপুর বেলা ভেড়ার খোয়াড় থেকে সেখানে এলে মেরি গিয়ে তাদের সঙ্গে মিলিত হবে।

বুড়ো অ্যাণ্ড্রু বাড়িতে ফিরে এলে তার ও স্ত্রীর মধ্যে গত রাতের ঘটনা নিয়েই কথাবার্তা চলতে লাগল। কথাপ্রসঙ্গে অ্যাণ্ড্রু বলল, "ভাল

কথা জিন, গত রাতে আমাদের মেয়ে যুবক জন অ্যালানসনকে কিন্তু একটা খুব খারাপ কথা বলেছে।"

"কী আবার খারাপ কথা ও বলেছে; একটি ভাল খ্রীস্টান মেয়ের মতই তো কথা বলেছে, বেশ করেছে।"

"আমি কিন্তু তা মনে করি না জিন। ও যে ছেলেটিকে হটিয়ে দিল সেটা সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের নামে না শয়তানের নামে তা কিন্তু সঠিক বোঝা গেল না।"

"আহা অ্যাণ্ড্র, তুমি এ-কথা বলছ কেন? সে যে ঈশ্বরের নামেই তাকে ফিরিয়ে দিয়েছে তাতে তোমার সন্দেহ হচ্ছে কেন?"

"আরে, মেয়ে তো স্পষ্ট করেই ঈশ্বরের নাম উল্লেখ করতে পারত; তাহলে তো আর সন্দেহের কোন অবকাশ থাকত না; তার পরিবর্তে সে কি বলল, না—'যাঁর বিধান তুমি লংঘন করেছ তাঁর নামে তোমাকে মিনতি করছি, তুমি আমার দৃষ্টির বাইরে চলে যাও।' সে কার কথা বলেছে—ঈশ্বরের না শয়তানের? তাছাড়া, সে তো আরও বলেছে, 'তার কষ্ট রক্ত-মাংসের মানুষের সহের অতীত।' তা থেকে কি এটাই বোঝায় না যে সে রক্ত-মাংসের জীবের চাইতে অন্য কিছু? জিন লিণ্টন, জিন লিণ্টন! হায়, যদি এটাই ঘটে থাকে যে আমাদের মেয়ে জলে ডুবে গেছে, আর তার রূপ ধরে আমাদের বাড়িতে ফিরে এসেছে একটা পরী, তাহলে তুমি কি বলবে?"

"চুপ কর অ্যাণ্ড্র বার্নেট, চুপ কর; আমার বুকটা যে ঠাণ্ডা হয়ে আসছে। আমরা তো চিরদিন প্রভুর উপর ভরসা রেখেছি, তিনিও কোনদিন আমাদের পরিত্যাগ করেন নি, তিনি কখনও শয়তানকে আমাদের উপর বা আমাদের সন্তানের উপর ভর করতে দেবেন না।"

"তুমি ঠিক বলেছ জিন, সেই আশাকেই আমরা আঁকড়ে ধরে থাকব।" এই কথা বলে বুড়ো অ্যাণ্ড্র ছেলে আলেকজাণ্ডারকে নিয়ে মাঠের দিকে চলে গেল আদরের মেরির কাজে সাহায্য করতে।

মাঠে পৌঁছে তারা তো অবাক। তিন ঘণ্টা হয়ে গেল মেরি বাড়ি থেকে বেরিয়েছে। প্রতি ঘণ্টায় তার অন্তত পক্ষে এক ডজন করে খড়ের আঁটি বাঁধা উচিত ছিল, কিন্তু সে বেঁধেছে মোট সাত আঁটি, আর একটা অসমাপ্ত হয়ে পড়ে আছে। তাছাড়া, মেরিরও দেখা নেই। মজা করার জন্য মেরি কোথাও লুকিয়ে আছে মনে করে তার দাদা খড়ের গাদার আনাচে-কানাচে অনেক খুঁজল, কিন্তু কোথাও তাকে পাওয়া গেল না। যুবকটি গোয়ালেই রাত কাটাত বলে গত রাতে তাদের বাড়িতে যেসব ঘটনা ঘটেছে তার কিছুই সে জানত না; তাই তার বাবা এতে খুব শংকিত হয়ে পড়লেও সে নিজে ততটা ভয় পেল না। বাবা কিছুতেই কাজে মন বসাতে পারল না; মেরির জন্য অপেক্ষা করে করে একসময় কোটটা গায়ে দিয়ে বাড়ির পথ ধরল—সব দুঃখের কথা

স্ত্রীর কাছে বলতে। যাবার আগে ছেলেকে বলে গেল, সে যেন আশপাশের সব খামারে ও বাড়িতে খোঁজ নেয় কেউ মেরিকে দেখেছে কি না।

বাড়িতে পৌঁছে অ্যাণ্ডু যখন স্ত্রীকে খবরটা দিল যে তাদের আদরের মেয়েটি হারিয়ে গেছে, তখন বৃদ্ধ দম্পতিটির শোকের আর শেষ রইল না। দুজনে বসে বসে কাঁদতে লাগল। বুড়োর সব রাগ গিয়ে পড়ল জন অ্যালাসনের উপর। বলল, "হতচ্ছাড়াটা যদি ক্ষুব্ধ বাবা-মার মিনতি না শোনে তাহলে এই দুটি হাতের ধকল তাকে সইতেই হবে।"

যুবক অ্যালানসনকে বাড়িতে পাওয়ার তিলমাত্র আশা নেই জেনেও এ্যাণ্ডু সোজা চলে গেল ইন্‌ভার্লনে। কিন্তু সেখানে পৌঁছে সে সবিস্ময়ে দেখল, অ্যালানসন প্রচণ্ড জ্বরে একেবারে শয্যাশায়ী; বিকারের ঘোরে অনবরত ডাইনী, ভূত ও মেরি বার্ণেটের কথা বলছে। তার বিকার এতই তীব্র আকার ধারণ করেছে যে তিনজন লোক তাকে জোর করে বিছানায় শুইয়ে রেখেছে। তার বাবা-মা খোলাখুলিই বলল যে তাদের ছেলেকে হয় ডাইনীতে ধরেছে, না হয় তো কোন অপদেবতা তার উপর ভর করেছে; ফলে গোটা পরিবারের দুঃখের আর অন্ত নেই। এত দুঃখের মধ্যে নিজের দুঃখের কথা বলে আর কি হবে—এই কথা ভেবে বুড়ো মেষপালক নিঃশব্দে নিজের শোকতপ্ত বাড়িতেই ফিরে গেল।

ব্যর্থ খোঁজাখুঁজির পরে তার ছেলেও বাড়ি ফিরল। কেউ তার বোনকে দেখে নি। তবে অক্সক্রুশ নামক জায়গায় একটা পাগলি বুড়ি বলেছে, একটা মস্তবড় রথে চড়ে যুবক জন অ্যালানসনের সঙ্গে মেরিকে বার্কহিলের পথ ধরে যেতে দেখেছে; এতক্ষণ তারা ডাস্‌গ্রি চৌরাস্তায় পৌঁছে গেছে। শুনে বুড়ো-বুড়ি ভাবল, অত বড় কোন রথ তো এ অঞ্চলে নেই, আর সেরকম রথ চলবার মত রাস্তাও এখানে নেই; কাজেই পাগলি বুড়ির কথাগুলোকে তারা বুড়ো বয়সের ভীমরতি বলেই ধরে নিল। তবু অনেক চেষ্টা করেও যখন মেরির কোন খোঁজই পাওয়া গেল না তখন বুড়ো অ্যাণ্ডু আর একবার সেই পাগলি বুড়ির কাছেই গেল। কিন্তু এবার সে কোন কিছুই স্মরণ করতে পারল না; এমন সব উপকথা আওড়াতে লাগল যার মাথামুণ্ডু কিছুই সে বুঝতে পারল না।

সুন্দরী মেরি বার্নেট হারিয়ে গেল। ১৭ই সেপ্টেম্বর বুধবার সকাল নটায় সে তার বাবার বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়; পরনে ছিল সাদা গাউন ও সবুজ ওড়না, কাঁধে ছিল খড়ের দড়ি; সেই বেশেই তাকে গ্রামের মধ্যে সর্বশেষ দেখা গিয়েছিল। এইভাবে কার্কস্টাইলের মেরি বার্নেট হারিয়ে গেল। এই রহস্যজনক ঘটনায় সারা দেশে হৈ-চৈ পড়ে গেল। এই দুঃখজনক ঘটনা নিয়ে একসময় একটা দীর্ঘ পল্লী-গাথাও রচিত হয়েছিল; সর্বত্র গাওয়াও হত। আমি শুধু তার কথাই শুনেছি, তার গান বা আবৃত্তি কখনও শুনিনি। তার

অনেকগুলি শ্লোকই এইভাবে শেষ হত :

"কিন্তু সুন্দরী মেরি বার্নেট,
তোমাকে তো আর কোন দিন দেখতে পাব না।"

গল্পটা ক্রমেই চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল (এবং সেটা যে অত্যন্ত অতিরঞ্জিত-ভাবেই হল সেবিষয়েও কোন সন্দেহ নেই), আর যে যুবকটি বেঁচে রইল তার প্রতি কটূক্তি বর্ষণেরও যেন কোন মাত্রা রইল না ; অবশ্য কটূক্তি তার কিছুটা প্রাপ্যই ছিল, কারণ তার পর থেকেই সে আগের চাইতে দশগুণ খারাপ হবে উঠল। একটা ব্যাপারে কিন্তু সারা দেশ একমত হল , আসল মেরি বার্নেট হ্রদের জলে ডুবে মরেছে, আর যে জীবটি বিছানায শুযে কেঁদেছিল ও পরদিন উধাও হল সে হয কোন পরী, আর না হয তো কোন পেত্নি , কারণ মাত্র একবার একটি রহস্যজনক উক্তি করা ছাড়া আর কোন কথাই সে বলেনি, এবং পরিবারের কারও সঙ্গে বসে কোনরকম খাবারও খায নি। বাবা-মা এ নিযে কোন কথাও বলে না, কোনরকম চিন্তা-ভাবনাও করে না , এই ক্লান্ত পৃথিবীর পথে তারা যেন স্বপ্নের ভিতব দিযে দিনগুলো কাটাতে লাগল। মেরি বার্নেটের সব জিনিসই তারা পবিত্র স্মৃতি হিসাবে বাড়িতে রেখে দিল , সেগুলিকে ঘিরে মাযের চোখে অনেক জল ঝরল।

বুড়ো অ্যাণ্ড্রু মাঝে মাঝেই হ্রদের তীব বরাবর হাঁটতে থাকে , মেযের কোন স্মৃতি-চিহ্ন যদি খুঁজে পাওযা যায এই তাব মনের আশা। অনেক ছোট ছোট হাড সে সংগ্রহ করল , কোনটা ভেড়ার, কোনটা বা অন্য জন্তুর, আবার কোনটা হয তো মাছের , বুড়োর ধারণা ওগুলো তার মেযের হাত-পায়ের আঙুলের হাড়। সেইসব হাড সে তাব ছোট থলিটাতে লুকিযে রাখে।

যুবক অ্যালানসনের জ্বর-বিকার ভাল হযে গেল , কিন্তু অন্য সকলের মত ধীরে ধীরে নয, হঠাৎ একদিন সে সুস্থ হযে উঠল। তাকে দেখে মনে হত, মেরি বার্নেটের কথা তার মনেই নেই। সে আগের চাইতে দশগুণ বেশী খারাপ হয়ে গেছে। অসংকোচে সবরকম অন্যায কাজ করে। সকলেই তাকে ঘৃণা করে।

অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি। মেরি বার্নেট হারিয়ে যাবার পরের বছর। এক শুক্রবার সকালে জন অ্যালানসন গেল অ্যানানডেল-এর অন্তর্গত মোফাট গ্রামের মস্ত বড় ভাড়াটে মেলায বাড়ির কাজের জন্য একটি দাসী ভাড়া করতে। তার চরিত্রের কুখ্যাতি তখন এতই ছড়িয়ে পডেছে যে আশেপাশের কোন যুবতীই তার বাবার বাড়িতে কাজ করতে রাজী হয না। তাই সে মোফাট-এর মেলায় গেল একটি সুন্দরী মেয়েকে ভাড়া করে আনতে ; মনের ইচ্ছা, বাড়িতে এনেই তাকে নষ্ট করবে। এটা কোন অনুমানমাত্র নয়, কারণ মেলায় তার সহযাত্রী কারিক্কেয়াল গ্রামের মিঃ ডেভিড ওয়েল্চ্‌কে সে তার

মনের কথাটি বেশ গর্বভরেই বলেছিল। কিন্তু অ্যানান্‌ডেল-এর কুমারী মেয়েদের একটি অভিভাবক-পরী যে সেদিন মেলায় উপস্থিত ছিল সে কথা তারা কেউই জানত না।

ভাড়াটে বাজারে ঘুরতে ঘুরতে একটি মেয়ে অ্যালানসনের নজরে পড়ে গেল; না পড়ে আর যাবে কোথায়, তার মত সুন্দরী, মনোরমা মেলায় আর একটিও ছিল না। মিঃ ওয়েল্‌চ্‌ চুপচাপ দাঁড়িয়ে অ্যালানসনকে দেখতে লাগল। অ্যালানসন সুন্দরীকে একপাশে ডেকে নিয়ে গেল। তার পরনে সবুজ পোশাক; যেন সদ্যফোঁটা গোলাপটি।

"তুমি কি ভাড়া যাবে সুন্দরী?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ"

"আমার সঙ্গে ভাড়া যাবে?"

"আপত্তি নেই। তবে অনেক দিনের জন্য ভাড়া করতে হবে।"

"অবশ্য। যত বেশী দিনের জন্য হয় ততই ভাল। কত মাইনে চাও?"

"কি জানেন, আমি যদি ভাড়া যাই তো ইন্‌ভাল´নে প্রথম যে জীবিত প্রাণীটিকে দেখব তাকেই আমার চাই।"

"তাহলে সে তো আমিই হব। কিন্তু ইন্‌ভাল´ন সম্পর্কে তুমি কি জান?"

"আমার তো ধারণা সবকিছুই আমার জানা উচিত।"

"কী আশ্চর্য! এ-মুখ যে আমার কাছে নিজের মুখের মতই চেনা, বুঝি বা তার চাইতেও বেশী চেনা। কিন্তু নামটা ঠিক মনে করতে পারছি না। তোমার নামটা জিজ্ঞাসা করতে পারি কি?"

হাত তুলে মেয়েটি গম্ভীর গলায় বলল, "চুপ। চুপ! ও কথা এখন থাক।"

যুবক চেঁচিয়ে বলল, "আমি যে হতভম্ব হয়ে গেছি! এ কথার অর্থ কি? দোহাই তোমার, তোমার নামটা বল।"

মেয়েটি ফিস্‌ফিসিয়ে বলল, "আমার নাম মেরি বার্নেট।" বলেই সে সবুজ ওড়নাটা মুখের উপর টেনে দিল।

সেই মুহূর্তে যদি অ্যালানসনের মৃত্যুর পরোয়ানা জারি করা হত তাহলেও হয় তো তার বুদ্ধিশুদ্ধি এতখানি লোপ পেত না। মুখটা মরার মত সাদা হয়ে গেল, চোয়াল ঝুলে পড়ল, চোখ দুটি চকচক করতে লাগল। মিঃ ওয়েল্‌চ্‌ সারাক্ষণ তার উপরে নজর রেখেছিল। সহযাত্রীর সংকট-অবস্থা বুঝতে পেরেই সে এগিয়ে গেল। বলল, "অ্যালানসন? মিঃ অ্যালানসন? কি হল তোমার? মেয়ে যে তোমাকে যাদু করেছে—একেবারে পাথরের মূর্তি বানিয়ে ফেলেছে!"

অ্যালানসনের গলার মধ্যে একটা শব্দ হল; যেন কিছু বলতে চাইল, কিন্তু জিভে কোন শব্দ উচ্চারিত হল না; কেবল বিড়বিড় করতে লাগল। তার বিকার দেখা দিয়েছে, এখনই মূর্চ্ছা যাবে—এটা বুঝতে পেরে মিঃ

ওয়েল্‌চ্‌ তাকে ধরে নিয়ে "জনস্টন আর্মস্‌" সরাইখানাতে ঢুকল। কিন্তু অনেক প্রশ্ন করেও তার মুখ থেকে কোন কথা বের করতে পারল না। ওয়েল্‌চের কিন্তু ঐ সবুজবসনা সুন্দরীকে আর একবার দেখার খুব ইচ্ছা হল। তাই অ্যালানসনকে বেশ কিছুটা মদ খাইয়ে তাকে সঙ্গে নিয়ে গোটা মেলা তন্ন তন্ন করে খুঁজল, কিন্তু সবুজবসনা সুন্দরী উধাও—কোথাও তাকে পাওয়া গেল না। নিজের নামটা বলেই সে ভিড়ের মধ্যে মিলিয়ে গেছে। অ্যালানসন ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠল। আবার সে ফিরে গেল বাজারের মাঝখানে।

অচিরেই আগেরটির চাইতেও সুন্দরী একটি মেয়েকে দেখতে পেল। সে যেন একটি ক্ষীণকটি পরী, পরনে বরফ-সাদা পোশাক, তাতে সবুজ ফিতে বাঁধা। ওয়েল্‌চ্‌ বলল, এমন সুন্দরী সে জীবনে দেখে নি। অ্যালানসন তাকে একপাশে ডেকে নিয়ে যথারীতি প্রশ্ন করল: "তুমি কি ভাড়া যাবে সুন্দরী?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"আমার সঙ্গে ভাড়া যাবে?"

"আপত্তি নেই।"

"তাহলে কত মাইনে চাও? আরে—খোলাখুলি বল। তবে ভেবেচিন্তে বল। অল্পসল্পের জন্য তোমাকে কিছুতেই ছেড়ে যাব না।"

"আমার মাইনে হবে বিনিময়ে; অন্য কোন শর্তে আমি কাজ করব না। বলুন তো, ইনভাল'নের সব ভাল মানুষরা কেমন আছে?"

অ্যালানসনের দম বন্ধ হয়ে এল, শরীরের ভিতর দিয়ে একটা ঠাণ্ডা স্রোত বইতে লাগল, কোনরকমে বলল, "তোমাকে ধন্যবাদ—সকলেই মোটামুটি ভাল আছে।"

মেয়েটি আবার শুধাল, "আর আপনার প্রতিবেশী বৃদ্ধ দম্পতি, তারা কি এখনও বেঁচে আছে—ভাল আছে?"

অ্যালানসন হাঁপাতে হাঁপাতে জবাব দিল, "আমি—আমি—আমি জানি তারা ভালই আছে। কিন্তু আমি তো কিছুতেই বুঝতে পারছি না কী তুমি যে এত সব খবর রাখ?"

"সে কি?" মেয়েটি বলল, "কার্কস্টাইলের মেরি বার্নেটকে তুমি এত তাড়াতাড়ি ভুলে গেলে?"

অ্যালানসন এমনভাবে চমকে উঠল যেন একটা বুলেট তার বুকে বিঁধেছে। সুন্দরী পরী-মূর্তি ভিড়ের মধ্যে মিশে গেল, আর হতভম্ব যুবকটি পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে রইল। মিঃ ওয়েল্‌চের ডাকে চমক ভাঙতেই আর একটি সুন্দরীকে দেখতে পেয়ে তাকেও তাড়া করতে চাইল এবং একই জবাব পেল। একই নাম শুনল। আসলে, প্রথম যখন আমি গল্পটা শুনি তখন এই রকম সাতটি সুন্দরীর কথা [illegible] বলা হয়েছিল, আর তারা সকলেই

ছিল কার্কস্টাইলের মেরি বার্নেট। কিন্তু আমার ধারণা, অতগুলি সুন্দরীকে পরীক্ষা করার আগেই সে নিশ্চয় বুঝতে পেরেছিল যে তার উপর কোন অপদেবতার ভর হয়েছে। যাইহোক, যখন কিছুতেই কিছু হল না, তখন সে বসে বসে বেশ খানিকটা কড়া মদ পেটে ঢালতে লাগল। আর তখনই মেলায় এমন একটি অপরূপা সুন্দরীর আবির্ভাব ঘটল যে সকলেরই দৃষ্টি গিয়ে পড়ল তার উপরে। সোনালী কাজ-করা রথে চড়ে মেলায় এসেছে এক সুন্দরী; সোনালী সবুজ উর্দিপরা দুটি পরিচারক তার রথের সামনে, দুটি পিছনে; মোকাট-এর মেলায় এমন চমৎকার উল্কা এর আগে কেউ কখনও দেখে নি। সঙ্গে সঙ্গে গোটা মেলায় খবর ছড়িয়ে পড়ল যে এই সুন্দরী আর্ল অব মর্টনের জ্যেষ্ঠা কন্যা লেডি এলিজাবেথ ডগ্‌লাস; সম্প্রতি তিনি মোফাটের নিকটবর্তী অচিনক্যাসলে বেড়াতে এসেছেন। স্কটল্যাণ্ডে তখন তার রূপের খ্যাতি; আর পরবর্তীকালে তিনিই হয়েছিলেন লেডি কীথ। এই কাহিনীতে তার নামটি উল্লেখিত হওয়াতেই জানা যায় যে সময়টা ছিল চতুর্থ জেম্‌সের রাজত্বকাল। আর সেইসময়েই স্কটল্যাণ্ডে ভূত-প্রেত-ডাইনিতে মানুষের বিশ্বাস ছিল সর্বাধিক।

মেলার সকলেরই বিশ্বাস যে এই সুন্দরী আর্ল অব মর্টনের কন্যা। তিনি যখন "জনস্টন আর্বস্" সরাইখানায় এলেন তখন সবুজ পোশাক-পরা একটি ভদ্রলোক খালি মাথায় এসে তাকে গাড়ি থেকে নামিয়ে নিল। সকলেই এক দৃষ্টিতে এই অপরূপা সুন্দরীকে দেখল, কিন্তু অ্যালানসনের মত এত বিহ্বল কেউ হল না। স্বর্গে, মর্ত্যে, বা পরীদের দেশে এর অর্ধেক মনোরমা কাউকে দেখার কথা সে কোনদিন ভাবতেই পারে নি। প্রশংসায় বিমূঢ় হয়ে সে যখন দাঁড়িয়েছিল তখন তাকে আরও বিস্মিত করে দিয়ে সেই অতুলনীয়া সুন্দরী তাকে ইসারায় কাছে ডাকলেন। নিজের চোখকে সে বিশ্বাস করতে পারল না; আর কেউ ব্যাপারটা লক্ষ্য করেছে কি না বুঝবার জন্য এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল; কিন্তু সুন্দরী তাকে দ্বিতীয়বার কাছে ডাকলেন; এবার তার মুখে বিজয়িনীর মধুর হাসি। সঙ্গে সঙ্গে অ্যালানসন মাথার বীভার-টুপিটা খুলে দ্রুত পায়ে তার দিকে এগিয়ে গেল; আর সুন্দরী হাত বাড়িয়ে তাকে ধরে দুজনে সরাইখানায় ঢুকে গেলেন।

অ্যালানসন ভাবল, দেশের শ্রেষ্ঠ সুন্দরী লেডি এলিজাবেথ ডগলাস এইভাবে তাকে কৃতার্থ করেছে; মেলার অন্য সকলেও তাই ভাবল।

মহিলাটি প্রথমেই অ্যালানসনের স্বাস্থ্য সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিলেন। অ্যালানসন যথাসম্ভব বিনীতভাবে মহিলাকে ধন্যবাদ জানাল। তারপরেই সুন্দরী অ্যালানসনের বাবা ও মার কথা জানতে চাইলেন। ওহো! যুবকটি নিজের মনেই বলে উঠল, তাহলে তো এই সুন্দরী তার প্রেমে পড়েছে! একান্ত বিনয়ে তার প্রশ্নের জবাব দিয়ে যুবকটি সুন্দরীর বাবা ও যুবক লর্ড

উইলিয়ামের কথা বলতে শুরু করতেই মহিলাটি তাকে থামিয়ে দিয়ে জানতে চাইলেন, যুবক তাকে চিনতে পেরেছে কি না।

"হ্যাঁ, নিশ্চয়! মাননীয়া মহিলাকে সে অবশ্যই চেনে, মনে হচ্ছে আগে তাকে সে অনেকবার দেখেছে, কিন্তু কবে, কোথায় তাদের দেখা হয়েছিল এই মুহূর্তে সেটা কিছুতেই স্মরণ করতে পারছে না।"

তারপরেই সুন্দরী কার্কস্টাইলের প্রতিবেশীদের কথা জানতে চাইলেন; তারা এখনও বেঁচে আছে কি না, ভাল আছে কি না!

অ্যালানসনের মনে হল তার হৃৎপিণ্ডটা বুঝি জমাট বরফ হয়ে গেছে। সারা দেহে একটা ঠাণ্ডা স্রোত বয়ে গেল; ধপ্ করে একটা আসনে বসে নিশ্চল হয়ে রইল, কিন্তু সুন্দরী মহিলা মধুর বচনে তাকে সান্ত্বনা দিলেন, তখন সে আবার কথা বলার মত সাহস ফিরে পেল।

যুবক বলল, "সে কী! তাহলে আপনিই কি সারাটাদিন আমাকে নিয়ে খেলা করেছেন?"

সুন্দরী বললেন, "মিঃ অ্যালানসন, প্রথম প্রেম তো এত সহজে চলে যায় না। আমাকে দেখেই তুমি বুঝতে পারছ যে আজ আমি ভাগ্যবতী; কিন্তু তা সত্ত্বেও তোমার প্রতি আমার প্রথম প্রেম আজও অটুট ও অপরিবর্তিত আছে; তাই তোমার ভালবাসাকে পরীক্ষা করতে, আমাকে দেখলে তোমার মনে কি ভাব জাগে সেটা বুঝতে তোমার সঙ্গে যদি একটু লুকোচুরি খেলে থাকি তো সেজন্য তুমি আমাকে ক্ষমা করো।"

যুবক বলল, "আজ সারাটাদিন আমি যে বারে বারে তোমার মুখই দেখেছি সেটাই আমার পরম ভাগ্য। কিন্তু একবার যখন দুজনের দেখা হয়েছে তখন আর সহজে আমরা আলাদা হয়ে যাব না। তোমার সেবাতেই জীবনের শেষ ক'টা দিন কাটিয়ে দেব, শুধু বল তুমি কোথায় থাক।"

"খুবই কাছে; এখান থেকে সামান্য দূরে; তোমার পক্ষে যদি সুবিধা হয় তো আজ রাতে সেখানে তোমাকে কাছে পেলে আমি খুব—খুব খুশি হব। কিন্তু বর্তমানে আমার স্বামী যে বাড়িতে নেই, অনেক দূর দেশে চলে গেছে।"

যুবক বলল, "তাতে আমাদের সাক্ষাৎ ঘটায় কোন বাধা হবে বলে তো আমি মনে করি না।"

বাইরে অনিচ্ছা দেখালেও শেষ পর্যন্ত সুন্দরী যুবকটিকে তার বাড়িতে যাবার অনুমতি দিলেন; তাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবার জন্য একজন বিশ্বাসী লোককে রেখে যেতে চাইলেন, কিন্তু যুবকটি তাতে আপত্তি জানিয়ে বলল সে একাই যেতে পারবে; অগত্যা তাকে নিজের প্রাসাদের পথটা ভাল করে বুঝিয়ে দিয়ে সুন্দরী তার রথে চেপে চলে গেলেন।

অ্যালানসন তখন পার্থিব সবকিছুর ঊর্ধ্বে উঠে গেছে। বন্ধু ডেভিড

ওয়েল্‌চ্‌কে খুঁজে বের করে তার অসাধারণ সৌভাগ্যের কথা জানাল, কিন্তু সেই সুন্দরী যে লেডি এলিজাবেথ ডগলাস নয় সেকথাটা তাকে বলল না। ওয়েল্‌চ্‌ জোর করেই তার সঙ্গ নিল, এবং মহিলাটির মস্তবড় প্রাসাদের রাস্তা পর্যন্ত তার সঙ্গে সঙ্গেই গেল; সেখানেই একা দাঁড়িয়ে থেকে সে দেখল, অ্যালানসন প্রাসাদের ফটক দিয়ে ভিতরে ঢুকে গেল। আকাশের তারার মতই অসংখ্য আলোয় প্রাসাদটা ঝলমল্‌ করছে।

অ্যালানসন বাবা-মাকে কথা দিয়ে গিয়েছিল, মেলা ভাঙবার পরদিন সকালে প্রাতরাশে তাদের সঙ্গে যোগ দেবে। কিন্তু সেদিন তো সে এলই না, তৃতীয় দিনে বুড়ো মানুষটা সাদা ঘোড়ায় চেপে মোকাটের পথে যাত্রা করল ছেলের খোঁজে। পথে কারিফেরান-এ মিঃ ওয়েল্‌চ্‌-এর সঙ্গে দেখা করল। যুবকটি বাড়ি ফেরে নি শুনে সে তো খুবই অবাক হয়ে গেল। তবু বুড়োকে বলল, তার ছেলে নিরাপদেই আছে, কাজেই বুড়ো এখান থেকেই বাড়ি ফিরে যাক। তারপব বুড়োর পীড়াপীড়িতে অনিচ্ছা সত্ত্বেও জানাল যে তার ছেলে আর্ল অব মর্টনের সুন্দরী মেয়ের প্রেমে পড়েছে, সেই সুন্দরীর ইচ্ছানুসারেই তার প্রাসাদে গেছে, ডেভিড ওয়েল্‌চ্‌ নিজে ফটক পর্যন্ত তার সঙ্গে গেছে, তাকে প্রাসাদে ঢুকতে দেখেছে, সে যখন এতদিন সেখানেই রয়ে গেছে তাতেই বোঝা যাচ্ছে সেখানে তার আদর-আপ্যায়ণ বেশ ভালই হয়েছে।

বুড়োকে খুব ভেঙে পডতে দেখে মিঃ ওয়েল্‌চ্‌ অগত্যা তার সঙ্গেই চলল। মোকাটে পৌছে তারা দেখল তার ঘোড়াটা সরাইখানার সামনেই দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু লেডি এলিজাবেথ ডগলাসেব বাডি যাবার পর থেকে ঘোড়ার মালিকের দেখা পাওয়া যায় নি। মিঃ ডেভিড ওয়েল্‌চ্‌কে সঙ্গে নিয়ে বুড়ো অচিনক্যাস্‌লের উদ্দেশে যাত্রা করল; কিন্তু সেখানে পৌছবার অনেক আগেই মিঃ ওয়েল্‌চ্‌ তাকে বলল যে তার ছেলেকে সেখানে মোটেই পাওয়া যাবে না, কারণ মেলার দিন সন্ধ্যার পরে এ-পথের ঠিক বিপরীত দিকের একটা পথে তারা গিয়েছিল। যাইহোক, তারা দুর্গপ্রাসাদে গিয়ে হাজির হল। আর্লের সঙ্গে দেখা করল। বুড়োর কথা শুনে তিনি মেয়ে এলিজাবেথকে ডেকে পাঠালেন। বৃদ্ধ ভদ্রলোকের ছেলের সঙ্গে মেয়ের মেলায় দেখা হওয়া এবং গত শুক্রবার সন্ধ্যায় তাকে এই বাড়িতে আমন্ত্রণ করে আনা প্রভৃতি বিষয়ে নানা-রকম প্রশ্ন করে শেষ পর্যন্ত আর্ল বললেন যে তাকে নিশ্চয় প্রাসাদের কোথাও নিরাপদে লুকিয়ে রাখা হয়েছে।

বাবার মুখে এইসব কথা শুনে এবং বুড়ো মানুষটির গম্ভীর বিপর্যস্ত দৃষ্টি দেখে মহিলাটি যে কি করবেন, কি বলবেন কিছুই বুঝতে পারলেন না। কিন্তু মিঃ ওয়েল্‌চ্‌ই তাকে সে সংকট থেকে উদ্ধার করল। সে বেশ জোর দিয়েই বুড়ো অ্যালানসনকে বলল যে তার ছেলে যে মহিলাটির সঙ্গে দেখা

করতে এসেছিল তিনি এই মহিলা নন, তাকে সে খুব ভাল করে দেখেছে, এবং হাজার মানুষের ভিড়ের মধ্যেও তাকে আবার চিনতে পারবে; তাছাড়া সেদিন যে প্রাসাদের কাছে সে বুড়োর ছেলের সঙ্গে এসেছিল সেটাও এই প্রাসাদ নয়, সে প্রাসাদটা মোটেই এই ধরনেরই নয়। তারপর বলল, "বরং তুমি আমার সঙ্গে চল, এ অঞ্চলে নবাগত হলেও তোমাকে আমি ঠিক জায়গায় নিয়ে যেতে পারব।"

আবাব তারা যাত্রা কবল, মিঃ ওয়েল্চ্ যুবক অ্যালানসনের সঙ্গে মোকাট থেকে যেপথে গিয়েছিল সেই পথ ধবে কয়েক মাইল যাবার পরে তারা একটা চৌমাথায় পৌঁছে গেল। তখন ওয়েল্চ্ বলল, "আমবা ঠিক পথেই এসেছি। আব একটু এগিয়েই আমবা ঐ গাছটাব কাছে পৌঁছে যাব, সেখান থেকে একটু দূরেই আমি অ্যালানসনকে মস্তবড় ফটকটা দিয়ে ঢুকতে দেখেছিলাম। তিন মিনিটের মধ্যেই আমরা সেই প্রাসাদে পৌঁছে যাব।"

তাবা গাছটাব কাছে গেল, আরও একটু এগোল, তারপরেই মিঃ ওয়েল্চেব মুখে আর কোন কথা নেই: সেখানে না আছে প্রাসাদ, না আছে ফটক, আছে শুধু পঞ্চাশ ফ্যাদম গভীব একটা প্রচণ্ড খাদ, আর তার নীচ দিয়ে ফেনিল তরঙ্গ তুলে বয়ে চলেছে একটা কালো স্রোত।

বুড়ো অ্যালানসন বলে উঠল, "এটা কি হল? এখানে তো না আছে প্রাসাদ, না আছে জন-বসতিব কোন চিহ্ন।"

ওয়েল্চের মুখে অনেকক্ষণ একটি কথাও ফুটল না, পাথরের মূর্তির মত সে হাঁ করে এই পরিবর্তিত ভয়ংকর দৃশ্যের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর একসময় বলল, "যিনি মানুষেব আত্মা সৃষ্টি করেছেন, যেসব আত্মা মাটিতে ও বাতাসে ঘুরে বেড়ায় তাদের সৃষ্টি করেছেন, একমাত্র তিনিই বলতে পারেন এটা কি? আমরা এক যাদুব রাজ্যে এসে পড়েছি, মানুষের ধরা-ছোঁয়ার বাইরের কোন শক্তি আমাদের উপর ভর করেছে। ঠিক এইখান থেকে আমি তোমার ছেলের কাছ থেকে বিদায় নিয়েছিলাম, আর ওদিকে—ওই খাদের প্রান্তে, অথবা তার ঠিক উপরেই ছিল সেই অপূর্ব প্রাসাদের মস্ত বড় ফটক। মানুষের বুদ্ধি-বিবেচনায় এসব ব্যাপার কেমন করে ধরা পড়বে?"

তারা খাদের একেবারে সীমানার কাছে এগিয়ে গেল। মিঃ ওয়েল্চই আগে আগে গেল ঠিক যেখানে ফটকটা খুলে গিয়েছিল। সেখানে লাফিয়ে-ওঠা ঘোড়ার ক্ষুরেব দাগ তারা দেখতে পেল; কিন্তু দেখে মনে হল যে ঘোড়াটা কোনরকমে নিজেকে সামলে নিয়েছিল, কিন্তু নীচে—অনেক নীচে পড়ে আছে জন অ্যালানসনের তালগোল-পাকানো মৃতদেহ; আর এইভাবে এক অদৃষ্টপূর্ব রহস্যের ভিতর দিয়ে একটি দুষ্ট পাপাসক্ত যুবকের জীবনের অবসান ঘটল। এই রূপকথা থেকে কী সুন্দর একটি নীতি-বাক্যই না বের

করা যায়!

আপনারা হয়তো বলবেন, এই গল্পের অনেক আঁকাবাঁকা পথের কোথাও মেরি বার্নেটের পরে কি হল তা বলা হয় নি; কারণ মোকাটে তাকে যখন সর্বশেষ দেখা গিয়েছিল তখন সে তো একটা অশরীরী মূর্তি বা ছায়ামাত্র! প্রিয় পাঠক-পাঠিকা, সেই কুমারীর কি হল তার একটা বিবরণ আমি আপনাদের দিতে পারি। এই প্রাচীন রূপকথায় যাই বলা হোক না কেন, আমার তো মনে হয় সেই মেয়েটির ভাগ্য আরও দশগুণ বেশী রহস্যের জালে আবৃত।

যেদিনটিতে মেরি হারিয়ে গিয়েছিল প্রতি বছর সেই দিনটিকে মেরির সান্ত্বনাবিহীন বৃদ্ধ বাবা-মা শোক, উপবাস ও প্রায়শ্চিত্তের দিন হিসাবে পালন করে। সাত-সাতটা বছর এল ও চলে গেল; উপবাস ও প্রার্থনার সপ্তম বার্ষিকী দিবস সমাগত। আগেরদিন সন্ধ্যায় বুড়ো অ্যাণ্ড্রু আদরের মেরির স্মৃতি-চিহ্নের খোঁজে যথারীতি হ্রদের বালির উপর দিয়ে হাঁটছিল। এমনসময় সে দেখল, উস্কোখুস্কো চেহারার একটি ছোটখাট বুড়ো মানুষ তার দিকেই দ্রুত এগিয়ে আসছে। লোকটির উচ্চতা পাঁচের বেশী নয়; মুখটা মোটেই মানুষের মত দেখতে নয়; তবু তার আচরণ ভদ্র, কথাবার্তা শোভন। অ্যাণ্ড্রুকে শুভসন্ধ্যা জানিয়ে শুধাল, সে কি খুঁজে বেড়াচ্ছে। অ্যাণ্ড্রু জবাব দিল, যা কোনদিন পাওয়া যাবে না তাই সে খুঁজছে।

নবাগত বলল, "প্রবীণ মেষপালক, দয়া করে আপনার নামটা বলুন; মনে হচ্ছে আপনার দরকারী কিছু কথা আমার জানা উচিত, হয় তো আপনাকে একটা খবর আমি দিতে পারব।"

অ্যাণ্ড্রু বলল, "হায়রে! আমার নাম জেনে আপনার কি হবে? আমার নামে এখন কারও কোন দরকার নেই।"

নবাগত শুধাল, "আপনার কি কোন সুন্দরী কন্যা ছিল যার নাম মেরি?"

"এ বড় হৃদয়-বিদারক প্রশ্ন," অ্যাণ্ড্রু বলল; "তবে হঁযা, একসময় মেরি নামে আমার একটি আদরিণী কন্যা ছিল।"

"তারপর তার কি হল?" নবাগত শুধাল।

অ্যাণ্ড্রু মাথাটা নেড়ে মুখ ঘুরিয়ে হাঁটতে লাগল; এবিষয়ের কোন আলোচনা সে সইতে পারে না। হ্রদের বালুকাময় তীর ধরে সে চলতে লাগল। তার ন্যুব্জ দেহ, তার চলন, চোখের দৃষ্টি, মুখের ভাব—সবকিছুতেই ফুটে উঠেছে গভীর হতাশা। বেঁটে লোকটি তবু তার পিছনেই চলতে লাগল। একসময় বলল: "দেখুন, দেখে মনে হচ্ছে কোন সত্যিকারের অথবা কল্পিত দুঃখে আপনি কষ্ট পাচ্ছেন। কিন্তু আপনি যা করছেন সেটা যুক্তি-সম্মতও নয়, ধর্মসম্মতও নয়। সৃষ্টিকর্তার নির্দেশে যা ঘটেছে তা নিয়ে প্রশ্ন তোলার কী অধিকার মানুষের আছে?"

উপদেশদাতার দিকে অবাক হযে তাকিযে অ্যাণ্ড্রু বলল, "নিজেকে সমর্থন আমি করছি না, কিন্তু এমনকিছু ভাব যাকে যুক্তি বা ধর্ম দিযে চাপা দেওযা যায না, আবার এমন ভাবও আছে যাকে মনের মধ্যে লালন করলে বাবা-মার কোন পাপ হয না।"

নবাগত বলল, "আমি কিন্তু তা স্বীকার করি না। সর্বময অধিকর্তার নির্দেশকে শান্ত হৃদযে গ্রহণ না কর'টাই অধর্ম। কিন্তু এসব তর্ক যাক, আবার আপনাকে প্রশ্ন করছি, আপনার মেযের কি হল?"

অ্যাণ্ড্রু গম্ভীর মুখে জবাব দিল, "যিনি তার আত্মার পিতা, তার দেহের সৃষ্টিকর্তা, তাকে জিজ্ঞাসা করুন, জিজ্ঞাসা করুন তাঁকে যাঁর হাতে শিশুকাল থেকেই তাকে সঁপে দিযেছিলাম। আমার সেই মেযেব কি হযেছে তা জানেন শুধু তিনি, আমি জানি না।"

"কতদিন আগে তাকে হারিযেছেন?"

"কাল সাত বছব পূর্ণ হবে।"

"আচ্ছা, আপনার দেখছি সমযটা খুব ভালই মনে আছে। এত বছব ধরে তাব জন্য শোক করছেন?"

"হ্যাঁ, আর আমার সব স্নেহের আধাব সেই একমাত্র কন্যার জন্য শোক কবতে করতেই কবরে চলে যাব। হে অপার্থিব পবামর্শদাতা, আমার আদরের মেযের কোন খবব কি আপনি বাখেন? যদি রাখেন তাহলে আপনি নিশ্চযই জানেন যে সে অন্য মেযেদের মত ছিল না, যে সরলতা ও পবিত্রতা আমার মেযে মেরিকে ঘিরে ছিল তা মানুষের মধ্যে কদাচিৎ দেখা যায়।

"আপনি কি আবার তাকে দেখতে চান?" বামন জিজ্ঞাসা করল।

অ্যাণ্ড্রু ঘুরে দাঁড়াল, তার সারা শরীর কাঁপছে, বেঁটে বামনটির দিকে তাকিযে সে তীব্র কণ্ঠে চেঁচিযে বলল, "আবার তাকে দেখতে পাব! আপনি বলছেন, তাকে দেখতে চাই কি না?"

বামন বলল, "হ্যাঁ, তাই তো বলছি, আরও বলছি, এই স্মারকটি চেনেন কি? ভাল করে দেখুন, চিনতে পারেন কি না!"

অ্যাণ্ড্রু স্মাবকটি হাতে নিল, একবার সেটার দিকে, তারপর নবাগতের দিকে, আবার স্মারকটির দিকে তাকাল; দুই চোখ জলে ভরে গেল, সে হাউ-হাউ কবে কেঁদে উঠল। সে কান্না সুখের কান্না, তার সঙ্গে জড়িযে আছে হাসির উচ্ছ্বাস। স্মারকটিকে চুমো খেতে খেতে সে ভগ্নকণ্ঠে বলতে লাগল: "হ্যাগো বুড়ো, আমি এটিকে চিনি!—আমি চিনি!—আমি চিনি! এতো সেই এডোযার্ড-মার্কা মোহর, এতে তিনটে ছিদ্র আছে, অষ্টাদশ জন্মদিনে মেরিকে এটা উপহার দিযে বলেছিলাম, সে যেন একপ্রস্থ পোশাক কিনে নেয। কিন্তু স্মারকটি হাতে পেয়ে সে বলেছিল, 'আহা, এটা এত সুন্দর!

দাতার কথা স্মরণ করে আমি এটা রেখেই দেব, খরচ করব না। আহা, সোনা আমার! কিন্তু আগে আপনি বলুন। সে কেমন আছে? কোথায় আছে? সে কি বেঁচে আছে, না মারা গেছে?"

বামন জবাব দিল, "সে বেঁচে আছে, সুস্থ দেহে আছে; বরং আগের চাইতে ভাল আছে, আরও সাহসী হয়েছে, আরও সুখে আছে, আরও সুন্দর হয়েছে। কিন্তু আপনি যদি তাড়াতাড়ি তৈরি হতে পারেন, তাহলে কাল বিকেলে মোকাটে তাকে সপরিবারে দেখতে পাবেন। দূর দেশে ভ্রমণের পথে তারা সেখান দিয়েই যাবেন; কিন্তু যাত্রাটা খুব জরুরী; তাই আমাকে এই স্মারকটি দিয়ে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন যাতে সব কথা জেনে মরবার আগে আদরিণী কন্যাকে আর একবার দেখবার ও আলিঙ্গন করবার সুযোগ আপনি পান।"

"মোকাটে আমার মেরির সঙ্গে দেখা হবে? তাহলে আসুন ছোট মানুষটি, আসুন স্বর্গের দূত, এই বুড়ো মেষপালকের ঘরের সেরা আনন্দের পেয়ালায় একটু চুমুক দেবেন আসুন। তারপরই আমি আপনার পায়ে পা মিলিয়ে পথে নামব, আমার বুড়িও আমাদের সঙ্গে পা মেলাবে। তাই আপনাকে মিনতি করছি, আমার সঙ্গে আসুন।"

লোকটি বলল, "আপনার বাড়িতে যাবার অথবা সেখানে পেয়ালায় চুমুক দেবার মত সময় আমার নেই। আপনার সংসার আরও বড়—বাড়ন্ত হোক, আপনাদের অন্তর সুখে ভরে উঠুক! কিন্তু আমার পথ তো এদেশে আপনার দেওয়া মাংসের স্বাদ গ্রহণ বা পেয়ালায় চুমুক দেবার দিকে নয়, আমাকে দ্রুত ফিরে যেতে হবে তার কাছে যিনি আমাকে এখানে পাঠিয়েছেন। আপনি যান, তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে আসুন, কারণ নষ্ট করার মত সময় আপনার হাতে নেই।"

অ্যাণ্ড্রু শুধাল, "ঠিক কখন সে ওখানে হাজির হবে?"

বামন চেঁচিয়ে জবাব দিল, "পবিত্র ক্রুশের ছায়া যখন পুব দিকে হেলবে ঠিক তখন।" বলেই সে মুখ ঘুরিয়ে পা চালিয়ে দিল।

বুড়ি জিন লিণ্টন স্বামীকে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসতে দেখে কটকের বাইরে এসে উদ্বেগের সঙ্গে শুধাল, "কি হয়েছে অ্যাণ্ড্রু বার্নেট?"

"আমার পথ থেকে সরে দাঁড়াও বৌ; কি জান, আমার খুব তাড়া আছে।"

"সে তো দেখতেই পাচ্ছি গো ভালমানুষ; কিন্তু একটু স্থির হয়ে দাঁড়াও, আমাকে বল কিসের এত তাড়া। তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে যে এ-রকম করছ?"

"না, না জিন লিণ্টন, আমার মাথা খারাপ হয় নি—আমাকে এক্ষুণি মোকাট পর্যন্ত ছুটে যেতে হবে।"

"হা ঈশ্বর ! বুড়োর কথা শোন ! মোকাটে আবার তোমার কি কাজ পড়ল ? তোমার কি মনে নেই যে রাত পোহালেই আমাদের অনুষ্ঠান শুরু করতে হবে ?"

"আরে বুড়ি, আমার পথ থেকে সরে দাঁড়াও। ওসব অনুষ্ঠানের কথা এখন থাক। অনুষ্ঠান হবে মোকাটে, সকাল বেলা। আরে বৌ, তুমিও তো মোকাটে যাবে। কি ভাবছ বৌ ? হু হু। আমার কেরামতি যে কতখানি তা তুমি কল্পনাও করতে পারবে না।"

"অ্যাণ্ডু—অ্যাণ্ডু বার্নেট !"

"হাঁ করে দেখছ কি গো ? তাড়াতাড়ি কর, আমার গরমের পোশাকটা বের করে দাও। আরে জিন লিন্টন, শুনতে পাচ্ছ, তুমিও বিয়ের গাউন আর রেশমী ওড়নাটা পরে নাও, কারণ সকালে তোমাকেও যে মোকাটে পৌঁছতে হবে। অবাক হচ্ছ তো ? হু-হু, তা তো হবেই। এখনও তো তোমাকে বলি নি যে আমাদের মেরি আমাদের সঙ্গে দেখা করবে কাল সকালে—মোকাটে।"

"আঃ অ্যাণ্ডু। দুঃখী মায়ের মন নিয়ে তামাশা করো না।"

"ঈশ্বরের দোহাই বৌ, তোমার মন নিয়ে আমি যেন কোনদিন তামাশা না করি !" অ্যাণ্ডু কেঁদে ফেলল। "আমি যা বলছি সব সত্যি। কাল সকালে মোকাটে আমাদের আদরের মেয়ে দুই হাতে দুই ছেলেকে ধরে আমাদের সঙ্গে দেখা করবে ; মরবার আগে অন্তত একটিবার তাকে আমরা বুকে জড়িয়ে ধরতে পারব, চুমো খেতে পারব, আশীর্বাদ করতে পারব।"

এবার বুড়ির চোখে জলের ধারা নামল, তার দুঃখদীর্ণ গাল বেয়ে ফোঁটায় ফোঁটায় মাটিতে ঝরে পড়তে লাগল। তারপর স্বামীর পায়ের কাছে নতজানু হয়ে প্রাণ খুলে পরম পিতাকে ধন্যবাদ দিতে লাগল। তারপরেই উঠে দাঁড়িয়ে জ্ঞানহারার মত মোকাটের পথে ছুটে গেল। অ্যাণ্ডু তাকে ফিরিয়ে নিয়ে এল ; দুজনই যাত্রার জন্য তৈরি হতে লাগল।

কার্লস্টাইল থেকে মোকাট বিশ মাইলের পথ ; তাই তারা ১৬ই সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার বিকেলেই রওনা হল ; পথে টার্নবেরি শিল-এ রাতের মত বিশ্রাম নিল ; মোকাটে পৌঁছল পরদিন দুপুরে। বুড়ো-বুড়ির বাকি দিনটা যেন আর কাটতে চায় না ; দুজন কেবলই ভাবতে লাগল, কোন্ পথে তাদের মেয়েটি আসবে ? কেমন লোকজন সঙ্গে নিয়ে আসবে ?

তারা দক্ষিণের পথ ধরে কিছুটা এগিয়ে গেল, যদি সেই পথে মেরি আসে সেই আশায় ; আবার ফিরে এল পবিত্র ক্রুশের ছায়াটা দেখতে ; সেটা যখন পূর্বদিকে পড়ল তখন যেন তাদের আর কিছুই করার রইল না ; পথের ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে তারা চারদিকই দেখতে লাগল। অবশেষে জ্রাবকিস্ রোডের উপর প্রায় আধ মাইল দূরে দেখা গেল দুটি শিশুকে নিয়ে

একটি ভিখারিণী এগিয়ে আসছে; তাদের থেকে বেশ কিছুটা পিছনে আসছে একটি ভিখারী। বুড়ো-বুড়ি একদৃষ্টিতে তাদের দিকে তাকিয়ে রইল; অ্যাণ্ড্রুর মনে হল, পিছনের লোকটি সেই বামন ছাড়া আর কেউ নয়। এই মুহূর্তে তাদের কাছে এই ক'টি ভিখারী ছাড়া আর সবকিছুই অর্থহীন। ঠিক সেইমুহূর্তে সোনালী কারুকার্য-করা একখানি রথ পূব দিক থেকে গ্রামে প্রবেশ করল, সবুজ-সোনালী উর্দি-পরা দুটি লোক রথের সামনে, আর দুজন পিছনে; রথটা পূর্ণ গতিতে তাদের পাশ কাটিয়ে চলে গেল। "ওহ্-হো' পার্থিব ঐশ্বর্যের কী অহংকার!" অ্যাণ্ড্রু চেঁচিয়ে উঠল, রথটা গর্জন করে তার পাশ দিয়ে চলে গেল; কিন্তু তার বা তার স্ত্রীর দৃষ্টি তখন আর রথের দিকে নেই; তাদের সব মনোযোগ তখন ভিখারী দলের উপর নিবদ্ধ। অ্যাণ্ড্রু বলে উঠল, "আরে, ঐ তো আমাদের মেয়ে, ঠিক সে, যত গরীবই হোক, তার চলার ভঙ্গী আমি ঠিক চিনতে পেরেছি। হোক তারা দীন-দরিদ্র, তবু যতদিন আমার ঘরবাড়ি আছে ততদিন ওরা দুজন আর ওদের সন্তানরা আমাদের অগ্নিকুণ্ডের পাশেই আশ্রয় পাবে।"

বুড়ো বুড়ির চোখ জলে ভরে উঠল; স্নেহ ও করুণায় গলে গেল তাদের অন্তর; আর তখনই অ্যাণ্ড্রুর মনে হল কে যেন তার দুই হাঁটুকে জড়িয়ে ধরেছে, চোখ নামিয়ে দেখল, রূপে ও ঐশ্বর্যে সদ্য-ফোটা ফুলের মত মেরি তাদের পায়ের নীচে নতজানু হয়ে আছে। আনন্দে চীৎকার করে অ্যাণ্ড্রু মেয়েকে বুকে জড়িয়ে ধরল। জিন লিণ্টন কিন্তু দুই হাত বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁপতে লাগল; এতবড় ঐশ্বর্যময়ীকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরার সাহস তার হল না; তখন মেয়েই এগিয়ে এসে মাকে আলিঙ্গন করল, আর তখনই তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে মা হাউ-হাউ করে কেঁদে উঠল।

এ এক আশ্চর্য ঘটনা—তুলনাবিহীন এক পুনর্মিলন। সত্যি সত্যি আদরের মেরিকে তারা ফিরে পেয়েছে, তাকে আলিঙ্গনে বেঁধেছে, তাকে চিনতে পেরেছে, খুশি হয়েছে। কি বললাম—খুশি? এত সুখ বুঝি মানুষের কপালে জোটে না। এইমাত্র মেরি রথ থেকে নেমে এসেছে; বুড়ো বাবা-মাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ছুটে এসে তাদের পায়ে পড়েছে। এবার তারা সরাইখানায় ফিরে গেল; বাবা-মার সঙ্গে দুই ছেলের পরিচয় করিয়ে দিল। নানারকম আমোদ-আহ্লাদের ভিতর দিয়ে সন্ধ্যাটা কেটে গেল। বুড়ো-বুড়িকে মেরি অনেক দামী দামী উপহার দিল, মধ্যরাত পর্যন্ত তাদের চোখে-চোখে রাখল, তারপর তারা সুখের ঘুমে ঘুমিয়ে পড়ল। মেরি তখন পুনরায় রথে চেপে চলে গেল।

তাকে যদি আর কখনও স্কটল্যাণ্ডে দেখা গিয়ে থাকেও আমি কিন্তু সে-কথা কখনও শুনি নি; কিন্তু তার বাবা-মা মৃত্যুর দিন পর্যন্ত এই আনন্দ নিয়েই বেঁচে রইল যে তাদের মেয়ে বড় সুখে আছে।

Mary Burnet—James Hogg

টপ কোট

টপ কোটটা লাল্চে টুইডের তৈরি।

স্টাফ-রুমের দরজার পিছনে একটা পুরনো পিতলের হুকের সঙ্গে কোটটা ঝোলানো ছিল।

কলারের উপরের দিকে সবুজ লাইনিং বেড়িয়ে এসেছে। আল্গা-লাগানো পকেটের কোণ থেকে সুতো বেরিয়ে পড়েছে। বেল্টের বক্লসটা বেঁকে গেছে।

সবই পরিষ্কার মনে আছে।

মনে আছে কাৎজ্ ও তার দপ্তরের কথাও।

কাৎজ্-এর মাথা ভর্তি টাক, চোখ দুটি জলে-ভরা, গলায় বো-বাঁধা; তার ব্রিফ-কেসটাই তার দপ্তর। ছাত্রদের দেওয়া খাবারের টুকরোতে সেটা ফুলে থাকত।

উপরের দিকের খাবারগুলো টাটকা; নীচেরগুলো পচা।

চোখ ঘুরিয়ে, বিবর্ণ নাকের ছিদ্র ফুলিয়ে কাৎজ্ বলত, "এগুলো আমার ছাত্রদের দেওয়া খাবার হের ব্র্যাওন।"

বলেই ব্রিফ-কেসের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে একমুঠো পচা মাংসের কাবাব তুলে দেখাত।

আমি যখন জার্মেনীতে শিক্ষকতা করতে গিয়েছিলান তখন সেখানকার দিনকাল খুব শোচনীয়।

আমার দুটি ছাত্র ক্রিৎজ্ ও ক্রলিন শ্নি-র কথা মনে পড়ে। জলের নালায় ডুবে তারা মারা গিয়েছিল।

ফ্রাউ লিংনারকেও মনে পড়ে। সে ছিল আমাদের স্কুলের সেক্রেটারী। সুন্দর কালো চুল, চৌকো কটি, আর শক্ত পা।

মনে পড়ে পেতিৎ জঁ, টম বেইলি, তিলি, ফ্রাউ গ্রোৎস্ ও ইংরেজির প্রধান অধ্যাপক স্মিস্-এর কথা; তার ছিল পর্তুগীজ পাসপোর্ট; সে 'th' উচ্চারণ করতে পারত না। তাদের কথা মনে হলে ভাল লাগে।

টপ কোটটার কথাও মনে পড়ে।

মনে হলেই ভয় করে।

সেই বিষন্ন জার্মান শহরটিতে যেদিন প্রথম গিয়েছিলাম সেদিন ফ্রাউ লিংনারই আমাকে স্টেশন থেকে নিয়ে এসেছিল।

বলেছিল, "হের ব্র্যাওন?"

"হ্যাঁ।"

"হের হালাম ব্র্যাণ্ডন ?"

"ঠিক।"

কর-মর্দন করে আমাকে নিয়ে একটা বুফে-তে গিয়ে কফি দিতে বলল।

"ইংলণ্ড থেকে বেশ ভালভাবেই এসেছো তো ?" সে বলল।

"হ্যাঁ।"

তার বিবর্ণ সবুজ চোখের উপর একটা বিষন্নতার ছায়া পড়ল। ধীরে ধীরে মাথাটা নেড়ে একটু হাসল।

বলল, "আমাদের স্কুল আপনার ভাল লাগবে না হের ব্র্যাণ্ডন।"

"আচ্ছা ?"

"এখানে কেউ বেশীদিন থাকে না।"

"কেন ?"

সে আবার হাসল।

বলল কফিটা খেয়ে আমার সঙ্গে চলুন।"

পাথুরে রাস্তায় তার পিছন-পিছন হাঁটতে লাগলাম। লোহার বারান্দা থেকে মাদুর ঝুলছে। হেমন্তকালীন শিকারীর দল কামারশালের বাইরে ঘোরাঘুরি করছে। টাটকা "সেমেল্‌ন্‌" ফুলের গন্ধে বাতাস ভারী।

একটা জীর্ণ বাড়ির সামনে থেকে ফ্রাউ লিৎনার দেয়ালের পিতলের নাম-ফলকটা আমাকে দেখাল।

তাতে লেখা :

"ক্রেৎস্‌মার-এর বিদেশী ভাষা শিক্ষার প্রাইভেট অ্যাকাডেমি।"

মুখ ফিরিয়ে সে আমার দিকে তাকাল। ম্লান সবুজ চোখে হঠাৎ আলোর ঝলকানি।

"এই পথে আসুন," বলে স্যাঁৎসেতে উঠোন পেরিয়ে, দু'ধাপ নীচু সিঁড়ি বেয়ে একটা চওড়া বারান্দা ধরে এগিয়ে আমাকে নিয়ে সে ছোট হল-ঘরটার দিকে চলল।

একেবারে শেষ প্রান্তে দুই পাল্লার কাঁচের দরজা।

তার পিছনেই ক্রেৎস্‌মার-এর প্রাইভেট অ্যাকাডেমি।

ফ্রাউ লিৎনারের সঙ্গে ভিতরে ঢুকলাম।

একটা সরু বারান্দার শেষ প্রান্তের দরজাটা দেখিয়ে সে বলল, "ওটাই স্টাফ-রুম।"

সে আমার কাঁধের উপর হাতটা রাখল। মুখ ফিরিয়ে তার ম্লান সবুজ চোখের দিকে তাকালাম। সে চোখে পলক পড়ছে না। তার আঙুলগুলো আমার বাহুর উপর ক্রমেই চেপে বসছে। তার শক্ত হাঁটুটা আমার পায়ের গুলির উপর চাপ দিচ্ছে।

একটা অজ্ঞাতপূর্ণ শক্তি আমার শরীরের ভিতর দিয়ে বয়ে গেল। আমি অসহায়ভাবে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। মুহূর্তকাল পরেই সে শক্তি উধাও হয়ে গেল।

সে ধীরে ধীরে বলল, "হের ব্র্যাগুন, এখানে আপনার ভাল লাগবে না।"

হঠাৎ মুখটা ঘুরিয়ে সে সশব্দে সেখান থেকে চলে গেল। একবার ফিরেও তাকাল না।

একটা সিগারেট ধরালাম, ধীর পায়ে বারান্দা দিয়ে হেঁটে গেলাম, তার পর স্টাফ-রুমের দরজাটা হাত দিয়ে ঠেলে খুলে ফেললাম।

টম বেইলি মুখ তুলে তাকাল। পেতিৎজাঁ টেবিলের উপর পা তুলে দিয়ে মুখ-ভর্তি মাখন ও লংকা নিয়ে আধগ্লাস বীয়ার তুলে ধরে মাথাটা নাড়ল। কাৎজ্ চোখ ঘোরাল, আর ফ্রাউ গ্রোৎস্ এককোণে বসে নাক ডাকাতে লাগল।

জানালা দিয়ে একঝলক বাতাস ঘরে ঢুকল।

টেবিল থেকে লংকাগুলো উড়ে গেল। দরজাটা সশব্দে বন্ধ হয়ে গেল।

লাল্চে টুইডের কোটটা মেঝেতে পড়ে গেল।

সেটা তুলতে আমি মাথাটা নোয়ালাম।

"খ্রীস্টের দোহাই, ওটাতে হাত দেবেন না!"

তীক্ষ্ণ চীৎকার। ভয়ার্ত। আমার গায়ে কাঁটা দিল।

ঘুরে দাঁড়ালাম।

টম বেইলির মুখ সাদা। পেতিৎজাঁর হাঁ-করা ঠোঁট ঝুলে পড়েছে। কাৎজ্-এর হাত কাঁপছে। ফ্রাউ গ্রোৎস নিজের চেয়ারে খাড়া হয়ে বসে আছে।

"ও কোটটাতে কোনদিন হাত দেবেন না," টম বেইলি বলল, তার গলা আতংকে কাঁপছে।

সকলের মুখের দিকে তাকালাম। সকলেরই চোখে ভয়ের ছাপ।

টম বেইলি শক্ত গলায় বলল, "কখনও না, কদাপি না।"

দরজাটা খুলে গেল। ফ্রাউ লিৎনার ঘরে ঢুকল। আমার নতুন সহকর্মীদের মুখের দিকে তাকাল। আমার দিকে তাকাল। কোটটার দিকে চোখ ফেরাল। তারপর হাসতে লাগল।

কেমন যেন বাঁকা হাসি; বিষণ্ণতা ও তিক্ততায় ভরা।

হেসেই চলল।

তারপর উপুড় হয়ে কোটটা তুলে নিয়ে আবার সেই আঁচড়-লাগা পিতলের হুকে ঝুলিয়ে রাখল।

বলল, "এই যে আপনারা সকলেই আছেন দেখছি।"

"আচ্ছা টম, তুমিই বল তো এই ব্লাডি কোটটা কার?"

টম বেইলি পেতিৎজাঁর দিকে তাকাল। ফরাসী ভদ্রলোকটি কাঁধ ঝাঁকাল। তার কাস্তের মত কালো গোঁফে বীয়ার লেগে চকচক করছে।

আমি বললাম, "দেখ, আজ দু'মাস হল আমি এখানে এসেছি, যখনই কোটটার কথা বলি, কোটটার দিকে তাকাই, ওই ব্লাডি কোটটার কাছাকাছি যাই, তখনই তোমরা সকলে ভয়ে আঁৎকে ওঠ।"

সরাইখানার পিছনের ঘরটাতে আমরা বসেছিলাম।

শীতকাল। আবহাওয়া বেশ খারাপ। বরফে চাপা পড়ে অরণ্যভূমি আর্তনাদ করছে। মাসের শেষ। আমাদেরও পকেট গড়ের মাঠ।

পেট-মোটা স্টোভটা খাই-খাই করে জ্বলছে।

আমাদের পেটের অবস্থাও তথৈবচ। গত তিনদিন একটাও গরম খাবার আমাদের কপালে জোটে নি। আরও দুটো দিন না গেলে জুটবেও না।

আমি বললাম, "তারপর? কোটের ব্যাপারটা কে আমাকে বলবে?"

তিলি দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

বলল, "ঠিক আছে। বলছি। কোটটা ছিল মর্গানের।"

"মর্গান?"

"তিন বছর আগে সে এখানে শিক্ষক ছিল। আমরা কেউই—"

"আমি চাই না যে তুমি সে-কথা বল," টম বেইলি বাধা দিল; তার মুখে-উদ্বেগ, আঙুলগুলি উত্তেজিত।

"বলে যাও তিলি," আমি কড়া গলায় বললাম।

তিলি পেতিৎজাঁর দিকে তাকাল; সে ঘাড় নাড়ল।

তিলি বলতে শুরু করল: "আমরা কেউ তাকে চিনতাম না। আমাদের আগে থেকেই সে এখানে ছিল। অবশ্য কাৎজ্‌ তাকে চিনত। লোকটি চুপচাপ থাকত, বড় একটা কথাবার্তা বলত না। প্রায় সময়ই মদে বুঁদ হয়ে থাকত। সকলের সামনে মদ খেত না। লুকিয়ে খেত।

"একটা অবাক কাণ্ড—সে কখনও তার টপ কোটটা গা থেকে খুলত না। গ্রীষ্মকালেও সেটা গায়ে দিয়ে থাকত। এমন কি পড়াবার সময়ও। কাৎজ্‌ বলে, কোটের পকেটে সে একটা রূপোর ফ্লাস্ক রাখত। যখনই বুঝত যে কেউ তাকে দেখছে না তখনই ফ্লাস্ক থেকে মদ খেত। কাৎজ্‌ বলে, মদটার রং দুধ-সবুজ। সেরকম মদ সে আর কোথাও দেখে নি।"

তিলি থামল। বীয়ারের শেষ ফোঁটাটাও গলায় ঢালল।

"তারপর?" আমি শুধালাম।

"একদিন রাতে—বছরের ঠিক এই সময়টাতেই—সে সত্যি মাতাল হয়ে পড়ল। ফ্রাউ লিৎনার তাকে সামাল দিতে চেষ্টা করল। কিন্তু সে ঘরময় দাপিয়ে বেড়াতে লাগল। একসময় ফ্রাউ লিৎনারের গালে চড় কসিয়ে ঝড়ের বেগে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

"তিন দিন কেউ তার টিকিটিও দেখতে পেল না।

"তারপর তাকে পাওয়া গেল।

"জঙ্গলে একটা নালার মধ্যে পড়েছিল।

"উলঙ্গ দেহ।

"এ-কান থেকে ও-কান পর্যন্ত তার গলাটা কাটা।"

টম বেইলি কাঁপতে শুরু করল।

তিলি নতুন করে বীয়াবে চুমুক দিল।

"চারদিন পরে একটা পার্সেল এল স্কুলে। ফ্রাউ লিংনারই সেটা খুলল। তার ভিতরে ছিল টপ কোটটা। ফ্রাউ লিংনার কিছুই বলল না, স্টাফ-রুমের দরজার পিছনে কোটটা সে ঝুলিয়ে রেখে বেরিয়ে গেল।

"তারপর এখানে ছিল বীস্ নামক একজন ওয়েল্‌শ্ শিক্ষক। সেও ছিল আমাদের মতই হাভাতে। সেও সবসময় চুপচাপ থাকত। একদিন রাতে সে কোটটা নিল।

"তাকেও আর কোনদিন দেখা গেল না। চারদিন পরে কোটটা ফেরৎ এল। ফ্রাউ লিংনার সেটাকে দরজায় ঝুলিয়ে রাখল।

"তারপর গত বছর বল্ড্‌ইনের বেলাতেও সেই একই ঘটনা ঘটল।"

টম বেইলি বলল, "তখন তো আমরা সকলেই এখানে ছিলাম। কাৎজ্ যখন তাকে কোটটা নিতে বারণ করল তখন আমরা তা নিয়ে মোটেই মাথা ঘামাই নি।

"তার কথা শুনে আমরা তো হেসেই খুন," তিলি বলল।

টম বেইলি বলল, "বল্ড্‌ইনও হেসেছিল। একদিন রাতে কোটটা নিয়ে বলল, মদের দোকান থেকে একটু ঘুরে আসতে।"

তিলি শান্ত গলায় বলল, "তাকে আর কোনদিন দেখা গেল না। চার-দিন পরে কোটটা ফেরৎ এল।"

"ভয়ংকর। অতি ভয়ংকর," টম বেইলি বলল।

স্টোভটা গর্জন করে উঠল।

তার সামনে শুটকো কালো বিড়ালটা নড়েচড়ে বসল। তার লেজের ডগায় কয়েকটা লাল্‌চে ফুটকি।

টেবিলের উপর আমার বীয়ারের গ্লাসটা ছিল। কিন্তু তাতে আর চুমুক দেওয়া হল না। গ্লাসের গায়ে জমে-ওঠা বাষ্পের উপর আঙুল বুলোতে লাগলাম।

"এইজন্যই তোমরা কেউ এটাকে ছোঁও না?" আমি বললাম।

টম বেইলি ও তিলি মাথা নাড়ল।

"কিন্তু ফ্রাউ লিংনার? সে কেন এটাতে হাত দিতে পারে?"

চুপ।

তিলি ও টম বেইলির চোখ আমার উপর থেকে সরে গেল। পেতিৎজাঁ আস্তে আস্তে তিলির বুকে টোকা দিতে লাগল।

আমি হেসে উঠলাম।

বললাম, "তুমি আমাকে ভড়কি দিচ্ছ।"

"না," তিলি বলল। "না।" পেতিৎজাঁর কাছ থেকে সরে এসে সে আমার দুই হাত চেপে ধরল।

"আমি সত্যি কথাই বলেছি। আমাকে কথা দাও, তুমি কখনও ঐ কোটটা ছোঁবে না।"

বীয়ারের গ্লাসে আমার তর্জনীর ডগাটা ডুবিয়ে দিলাম।

আমার হাতদুটি জোরে চেপে ধরে সে বলল, "কথা দাও, আমাকে কথা দাও।"

'ঠিক আছে," আমি বললাম।

এক ঘণ্টা পরে তিলি পেতিৎজাঁর সঙ্গে সরাইখানা থেকে বেরিয়ে গেল। যাবার আগে আস্তে আমার কপালে চুমো খেল।

টম বেইলি ফ্রিৎজকে ডাকল। ফ্রিৎজ্ ও ফ্রলিন শ্লি ঘরের এক কোণে চুপচাপ বসে ছিল। ফ্রিৎজকে দিয়ে আর এক গ্লাস "স্ন্যাপ" (মদ) আনিয়ে একচুমুকে সেটা শেষ করে টম বেইলি রাতের অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

আমি সোজা দাঁড়িয়ে তাদের দুজনের দিকে এগিয়ে যেতে টেবিলের সঙ্গে ধাক্কা খেলাম।

ফ্রিৎজ্ লাফ দিয়ে উঠে একটা চেয়ার এনে সসম্ভ্রমে আমাকে বসিয়ে দিল।

বললাম, "আরও স্ন্যাপ নিয়ে এস।"

"নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই," সে বলল।

ইল্জে স্ন্যাপ ও বীয়ার নিয়ে এল।

সব পেটে ঢাললাম।

ইল্জে আরও স্ন্যাপ, আরও বীয়ার এনে দিল।

ফ্রিৎজ্ চোখ থেকে চশমা খুলে জ্যাকেটের আস্তিনে সজোরে কাঁচটা ঘসতে লাগল।

বলল, "হের ব্রাওন, আপনাকে কিছু বলতে চাই।"

"চটপট বলে ফেল," আমি বললাম।

ফ্রিৎজ্ চোখ মিটমিট করল। তাকাল। জিভ চাটল। তারপর বলল: "আজ রাতে ফ্রাউলিন শ্লি ও আমি বাবার কাছ থেকে পালিয়ে যাব।"

থুত্নিটা বুকের কাছে নামিয়ে তাদের দিকে তাকালাম। কোন কথাই বললাম না।

স্ক্রিৎজ্ গলা খাঁকারি দিয়ে মোটা ফ্রাউলিনের হাতটা ধরল। আমার দিকে তাকাল। চোখ-ভরা মিনতি।

"দেখুন," সে বলল। "দেখুন—"

আমার মুখে মৃদু হাসি দেখা দিল। টেবিল থেকে উঠে দাঁড়ালাম।

বাইরে নির্মম ঠাণ্ডা।

হাড় কস্কন্ করতে লাগল।

স্ন্যাপের ধোঁয়া তাড়াবার জন্ম মাথাটা নাড়তে লাগলাম। মুহূর্তের জন্ম বমির ভাব দেখা দিল। মাথাটা ঘুরে যেতেই দেয়ালে ভর দিয়ে দাঁড়ালাম।

আর তখনই সেটা চোখে পড়ল।



স্কুলের জানালায় একটা আলো। সেই আলোয় একটি নারীমূর্তি। মাত্র কয়েক সেকেণ্ডের জন্ম সেই ছায়ামূর্তি দেখতে পেলাম। তারপরেই অদৃশ্য হয়ে গেল।

মুহূর্তের মধ্যে আমার মাথা খুলে গেল।

তাড়াতাড়ি রাস্তা পার হয়ে, উঠোন পেরিয়ে, দুই ধাপ সিঁড়ি বেয়ে স্কুলের কাঁচের দরজাটা সপাটে খুলে ফেললাম।

অন্ধকার। নীরবতা।

চীৎকার করলাম। "হলো। ওখানে কে আছ?"

কোন উত্তর নেই।

চারদিকে তাকালাম। স্টাফ-রুমের দরজার নীচ দিয়ে একফালি আলো এসে পড়েছে।

আমার বুকের ভিতরটা টিপ্ টিপ্ করতে লাগল। সাবধানে বারান্দা ধরে এগোলাম। দরজার বাইরে থামলাম। তারপর সহসা দরজায় কাঁধ

লাগিয়ে সেটাকে খুলে ফেললাম।

আমার সামনেই মেঝেতে পড়ে আছে লাল্‌চে টপ কোটটা।

ভিতরে ঢুকতেই চোখে পড়ল, আমার পিছনের দরজায় ঝুলছে ফ্রাউ লিৎনারের টাইরোলীয় টুপি ও স্কার্ট।

আর্তনাদ করে ডাকলাম, "ফ্রাউ লিৎনার! ফ্রাউ লিৎনার।"

কোন উত্তর নেই।

দীর্ঘ, ধীরগতি নৈঃশব্দ্য।

ফ্রাউ লিৎনারের নাম ধরে ডাকতে ডাকতে স্টাফ-রুম থেকে ছুটে বেরিয়ে গেলাম।

ভয়ে পাগলের মত ক্লাস-ঘর, স্নান-ঘর, ছোট আপিস-ঘর, গুদাম-ঘর, রান্নাঘর—সব একে একে খুঁজলাম।

আবার চীৎকার করে ডাকলাম, "ফ্রাউ লিৎনার! ফ্রাউ লিৎনার!"

কোন উত্তর নেই।

জীবনের চিহ্নমাত্র নেই।

তারপরেই মনে হল, কে যেন খুব ধীরে, খুব আস্তে আমার বাহুর উপরে, আমার পায়ের গুলির উপরে চাপ দিচ্ছে

মাত্র দু'মাস আগে যে শক্তি আমাকে ভর করেছিল আবার তাকে ফিরে পেলাম।

তার বিরুদ্ধে লড়াই করলাম। মাথার মধ্যে আমার কণ্ঠস্বর বাজতে লাগল। শরীরের মাংসপেশীগুলি সংকুচিত হতে লাগল। প্রতিটি স্নায়ু আর্তনাদ করছে।

সব বৃথা।

আবার স্টাফ-রুমে ফিরে গেলাম।

লাল্‌চে টপকোটটার উপর ঝুঁকলাম।

সেটাকে তুলে নিয়ে গালের উপর ঘসতে লাগলাম।

ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলাম, "ফ্রাউ লিৎনার···ফ্রাউ লিৎনার।"

আমার ভিতরকার শক্তি আরও বেড়ে গেল। আমাকে অভিভূত করে ফেলল।

ছুটে পথে নামলাম।

টপকোটটা আমার গায়ে।

সেটাকে ছিঁড়ে ফেলতে চেষ্টা করলাম।

বৃথা চেষ্টা।

একটা অজ্ঞাত শক্তি আমার শিরা-উপশিরার ভিতর দিয়ে দাপাদাপি করছে, কপালের ভিতর হাতুড়ি পিটছে, মাথার মধ্যে ভয়ার্ত কণ্ঠস্বরের গলা টিপে ধরছে, একটা কাঁপা দুধ-সবুজ আভা দিয়ে চারদিকের আলোকে ঢেকে

দিচ্ছে: তার বিরুদ্ধে আমি একেবারেই অসহায়।

সে-শক্তি ক্রমেই জোরদার হচ্ছে। সে আমার মাথাটা ঘুরিয়ে দিল, আমাকে বাধ্য করল স্টাফ-রুমের আলোকিত জানালার দিকে তাকাতে।

সেখানে আবার সেই নারীমূর্তির রেখাচিত্র।

"ক্রাউ লিৎনার," আমি হাঁক দিলাম।

কোন শব্দ এল না। একটি কথাও না।

শহরের ভিতর দিয়ে হাঁটতে লাগলাম।

শেষ ট্রামটা পাথুরে রাস্তা ধরে ডিপোতে ফিরে গেল।

মিউনিসিপ্যাল গণিকালয়ের সুন্দরীরা বিমর্ষ মুখে চুপচাপ জানালায় বসে আছে।

জনৈক পুরোহিত বমি করছে।

ক্রমে শহরের যে অঞ্চলে পৌঁছে গেলাম সেটা আমার কাছে অপরিচিত।

তবু হাঁটতে লাগলাম। বাগানওয়ালা বড় বড় বাড়ি পার হয়ে গেলাম। কানে আসছে কেবল আমারই পায়ের শব্দ।

একটা ছোট পার্কে পৌঁছলাম। অসংকোচে ফটক পেরিয়ে চাঁদের আলোয় উদ্ভাসিত ছোটদের দোলনা ও টেনিস কোর্টের কুয়াশার ভিতর দিয়ে পা চালিয়ে দিলাম।

উঁচু লরেল গাছের বেড়ার ভিতরে একটা ফাঁকা জায়গা পেয়ে নির্ভুলভাবে সেটার ভিতর দিয়ে গলে গেলাম।

বাগানের মধ্যে পৌঁছে গেলাম। বহির্বাটিটা যেন অন্ধকারে ওৎ পেতে আছে। ঘাসগুলো এলোমেলো বেড়ে উঠেছে। সূর্য-ঘড়িটার উপর একটা কালো পাখি ঠাণ্ডায় মরে পড়ে আছে।

আমারও কাঁপুনি ধরল।

এক উন্মাদ মুহূর্তে মনে হল, এবার টপ কোটটা খুলে ফেলতে পারব।

বোতামগুলো ছিঁড়ে ফেললাম। আস্তিন ধরে টান দিলাম।

কিন্তু তখনই সেই শক্তিটা আবার আমার উপর ভর করল; আমাকে বাড়িটার পাশ দিয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে গেল। পাথরের নুড়ির উপর আমার পায়ের শব্দ। সামনের পোর্টিকোতে পৌঁছে গেলাম। কালো ওক কাঠের দরজার পাশে ঘণ্টাটা ঝুলছে। সেটাকে নেড়ে দিলাম।

সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে গেল। ভিতরে পা দিলাম।

সবকিছু বিষণ্ণতায় মোড়া যেন।

সাদা চাদরে ঢাকা আসবাবপত্র চোখে পড়ল। কাঁচের ঝাড়-লণ্ঠনের টুংটাং শব্দ কানে এল। নিঃশ্বাসে ধুলোর গন্ধ। সামনে চওড়া শ্বেতপাথরের সিঁড়ি।

"এদিকে, মেইন হের।"

লোকটি আমার ডান দিকে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছে।

মনে হল, কণ্ঠস্বরটা চিনতে পেরেছি। ইতস্তত করলাম।

"দয়া করে এদিকে চলুন।"

আসবাবপত্রের স্তূপের ভিতর দিয়ে লোকটি এগিয়ে গেল। তাকে অনুসরণ করলাম।

মূর্তিকে চিনতে পারলাম।

কাৎজ্।

বললাম, "কাৎজ্! তুমি এখানে কি করছ?"

সে মুখ ফেরাল না। শ্বেতপাথরের সিঁড়িটা পর্যন্ত তাকে অনুসরণ করলাম। আয়না ও ক্লিমৃট্-এর ছবি ঝোলানো চাতাল ধরে সে আমাকে নিয়ে চলল।

একটা দরজা খুলে মাথা নোয়াল।

বলল, "ভিতরে যান মেইন হের।"

থামলাম। বললাম, "খ্রীস্টের দোহাই, এসব কি হচ্ছে কাৎজ্?"

ঘরের ভিতর থেকে কে যেন ডাকল।

"দয়া করে ভিতরে আসুন।"

ফ্রাউ লিৎনারের গলা।

আবার আহ্বান।

"এখানে এলে আপনার ভাল লাগবে। সবকিছু দেখেই আপনি সন্তুষ্ট হবেন হের মর্গান।"

ভিতরে ঢুকলাম। সে আমার জন্য অপেক্ষাই করছিল।

একটা উজ্জ্বল আলোক-ক্ষেত্র ছাড়া সবই অন্ধকারে ঢাকা। সেই আলোক-রশ্মিটা তার উপরেই পড়েছে।

ফ্রাউ লিৎনার। কিন্তু এ ফ্রাউ লিৎনারকে তো আমি আগে কখনও দেখি নি।

ট্রায়োলীয় টুপি নেই, চৌকো স্কার্ট নেই, মোটা জাম্পার নেই, পুরু পশমী মোজা নেই।

খোলা কাঁধের উপর কালো চুলের রাশি এলোমেলোভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। নীচু কাঠের লাল গাউন পরনে। দুই চোখে ঘন করে কাজল টানা। গালে পাউডার। ঠোঁট চকচকে।

সে কয়েক পা এগিয়ে এল। আমার কোমর জড়িয়ে ধরে ঠোঁটের উপর লম্বা চুমো খেল।

একটা বরফের বর্শা যেন বিঁধল আমার পেটের মধ্যে। বরফের শলা বিঁধল গলার উপরকার চুলের গোড়ায়।

ফ্রাউ লিৎনার বলল, "স্বাগতঃ হের মর্গান।"

আর্তনাদ করতে মুখ খুললাম, কিন্তু কোন শব্দ বের হল না।

আর পরক্ষণেই ঘরটা আলোয় ভরে গেল।

বরফ-সাদা দেয়াল। বরফ-সাদা মেঝে। কয়লা-কালো চেয়ারের সারি।

পাকানো চামরার দড়ি দিয়ে প্রতিটি চেয়ারের সঙ্গে বেঁধে রাখা হয়েছে আমার শহরের বন্ধু ও সহকর্মীদের—টম বেইলি, তিলি, অধ্যাপক স্মিস, ফ্রাউ গ্রোৎস্, অ্যাকাডেমির ডিরেক্টর, সকলকেই। আতংকে তাদের মুখগুলি সাদা হযে গেছে, চোখের পাতাগুলি জমে গেছে; একটা পলকও পড়ছে না। সূর্য-ঘড়ির উপর মরে পড়ে থাকা কালো পাখিটার কথা মনে পড়ল।

ফ্রাউ লিংনার আমার শরীরটাকে চেপে দাঁড়াল। ফিস্‌ফিসিয়ে বলল, "আপনি কাঁপছেন হের মর্গান।"

তারপর মৃদু হেসে সে আমার টপ কোটের ডানদিকের পকেটে হাত ঢুকিয়ে দিল। একটা রূপোর ফ্লাস্ক বের করে ছিপিটা খুলে ফ্লাস্কটা আমার ঠোঁটে চেপে ধরল।

বলল, "একটু পান করুন হের মর্গান।"

দুধ-সবুজ তরল পদার্থ কিছুটা পান করলাম।

"আরও," সে বলল।

ফ্লাস্কটা শেষ করলাম।

হাত ধরে সে আমাকে ঘরের মাঝখানে নিয়ে গেল। মনে হল, আমি যেম ভেসে চলেছি।

একটা ব্রোকেড-ঢাকা ডিভানে সে আমাকে শুইয়ে দিল। একটা সুগন্ধি আরাম যেন আমাকে ঘুম পাড়িয়ে দিচ্ছে।

আমার পাশে নতজানু হযে সে বসে পড়ল।

গালের উপর তার নিঃশ্বাস পড়ছে। গলার উপর ছড়িয়ে পড়েছে তার দীর্ঘ কালো চুল। তার দেহের স্পর্শে উত্তপ্ত আমার দেহ।

সে বলল, "চোখ বুজুন হের মর্গান।"

আমার চোখ বুজে গেল। তার কাজে বাধা দেবার শক্তি আমার নেই।

সে ফিস্‌ফিস্ করে বলল, "ভাল করে তাকান হের মর্গান।"

মুদ্রিত পাতার নীচ থেকে চোখ খুলতে চেষ্টা করলাম।

অন্ধকার! তমিস্রা। ক্ষত-বিক্ষত।

"আরও, আরও জোরে তাকান হের মর্গান।"

দুই কানে এল বজ্রের গর্জন। বুকের ভিতরটা ধ্বক্ করে উঠল। সবগুলি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কুঁকড়ে যেতে লাগল; শেষ পর্যন্ত দেখা দিল দীর্ঘস্থায়ী আক্ষেপ।

আর তারপরেই মুদ্রিত আঁখি-পল্লবের নীচে ভেসে উঠতে লাগল একটার পর একটা ছবি।

ছবিগুলি স্পষ্ট, তীক্ষ্ণ, কিন্তু চারদিকটা দুধ-সবুজ আলোয় অস্পষ্ট।

একটা চিলে-কোঠা। মাঝখানে একটা বিছানা। তাব উপর শুযে আছে একটি লোক লাল্‌চে টুইডের টপ কোট গাযে। লোকটি চওডা, মোটাসোটা, পাতলা কালো চুল, নাকের উপর একটা এবডো-খেবডো সাদা ক্ষত-চিহ্ন।

চিলে-কোঠার দরজাটা খুলে গেল। ফ্রাউ লিৎনার ভিতবে ঢুকল। মাথাব টাইবোলীয টুপিটা খুলে ফেলল, কালো চুল চারদিকে ছডিযে পডল।



মুহূর্তেব জন্য সব অন্ধকাব হযে গেল। তারপর আব একটা ছবি।

বনের গভীরে একটা পথ দেখতে পেলাম। পাইনেব ডালপালা পডে পাযের নীচটা দুলছে। পথের শেষে একটা খোলা জাযগা। নানা গাছেব চন্দ্রাতপ ভেদ করে দুধ-সবুজ রোদ এসে পডেছে সেখানে। মাঝখানে বিছানো রযেছে লাল্‌চে টুইডেব একটা টপকোট। তার উপর শুযে আছে সেই মোটা-সোটা লোকটি আর ফ্রাউ লিৎনাব। তারা পরস্পরকে আদব কবছে, চুমো খাচ্ছে।

অন্ধকার। আর একটা ছবি।

ফুল-আঁকা দেযাল-কাগজে ঢাকা একটা ঘব। বসন্তকালেব ফুলে সাজানো ফুলদানি, বাতাসে পর্দা উডছে, ড্রেসিং-টেবিলে কাঠের পুতুল সাজানো।

দরজা খুলে গেল। লাল্‌চে টুইডের টপকোট পবা মোটাসোটা লোকটি ঘরে ঢুকল। কোটটা খুলে ফেলল। তারপবেই দুধ-সবুজ আলো এসে আমার দৃষ্টিশক্তিকে আচ্ছন্ন করে ফেলল। শুধু শুনতে পেলাম ফুঁপিযে কান্না, ধীর আর্তনাদ ও দীর্ঘশ্বাস এবং একটি দীর্ঘাযত মর্মভেদী চীৎকাব।

অন্ধকার।

এবারকার ছবিটা ঝল্‌মল্‌ করছে।

দেখলাম ঝোলানো কার্ণিশওয়ালা উঁচু বাতির একটা শোবার ঘর। কানে এল করাত চালাবার ঘস্‌-ঘস্‌ শব্দ। বিছানায় উলঙ্গ হয়ে শুয়ে আছে মোটা-সোটা চওড়া লোকটি আর ক্লাউ লিংনার। সে পুরুষটিকে পা দিয়ে চেপে ধরেছে। তার চওড়া পিঠটা পুরুষটির বিকৃত, ঘর্মাক্ত মুখের দিকে ফেরানো।

ক্লাউ লিংনারের হাতে একটা লম্বা সরু, বাঁকানো ছুরি।

দরজাটা খুলে গেল।

ঘরে ঢুকল ক্রিংজ্‌ ও মোটা ক্রলিন শ্নি।

ক্লাউ লিংনার তাদের দেখেই চীৎকার করে উঠল। চীৎকার আর চীৎকার।

তার হাতটা সজোরে আমার গালে আঘাত করল। চোখ মেলে তাকালাম।

ঘরটা আবার অন্ধকার হয়ে গেল; শুধু সেই আলোর রশ্মিটা পড়েছে ডিভানের উপর। আমি সেখানেই শুয়ে আছি।

ক্লাউ লিংনারের জিভটা আমার কানের কানাটা খুঁজছে।

তার হাত দুটি চেপে বসেছে আমার উরুতে।

সে বলে উঠল, "হের মর্গান, এবার চোখ মেলার সময় হয়েছে।"

আমার গলার নীচে হাত রেখে সে আমার মাথাটাকে তুলে ধরল।

আমার সামনে মেলে ধরল একটা হাত-আয়না।

বলল, "তাকান।"

আয়নায় তাকালাম।

যা দেখলাম সেটা তো আমার মুখ নয়।

যে মুখটা দেখলাম সেটা যার তার চেহারা চওড়া ও মোটাসোটা, মাথায় পাতলা কালো চুল, নাকের উপর সাদা কাটা-দাগ।

আর তার এ-কান থেকে ও-কান পর্যন্ত গলা থেকে একটা রক্তের ধারা নেমে বুকের উপর গড়িয়ে পড়ছে।

চীৎকার করে উঠলাম।

তীক্ষ্ণ, দীর্ঘায়ত চীৎকার।

আর এবার সে শব্দটা প্রবল বেগে বেরিয়ে এল আমারই বুকের গভীর থেকে।

ঠিক ভোরের পরেই পুলিশ এল আমার ঘরে। বাইরে নিয়ে তাদের গাড়িতে চড়াল। জঙ্গলের মধ্যে নিয়ে গেল। তারপর একটা নালার ধারে। তার উপর একটা প্লাস্টিকের আচ্ছাদন। তারা প্লাস্টিকটা সরিয়ে নিল। নালার মধ্যে দুটো মৃতদেহ।

"এবার ?"

আমি মাথা নাড়লাম।

বললাম, "হ্যাঁ। এরা আমার ছাত্র,ক্রিৎজ ও ফ্লিন শ্মি।"

আমার হাতে কাঁপুনি ধরল।

চলতেও পারছি না।

ক্রিৎজের মৃতদেহ থেকে চোখ সরাতে পারলাম না।

লাল্‌চে টুইডের টপ কোট দিয়ে সেটা জড়ানো।

চারদিন পরে স্কুল ছেড়ে চলে এলাম।

ফ্রাউ লিৎনার আমাকে স্টেশনে পৌঁছে দিল।

ট্রেনটা প্ল্যাটফর্মে এসে দাঁড়ালে সে আমার হাতটা ধরে সজোরে চাপ দিল।

বলল, "বিদায় হের ব্র্যাণ্ডন।"

তারপর আমার কোমর জড়িয়ে ধরে ঠোঁটে দীর্ঘ, আবেগ-তীব্র চুমো খেল।

অস্পষ্ট স্বরে বলল, "আমার দুঃখ যে আপনি এখানে থাকলেন না। দুজনে মিলে আমরা অনেককিছু করতে পারতাম।"

গাড়ির জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে তার হাতটা ধরলাম।

তার দুটি পা ঘিরে ট্রেনের বাষ্প ছড়িয়ে পড়ল।

বাঁশি বাজল।

সে উপুড় হয়ে তার ক্যানভাসের থলে থেকে কি যেন বের করল।

বলল, "আপনার জন্য।" ট্রেন ছেড়ে দিল। সে একটি চুমো ছুঁড়ে দিল।

ট্রেনটা ছেড়ে বাঁক না নেওয়া পর্যন্ত তারদিকে তাকিয়ে রইলাম।

কিছুক্ষণ সে নড়ল না।

তারপর দ্রুত হাতে টাইরোলীয় টুপিটা খুলে ফেলল, শীতের হাওয়ায় তার উজ্জ্বল, রেশমী, কালো চুল উড়তে লাগল।

ট্রেনের গতি বাড়ল।

বনটা দ্রুত পিছিয়ে গেল।

ফ্রাউ লিৎনার তার থলে থেকে বের করে যে মোটা পার্সেলটা আমাকে দিয়েছিল সেটার দিকে তাকালাম।

তারপর যথাসাধ্য জোরে সেটাকে জানালা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিলাম।

The Top Coat—Peter Tiunis Wood

পদধ্বনি

সিঙাপুরে একটি চীনা মেয়ের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল। বললাম বটে মেয়ে, তার সঙ্গে যখন আমার পরিচয় হয় তখন তার বয়স ত্রিশ বছর; কিন্তু সে দেখতে এতই ছোটখাট ছিল আর তার গায়ের চামড়া ছিল এতই মসৃণ যে তাকে খুবই অল্পবয়সী মেয়ে বলে মনে হত।

কি করে তার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল সেটা বড় কথা নয়। তার নাম কোয়ান আন। বেশ সম্পন্ন পরিবারের মেয়ে; তার মা ছিলেন সে সময়কার বিখ্যাত সুন্দরী ও কবি। কোয়ান আন ও দুটি বুড়ো চাকরকে নিয়ে তিনি তখন বাস করতেন শহরের তাংলিন অঞ্চলে ছায়াঘেরা শান্ত রাজ-পথের উপরে একটি সেকেলে মস্তবড় কাঠের বাড়িতে। বাড়ির কাঠের কারুকার্যমণ্ডিত হলঘরটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, সামনের ফটক দিয়ে ঢুকেই হল ঘরের একদিকে ছিল পারিবারিক উপাসনা-বেদী; আর ছিল কাঠের প্যানেলের উপর চীনা ভাষায় সোনালী রং-এ খচিত নানা বাণী।

উপাসনা-বেদীর দু'পাশ দিয়ে দুই ধাপ সিঁড়ি উঠে গেছে। কোয়ান আনের বসবার ঘরটি ছিল দোতলায় খোলা বারান্দায়, ঠিক বাগানের উপরে। সেখানে যেতে আমরা সব সময় বাঁ-হাতি সিঁড়িটাই ব্যবহার করতাম। মনে পড়ে, একদিন আমি ডান-হাতি সিঁড়িটার দিকে এগিয়ে যেতেই সে আমাকে শান্তভাবে বলেছিল যে ও সিঁড়িটা এখন আর তারা ব্যবহার করে না। সেসময় কথাটাকে কোনরকম গুরুত্ব দেই নি, কিন্তু পরবর্তীকালে কথাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল।

কোয়ান আনের মা মিসেস লীর সঙ্গে আমার কখনও-সখনও দেখা হত, তিনি তার ঘরেই থাকতেন, নয়তো রান্না ঘরে বুড়ি আমার সঙ্গে কথাবার্তা বলতেন। তিনি খুব সুন্দরী ছিলেন; কথাও বলতেন কম।

একদা সন্ধ্যায়—বাদুরের ডানায় ভর করে যখন গোধূলি নেমে আসে—কোয়ান আনের ঘরে বসে আমরা কি নিয়ে যেন কথা বলছিলাম—সম্ভবত সাহিত্য নিয়ে, কারণ তাতেই ছিল তার বেশী আগ্রহ। চারদিক শান্ত, ঝিঁঝিঁ পোকা ডাকছে, ফ্রাঙ্গিপানি ফুল গন্ধ ছড়াচ্ছে। আর তখনই আমি স্পষ্ট শুনতে পেলাম সিঁড়িতে একটা ক্যাচ-ক্যাচ আওয়াজ হল; যেন কেউ সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে আসছে।

চেয়ারেই একটু পাশ ফিরলাম; ভাবলাম, কোয়ান আনের মা আসছেন আমাদের সঙ্গে যোগ দিতে। পায়ের শব্দ সিঁড়ির শেষ ধাপে পৌঁছে গেল; দরজাটা খোলার অপেক্ষায় রইলাম, কিন্তু সেরকম কিছুই ঘটল না। তখন বুঝতে পারলাম, যে সিঁড়িটা আমরা ব্যবহার করে থাকি তার পরিবর্তে পায়ের শব্দ হচ্ছে হল ঘরের অন্য দিকের সিঁড়িতে, অথচ সেদিক থেকে বসার ঘরে ঢুকবার কোন দরজাই নেই।

আমাকে বিস্মিত হতে দেখে কোয়ান আন বলল, "ও আমার দাদা।"

"তোমার দাদা? কিন্তু আমি তো জানতাম না—কখনও তার সঙ্গে দেখাও হয় নি।"

কিন্তু সে দাদাও আমাদের সঙ্গে যোগ দিল না।

"ও নিয়ে মাথা ঘামিও না। সে এখানে আসবে না।"

"কিন্তু তার সঙ্গে দেখা হলে আমি খুশি হতাম·"

কোয়ান আন ধীরে ধীরে মাথা নাড়তে লাগল।

"সে ছিল খুবই চালাক-চতুর। তার জীবনটা ছিল বড়ই দুঃখের; বিয়েটাই ছিল তার দুঃখের কারণ।"

তার কথায় অতীত কালের ব্যবহার শুনে সেই গ্রীষ্মের সন্ধ্যায়ও আমার শরীরটা শিউরে উঠল।

"তার মৃত্যুর পরে—তখন আমার বয়স ছিল মাত্র বারো বছর—প্রায়ই ওই সিঁড়িতে তার পায়ের শব্দ শুনতাম, ভাবতাম সে বুঝি ঘরে ঢুকবে। কিন্তু ঢুকত না। তাকে সুখী করতে সাধ্যমত সব কিছুই আমরা করেছি, কিন্তু কিছু লোক মৃত্যুর পরেও তাদের দুর্ভাগ্যকেই বয়ে বেড়ায়।"

সে হাসল। "চমকে উঠো না। গল্পটা খুবই সাধারণ। দুঃখেরও বটে।" গল্প বলার জন্য তৈরি হয়ে সে ভালভাবে বসল।

দাদা আমার চাইতে আট বছরের বড় ছিল; আমি তাকে ভালবাসতাম, তাকে নিয়ে গর্ব করতাম। কি জান, সে খুব ভাল ছাত্র ছিল, আইন পড়ছিল। আমাদের আশা ছিল, সে একদিন বিখ্যাত সফল লোক হবে।

স্কুল থেকে ফিরে সন্ধ্যায় এখানে বসে স্কুলের পড়া করতাম আর সিঁড়িতে দাদার পায়ের শব্দের জন্য উৎকর্ণ হয়ে থাকতাম: কখন সে ঝড়ের মত ঘরে ঢুকেই বলে উঠবে, "কেমন আছ গো ছোট বোনটি আমার? আজ রাতে সিনেমা দেখার কি হবে?" মনে পড়ে, একদল বন্ধুবান্ধব নিয়ে সে বাড়ি ফিরত, ওই লনে ব্যাডমিণ্টন খেলত, ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে গল্প করত; আমিও তাদের সঙ্গে থাকতাম। আমাকে নিয়ে বোটানিক্যাল গার্ডেনে বেড়াতে যেত; তারপর যখন তার গাড়ি হল তখন প্রতি রবিবার আমাকে নিয়ে সাগর-সৈকতে পিকনিক করতে যেত।

তারপর সে প্রেমে পড়ল। সেকথা মাকে জানাল না। কি জান, মেয়েটি মোটেই তার যোগ্য ছিল না; সে জানত, তাদের বিয়ে করতে দেওয়া হবে না। কেবল আমাকেই সে সব কথা বলত। মেয়েটির নাম ছিল মিংলী; একটা বার-এ কাজ করত, মদ পরিবেশন করত। কি করে

তাদের বিয়ে হবে ? শহরের দরিদ্র অঞ্চলে একটা ছোট ঘর নিয়ে আরও দুটি মেয়ের সঙ্গে সে থাকত। দাদাই আমাকে বলেছে, মায়ের নিষ্ঠুর ব্যবহারে অতিষ্ঠ হয়ে মাত্র চোদ্দ বছর বয়সে মেয়েটি বাড়ি ছেড়ে চলে এসেছে। আমি ঠিক জানি না। তবে আমার ধারণা, সে ধরনের জীবন চালাবার হয় তো অন্য কারণও ছিল। তাই ব্যাপারটা আমার কাছে খুব রোম্যান্টিক মনে হত। আর সে খুব সুন্দরীও ছিল।

কোন কোন সন্ধ্যায় দাদা আমাকে সমুদ্রতীরে নিয়ে যেত। সেখানে বেড়াতে বেড়াতে সেই মেয়েটি ও তার বান্ধবীদের সঙ্গে আমাদের দেখা হত ; সকলে একসঙ্গে বেড়াতাম। দাদা ও মেয়েটি হাত-ধরাধরি করে হাঁটত। বেশী কথা বলত না। আমার কেমন ঈর্ষা হত, দাদার অন্য হাতটা শক্ত করে চেপে ধরতাম।

মনে হয়, মার মনে সন্দেহ জেগেছিল। আমি ঠিক জানি না। মিংলীর কথা মাকে না বললেও দাদার হাবভাবে মা বোধহয় কিছুটা বুঝতে পেরেছিল। দু' একবার দাদা মেয়েটির সঙ্গে দেখা করতে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতেই মাও সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়ত।

তারপর একদিন ভয়ংকর ধাক্কা খেলাম। ভোরে উঠে নীচে নামলাম। বাড়িটা তখনও বন্ধ, গরম, অন্ধকার, আর চুপচাপ। কাগজওয়ালা সকালবেলাকার খবরের কাগজটা কাঠের বড় দরজাটার নীচ দিয়ে ঢুকিয়ে রেখে গেছে। কাগজটা তুলে নিতেই আলো-অন্ধকারে দেখলাম, তার মুখখানা আমার দিকে তাকিয়ে আছে। তাড়াতাড়ি জানালার কাছে গিয়ে পাল্লা খুলে দিতেই শিরোনামটা চোখে পড়ল : "বার-গার্লের আত্মহত্যা : ব্যর্থ প্রেম।" মেয়েটি মারা গেছে। নিজের ঘরে একাকি হাতের কব্জিটা কেটে ফেলার ফলে রক্তক্ষরণে মৃত্যু হয়েছে। বান্ধবীরাই তার একটা চিরকুট পেয়েছে :

"আমি ভালবেসেছি, আর সেও আমাকে ভালবাসে ; কিন্তু এ ভালবাসা আশাহীন ও দুঃখময়, কারণ আমাদের বিয়ে হবে না। এভাবে বেঁচে থাকা যায় না। আমাকে দোষ দিও না। বিদায়।"

কাগজটা পড়তে পড়তে আমার সারা শরীর কাঁপতে লাগল। দাদা যাতে দেখতে না পায় সেজন্য খবরের কাগজটা লুকিয়ে ফেলতে চাইলাম। কিন্তু সে তো জানতে পারবেই। তাই কাগজটাকে মেঝের উপর ফেলে রেখেই লুকিয়ে বিছানায় চলে গেলাম। তাদের দুজনের জন্য অনেক কাঁদলাম।

সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করলাম। বাড়িটা চুপচাপ। তারপর দাদা ও মার গলা শুনতে পেলাম—তারা চীৎকার করছে। কান্নার শব্দ। দুই হাতে কান ঢেকে ছুটে বাগানে গেলাম।

দরজার ঘণ্টাটা বেজে উঠল। পরিচিত গলা শুনতে পেলাম—আমার

কাকা। ছুটে গেলাম। সদয় হাসি হেসে আস্তে আমাকে একপাশে সরিয়ে দিয়ে কাকা বলল, "তোমার সঙ্গে পরে কথা বলব সোনা, এখন তোমার মার সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি।" কাকা উপরে উঠে গেল।

পরদিন পুলিশ এল—একজন সিনিয়র পুলিশ অফিসার। সঙ্গে কাকা। হল-ঘরে তারা মা ও দাদার সঙ্গে কথা বলল। সিঁড়ির রেলিং-এ ঝুঁকে আমি তাদের কথাবার্তা শুনতে চেষ্টা করলাম, কিন্তু কিছুই কানে এল না। পরে দাদা আমার পাশ দিয়েই উপরে উঠে গেল—অথচ আমাকে যেন দেখতেই পেল না। তার মুখটা সাদা হয়ে গেছে, চোখ দুটো জল্ জল্ করছে।

মনে পড়ে, তারপরেই দাদা হংকং চলে গেল। সেটা কয়েক সপ্তাহ পরের কথা। পড়াশুনা ছেড়ে দিয়ে সেখানে এক আত্মীয়ের কাছে থেকে দাদা তার কাছে থেকে ব্যবসা শিখবে। তার সঙ্গে সকলেই বিমান বন্দরে গেলাম—আমি, মা ও ঠাকুমা। বিমানের অপেক্ষায় বসে থেকে আমরা কোক খেলাম। দাদার মুখে কথা নেই। যেন সেই হাসিখুশি দাদাই নয়। যাবার সময় আমাকে বলল, "ঠাকুমাকে দেখিস্ লক্ষ্মীটি।"

"দেখব—আর মাকে?" আমি বললাম।

"ওঃ, মা নিজেই নিজেকে সামলাতে পারবে।"

সেকথা শুনে মা উদাস চোখে তার দিকে তাকাল।

গাড়িতে ফিরবার সময় ঠাকুমা বলল, "তুমি সব কিছুতেই বড় বেশী নাক গলাও। গাছ-গাছড়াকে নিজের মত বাড়তে দিতে হয়।"

মা বলল, "আপনার আদরের গাছটাকে আগাছায় ছেয়ে ফেলুক তাই কি আপনি চান?"

তখন এসব কথার অর্থ বুঝতে পারি নি। এখন বুঝি।

কিন্তু দাদা অল্পদিন পরেই বাড়ি ফিরে এল। হংকং-এ সে অসুস্থ হয়ে পড়েছিল; বাড়ি ফিরল বেশ রুগ্ন ও কুঁজো হয়ে। ছোকরা-চাকরটা তাকে ধরে ধরে সিঁড়ি দিয়ে তুলছে দেখে আমি কেঁদে ফেললাম।

তার পাশে বসে গল্প করতাম। অনেক সময়ই সে বিকারের ঘোরে থাকত; কখনও বা একদৃষ্টিতে সিলিংয়ের দিকে তাকিয়ে চুপচাপ শুয়ে থাকত।

জ্বলন্ত চোখ মেলে একদিন সে আমাকে বলল, "সে আমার জীবনটা নষ্ট করেছে। সে আমাকে খুন করেছে। দেখ যেন তোমাকেও খুন করতে না পারে।"

"দাদা কি বলছে?" মাকে শুধালাম।

"মদের দোকানের যে মেয়েটা ওকে ফাঁদে ফেলেছিল তার কথাই ও বলছে," এই কথা বলে মা ঠোঁটে যেন কুলুপ এঁটে দিল।

"কিন্তু সে আমাকে খুন করবে কেমন করে?" আমি প্রতিবাদ

জানালাম। মা কোন জবাব দিল না।

মা ডাক্তার ডাকল—প্রথমে ইউরোপীয় ডাক্তার, হাসপাতাল থেকে, হংকং থেকে, লণ্ডন থেকে বিশেষজ্ঞরা এল। তারপর চীনা ডাক্তার এল, তার শরীরে ছোট ছোট পিন ফোটাল, বিশেষ ধরনের ওষুধ দিল। এমন কি এক-জন মালয় "বোমো" কেও ডাকা হল। লোকটা যাদু জানত; নারকেল-মালার তেলে ভাসমান সল্‌তে জ্বালিয়ে সে দাদার বিছানার চারধারে রেখে দিল। ঘরময় ঘুরে ঘুরে অদ্ভুত সব শব্দ করতে লাগল। দেয়ালে ও সিলিং-এ তার ছায়া নড়তে লাগল। কিন্তু কিছুই হল না। শেষ পর্যন্ত সে বলল, "মেয়েটির আত্মা কবর থেকে তোমার ছেলেকে ডাকছে। তোমার ছেলে সে ডাক ফেরাতে পারছে না। সে তার কাছেই যাবে।

তারপর থেকে মা কখনও দাদার ঘরে যেত না। নীচের হলে বসে ক্রুদ্ধ মুখে দাদার মৃত্যুর অপেক্ষা করতে লাগল। কয়েকদিন পরেই দাদা মারা গেল, মাকে একবার দেখতেও চাইল না।

দাদার জন্য ঠাকুমা ও আমি অনেক চোখের জল ফেললাম। আমার শরীরের অবস্থা ভাল ছিল না: তবু ঠাকুমার পীড়াপীড়িতে তাকে নিয়ে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যোগ দিলাম।

ধীরে ধীরে মৃত্যুর শোক কমে এল। বাড়িটা আর আগের মত ফাঁকা লাগে না। কিন্তু প্রায় সন্ধ্যায়ই এখানে এসে বসলে দাদার কথা মনে পড়ে: বাড়ি ফিরেই সে উপরে উঠে আসত, আমার সঙ্গে কত কথা বলত, হৈ-চৈ করত।

তারপর একদিন সন্ধ্যায় সিঁড়িতে তার পায়ের শব্দ শুনতে পেলাম,, হাল্কা পায়ে অতি দ্রুত সে দরজার দিকে এগিয়ে আসছে। দাঁড়িয়ে তার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম। কিন্তু সে ঘরে ঢুকল না। সাহসে ভর করে এগিয়ে গিয়ে দরজাটা খুললাম। কেউ কোথাও নেই। মা ও ঠাকুমাকে কথাটা বলতে ছুটে নীচে নেমে গেলাম। তারা মুখ-চাওয়া চাওয়ি করতে লাগল।

"ভাল কথা নয়," ঠাকুমা বলল।

"কোন অনুষ্ঠান কি আমরা বাকি রেখেছি?" মা শুধাল।

প্রতি সন্ধ্যায়ই পদধ্বনি শোনা যেতে লাগল। টান-টান ভয় ও প্রত্যাশা নিয়ে প্রতি সন্ধ্যায় আমি অপেক্ষা করে থাকি। বাড়ির বাইরে যেতে বা এ-ঘর থেকে ও-ঘরে যেতে পারি না। ঘরেই থাকতাম, আবার ভয়ও করত; আমি জানতাম, একদিন না একদিন সে ঘরে আসবেই। আমি চাইতাম সে আসুক, আবার ভয়ও পেতাম। ক্রমে আমার খাওয়া বন্ধ হল, শুকিয়ে যেতে লাগলাম, ফ্যাকাসে ও চঞ্চল হয়ে উঠলাম। তারপর একদিন স্বপ্ন দেখলাম। দাদা যেন আমার বিছানার শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে বলছে, "মিংলী আমার কাছেই আছে। আমরা এখনও পরস্পরকে ভালবাসি। বিয়ে করতে চাই

মাকে এ বিয়ের ব্যবস্থা অবশ্যই করে দিতে হবে। মাকে বলো কোয়ান আন।"

ঘুম ভাঙতেই ছুটে গেলাম মার কাছে। কাঁপতে কাঁপতে তাকে সব কথা বললাম। মার মুখটা শক্ত হয়ে উঠল। "বটে! সেই জিতল—সবকিছু জিতে নিল!"

মা উঠে দাঁড়াল। আমার ঘর থেকেই শুনতে পেলাম, মা সারা রাত ঘরময় হেঁটে বেড়াচ্ছে।

পরদিন কাকাকে ডাকা হল। তিনজনে অনেক পরামর্শ হল। কাকা বলল, "দেখ বৌদি, তার আত্মার শান্তি যদি চাও তো এটা করতেই হবে। এখন আমাদের সব অহংকার ও ঘৃণা ভুলে যেতে হবে।"

পরদিন মা কেন যে আমাকে সঙ্গে নিল জানি না। প্রাতরাশের পরে গাড়িটা আনা হল। আমরা শহরের একটা দরিদ্র অঞ্চলে পৌঁছে গেলাম। মার পিছন পিছন দোকানের উপরকার একটা অন্ধকার ছোট ঘরে গিয়ে উঠলাম। সেখানে একটি পুরুষ ও একটি নারী আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিল। পুরুষটি শীর্ণকায়, মাথার চুল পাকা, নারীটি স্থূলকায়, কিন্তু মুখ বলীরেখায় ভর্তি। তাদের পরনে জীর্ণবাস, ঘরে আসবাবপত্র কিছু নেই বললেই চলে, প্রার্থনা-বেদীর উপর মিংলীর একখানা ফটো ঝোলানো রয়েছে। মা তাদের সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বলল। মাকে খুব ক্রুদ্ধ মনে হল। সবকিছু বুঝতে পারলাম না, কিন্তু এটা বুঝলাম যে এরাই দাদার প্রেমিকার বাবা-মা, আর মা চেষ্টা করছে তাদের মৃত কন্যার সঙ্গে আমার মৃত দাদার বিয়ের ব্যবস্থা পাকা করতে।

পুরুষটি বলল, "ওরা যখন বেঁচেছিল তখন তো আপনি এটা চান নি। তাহলে আজ তাদের বিয়ে দিতে চাইছেন কেন?"

"কারণ আমার ছেলের জীবনটাই নষ্ট হয়ে গেছে। তোমার মেয়ে তাকে কবরেও শান্তিতে থাকতে দিচ্ছে না। সেই আমার ছেলেকে মেরেছে।"

"না। তাকে মেরেছেন আপনি। ঠিক যেমন আপনি আমার মেয়েকেও মেরেছেন।"

এসব দেখে শুনে আমি তো হতভম্ব! ভেবেছিলাম মা খুব রেগে যাবে, চেঁচামেচি করবে, বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাবে। কিন্তু ঠোঁটে ঠোঁট চেপে মাথা নীচু করে মা চুপচাপ বসে রইল। তারপর ঘৃণাভরা চোখ তুলে বুড়োর দিকে তাকাল।

"তারা এ বিয়ে চায়। আমিও তাতে রাজী হয়েছি।"

"নিশ্চয় যথাবিহিত অনুষ্ঠানই করা হবে। সেই তো হবে প্রথমা স্ত্রী?"

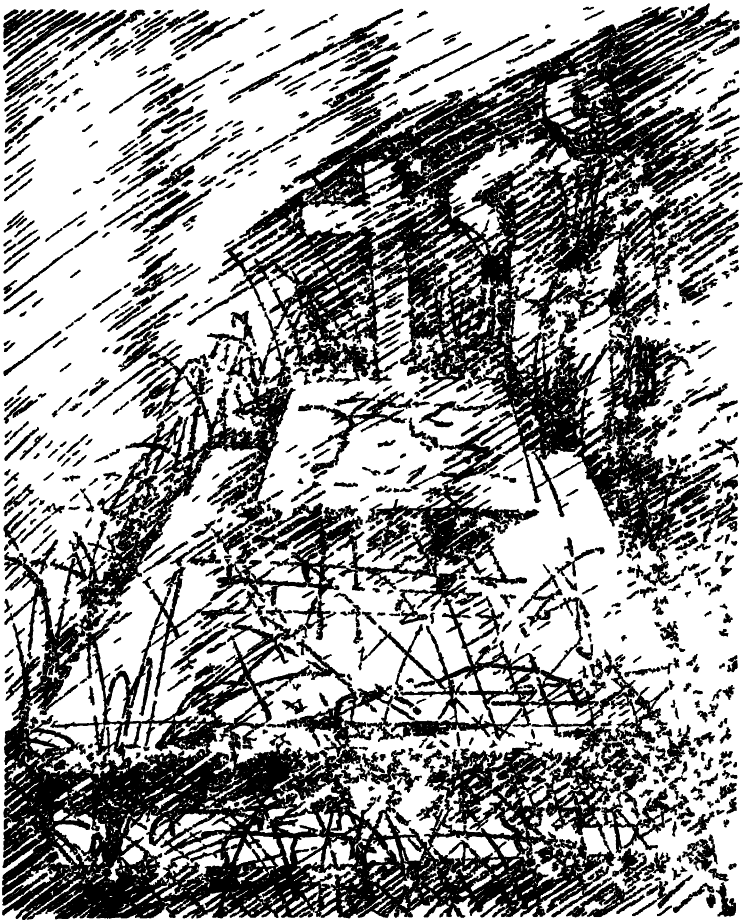
মা মাথা নাড়ল।

"কন্যা-পণ দেবেন?"

মা আবার মাথা নাড়ল। "একজন পুরোহিত ও ঘটক পাঠিয়ে দেব। তাদের তোমার মেয়ের কবরে নিয়ে যেযো।"

বাড়ি ফিরবার পথে মা একটা কথাও বলল না।

ক'দিন পরেই মিংলীর সঙ্গে দাদার বিয়ে হয়ে গেল। পুরোহিত ও ঘটক



ফুলে সাজানো বড় গাড়িতে করে মিংলীর আত্মাকে নিয়ে আমাদের বাড়িতে এল। গাড়ির বনেটের সামনে একটা কনে-পুতুল বাঁধা ছিল। পুরো ব্যাপারই মার না-পছন্দ ছিল: তবু যথাবিহিতভাবে অনুষ্ঠান সম্পন্ন করার জন্য মা কাকাকে ছাড়া আরও অনেক বন্ধুবান্ধবকে আমন্ত্রণ করে আনল।

পুরোহিত ও ঘটক যখন বাড়িতে এল তখন আমি হল ঘরেই ছিলাম। মা, ঠাকুমা ও কাকা বসল এক দেয়াল জুড়ে, আর অতিথিরা বসল অন্য দেয়াল

বরাবর ; দুই আত্মার মধ্যে পরিণয়-অনুষ্ঠান সম্পন্ন হল মাঝখানে পারিবারিক প্রার্থনা-বেদীর সামনে। পরে অদৃশ্য দম্পতি যখন পূর্বপুরুষের স্মৃতি-ফলক ও পারিবারিক দেবতাদের সামনে প্রণাম নিবেদন করল তখন আমরা নীরবে তা দেখলাম। আত্মীয়রা মুখ তুলে দেখল, অদৃশ্য কনেটি মা ও ঠাকুমাকে চা খেতে দিল। তারপর কাগজ ও ভৌতিক টাকায় তৈরি দামী দামী সব উপহার পোড়ানো হল যাতে অন্য জগতে গিয়ে দম্পতি সেটা ব্যবহার করতে পারে। অতিথিদের সামনে পরিবেশন করা হল চমৎকার বৈবাহিক ভোজ।

মা পাথরের মত কঠিন মুখে বসে রইল ; একটা কথাও বলল না। মদ পরিবেশনের পর অতিথিরা ক্রমে ভুলেই গেল যে তারা এসেছে ভূতের বিয়েতে। কাকা আগেই নিঃশব্দে চলে গিয়েছিল।

তারপর থেকে আর কোন স্বপ্ন দেখি নি। সিঁড়িতে কোন পায়ের শব্দ শুনি নি। স্কুলে যেতে লাগলাম। শনিবার সকালে বন্ধুদের সঙ্গে শহরে গিয়ে আইসক্রিম খেতাম, পিকনিকে যেতাম, খেলাধুলা করতাম। একবার মা আমাকে নিয়ে হংকং গেল আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে দেখা করতে। মাঝে মাঝে মা কোন পাহাড়েও যেত ছুটি কাটাতে। ঠাকুমা মারা গেল। শেষের দিকে সে প্রার্থনা-বেদীর পাশে তার চেয়ারে চুপচাপ বসে থাকত। একদিন মাকে বলল, "অচিরেই আমি তোমার ছেলে ও তার স্ত্রীকে দেখতে পাব। তাদের জন্য কোন খবর পাঠাবে কি ?"

মা কখনও দাদার কথা বলত না। ঠোঁট শক্ত করে বলল, "এ বিয়ে করে আমাদের অমর্যাদা করা তার উচিত হয় নি। তাকে বলার আমার কিছুই নেই।"

ঠাকুমার অন্ত্যেষ্টিও খুব বড় মাপের হয়েছিল। সিঙাপুর ও মালয়ের প্রবীণ চীনাদের মধ্যে তার অনেক বন্ধু ছিল। অনেকদিন পর্যন্ত বাড়িটা লোকজনে ভর্তি ছিল।

মা বলল, "আমি মনে করি, আমাদের একবার ইওরোপ ভ্রমণে যাওয়া উচিত। বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢোকার আগে সে দেশটা তোমার দেখা উচিত।"

এইভাবে আমার সতেরো বছর বয়সে আমরা ইওরোপ গেলাম। ইতালি, অস্ট্রিয়া, ফ্রান্স, এমন কি স্পেন ঘুরে বেড়ালাম। কোন কোন স্থানে মার বন্ধু বা আত্মীয়রা ছিল ; তারাই সব ঘুরিয়ে দেখাল। লণ্ডনে আমার এক কাকা ছিল। কেণ্টের একটা ছোট গ্রামে ছিল আর এক কাকা ও কাকিমা। হ্রদ অঞ্চল, এডিনবরা ও স্ট্রাটফোর্ডেও গেলাম। দিনগুলি চমৎকারভাবে কেটে গেল। তবু সিঙাপুরে ফিরে বিমান থেকে নামতে খুবই ভাল লাগল।

বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকে আমি সাহিত্য পড়লাম, কারণ মার মত আমারও সাহিত্যেই আগ্রহ, আর অনেক বছর ধরেই লেখালেখি করেছি।

প্রথম বার্ষিক পরীক্ষার ঠিক আগে, [illegible] উদ্বেগবশত বড় বেশী পড়া-

শুনাই করছিলাম। স্নায়ু-বিকারের ফলে আমার একটু জ্বর-জ্বর ভাবও হয়েছিল। মা খুব চিন্তিত হয়ে পড়ল। আমার মন-মরা বিষণ্ণ ভাবটা ক্রমেই বাড়তে লাগল। কেন যে এরকম হল বুঝতে পারলাম না। তারপর একদিন সন্ধ্যায় ঠিক এইখানে বসেছিলাম মন-মেজাজ খারাপ করে, আর ঠিক তখনই আবার সেটা শুনতে পেলাম—সিঁড়িতে সেই পদধ্বনি ; এবার আরও ভারী, আরও ধীরগতি। জানতাম, দাদা এসেছে। আরও জানতাম, এঘরে সে ঢুকবে না। দরজার কাছে এসে পদধ্বনি থেমে গেল।

মাকে কিছুই বললাম না। অকারণে তার দুশ্চিন্তা বাড়াতে চাইলাম না। একবার মনে হল, ভুল শুনেছি। যা শুনেছি সেটা আমার অসুস্থ মনের কল্পনামাত্র। কিন্তু প্রতি সন্ধ্যায়ই সে পদধ্বনি শুনতে পেলাম। বুঝলাম, আমার দাদাই ফিরে এসেছে।

একদিন রাতে সে স্বপ্নে এসে দেখা দিল ; দাঁড়াল আমার বিছানার পায়ের কাছে। "অন্য জগতে আমি বড় কষ্টে আছি। বৌয়ের সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে। আমরা আলাদা হয়ে গেছি। তাকে বিয়ে করা উচিত হয় নি। তার আর আমার পথ এক নয়। আমি বাড়িতে ফিরে যেতে চাই। মাকে বলো।"

মাকে বললাম। তার চোখে খুশির ঝিলিক দেখা দিল। একটু মৃদু হাসিও। "আমি জানতাম সে ভুল করেছে। অকারণ অর্থব্যয়—তাও একটা বার-গার্লের জন্য! আমার কথাই ঠিক হল।" একটু থেমে বলল, "তাকে তো এ বাড়ি থেকে ফেরাতে পারি না। সে বরং তার পুরনো ঘরটাতেই থাকুক। কিন্তু সে তো এখন বড় হয়েছে, কাজেই ঘরটাকে বেশ কিছুটা অদল বদল করে দেওয়া দরকার।"

ছুতোর মিস্ত্রিকে ডাকা হল। ওখানকার দরজাটাকে তক্তা মেরে বন্ধ করে দেওয়া হল, ফলে যে সিঁড়িটা দিয়ে এখানে এবং তার ঘরে যাওয়া যেত সেটা দিয়ে এখন শুধু তার ঘরেই যাওয়া যায়। মার ও আমার আসা যাওয়ার জন্য অন্য দিকে আর একটা সিঁড়ি বানানো হল। ছেলের অভ্যর্থনা উপলক্ষ্যে আত্মীয়-বন্ধুদের জন্য একটা মজলিসের ব্যবস্থা করা হল। তার ঘরটা পরিষ্কার করা হল। দরকার মত সব জিনিসপত্র এনে রাখা হল। এইভাবে আবার আমরা একত্রে বাস করছি। প্রতি রাত্রে আমি শুনতে পাই, দাদা তার ঘরে ফিরে আসছে।

কোয়ান আনের কথা বন্ধ হল। অন্ধকার হয়ে এসেছে। ঝি ঝি পোকার ডাক ছাপিয়ে একটা টিকটিকি ডেকে উঠল, চি-চক্-চক!

কোয়ান আন উঠে গিয়ে আলোটা জ্বালিয়ে দিল। হলুদ আলোয় ঘরটা ভরে গেল ; আর সেইসঙ্গে মিলিয়ে গেল তার গল্পের রহস্যময়তা।

তার শান্ত মুখের উপর আলো পড়ে চিকচিক করছে। আমার দিকে তাকিয়ে সে মৃদু হেসে বলল, "প্রিয়জনের মৃত্যুর উপরে একটা প্রাচীন কবিতা আছে: "রেশমী আস্তিনের কোন খসখস শব্দ নেই। নেই মেঝের উপরে কোন পদধ্বনি।' সেদিক থেকে আমার ভাগ্য ভাল। প্রতি রাতে আমি দাদার ফিরে আসার পায়ের শব্দ শুনতে পাই। চৌকাঠে ভেজা পাতা লেগে থাকে।"

স্বীকার করতে বাধা নেই, দাদার প্রেতাত্মা সম্পর্কে যে যাই বলুক বাকি সময়টা আমার খুব অস্বস্তিতে কাটল; দোতলার ঘরটা ছেড়ে নীচের হল-ঘরের স্বাভাবিক বাতাসে নিঃশ্বাস নিতে পেরে যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম।

সাদা কুর্তা ও কালো ট্রাউজার পরে বুড়ি কাঠের মেঝেতে চপ্পলের শব্দ করে ধীর পায়ে ঘরে ঢুকল। আমার দিকে তাকিয়ে সোনা বাঁধানো দাঁত বের করে হাসল। "আপনি কি এখন বাইরে যাবেন তুয়ান?" বলে সামনের দরজাটা খুলে দিয়ে ফটকের আলো জ্বেলে দিল। বাগানের তাজা বাতাস আর দূরের বড় রাস্তার যানবাহনের শব্দ ঘরটাকে ভরে দিল।

কোয়ান আন কিন্তু সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। আমার আগ্রহের কথা জানে বলেই দেয়ালের চীনা ভাষার সোনালী লেখাগুলোর দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল।

"এগুলোর কথা তোমাকে কখনও বলেছি মনে হয় না। এতে আমাদের পরিবারের কাম্য সব রকম শুভেচ্ছার উল্লেখ রয়েছে—যেমন স্বাস্থ্য, প্রাচুর্য, আনন্দ, দীর্ঘায়ু, সহিষ্ণুতা, আত্মার শান্তি, বংশবৃদ্ধি···"

জানতে চাইলাম, "এসব শুভেচ্ছাই কি তোমাদের পরিবারে ফলবতী হয়েছে?"

সে জবাব দিল না। মনে হল, আমার প্রশ্নটা সে শুনতেই পায় নি। তার মুখখানি তখনও প্রশান্তিতে ভরা, হাসিটি গম্ভীর, মাথাটা ঈষৎ হেলানো, একটা হাত প্রত্যাশায় উপরে তোলা। অপর সিঁড়িটার দিকে তাকিয়ে সে কান পেতে আছে দাদার পদধ্বনি শোনার আশায়।

Footsteps—Sylvia Sherry

অবাঞ্ছিত আবাস

আমি মনে করি না যে বাড়িটাকে আমি কোনদিন পছন্দ করেছি। আর আজ যখন বাড়িটার কথা ভাবি, তখনও মনে হয় না যে আন কোনদিন

বাড়িটাকে পছন্দ করত। আসলে বাড়িটা কিন্তু মোটামুটি ভালই, তবু প্রথম দিনেই আমরা দুজনই সেখানে কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করেছি। অবশ্য যা সব কাণ্ড-কারখানা ঘটে গেল তাতে সহজেই বলা যায় যে আমরাই ভুল করেছিলাম। কিন্তু আমার ধারণা, প্রথম দিন অপরাহ্ণেই জায়গাটাতে আমরা কিছুটা অস্বস্তিবোধ করেছি।

মনে পড়ে, সেটা ছিল অগাস্ট মাসের একটি উজ্জ্বল দিন। আগের সপ্তাহে আমরা অন্তত কুড়িটা বাড়ি দেখেছি। তখন আমরা একটা সুসজ্জিত ফ্ল্যাটে থাকতাম; আর নিজস্ব একটা আলাদা বাড়ির খোঁজে হন্যে হয়ে ঘুরছিলাম। অনেক টাকা খরচ করার সামর্থ্য আমাদের ছিল না। বাড়িটা দেখেই মনে হল,, এজেন্ট ভদ্রলোক বাড়িটার দাম বলতে গিয়ে নিশ্চয় ভুল করেছে। অন্তত বাইরেটা দেখলে মনে হয় যে টাকা চাওয়া হয়েছে বাড়িটার দাম তার চাইতে বেশী হওয়াই উচিত।

বললাম, "বাড়িটা তো বেশ ভালই; তবে ছাদটা যেন কেমন দেখতে।"

অ্যান সন্দিগ্ধ গলায় বলল, "আমি ঠিক বুঝি না। দেখতে তো ভালই লাগছে। তবে বাড়িটা এত 'সাধারণ' না হলেই ভাল হত।"

বাড়িটা সত্যিই সাধারণ। ২৬ নম্বর ব্র্যায়ারফিল্ড অ্যাভেনিউ-এর এই বাড়িটি শহরতলীর অন্য সব বাড়ির মতই; সামনে টিউডর আমলের নকল পাশকপালি লাগানো, আর ঢালাই-লোহার একটা বিশ্রী ফটক। একটা গ্যারেজও নেই। অবশ্য এটুকু ছাড়া বাড়িটার বিরুদ্ধে আর কিছু বলার নেই।

অ্যান বলল, "পাশের বাড়িটা কিন্তু অনেক বেশী সুন্দর। ঠিক আমার মনের মত।"

বিচলিত বোধ করলাম। ২৬ নম্বর বাড়ির অন্য অংশটাই ২৪ নম্বর। দুটো বাড়ি মোটামুটি একই রকমের।

অ্যান বলল, "না, না, ওটা নয়। ও পাশের বাড়িটা।"

ও পাশের বাড়িটা এখনকার সাদামাঠা পরিবেশের তুলনায় সত্যি অনেক আকর্ষণীয়। ভিক্টোরীয় ছাঁদের গঠন, লম্বা জানালা, গম্বুজ। বাগানের গাছগুলি অযত্নে বেড়ে উঠেছে। দেখলেই বোঝা যায় বাড়িটা অনেকদিন খালি পড়ে আছে।

"হ্যাঁ, খুব সুন্দর। তবে বড্ড বড়। মেরামত করতে অনেক টাকা ঢালতে হবে।"

অ্যান দীর্ঘশ্বাস ফেলল। "তুমি হয়তো ঠিকই বলেছ। তুমি তো সবসময় ঠিকই বল।" অ্যান গাড়ি থেকে নামল। "বেশ তো, ২৬ নম্বর বাড়িটাই দেখা যাক। বেলা অনেক হয়েছে।"

যে লোকটি ফটক খুলে দিল সে আমার সমবয়সী; বিবর্ণ মুখ, চোখে চশমা, গায়ে সবুজ কার্ডিগান। [illegible] আমার বাড়িয়ে দেওয়া হাতটা সে

দেখতেই পায় নি, অথবা দেখতে চায় নি। বলল, "আমার নাম ট্যাপ্‌লো। আর আপনি নিশ্চয়ই—"

"ডেভিড টার্ণার। ইনি আমার স্ত্রী।"

"ঠিক আছে। ভিতরে আসুন।"

হল-এ ঢুকলাম। আন আবহাওয়া সম্পর্কে কি যেন বলল, কিন্তু ট্যাপ্‌লো তার দিকে ফিরেও তাকাল না। হঠাৎ বলে বসল, "বাড়িটা ভাল। মনে হয়, আপনাদের পছন্দ হবে। এটা বৈঠকখানা।"

এক জোড়া মেষের মত ট্যাপ্‌লোর সঙ্গে বাড়িটা ঘুরে দেখলাম। ভিতরটা বাইরের মতই নিতান্ত সাধারণ। খুব সম্প্রতি কিছুটা সাজানো হয়েছে। ট্যাপ্‌লোই বলল, ওয়্যারিং টা নতুন। আসবাবপত্র ও কার্পেটও নতুন বলে মনে হল। আনের মুখ দেখেই আমি বলে দিতে পারতাম যে বাড়িটা দেখে সে মোটেই খুশি হয় নি, কিন্তু আমার কাছে তো বেশ ভালই মনে হল, আর দামের তুলনায় বেশ সস্তাও বটে। দামটা যদি ঠিক-ঠিক বলা হয়ে থাকে, আর বাড়িটাব যদি কোন গোপন ত্রুটি না থাকে, তাহলে কথাটা পাকা করে ফেলাই ভাল। দরকার হলে পরে তো আমরা এটা বিক্রি করে দিয়ে একটা আধুনিক প্যাটার্ণের বাড়ি কিনতেই পারব।

রান্নাঘরে পৌছে আমাদের যাত্রা শেষ হল। ট্যাপ্‌লো আমার দিকে ঘুরে বলল, "দামটাও ন্যায্য বলেই আমার ধারণা। আপনাকে খোলাখুলিই বলছি, বাড়ি-বিক্রির ব্যাপারটা আমি তাড়াতাড়ি চুকিযে ফেলতে চাই।" আমার চোখে-মুখে নিশ্চয়ই একটা সন্দেহ ঝিলিক দিয়েছিল, কারণ সে তখনই বলে উঠল, "বাড়িটার যে কোন দোষ আছে তা কিন্তু নয়। আমাকে ভুল বুঝবেন না। আমরা—আমি মাত্র ছ'মাস এ বাড়িতে বাস করেছি, আর বাড়িটা তৈরি করাও হয়েছে একটা ঘণ্টার মতই শক্তপোক্ত করে। প্রতিবেশীরাও শান্তশিষ্ট। রাস্তাটাও ভাল। বাড়িটা আদর্শ। সম্পূর্ণ আদর্শ।"

বুঝলাম, আনের আগ্রহ বেড়েছে। বাড়িটা তাকে খুশি না করুক, ট্যাপ্‌লো করেছে। তার স্বভাবই ঐ রকম, কোন বস্তুর চাইতে মানুষের প্রতি তার টান বেশী।

ট্যাপ্‌লো তার সহানুভূতিটা ধরতে পারল। একটু কেশে বলল, "কয়েক সপ্তাহ আগে আমার স্ত্রী মারা গেছেন। স্মৃতি বড়ই বেদনাদায়ক…কাজেই, বুঝতেই পারছেন, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমি এখান থেকে চলে যেতে চাই।"

আন বলল, 'বটেই তো, বটেই তো। আমি দুঃখিত।"

ট্যাপ্‌লো কিছুটা সুস্থির হল। "ঠিক আছে। তাহলে ঐ কথাই হল। ভাল কথা, ঐ দামের মধ্যেই কার্পেটগুলো পাচ্ছেন। আর রাতে ব্যবহারের জন্ত হিটারগুলোও।"

আমি পরিষ্কার বলে দিতে পারি, ট্যাপ্‌লোর স্ত্রীর কথা জানবার জন্ত আনের মন তখন নিসপিস করছে। সংকোচের সঙ্গেই সে প্রশ্ন করল, "অনেক—অনেকদিনের অসুখ বুঝি?"

"কি বললেন? না, না, মোটেই তা নয়। খুবই আকস্মিক—অপ্রত্যাশিত।" এই প্রথম তার মুখে হাসি দেখলাম। ঠোঁট-ফাঁটা হাসি, তবু হাসি তো বটে। "তিনি এ বাড়িতেও মারা যান নি, আপনারা সে ভয় করবেন না। বাড়িটা ভূতুড়েও নয়।" সে উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠল। "এটা ভুতুড়ে বাড়ি নয়।"

এবার আনের বিচলিত হবার পালা। কোনরকমে একটু হেসে সে জানালার কাছে গেল। বলল, "আরে, দেখ, বাগানটা দেখ। বাগানের কথা তো আমরা প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম।"

ট্যাপ্‌লো বলল, "বোকামিটা আমারই। সেজন্ত ক্ষমা চাইছি…" পিছনের দরজাটা খোলা হল। তার পিছন-পিছন আমরাও বাইরে গেলাম।

বাগানটা লম্বা ও সরু; আর বাড়িটার মতই সাধারণ। লনটার দিকে এখনই নজর দেওয়া দরকার; একেবারে শেষপ্রান্তের তরকারি-বাগানটার অবস্থাও তথৈবচ। আনের খুব বাগানের শখ। তাই আমি ট্যাপ্‌লোকে নিয়ে দরজায় দাঁড়িয়ে রইলাম, আর সে বাগানে ঘুরে বেড়াতে লাগল। একটা ওষধি-গাছের সারিকে সে খুব ভাল করে দেখতে লাগল।

ট্যাপ্‌লো বলল, "এখানে একটা ভাল বাগান করার পরিকল্পনা আমাদের ছিল, কিন্তু তা আর হয়ে ওঠে নি।"

"সেটা বেশ ভালই হত," এসব ব্যাপারে আমার অনাগ্রহকে ঢাকতে চেষ্টা করলাম।

"খোলা হাওয়ায় খাদ্যের স্বাদই বেড়ে যায়," ট্যাপলো মন্তব্য করল।

আমাদের কথা এর বেশী এগোল না। আনের দিকে তাকালাম। সে বাগানের শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে। পাশের গম্বুজওয়ালা ভিক্টোরীয় বাড়িটার দিকে তার দৃষ্টি নিবদ্ধ। তার দীর্ঘ চুলের রাশি সূর্যের আলোয় ঝলমল্ করছে।

বললাম, "ঐ বাড়িটা আমার স্ত্রীর খুব চোখে লেগেছে। ঐ পুরনো বাড়িটা তো খালি, তাই না?"

ট্যাপলো প্রথমে জবাব দিল না। সে তাকিয়ে আছে আনের দিকে। তার মুখে একটা অদ্ভুত ভঙ্গী।

আবার শুধালাম, "ওই বাড়িটা। ওটা কি খালি?"

ট্যাপলো আমার দিকে মুখ ফেরাল। "ওই বাড়িটা? হ্যাঁ, ওটা খালি।" একটু কেশে তাড়াতাড়ি বলল, "আপনার স্ত্রীর ভিতরে আসা উচিত। বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে…" সে থামল। মৃদু হাসল। অগস্টের রৌদ্রস্নাত দিনে

মোটেই ঠাণ্ডা ছিল না। সে আবার বলল, "আমি দুঃখিত। আপনি যেন কি বলছিলেন? ও, হ্যাঁ, বাড়িটার কথা। আমি জানি, ওটা চক্ষুশূল, কিন্তু, দেখতেই তো পাচ্ছেন, দেয়ালটা খুবই উঁচু; তাছাড়া বাড়িটা শিগ্‌গিরই ভেঙে ফেলা হবে; নতুন করে বাড়ি বানানো হবে।"

"ওঃ?" তাহলে এই দোষের কথাই কি আমি এতক্ষণ সন্দেহ করছিলাম?"

ট্যাপ্‌লো বলতে লাগল, "অবশ্য তাতে কোন ক্ষতি হবে না। আধ ডজন আধুনিক ধরনের বাড়ি তৈরি হবে বা ঐরকমই একটা কিছু। পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়েই সব কিছু করা হবে। ও নিয়ে দুশ্চিন্তা করার কিছু নেই। তার মুখটা আগের মতই নির্বিকার।

আমি ঘুরে দাঁড়ালাম। আন তখনও পাশের বাড়িটার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে একই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে। তার দৃষ্টিকে অনুসরণ করলাম। মনে হল, দোতলার একটা জানালার দিকে সে তাকিয়ে আছে। জানালাটা খুব বড়, রঙিন কাঁচের ছোট ছোট টুকরো দিয়ে অদ্ভুত একটা বর্ডার টানা হয়েছে। উল্লেখ করার মত কোন বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ল না।

ডাকলাম, "আন! এবার আমাদের ফিরতে হবে।"

একটু নীরবতা। তারপর আন প্রথমে ধীর পায়ে, তারপর দ্রুত পায়ে আমাদের দিকে এগিয়ে এল। তাকে বিচলিত দেখাচ্ছে। সে এলে বললাম, "এবার আমাদের যেতে হবে। এমনিতেই মিঃ ট্যাপ্‌লোর অনেক সময় নষ্ট করেছি।"

"মোটেই না," ট্যাপলো বলল। সে একদৃষ্টিতে আনের দিকে তাকিয়ে আছে।

আন শুধাল, "পাশের বাড়িটাতে কেউ থাকে কি? আমি জানি ওটা খালি, কিন্তু—"

"কিন্তু কি?" ট্যাপ্‌লো বলল।

আন হাসল। "জানালায় কাকে যেন দেখলাম। কে যেন জানালায় দাঁড়িয়েছিল আর সেই নারী—"

"নারী? ট্যাপলো বলল। "আপনি বলছেন নারী?"

আন তার দিকে তাকাল। "না, অবশ্য এটা আমার কল্পনাও হতে পারে। বাড়িটা তো খালি। একতলার জানালাগুলো কাঠ মেরে আটকে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তাহলেও—"

আমি বললাম, "হয় তো কোন ভবঘুরে হবে। অথবা কোন অনধিকার প্রবেশকারী। ওরকম খালি বাড়িতে লোকজন তো ঢুকে পড়বেই।"

ট্যাপ্‌লো বলল, "না। দরজাগুলো তক্তা দিয়ে এঁটে দেওয়া হয়েছে। কেউ ঢুকতেই পারে না।"

আন বলল, "তাহলে তো মিটেই গেল। ওটা আমার নিছক কল্পনা। আলোর ভেল্কি।"

"ঠিক তাই।" বলেই ট্যাপ্‌লো হঠাৎ মুখ ঘোরাল। আমরাও তাকে অনুসরণ করে বাড়ির ভিতর ঢুকলাম। হল থেকেই আমরা বিদায় নিলাম। বলে এলাম, বাড়ির ব্যাপারে একটা সিদ্ধান্ত নিয়েই আমরা এজেন্টকে জানিয়ে দেব। গাড়িতে ওঠার আগে আন আর একটি কথাও বলল না।

তারপর বেশ জোর দিয়েই বলল, "কিন্তু একটা কিছু আমি নিশ্চয় দেখেছি। জানালায় যে হোক কেউ ছিল।"

আমি অস্বস্তি বোধ করলাম। "বেশ তো, তুমি না হয় জানালায় কাউকে দেখেছ। তাতে কি হল? বাড়িতে কেউ ছিল, বাস, মিটে গেল।"

আন আবার বলল, "একটি মেয়েকে দেখেছি। সে আমার দিকে তাকিয়েছিল।"

আমি তার দিকে ঘুরে দাঁড়ালাম। "আচ্ছা, এটাকে এত গুরুত্ব দিচ্ছ কেন?"

আন ভুরু কুঁচকে বলল, "ঠিক বুঝতে পারছি না। কিন্তু—না, ওটা কিছু না। তুমি ঠিকই বলেছ। এটা মোটেই গুরুতর কিছু নয়।"

আমি বিরক্ত হয়ে বললাম, "তা কেন বলছ? তুমি নিশ্চয়ই এটাকে গুরুতর মনে করছ। তা না হলে কথাটা বলতেই না।"

"দেখ, ওসব ভুলে যাওয়াই ভাল। কি বল? এখন বাড়ি চল।"

আমি কঠিন কণ্ঠে বললাম, "না। তুমি যতক্ষণ এব্যাপারে—জানালার এই মেয়েটির ব্যাপারে সব কথা না বলছ, ততক্ষণ আমি যাব না।"

"আমার কথা তুমি বিশ্বাস করবে না।"

"আগে তো বল। তারপর দেখা যাবে।"

আন দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল। "বেশ, তাহলে শোন। মেয়েটি দেখতে অতি সাধারণ। লাল চুল। কিন্তু মুখটা..." আন শিউরে উঠল। "বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে, তাই না?"

তার হাতে হাত রাখলাম। "মোটেই ঠাণ্ডা পড়েনি। কথা পাল্টিয়ো না। তার মুখের কথা কি বলছিলে?"

"মুখ—মুখটা বিবর্ণ, সন্ত্রস্ত। তার চোখ · সে যেন আমাকে কিছু বলতে চাইছিল। মনে হল—দেখ, আমি হলফ্ করে বলতে পারি, সে আমার কাছে সাহায্য চাইছিল। সাহায্যের জন্য মিনতি জানাচ্ছিল। কোন কিছু থেকে তাকে উদ্ধার করতে বলছিল।" আন মাথা নাড়তে লাগল। "হয়তো এসবই আমার কল্পনা। কিন্তু তাকে এমন বেপরোয়া মনে হচ্ছিল ·

কি বলব বুঝতে পারছি না। আন তো সেরকম কল্পনাপ্রবণ মেয়ে নয়। আমার বিশ্বাস সে জানালায় কাউকে দেখেছে, কিন্তু ব্যক্তিটা...। ট্যাপ্‌লো

বলেছে বাড়িটা খালি, আর দরজা ভেঙে কেউ বাড়িটাতে ঢুকতে পারে না। কিন্তু বাগানে তার ব্যবহারও তো কিছুটা অদ্ভুতই ছিল।

হাল্কাভাবে বললাম, "রোদে ঝিমঝিম লেগেছে।"

ঠাট্টাটা কাজে লাগল না। আন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাল। "আমি জানতাম তুমি আমার কথা বিশ্বাস করবে না। কাজেই একথা ভুলে যাওয়াই ভাল। এরকম কোন ঘটনাই ঘটে নি। ঠিক আছে?"

"তুমি যা বলবে," আমি অস্বস্তির সঙ্গে বললাম।

আন বলল, "বেশ। একথা আমরা ভুলেই যাব। এবার বাড়ি চল। আমার একটু কিছু চুমুক দেওয়া দরকার।"

দরকার আমারও ছিল। গাড়ির চাবি ঘুরিয়ে বললাম, "আর বাড়িটা সম্পর্কে কি বল?"

সে হেসে উঠল। "ওহো, সেটা তো ভুলেই গিয়েছিলাম। সেকথা পরে হবে। আগে বাড়ি চল।"

বাড়ি ফিরে বাড়িটা সম্পর্কে অনেক কথা হল। শেষ পর্যন্ত স্থির হল, বাড়িটা কেনা হবে। যদিও বাড়িটা আমাদের কারও খুব পছন্দসই নয়, তবু দাওটা হাতছাড়া করার মত নয়। দরকার হলে পরে আর একটা ভাল বাড়ি কিনলেই হবে।

নতুন বাড়িতে প্রথম কয়েকটা সপ্তাহ কোন অঘটন ঘটল না। বাড়িতে নতুন করে কিছু করারও ছিল না। কেবল ঘরের যে রংয়ের পরিকল্পনা ট্যাপ্‌লো করেছিল সেটা আমাদের পছন্দ হয় নি, দু' একটা ঘর নতুন করে সাজানোও হল। এটুকু ছাড়া আর কোন অদল-বদলই করা হল না। "মৃতা নারীর পরিত্যক্ত জুতো," ঠাট্টাটা করেই সঙ্গে সঙ্গে আমার অনুশোচনা হল।

বাড়িতে আসার কয়েক সপ্তাহ পরে ২৪ নম্বরের পাশের বাড়িতে দম্পতির সঙ্গে পরিচয় হতেই ঠাট্টাটার কথা মনে পড়ল। তার আগে পর্যন্ত তারা আমাদের এড়িয়েই গেছে। দুটো বাগানের মাঝখানের বেড়ার দু-দিক থেকে মাঝে-মধ্যে কিছু কথা হয়েছে মাত্র, কিন্তু কোন না কোন ছুতোয় তারা বাড়িতে ঢুকে গেছে। মধ্যবয়সী দম্পতি—তাদের নামটাও জানা হয় নি—শীঘ্রই অবসর গ্রহণে উন্মুখ। একদিন নানা কথায় ভুলিয়ে সেই নাম-না-জানা মিসেসের সঙ্গে আলাপ জমিয়ে নিলাম এবং কথাপ্রসঙ্গে ট্যাপ্‌লোদের কথাটাও তুললাম।

নামটা শুনেই মিসেসের মুখটা কঠিন হয়ে উঠল, কিন্তু একটু পরেই অনেকটা সহজভাবেই তাদের সম্পর্কে দু'একটা কথা বলল। অবশ্য নতুন তথ্য বিশেষ কিছু ছিল না। ট্যাপ্‌লো দম্পতি খুবই সুবিবেচক প্রতিবেশী ছিল, শান্তশিষ্ট, ভদ্র। কিন্তু কিছুদিন পরেই মিসেসের ব্যবহার কেমন যেন হাস্যকর

মনে হত। ঘণ্টার পর ঘণ্টা বাগানে দাঁড়িয়ে থাকত, বিড়বিড় করত, কাঁদত। আর কিছুদিন পরেই নাম-না-জানা মিসেস আর কিছু বলতে চাইল না। স্টোভে রান্না চাপিয়ে এসেছে, তক্ষুণি সেটা নামাতে হবে। কিন্তু রান্নাঘরের দিকে যেতে যেতেই সে বলে গেল, কী লজ্জার কথা ; মিসেস ট্যাপ্‌লো এমন সুন্দরী মেয়ে, লাল চুল,…

এই বাক্যালাপের কথা আনকে জানালাম না। বলা দরকারও মনে হয় নি। জানালায় দেখা সেই মুখের প্রসঙ্গ যত না ওঠে ততই আমাদের পক্ষে মঙ্গল। ওটাকে আমরা দুজনই ভুলে যেতেই চাই।

নাম-না-জানা মিসেসের সঙ্গে কথাবার্তার কয়েকদিন পরে কাজ থেকে বাড়ি ফিরে আনকে বাগানেই পেয়ে গেলাম। পুরনো বাড়িটার জানালার দিকে সে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। কাছে গিয়ে তার দুই চোখে ভয় ও হতাশা লক্ষ্য করে আমি চমকে উঠলাম। তাকে নিয়ে বাড়িতে ঢুকলাম। সে একটি কথাও বলল না। দু'জনের জন্য পানীয় ঢাললাম। আনের শরীর তখন কাঁপছে।

একটু পরে বললাম, "তুমি আবার তাকে দেখেছ, তাই না?"

"হ্যাঁ।" সে অস্ফুট গলায় জবাব দিল।

"সেই একই মুখ? একই মেয়ে?"

"হ্যাঁ।"

নাম-না-জানা মিসেসের দেওয়া বিবরণ মনে পড়ে গেল। বললাম, "মাথায় লাল চুল, তাই না?"

"হ্যাঁ। ..দেখ, আমি খুবই দুঃখিত।…আমি জানি কথাগুলি বোকার মতই বলছি…"

আমি জোর গলায় বললাম, "না, না, বোকার মত কেন হবে? এ বাড়িতে নিশ্চয় কেউ বাস করে।"

"তা কি করে হবে? বাড়ি তো তালাবন্ধ।" আনের আর্তস্বর "সে আমার সাহায্য চায়। আমাকে তার দরকার…"

"বাজে কথা। তোমাকে তার দরকার হবে কেন?'

আন কাঁধ ঝাঁকুনি দিল। আমি জানি, সে আমাকে চাইছে।"

গ্লাসটা নামিয়ে রেখে বললাম, 'বেশ তো, তাহলে চল, গিয়ে দেখেই আসি ব্যাপারটা কি। চল, লাল-মাথা মেয়েটির সঙ্গে আলাপ করেই আসি।"

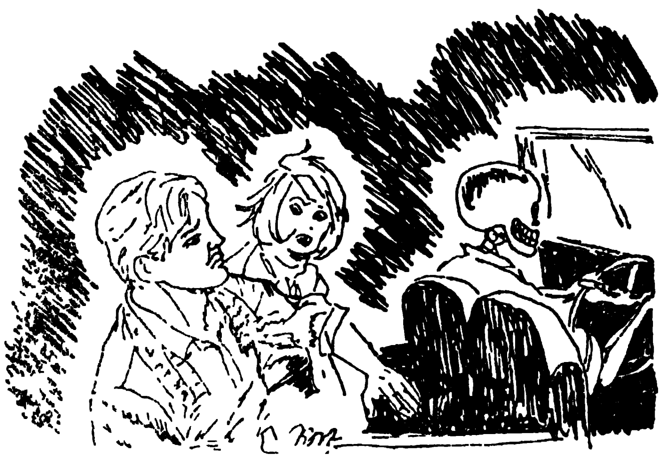
আন ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল। বলল, "এটা হয় তো আমার কল্পনা। হ্যাঁ, নিশ্চয় কল্পনা।"

"বেশ তো, চল না। ওখানে গিয়েই সন্দেহ ভঞ্জন করে আসি। বলে হাতটা বাড়িয়ে দিলাম। আমার হাতটা ধরে সে গম্ভীরভাবে আমার দিকে তাকাল। "আমার আচরণ তোমার কাছে হাস্যকর মনে হচ্ছে না তো? এই

সব যা-তা দেখা। ভ্রান্তদর্শন।"

বললাম, "না, আমি মোটেই তা মনে করি না। জানালায় তুমি কাউকে দেখেছ। তার মানে ওখানে কেউ থাকে। আর কোনরকম সাহায্যের দরকার যদি তার থাকেই তাহলে তো সাহায্য করাই কর্তব্য। চল।"

বাড়িটার নাম "দি লরেল্‌স্‌। ফটক থেকে সামনের সিঁড়ি পর্যন্ত রাস্তাটা ভাঙা-চোরা ও আগাছায় ভর্তি, ফটকটাও খুব নিরাপদ মনে হয় না। পৌঁছে দেখলাম, সামনের দরজাটা তালাবন্ধ, আর রঙিন কাঁচের পাল্লার উপর তক্তা মেরে দেওয়া হয়েছে। জানালায় দেখা নারী যে এই দরজার দিকে ঢোকে নি সেটা সহজেই বোঝা যায়। বাড়িটা ঘুরে দেখলাম। বাগানটা ঝোপ-জঙ্গলে ভর্তি; এখানে—ওখানে আবর্জনার স্তূপ, পরিত্যক্ত বাড়িতে যেরকম হয়ে থাকে। একতলার জানালাগুলো পোক্ত করে বন্ধ করা হয়েছে। পিছনের দরজাটাও সামনের দরজার মতই বন্ধ।



আবার সামনের দরজায় ঘুরে এসে আনের দিকে ফিরে বললাম, "দেখ, তোমার সেই রহস্যময়ী বান্ধবীটি একতলা দিয়ে ঢুকেছে বলে তো মনে হয় না। হয়তো জলের পাইপ বেয়ে উঠে দোতলার জানালা দিয়ে ঘরে ঢুকেছে।

আন চটে গেল। "ঠাট্টা করছ? তুমি তো আগাগোড়াই আমাকে অবিশ্বাস করছ। বেশ তো, তাহলে সবটাই আমার কল্পনা। না হয় আমি মিথ্যা বলেছি। তোমার যা খুশি তাই মনে করতে পার। সে মুখ ঘুরিয়ে রাস্তায় চলে গেল।

তাড়াতাড়ি তার পিছু নিলাম। আমি কি ভাবব বলে তুমি আশা কর? তোমাকে অবশ্যই বিশ্বাস করি। তুমি জানালায় কাউকে দেখেছ। কিন্তু

নিজের চোখেই তো দেখলে বাড়িটা বন্ধ। তাহলে সে ঢুকল কোথা দিয়ে?

ততক্ষণে আমরা আমাদের নিজের ফটকে পৌঁছে গেছি। আন ফটক খুলে কোন কথা না বলেই দরজা দিয়ে ঢুকে গেল। তাকে অনুসরণ করে হলে ঢুকে দরজাটা বন্ধ করে দিলাম। ধীরে ধীরে বললাম, "তোমার বিশ্বাস জানালায় কাউকে দেখেছ। কিন্তু ও বাড়িতে যে কেউ আছে সেটা আমি বিশ্বাস করি না।"

আন তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলে উঠল, "তাহলে ব্যাপারটা কি দাঁড়াল? আমি একটা হাঁদা?"

"আমি জানি না। আমি জানি না।" বৈঠকখানায় ঢুকে একটা গ্লাস নিয়ে বসলাম। আন দোতলায় উঠে গেল। সে সন্ধ্যায় আর নীচে নামল না।

অবশ্য রাতে নেমে এল। সকাল তিনটে নাগাদ ঘুম ভাঙতে দেখি আন বিছানায় নেই। স্নান-ঘরে নেই, একতলায়ও নেই। গোটা বাড়িটাতেই তাকে খুঁজে পেলাম না। ভয় পেয়ে গেলাম। হঠাৎ বুঝতে পারলাম সে কোথায় গেছে। পিছনের শোবার ঘরে গিয়ে জানালা দিয়ে বাগানে চোখ ফেললাম। সেখানে চাঁদের আলোয় আন দাঁড়িয়ে আছে; একদৃষ্টিতে পাশের বাড়িটার দিকে তাকিয়ে আছে তো তাকিয়েই আছে।

সেই থেকেই আন কেমন যেন বদলে গেল। হাসিখুশি চটপটে মেয়েটি ধীরে ধীরে কেমন চুপচাপ, চাপা স্বভাবের মানুষ হয়ে গেল। আমি তাকালেই মুখ ফিরিয়ে নেয়, হাত বাড়ালে সরে যায়। এমন ভাব দেখায় যেন কিছুই হয় নি, যেন জানালায় দেখা নারীর কথা সে ভুলেই গেছে, কিন্তু আমি তো জানি প্রতিদিন সকালে আমি বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলেই সে সোজা বাগানে চলে যায়। সন্ধ্যায় যখন ফিরে আসি তখন সে রান্নাঘরে কাজে ব্যস্ত থাকে, কিন্তু তার মুখের ক্লান্তি দেখেই আমি বুঝতে পারি সেই নারীকে সে আবার দেখতে পেয়েছে। রাতে বিছানায় সে আমার দিকে পিছন ফিরে শুয়ে অন্ধকারে জেগে থাকে। যখনই জাগি তখনই দেখি সে নেই। সে যে কোথায় গেছে তা নিয়ে এখন আর আমি ভাবি না। আমি জানি।

ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে চাইলে বাধ্য মেয়ের মতই সে আমার সঙ্গে গেল। কিন্তু ডাক্তার যে বড়ি খেতে দিল তাতে কোনই পরিবর্তন হল না। হয়তো সে বড়ি সে খায়ই নি। বললাম, চল এখান থেকে চলে যাই, আর বাড়িটা বিক্রি করে দেই, কিন্তু তার তীব্র আপত্তিতে চুপ করে গেলাম। আন বাগানে গিয়ে কি দেখে সেটা জানবার জন্য দু'একবার বাগানে গিয়ে বাড়িটার দিকে তাকিয়েও থেকেছি। সেই নারীকেও দেখতে চেয়েছি। কিন্তু ধূলি-মলিন কাঁচের উপর আলো ও গাছপালার ছায়া ছাড়া আর কিছুই চোখে

পড়ে নি। কি যে করব বুঝতে পারছি না। আমার এত ঘনিষ্ঠ সঙ্গিনী স্ত্রী যেন ক্রমেই আমার কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে।

তারপর, একদিন সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে দেখি ঘর খালি। পিছনের দরজা দিয়ে বাগানে গেলাম। কিন্তু বাগানও জনশূন্য। সে কোথায় গেছে তার কোন সূত্র যদি পাওয়া যায় এই আশায় বাড়িময় ঘুরে বেড়াতে লাগলাম। কোথাও কিছু পেলাম না। টেলিফোনটা বেজে উঠল। ছুটে নীচে গেলাম, নিশ্চয় আন কোন বান্ধবীর বাড়ি থেকে ফোন করছে, হয়তো সেখানেই ডিনারের জন্য বান্ধবী আটকে দিয়েছে; অথবা শহরে গিয়ে ফিরতে দেরি হয়েছে। কিন্তু টেলিফোন করেছে অন্যলোক—আমার ভাই, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কথা শেষ করলাম।

ঘণ্টা বেজেই চলল। আকাশ অন্ধকার হয়ে এল। আবার বাগানে গিয়ে "দি লরেল্স্"-এর দিকে তাকালাম। হঠাৎ মনে হল, আন সেখানেই গেছে। ছুটে রান্নাঘরে গেলাম; সেখান থেকে হল-এ; সশব্দে দরজা ও ফটক বন্ধ করে আমাদের বাড়িও "দি লরেল্স্"-এর মাঝখানের কয়েক গজ জায়গা ছুটে পার হয়ে গেলাম। অন্ধকার জানালাগুলি অন্ধের চোখের মত আমার দিকে তাকিয়ে আছে। ভাঙা সিঁড়ি ও কাঠ লাগানো দরজায় যাবার পথে বার কয়েক হোঁচট খেলাম। কেন যাচ্ছি কিসের আশায় যাচ্ছি তাও জানি না। শুধু এইটুকু নিশ্চিত জানি যে আন ঐ বাড়িতে আছে, আর তাকে খুঁজে বের করতেই হবে।

সামনের দরজাটা খোলা দেখে আমার অবাক হওয়াই উচিত ছিল, কিন্তু আমি অবাক হই নি। দরজাটা কেন খোলা আছে, আর কে বা খুলেছে সে-কথা একবারও না ভেবে ওপাশের অন্ধকার, ধূলোভর্তি হল-ঘরে ঢুকে পড়লাম। সিঁড়ির উপরকার স্কাই-লাইট দিয়ে আসা একটা আবছা আলো হলের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে। ঘরের দুই পাশের বন্ধ দরজাগুলোর দিকে কোনরকম নজর না দিয়েই আমি চওড়া সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগলাম। একবার কান পাতলাম। কিছুই শুনতে পেলাম না। নিস্তব্ধতার একটা শ্বাস-রোধকারী কালো কম্বল যেন আমাকে ঘিরে ধরেছে; আমার পায়ের শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দ কোথাও নেই। দোতলার চাতালে পৌঁছে একবার থামলাম। তবু কোন শব্দ নেই। আমার ডান দিকে একটা বারান্দা চলে গেছে; সেটা ধরেই এগিয়ে গেলাম।

শেষ প্রান্তে একটা দরজা খোলা; তার ফাঁক দিয়ে একটা রূপোলি আলোর রেখা বারান্দায় এসে পড়েছে। থামলাম। আমি জানতাম, আন সেই দরজার অপর দিকে, আর এই প্রথম আমি তাকে ডাকলাম, "আন! আন, তুমি কোথায়?" কোন উত্তর এল না। একটা শব্দ পর্যন্ত নেই। ধীরে ধীরে খোলা দরজার দিকে এগিয়ে গেলাম। ইচ্ছা হল, ছুটে যাই, একধাক্কায়

দরজাটা খুলে ফেলি, আনকে ঘরের ভিতর থেকে টেনে নিয়ে আসি। কিন্তু তার সঙ্গে আর কে আছে তা তো আমি জানি না। দরজার কাছে পৌঁছে আবার থামলাম। আস্তে একটু ধাক্কা দিলাম। দরজাটাও আস্তে ভিতরের দিকে খুলে গেল, আর সঙ্গে সঙ্গে একটা কিছু—একটা মাকড়শার জাল অথবা হাওয়া—এসে আমার গালে লাগল। ঘরের মধ্যে তাকালাম। আমার মুখোমুখি একটা জানালা। রঙিন কাঁচের ছোট ছোট টুকরো দিয়ে তৈরি বিচিত্র পাড় বসানো একটা মস্ত বড় জানালা।

ঘরের মধ্যে আন একা। আর কেউ নেই, কোন লাল-চুল মেয়ে নয়, কিছু নয়। শুধু আন। ধূলোভর্তি মেঝেতে সে তালগোল পাকিয়ে শুয়ে আছে। লম্বা চুলের রাশি তার মুখের উপর ছড়িয়ে পড়েছে। সে চুল এক-পাশে সরাতেই দেখলাম সে হাসিমুখেই মারা গেছে।

একটি যুবক দম্পতি আজ বাড়িটা দেখতে এসেছে। আমারই বয়সী, বরং একটু বেশী লাজুক। বাড়িটা দেখে তারা বেশী কিছু বলল না, তবে মনে হল যে বাড়ি তাদের পছন্দ হয়েছে। পছন্দ হবারই কথা। বাড়িটা ভাল, পরিবেশটাও ভাল। আর কোনরকম অযৌক্তিক দামও আমি চাই নি। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বাড়িটা বিক্রি করে দিতেই আমি চাই; তাদের শুধু বললাম, এ দামে যদি তারা এর চাইতে ভাল বাড়ি পান তবে তাদের ভাগ্য ভাল বলতেই হবে।

অবশ্য বাগানে দাঁড়িয়ে মেয়েটির আচরণ কেমন যেন অদ্ভুত মনে হল। পাশের পুরনো বাড়িটার দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে সে আমার কাছে জানতে চাইল, ও বাড়িতে কে থাকে। আমি যখন বললাম যে বাড়িটা খালি পড়ে আছে তখন সে ভুরু কুঁচকে বলল, সে শপথ করে বলতে পারে যে দোতলার একটা জানালায় সে কাউকে দেখেছে। মেয়েটির মাথায় লম্বা চুলের রাশি।

Undesirable Residence—Lance Salway

বাসের সেই ছেলেটি

নিজের চোখে না দেখা পর্যন্ত আণ্ড্রু স্টার্লিং ভূতে বিশ্বাস করত না। তখন তার বয়স তেরো বছর; কিন্তু পাঁচ বছর আগের একটা ঘটনা না ঘটলে সে তো ভূতকে ভূত বলেই চিনতে পারত না।

সাড়ে সাত বছর বয়সে সে ছিল একেবারেই ছেলেমানুষ; সম্প্রতি বেশ বাড়তে শুরু করেছে। সপ্তম জন্ম দিনে যে টেরিলিন শর্ট তার হাঁটু ছুঁত, এখন সেটা পরলে তার উরু বেরিয়ে পড়ে। একদিন তার বাবা-মা গাড়ি করে তাকে নিয়ে গেলেন হাই হিথ প্রিপারেটরি স্কুলে ভর্তি-পরীক্ষার জন্য। প্রধান শিক্ষক সঙ্গে সঙ্গে তাদের সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন স্কুলের বাড়ি ও খেলার মাঠ ঘুরিয়ে দেখাতে। আশুকে তুলে দেওয়া হল সেকেণ্ড মাস্টারের হাতে। লোকটি বয়স্ক, নাকের উপরে সোনালী ফ্রেমের চশমা, মুখে মিষ্টি হাসি।

দুজনে কয়েক ধাপ সিঁড়ি বেয়ে নেমে একটা খুব ছোট অন্ধকার ঘরে ঢুকল। ঘরটার সবগুলি দেয়াল মেঝে থেকে শিলিং পর্যন্ত বইয়ের তাকে ঠাসা। মাঝখানে একটা কাঠের টেবিলেও স্তূপীকৃত বই। তার চারদিকে চারটে চেয়ার।

"স্কুলের শেষ বছরে সবচাইতে সেরা ছেলেরাই এই ঘরে পড়তে আসে," ঈষৎ বিদেশী উচ্চারণে সেকেণ্ড মাস্টার কথাগুলি বললেন।

আশু মাথা নেড়ে বোঝাতে চাইল সে মন দিয়ে শুনছে, কিন্তু আসলে নিজের আসন্ন পরীক্ষা নিয়ে সে তখন এতই চিন্তিত যে অন্য কিছু ভাববার সময় তার ছিল না।

শিক্ষক বললেন, "এখানে বস। প্রথমে সহজ প্রশ্ন দিয়েই শুরু করি। একটা ছোট গল্প লেখ দেখি কেমন পার।"

লিখতে বসে আশুর বুক কাঁপতে লাগল। সে মোটেই গল্প বানাতে পারে না। কিন্তু বাবাকে কথা দিয়েছে, সাধ্যমত চেষ্টা করবে। পেন্সিলটা হাতে নিয়ে কোন্ বিষয়ে গল্প লিখতে হবে সেটা শুনবার জন্য অপেক্ষা করতে লাগল।

শিক্ষক বললেন, "দীর্ঘ গল্প লিখতে হবে না। ততটা সময় আমাদের হাতে নেই। তোমাকে একটা ছবি দেখাচ্ছি। সেটা দেখে তাকে ভিত্তি করেই গল্পটা লিখবে। এই দেখ।"

সাদা-কালোয় আঁকা একটা সাধারণ ছবি, যেরকম ছবি সাধারণত আঁকার বইতে থাকে। একটা একতলা বাসে একটি ড্রাইভার স্টিয়ারিং-হুইলে বসে হাঁ করে সামনের দিকে তাকিয়ে আছে। পিছনের সিটে দুজন যাত্রী বসে আছে; পুরুষটির মাথায় মোটর-সাইকল চালকের শিরস্ত্রাণ, আর স্ত্রীলোকটির হাতে একটা পেট-মোটা বাজারের থলে। একজন ফুটবল-অনুরাগী যুবক সবেমাত্র বাসে পা দিয়েছে, তার মাথায় ডোরাকাটা পশমী টুপি, আর জার্সিতে একটা ছোট গোলাপ ফুলের ছবি পিন দিয়ে আঁটা। একটি বয়স্ক ভদ্রলোক হাত তুলে বাসটা থামাতে বলে ছুটে আসছে, বাতাসে তার স্কার্ফটা উড়ছে। খুবই সাধারণ একটা দৃশ্য। ছবিটাতে এমন কিছু নেই যাতে বোঝা যেতে পারে কেন বাসটার পিছন থেকে বিষাক্ত গ্যাসের মত একটা ভয়ংকর ঘন কালো ধোঁয়ার সারি আশুকে ঢেকে ফেলতে চাইছে,

তার গলা আটকে দিতে চাইছে, তার দম বন্ধ করে দিতে চাইছে।

আশু উঠে দাঁড়াল। তার চেয়ারটা সশব্দে একপাশে উল্টে গেল; তার পেন্সিলটা ঠুক করে মেঝেতে পড়ল; কিন্তু সে কিছুই শুনতে পেল না। ছবিটার কাছ থেকে এই মুহূর্তেই পালিয়ে যেতে হবে—এ ছাড়া আর কোন চিন্তাই তার মাথায় এল না। ঘরটা খুবই ছোট। এক পা পিছিয়ে গেলেই দেয়ালে ধাক্কা খেতে হবে। তার মুখ শুকিয়ে কাঠ হয়ে উঠল; হৃৎপিণ্ডের গতি থেমে গেল; বরং মনে হল হৃৎপিণ্ডটা যেন শরীরের মধ্যে বেলুনের মত ফুলে উঠছে। মাথার চারদিকে একটা গর্জনের শব্দ হচ্ছে, কিন্তু মাঝখানে দেখা যাচ্ছে ত্রাসের একটা ছোট সাদা বৃত্ত। পিছু হটে বইয়ের তাকের উপর ভর দিয়ে দাঁড়াল; কোন কিছু ধরবার জন্য হাত দুটোকে দুদিকে বাড়িয়ে দিল; মনে হল, সে বুঝি পড়ে যাবে।

কিসে যেন তাকে সজোরে আঘাত করল, প্রথমে ডান গালে, তারপর বাঁ গালে। একটা হাত গলা চেপে ধরে এমনভাবে তাকে নুইয়ে দিল যে তার মাথাটা হাঁটু স্পর্শ করল। একমুহূর্ত পরে সে শিউরে উঠল; মাথার ভিতরকার গর্জনটা কথঞ্চিৎ প্রশমিত হল; কানে এল শিক্ষকের কণ্ঠস্বর।

"তোমাকে আঘাত দেবার জন্য ওটা করা হয় নি আশু, তোমার মাথায় রক্তটা ফিরিয়ে আনতেই ওরকম করা হয়েছে। একটু কিছু পান করবে কি?"

জবাব দিতে আশুর একমুহূর্ত বিলম্ব হল। সে কিছুতেই বুঝতে পারল না, ভয়ের কোন কারণ না থাকা সত্ত্বেও কেন সে ভয় পেল। কিন্তু একটা জবাব তো দিতে হবে।

"না; ধন্যবাদ স্যার।" বাবা তাকে শিখিয়ে দিয়েছে, যতবার সম্ভব সে যেন "স্যার" কথাটা ব্যবহার করে।

শিক্ষক বললেন, "মনে হচ্ছে এই ছোট্ট পরীক্ষার জন্য তুমি খুবই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছ। 'হাই হিথ'-এ আসাটা কি তোমার পক্ষে একান্তই দরকার?"

প্রশ্নটা মোটেই সহজ নয়। জুনিয়র স্কুলে আশু বেশ সুখেই ছিল। কেন যে বাবা-মা তাকে অন্য স্কুলে দিতে চায় তাও সে জানে না; কিন্তু সে এটা জানে যে তার সাহায্য ছাড়া তাদের এ পরিকল্পনা কার্যকরী হতে পারে না। কাজেই কারণ যাই হোক না কেন, এ ব্যাপারে তার যে একটা দায়িত্ব আছে তা সে বোঝে।

মনে হল, তাকে চুপ করে থাকতে দেখেই শিক্ষক সঠিক জবাবটা পেয়ে গেলেন।

বললেন, "তোমার বাবা হয় তো এটা চান, কি বল?" আশু মাথা নাড়ল। "কিন্তু কেন চান সে কথা কি তোমাকে কেউ বলেন নি?"

শিক্ষক একমুহূর্ত থেমে দরজাটা খুলে দিলেন।

"আবার আমার সঙ্গে এস।" সিঁড়ি বেয়ে উঠে তারা একটা বড় ঘরে

ঢুকল। মনে হল, ঘরটা একাধারে সভা-কক্ষ ও ব্যায়ামাগার। দুটো টানা দেয়ালে মই বসানো। প্ল্যাটফর্মের পিছনে একেবারে শেষ প্রান্তে কৃতী ছাত্রদের নামের তালিকাসম্বলিত একটা বোর্ড চোখে পড়ল। বোর্ডটা ভর্তি করে সোনালী অক্ষরে অনেক নাম লেখা রয়েছে।

শিক্ষক বললেন, "এটা ভাল ছেলেদের স্কুল। কম-বেশী সকলেই ভাল, কেউ বোকা নয়। কোন ধনী ব্যক্তি যদি তার বোকা ছেলেকে নিয়ে আসেন, আমরা তাকে দুঃখের সঙ্গে ফিরিয়ে দেই।"

আণ্ডু শুধাল, "এখানে ভর্তি হবার আগেই কি করে আপনারা বোঝেন তারা ভাল ছেলে?"

শিক্ষক বললেন, "যেসব ছেলে এখানে আসতে চায় তাদের প্রত্যেকের সঙ্গে আমি একটি ঘণ্টা কাটাই। সেই এক ঘণ্টার পরেই আমি বুঝতে পারি তার বুদ্ধিশুদ্ধি কতটা আছে।" শিক্ষক প্ল্যাটফর্মের দিকে এগিয়ে গেলেন। বোর্ডটা দেখিয়ে বললেন, "কেউ তার ভাল ছেলেটিকে আমাদের এখানে দিলে বিনিময়ে আমরা তাকে এইটি দিতে চেষ্টা করি। পাব্লিক স্কুলে যাবার জন্য একটা বৃত্তি।"

আণ্ডু বলল, "আপনারা দেখছি বহু ছেলে পান স্যার।" গত বছরের তারিখ দিয়ে যে নামগুলি সোনালী অক্ষরে লেখা হয়েছে সেগুলিকে সে গুণতে লাগল।

শিক্ষক ঘাড় নেড়ে বললেন, "হ্যাঁ, অনেক ছেলে। এই জন্যই তোমার বাবার মত সকলেই তাদের ছেলেকে 'হাই হিথ'-এ পাঠাতে চান। তেরো বছরের ভাল ছেলেরা বৃত্তি পায়, আর তাতেই স্কুলের সুনাম হয়, ফলে সাত-আট বছরের ভাল ছেলেদের এখানে পাঠানো হয় যাতে তারাও একদিন বৃত্তি পেতে পারে। তোমার বাবা মনে করেন তুমিও একটি ভাল ছেলে। কিন্তু বাবারা তো তাদের ছেলেকে ভাল ভাববেনই। তিনি ঠিক ভেবেছেন কি না সেটা প্রমাণ করতে হবে তোমাকে। স্কুলে কি পড়তে তোমার সব চাইতে ভাল লাগে আণ্ডু?"

"অংক স্যার।"

"তাহলে তো আমাদের সেই ছোট ঘরটায় ফিরে গিয়ে কিছু অংকই কষতে হবে।"

তারা এত দ্রুতপায়ে সিঁড়ি দিয়ে নামল যে স্পষ্টই বোঝা গেল যথেষ্ট সময় এর মধ্যেই নষ্ট হয়েছে।

"এখানে আমার ঠিক পাশে বস। দেখ, এই ছোট বইটাতে একশটা প্রশ্নের অংক আছে। অবশ্য সবগুলো অংক কষতে তোমাকে বলব না। অনেকগুলো অংকই তোমার চাইতে তিন-চার বছরের বড় ছেলেদের জন্য। প্রথম আমরা তাড়াতাড়ি লাফিয়ে যাব, যাতে আমি বুঝতে পারি কোথায়

তোমার শক্ত লাগছে।"

আণ্ড্, ঘাড় নেড়ে জানাল, সে বুঝেছে। সে সোজা হয়ে বসল। পরীক্ষাটাতে তাকে ভাল ফল করতেই হবে।

"প্রথম অংকটা একেবারে বাচ্চাদের জন্য। উত্তর বল।"

সহজ গুণ অংকটা মনে মনে কষেই আণ্ড্, সঠিক জবাবটি দিল।

"সোজা চলে যাও দশ নম্বরে। মনে হয়, এটাও তোমার পক্ষে সোজাই হবে।"

অংকটা এই রকম: একটি ছেলে কিছু মার্বেল জিতল, কিছু হারল, কিছু ভাগাভাগি করল; কিন্তু কথাগুলি বলা হল খুব ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে। অংকটাও অ্যাণ্ড্, মনে মনেই কষে ফেলল।

"তাহলে চলে যাও বিশ নম্বরে। কাগজ-পেন্সিলের দরকার হলে চেয়ে নিও।"

এ অংকটা একটি পরিবারের ছেলেমেয়েদের বয়সের হিসাব। আণ্ড্, অংকটা ঠিক ঠিক কষে ফেলল।

শিক্ষক বললেন, "এবার তোমাকে একটা শক্ত অংক দিতে হবে। ত্রিশ।"

ত্রিশ নম্বর অংকটার চারটে অংশ। প্রত্যেক অংশে পর পর কতকগুলি করে সংখ্যা। প্রতিটি অংশে আর একটা সংখ্যা যোগ করতে হবে সংখ্যাগুলির ক্রম-নিয়ম অনুসরণ করে। আণ্ড্, খুব তাড়াতাড়ি প্রশ্নটা বুঝে নিয়ে সঠিক জবাবই দিল।

ত্রিশ নম্বরের পরে আর লাফিয়ে যাওয়া নেই। কাগজ-পেন্সিল নিয়ে সে ধীরে ধীরে একের পর এক অংক কষে যেতে লাগল। সাঁইত্রিশ ভুল হল; আটত্রিশ আরম্ভই করতে পারল না। সভয়ে শিক্ষকের দিকে তাকাল।

শিক্ষক বললেন, "তুমি তো ভালই করছ। এবার তোমাকে একটা ছোট্ট পড়া দেব। মন দিয়ে শোন; দেখ ঠিক বুঝতে পার কি না।"

পড়াটা গড়-বিষয়ক; কথাটা আণ্ড্, আগে কখনও শোনে নি। শিক্ষক বেশ ভাল করে বুঝিয়ে দিয়ে চুপ করলেন। আণ্ড্, বুঝতেই পারল না তাকে কি করতে হবে।

"তুমি কি আটত্রিশটা আর একবার দেখবে?"

এবার অংকটার দিকে তাকিয়েই আণ্ড্, বুঝতে পারল, সে ঠিক কষতে পারবে। খুশির হাসি হেসে উত্তরটা লিখে দিল।

বলল, "কিন্তু এটা কি ঠিক হল স্যার? মানে, আপনি তো আমাকে সাহায্য করলেন।"

"তোমার উত্তরগুলো দেখে আমাকেই তো বলতে হবে 'হ্যাঁ, আমরা একে নেব অথবা, নেব না। আর আমিই শুধু জানব তুমি কতটা সাহায্য পেয়েছ। তোমাকে যা বলা হল সেটা তুমি ঠিক ঠিক বুঝতে পার কি না—সেটাও এক

ধরনের পরীক্ষা। এবার এই বইটা থেকে আমাকে কিছু পড়ে শোনাও।"

খুব বেশী না থেমেই আশু একটা অনুচ্ছেদ পড়ল। তাকে অনেকগুলি ছবি দেওয়া হল। এক রকমের দুটো ছবি, বা এক ধরনের ছবি নয় এ রকম ছবি সে সহজেই বেছে বের করে দিল। শিক্ষক সারাক্ষণই সম্মতিসূচকভাবে মাথা নাড়তে লাগলেন। তারপর ছবিগুলি ফিরিয়ে নিলেন।

"এবার লিখতে পারবে তো?"

অকারণেই এবারও আগের মতই একটা ভয় তাকে পেয়ে বসল। এক মিনিট কোন কথাই বলতে পারল না; শুধু মাথা নাড়ল।

তারপর যেন কথা বলার ক্ষমতা ফিরে পেল। বলল, "না; না, আমি পারব না।"

"কেন পারবে না?"

কেন পারবে না তা আশু জানে না। শুধু বুঝল, এখানে আসা তার উচিত হয় নি। এখানে তার জন্য কোন অকল্যাণ অপেক্ষা করে আছে। সে এখান থেকে চলে যেতে চায়, এই বুড়ো মানুষটির কাছ থেকে পালাতে চায়; ইনি যে তার মনের ভিতরটা পর্যন্ত দেখতে পান, সেখানে যা কিছু আছে সব পরিষ্কার করে দিতে চান। তাছাড়া, এই বাস ও তার সারিবদ্ধ যাত্রীদের দৃষ্টির বাইরে সে চলে যেতে চায়।

একটা যুক্তি খোঁজার আপ্রাণ চেষ্টায় সে বলে উঠল, "আমি বানান করতে পারি না।" কথাটা সত্যি। জুনিয়র স্কুলের কোন শিক্ষকই বানান শেখার উপর গুরুত্ব দেয় নি। তারা বলতেন, তাড়াতাড়ি লিখতে পারলেই হল, আর মনের কথা বোঝাবার জন্য ঠিক শব্দটা বেছে নিতে পারলেই হল। শব্দের ভিতরকার অক্ষরগুলো নিয়ে মাথা ঘামাবার কিছু নেই।

শিক্ষক দয়ালু গলায় বললেন, "আমি তোমাকে সাহায্য করব। কেমন করে বানান করতে হয় তা তোমাকে শিখিয়ে দেব। আজ আমি শুধু দেখতে চাই, বানান করার উপযুক্ত কোন কিছু তুমি ভাবতে পার কি না।"

"না, সেটা ভাবতে আমি চাই না।"

"সে কি? তুমি যদি কিছুই না লেখ, তাহলে আমি তোমাকে পরীক্ষায় পাশ করাব কেমন করে?"

"আমি পাশ করতে চাই না।"

"কিন্তু আমি চাই।" শিক্ষক একমুহূর্ত থামলেন। "এস। আর একবার 'হাই হিথ'-এর কথাই আলোচনা করি। এ স্কুলে অনেকগুলি পরীক্ষা হয়। পাবলিক স্কুলের বৃত্তি-পরীক্ষাটা হচ্ছে শেষ পরীক্ষা। প্রতি টার্মেই একটা করে ছোট পরীক্ষা হয়। প্রতি তিন সপ্তাহে একবার করে নম্বর যোগ করা হয়; প্রত্যেক শ্রেণীর একেবারে উপরের ও একেবারে নীচের ছেলেটিকে বের করা হয়। একেবারে নীচের ছেলে হওয়াটা তো সুখের কথা নয়।

কাজেই সব সময় কঠোর পরিশ্রম করে প্রতিযোগিতা করতে হয়। এ ব্যবস্থাটা সব ছেলের পক্ষেই যে ভাল তা নয়। অনেকেই এতে বিরক্ত হয়, দুঃখ পায়। এই স্কুলে আসাই তাদের উচিত নয়। তুমি খুব ছোট, কিন্তু আমাদের অবশ্যই বুঝতে হবে, তোমাকেও বুঝতে হবে, এখানকার জীবন তোমাকে উদ্দীপিত করবে না বিষণ্নতার মধ্যে ফেলে দেবে—এটা তোমার পক্ষে সঠিক জায়গা কি না।"

আণ্ড্রু কিছুই বলল না। ছবির ব্যাপারটা ছাড়া আর সবই তাব ভাল লেগেছে; তবু কেন যে অকারণে তার মন খারাপ হয়েছে তা সে বুঝতেই পারছে না।

শিক্ষক বলতে লাগলেন "একটা পরীক্ষা ভালভাবে পাশ করতে হলে তিনটে জিনিস প্রযোজন। তোমাকে শুদ্ধ জ্ঞান অর্জন করতে হবে, আর সেই জ্ঞান তোমাকে দান করাই শিক্ষকের কাজ। সেই জ্ঞানকে কাজে লাগাবার মত বুদ্ধি তোমার থাকা চাই। হয তো আমার বলা উচিত নয়, তবু বলছি যে সে বুদ্ধি তোমার আছে। কিন্তু আরও একটা তৃতীয় জিনিস চাই। এই সব পরীক্ষায় ভাল ফল করার উচ্চাকাংখা তোমার অবশ্যই থাকা চাই। এই স্কুলে আসার বাসনা যদি তোমার থাকে তো এই পরীক্ষাটা তোমাকে শেষ করতে হবে এবং আরও পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। এ পরীক্ষাটা যদি শেষ করতে না পার তাহলে এ ঘর থেকে বেরিয়ে যাও, আর কোন দিন এসো না। এখন তোমার যা অভিরুচি।"

আণ্ড্রু শিক্ষকের দিকে চোখ তুলে তাকাল। তার বুক টিপ্ টিপ্ করছে। দুটি সদয় চোখ তার দিকে তাকিয়ে আছে।

"দেখ আণ্ড্রু, যদি এখানে থাক, আমি তোমাকে গড়ে-পিটে মানুষ করে তুলব। তুমি আমার সঙ্গে কাজ করবে, শক্ত শক্ত অংক কষবে, আর ঐ বোর্ডে তোমার নাম আমি স্বর্ণাক্ষরে লিখিয়ে দেব। তুমি কি আমার কথা মত এখানে থাকবে? গল্পটা লিখে ফেলবে?"

আরও কিছুক্ষণ চুপচাপ কাটল। স্কুল পাল্টাবার কোন কারণ আণ্ড্রুব নিজের নেই, আর সেই বাসের ছবিটা প্রথম দেখার পর থেকেই বাবাব ইচ্ছা ও গুরুত্বও তার কাছে কমে গেছে। কিন্তু যে কারণেই হোক এই বুড়ো মানুষটি তার বন্ধু হয়ে উঠেছে। তাদের মধ্যে যে বন্ধন গড়ে উঠেছে আণ্ড্রু সেটাকে ভাঙতে অক্ষম। সে ঘাড় নাড়ল।

তখন কিন্তু সে গল্পটা লিখতে শুরু করতে পারল না। ছবিটার দিকে যতবার তাকায় ততবারই সে ভয়টা তাকে পেয়ে বসে; আর সেই ভয়কে জয করতে গিয়ে আর কোন দিকেই মন দিতে পারে না।

শিক্ষক শান্ত গলায বললেন, "এই লোকগুলির বরং একটা করে নাম দেওয়া যাক। একটা মুখকে নিয়ে গল্প লেখাটা শক্ত। কিন্তু তাকে যখন একটা

নাম দেওয়া যায় তখন সে একটা মানুষ হয়ে ওঠে, আর তার জীবনে অনেক কিছুই ঘটতে পারে। এবার লেখ।"

পেন্সিলটা আঙুলে চেপে ধরে আশু বাসের জন্ম ছুটন্ত বুড়ো লোকটির দিকে তাকাল। জড়ানো হরফে লিখতে শুরু করল।

"মিঃ স্মিট্—"

শিক্ষক মুচকি হাসলেন।

"তুমি দেখছি আমাকে নিয়েই লিখছ, কি বল?"

আশু চমকে চোখ তুলে তাকাল।

"আপনি মিঃ স্মিথ?"

"ইংলণ্ডে আমি মিঃ স্মিথ। আমার বয়স যখন তোমার মত ছিল তখন আমার নামের বানানটা তুমি যেমন লিখেছ প্রায় সেইরকমই ছিল। তুমি ইংরেজি বানানটাই রপ্ত করো, কেমন?"

আশু সভয়ে নামটা কেটে ফেলতে গিয়ে পেন্সিলটাতে এত জোরে চাপ দিল যে কাগজে একটা ফুঁটো হয়ে গেল।

শিক্ষক ঈষৎ হেসে বললেন, "তোমার ভুলটা শুধরে দেওয়া আমার উচিত হয় নি। আমি বাইরে চলে যাব কি?"

"হাঁ স্যার, তাই করুন।"

"একটু পরেই আমি ফিরে আসব। দয়া করে তোমার গল্প থেকে আমাকে বাদ দিও না। আবার মিঃ স্মিথ সম্পর্কেই লেখ।"

ছবিটার উপর ঝুঁকে শিক্ষক ছুটন্ত বুড়ো লোকটির নাকের উপর এক-জোড়া চশমা এঁকে দিলেন। তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

ছবিটার যা কিছু অশুভ শক্তি সব যেন তার সঙ্গেই চলে গেল। লেখার ব্যাপারে আশু কোনদিনই পোক্ত নয়, কিন্তু এবার কথাগুলি যেন কাগজে লিখবার আগেই তার মাথা থেকে বেরিয়ে আসতে লাগল। তার সর্বশেষ স্কুল-রিপোর্টে বলা হয়েছে, তার মধ্যে কল্পনা-শক্তির অভাব আছে; কিন্তু ছবিটার দিকে তাকিয়ে তার কোন কিছু কল্পনা করার দরকারই হল না। বাসটা সম্পর্কে এবং বাসের লোকজন সম্পর্কে সব কথাই যেন তার জানা। কোন কিছু বানিয়ে লেখার দরকারই হল না; শুধু সে যা জানে তাই লিখে গেল।

মিঃ স্মিথের প্রত্যাশার অনেক আগেই তার লেখা শেষ হয়ে গেল। কিন্তু ছোট ঘরটাতে একলা বসে থাকতে ভাল না লাগায় সে নিজেই দরজাটা খুলে দিল। সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতেই সে শুনতে পেল, স্কুল পরিদর্শনান্তে তার বাবা-মাকে প্রধান শিক্ষকের পড়ার ঘরে অপেক্ষা করতে বলা হচ্ছে। একটা দরজা বন্ধ হয়ে গেল; বাইরের বারান্দায় প্রধান শিক্ষক কাকে যেন কিছু বললেন।

"আমি ভিতরে ঢুকবার আগেই ছেলেটি সম্পর্কে আপনার মতামত বলুন।"

আণ্ডু চুপচাপ দাঁড়িয়ে পড়ল। কোনরকম বিঘ্ন সৃষ্টি করবার সাহস হল না, আবার ছোট ঘরটাতে ফিরে যেতে গিয়ে কোনরকম শব্দ করতেও চাইল না। সে বুঝল, এভাবে ওদের কথাবার্তা শোনা তার উচিত নয়, কিন্তু এতক্ষণে মিঃ স্মিথের মতামত তার কাছে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

মিঃ স্মিথের গলা শোনা গেল। "সে এখনও শেষ করে নি। তাকে একটা গল্প লিখতে দিয়ে এসেছি। কিন্তু আপনাকে বলছি স্যার, যদিও সে একটা শব্দের পর আর একটা শব্দ বসাতে পারে না, তবু তাকে এখানে আনতেই হবে। তাকে আমার চাই।"

"একটি ভবিষ্যৎ গাণিতজ্ঞ বুঝি?"

মিঃ স্মিথ বললেন, "সে প্রতিভা তার আছে। এর মধ্যেই অংকের যে-সব কথা সে বুঝতে পারে তার চাইতে চার বছর বড় অনেক ছেলের পক্ষেই তা বোঝা বেশ শক্ত। তাকে কিছুই শেখানো হয় নি, কিচ্ছু না। এটা একটা অপরাধ। কিন্তু কোন সাহায্য ছাড়াই সে সংখ্যাতত্ব বুঝেছে। কি জানেন স্যার এখানে পঁচিশ বছর ধরে আমি এমন একটি ছেলেরই খোঁজ করছি যে উইন্‌চেস্টার-এর প্রথম বৃত্তিটি জয় করে আনবে।"

প্রধান শিক্ষক বললেন, "উইন্‌চেস্টার পরীক্ষার্থীদের নিয়ে আপনি তো আগাগোড়াই ভাল ফল দেখিয়েছেন। গত বছরই তো তৃতীয় স্থান পেয়েছে, আর তার কিছু আগেই পঞ্চম স্থান।"

"কিন্তু প্রথম স্থান তো পায় নি। সেকথা থাক। এতদিনে সেই ছেলেটিকে আমি পেয়েছি।"

"সাত বছর বয়সেই সে বিষয়ে আপনি নিশ্চিত হতে পারেন না।"

মিঃ স্মিথ বললেন, "ইতিমধ্যেই আমাদের মধ্যে একটা বোঝাপড়া হয়েছে। একটা অনুভূতি। আমরা পরস্পরকে কথা দিয়েছি। সে নিজেকে আমার হাতে সঁপে দেবে, আর আমি তাকে দেব উইন্‌চেস্টার বৃত্তি। তালিকার একেবারে শীর্ষ স্থানটি।"

"বলেন কি মশায়!" প্রধান শিক্ষকের কণ্ঠস্বরের বিরক্তিতে আণ্ডু অস্বস্তি বোধ করল। কিন্তু এখন তার পক্ষে সেখান থেকে সরে যাওয়া অসম্ভব। "আপনি নিশ্চয় ছেলেটিকে এসব কথা বলেন নি? আর তাকে যদি কথা দিয়েও থাকেন তাহলেও সে কথা দ্বিতীয়বার উচ্চারণ করবেন না। এ ধরনের কথা আপনি আমাকে দিতে পারেন।"

"ঠিকই বলেছেন স্যার।"

জানালা দিয়ে একঝলক বাতাস এসে নীচের ঘরের দরজাটাকে সশব্দে বন্ধ করে দিল। মুহূর্তের জন্য আণ্ডু চমকে উঠল; তারপরই যেন এইমাত্র

চেয়ার ছেড়ে উঠে এসেছে এমনিভাবে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে গেল। তাকে দেখে মিঃ স্মিথ একটুও অবাক হলেন না।

"শেষ করেছ? এস আমার সঙ্গে।" মিঃ স্মিথ তাকে নিয়ে প্রধান শিক্ষকের পড়ার ঘরে ঢুকলেন। মিঃ ও মিসেস স্টার্লিং সেখানেই বসেছিলেন। শিক্ষক বললেন, "আণ্ডুকে তার গল্পটা জোরে জোরে পড়ে শোনাতে বলব কি? তাহলে বানানে ভুল থাকলেও সেটা কেউ জানতে পারবে না।"

এই দয়াটুকুর জন্য আণ্ডু খুব কৃতজ্ঞ বোধ করল। বড়রা যাতে তার গল্পের বিষয়বস্তুটা বুঝতে পারে। সেজন্য ছবিটা সকলকে দেখানো হল। তারপরই আণ্ডু পরিষ্কার জোর গলায় পড়তে শুরু করল।

"বাসের ড্রাইভার যাত্রা শুরু করতে প্রস্তুত। তার নাম জ্যাক। স্ত্রী অসুস্থ থাকায় সে খুব চিন্তিত পিছনের আসনে দুজন বসে আছে। মিঃ জোন্স মোটর বাইকের দোকানে গিয়েছিল, কিন্তু সেখানে বাইকটা খারাপ হওয়ায় তাকে বাসে চেপে বাড়ি ফিরতে হচ্ছে মিসেস হল বাজার করতে বেরিয়েছে। গরমে তার খুব কষ্ট হচ্ছে, কারণ মহিলাটি খুব মোটা। বাসের মধ্যে আরও একজন কেউ আছে, কিন্তু অন্যদিকে বসার জন্য তাকে ছবিতে দেখা যাচ্ছে না। মিঃ পারকিন্স সবে বাসে উঠতে যাচ্ছে। সে ফুটবল খেলতে গিয়েছিল। সেখানে লড়াই বেঁধেছিল। এখন বাড়ি যেতে পেরে সে খুব খুশি। মিঃ স্মিথ বাসটা ধরার জন্য ছুটছেন। তিনি খুব বৃদ্ধ, তাই জোরে ছুটতে পারেন না। সকলে বসতেই ড্রাইভার বাসটা ছেড়ে দিল। বাসে একটা দুর্ঘটনা ঘটবে, কিন্তু সেটা এখনও কেউ জানে না। যাত্রার শেষে বাসের সব লোকই মারা গেল।"

নিজের লেখাটা নিয়ে সে বেশ খুশি, কিন্তু সকলকে চুপ করে থাকতে দেখে কেমন যেন ঘাবড়ে গেল, মনে হল সে বুঝি অন্যায় কিছু করে বসেছে। মা ও বাবা চিন্তিতভাবে দৃষ্টি-বিনিময় করলেন, প্রধান শিক্ষক অবাক দৃষ্টিতে মিঃ স্মিথের দিকে তাকালেন।

বললেন, "আপনি বলেছিলেন যে ছেলেটির লেখার কোন ক্ষমতা নেই।

"আণ্ডু নিজে আমাকে যা বলেছে আমি আপনাকে তাই বলেছি। এ লেখাটা তো তখন দেখি নি।"

প্রধান শিক্ষক তবু মাথা নাড়তে লাগলেন। তারপর উজ্জ্বল চোখে আণ্ডুর বাবা-মার দিকে তাকালেন।

"মিঃ স্টার্লিং, মিসেস স্টার্লিং, লেখাটা বেশ ভাল হয়েছে। বেশ আনন্দের সঙ্গেই আমরা সেপ্টেম্বর মাসে আপনাদের ছেলেকে এখানে নিয়ে নেব। এখনও যদি কোন পাবলিক স্কুলে তার নাম না লিখিয়ে থাকেন তাহলে অচিরেই সেটা করে ফেলুন।"

মিঃ স্মিথ বললেন, "আপনাদের যেখানে খুশি তার নামটা লিখিয়ে

রাখুন। কিন্তু তেরো বছর বয়স হলে আমি তাকে উইন্‌চেস্টারেই পাঠাব।"

মুহূর্তের জন্য প্রধান শিক্ষককে বিরক্ত মনে হল।

"দেখুন মিঃ স্মিথ, আপনার কথাটা যেন স্মরণ থাকে।"

প্রধান শিক্ষককে জবাবটা দিলেও মিঃ স্মিথ আণ্ডুর দিকে তাকিয়েই স্মিত হাসি হাসলেন।

বললেন, "নিশ্চয়, নিশ্চয় স্যার। আমি সব সময়ই কথা রাখি।"

আণ্ডু যেদিন প্রথম "হাই হিথ"-এ ঢুকেছিল নবাগত ছাত্র হিসাবে তার পাঁচ বছর পরে খ্রীস্টমাস টার্মের শেষ দিনে বিদায়ী ছাত্রদের সম্মানে প্রধান শিক্ষক একটি ভোজসভার আয়োজন করেছেন। ডিসেম্বর মাসেই পাবলিক স্কুলগুলি তাদের অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজের প্রার্থীদের বিদায়-সম্ভাষণ জানায়, আর তার ফলে জানুয়ারী মাসেই প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে আগত নতুন ছাত্রদের তারা ভর্তি করতে পারে।

এ বছর যে তেরোটি ছাত্র "হাই হিথ" ছেড়ে যাচ্ছে তাদের মধ্যে ন'জন বিভিন্ন স্কুলের বৃত্তি বা সম্মান-পদক লাভ করেছে, কিন্তু আণ্ডুই হয়েছে সেরা বীর। আগেকার মে মাসে উইন্‌চেস্টার নির্বাচনে বৃত্তিপ্রাপ্ত ছেলেদের তালিকায় সেই শীর্ষস্থান অধিকার করেছে। প্রধান শিক্ষক তার সঙ্গে কর-মর্দন করেছেন, বাবা হিসাব করেছেন বৃত্তির দরুণ কত টাকা পাওযা যাবে; তাকে একটা নতুন বাইসাইকলও কিনে দিয়েছেন, আর মিঃ স্মিথ আনন্দে কাঁদতে কাঁদতে তার দুই গালে চুমো খেয়েছেন।

আণ্ডু অবশ্য চোখের জল বা চুম্বন কোনটাতেই বিব্রত বোধ করে নি, অবশ্য অন্য কেউ এ কাজ করলে সে খুবই বিব্রত হত। মিঃ স্মিথের সঙ্গে তার সম্পর্কটাই অন্য রকম। পরীক্ষার আগের বছর থেকেই ছোট লাইব্রেরি ঘরটাতে বসে দুজনে লেখা পড়া করেছে। সেই সময় আণ্ডু যেন অনুভব করত, শিক্ষকের সব জ্ঞান আপনা থেকে তার মাথায় ঢুকে যাচ্ছে, তাকে কোন রকম চেষ্টাই করতে হচ্ছে না। ততদিন সে আরও বুঝে নিয়েছে যে উইন্‌চেস্টারকে কেন্দ্র করে যে স্বপ্ন মিঃ স্মিথ এতকাল দেখে এসেছেন তাকে পূর্ণ করার শেষ সুযোগটি এনে দিয়েছে সে নিজে। সেকেণ্ড মাস্টারটি ইতি-মধ্যেই অবসর গ্রহণের বয়স পার হযে গেছেন। লোকে বলে, তার বয়স প্রায় সত্তর বছর; কাজেই এটা নিশ্চিত যে সেপ্টেম্বরের পরে তিনি আর এ-স্কুলে ফিরছেন না। জুলাই মাসের পুরস্কার-বিতরণী সভায় তাকে একটা জটিল দেয়াল-ঘড়ি উপহার দেওয়া হয়েছে। ঘড়িটার যন্ত্রপাতি সব দেখা যায়। পঁচিশ বছর ধরে যেসব ছাত্রদের তিনি পড়িয়েছেন তারাও এসে তার সঙ্গে কর-মর্দন করে গেছে।

অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে তাতে মিঃ স্মিথ এমনিতেই সেপ্টেম্বরে আর "হাই

হিথ''-এ ফিরে আসতে পারতেন না। অগস্ট মাসে তার একটা "স্ট্রোক" হয়ে গেছে ; নভেম্বর মাসের শেষে আর একটা। বিদায়ী ছাত্রদের ভোজ-সভায় প্রধান শিক্ষক তো বলেই ফেললেন যে এক ঘণ্টা আগে হাসপাতাল থেকে খবর এসেছে মিঃ স্মিথের "অবস্থা খারাপ।" আণ্ড কথাটার অর্থ ঠিক বুঝতে পারল না, তবু স্থির করল যে বড়দিনের ছুটিতে প্রাক্তন শিক্ষকের সঙ্গে দেখা করতে যাবে।

ভোজসভার জন্য স্কুল থেকে বের হতে আণ্ডর কিছুটা দেরি হয়ে গেল। চৌমাথার মোড়ে পৌছেই দেখতে পেল, একটা বাস "স্টপ" থেকে ছেড়ে চলে গেল। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। মা বলেছিল, গাড়ি নিয়ে এসে তার সঙ্গে দেখা করবে। মা তো জানতই, স্কুলের শেষ দিনে আণ্ড অনেক জুতো, বই, ও বড়দিনের পুরস্কার পাবে। কিন্তু ভোজসভা ঠিক কখন শেষ হবে জানত না বলে সে মার প্রস্তাবটা ফিরিয়ে দিয়েছিল। এখন তার মনে হল, প্রস্তাবটা গ্রহণ করলেই ভাল করত।

বাস চলে আধঘণ্টা পর-পর। এদিকে বৃষ্টি পড়তে শুরু করেছে। খোলা জায়গায় দাঁড়িয়ে কাঁপার চাইতে সে রুটের টার্মিনাস পর্যন্ত সামান্য দূরত্বটুকু হেঁটে গিয়ে পরের বাসটাতে বসে পড়ল। দেখা যাক, কতক্ষণে বাসটা ছাড়ে।

আটটা নাগাদ ড্রাইভার একটা কাফে থেকে বেরিয়ে এল একটা টেলিফোন করতে সেখানে গিয়েছিল। এসেই সে সঙ্গে সঙ্গে বাসটা ছেড়ে দিল। বাসটা যেন আগের তুলনায় একটু বেশী ঝাঁকুনি দিচ্ছে।

ড্রাইভার আণ্ডকে ভাল করেই চেনে। শুধু প্রতি টার্মের প্রথম সপ্তাহে অথবা বাসে ইন্সপেক্টর উঠলে তবেই সে আণ্ডর সিজন-টিকিটটা একবার দেখতে চায়। কিন্তু আণ্ড বাসে ঢোকার পরেই যে দুটি যাত্রী উঠেছে তাদের টিকিট কাটতেও সে বাসের পিছন দিকে গেল না দেখে আণ্ড অবাক হয়ে গেল। যাত্রীদের দুজনের মধ্যে মোটা স্ত্রীলোকটির সঙ্গে বড়দিনের কেনাকাটার বোঝা, আর যুবকটির পরনে কালো চামড়ার স্যুট, মাথায় হলুদ শিরস্ত্রাণ। যাইহোক, সেটা আণ্ডর কোন ব্যাপারই নয়।

বোঝা গেল, আজ ড্রাইভারের খুব তাড়া আছে। প্রতিটি বাধ্যতামূলক বাস-স্টপে গাড়ির গতি মন্থর করলেও নিয়মমাফিক একেবারে থামাচ্ছে না। সে যেন ধরেই নিয়েছে, কোন যাত্রী যখন নামবার জন্য অপেক্ষা করে নেই তখন কেউই সে স্টপে নামছে না তাতে আণ্ডরই ভাল। সেও চায় তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে। কিন্তু এ অবস্থায় একটি যাত্রীকে লাফিয়ে বাসে উঠতে দেখে সে অবাক হয়ে গেল। আঠারো বছর বয়সের একটি যুবক ; মাথায় পশমের টুপি, পরনের স্থানীয় ফুটবল ক্লাবের জার্সিতে একটা ছোট গোলাপের ছবি আঁটা। যুবকটি প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে আছে। সে টিকিট চাইল না, ড্রাইভারও তার দিকে নজর দিল না। ধীরে ধীরে হেঁটে সে বাসের

পিছন দিকে চলে গেল।

তাকে দেখে আশু কেমন যেন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল। লোকটিকে পরিচিত মনে হচ্ছে, কিন্তু কোথায় পরিচয় হয়েছে প্রথমে সেটা বুঝতেই পারল না।

তারপরেই মনে পড়ে গেল। হঠাৎ তার শিরায় শিরায় রক্ত বুঝি জমাট বেঁধে গেল। আসন থেকে উঠে দাঁড়িয়ে সে ঘুরে বাসের পিছন দিকে তাকাল। তিনটি যাত্রী সামনের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে পাশাপাশি বসে আছে ; কেউ কিছুই বলছে না : স্ত্রীলোকটির হাতে বাজারের ঝুড়ি, যুবকটিকে ঘিরে ফুটবলের গল্প, পুরুষটির মাথায় শিরস্ত্রাণ।

যে আয়নাটার মধ্যে যাত্রীদের দেখা যায় সেদিকে চোখ রেখে ড্রাইভার বলল, "বসে পড। তোমার স্টপ এখনও আসে নি।"

কিন্তু আশু নড়তেই পারছে না। ভর্তি-পরীক্ষার পর থেকে বিগত পাঁচ বছরের মধ্যে বাসের সেই ছবিটা এবং ছবিটা দেখে তার ভয়ের কথা সে সম্পূর্ণ ভুলেই গিয়েছিল। সেই ভয়টা আবার ফিরে এসেছে—আগের চাইতেও তীব্রতর হয়ে, কারণ আগে তো ভয়ের কারণটা সে জানত না। আজ জেনেছে। এই বাসটিতেই দুর্ঘটনা ঘটবে।

এই পূর্বাভাষ ছাড়াই কিন্তু বিপদের সম্ভাবনাটা সে হয় তো অনুমান করতে পারত। ড্রাইভার অত্যন্ত দ্রুত বাস চালাচ্ছিল, যে কোন মোড়ে পৌছে বাসটাকে যেন ঝড়ের বেগে ঘুরিয়ে নিচ্ছিল, ব্রেক না কসেই সামনের গাড়ির পিছনে পৌছে যাচ্ছিল। আশুর গলা শুকিয়ে আসছে, তবু সে নিজেকে সংযত করে রাখল। বাসের ছবিটাতে তার বয়সের কোন ছেলে ছিল না। আর সেখানে ছিল একটি বুড়ো মানুষ। যতক্ষণ না বুড়ো লোকটি এসে তার জায়গায় দাঁড়াচ্ছে ততক্ষণ কোন বিপদ ঘটতে পারে না। এখনও আসন্ন বিপদ থেকে পালাবার সময় আছে।

এক পা এগিয়ে আশু বলল, "আমি এখানেই নেমে যাব।" সামনেই একটা অনুরোধের বাস-স্টপ, কিন্তু ড্রাইভার এত জোরে বাসটা চালাচ্ছে যে সেখানে থামাতেই পারল না ; আর সে চেষ্টাও করল না।

মুখে বলল, "যেখানে সাধারণত নেমে থাক সে স্টপটা কি দোষ করল ? আমরা তো প্রায় সেখানে এসে পড়েছি।"

সামনেই একটা বড় চৌমাথা। সেখানে পৌছতেই ট্র্যাফিকের লাল আলো জ্বলে উঠল। কি যেন বিড়বিড় করে ড্রাইভার বাসটা থামিয়ে দিল। এই মোড়টা তাদের বাড়ি থেকে বাস-স্টপের তুলনায় কাছে হলেও অত্যধিক ভিড়ের জন্য আশুকে কঠোরভাবে নিষেধ করে দেওয়া হয়েছে—সে যেন কখনও এখানে বাস থেকে না নামে। মনের মধ্যে যথেষ্ট উদ্বেগ থাকা সত্ত্বেও গুরুজনের কথা মেনে চলার অভ্যাসবশত সে একমুহূর্ত থমকে দাঁড়াল। কিন্তু

তখনই সহসা তার মনে হল যে এই চৌ-মাথায়ই দুর্ঘটনাটা ঘটবে। এমনিতেই তো ড্রাইভারটিকে অস্বাভাবিক রকমের অধৈর্য মনে হচ্ছে ; হলুদ আলো দেখা মাত্রই সে বাস ছেড়ে দেবে, আর অন্য রাস্তা ধরে আসতে আসতে অন্য কোন গাড়ি হয়তো ভাববে যে লাল আলোটা থাকতে থাকতেই সে চৌমাথাটা পার হয়ে যেতে পারবে।

সামনে একটু ঝুঁকে আণ্ড, ভাল করে দেখে নিতে চাইল বাঁ দিক থেকে কোন গাড়ি আসছে কি না। কিন্তু সেটা করবার আগেই তার চোখটা এক জায়গায় আটকে গেল। চৌমাথার ও-পার থেকে একটি বুড়ো মানুষ বাস-স্টপের দিকে ছুটে আসছে ; বুড়োর স্কার্ফটা উড়ছে, নাকের উপর সোনালী ফ্রেমের চশমা ; হাত নেড়ে বাসটাকে থামাতে বলছে। লোকটি মিঃ স্মিথ।

এই দুর্ঘটনার একমাত্র সাক্ষী আগাগোড়াই বলল যে বাসের প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়েই ছেলেটি চীৎকার করে উঠেছিল ; কিন্তু মুহূর্ত পরেই সে বাস থেকে লাফিয়ে নেমে পড়ল, আর ঠিক সেইক্ষণেই একটা ট্যাক্সি এসে তাকে চাপা দিল ; কিন্তু কেন যে এরকমটা ঘটল তা কেউ বলতে পারল না। আঘাতের সঙ্গে সঙ্গেই আণ্ডর মৃত্যু ঘটে নি ; সেইমুহূর্তে নিজের মাথার মধ্যে একটা গর্জন ছাড়া আর কোন শব্দই সে শুনতে পায় নি। শুধু আবছাভাবে তার মনে পড়ে, ট্যাক্সি ড্রাইভার সভয়ে তার উপর ঝুঁকে দাঁড়িয়েছিল, আর বাস-ড্রাইভারটি তীব্র দুঃখে হাতের ড্রাইভিং-হুইলের উপরেই মারা গিয়েছিল। তারপরেই পিছনের সিট থেকে উঠে তিনটি যাত্রী সার বেঁধে নীরবে বাস থেকে বেরিয়ে এসে অর্ধচন্দ্রাকারে তাকে ঘিরে দাঁড়াল। অন্য দিক থেকে ছুটে এসে মিঃ স্মিথ তাদের সঙ্গে যোগ দিলেন। তার মুখটা চোখের জলে ভেসে যাচ্ছে।

তিনি বললেন, "ঐ বোর্ডে তোমার নাম সোনার অক্ষরে লেখা থাকবে। আমি কথা দিলাম।"

আণ্ড কথাগুলি শুনল। দুই গালে দুটি চুম্বনের স্পর্শও অনুভব করল। তারপরই মিঃ স্মিথ তাকে তুলে নিয়ে কোথায় চলে গেলেন।

The Boy on the Bus—Margaret Potter

চোখের আড়াল তো জীবনের আড়াল

ঘটনাটি কি ? আসলে ব্যাপারটাই বা কি ? ওটা কি বিভিন্ন ঘটনার সঙ্গে এমন একটি ছোট মেয়ের আকস্মিক যোগাযোগ যে বড় বড় গল্প ফাঁদার লোভ সামলাতে পারে নি—না কি অন্য কিছু—একটা ব্যাখ্যাতীত, রহস্যময় এবং বিচিত্র হতেও বিচিত্রতর কিছু ?

কিন্তু সে যাই হোক এখন আর তাতে কিছু যায় আসে না। এত বছর পরেও এখন আর আমার তাতে কিছুই যায় আসে না। কেবল ব্যাপারটাকে ভুলতে পারি না। মাথার উপর অনবরত এরোপ্লেন উড়তে থাকলে ভুলতে পারিই বা কেমন করে? যতবার ঐ গর্জন কানে আসে ততবারই সে আতংকের কথা মনে পড়ে যায়, আর সারা শরীর ঘামে ভিজে ওঠে। মনের কানে সে গর্জন প্রবল থেকে প্রবলতর হতে থাকে—তারপর থেমে যায়—আর তারপরই সেই সর্বধ্বংসী আঘাত—ইট, পাথর ও কাঁচ ভেঙে পড়ছে, অনেক কণ্ঠের আর্তনাদ হচ্ছে, আর সে আর্তনাদ শুনতে পাচ্ছি শুধু আমি, মনের কোন রহস্যময় কানে।

অথচ পুরো ব্যাপারটাই আরম্ভ হয়েছিল কেমন একটা তুচ্ছ ও অর্থহীন ভাবে, নেহাৎই একটা পেরাম্বুলেটারকে কেন্দ্র করে।

একদিন জেনি ও আমি দোকান থেকে ফিরছিলাম। হঠাৎ সে আমার হাতটা চেপে ধরে আঙুল বাড়িয়ে রাস্তার ওপারটা দেখাল।

"মামি, ওই প্রামটাকে দেখ।"

তাকিয়ে দেখলাম, আমাদের প্রতিবেশী মিসেস বার্নেস বাচ্চাসহ তার পেরাম্বুলেটারটা ঠেলতে ঠেলতে বাজারের দিকেই যাচ্ছে।

বললাম, "দেখার কি আছে? মিসেস বার্নেসের প্রামটা তুমি তো আগেও দেখেছ।"

"কিন্তু মিসেস বার্নেস সেটাকে ঠেলছেন না এরকম অবস্থায় তো কখনও দেখি নি," জেনি বলল।

অপস্রিয়মান মূর্তিটার দিকে তাকিয়ে বললাম, "কি বলছ তুমি?" ঐ তো মিসেস বার্নেস; তার ঘোড়ার লেজের চুলের গুচ্ছ বাতাসে উড়ছে, ট্রাউজার-পরা পা দুটি দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে।

জেনি বলল, "দেখতে পাচ্ছ না? মিসেস বার্নেস তো নেই। প্রামটা আপনা থেকেই চলেছে।"

"বোকার মত কথা বলো না সোনা।" মনের বিরক্তিটাকে কোনরকমে চেপে গেলাম। আজকাল জেনির মন-মেজাজ ভাল নয়। সে আমাদের একমাত্র সন্তান, ঘনিষ্ট বন্ধুবান্ধবও নেই, ফলে তার ছুটির দিনগুলো বড়ই একঘেয়ে লাগে। সকালে তাকে সঙ্গে নিয়েই বাজারে যাই, কাফেতে নিয়ে আইসক্রিম খাওয়াই, হাতে সময় থাকলে বিকেলে তার সঙ্গে খেলাধূলাও করি; কিন্তু সেটা তার পক্ষে যথেষ্ট নয়। জেনি অত্যন্ত চটপটে ও কল্পনা-প্রবণ। এরকম শান্তশিষ্ট জীবন তার ভাল লাগে না। মাঝে মাঝেই ক্লান্তিকর ও বিরক্তিকর কথাবার্তা বলে।

সেদিন সকালেই তার বাবার শার্টের ব্যাপার নিয়ে আমাকে একেবারে নাজেহাল করে ছেড়েছে। "কাজে যাবার সময় বাপি কেন একটা সবুজ শার্ট

পরে গেল ?"

"সবুজ শার্ট তো পরে নি। যথারীতি সাদা শার্ট পরেই তো গেছে।"

"না তো, বাপি সবুজ শার্ট পরে গেছে।"

"তার সবুজ শার্টই নেই।"

"নিশ্চয় আছে, না থাকলে পরল কেমন করে? কেন সে সবুজ শার্ট পরল ?"

প্রায় এক ঘণ্টা ধরে এই চলল। এখন আবার এই প্রাম নিয়ে পড়েছে। বলল, "মোটেই বোকার মত কথা বলছি না। প্রামটা আপনা থেকেই চলছিল। তা না হলে তোমাকে দেখতে বলব কেন ?"

"আমাকে বোকা বানাবার জন্য, বাঁদর কোথাকার।"

"সত্যি বলছি মামি। কেউ ওটাকে ঠেলছিল না।"

"রোজকার মতই মিসেস বার্নেসই ওটাকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছিলেন।"

"মোটেই না। হয় তো প্রামটাতে মোটর লাগানো আছে। তাহলেও স্টিয়ারিং কে ধরল? বাচ্চাটা? বুঝেছি—ওটা নিশ্চয় কম্পিউটার-চালিত প্রাম। বাচ্চাটাকে দোকানে নিয়ে যাবার মত নির্দেশ দিয়ে দাও, বাস, প্রামটা চলতে শুরু করে দেয়।"

তার এই বকবকানি চলতেই লাগল। শেষ পর্যন্ত আমি বললাম: "খুব হয়েছে জেনি, এবার একটু থাম। তুমি ভাল করেই জান যে মিসেস বার্নেস ওখানেই ছিলেন।"

সতর্ক চোখ তুলে জেনি আমার দিকে তাকাল। "তুমি নিজের কথাই বলে যাচ্ছ মামি, তাই না? যেহেতু সকালে আমি ভেবেছিলাম যে বাপির শার্টের ব্যাপারে তুমি ধোঁকা দিয়েছিলে, তাই এখন তুমি ভাবছ যে আমি তোমাকে ধোঁকা দিচ্ছি। ও. কে.—সন্ধি। আমি মেনে নিচ্ছি যে সকালে আমি তোমাকে ধোঁকা দিয়েছিলাম। বাপি সবুজ শার্ট পড়ে নি। এবার তুমি তাহলে মেনে নিচ্ছ যে মিসেস বার্নেস প্রামের সঙ্গে ছিলেন না ?"

"মিসেস বার্নেস অবশ্যই ছিলেন।"

জেনি তবু বলল, "প্রামটা আপনা থেকেই যাচ্ছিল। বেশ তো, আমি জানালায় বসে থাকছি, ওটা যখন ফিরে যাবে তখন ভাল করে দেখব। এখানে এলেই তোমাকে ডাকব। "জেনি জানালার গোবরাটে উঠে বসল, আমিও লাঞ্চ তৈরি করতে রান্নাঘরে চলে গেলাম। কাজের চাপে একসময় জেনি ও তার স্বয়ংচালিত প্রামের কথা ভুলেই গেলাম।

বেলা একটায় লাঞ্চ প্রস্তুত। জেনি তখনও গোবরাটে বসে আছে। ডেকে বললাম, "এস, খেয়ে নাও।"

কাছে এসে জেনি বলল, "এখনও তো ফিরল না ?"

"কে ফিরল না ?"

"প্রামটা। ওটা বোধ হয় পথ হারিয়ে ফেলেছে ?"

"তাহলে তো মিসেস বার্নেস ওটাকে খুঁজতে বেরিয়েছেন।" আমার গলায় ঠাট্টার স্বর।

"না তো।" জেনি বলল। "আমি তাদের দরজায়ও নজর রেখেছিলাম। তিনি বাড়ি থেকেই বের হন নি। তাহলে লাঞ্চের সময়ও ওটা ফিরল না কেন তা তো বুঝতে পারছি না।"

"আমার তো মনে হয় তিনি বাচ্চাকে নিয়ে কোন বন্ধুর বাড়িতে লাঞ্চ খেতে গেছেন।"

"আমার কথা তুমি এখনও বিশ্বাস করছ না ? না কি বিশ্বাস না করার ভান করছ ? এটা কিন্তু খুব খারাপ। আমি তো শার্টের ব্যাপারটা মেনে নিয়েছি।"

"আচ্ছা, এটা নিয়ে তুমি একটা গল্প লেখ না কেন ?—'যে প্রাম নিজে-নিজে চলে।'"

"গল্প লিখব না কারণ এটা গল্প নয়! এটা সত্যি!"

সেদিন সন্ধ্যা। জেনি শুয়ে পড়েছে। আমার স্বামী হ্যারল্ড বলল : জেনির সামনে কথাটা বলি নি, কিন্তু একটা খুব খারাপ খবর আছে। রাস্তার ওপারের সেই সুন্দরী তরুণী মিসেস বার্নেসকে তো তুমি চেন ?'

"তা আর চিনি না!" এই একদিনে তার কথা কতবার যে শুনলাম।"

"কি জান, আজ সকালে হাই স্ট্রীটে তিনি গাড়ি-চাপা পড়েছেন। শুনলাম রাস্তাটা পার হয়ে সবে প্রামটাকে ওদিকের ফুটপাতে তুলবেন এমন সময় সেটা যেন কিসে আটকে যায়, আর ভদ্রমহিলা তখনও রাস্তায়ই দাঁড়িয়ে। একটা মোটর ছুটে আসছিল ; ঠিক সময় গাড়িটা থামতে পারে নি, আর বেচারি সঙ্গে সঙ্গেই মারা যায—প্রায় মারা যাবার দাখিল। অ্যাম্বুলেন্স যখন এল তখন তিনি মৃত।"

আমার তো জমে যাবার অবস্থা। "তাহলে এই জন্যই তিনি দোকান থেকে ফিরে আসেন নি। জেনি সারাক্ষণ পথের দিকে তাকিয়েছিল। ওঃ, কী ভয়ংকর ঘটনা। আর বাচ্চাটার কি হল ?"

"সে সম্পূর্ণ নিরাপদ। একটা আঁচড়ও লাগে নি। তুমি বললে না জেনি তার জন্য পথের দিকে তাকিয়েছিল ? কেন বলতো ?"

প্রামঘটিত জেনির কাহিনীটা তাকে বললাম ; তারপর বললাম, "আমার মনে হয়, মৃত্যু-সংবাদটা ওকে জানানো দরকার। তুমি কি মনে কর ও খুব ভেঙে পড়বে ?"

"ভবিষ্যতে মানুষকে নিয়ে বাজে ঠাট্টা না করার শিক্ষাটা হয় তো এর থেকে সে পাবে।" হ্যারল্ড বলল।

"এটা ঠিক হল না। ও কেমন করে জানবে ? না, ওকে বলে কাজ নেই।"

পরদিনও তাকে খবরটা জানাতে দেরি করলাম। হয়তো এটা বোকামি, তবু তো লোকে নিজের সন্তানকে কঠোর বাস্তবের হাত থেকে দূরেই রাখতে চেষ্টা করে। কিন্তু কথাটা বেশীক্ষণ চেপে রাখা গেল না। দোকান থেকে ফিরবার পথে জেনি বলল, "কাল প্রামটা নিরাপদে ফিরেছে কি না কে জানে।" অগত্যা তাকে খবরটা বললাম।

"তোমার মনে আছে সোনা, কাল মিসেস বার্নেসকে বাজারে যেতে দেখেছিলাম? না—বাধা দিওনা—ব্যাপারটা গুরুতর। হাই স্ট্রীটে তিনি একটা মোটব দুর্ঘটনায় পড়েছিলেন। বাচ্চাটা নিরাপদেই আছে, কিন্তু মিসেস বার্নেস মারা গেছেন।"

"মারা গেছেন!"

"হ্যাঁ জেন। খবরটা খুবই দুঃখের, কিন্তু সত্যি।"

"ঠিক কি ঘটেছিল?"

দুর্ঘটনার যে বিবরণ হ্যারল্ড আমাকে শুনিয়েছিল সেটাই বললাম। গভীর আগ্রহে জেনি সব শুনল। তারপর শান্ত গলায় বলল, "নিশ্চয় তিনি আগেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে হাই স্ট্রীটে প্রামটার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। কিছুতেই তিনি প্রামটা নিয়ে বের হন নি।"

আমি আর কিছু বললাম না। প্রতিবেশিনীর মৃত্যু-সংবাদে সে যে বড় একটা ভেঙে পড়ল না তাতেই আমি স্বস্তি বোধ করলাম। তারপর বেশকিছু দিন জেনিও আর মিসেস বার্নেস বা প্রামটার কথা উল্লেখই করল না।

কয়েক সপ্তাহ পরেই সে স্কুলে ফিরে গেল, আর টার্মের মাঝামাঝি সময়ে একটা কাণ্ড বাধিয়ে বসল। নেহাৎই ছেলেমানুষী দুষ্টুমি: একজন শিক্ষিকার মাকড়শাকে খুব ভয়; জেনি তার ডেস্কের মধ্যেই একটা মাকড়শা রেখে দিয়েছিল, আর তিনিও হেডকে রিপোর্ট করে দিলেন। লাঞ্চে বাড়িতে এসে জেনি বলল, প্রধানা শিক্ষিকা মিস প্রেট্রেল চারটের সময় জেনিকে তার সঙ্গে দেখা করতে বলেছেন। "কাজেই বাড়ি ফিরতে আমার দেরি হবে মামি। জানিনা কতক্ষণ তিনি আমাকে আটক রাখবেন। সাধারণত বিশ মিনিটের মত হয়, তবে বেশীও হতে পারে।"

যাইহোক, বিকেলে স্কুল থেকে ফিরতে তার বেশী বিলম্ব হল না। বললাম, "মিস পেট্রেল তো তোমাকে বেশীক্ষণ আটকে রাখেন নি।"

জেনি বলে উঠল, "আঃ, কী সৌভাগ্য! তিনি ছিলেনই না। চারটের সময় তার ঘরে গেলাম। পা কাঁপছে! দরজায় টোকা দিলাম। মনে হল তার গলা শুনলাম, 'ভিতরে এস,' কিন্তু গলাটা তার হতেই পারে না, কারণ ঢুকে দেখলাম ঘরটা খালি। নিশ্চয় আমার কথা বেমালুম ভুলে গেছেন। কী ভাগ্য বল?"

"তোমার অপেক্ষা করা উচিত ছিল। তিনি হয়তো কিছুক্ষণের জন্য বাইরে

গিয়েছিলেন।"

"না তা তিনি করবেন না। কাউকে ধোলাই দেবার সুযোগ তিনি কখনও ছাড়েন না। ধোলাই দিতে খুব ভালবাসেন। আমারই ভাগ্য ভাল বলতে হবে।"

মিস পেট্রেলের ভাগ্যটা কিন্তু খারাপ। পরদিন স্কুলের সেক্রেটারী মিসেস লেনিং-এর সঙ্গে দেখা হল। তাকে খুব উস্কোখুস্কো ও বিচলিত দেখাচ্ছিল। ব্যাপার কি জানতে চাইলাম।

মিসেন লেনিং বললেন, "ব্যাপার একটা আছে। খবরটা এখনও জানা-জানি হয় নি, কিন্তু কাল রাতে মিস পেট্রেল হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন। যে মেয়েটি ঘর-দোর পরিষ্কার করে সে আজ সকালে গিয়ে তাকে মৃত অবস্থায় বিছানায় দেখতে পায়। আসলে আমি ছাড়া আপনার মেয়ে জেনিই শেষ লোক যে তাকে জীবিত দেখেছে।"

"চারটেব সময জেনির তার সঙ্গে দেখা করার কথা ছিল, কিন্তু—"

"ঠিক কথা," মিসেস লেনিং বললেন। "কিন্তু সে ভয়েই পালিযে গেছে, তাই না? আমি তখন আপিসেই ছিলাম, আমার ঘবের দরজাটাও খোলা ছিল। আমি দেখেছি, সে মিস পেট্রেলের দরজায টোকা দিল। হেড-এর গলাও শুনলাম, 'ভিতরে এস', জেনি ভিতবে ঢুকল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই বেরিযে এসে ছুটে চলে গেল। আমি মিস পেট্রেলের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম, তিনি বললেন, জেনি তার দিকে একবার তাকিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেছে। বেচারি মিস পেট্রেল—তিনি বললেন: "আমি কি একটা ড্রাগন যে আমাকে দেখেই বাচ্চারা প্রাণের ভযে পালিযে যায?"

"ওঃ, তাহলে এই ব্যাপার," আমি বললাম।

মিসেস লেনিং বলতে লাগলেন: "তিনি বলেছিলেন খুব ক্লান্ত বোধ করছেন, আর জেনিকে আটকে বেখে বকাঝকা করতে হয নি বলে তিনি স্বস্তিই পেয়েছেন। সত্যি, তাকে খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছিল, কিন্তু তিনি যে অসুস্থ সেটা আমি বুঝতে পারি নি। কি জানেন, বকুনি দেবার জন্য ছেলে-মেয়েদের নামে তার কাছে রিপোর্ট করা হোক এটা তিনি পছন্দ করতেন না। ছোটখাট দুষ্টুমির ব্যাপারগুলো নিজেরা ফযসালা না করে শিক্ষিকারা অনেক সময়ই তা নিয়ে বড় বেশী বাডাবাড়ি করেন। হায়রে, এই করেই তো আমরা তাকে হারালাম।"

তার দুই চোখ জলে ভরে এল, কাঁপা গলায শুধালেন, জেনি কি তাহলে এ ব্যাপারে আপনাকে কিছু বলেছে?"

"বলেছে যে মিস্ পেট্রেল ঘরে ছিলেন না।"

মিসেস লেনিং মাথা নেড়ে বললেন, "দুষ্টু মেয়ে। হেডমিস্ট্রেস অবশ্যই ঘরে ছিলেন। খবরটা শুনে জেনি খুব আঘাত পাবে। সব মেয়েরাই দুঃখ

পাবে। আজ বিকেলেই একটা বিশেষ সভায় সিনিয়র মিস্ট্রেস খবরটা ঘোষণা করবেন।"

সেদিন স্কুল থেকে বাড়ি ফিরে জেনির মুখে কেবল প্রধানা শিক্ষিকার আকস্মিক মৃত্যুর কথাই শোনা গেল। বলল, "তাহলে এই জন্যই তিনি কাল চারটে পর্যন্ত আমার জন্য অপেক্ষা করেন নি। নিশ্চয় অসুস্থ বোধ করার আগেই বাড়ি চলে গিয়েছিলেন।"

"জেনি, লক্ষ্মীটি, দয়া করে মিথ্যা কথা বলো না। কি লাভ তাতে?"

"মিথ্যা? কোন্‌টা মিথ্যা?"

"মিস পেট্রেল তোমার জন্য ঘরেই অপেক্ষা করে ছিলেন। আমি জানি।"

"মামি, তিনি ঘরে ছিলেন না। তোমার তো জানবার কথাও নয়। তুমি সেখানে ছিলে না।"

"আজ সকালে মিসেস লেনিং-এর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে। তিনি আমাকে সব কথাই বলেছেন।"

"কি বলেছেন তিনি?"

"বলেছেন, তুমি মিস পেট্রেলের ঘরে ঢুকেছিলে, আর একবার তার দিকে তাকিয়েই পালিয়ে গিয়েছিলে। অবশ্য তোমাদের হেড তাতে স্বস্তিই পেয়েছিলেন। কাউকে ধোলাই দেওয়াটা তিনি মোটেই ভালবাসেন না।"

"মামি, আমি শপথ করে বলছি, আমি যখন সে ঘরে ঢুকলাম তখন ঘরটা একেবারেই ফাঁকা ছিল।"

"ওঃ, তোমাকে নিয়ে আমি যে কি করি?"

"আমি যা বলি সেটা বিশ্বাস করতে শুরু কর। মিসেস বার্নেসের বেলাতেও এই হয়েছিল। তখনও তুমি আমার কথা বিশ্বাস করো নি; কিন্তু আমি মিথ্যা বলি নি।"

আর তখনই সর্বপ্রথম বুঝতে পারলাম যে একটা অদ্ভুতুড়ে ব্যাপার চলছে। যে দুজনকে অন্য সকলে দেখলেও জেনি দেখতে পায় নি, তারা দুজনই কিছুক্ষণ পরেই মারা গেছে। হয়তো আমার মনের ভাবটা বুঝতে পেরেই জেনি ভয়ার্ত চোখে আমার দিকে তাকাল।

ফিস্‌ফিস্ করে বলল, "ব্যাপারটা খুব অদ্ভুত, তাই না?"

সত্যি অদ্ভুত। হ্যারল্ডকে একলা পেয়ে তার সঙ্গেও এগিয়ে কথা বললাম। সে বলল, "এটা ঘটনার আকস্মিক যোগাযোগ মাত্র। মিসেস বার্নেসের দুর্ঘটনা আর মিস্ পেট্রেলের হৃদ্‌রোগের সঙ্গে জেনির রূপকথার সত্যিকারের যোগসূত্র কি থাকতে পারে?"

এদিক থেকে দেখলে তো সত্যি মনে হয় যে আকস্মিকতার উইয়ের ঢিপি থেকে আমরা মানসিক পাহাড় গড়ে তুলছি। আর সেই সপ্তাহের শেষের

দিকেই যদি আরও কিছু ঘটনা না ঘটত তাহলে হয় তো আমার সব আশংকাকেই অবাস্তব ভেবে উড়িয়ে দিতে পারতাম। ও'ব্রায়েন নামক একজন খুবই সাদামাঠা রেস্তওয়ালা আইরিশ গোয়ালাকে কেন্দ্র করেই ঘটনাটা ঘটল।

সাধারণ ব্যবস্থামতই প্রতি শনিবার সকালে আমি তার টাকা-পয়সা মিটিয়ে দেই এবং তাকে এক কাপ কফি খাওয়াই। সে সময়টা জেনি তার ঘরেই থাকে, সাপ্তাহিক বাড়ির কাজগুলো করে অথবা করার ভান করে। যতসময় পড়াশুনা করে ঠিক ততটা সময়ই স্বপ্ন দেখে কাটায়। জেনি কোন দিনই কঠোর পরিশ্রম করতে পারে না।

সেদিন সকালে ও'ব্রায়েন আমাকে বলল যে শীঘ্রই তার মেয়ের বিয়ে হচ্ছে আর সেই উপলক্ষ্যে সন্ধ্যায় সে একটা ভোজের আয়োজন করেছে। বলল, "এক ফোঁটা দুধও মিলছে না ; খুবই মুস্কিলে পড়েছি।"

সে চলে গেলে জেনি রান্নাঘরে ঢুকে বলল, "এখানে দুধ এল কেমন করে ?"

"গোয়ালাই দিয়ে গেল।"

"কিন্তু সে তো এখানে আসে নি। এলে জানালা থেকে আমি তাকে দেখতে পেতাম।"

'তাহলে তোমার দৃষ্টি এড়িয়েই সে এসেছিল।"

"আমার চোখকে এড়াতে তো সে পারে না ; যখনই সে এপথে আসে তখনই তার সাদা কোটটা সশব্দে পৎপৎ করে উড়তে থাকে।"

"তাহলে দুধটা কেমন করে এখানে এল বলে তোমার ধারণা ? তুমি তো পড়া নিয়েই ব্যস্ত ছিলে।"

জেনি বলল, "আসলে আমি মোটেই পড়ায় ডুবে ছিলাম না। ইতিহাসের পড়ায় কখনও আমার মন বসে না। খুব বিরক্তিকর মনে হয়। যত সব মরা মানুষের কথা। সেসব শিখে কি লাভ ? আমি তো বুঝি না। তারা তো সব শূন্যে মিলিয়ে গেছে। হতে পারে মিঃ ও'ব্রায়েন সামনের পথ দিয়ে না এসে বাড়ির পাশ দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকেছে।"

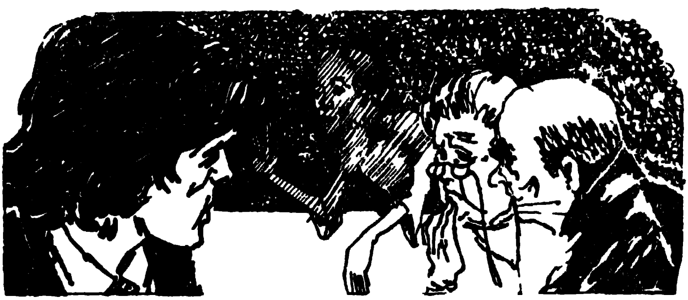
আমি জানি ও'ব্রায়েন সেসব কিছুই করে নি, তবু এ নিয়ে আর ঘাঁটাঘাঁটি করলাম না। জেনির সঙ্গে বাজে বক্‌বক্‌ করা ক্লান্তিকর।

পরদিন রবিবার। দুপুরের আগে দুধ এল না। যে যুবকটি দুধ নিয়ে এসেছিল সে বিলম্বের কারণ ব্যাখ্যা করে বলল : "দুধের ডিপোতে একেবারে নয়-ছয় ব্যাপার। কাল রাতে বেচারি বুড়ো ও'ব্রায়েন মদের দোকানে একটা ঘুসোঘুসিতে জড়িয়ে পড়েছিল। সেখানে একটা ভোজসভা চলছিল।"

"মেয়ের বিয়ের পাকা কথা উপলক্ষ্যে। সে আমাকে বলেছিল। কিন্তু হয়েছিল কি ?"

"কে একজন ফোঁড়ণ কেটেছিল যে ব্যাপারটা একটু তড়িঘড়ি সেরে ফেলা হচ্ছে, কারণ মেয়েটি নাকি বরফের মত সাদা চরিত্রের নয়। তাতেই ও'ব্রায়েনের আইরিশ রক্ত টগবগিয়ে ওঠে; সে লোকটার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। কিন্তু সে তখন আধা মাতাল, তাই সুবিধা করতে পারল না। অপর লোকটি একখানা উড়ন্ত ঝেড়ে দিল, আর সেও ছিটকে পড়ে মাথায় আঘাত পেল একটা টেবিলের কোণায় লেগে। ডাক্তারকে ডাকা হয়েছিল, কিন্তু কোন ফল হয় নি। সে আর নেই।"

"তুমি বলছ—মিঃ ও'ব্রায়েন মারা গেছে?" ঘরটা যেন ঘুরতে লাগল। অনেক দূর থেকে যেন যুবকটির গলা ভেসে এল: "ভাল করে তাকান, শুনছেন—ওঃ, আমি খুবই দুঃখিত। এমন হুট করে কথাটা বলাই আমার



উচিত হয় নি। এক মিনিট চুপ করে বসুন। এখন সুস্থ বোধ করছেন কি?" চোখের সামনে থেকে কুয়াসাটা কেটে গেল, আমার দেহটা অসার, ঘর্মাক্ত, ঠাণ্ডা।

"হঁ্যা, এখন ভাল আছি। আমি দুঃখিত।"

জেনি ঘরে ঢুকল। "হেলো, মিঃ ও'ব্রায়েন কোথায়?"

নতুন লোকটি বলল, "সে কথা তোমার মাই বলবেন। আপাতত তার একটু যত্ন নাও। তার মাথাটা ঘুরে গিয়েছিল।" লোকটি তাড়াতাড়ি কেটে পড়ল।

"কি হয়েছে মামি? তুমি কি অসুস্থ?"

"মদের দোকানে মারামারি করতে গিয়ে মিঃ ও'ব্রায়েন কাল রাতে মারা গেছে।"

জেনির মুখটা সাদা হয়ে গেল। "তাই তাকে আমি দেখতে পাই নি।"

"না সোনা। কাল সকালে সে সম্পূর্ণ সুস্থ ছিল। ঘটনাটা ঘটেছে সন্ধ্যায়।"

জেনি বলল, "কিন্তু সেই কারণেই আমি তাকে সকালে দেখতে পাই নি।

মিস পেট্রেল ও মিসেস বার্নেসের বেলায়ও তাই ঘটেছিল। ও মামি, ব্যাপারটা তো ভারি অদ্ভুত।" ভয়ে তার গলা চড়তে লাগল। আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না। কেন এমনটা ঘটে?"

তাকে ভয় পেতে দেখে আমার ভয়টা আমি চেপে দিলাম। হেসে বললাম, "সবই তোমার কল্পনা মামণি—শুধুই কল্পনা—আমি বলছি, আসলে তার কিছুই ঘটে না।"

কিন্তু হ্যারল্ডের কাছে আমার সংস্কারাচ্ছন্ন আতংককে লুকোতে পারলাম না। সর্বশেষ ঘটনাটা তাকে বললাম। সে বিষণ্ণ হাসি হেসে বলল, "আমাদের জেনি দেখছি সকলের মনোযোগের মধ্যমণি হতে চাইছে। সে চায়, সব আলো তার উপরেই পড়ুক। সে বলতে চায়, তার উপরে কোন কিছুর ভর হয়। তার মনটাই আফিমের ফুল। এখন একমাত্র পথ, এ ধারণাটা তার মাথা থেকে হেসে উড়িয়ে দাও। খেয়াল রেখো, এই সব বড় বড় কথা নিয়ে সে যেন আমার কাছে না আসে।"

হ্যারল্ডের মা প্রায় পঙ্গু। সেদিন সন্ধ্যায় আমরা তাকে দেখতে যাব এ-রকম কথা ছিল। যে বয়স্কা বান্ধবীটির সঙ্গে তিনি থাকেন সেই খবর পাঠিয়েছে "আজ বৃদ্ধার অবস্থা খুব ভাল নয়।" জেনি ফিস্‌ফিসিয়ে বলল, "মামি, ধর আমি যদি তাকে দেখতে না পাই। তার যে কি অর্থ তা তো তুমি বোঝ।" তখনই মনে হল, হ্যারল্ডের কথাই ঠিক। জেনির মনে নাটক করার বাসনা জন্মেছে। সে চায় সব দৃশ্যেরই তারকা হতে। কিন্তু এ তো আগুন নিয়ে খেলা। ধরা যাক, তার ঠাকুমাকে দেখতে গেলে সে যদি বলে তিনি সেখানে নেই ·

অবশ্য সেটা ঘটল না।

দেখাশুনার পাট ভালভাবেই চুকে গেল। বাড়ি ফিরবার পথে জেনি বলল, "ঠাকুমাকে নিয়ে কোনরকম দুশ্চিন্তা করো না বাপি। তার মরতে দেরি আছে।"

"তোমাকে কে বলেছে যে তিনি এখনই মরতে যাচ্ছেন?" হ্যারল্ড বলে উঠল। "মনে রেখো, আমরা সবাই তোমার মতামত শুনবার জন্য হাঁ করে বসে নেই।"

জেনি মুচ্‌কি হাসল। বাবার সঙ্গে তার ব্যবহার খুবই স্বাভাবিক ও শিশুসুলভ। তার যত অর্থপূর্ণ দৃষ্টি ও মারাত্মক ফিস্‌ফিসানি সে আমার জন্য জমিয়ে রাখল।

আমার ভয় কিন্তু গেল না। একটা আসন্ন বিপদের আতংক যেন আমাকে পেয়ে বসল। হ্যারল্ডের সঙ্গে এ নিয়ে কথা বলে কোন লাভ নেই। সবকিছুই সে হেসে উড়িয়ে দেবে। তাই আমাদের বন্ধু যুবক জি. পি.-র সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। তিনটি ঘটনার কথাই তাকে বললাম। সব শুনে তিনি

মুচকি হেসে বললেন :

"আপনার জেনি খুব বুদ্ধিমতী মেয়ে, কিন্তু এখন তার যা বয়স সেটাই একটা গোলকধাঁধা। যৌবন-সন্ধির ঠিক প্রাক্কালে এমন একটা সময় আসে যখন মেয়েদের মাথায় একধরনের পাগলামি দেখা দেয়। তারা তখন শৈশব ও যৌবনের সন্ধিক্ষণে পৌঁছে যায়। তখন তারা এই পৃথিবীর জীব হয়েও যেন পৃথিবীর কেউ নয়। যৌবনের গন্ধময় বাস্তবতাই মানুষকে জীবনের মাটিতে সুপ্রতিষ্ঠিত করে। তার আগে পর্যন্ত তারা যেন আমাদের সঙ্গে থেকেও আমাদের কেউ নয়। এমনিতে সে বেশ সুস্থ তো ?"

"দৈহিক দিক থেকে তো সুস্থই।"

"তার এখন যা বয়স তাতে অস্বাভাবিক হওয়াটাই তো স্বাভাবিক, সে কথা মনে রাখলে বলা যায় সে মানসিক দিক থেকেও সুস্থ। হয়তো এইসব আসন্ন মৃত্যুর এক ধরনের অতীন্দ্রিয় চেতনা তার মধ্যে দেখা দেয়—সে কথা কে বলতে পারে ?—আর তার ফলেই সে বলে যে সংশ্লিষ্ট লোকগুলিকে সে দেখতেই পায় না। এ নিয়ে খুব একটা হৈ-চৈ করবার কিছু নেই। সহজ-ভাবেই এগুলিকে মেনে নিন। তার এই সব কথাবার্তার সঙ্গে বেশী সুর মেলাবেন না, তাহলে ঐদিকে তার ঝোঁক আরও বেড়ে যেতে পারে, আর সেটা বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু সত্যি বলছি, আমি এর মধ্যে খুব চিন্তিত হবার মত কিছু দেখছি না।' তারপর বলুন, এখন কেমন আছেন ? আপনাকে একটু বিবর্ণ দেখাচ্ছে। ভাল ঘুম হচ্ছে তো ?"

"না। সত্যি না। এই ব্যাপারটা মনের উপর চেপে বসে আছে।"

"হুম। প্রাগুষার ক্ষণিক মুহূর্তগুলিতেই অন্ধকার গাঢ়তর হয়ে থাকে। কি বলেন ?"

"ঠিক কথা ডাক্তার, আপনার কথাই ঠিক।"

ঘুমের বড়ির একটা প্রেস্ক্রিপ্‌শন হাতে নিয়ে ডাক্তারের সার্জারি থেকে যখন বেরিয়ে এলাম, তখন নজরে পড়ল আমার কেস-কার্ডে তিনি যেন কি লিখলেন ; অনুমান করলাম, "অতিচিন্তাগ্রস্ত মা : ঘুম হচ্ছে না" এই রকম কিছু লিখলেন।

কয়েক সপ্তাহ আর বিশেষ কিছু ঘটল না। জেনির মাথায় তখন আসন্ন পরীক্ষার দুশ্চিন্তা। পরীক্ষার ব্যাপারে সে খুবই কাঁচা। এই সময়টাতেই অবহেলিত লেখাপড়ার চাপটা বড় বেশী করে তার মাথায় নামে ; হাতে প্রশ্ন-পত্র পেয়ে হয়তো কিছুই লিখতে পারবে না, এই আতংক তাকে পেয়ে বসে।

প্রথম পরীক্ষার দিন সে প্রাতরাশের জন্য নীচেই নামল না। বারকয়েক ডেকেও সাড়া পেলাম না। শেষ পর্যন্ত তার ঘরেই গেলাম। আতংকিত, বিস্ফারিত চোখে সামনের দিকে তাকিয়ে সে বিছানায় বসে আছে।

"লক্ষীটি, এবার উঠে পড় ; নইলে দেরি হয়ে যাবে।"

সে বলল, "আজ স্কুলে যাব না। এখানেই থাকব।"

"তোমার কি অসুখ করেছে?"

"হ্যাঁ মামি। আমি ভয়ংকর অসুস্থ। এত অসুস্থ যে স্কুলে যেতেই পারব না।"

"তাহলে তো ডাক্তারকে খবর দিতে হয়—"

"না! তিনি তো এসে বলবেন, আমার কিছুই হয় নি।"

"সত্যি কি কিছু হয়েছে? দেখ জেন, তোমাকে স্কুলে যেতেই হবে! না যাওয়াটা তো ভীরুতা। পরীক্ষা তোমাকে দিতেই হবে। ওঠ, ওঠ লক্ষ্মী সোনা। আরে, পরীক্ষা তো তুমি আগেও দিয়েছ। এ পরীক্ষাটা যদি খারাপই হয়, তাতে তো পৃথিবী রসাতলে যাবে না। আর শুধু যে তোমার পরীক্ষাই খারাপ হবে তাও তো নয়।"

"পরীক্ষার কথা নয় মামি! পরীক্ষা নিয়ে আমার থোরাই মাথাব্যথা। এটা হল—এটা—ওঃ, মামি, আমি মরতে চাই না!"

"মরবে? তুমি কেন মরতে যাবে? এসব আজে-বাজে কী বলছ?"

"আমি বাড়িতেই নিরাপদে থাকতে চাই—আমাকে থাকতেই হবে—থাকবই—বাইরে গেলেই আমার ভয়ংকর বিপদ—"

"কিসের বিপদ?"

"যেকোন বিপদ হতে পারে—একটা গাড়ি আমাকে চাপা দিতে পারে—আগুন ধরে যেতে পারে—কেউ আক্রমণ করতে পারে—বোমা ফাটতে পারে—যাহোক একটা কিছু ঘটবেই!"

"কাল রাতে কি কোন দুঃস্বপ্ন দেখেছ?"

"হ্যাঁ, দেখেছি—ভয়ংকর সব স্বপ্ন—কিন্তু স্বপ্নের কথা হচ্ছে না—খারাপ স্বপ্ন তো প্রায়ই দেখি। ওঃ মামি, আমাকে বাইরে যেতে বলো না।" সে কাঁদতে লাগল।

তাকে আদর করলাম, সান্ত্বনা দিলাম। ব্যাপার যাই হোক, এ অবস্থায় তাকে কিছুতেই স্কুলে পাঠাতে পারি না। কিন্তু তার কিসের ভয় সেটা তো আমাকে জানতে হবে। তাই বললাম, "কেন তুমি এত ভয় পাচ্ছ সেটা বললে তোমাকে বাড়িতেই থাকতে দেব। নিশ্চয় পরীক্ষার ব্যাপারে—"

"পরীক্ষা তো তুচ্ছ ব্যাপার। কিন্তু আসল কথা বললে তো তুমি বিশ্বাসই করবে না।"

"বলেই দেখ।"

"ঠিক আছে। সকালে ঘুম থেকে উঠেই আয়নায় মুখ দেখলাম।"

তার ছোট্ট মুখখানির দিকে তাকালাম। অশ্রুসিক্ত, বিপর্যস্ত, ফ্যাকাসে মুখ। অস্ফুট গলায় বললাম, "সকালে উঠেই কি সকলের মুখ সৌন্দর্যে ভরে ওঠে?"

আমার ঠাট্টায় সে কান দিল না। "আমার ড্রেসিং টেবিলের ছোট আয়নাটা নিয়ে এস।" আয়নাটা এনে তার হাতে দিলাম। "এবার আমার পিছনে এসে দাঁড়াও," তাই করলাম। সে আয়নাটা সামনে মেলে ধরল ফলে তার মুখ এবং পিছন থেকে আমার মুখও আয়নায় দেখা গেল।

ঠাট্টা করে বললাম, "আহা, কী সুদর্শনা যুগল!"

"যুগল? তুমি কি দেখছ?"

"তোমাকে ও আমাকে।"

সে আয়নাটা ছুঁড়ে ফেলে দিল, "আমি দেখছি শুধু তোমাকে। নিজেকে পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছি না। এর কি অর্থ তা তো তুমি জান!"

বাচ্চাদের সিজোফ্রেনিয়া (Schizophrenia)। কথাটা হঠাৎই মনে এল। বইতে পড়েছি, বেতারেও শুনেছি। এখন ঘরের মধ্যেই দেখছি। কারণ আমার দৃঢ় বিশ্বাস, মেয়ে সত্য কথাই বলছে।

খুশির ভাব দেখিয়ে বললাম, "আর, তোমাব তো ভাগ্য ভাল, কি বল? পরীক্ষার সময় অসুখ করায় তোমার তো ভালই হল। অন্যরা যখন পরীক্ষা দিয়ে মরবে, তুমি ত তখন আরাম করে বিছানায় শুয়ে কাটাবে। শুয়ে পড় সোনা। চাদরটা ভাল করে গুঁজে দিচ্ছি; নিরাপদে আরাম কর। কোন কিছু নিয়ে দুর্ভাবনা করো না।"

"ওঃ, ধন্যবাদ মামি!" জেনি শুয়ে পড়ল; তার গাল বেয়ে তখনও চোখের জল ঝরছে।

নীচে নেমে হ্যারল্ডকে বললাম; কফিতে চুমুক দিতে গিয়েও সে থমকে গেল। "আয়নায় নিজেকে দেখতে পাচ্ছে না? তোমাকে আচ্ছা ধোঁকা দিয়েছে তো!"

বললাম, "ও ঠিক কথাই বলেছে। ভয়ে একেবারে আধমরা হয়ে গেছে। আয়নায় তাকিয়ে নিজের মুখটা দেখতে পাচ্ছে না। হয় তো ভ্রান্তদর্শনের দৃষ্টান্ত—কিন্তু ভাব তো অবস্থাটা কী ভয়াবহ!"

"ও তো সব কিছুই কল্পনা করছে। আমি বাজি ধরে বলতে পারি, পরীক্ষার দিন যা ঘটেছে, স্কুলের উৎসবের দিন সেটা ঘটত না। বুঝলে!"

"আমি ওকে বিশ্বাস করি। ডাক্তারকে রিং করতে যাচ্ছি।"

"এ ব্যাপারে আমাকে ডাকাডাকি করো না," বলে হ্যারল্ড কাজে বেরিয়ে গেল। তাকে আমি ভালবাসি, আবার অনেক সময় ঘৃণাও করি।

ডাক্তার এলেন। জেনি কেঁপে কেঁপে উঠে কাঁদতে কাঁদতে তাকে সব কথা বলল। ডাক্তার মন দিয়ে শুনলেন; মাঝে মাঝে "হু" ও "হ্যাঁ" বললেন; তারপর আমার দিকে মুখ ফেরালেন।

"বাকি দিনটা ওকে বিছানায় শুইয়ে রাখুন। আশা করি, কাল অনেকটা ভাল বোধ করবে।" দুজনে বাইরে এলে তিনি একটা প্রেস্ক্রিপ্‌শন লিখলেন।

.এন, "একটা মৃদু ঘুমের বড়ি। পরীক্ষার সময় যেসব ছেলেমেয়ের স্নায়ু বিপর্যস্ত হয় তাদের অনেককেই এটা খাইয়ে ভাল ফল পেয়েছি। কোন ওষুধের দোকান থেকে এখনই ওষুধটা নিয়ে আসুন, লাঞ্চে একটা দিন, তারপর চায়ের সঙ্গে একটা, শোবার সময় একটা, কাল প্রাতরাশের সময় একটা; দেখবেন অনেক শান্ত মনে ও পরীক্ষায় বসতে পারবে।"

"তাহলে আপনার ধারণা এটা স্নায়বিক গোলমাল ছাড়া আর কিছু নয়?"

"মূলত তাই। মেয়ে এত বেশী পরিশ্রম করেছে যে হিস্টোরিয়া বাধিয়ে বসেছে। সন্ধ্যার দিকেই অনেকটা ভাল হয়ে যাবে। ভয় পাবেন না—তবে লক্ষ্য রাখবেন, বড়িগুলো যেন ঠিক মত খায়। কাল যদি অবস্থার উন্নতি না হয় তো আমাকে রিং করবেন। কিন্তু আমার ধারণা, ভাল হয়ে যাবে।"

ডাক্তার চলে গেলেন। আমি উপরে উঠে জেনিকে বললাম, "ওষুধের দোকানে যাচ্ছি। আধ ঘণ্টা সময় একলা থাকতে পারবে তো সোনা?"

"খুব পারব মামি। বিছানায় তো আমি সম্পূর্ণ নিরাপদ, তাই না?"

জেনি দুই হাত বাড়িয়ে দিল। হাত দু'খানি সরু মনে হল। গাঢ় আলিঙ্গনে আমাকে জড়িয়ে ধরল। এখনও সেটা স্পষ্ট মনে পড়ছে। সেই উৎকণ্ঠিত আবেগভরা আলিঙ্গন আমাদের সাধারণ আদর ও চুম্বনের চাইতে সম্পূর্ণ আলাদা। ওষুধ আনতে বেরিয়ে গেলাম। যাতে বেশীক্ষণ মেয়েকে একলা থাকতে না হয় তাই প্রায় ছুটতে ছুটতে গেলাম।

ফিরবার সময় নিজের চিন্তায় এতই ডুবেছিলাম যে প্রথমে খেয়ালই করি নি মাথার উপর দিয়ে একটা এরোপ্লেন উড়ে যাচ্ছে। একটু পরেই তার প্রচণ্ড শব্দ কানে এল। চোখ তুলে দেখলাম, এরোপ্লেনটা খুব নীচু দিয়ে যাচ্ছে—এ অঞ্চলটার পক্ষে একটু বেশী নীচু দিয়েই যাচ্ছে, কারণ এখানে অনেক নতুন নতুন বাড়ি উঠেছে। ইঞ্জিনটা একবার বন্ধ হচ্ছে, আবার চলছে, আবার বন্ধ হচ্ছে, আবার চলছে, ফলে ভয়ংকর শব্দটাও কখনও বাড়ছে, কখনও কমছে।

হঠাৎ ইঞ্জিনটা সম্পূর্ণ থেমে গেল। অসহ্য নীরবতা। তারপরই ইঞ্জিনটা সোজা নেমে এসে যে রাস্তাটা ধরে আমি হাঁটছিলাম তার উপরকার বাড়ি-গুলোর পিছন দিকে প্রচণ্ড শব্দ করে ভেঙে পড়ল—বাড়িগুলোর পিছন দিকে—ঐ বাড়িগুলোর পিছন দিকেই তো আমাদের রাস্তা—আমাদের বাড়ি। আর ঠিক তখনই একটা আর্তনাদ শুনতে পেলাম।

ছুটতে লাগলাম। এত দ্রুত জীবনে কখনও ছুটি নি। যখন আমাদের বাড়িতে পৌঁছলাম তখন সেটা একটা ধ্বংসস্তূপমাত্র। আগুনের শিখা লকলক করছে, ভাঙা এরোপ্লেনটা ইট, চুন-সুরকি ও কাচের সঙ্গে মিলে-মিশে পড়ে

আছে—আর আছে বিমান-চালকের রক্ত-মাংস-হাড়—আর আছে একটি নিঃসঙ্গ মেয়ে। মেয়ে। আমার মেয়ে জেনি।

এই হল ঘটনা। অনেককাল আগের ঘটনা। এ রহস্যের কোন সমাধান আমি খুঁজে পাই নি। এখন আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে পারবেন কেন এরোপ্লেনের শব্দ শুনলে আমি এত ভয় পাই, আর সে শব্দ যত বাড়তে থাকে ততই একটা অপার্থিব আর্তনাদ কেন আমার কানে আসে যা আমি ছাড়া আর কেউ শুনতে পায় না।

Out of sight, Out of life—Rose Mary Timperley

মৃত্যুর মুহূর্তে

নিজেই ভূত হয়ে গেলে তখন আর ভূতে বিশ্বাস করাটা শক্ত ব্যাপার নয়। একটা হঠকারী মুহূর্তে আমি ফাঁসিতে ঝুলেছিলাম, আর কাজটা ভাল-ভাবে শুরু করার আগেই মনস্তাপও হয়েছিল। চেয়ারটাকে ঠেলে সরিয়ে দেওয়া মাত্রই আবার সেটাকে পায়ের নীচে ফিরে পেতে চাইলাম, কিন্তু মাধ্যাকর্ষণ-শক্তি ততক্ষণে কাজ শুরু করে দিয়েছে, চেয়ারটা মেঝেতে যেখানে ছিল সেখানেই পড়ে রইল, আর আমার তেরো স্টোন এগারো হন্দরের দেহটা ক্রমেই নীচে নামতে লাগল, গলার দড়িটা ক্রমেই এঁটে বসতে লাগল।

গলার মাঝখানটায় ভীষণ ব্যথা করতে লাগল; কিন্তু আমার গালদুটো এমনভাবে ফুলে উঠল যে সেটাই তাজ্জব ব্যাপার বলে মনে হল। গালের দুটো উঁচু ঢিবির উপর দিয়ে ভাল করে তাকাতেও পারছি না, যদিও তখন আমি প্রাণপনে দরজার দিকে তাকাতে চাইছিলাম যদি তখনও কেউ এসে আমাকে উদ্ধার করে এই আশায়। কিন্তু আমি ভাল করেই জানি যে বাড়িতে আর কেউ নেই, আর থাকলেও দরজাটা তো ভিতর থেকে ভাল করে বন্ধ করেই দিয়েছি। পা দুটো ছোঁড়ার ফলে আমি অনবরত ঘুরছি; ফলে কখনও দরজার দিকে কখনও জানালাটার দিকে মুখটা ঘুরে যাচ্ছে, কাঁপা হাতে দড়িটা ধরে যতই টানাটানি করছি ততই সেটা আরও শক্ত হয়ে মাংসের মধ্যে বসে যাচ্ছে।

আমার নামটি হচ্ছে—ছিল—এডোয়ার্ড থর্ণবার্ণ, সময় ১৯৩৮—১৯৭৭। চল্লিশতম জন্মদিনের ঠিক একমাস আগে আমি আত্মহত্যা করি। আমি জানি, সেজন্য দায়ী আমার পুরুষত্বহীনতা। আমি যদি সন্তানের পিতা হতে পারতাম তাহলে আমাদের বিবাহবন্ধন শক্তই থাকত, তাহলে এমিলি আমার প্রতি

বিশ্বাসঘাতিনী হত না, আর আমিও ক্ষণিকের দুর্বলতায় নিজের জীবন নষ্ট করতাম না।



ঘটনাস্থল কনেক্টিকাট-এর বার্ন্‌স্টেপ্‌ল্‌-এ আমাদের বাড়ির অতিথি-কক্ষ; সময় সন্ধ্যা সাতটার ঠিক পরে, বৎসরের এই সময়টাতে তখন গাঢ় গোধূলি নেমে আসে। আপিস থেকে বাড়ি ফিরেছি ছ'টার একটু আগে। আমি বাড়ির দালালি করি, কাজটা কনেক্টিকাট শহরে বেশ লাভজনক, যদিও ইদানীং আমার আয়-উপার্জন বেশ কমে এসেছিল। বাড়ি ফিরেই দেখলাম রান্নাঘরের টেবিলে একটুকরো চিঠি: "গ্রেগের সঙ্গে প্রাচীন ধ্বংস-স্তূপ দেখতে যাচ্ছি। তোমার রাতের খাবার ব্যবস্থাটা তোমাকেই করে নিতে হবে। দুঃখিত। ভালবাসা, এমিলি।"

এই গ্রেগ লোকটা এমিলির প্রেমিক। নিউইয়র্ক যাবার বড় রাস্তার উপর তার একটা পুরাবস্তুর দোকান আছে, অল্প-মাইনের সহকারিণী হিসাবে এমিলি দিনের বেশীর ভাগ সময়টা সেখানেই কাটায়। মধ্য-সপ্তাহের দীর্ঘ অপরাহ্ণগুলিতে যখন দোকানে কোন ভ্রমণকারী থাকে না, কোন পুরাবস্তু-সংগ্রহকারী থাকে না, তখন তারা দুজন একত্রে দোকানের পিছনে গিয়ে কি করে তাও আমি জানি। তিন বছরের অধিক কাল ধরে ব্যাপারটা আমার জানা থাকলেও তা নিয়ে কি যে করব ঠিক বুঝে উঠতে পারি নি। আসলে ব্যাপার হল, দোষটা তো আমারই, তাই পাছে এই কুৎসিত ব্যাপারটা প্রকাশ হয়ে পড়ে সেই ভয়েই আমি কিছু বলতেও পারি নি।

তাই মনে মনে অসন্তুষ্ট হলেও আমি চুপ করেই ছিলাম। অসন্তোষ, দুঃখ, প্রতিবাদ—সবই মনের মধ্যেই চেপে রেখেছিলাম।

আগেও আত্মহত্যার চেষ্টা করেছি। প্রথমে মোটরগাড়ি নিয়ে প্রচণ্ড বেগে ছুটে আসা কোন ট্রাকের দিকে এগিয়ে গিয়েছি (কিন্তু চতুর্দিকের হর্ণের শব্দে শেষ মুহূর্তে নিজের গাড়িটাকে ঘুরিয়ে নিয়েছি): কখনও বা একটা পাহাড়ের উপর থেকে কনেক্টিকাট নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়তে গেছি (একেবারে শেষ প্রান্তে পৌঁছে ব্রেকটা টেনেছি এবং আধ ঘণ্টা ধরে ঘর্মাক্ত দেহে গাড়িতে কাটিয়ে তবে সুস্থ হয়ে উঠেছি), শেষ পর্যন্ত এ অঞ্চলের যে কোন একটা লেভেল-ক্রসিং-এ গাড়িটাকে আড়াআড়িভাবে দাঁড় করিয়ে রেখেছি, কিন্তু বিশ মিনিটের মধ্যেও কোন ট্রেন না আসায় মনের বেপরোয়া ভাবটা কেটে গেছে, আর আমিও গাড়ি নিয়ে বাড়ি ফিরে এসেছি।

পরে কব্জিটা কেটে ফেলতে চেষ্টা করেছি, কিন্তু কোন ধারালো যন্ত্র নিজের শরীরে ঢুকিয়ে উঠতে পারি নি। অসম্ভব। পরের কোন সুযোগের জন্য অপেক্ষা করেছি।

শেষ পর্যন্ত দড়ির সাহায্য নিলাম; আর তাতেই সফল হলাম। সম্পূর্ণ সফল হলাম। পুরোপুরি সফল। পা দুটো হাওয়ায় ছুঁড়তে লাগলাম, আঙুল দিয়ে নিজের গলাই চেপে ধরলাম, চোখ দুটো ঠেলে বেরিয়ে এল, জিভটা শুকিয়ে উঠল, সারা দেহটা লেত্তির মাথায় লাটিমের মত ঘুরতে লাগল। তীব্র,

তীক্ষ্ণ, অসহ্য যন্ত্রণা।

ক্রমে পা দুটো দুর্বল হয়ে এল, হাত দুটো ঝুলে পড়ল, আঙুলগুলো বৃথাই ট্রাউজারের পা আঁকড়ে ধরতে চেষ্টা করল, ফাঁসির দড়ি থেকে মাথাটা কাত হয়ে ঝুলতে লাগল।

দেখতে পেলাম, আমার বিস্ফারিত চোখ দুটি দ্যুতিহীন, সাদা হয়ে উঠেছে, চোখের কোণে এক ফোঁটা জল নেই, পাথরের মত শুকনো। তবু নিজের চোখ দুটোকে দেখতে পাচ্ছি; আরও ভাল করে তাকিয়ে গোটা শরীরকেই দেখতে পেলাম—ঝুলছে, ঘুরছে, কিন্তু এখন আর তাতে কোন-রকম খিঁচুনিই নেই। সভয়ে বুঝতে পারলাম যে আমি মরে গেছি।

কিন্তু আছি। মরে গেছি, তবু আছি; গলায় এখনও ফাঁসের ব্যথা, মাথার মধ্যে কেমন একটা ঠেলে-ওঠা চাপ। আছি, কিন্তু সেই মাটির শরীরে নেই, নেই সেই ঝুলন্ত মাংস-পিণ্ডের মধ্যে, অদৃশ্য আলোর মত ছড়িয়ে আছি সারা ঘরে, নিরালম্ব হয়ে ফিরছি সর্বত্র। এবার কি হবে? ভয়, বিস্ময় ও ব্যথা একসঙ্গে আমাকে ভর করল, ঝুলন্ত কুয়াসার মত পরবর্তী ঘটনার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম।

কিন্তু কিছুই ঘটল না। অপেক্ষা করেই আছি: শরীরটা একেবারেই স্থির হয়ে গেছে; দেয়ালের দুটো ছায়া এতটুকু নড়ছে না; বিছানার পাশের বাতিগুলো জ্বলছে, দরজা বন্ধ; জানালার পর্দা নামানো, কিছুই ঘটল না।

এবার? চীৎকার করে প্রশ্ন করতে চাইলাম, পারলাম না। গলাটা ব্যথা করে উঠল, কিন্তু আমার তো তখন কোন গলা ছিল না। মুখটা যেন জ্বলে গেল, কিন্তু আমার তো মুখও নেই। শরীরের প্রতিটি চেষ্টা ও উদ্যম মনের উপর ছাপ এঁকে দিচ্ছে, কিন্তু আমার তো শরীর নেই, মস্তিষ্ক নেই, আত্মা নেই, কিছুই নেই। কথা বলার ক্ষমতা নেই, নড়াচড়ার শক্তি নেই, এই ঘর ছেড়ে, এই ঝুলন্ত শবদেহ থেকে দূরে যাবার ক্ষমতাও নেই। আমি পারি শুধু এখানে অপেক্ষা করতে, বিস্ময়ে হতবাক হয়ে অপেক্ষা করে থাকতে।

বিছানার মুখোমুখি ড্রেসিং-টেবিলে একটা সংখ্যা-বসানো ঘড়ি ছিল। সেদিকে চোখ পড়তেই দেখলাম ৭-২১—সম্ভবত পা দিয়ে চেয়ারটা ঠেলে দেবার পরে বিশ মিনিট পার হয়ে গেছে, আর আমি মরে যাবার পরে পনেরো মিনিট কেটে গেছে। এখনও কি কিছু ঘটবে না? কোন পরিবর্তন দেখা দেবে না?

ঘড়িতে যখন ৯-১১ তখন বাড়ির পিছনে এমিলির ভক্সওয়াগেন-এর শব্দ শুনতে পেলাম। আমি কোন চিরকুট লিখে রাখি নি; লিখবার তো কিছু ছিল না; আমার মৃতদেহটাই তো সবকিছু বলবে। কিন্তু এমিলি যখন আমাকে দেখবে তখনও আমি যে এখানেই থাকব এটা ভাবতে পারি নি। এখন অনুশোচনা হলেও আমি যা করেছি ঠিকই করেছি। আমি জানি আমি

ঠিক কাজই করেছি, কিন্তু এমিলি যখন দরজা দিয়ে ঘরে ঢুকবে তখন তার মুখটা দেখতে আমি চাই নি। সে আমার প্রতি অন্যায় করেছে, সেই তো সব কিছুর কারণ, সেও আমার মতই সে কথাটা বুঝুক, কিন্তু তার মুখ দেখতে আমি চাই নি। চাই নি।

ব্যথাটা আবার বাড়ল, যা ছিল আমার গলা, আমার মাথা, সেখানে ব্যথা। অনেক দূরে একতলায় দরজা বন্ধ করার শব্দ হল। বাতাসের মত ঘরের মধ্যেই আমি কেঁপে উঠলাম। কিন্তু ঘর ছেড়ে গেলাম না, যেতে পারলাম না।

"এড? এড? আমি ডাকছি মিষ্টি।"

আমি জানি তুমি ডাকছ। এখনই আমাকে চলে যেতে হবে এখান থেকে, এখানে থাকতে আমি পারি না। ঈশ্বর কি আছ? এই ভ্রাম্যমান উপস্থিতিই কি আমার আত্মা? এর চাইতে নরকও ভাল, আমাকে নরকে নিয়ে যাও, যেখানে খুশি নিয়ে যাও, শুধু এখানে ফেলে যেয়ো না।

ডাকতে ডাকতে এমিলি উপরে উঠে এল, অতিথি-কক্ষের বন্ধ দরজার পাশ দিয়ে চলে গেল। আমাদের শোবার ঘরে ঢুকল, আমার নাম ধরে ডাকল, কণ্ঠস্বরে যেন একটা ভয়ের আভাষ। সে আবার চলে গেল, হল পেরিয়ে নীচে নেমে গেল। সব চুপচাপ।

সে কি করছে? হয় তো আমার কোন চিরকুট। কোন সংবাদের খোঁজ করছে। জানালা দিয়ে তাকাল, আমার শেভ্রলেট গাড়িটা দেখে বুঝল আমি বাড়িতেই আছি। এ-ঘর থেকে ও-ঘরে গেল। বাড়িটা খুব পুরনো। প্রায় দুশ' বছর আগেকার। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় আগেকার মালিক কিছু অদল-বদল করেছিলেন। আমি কিনেছি বারো বছর আগে, সেকেলে আসবাব-পত্র ও পুরাবস্তু দিয়ে বাড়িটাকে সাজিয়েছে এমিলি—ও গ্রেগ। নড়বড়ে আসবাব, ঔপনিবেশিক যুগের জিনিসপত্র, পাইন কাঠের হলুদে পুরনো টেবিল। বাড়িটা কিনেছি আমি, কিন্তু কোনদিন বাড়িটাকে ভালবাসতে পারি নি। কিনেছি এমিলির জন্য, তার জন্যই সব করেছি, কারণ আমি জানি এমিলি যা চায় সেই জিনিসটি কোনদিন তাকে দিতে পারব না। দিতে পারব না একটি সন্তান।

অবশ্য এ নিয়ে এমিলি কখনও গোলমাল করে নি। এমিলি খুব ভাল। কখনও আমি তাকে দোষ দেই নি, নিজের পরিবর্তে তাকে কখনও দোষী করি নি। বিয়ের প্রথম দিকে সে সাগ্রহে দু'একবার কথাটা তুলেছে, কিন্তু আমার প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করে দীর্ঘকাল আর কিছুই বলে নি। কিন্তু,আমি জানতে পেরেছি।

যে কড়ি-কাঠ থেকে আমি ঝুলেছি, সেটা পুরনো বাড়িরই একটা অংশ— এগারো বর্গ ইঞ্চি হাতে-চেরা একখণ্ড পুরনো কাঠ। কড়ি-কাঠটা বেশ শক্ত।

আমি চিরকাল ঝুলে থাকলেও ওটার কিছু হবে না। সকলের চোখে পড়বার পরে তারা যখন আমাকে নামিয়ে নেবে তখনও ওটা আমার ভার সইতে পারবে।

ঘড়িতে ৯-২৩। এমিলি আবার উপরে উঠে এসেছে। কাঠের সিঁড়িতে তার পায়ের শব্দ দ্রুততর। ডাকল, "এড ?"

দরজার হাতলটা ঘোবাল।

দরজা তালাবন্ধ। চাবিটা ভিতরে। দরজা ভাঙতে হবে। সেজন্য অন্য কাউকে ডাকতে হবে। এমিলি একা পারবে না।

"এড ? তুমি কি ভিতবে আছ ?" এমিলি দরজায় ধাক্কা দিল, হাতলটা খট্‌খট্‌ করল, বারকয়েক আমার নাম ধরে ডাকল, তারপর হঠাৎই নীচে নেমে গেল, তাব অস্পষ্ট কণ্ঠস্বব শুনতে পেলাম। টেলিফোনে কাকে যেন ডাকছে।

মনে হল গ্রেগকে। গলার ব্যথাটা আবার বাড়ল। মন বলল, এবাব শেষ হোক। আমি চাই, আমাকে বাইরে নিয়ে যাওয়া হোক, জীবন্ত আত্মা ও মৃতদেহটাকে বাইরে নিয়ে যাওয়া হোক। সব শেষ হয়ে যাক।

নীচে এমিলি অপেক্ষা করছে গ্রেগের জন্য, আর উপরে আমি অপেক্ষা করছি তাদের দুজনের জন্য। হয়তো সে বুঝতে পেরেছে উপরে এসে কি দেখতে পাবে ; তাই নীচেই অপেক্ষা করছে।

গ্রেগ এখানে উপস্থিত থাকাতে আমার কোন আপত্তি নেই ; আমার আপত্তি এমিলির উপস্থিত থাকায।

ঘড়িতে যখন ৯-৪৪ তখন বাড়ির পাশের পাথরের নুড়ির উপর গাড়ির চাকার শব্দ শুনতে পেলাম। গ্রেগ বাড়িতে ঢুকল, নীচে তাদের কথাবার্তা শুনলাম ; গাঢ় কণ্ঠস্বর ধীর স্থির আশ্বাসপূর্ণ, আর হাল্কা নারী-কণ্ঠস্বর দ্রুত ও ভয়ার্ত। দুজনে একসঙ্গে উঠে এল। কারও মুখে কথা নেই। দরজার হাতলটা ঘুরল, খট্‌খট্‌ শব্দ হল, গ্রেগের গলা শোনা গেল, "এড ?"

ক্ষণেক নীরবতার পরে এমিলি বলল, "না। না। সে কিছুতেই একাজ করতে পারে না।"

"এ কাজ ?" গ্রেগের গলায় সচকিত সন্দেহ। "তুমি কি বলতে চাইছ ? এ কাজ মানে ?"

"ইদানীং সে এত মন-মরা হয়ে থাকত—এড ?" দরজা ধরে নাড়া দিল।

"ওরকম করো না এমিলি। ব্যাপারটাকে সহজভাবে নাও।"

এমিলি বলল, "তোমাকে ডাকা আমার ঠিক হয় নি। এড ? দোহাই তোমার !"

"কেন ঠিক হয় নি ? ঈশ্বরের দোহাই, বল এমিলি—"

"এড, দয়া করে বেরিয়ে এস। এভাবে আমাকে ভয় পাইয়ে দিও না!"

"কেন আমাকে ডাকা তোমার ঠিক হয় নি এমিলি?"

"এড তো বোকা নয় গ্রেগ। সে তো—"

আবার নীরবতা। ওরা ভাবছে, আমি ভিতরে এখনও বেঁচে আছি। ওরা চায় না আমি শুনে ফেলি এমিলি বলছে, "সে তো জানে গ্রেগ, আমাদের সব কথা জানে।"

একটু পরে গ্রেগ বলল, "এটা কিরকম ইয়ার্কি হচ্ছে এড? বেরিয়ে এস। খোলাখুলি সব কথা হোক।" আবার দরজার খট্‌খট্‌ শব্দ। 'আমাদের ঢুকতেই হবে। আর একটা চাবি আছে কি?"

"আমার মনে হয় এ বাড়ির সবগুলি তালাই এক। এক মিনিট অপেক্ষা কর।"

সত্যি তাই। যেকোন চাবিতেই এ বাড়ির ভিতরের দরজাগুলো খোলা যায়। কান পেতে অপেক্ষা করতে লাগলাম। বুঝলাম, এমিলি আর একটা চাবি আনতে গেছে, এখনই তারা ফিরে আসবে। এমিলি ঘরে ঢুকবে ভেবে আমি এত ভয় পেয়ে গেলাম যে বিকৃত আয়নার প্রতিবিম্বের মত ঘরের মধ্যেই আমি যেন ঝিক্‌মিক্ করে উঠলাম। আহা, আমি যদি কোন রকমে দেখতে পারাটা বন্ধ করতে পারতাম! যখন বেঁচেছিলাম তখন আমার চোখ ছিল, কিন্তু চোখের পাতাও ছিল, যা অসহ্য তাকে দৃষ্টির আড়ালে রাখতে পারতাম, কিন্তু এখন তো আমি একটা উপস্থিতি মাত্র, আমার চেতনাকে তো আমি থামিয়ে দিতে পারি না।

তালায় চাবি ঘোরানোর খস্‌খস্ শব্দ যেন আমার গলায় উখোর মত ঘসা দিতে লাগল। আবার তীব্র যন্ত্রণা। তার মধ্যেই শুনতে পেলাম এমিলি বলছে, হল কি? আর গ্রেগ জবাব দিল, চাবিটা ভিতরেই রয়েছে, ওপাশ থেকে।

"হা ঈশ্বর। হায় গ্রেগ, না জানি সে কি করে বসেছে।"

গ্রেগ তাকে বলল, "দরজার কব্জা খুলে ফেলতে হবে। টনিকে ডাক। ওর যন্ত্রপাতির বাক্সটা নিয়ে আসুক।"

"তুমি কি চাবিটা ঢোকাতে পারছ না?"

নিশ্চয়ই পারত, তবু গ্রেগ গম্ভীর গলায় বলল, "যা বলছি তাই কর এমিলি"; আর তখনই বুঝলাম যে দরজা প্রথম খোলার সময় এমিলি সেখানে থাকে এটা সে চাইছে না; তাই তাকে সরিয়ে দিল। ভাল, খুব ভাল!

"ঠিক আছে," বলে এমিলি চলে গেল টনিকে ফোন করতে। টনি যুবক, ঘন ভুরু, একরাশ কালো চুল, গায়ের রং অলিভ পাতার মত; সে গ্রেগের বাড়িতেই থাকে, তার সব কাজকর্ম করে।

তালায় নতুন করে খস্‌খস্ শব্দ হতে লাগল। এমিলি ফিরে আসার আগেই গ্রেগ দরজাটা খুলতে চেষ্টা করছে। আমি যেন একটা আরামের স্বাদ অনুভব করলাম, গ্রেগকেও ভাল লাগছে। সে তো লোক মন্দ নয়। আমার স্ত্রীর ব্যাপারে একটা সুযোগ নিলেও আসলে সে লোক খারাপ নয়। সে কি এখন এমিলিকে বিয়ে করবে? তারা তো এই বাড়িতেই বাস করতে পারবে; এ-বাড়ি সাজানো-গোছানোর ব্যাপারে তার অবদান তো আমার চাইতেও বেশী। নাকি এ ঘরটা এমিলির কাছে বড় বেশী দুঃখজনক স্মৃতি হয়ে থাকবে? এমিলি কি এ বাড়ি বিক্রি করে দিয়ে অন্যত্র বাস করবে? কিন্তু তাকে তো অনেক অল্প দামে বাড়িটা বিক্রি করতে হবে। বাড়ির দালাল হিসাবে আমি তো জানি, যে বাড়িতে কোন আত্মহত্যার ঘটনা ঘটে সেটা বিক্রি করা কত ঝামেলার ব্যাপার। অতি-প্রাকৃতিক ঘটনার ভীতি মানুষের মন থেকে যায় না। অনেকেই হয়তো বিশ্বাস করে বসবে যে বাড়িটা ভূতে-পাওয়া।

আর ঠিক তখনই আমি বুঝতে পারলাম যে এ ঘরটাও তো ভূতে-পাওয়া। এখানে তো আমি রয়েছি! আমিই তো ভূত।

কী ভয়ানক কথা! আমি এখানে ভেসে বেড়াচ্ছি,—হাড় নেই, মাংস নেই, একটা বেদনাদীর্ণ উপস্থিতি মাত্র: ঠিক যেন একটা এককোষী ছত্রাক, কত লোক যাবে-আসবে, আর নিরবধি কাল দিন ও রাত্রি একাকি দুঃখদীর্ণ অন্তরে আমি তাদের নীরব দর্শকমাত্র হয়ে থাকব। না এমিলি বাড়িটা বিক্রি করেই দেবে—তাকে বিক্রি করতেই হবে। আর সেটাই হবে আমার যোগ্য শাস্তি—আত্মহত্যার শাস্তি, যে মানুষ নিজের জীবনকে হনন করে তার নির্জন নরকবাস। সব ইন্দ্রিয়গুলি সজাগ থাকবে, অথচ তার বেশী কিছু থাকবে না, মাধ্যাকর্ষণের চাইতেও শক্তিমান কোন শক্তি আমাকে বেঁধে রাখবে আমারই আত্ম-হননের ঘটনাস্থলে।

তালার এদিককার চাবির একটা আকস্মিক শব্দে চমকে সেদিকে তাকাতেই দেখলাম একটা জীবন্ত প্রাণীর মত এঁকেবেঁকে চাবিটা যেন লাফ দিয়ে নীচে নামতে গিয়ে ঝকঝক শব্দে মেঝেতে ছিটকে পড়ল। একমুহূর্ত পরেই দরজাটা খুলে গ্রেগ আমার রক্তিম মুখের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রইল, আর পরক্ষণেই বিস্ময়ে ও আতংকে—না কি ঘৃণায়?—পিছিয়ে গিয়ে দরজাটাকে সশব্দে বন্ধ করে দিল। তালার মধ্যে চাবিটা আর একবার ঘুরল, শুনতে পেলাম, দ্রুত পায়ে সে নীচে নেমে গেল।

ঘড়িতে ৯-৫৮ বাজে। এতক্ষণে গ্রেগ সব কথা এমিলিকে বলছে, তাকে শান্ত করতে কিছু পানীয় দিচ্ছে। এবার সে পুলিশকে টেলিফোন করছে। এবার এমিলিকে জিজ্ঞাসা করছে, পুলিশকে ব্যাপারটা জানাবে কি না জানি না, তারা কি স্থির করবে

"না—আ আ আ—আ আ আ!"

ঘড়িতে ১০-০৭ বাজে। এত সময় লাগছে কেন? গ্রেগ কি এখনও পুলিশকে ডাকে নি?

এমিলি সিঁড়ি বেয়ে দৌড়ে আসছে; হোঁচট খেয়ে পড়ে যাচ্ছে, তবু আবার দৌড়চ্ছে; চীৎকার করে আমার নাম ধরে ডাকছে। আমি ঘরের এক কোণে কুঁকড়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। দরজার উপর তার ঘুসির শব্দ শুনতে পেলাম। সে ঢুকতে পারছে না। হে ঈশ্বর, ওকে ঢুকতে দিও না। ও যা খুশি তাই করুক; আমার কিছুতেই কিছু যায়-আসে না, শুধু ও যেন আমাকে দেখতে না পায়! ওকে আমাকে দেখতে দিও না।

গ্রেগ এল। এমিলি চেঁচামেচি করল, মিনতি করল, রাগ করল, তর্ক করল, দাবী করল, কিন্তু গ্রেগ শুনল না। "চাবিটা দাও। আমাকে চাবিটা দাও।"

গ্রেগ চাবিটা এমিলিকে দিল।

না। এটা অসহ্য। এটাই সব চাইতে ভয়ংকর। এমিলি ঢুকল, হেঁটে ঘরের মাঝখানে এল, তার পায়ের শব্দ চিরকাল আমার মনে থাকবে। সে কাঁদছে, কিন্তু সে যেন মানুষের কান্না নয়; যেকোন জীবের হতাশাভরা কান্না। এতক্ষণে বুঝলাম, হতাশা কাকে বলে।

গ্রেগ তাকে সংযত করতে চেষ্টা করল, ঘাড়ে হাত রেখে ঘর থেকে বের করে নিয়ে যেতে চাইল; কিন্তু এমিলি তার হাত ছাড়িয়ে এগিয়ে এল·· না, আমার দিকে নয়। যন্ত্রণায় ও বিষাদে আমি তো তখন ঘরের সব জায়গায় আছি। এমিলি এগিয়ে এল আমার শবদেহের দিকে। গভীর মমতায় সেটার দিকে তাকাল, হাত বাড়িয়ে ফুলে-ওঠা গালটা স্পর্শ করল, অস্ফুটে বলল, "হায় এড!"

গ্রেগ এগিয়ে এল। আবার তার কাঁধে হাত রাখল, নাম ধরে ডাকল। এবার এমিলি ডুকরে কেঁদে উঠে মৃতদেহের পা দুটি জড়িয়ে ধরল, কাঁদতে কাঁদতে অত্যন্ত দ্রুত এমন সব কথা বলতে লাগল যে তার মাথামুণ্ডু কিছুই বোঝা গেল না। আহা, সেজন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ!

আর বোকা গ্রেগটা এমিলিকে ধরে জোর করে ঘর থেকে বের করে নিয়ে গেল; দরজাটাকে সশব্দে বন্ধ করে দিল। মৃতদেহটা কিছুক্ষণ দুলতে দুলতে একসময় আবার স্থির হয়ে গেল।

সে বড় শোচনীয় অবস্থা। এর চাইতে খারাপ আর কিছু হতে পারে দীর্ঘ দিন, দীর্ঘ রাত এখানে এইভাবে কাটাতে হবে! কিন্তু এর চাইতেও শোচনীয় পরিস্থিতি তো আছে। এমিলি বেঁচে থাকবে, বাড়িটা বেচে দেবে, ধীরে ধীরে সব ভুলে যাবে। (আমিও তো একসময় ভুলে যাব।) সে গ্রেগকে বিয়ে করবে। তার তো মোটে ছত্রিশ বছর বয়স;

সে এখনও মা হতে পারবে।

বাকি রাতটা বাড়ির অন্য কোন ঘর থেকে তার বিলাপ শুনতে পেলাম। শেষ পর্যন্ত পুলিশ এল, মর্গ থেকে এল সাদা কোট-পরা দুটি মূর্তি। আমাকে—ওটাকে—কেটে নামিযে নিতে তারা ঘবে ঢুকল। একটা ভাঙা খেলনার মত মৃতদেহটাকে পুটুলির মত জড়িযে স্ট্রেচারে করে বযে নিযে গেল।

ভেবেছিলাম, আমাকে মৃতদেহের সঙ্গেই থাকতে হবে; ভয পেযেছিলাম আমাকেও হয তো ওটার সঙ্গেই কবর দেওযা হবে, একটা বাক্সেব কালো অন্ধকারের মধ্যে অনন্তকাল কাটাতে হবে চিন্তাশীল একটা মহাশূন্য হযে। কিন্তু মৃতদেহটা ঘর থেকে চলে গেল, আব আমি থেকেই গেলাম।

একজন ডাক্তারকে ডাকা হল মৃতদেহ সরিযে নেবাব পবে দবজাটা খোলাই ছিল। নীচের কথাবার্তা স্পষ্ট শুনতে পেলাম। ডাক্তার এমিলিকে একটা ঘুমের ওষুধ দিতে চেষ্টা কবছে, কিন্তু তার বিলাপ কিছুতেই থামছে না। বার বারই বলছে, "আমিই একাজ কবেছি। সব দোষ আমার।"

হ্যাঁ। এই প্রতিক্রিযাই আমি চেযেছিলাম, আশা করেছিলাম। জীবনের শেষ মুহূর্তে যা কিছু কামনা কবেছিলাম সবই পেযে গেলাম, তবু এ যে ভয়াবহ। আমি তো মরতে চাইনি। চাই নি এমিলিকে এত কষ্ট দিতে। আর সবচাইতে বড কথা, এখানে থেকে এসব দেখতে ও শুনতে আমি চাই নি।

শেষ পর্যন্ত এমিলি চুপ করল। গ্রেগকে সঙ্গে নিযে নীল পোশাক-পরা একজন পুলিশ ঘরে ঢুকল। গ্রেগ ঘটনার একটা বিবরণ দিল।

পুলিশ শুধাল, "আপনি কি ওর ঘনিষ্ট বন্ধু?"

"বলতে পারেন ওর স্ত্রীর সঙ্গেই আমার ঘনিষ্টতা বেশী। সে আমার দোকানে কাজ করে। নিউ ইযর্ক রোডের উপর আমার একটা পুরাবস্তুর দোকান আছে।"

পুলিশ বলল, "উনি কেন এ কাজ করেছেন বলে আপনার মনে হয?"

"আমার মনে হয়, উনি সন্দেহ করতেন যে ওর স্ত্রীর সঙ্গে আমার একটা প্রণযঘটিত ব্যাপার আছে।"

পুলিশ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাব দিকে তাকিযে বলল, "আপনি সত্যি এ ব্যাপারে জড়িত ছিলেন?"

"হ্যাঁ।"

"মহিলাটি কি বিবাহ-বিচ্ছেদের জন্য চেষ্টা করছিলেন?"

"না। সে আমাকে ভালবাসে না; ভালবাসে তার স্বামীকে।"

"তাহলে তিনি যেখানে-সেখানে রাত কাটান কেন?"

এ কথায় গ্রেগ অসন্তুষ্ট হল। বলল, "যেখানে-সেখানে তো রাত কাটায় না। মাঝে মাঝে, তাও ঘন ঘন নয়, আমার সঙ্গে রাত কাটায়।"

"কেন ?"

"একটু স্বস্তির জন্য। এডের সঙ্গে চলাটা খুব সহজ ব্যাপার নয়। সে বড্ড মেজাজী মানুষ। ইদানীং ক্রমেই অবস্থা খারাপ হয়ে উঠছিল।"

"জীবনে সুখী লোকরা আত্ম-হত্যা করে না," পুলিশটি বলল।

"ঠিক কথা। এড প্রায়ই মন-মরা হয়ে থাকত, মাঝে মাঝেই চাপা ক্রোধে কষ্টও পেত। ফলে তার ব্যবসা খারাপ হচ্ছিল, খদ্দেররা বিগড়ে যাচ্ছিল। এমিলির জীবনও শোচনীয় হয়ে উঠছিল, কিন্তু তবু সে এডকে ছাড়তে রাজী নয়, সে স্বামীকে ভালবাসে। জানি না এখন সে কি করবে।"

"আপনারা দু'জনে বিয়ে করতে পারেন না ?"

"না, না," গ্রেগ বিষণ্ণ হাসি হাসল। "আচ্ছা, আপনি কি মনে করেন আমাদের বিয়ে করতে সুবিধা হবে বলেই আমরা ওকে খুন করে আত্মহত্যা বলে চালাতে চেষ্টা করছি ?"

"মোটেই না," পুলিশটি বলল। "কিন্তু আপনাদের সমস্যাটি কি ? আপনি কি বিবাহিত !"

"তা ঠিক নয়। তবে কারণ একটা আছে। তাছাড়া, আগেই তো বলেছি. এমিলি আমাকে ভালবাসেনা, ভালবাসে তার স্বামীকে'

"অথচ—"

গ্রেগ তাকে বাধা দিয়ে বলল, "এমিলিকে আমি ভালবাসি, তার জন্য আমার দুঃখ হয়, এডের সঙ্গে তার জীবনটা তো খুব সুখের ছিল না। কিন্তু আপনাকে তো আগেই বলেছি তার সঙ্গে আমার দেহসংসর্গ হয়েছে কালে-ভদ্রে। আর তাতেও সে যে খুব খুশি হয়েছে তাও নয়"

হায় এমিলি ! বেচারি এমিলি !

পুলিশ বলল, "ঠিক আছে। বাইরে চলুন।"

তারা চলে গেল। দরজাটা খোলাই রইল, সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে তারা কথা বলতে লাগল।

পুলিশটি শুধাল, "রাতে থাকার মত কেউ আছে কি ? মিসেস থর্ণবার্ণের একলা থাকাটা ঠিক নয়।"

"গ্রেট বারিংটনে ওর আত্মীয়-স্বজনরা আছেন। আগেই তাদের টেলি-ফোন করেছি। ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই কেউ না কেউ এসে পড়বেন।"

"ততক্ষণে আপনি থাকছেন তো ? ডাক্তার বলছেন, হয়তো উনি ঘুমিয়েই থাকবেন, তবু ধরুন যদি—"

"বেশ তো, আমি থাকব।

ঐ পর্যন্তই। একটু পরেই নীচের কথাবার্তা থেমে গেল। গাড়ি চলে যাওয়ার শব্দ শুনতে পেলাম।

নর-নারীর সম্পর্ক কত জটিল। সাধারণ কাজও কত অর্থহীন। কাউকে

কোনদিন বুঝতে পারি নি, নিজেকে তো মোটেই না।

পুলিশ চলে যাবার কিছুক্ষণ পরেই গ্রেগ পুনরায় ঘরে এল। তাকে খুব অপরাধী ও অনুতপ্ত মনে হল। চেয়ারটাকে পায়ার উপর দাঁড় করিয়ে তার উপর উঠে দাঁড়াল, অনেক কষ্টে বাকি দড়িটা খুলে ফেলল। সেটাকে পকেটে ভরে চেযারটাকে ঘরের এক কোণে যথাস্থানে রেখে মেঝে থেকে চাবিটা কুড়িযে নিল। সেটাকে তালার মধ্যে পরিযে বিছানার দুটো বাতিই নিভিযে দিযে ঘর থেকে বেরিযে গেল। যাবার আগে দরজাটা বন্ধ করে দিযে গেল।

এবার আমি অন্ধকারে একা। দরজার ফাঁক দিযে ঈষৎ আলো আসছে, আর আছে ঘড়ির জলজলে সংখ্যাগুলোর স্তিমিত আলো। একটা মিনিট কী দীর্ঘ! ঐ ঘড়িটাই আমার শত্রু। ওটার টিক্‌টিক্ করে চলাটাই আমি সহ্য করতে পারছি না। এক ঘণ্টায ষাট বার টিক্‌টিক্, ঘণ্টার পর ঘণ্টা, সারাটা রাত। একটা রাতই সহ্য করতে পারছি না, তাহলে কেমন করে সহ্য করব অনন্তকাল?

সারাটা রাত আমাকে ভাবতে হবে, এই যন্ত্রণা সইতে হবে, কিসের জন্য অপেক্ষা করছি অথবা কখন এ অপেক্ষার শেষ হবে তা না জেনেই অপেক্ষা করে থাকতে হবে। এমিলির দিদি ও ভগ্নিপতির আসার আওয়াজ পেলাম। টনি ও গ্রেগ চলে গেল। তার অল্পক্ষণ পরেই অতিথি-কক্ষের দরজাটা খুলেই বন্ধ হযে গেল। কেউ ঘরে ঢুকল না। একটু পরেই হলের আলোও নিভে গেল। এখন ঘড়ির আলোই অন্ধকারের একমাত্র ব্যতিক্রম।

এমিলির সঙ্গে আবার কখন আমার দেখা হবে? সে কি আবার এঘরে আসবে?

একটু একটু করে ভোরের আলো ফুটতে লাগল। বাইরে সূর্যহীন মেঘলা দিন। খুবই অনুজ্জ্বল। ঘড়ির টিক্‌টিক্ শব্দের সঙ্গে একটা একঘেয়ে দিন এগিযে চলল। কখনও পাছে কেউ ঘরে ঢোকে সেই ভয়, আবার কখনও মনে মনে প্রার্থনা জানাই, যেমন করে হোক, এমন কি এমিলির উপস্থিতির দ্বারাও যদি হয তবু এই সীমাহীন নির্জনতার শেষ হোক। কিন্তু দিন একইভাবে চলতে লাগল—কোন ঘটনা নয, শব্দ নয়, কর্মচাঞ্চল্য নয়। এমিলিকে হয়তো এখনও ঘুম পাড়িযে রাখা হয়েছে। শেষ পর্যন্ত গোধূলি লগ্নে—ঘড়িতে যখন ৬-৫২ বাজে—দরজাটা আর একবার খুলে গেল। একজন কেউ ঘরে ঢুকল।

প্রথমে তাকে চিনতে পারি নি। একটি রাগীমত লোক দৃঢ় পদক্ষেপে দ্রুত ঘরে ঢুকল, শয্যাপার্শ্বের দুটো বাতি জ্বালিযে দিল, তারপর অপ্রয়োজন জোরে ধাক্কা মেরে দরজাটা বন্ধ করে চাবিটা ঘুরিয়ে দিল। সে দরজার থেকে মুখটা ফেরাতেই অবাক হয়ে দেখলাম যে সে তো স্বয়ং আমি। আমি! আমি মরি নি, বেঁচে আছি! কিন্তু তা কেমন করে হবে?

কিন্তু তার হাতে কি? ঘরের কোণ থেকে চেয়ারটা টেনে এনে মাঝখানে



রেখে চেয়ারের উপর সে উঠে দাঁড়াল—

না! না!

দড়িটাকে কড়ি-কাঠের সঙ্গে বাঁধল। অপর দিকে ফাঁসটা বানানোই ছিল সেটাকে মাথার উপর দিয়ে গলিয়ে দিতেই গলার উপর চেপে বসল।

হা ঈশ্বর! এ কাজ করো না!

লাথি মেরে চেয়ারটা সরিয়ে দিল।

চেয়ারটাকে লাথি মেরে সরিয়ে দেবার পরমুহূর্তেই সেটাকে ফিরে চাইলাম, কিন্তু চেয়ারটা যেখানে ছিটকে পড়েছিল সেখান থেকে ফিরে এল না. আর আমার তেরো স্টোন এগারো হন্দর ওজনের ভারী দেহটাও গলার শক্ত দড়িটা থেকে ক্রমেই নীচের দিকে নামতে লাগল।

গলায় ব্যথা লাগছিল, ভয়ংকর ব্যথা; কিন্তু তার চাইতেও বিস্ময়কর-ভাবে আমার গাল দুটো ফুলে উঠল। যন্ত্রণাদীর্ণ চোখে অনেক কষ্টে দরজার দিকে তাকালাম; মনে আশা, এখনও যদি কেউ এসে আমাকে রক্ষা করে, যদিও আমি জানি যে বাড়িতে আর কেউ নেই, আর দরজাটা বেশ ভালভাবেই তালাবন্ধ করা হয়েছে। পা দুটো ছোঁড়ার ফলে শরীরটা দুলতে দুলতে ঘুরপাক খাচ্ছে; ফলে কখনও দরজার দিকে, কখনও জানালার দিকে আমার মুখটা ঘুরে যাচ্ছে। গলায় এঁটে বসে যাওয়া ফাঁসটাকে ঢিলে করবার জন্য কাঁপা হাতে বৃথাই অনেক চেষ্টা করলাম; কোন ফল হল না।

ক্রমে দেহটা স্থির হয়ে এল। মনে হল, এবার আমার মৃত্যু হল। এই তো মৃত্যু।

In at the death—Donald E. Westlake

ওক-কাহিনী

অনেক বছর যত্ন করে রাখার পরে শেষ পর্যন্ত আজ রাতেই ওক গাছের বীচিটা পুড়িয়ে ফেলাম। ভাবলাম, এর ফলে হয়তো দুঃস্বপ্নের হাত থেকে মুক্তি পাব। বীচিটাকে কয়লার আগুনের মধ্যে ফেলে দিলাম, সেটা ফট্‌ফট্‌ শব্দ করল। তারপরেই জ্বলে উঠল। বীচিটা পুড়ে ছাই হয়ে গেল, আমিও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলাম।

অনেকদিন পর্যন্ত দুঃস্বপ্নগুলো দেখি নি, কিন্তু কয়েক সপ্তাহ আগে তারা আবার দেখা দিতে শুরু করল। সেই একই দুঃস্বপ্ন। আমি যেন শুনতে পাই, করাত দিয়ে গাছ কাটা হচ্ছে; আমি জানি ওটা ওক গাছ। পতনোন্মুখ হয়ে গাছটা আর্তনাদ করে ওঠে, এখনই হুড়মুড় করে আমার শরীরের উপর ভেঙে

পড়বে—ঘুম ভেঙে যায়; অন্ধকারে সারা শরীর ঘামে ভেজা।

আর ঘুম আসে না; সেই নিদ্রাহীন প্রহরগুলিতে শিক-বসানো জানালার দিকে তাকিয়ে লেস্‌লি ডিয়েকনকে মনে পড়ে, মনে পড়ে তার সেই কাহিনী, বিশ বছর আগে এই ঘরে বসে যা সে আমাকে শুনিয়েছিল। সে ছিল একটি হাসি-খুশি, বেপরোয়া, কলেজে-পড়া যুবক; আর সেই কিনা হয়ে উঠেছিল ভয়ের একটি জীবন্ত প্রতিমূর্তি—শেষ পর্যন্ত বুঝিবা তার চাইতেও শোচনীয় কিছু।

ডিয়েকনের একহারা চেহারা; মাথায় বালি-রং চুল। চটপটে স্বভাব; হাসি-ঠাট্টায় ভরপুর। দু'জন একসঙ্গে কলেজে গেলাম রসায়নশাস্ত্র পড়তে; যদিও সে গিয়ে পড়ল ভাষা-শিক্ষার ছাত্রী পিঙ্গলাক্ষী সুন্দরী ওয়েণ্ডি ট্রায়ান-এর খপ্পরে—মানব-সম্পর্কের রসায়ন-চর্চায়ই তার বেশী সময় কাটতে লাগল। ক্রমেই তার দেখা পাওয়া ভার হয়ে উঠতে লাগল; পড়াশুনায়ও ঢিল পড়ল।

মনে পড়ে, সেদিন রাতে আমার ঘরেই তীক্ষ্ণবুদ্ধি মারগ্রেভকে নৈশ-ভোজে আপ্যায়িত করছিলাম; এমন সময় ডিয়েকন হন্তদন্ত হয়ে ঘরে ঢুকল। কলেজ-গাউনটাকে একপাশে ঝুলিয়ে রাখল, সারা সন্ধ্যাটা ওয়েণ্ডির সঙ্গে কাটানোর আনন্দে তার মুখখানি জ্বলজ্বল করছে। টোস্টিং-ফর্কটা হাতে নিয়ে আগুনের পাশে উবু হয়ে বসে নিজের জন্য একটুকরো রুটি টোস্ট করতে শুরু করল।

"সরে বস তো লেস্," বলে বন্ধুর মতই তাকে আস্তে একটু ঠেলে দিলাম। "ঘরে এমনিতেই যথেষ্ট হাওয়া আসছে, তোমাকে আর আগুনটা উস্কে দিতে হবে না!"

সে আপত্তির সুরে বলল, "থাম তো নরম্যান। যখনই ঘরে ঢুকি তখনই তুমি হাওয়ার জন্য হাহাকার কর।"

হয়তো কখনও কখনও করি। আমার ঘরটা যেন একটা গুদাম। কিন্তু সেইমুহূর্তে আমি ভাবছিলাম মারগ্রেভের কথা—ইতিহাসের ছাত্র রাগী মারগ্রেভের কথা। সে রাতে কেন তাকে নৈশভোজে ডেকেছিলাম সেটা মনে পড়ছে না। এককালে সে সেনাবাহিনীতে ছিল; যুদ্ধে পঙ্গু হয়ে ফিরেছে। ভাল পোশাক পরে, মাথায় ফুলেল তেল মাখে; তার বেশী তার সম্পর্কে কিছু জানি না।

টোস্টে মাখন মাখিয়ে ডিয়েকন টি-পটের ঢাকনাটা খুলল। "এ যে একেবারে মরুভূমি। একফোঁটাও নেই?" যা হোক দু'এক ফোঁটা যা ছিল তাই গলায় ঢেলে ডিয়েকন মেজাজটা ফিরে পেল। হেসে বলল, "দেখ নরম্যান, হাওয়া-হাওয়া করে চেঁচিয়ে কোন লাভ নেই; এ সব সেকেলে পুরনো বাড়ির অবস্থা এইরকমই হয়।"

"আরে, তুমি তো সে-কথা বলবেই। তোমাকে তো আর এখানে রাত

কাটাতে হয় না। তুমি তো ফূর্তি কর ওয়েণ্ডির বাড়িতে।"

কথায়-কথায় কথা বেড়ে চলল। ডিয়েকন অনেক প্রাচীন বাড়ি-ঘরের নজীর উপস্থিত করল আর আমিও সুযোগ বুঝে আলোচনার মোড় ঘোরাবার জন্য একটা প্রাচীন বাড়ির প্রসঙ্গই তুললাম।

"আরে বাবা, অনেক প্রাচীন জমিদার-বাড়ির ইতিহাসই যখন তোমার জানা, তখন এই বাড়ির কথাই শোনাও না।"

"শুনবে? ঠিক আছে।" হাতল-চেয়ারে হেলান দিয়ে ডিয়েকন একটু মুখ টিপে হাসল। "আচ্ছা, ওক গাছের কথাই ধর।"

"ওক গাছ? এখানে তো কোন ওক গাছ নেই!"

"এখন নেই। চারশ বছর আগে এখানে ছিল ওক গাছের জঙ্গল। এই জানালার পাশেই যেসব দৈত্যের মত গাছ জন্মাত তাদের কথা কখনও শোন নি বোধহয়?"

কথার ফাঁকে ফাঁকে সে জ্যাম-মাখানো টোস্ট চিবুতে লাগল।

"গাঁয়ের এক গোঁয়ার-গোবিন্দ আর তার মনের মানুষ সেই গাছের নীচে ঘুমত। অসংখ্য ডালাপালার মনোরম ছায়া; প্রেম করার পক্ষে মোক্ষম জায়গা...তুমি কি জান, একসময় এই ঘরগুলি জমিদার-বাড়িরই অংশ ছিল? একদিন জমিদারবাবু স্থির করল, সব ওক গাছ কেটে ফেলবে। দূরের গাছগুলি একটার পর একটা কাটা হতে লাগল; বড় গাছটার গায়ে তখনও হাত পড়ে নি; জমিদারবাবুর মনে আশা, ভাবগতিক দেখে প্রেমিক-যুগল অবস্থা বুঝে সেখান থেকে সরে যাবে। কিন্তু বৃথা আশা। তারা এটাকে নিজেদের সম্পত্তি বলেই ধরে নিল। একধরনের জবর-দখল অধিকার আর কি। বড় গাছটার পালা যখন এল তখনও তারা গাছটার নীচেই শুয়ে রইল।

জমিদারবাবুর তখনও টনক নড়ল না। ভাবল, সময় হলে তারা ঠিক সরে যাবে। কিন্তু তারা সেখানেই শুয়ে থাকল। শেষ পর্যন্ত করাত-কুড়ুল নিয়ে কাঠুরেরা এল, গাছে করাত বসাল...দৈত্যাকার প্রাচীন গাছ। কাটতে সময় লাগল অনেক। কিন্তু গাছটা যখন মড়্-মড়্ শব্দ করে দুলতে শুরু করল, তখন জমিদারবাবু চীৎকার করে শেষ বারের মত সাবধান করে দিল। আর—"

ডিয়েকন হাতটা তুলল। হাসতে হাসতে হাতলের উপর রাখা টোস্টকে এক আঘাতে গুঁড়ো করে ফেলল। আমি চমকে উঠলাম। কিন্তু মারগ্রেভের কোনরকম ভাবান্তর দেখলাম না।

"একজন গেঁয়ো গোঁয়ার-গোবিন্দ বিদায় হল," বলে ডিয়েকন মাখন-মাখাবার ছুরিটা দিয়ে তার হাতের তালু থেকে জ্যামটা চেঁচে ফেলতে লাগল।

নিস্তব্ধতা ভেঙে আমিই কথা বললাম: "তার প্রণয়িনীর কি হল?"

"একটা ভাঙা পা নিয়ে সে বেঁচে গেল।" বাঁকা চোখে টোস্টের অবশিষ্ট টুকরোগুলোর দিকে তাকিয়ে ডিয়েকন সেগুলোকে আগুনের মধ্যে ছুঁড়ে

ফেলে দিল।

"এর মধ্যে প্রাচীনতার ঐতিহ্যের কি আছে ?'

"ঐতিহ্য ? সে আর এক ইতিহাস। মনে হচ্ছে, তুমি সেটাই শুনতে চেয়েছিলে, তাই না ?"

খাবারের প্লেটগুলো একপাশে সরিয়ে রেখে বললাম, "তোমাকে তো আমি চিনি ; তুমি যা বলবে তা আমি বিশ্বাস করি না।"

"কেন কর না ? তোমার বন্ধু মারগ্রেভকে জিজ্ঞাসা কর। সে তো একজন ইতিহাসের ছাত্র।"

এইবার মারগ্রেভ প্রথম কথা বলল, "এই সব বাজে কথা শোনাতে চাও শোনাও, কিন্তু তার জন্য এ ধরনের সবজান্তা ভাব দেখিও না।"

কথা-কাটাকাটি থেকে দুজনের মধ্যে মন-কষাকষি দেখা দিল। অনেক কষ্টে আমি দুজনকেই থামিয়ে দিলাম।

"আচ্ছা, শুভরাত্রি," বলে মারগ্রেভ ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

আর তখনই আমার প্রথম খেয়াল হল যে আমার ঘরের দুটো দরজা খুলে সে বেরিয়ে গেল। ডিয়েকন ঘরে ঢোকার সময় বাইরের ওক কাঠের দরজাটাও বন্ধ করে দিয়েছিল দেখে আমি অবাক হয়ে গেলাম। শুধালাম, "ব্যাপার কি ডিয়েকন ? ওকের দরজাটা বন্ধ করেছিলে কেন ?"

"বন্ধ করেছিলাম না কি ? কি জানি, খেয়াল করি নি। হয়তো তোমার ঠাণ্ডা হাওয়ার বাতিক আমাকেও পেয়ে বসেছে। যাক গে সে কথা। আমি ঘুমতে চললাম।"

ডিয়েকন চলে গেল। ব্যাপারটা ওখানেই চাপা পড়ল। কিন্তু আমার ওকের দরজাটা সে কেন বন্ধ করল সে কথা জানবার কৌতূহলটা মন থেকে তাড়াতে পারলাম না। যতদূর মনে পড়ে, এই প্রথম তাকে একাজটা করতে দেখলাম।

তারপর থেকে বেশ কয়েকদিন আর ডিয়েকনের টিকিটিও দেখতে পেলাম না। সপ্তাহ দুই পরে যখন তার সঙ্গে দেখা হল তখন তার চোখে-মুখে একটা বিপর্যস্ত ভাব আমার নজর এড়াল না। জিজ্ঞাসা করলাম, "লেস্, কোন গোলমাল দেখা দিয়েছে কি ?"

তার চোয়াল শক্ত হয়ে উঠল। "গোলমাল ? না তো—গোলমাল দেখা দেবে কেন ?"

আমি আর চাপাচাপি করলাম না ; কিন্তু যেরকম অকারণ জোর দিয়ে সে আপত্তিটা জানাল তাতেই মনে হল তার কথা সত্যি নয়।

হয়তো তার ও ওয়েণ্ডির ব্যাপারটায় ভাঁটা পড়েছে। তবু···কিছুই বলা যায় না ; হতেও তো পারে।

ইদানীং প্রায়ই লক্ষ্য করি, প্রায় সময়ই ডিয়েকনের ঘরের ওকের দরজাটা

বন্ধ থাকে না। তবে তো ওয়েণ্ডির সঙ্গে ব্যাপার-স্যাপারটাই ভেস্তে গেছে : কিন্তু আকস্মিকভাবেই আমি নিজেই একদিন সে ধারণাটাও বাতিল করতে বাধ্য হলাম।

আমার রসায়নের নোট-খাতাটা ডিয়েকন নিয়েছিল। সেটা আনতেই তার ঘরে গিয়েছিলাম। বাইরের ওকের দরজাটা বন্ধ না থাকায় একটু ঠেলতেই ভিতরের দরজাটা খুলে গেল। ভিতরে ঢুকে গেলাম।

উঁচু হাতল-চেয়ারের পিঠটা ছিল আমার দিকে, অগ্নিকুণ্ডের এক পাশে। চেয়ারটা প্রায় পেরিয়ে যেতেই খস্‌খস্ শব্দ কানে এল। ওয়েণ্ডির আলিঙ্গন থেকে ডিয়েকন তার হাত ও পা গুটিয়ে নিচ্ছে, মেয়েটিও তাড়াতাড়ি স্কার্টটা টেনে নামিয়ে দিচ্ছে।

তো-তো করে বললাম, "আমি দুঃখিত। তোমাদের দেখতে পাই নি।" কোনরকমে টেবিল থেকে নোট-খাতাটা তুলে নিয়ে ছুটে বেরিয়ে এলাম।

সন্ধ্যার গোড়াতেই ডিয়েকন আমার ঘরে এল। হেসে বললাম, "খুব খেল দেখালে বটে। একটা আলোও জ্বেলে রাখ নি। আমার তো ধারণা ছিল, ওয়েণ্ডি ঘরে থাকলে তুমি ওকের দরজাটা বন্ধ করেই রাখ।"

"ভুলে গিয়েছিলাম ভাই। ডিয়েকন মুচকি হাসল বটে, কিন্তু আমার মনে কেমন যেন একটা সন্দেহ দেখা দিল। তক্কে তক্কে রইলাম। দেখলাম, ওয়েণ্ডি ঘরে ঢুকলেও সে ওকের দরজাটা বন্ধ করে না। অথচ আগে তো দেখেছি, পড়াশুনা করার সময়ও সে ঐ দরজাটা বন্ধ করেই রাখত।

একদিন বিকেলে আমার ঘরে পেয়ে তাকে চেপে ধরলাম।

"ঠিক ঠিক বলতো লেস্, ব্যাপারটা কি ?"

কেমন যেন অসহায়ভাবে আমার দিকে তাকিয়ে ডিয়েকন বলল, "তুমি ঠিক ধরেছ নরম্যান। সত্যি, এর একটা গভীর কারণ আছে—আর সেটা নারকীয়।"

উত্তেজনায় সে উঠে দাঁড়াল। হাতের পেন্সিলটা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগল।

চাপা অনুচ্চ কণ্ঠে বলল, "আসল কথা, যখনই ওকের দরজাটা বন্ধ করি আর ওয়েণ্ডি আমার কাছে থেকে, তখনই একটা আওয়াজ শুনতে পাই।"

"আওয়াজ ? কি রকম আওয়াজ ?"

ডিয়েকন ঘুরে দাঁড়াল। জিভ দিয়ে ঠোঁট দুটো ভিজিয়ে নিল। "আমার ধারণা, সত্যিকারের কোন আওয়াজ নয়। প্রথমে, ভাল করে ধরতেই পারি নি। কিন্তু ইদানিং আওয়াজটা বেশ জোরে হচ্ছে—অনেকটা করাতের শব্দের মত।"

দেখলাম, তার গালের মাংসপেশী কুঞ্চিত হচ্ছে, চোখের পাতা কাঁপছে।

"ওয়েণ্ডি সে শব্দ শুনতে পায় ?"

"না। অন্তত—আমি তাকে জিজ্ঞাসাই করি নি। কিন্তু শুনতে পেলে সে নিশ্চয় আমাকে বলত।"

'আর শব্দটা হয় যখন ওয়েণ্ডি ঘরে থাকে, আর ওকের দরজাটা বন্ধ থাকে?" একটু ইতস্তত করে আবার শুধালাম: "আচ্ছা সেদিন রাতে ওক গাছের গল্পটা বলার পর থেকেই কি শব্দটা শুনতে পাওয়া যাচ্ছে?"

"তা—সেইরকমই তো মনে হয়।...কিন্তু তুমি যদি মনে কর যে এর পেছনে ঐ মারগ্রেভের হাত আছে, আমি কিন্তু তা মনে করি না।...এ ব্যাপারে তার করবার কি আছে? · বরং আমার তো ধারণা, এটা এই পুরনো বাড়িটারই কোন কারসাজি। নানা ফাঁক-ফোকড় দিয়ে শন্‌শন্ করে হাওয়া তো আসেই।"

সে হা-হা করে হাসতে লাগল। আমি উঠে জানালা দিয়ে নীচে তাকালাম। ডিয়েকনের এ অবস্থার জন্য অংশত আমিই দায়ী। তাকে সাহায্য করতেই চাই, কিন্তু আমিই বা কি করতে পারি? মারগ্রেভকে কথাটা জানানো তো আরও বোকামি হবে।

স্থির করলাম ওয়েণ্ডির সঙ্গে এনিয়ে কথা বলব। পরদিন সকালে কফি-বারে তাকে একা পেয়ে গেলাম। প্রথমেই সেদিন ডিয়েকনের ঘরে আচমকা ঢুকে পড়ার জন্য ক্ষমা চাইলাম; তা শুনে সে তো হেসেই খুন; তার পিঙ্গল চোখে হাসির ঝিলিক খেলে গেল।

"ওকের দরজাটা খোলা রেখে লেস্‌লিই তো কাণ্ডটা ঘটাল।"

"যা বলেছ। আচ্ছা, সে যে বলে দরজাটা বন্ধ করলেই একটা শব্দ শুনতে পায়, সেটা কি ব্যাপার?"

"আমি জানি না। কথাটা সেও আমাকে বলেছে, কিন্তু আমি কখনও কিছু শুনি নি।" তার মুখের হাসি নিভে গেল। "কিন্তু লেস্‌লি যে এখনও শুনতে পায় সেটা ভাল করেই জানি। কিন্তু আমি তো মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝি না। ·· এটা তার একধরনের পাগলামি। যতসব গোলমেলে ব্যাপার।"

ওয়েণ্ডি স্প্যানিশ ভাষার ক্লাস করতে চলে গেল। আমি বসে বসে ভাবতে লাগলাম। ওয়েণ্ডিকে আমি পছন্দ করি। এ নিয়ে তার ও ডিয়েকনের মধ্যে একটা ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হোক তা আমি চাই না। কিন্তু আমিই বা কি করতে পারি?

একসময় ওক গাছ কাটার গল্পটা মনে পড়ে গেল। কফি-বার থেকে বেরিয়ে কলেজের মাঠের দিকে তাকালাম। রৌদ্রতপ্ত বাতাস বেশ মিষ্টি লাগছে; নতুন ঘাস কাটার গন্ধে ভরপুর। হঠাৎ চোখে পড়ল···

ঐ তো একটা গাছ ছিল—অথবা গাছের গুঁড়ি—আমার জানালা থেকে খুব দূরেও নয়। গাছটা এমনভাবে কাটা হয়েছে যে একটা বৃত্তাকার আসন গড়ে উঠেছে। একদল ছাত্র সেখানে বসে গুলতানি করছে।...তাহলে কি

ডিয়েকনের গল্পের সত্যি কোন ভিত্তি আছে ?

কি মনে করে লাইব্রেরিতে গিয়ে ঢুকলাম। কয়েকখানা জরাজীর্ণ প্রাচীন বই খুঁজে বের করলাম। এই তো লেখা আছে : একসময় এই অঞ্চলে প্রচুর পুরনো ওক গাছ ছিল। একখানা পুরনো মানচিত্রে অনেক ওক গাছ দেখানোও হয়েছে। তারপর সেকেলে ইংরেজি ভাষায় লেখা আছে হুবহু ডিয়েকনের সেই একই গল্প।

জমিদার-বাড়ির পাশেই ছিল একটা ওক গাছ, সেটা কাটা হল, একটি ছেলে মারা গেল, মেয়েটা পঙ্গু হয়ে গেল। একেবারে এক গল্প। শুধু একটা বিবরণ আগে শুনি নি : ওড্‌থর্প নামের সেই জমিদারবাবু পঙ্গু মেয়েটিকে তুলে নিয়ে নিজের বিছানায় শুইয়ে দিল, এবং এক বছর পার না হতেই তাকে বিয়ে করল। আরও একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা তাতে লিপিবদ্ধ রয়েছে ; কেটেফেলা ওক গাছটাকে চিরে তক্তা বানিয়ে তা দিয়ে জমিদার-বাড়ির ঘরের বাইরের দরজাগুলি তৈরি করা হয়েছিল।

আরও অনেকগুলি প্রাচীন বই খুলে বসলাম : ওড্‌থর্পের বংশধরদের কোন হদিস যদি মেলে।...পাতা ওল্টাতেই স্থানীয় ভদ্রলোকদের কিছু কালির আঁকা প্রতিকৃতি চোখে পড়ল—আমার শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হবার উপক্রম হল। জীর্ণ হলুদ পাতায় আঁকা যে তীক্ষ্ণ, গভীর চোখগুলি আমার দিকে তাকিয়ে আছে তার উপর ঝুঁকে পড়লাম। এমন কি ছবির নীচেকার পরিচয়-লিপি পড়বার আগেই বুঝতে পারলাম যে এটা ওড্‌থর্পেরই প্রতিকৃতি। কারণ সে মুখে মারগ্রেভের মুখটাই যেন কেটে বসানো।

ছবি ও তার চিন্তার মধ্যে এতই ডুবে গিয়েছিলাম যে সহকারীটি এসে লাইব্রেরি বন্ধ হবার সময় হয়েছে জানাতে আমি চমকে উঠলাম। বাইরে বেরিয়ে এলাম। একটা বাতাস উঠেছে। কাটা ঘাসগুলো বাতাসে উড়ছে। সবুজ মাঠের এক প্রান্তে বসে ওয়েণ্ডি ও মারগ্রেভ গভীর আলোচনায় রত।

দৃশ্যটিতে দোষের কিছু নেই : তবু কেমন যেন দৃষ্টিকটু লাগল। বাতাসে ওয়েণ্ডির চুল উড়ছে, আর মারগ্রেভের গাউনটা উড়ছে বাদুরের কালো ডানার মত।

তাড়াতাড়ি সেখান থেকে চলে গেলাম বৃত্তাকার গুঁড়িটার পাশ দিয়ে। আসনটার মাপ দেখেই বোঝা যায় যে গাছটার বেড় ছিল প্রায় চার ফুটের মত...

জমিদার-বাড়িতে ফিরে গেলাম। ডিয়েকন চিন্তিত মুখে অন্ধকার বারান্দায় পায়চারি করছে। মুখোমুখি হতেই সে চমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। উঁচু জানালা দিয়ে আসা ম্লান আলোয় তার মুখটাকে হতশ্রী দেখাচ্ছে।

"কোন অঘটন ঘটেছে কি ?" শুধালাম।

"হ্যাঁ। আমি—" তার এক হাতে নোট-খাতার একটা ছেঁড়া পাতা

থর্‌থর্ করে কাঁপছে। "এখন ওযেণ্ডি ঘরে নেই, অথচ সেই শব্দটা এখনও শুনতে পাচ্ছি।"

সে পিছন ফিরে তাকাল। ওকের দরজাটা খোলা; ঘরের চৌকাঠ থেকে দিনের আলো ছড়িয়ে পড়েছে।

"লেস্, গাছের গল্পটা কি সত্যি তুমি বানিয়ে বলেছিলে?" আমি থামলে সে অন্যমনস্কভাবে মাথা নাড়ল। "তাহলে ঐ শব্দটা সত্যি হয় কেমন করে? আর তা শুনে তুমি পালিয়েছই বা কেন?"

তাকে তার ঘরে নিয়ে যেতে চেষ্টা করলাম, কিন্তু নিজেকে সে ছাড়িয়ে নিল।

"না!" দেয়ালে-দেয়ালে তার কণ্ঠস্বর প্রতিধ্বনিত হল। "ওক কাঠের দরজা বন্ধ করে···পড়তে চেষ্টা করলাম · করাত চলতে আরম্ভ করল···পিছনে—সামনে।" সে মুঠোর ভিতরকার দলা-পাকানো কাগজখানার দিকে তাকাল। "তারপর কোন রকমে এইটুকু লিখেছি—তারপরই শুরু হল ডাল-পালা কাটার শব্দ।"

একটু শান্ত করার জন্য তাকে আমার ঘরে নিয়ে গেলাম।

"ওয়েণ্ডির সঙ্গে তোমার আবার কখন দেখা হবে?"

"আজ রাতে তার আসার কথা আছে।" ডিয়েকন মাথার পেরেকের মত খাড়া চুলে হাত বুলাতে লাগল। হঠাৎ সে পাগলের মত প্রশ্ন করল: "সে তো বলছে আমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে; তোমার কি ধারণা সে ঠিক কথাই বলছে? আমরা যেন পরস্পরকে এখন আর ঠিক-ঠিক বুঝতে পারছি না।"

"লেস্, আমার কথা শোন। অবস্থার মোকাবিলা করতে চেষ্টা কর, নইলে এ সবের পিছনে কি আছে তা কোনদিন বুঝতে পারবে না। আজ কি একটু শক্তির পরিচয় দিতে পারবে না—ওকের দরজাটা বন্ধ করতে পারবে না?- হয় তো তাতে শব্দটা এত জোরে হবে যে ওয়েণ্ডিও শুনতে পাবে। তাকে অন্তত এটা বোঝাতে পারবে যে দুজন একত্র হলে তোমরা সবকিছুর মুখোমুখি দাঁড়াতে পার।" এইভাবেই এ ভয় তোমাকে জয় করতে হবে।"

তখনকার মত প্রস্তাবটা বেশ ভালই মনে হল। কিন্তু সেটা যে এতখানি কার্যকর প্রমাণিত হবে তা আমি ভাবতেই পারি নি।

তার ঠোঁট দুটো কুঁচকে যেতে লাগল। "কিন্তু, কি জান—মারগ্রেভ—"

"মারগ্রেভের আবার কি হল-?"

ডিয়েকন ইতস্তত করল। "কিছু না।" মুখটা মুছল। চোখে যেন ভয়ের ঝিলিক।

আমি সরল বিশ্বাসে বললাম, "যদি প্রয়োজন মনে কর, যখন ওকের

দরজাটা বন্ধ করবে তখন আমি বাইরে থেকে নজর রাখতে পারি।"

সে ঘাড় নেড়ে বলল, "ঠিক আছে। চেষ্টা করব।"

সে-রাতে ডিনার খেতে গেলাম না। ডিয়েকনকে না জানিয়ে ওয়েণ্ডির কলেজে গিয়ে তার সঙ্গে দু' একটি কথা বললাম। আমি যে জানতে পেরেছি যে ডিযেকনের গল্পটা সত্যি সেকথাও তাকে সংক্ষেপে বললাম।

"ওয়েণ্ডি, তুমি যদি চাও সে এ ভযটা কাটিযে উঠুক, তাহলে তোমাকেই তাকে সাহায্য কবতে হবে। আজ রাতে সে ওকের দরজাটা বন্ধ রাখতে রাজী হযেছে—যদিও শব্দটা আরও বেড়েছে। কাজেই সে যাতে দরজাটা বন্ধ রাখে সেটা অবশ্য দেখবে।"

স্কার্ফটা নাডতে নাড়তে ওযেণ্ডি বলল, "আর সে যদি আবার শব্দটা শুনতে পায—তাহলে? তখন আমি কি করব?"

"শুধু শুনে যাবে। মনে বেখো, এটা তোমাব কাছে সাধারণ ব্যাপার হলেও তার পক্ষে মাবাত্মক বকমের গুরুতর।"

"কিন্তু আমি যদি তখনও কিছু শুনতে না পাই?" আমি কি তবু শোনার ভান করব? না কি তাকে বোঝাতে চেষ্টা করব যে শব্দ-টব্দ কিছু সেখানে নেই?"

"সেটা তুমি যা ভাল বুঝবে তাই করবে; শুধু তাকে একটু সহানুভূতি দেখাবে। এ ব্যাপারটা বেচারাকে ছিঁড়ে-ছিঁড়ে খাচ্ছে।"

সেই মুহূর্তে আমার মনে হল, তার আচরণ যেন একটু অন্যরকম, যেন আমার কৌতূহল দেখে সে সন্তুষ্ট নয়। মারগ্রেভের কথা মন থেকে মুছে ফেললেও হঠাৎ আমার মনে একটা সন্দেহ ঝিলিক দিয়ে উঠল। বললাম, "তুমি তো এখনও লেস্‌লিকে চাও, তাই না?"

"তাকে চাই কি না?" ওযেণ্ডির মুখে বিষণ্ণতার ছাযা। "চাইতাম, কিন্তু—নরম্যান, তোমাকে খোলাখুলি বলাই ভাল। আজ রাতে আমি—আমি তার সঙ্গে সব সম্পর্ক ছিন্ন করতে চাই।"

অবিশ্বাসের ভঙ্গীতে তার দিকে তাকালাম। "কিন্তু কেন? কারণটা কি—?"

"জ্যাক মারগ্রেভ।" ওয়েণ্ডি বিচলিত বোধ করল, হযতো কিছুটা ভযও পেল। তারপর চোখ তুলে আমার দিকে তাকাল। "কাজেই আজ রাতে যখন লেস্‌লির ঘরে যাব তখন সত্যি আমি চাইব না যে সে ওকের দরজাটা বন্ধ করুক। কিন্তু তুমি যদি মনে কর তাতে তার ভাল হবে—তাহলে সে যাতে ওকের দরজাটা বন্ধ করে সেই কাজই আমি করব।"

এ কথার জবাব দেওয়া শক্ত। "ভাল। ধন্যবাদ ওয়েণ্ডি। কিন্তু খুব সাবধান।" এই সতর্ক-বাণী শুনিয়েই ক্ষুব্ধ অন্তরে সেখান থেকে চলে এলাম।

ওয়েণ্ডি ও মারগ্রেভ···এ যে কল্পনার অতীত এক রূপকথা। আমি মন

থেকে সন্দেহটা বাতিল করতেই চাইলাম, কিন্তু পারলাম না।

মাথার উপরে শিসের কফিনের মত ধূসর ও ভারী মেঘের দল উড়ে চলেছে। কলেজে ফিরে দেখলাম, বাতাসের দিকে মাথা নুইয়ে ডিয়েকন এগিয়ে আসছে—আসছে ওয়েণ্ডিকে নিয়ে যেতে। তাকে এড়াবার জন্য একটা গলিতে ঢুকে পড়লাম। নিজেকে বারবার প্রশ্ন করতে লাগলাম, কাজটা ভাল করলাম কি? ভারী আকাশের মত সংকটটাও ভারী হয়ে আমার উপর চেপে বসল।

জমিদার বাড়ির ভিতরে পাথরের বারান্দায় বাতাসের দীর্ঘশ্বাস শোনা যাচ্ছে। থামলাম। বারান্দার শেষ প্রান্তে ডিয়েকনের দুটো দরজাই সপাটে খোলা; একটা সুবাস আমার নাকে এল। সিঁড়িতে একটা পায়ের শব্দ শুনে চমকে উঠলাম। মুখ ফিরিয়ে দেখি, মারগ্রেভ আমার পিছনে দাঁড়িয়ে আছে, আমাকে পাশ কাটিয়ে যেতে চায়।

ডিয়েকনের ঘর থেকে যে মৃদু আলো আসছিল তাতেই দেখলাম তার মুখটা ছাইয়ের মত সাদা, চোখের কোণে কালি। সরে দাঁড়ালাম, আর সেও নিঃশব্দে মৃদু হেসে সিঁড়ি বেয়ে তার দোতলার ঘরে উঠে গেল। লাইব্রেরিতে দেখা প্রতিকৃতির সঙ্গে তার মুখের মিলটা লক্ষ্য করার মত। সেই ভূতুড়ে প্রভাবটা মন থেকে তাড়াতে ডিয়েকনের দরজাটাকে ভাল করে দেখার জন্য সেইদিকে এগিয়ে গেলাম।

অসাধারণ কিছুই চোখে পড়ল না। জমিদার-বাড়ির অন্য সব ঘরের মতই ভিতরের ও বাইরের দরজার মাঝখানে ফুট চারেকের মত ফাঁকা জায়গা রয়েছে—একটা ছোটখাট অলিন্দের মত। বাইরের ওকের দরজাটা মজবুত। মুহূর্তের জন্য সেটাকে বন্ধ করলাম; লোহার মোটা হুড়কোটা পরীক্ষা করে দেখলাম। ঘরে অগ্নিকুণ্ডটা জ্বলছে; তারই টানে দরজার নীচ দিয়ে এক ঝলক হাওয়া ঘরে ঢুকল।

অলিন্দটার একপাশে একটা কাবার্ড বসানো। দু'একটা ঘর মোছার বাসন ছাড়া কাবার্ডটা খালি পড়ে আছে। হঠাৎই কথাটা মনে এল—এখানে লুকিয়ে থাকলে কেমন হয়?

গোয়েন্দাগিরি? না, আমি তো কথা দিয়েছি, ডিয়েকনের ঘরের উপর নজর রাখব। তাড়াতাড়ি সেখানে লুকিয়ে পড়লাম। অচিরেই পায়ের শব্দ ও তাদের কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম।

তারা অলিন্দে পা রাখল। ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলে ডিয়েকন ওকের দরজাটা ঠেলে বন্ধ করে হুড়কোটা তুলে দিল। "খুশি হয়েছ?" সাহস দেখিয়ে ডিয়েকন কথাটা বলল ওয়েণ্ডিকে। তারা ঘরে ঢুকে ভিতরের দরজাটাও বন্ধ করে দিল।

আলো আসার সব পথ বন্ধ হয়ে গেল। কাবার্ডের ভিতরটা কয়লা-

কালো। নড়তে-চড়তেও পারছি না, পাছে ঘর মোছার বাসনপত্রের শব্দে ডিয়েকন ও ওয়েণ্ডি ভয় পায়। অগ্নিকুণ্ডের কয়লার মধ্যে লোহার শিক নাড়া-চাড়ার শব্দ শুনতে পেলাম। আগুন যতই জোরদার হচ্ছে ততই দরজার ফাঁক-ফোকড় দিয়ে বেশী করে বাতাস ভিতরে টানছে।

তাদের অস্পষ্ট কথাবার্তা কানে এল।

ওয়েণ্ডি বলল, "জ্যাক মারগ্রেভ সম্পর্কে যা বললাম সেটা বুঝতে পারছ?"

আচ্ছা—তাহলে এর মধ্যেই কথাটা বলা হয়ে গেছে।

"না।" ডিয়েকনের উচ্চ কণ্ঠস্বরে অসন্তুষ্টির আভাষ। "ওই লোকটার মধ্যে তুমি যে কি দেখেছ আমি বুঝিনা। ও তো একটা কীট মাত্র··· আজ রাতে এখানে আসাই আমাদের উচিত হয় নি। কোন অর্থ হয় না।"

"চূড়ান্ত আলোচনার পক্ষে এটাই উপযুক্ত স্থান।···আর কিছু না হোক, স্থানটার একটা ঐতিহ্য আছে। তাছাড়া এভাবে এখানে আসা—এটা আমাদের অনেক দিনের অভ্যাস।"

মনে মনে বললাম, অভ্যাসই বটে।···এই ঘর যেখানে তারা পরস্পরকে ভালবেসেছে, ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখেছে, আজ রাতে সেখানেই তারা এসেছে কোন অশুভ শক্তির টানে। না-বলা কারণটা তো তারা দুজনই জানে; তারাই লেস্‌লিকে টেনে এনেছে এই গোলকধাঁধার পথে।

ওয়েণ্ডি ভাঙা গলায় বলল, "লেস্‌লি, আমার কথা শোন। দরজার কাছ থেকে এদিকে এস।"

ডিয়েকনের পায়ের শব্দ শুনতে পেলাম। আবার থামল। তার পরের প্রশ্নে ফুটে উঠল বিকারের বিকৃত স্বর। "তুমি কি কখনও মারগ্রেভকে বলেছ—মানে এখানে যা ঘটে সে কথা?"

কোন জবাব শুনতে পেলাম না। তারা চুপচাপ থাকায় মনে হল দুজনই বাতাসে কান পেতে আছে। অন্ধকারে চোখ ও কান দুইই খাড়া করলাম। আমার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে উঠেছে।

"ওয়েণ্ডি, মুখোমুখি দাঁড়িয়ে শব্দটাকে যদি তাড়িয়ে দিতে পারি ···তবু কি কোন আশা থাকবে না?···আমি বলতে চাই, তবু কি ভাঙা কাঁচ জোড়া লাগবে না···? ডিয়েকনের কণ্ঠস্বর মিলিয়ে গেল।

ওয়েণ্ডির অস্ফুট স্বর কোনক্রমে কানে এল। "আমি জানি না। সত্যি বলছি, আমি জানি না।" দরজার ফাঁক দিয়ে আসা একটা অপার্থিব আর্তনাদে সে কণ্ঠস্বর চাপা পড়ে গেল। তার পরেই—"লেস্‌লি, ঐ শোন···"

আমিও শুনতে পেলাম—বাতাসের আর্তনাদে একটা বিচিত্র ছন্দ বাজছে। চাপা নিঃশ্বাসের মত ছলনাময়ী।

"লেসলি।".

ওয়েণ্ডির আর্ত কণ্ঠস্বর। আমার মনেও কোন সন্দেহ রইল না। বুঝলাম, ডিয়েকন চলচ্ছক্তি রহিত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে ; আবার ও ওয়েণ্ডির চাইতেও স্পষ্টতর করে সে শুনেছে···করাতের কর্কশ ঘস্-ঘস্ শব্দ।

বাতাসের ঝাপ্‌টা এল। কাবার্ডের দরজাটা সশব্দে বন্ধ হয়ে গেল। চমকে উঠলাম। ঠেলে খুলতে গেলাম, কিন্তু সিট্‌কিনিটা পড়ে যাওয়াতে আমি ভিতরে আটকা পড়ে গেছি। হাত বেয়ে ঝরতে লাগল কপালের ঘাম। ঘস্-ঘস্ শব্দটা যেন আমার মাথাটাকেই চিঁরে ফেলছে। সব শক্তি হারিয়ে ফেললাম।···গাছের গুঁড়িটার মধ্যে করাতটা কেটে বসে যাচ্ছে।

আবার শুনতে পেলাম ওয়েণ্ডির চীৎকার—অনেক দূর থেকে। বহু শতাব্দীর চারদেয়ালের মধ্যে আমি বন্দী, একটা ওকগাছের ভিতরে সমাহিত, একপাটি নিষ্ঠুর দাঁত এগিয়ে আসছে আমার দিকে ; চোখ দুটোকে উপরে তুলে দরজার উপর চাপ দিয়ে হাঁপাতে লাগলাম। দরজার কাঠ যন্ত্রণায় আর্ত-নাদ করে উঠল। শব্দায়মান ধাতুর মত কানে বাজছে আমারই রক্তের স্রোত। চোখের মণিতে আলোর ফুল্‌কিগুলো নাচছে করাতের সাদা গুঁড়োর মত—ধারালো করাতের উপর সূর্যরশ্মির মত।

অনেক দূর থেকে বাতাসে ভেসে এল সুরার মদির গন্ধ। কানে এল ঘুসির শব্দ, দূরাগত চীৎকার। আমি সম্পূর্ণ বিহ্বল, কিন্তু মনে হল সেটা মারগ্রেভের কণ্ঠস্বর। পাগলের মত বিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে লাফ দিলাম। হঠাৎই কাবার্ডের সিট্‌কিনিটা ভেঙে পড়ে গেল। বেরিয়ে এলাম অন্ধকার অলিন্দে। ঝড়ের আর্তনাদ রূপান্তরিত হল গাছ কাটার শব্দে, একটা শক্তি-শালী কিছুকে যেন বিদীর্ণ করা হচ্ছে।

ওকের দরজাটা সশব্দে দেয়ালের উপর আছড়ে পড়ল। আমার কাঁধে ভয়ংকরভাবে আঘাত করল ; ঘুরে দাঁড়াতেই মারগ্রেভের মুখোমুখি। বারান্দার অস্পষ্ট আলো-ছায়ায় কালো রেখাচিত্রের মত টলতে টলতে সে এগিয়ে আসছে।

কাঁধে ভীষণ যন্ত্রণা ; কোন কিছুই ভালভাবে বুঝতে পারছি না। কান রয়েছে ওয়েণ্ডির চীৎকারের দিকে। সে চীৎকার ডিয়েকনের ঘর থেকে আসছে না, আসছে চারশ' বছরের সময়-সমুদ্রের ওপার থেকে।

মারগ্রেভের সাহায্যে ভিতরের দরজাটাও খুলে ফেললাম।

মুহূর্তের জন্য অতীতের ছায়া ঘরটাকে ঢেকে দিল, কিছুই চিনতে পারছি না। সন্তকাটা করাতের গুঁড়ো, ডালপালা ও ঘামের গন্ধে আমার মাথাটা ঘুরে গেল। বাতাসের হাহাকার কমে আসার সঙ্গে সঙ্গে সে অবস্থাটাও কমে গেল। দেখলাম, বুক-কেসে হেলান দিয়ে ওয়েণ্ডি কাঁদছে। মারগ্রেভ ততক্ষণে তার কাছে গিয়ে গলা জড়িয়ে ধরে তাকে সান্ত্বনা দিচ্ছে। মুখ ফেরাতেই মেঝেতে চোখ পড়ল—সন্ধ্যার আবছা আলোয় দেখলাম রক্তের স্রোতে

ভাসছে লেস্‌লি ডিয়েকনের বিচূর্ণিত দেহ—যেন প্রচণ্ড জোরে আঘাত করে কেউ তাকে মেরে ফেলেছে।

মারগ্রেভ ওয়েণ্ডিকে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল স্পষ্ট দেখলাম, ওয়েণ্ডি খুঁড়িয়ে হাঁটছে ···।

আর তখনই ডিয়েকনের রক্তাক্ত হাতের কাছে চেয়ারের নীচে পেলাম সেই একটিমাত্র ওকের বীচি যেটাকে আমি বিশ বছর ধরে আমার কাছে রেখে দিয়েছি।

আমি বিশ্বাস করি না যে বীচিটা তার আঙুলের ফাঁক দিয়ে গড়িয়ে সেখানে গিয়ে পড়েছে। অশুভ শক্তিকে দূরে রাখার জন্য কোন স্মারক সঙ্গে রাখার মত ছেলে সে নয়।

তবু অতীতের কথা ভাবতে বসলেই মনে পড়ে, আমি স্পষ্ট শুনেছিলাম মারগ্রেভ ওয়েণ্ডিকে ডেকেছিল। কিন্তু সে-কথা সে অস্বীকার করেছে। ছু' জনের কাউকেই আর কোন দিন আমি দেখতে পাই নি। ডিয়েকনের মৃত্যুর ছ'মাস পরেই তাদের বিয়ে হযেছিল। ওয়েণ্ডির দৈহিক কোন ক্ষতি হয় নি, তবে যতদূর জানি সে এখনও খুঁড়িয়েই হাঁটে। · সে রাতে সেই ঘরের মধ্যে আসলে কি ঘটেছিল—কোন তদন্তেই তা প্রকাশ পায় নি। ওয়েণ্ডির কথাও সকলে বেমালুম ভুলে গেছে।

নিজেকে সব সময়ই বোঝাই—আমার তো কোন দোষ ছিল না। কিন্তু হয় তো একটা অপরাধবোধ থেকেই আবার দুঃস্বপ্নটা ফিরে এসেছে। রসায়ন শাস্ত্রের লেক্‌চারার হয়েই আমি এখানে ফিরে এসেছি। আর ভাগ্যের কী নিষ্ঠুর খেলা—ডিয়েকনের সেই পুরনো ঘরটাতেই আমাকে থাকতে দেওয়া হয়েছে। ঘরটা এখনও সেইরকম অসংস্কৃত সেকেলে অবস্থাতেই আছে।

সেই বীচিটাকে রাখার আর কোন মানে হয় না। সেটাকে পুড়িয়ে নষ্ট করে দিলে হয় তো এই ভৌতিক দুঃস্বপ্নের হাত থেকে মুক্তির একটা সুযোগ পেতে পারি।

কিন্তু, সেবিষয়েও আমি খুব নিশ্চিত নই···আগুনের শিখার মধ্যে বীচিটা পুড়ছে। বাইরের দরজায় হুড়কোটা এঁটে দিয়ে এই কাহিনী লিখছি। করাত চলার মৃদু ফিস্‌ফিস্‌ আওয়াজ যেন শুনতে পাচ্ছি।

Sport of the Oak—Kenneth Harker

কে জানে ?

হা ঈশ্বর, হা ঈশ্বর ! শেষ পর্যন্ত সেই কাহিনী আমাকেই লিখতে হবে ? কিন্তু আমি কি তা পারব ? লিখতে সাহস করব ? এত অদ্ভুত, এত দুর্বোধ্য, এত জটিল যে তাকে সুষ্ঠুভাবে প্রকাশ করাই যে কষ্টকর।

আমি যা দেখেছি তা যে ভুল নয়, আমার চিন্তার মধ্যে যে কোন ভ্রান্তি নেই, ঘটনাবলীর সূক্ষ্ম আর নির্মম পর্যালোচনার ভেতরে আমার যে কোন ফাঁক নেই—এ বিষয়ে যদি আমি নিশ্চিৎ না হতাম তাহলে আমি ভাবতাম যে আমি যা দেখেছি তা অবাস্তব…সম্পূর্ণরূপে দৃষ্টি বৈক্লব্য—মরীচিকা। অথবা, তাই যে নয়, সেকথা কে-ই বা বলতে পারে ?

আজ আমি বেসরকারী একটি উন্মাদ আশ্রমে। ভীতির কবলে প'ড়ে আমি যে স্বেচ্ছায় এখানে এসেছি সেটা আমার বিজ্ঞতার পরিচয় দেয়। একটি মাত্র জীবন্ত মানুষই আমার এই কাহিনী জানেন ; তিনি হচ্ছেন এখানকার ডাক্তার। সেই কাহিনীই এখানে আমি লিখছি। কেন লিখছি তা আমি জানিনে। বুকের মধ্যে এ-কাহিনী গুমরে-গুমরে ওঠে . দুঃস্বপ্ন দেখার মত আঁৎকে উঠি আমি। এই কাহিনী প্রকাশ ক'রে দিলে ভেতরটা হালকা হয়ে যাবে। সেই জন্যেই এই কাহিনী আমি লিখতে বসেছি।

চিরকালই আমি লৌকিক সমাজ থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রেখেছি ; মনটা আমার সর্বত্যাগী দার্শনিকের মত। মানুষ বা ভগবান…কারও বিরুদ্ধেই আমার কোন অভিযোগ নেই ; চিরকাল অল্পেতেই আমি খুশি। চিরকালই আমি নিঃসঙ্গ ; মানুষের সংস্পর্শ আমার ভাল লাগে না—কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করি আমি, কেন করি, তা আমি জানিনে ; বলতেও তা আমি পারব না। লোকজনের সঙ্গে দেখা করতে আমার কোন আপত্তি নেই ; তাদের সঙ্গে আমি গল্পও করি, বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে হোটেলে ব'সে খাওয়া-দাওয়াও করি। কিন্তু ওই পর্যন্ত—বেশীক্ষণ কারও কাছে ব'সে থাকলেই আমার গা ঘিন-ঘিন করে ; এমন কি যারা আমার অত্যন্ত অন্তরঙ্গ তাদেরও যেন বেশী-ক্ষণ সহ্য করা আমার পক্ষে কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়। তাদের তাড়াতাড়ি বিদায় দেওয়ার জন্যে অস্থির হয়ে উঠি, নিজের মধ্যে গুটিয়ে নিতে চাই নিজেকে।

এই আকাঙ্খাটা নিছক আকাঙ্খা নয়—এটা ছিল অপ্রতিরোধ্য একটি প্রয়োজনীয়তা। যদি তাদের কাছ থেকে সরে আসতে না পারতাম, যদি আমাকে বাধ্য হয়ে তাদের সঙ্গে বেশীক্ষণ থাকতে হোত তাহলে মনে হোত এখনই একটা দুর্ঘটনা ঘটবে আমার। কী রকম দুর্ঘটনা ? কে জানে ? হয়ত, আমি মূর্ছিত হয়ে পড়ব, হ্যাঁ। হয়ত বা !

নির্জনতার ওপরে আমার এমন একটা টান ছিল যে আমার ঘরে শুয়ে

কেউ ঘুমোচ্ছে এটা ভাবতেও আমার অস্বস্তি লাগত। প্যারিসে আমি থাকতে পারিনে, কারণ সেখানে থাকতে আমার অবর্ণনীয় কষ্ট হয়। মনে হয় আমার আত্মিক মৃত্যু হয়েছে। মানুষের ভিড়ে সারা শহরটাই গম-গম করতে থাকে। সে-শব্দের যেন বিরাম নেই, বিশ্রাম নেই। শহরটা যখন ঘুমিয়ে পড়ে তখন-ও যেন সেই শব্দ বিনিদ্র রাত্রী যাপন করে। জীবন্ত মানুষের আলাপের চেয়ে ঘুমন্ত মানুষের নির্বাক অস্তিত্ব আমার কাছে অনেক বেশী উপাদেয়। কেন আমাকে বিধাতা এমন ক'রে সৃষ্টি করলেন? কে জানে? এর কারণটা সম্ভবত সহজ। নিজের বাইরে অন্য কারও অস্তিত্ব আমি সহ্য করতে পারতাম না।

পৃথিবীতে দু'জাতের মানুষ রয়েছে। একদল নির্জনতাকে আদৌ সহ্য করতে পারে না। মনে হয়, নির্জনতা তাদের বুকে পাষাণের মত চেপে বসে—তুষার-প্রবাহের মত বিরাট একটা স্তূপ ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদের ওপরে। নির্জনতা শ্বাসরুদ্ধ ক'রে দেয় তাদের। আর একদল রয়েছে যারা নির্জনতায় ফিরে পায় নিজেদের, স্বস্তির, মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচে। আসল কথাটা হচ্ছে—এমন কিছু মানুষ রয়েছে যারা বাইরের জগতে বাস করতে ভালবাসে; আর একদল রয়েছে যারা ভালবাসে নিজেদের মধ্যে গুটিয়ে নিয়ে বেঁচে থাকতে। আমি সেই দ্বিতীয় জাতের।

ফলে, জীবন্ত প্রাণীর চেয়ে জড়দেরই আমার ভাল লাগত বেশী। আর সেই জন্যেই আমার বাড়িটাই হয়ে উঠেছিল আমার জগৎ; আমার ঘরের আসবাবপত্র, ছোট-খাট অসংখ্য জিনিসের সাহচর্য আমার কাছে বেশী কাম্য ছিল; তারাই নির্বাক সাহচর্যে আমার নিঃসঙ্গ দিনগুলিকে ভরাট ক'রে রেখেছিল। বাইরে থেকে দেখতে না পাওয়া যায় এইভাবে ঘরের উঠোনে একটা সুন্দর বাগান তৈরি করেছিলাম আমি। শহর থেকে কাছেই ছিল আমার বাড়ি। প্রয়োজনমত সহজেই শহরে যেতে পারতাম আমি। আমার ঘরের চৌহদ্দী ছাড়িয়ে দূরে কিচেন-গার্ডেনের পাশে একটা ছোট বাড়ি ছিল। আমার চাকর-বাকররা রাত্রে সেইখানেই ঘুমতো। বাগানের বিরাট-বিরাট গাছের ছায়ার নীচে রাত্রির অন্ধকারে গভীর সুষুপ্তিতে আমার বাড়িটি আচ্ছন্ন হ'য়ে আসত। অনেকক্ষণ ধরে সেই সুপ্তি উপলব্ধি করতে-করতে আমি বেশ দেরী ক'রেই ঘুমোতে যেতাম।

সেই বিশেষ দিনটির কথা বলছি। স্থানীয় একটি থিয়েটারে সে-রাত্রিতে "সিগার্ড" অভিনীত হ'ল। এত সুন্দর সঙ্গীতমুখর নাটক জীবনে আর আমি শুনি নি। মন আর প্রাণ আমার ভরে উঠেছিল একেবারে। মাথার মধ্যে সুরের সেই ঝঙ্কার নিয়ে হেঁটেই বাড়ি ফিরছিলাম আমি। চোখে তখন আমার স্বপ্নের মাদকতা; অন্ধকার, অন্ধকার! চারপাশে অন্ধকার নেমে এসেছে আলকাতরার মত, এত অন্ধকার যে বড় রাস্তাটাও চিনতে পারা

আমার পক্ষে কষ্টকর হয়ে উঠেছিল। ফলে, বারবার আমি পথ থেকে নেমে খানার মধ্যে গিয়ে পড়ছিলাম। টোল-গেট থেকে আমার বাড়ি এক মাইলের কিছু কমই হবে; হাঁটা-পথে মিনিট কুড়ির মত; তাও ধীরে-ধীরে হাঁটলে, রাত্রি তখন হবে একটা কি দেড়টা। আকাশে পাণ্ডুর চাঁদের স্তিমিত আলো প্রহেলিকার মত ছড়িয়ে পড়েছিল চারপাশে। সেই আলোতে দূর থেকে আমার বাড়িটা দেখতে পেলাম আমি। যতই বাড়ির দিকে এগোতে লাগলাম, ততই কী জানি কেন—কেমন যেন অস্বস্তি লাগছিল আমার। চলার গতি কমিয়ে দিলাম আমি। সেই প্রাচীন অসংখ্য গাছপালার মধ্যে মনে হ'ল আমার বাড়িটা কবরের মধ্যে চুপ ক'রে শুয়ে রয়েছে।

গেটের দরজা খুলে ধীরে-ধীরে এগিয়ে গেলাম। দু'পাশে বড় বড় সাইকামোর গাছের সারি। সেগুলি পেরিয়ে গেলেই আমার বাড়ি; তাকে চারপাশ থেকে ঘিরে রেখেছে অসংখ্য ছায়া, ফুল, আর গাছের খিলান। বাড়ির মুখে গিয়েই থমকে দাঁড়ালাম। বিরাট একটা অস্বস্তি নেমে এল আমার ওপরে। কোথাও কোন শব্দ নেই, নড়ছে না গাছের কোন পাতা। মনে-মনে ভাবলাম—কী হ'ল আমার। গত দশটি বছর ধরে এই একই ভাবে রাত্রির অন্ধকারে, বৃক্ষ-পল্লবের অন্তরাল দিয়েই তো বাড়ি ফিরেছি আমি। কোনদিনই, কখনও কোন অন্ধকারে ভয় পাই নি। কোন লোক অসৎ উদ্দেশ্যে সামনে দাঁড়িয়ে থাকলে বিদ্যুতের বেগে তার ওপরে ঝাঁপিযে পড়তে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করতাম না আমি। তাছাড়া, আমার হাতে রিভলবার ছিল। কিন্তু রিভলবার ছুঁলাম না আমি। মনের মধ্যে যে আতঙ্ক উঁকি দিযে আমাকে গ্রাস করার জন্যে এগিযে আসছিল তার সঙ্গে একটা মোকাবিলা করার জন্যে প্রস্তুত হ'য়ে দাঁড়ালাম।

কিন্তু এটা কী? স্বপ্ন, মায়া, না মতিভ্রম? কী এটা? মনের মধ্যে অজানা একটা আতঙ্ক এইভাবে আমাকে আচ্ছন্ন ক'রে ফেলছে কেন? এ সেই রহস্যজনক রাত্রির প্রভাব যা ধীরে-ধীরে মনের মধ্যে সঞ্চারিত হয়ে মানুষকে গ্রাস ক'রে ফেলে! একে তো অগ্রাহ্য করা যায় না—বুদ্ধি দিয়েও বিচার করা যায় না যাকে—এইরকম উৎকট অনিবার্য একটা অনুভূতির উচ্ছ্বাস। হয়ত তাই হবে! কে জানে?

এক পা এক পা করে এগোই; আর আমার গায়ের রোঁয়াগুলি খাড়া হ'য়ে ওঠে। সেই বিরাট বাড়ির দেওয়ালের পাশে একটু দাঁড়ালাম। এর দরজা জানালা সব বন্ধ। দরজা খুলে ভেতরে ঢোকার আগে একটু অপেক্ষা করলাম। আমার ড্রয়িংরুমের পাশে একটা জানালা। তারই পাশে বাগান। সেইখানে বসার একটা বেঞ্চ। সেই বেঞ্চের ওপরে আমি একটু বসলাম। গাছের ছায়ার দিকে তাকিয়ে দেওয়ালে মাথা ঠেকিয়ে চুপচাপ বসে রইলাম একটু। অস্বাভাবিক কোন কিছু প্রথম দিকে নজরে পড়ে নি আমার।

কানের ভেতরে কেবল ভোঁ ভোঁ ক'রে একটা শব্দ হচ্ছিল। কিন্তু এ রকম শব্দ আমার কানে প্রায়ই হয়। মাঝে-মাঝে মনে হয় ট্রেণ চলার শব্দ হচ্ছে, মনে হয় ঘড়িতে সময় জ্ঞাপক শব্দ হচ্ছে—মাঝে-মাঝে মনে হয় অনেক মানুষের পদশব্দ শুনতে পাচ্ছি। তারপরেই সেই ভোঁ ভোঁ শব্দটা স্পষ্ট হয়ে উঠল। আমার ভুল হয়েছিল। ওই শব্দটা আমার বুক ধড়ফড়ানির শব্দ নয়; ওই শব্দটা আসছিল আমারই ঘরের ভেতর থেকে—একটা অদ্ভুত ঘঙ-ঘঙে জড়ানো-জড়ানো শব্দ—ঠিক কিসের শব্দ তা আমি বুঝতে পারলাম না। ঠিক শব্দ না ব'লে তাকে আলোড়ন বলাই উচিৎ—অনেক জিনিস একসঙ্গে টানার শব্দ—মনে হ'ল, কে বা কারা যেন আমার চেয়ার-টেবিল-আলমারি-গুলি ধরে টানাটানি করছে।

অনেকক্ষণ ধরে নিজের কানকেই আমি যেন বিশ্বাস করতে পারলাম না। কিন্তু জানালার শার্সির ওপরে কানটা চেপে ধরতেই বুঝলাম ঘরের ভেতরে অস্বাভাবিক কিছু একটা ঘটছে। ভয় পেয়েছিলাম সত্যি কথা; কিন্তু তার চেয়েও অবাক হয়েছিলাম অনেক বেশী। প্রয়োজন হ'বে না মনে ক'রেই আমি রিভলবারটা বার করলাম না। অপেক্ষা করতে লাগলাম।

কিন্তু অনেকক্ষণ অপেক্ষা ক'রেও কোন একটা সিদ্ধান্তে এসে পৌছতে পারলাম না। তারপর হঠাৎ মরিয়া হয়ে দরজার তালার মধ্যে একটা চাবি ঢুকিয়ে ঘোরালাম। জোরে ধাক্কা দিলাম কপাটে।

কপাট খোলার শব্দটা মনে হল কেউ পিস্তল ছুঁড়েছে। সবচেয়ে অবাক কাণ্ড, যেন তারই উত্তরের প্রতিবাদে দোতলা, একতলা, বাড়ির সর্বত্র তুমুল একটা হট্টগোল সুরু হল। সেই শব্দ এত আকস্মিক, এত ভয়ঙ্কর, এত তীব্র যে ভয় পেয়ে আমি কয়েক পা পিছু হটে গেলাম; এবং যদিও এখনও মনে করি যে কোন প্রয়োজন ছিল না তবু সেই সময় কোমর থেকে রিভলবারটা খুলে হাতে নিয়েছিলাম আমি।

অপেক্ষা করতেই লাগলাম আমি। কিন্তু বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। এতক্ষণে একটা অদ্ভুত শব্দ আমার কানে এসে লাগল—একটা অদ্ভুত ট্যাপ-ট্যাপ শব্দ সিঁড়ির ওপরে হ'তে লাগল; সে শব্দ জুতো বা চটি পায়ে দিয়ে চলাফেরা করার শব্দ নয়; মনে হল, কাঠের ক্রাচ নিয়ে কে বা কারা যেন হেঁটে-হেঁটে বেড়াচ্ছে। তারপরে হঠাৎ দেখলাম আমার দরজার সামনে একটা আর্ম চেয়ার, ওই বড় চেয়ারটার ওপরে ব'সে আমি পড়াশুনা করতাম, হেলতে-দুলতে এগিয়ে এল। তারপরে বেরিয়ে গেল সোজা বাগানের দিকে। তাকে অনুসরণ ক'রে বেরিয়ে গেল আমার বসার ঘরের চেয়ারগুলি; তারপরে এগিয়ে এল কুমীরের মত ছোট-ছোট পায়ে ভর দিয়ে আমার নীচু কোচ-গুলি। তারপরে ছাগলের মত লাফাতে-লাফাতে এল আমার ঘরের অন্যান্য চেয়ার; তাদের অনুসরণ করল শশব্যস্তে [illegible] আমার বাড়ির টুলগুলি।

আমার মনের অবস্থাটা কী একবার ভেবে দেখুন। ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে বসে রয়েছি আমি; আর আমার চোখের ওপর দিয়ে কদম-কদম এগিয়ে চলেছে আমার ঘরের আসবাবপত্রগুলি। পর-পর চলেছে—চেহারার অনুপাতে কেউ ছুটছে, কেউ বা আবার মন্থরগতিতে। আমার বিরাট পিয়ানোটা পাগলা ঘোড়ার মত ছুটে বেরিয়ে গেল; যাওয়ার সময় সুরের আমেজ ছড়িয়ে গেল চারপাশে। ছোট-ছোট জিনিসগুলো পিঁপড়ের মত গড়িয়ে-গড়িয়ে চলতে লাগল। ঘরের পর্দাগুলি অকটোপাশের মত শুঁড় বিস্তার ক'রে ছুটলো। তারপরে চোখে পড়ল আমার লেখার টেবিল। বেশ দামী, তার চেয়েও বড় কথা, আজকালকার দিনে ওরকম টেবিল একরকম দুষ্প্রাপ্য। ওর ভেতরে আমার অনেক গোপন চিঠি রয়েছে—রয়েছে আমার একান্ত গোপনীয় অনেক কাহিনী, অনেক ফটোগ্রাফও।

আর চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকা আমার পক্ষে কষ্টকর হ'য়ে পড়ল। চোরকে মানুষ যেমন পাকড়ে ধরে আমিও সেইরকম তাকে আঁকড়ে ধরলাম। সে আমাকে মাটির ওপর দিয়ে ঘষড়াতে-ঘষড়াতে টেনে নিয়ে চলল। তার গতি রোধ করতে না পেরে একসময় মাটির ওপরে পড়ে গেলাম আমি। তার পেছনে অন্যান্য আসবাবপত্র যেগুলি আসছিল তারা আমার দেহের ওপর দিয়ে নির্বিবাদে এগিয়ে গেল। মনে হ'ল পরাজিত কোন সৈনিকের বুকের ওপর দিয়ে বিজয়ী সেনানীরা যেন মাড়িয়ে-মাড়িয়ে চলছে; ভয় পেয়ে উঠে দাঁড়ালাম আমি। তারপরে আবার ঝোপের মধ্যে গিয়ে ঢুকলাম। দেখলাম, আমার চোখের ওপর দিয়ে আমার বাড়ির সমস্ত আসবাবপত্র নির্বিবাদে বাইরে বেরিয়ে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

তারপরে সেই শূন্য ঘরের মধ্যে আর একরকম শব্দ হ'ল—বাড়ির প্রতিটি ঘরের দেওয়ালে সেই বীভৎস শব্দগুলি প্রতিধ্বনিত হ'ল। সেই শব্দ হচ্ছে জানালা-দরজা বন্ধ করার শব্দ। প্রচণ্ড শব্দে কে বা কারা যেন বাড়ির অজস্র জানালা-দরজা বন্ধ ক'রে দিচ্ছে। সব শেষে বন্ধ হল সেই দরজাটা যেটা আমি বোকার মত প্রথম খুলে দিয়েছিলাম।

ভয় পেয়ে শহরের দিকে দৌড় দিলাম আমি; থামলাম একেবারে বড় রাস্তার ওপরে এসে। একটা পরিচিত হোটেলে গিয়ে বেল বাজালাম আমি। হাত দিয়ে গায়ের ধূলো ঝেড়ে নিলাম; তারপরে হোটেলের মালিককে বললাম আমার ঘরের চাবিটা কোথায় হারিয়ে ফেলেছি। তারা শোওয়ার ব্যবস্থা ক'রে দিল আমার। আমি চাদরে আপাদমস্তক ঢেকে শুয়ে পড়লাম। শুয়ে-শুয়ে সকাল হওয়ার অপেক্ষা করছিলাম আমি। আমার নির্দেশ ছিল সকাল হলেই যেন আমার চাকরদের জানানো হয়।

সকাল সাতটা নাগাদ আমার দরজায় টোকা পড়ল। চাকরটির মুখ তখন উত্তেজনায় কাঁপছে।

সে বলল—কাল রাত্রিতে ভয়ানক কাণ্ড ঘটেছে স্যার। বাড়ির সব আসবাবপত্র চুরি হ'যে গিয়েছে। এক রত্তি জিনিস বলতে আর কিছু নেই।

সংবাদটা শুনে আমি খুশি হলাম। কেন? কে জানে? মুখে আমি কিন্তু কিছু প্রকাশ করলাম না; কেবল বললাম—ওই লোকগুলিই তাহলে আমার চাবি চুরি করেছিল। এখনই পুলিশে সংবাদ দেওয়া উচিৎ। চল, আমিও যাচ্ছি।

পাঁচ মাস ধরে পুলিশের তদন্ত চলল। চোর বা জিনিসপত্র—কোন কিছুরই হদিস হ'ল না। হা ঈশ্বর! আমি স্বচক্ষে যা দেখেছি তা যদি তাদের বলতাম তাহলে ডাকাতদের বাদ দিয়ে আমাকেই তারা গারদের মধ্যে আটকে রাখতো।

আমি চুপ করেই রইলাম! বাড়িতে আর আসবাবপত্র ঢোকাই নি আমি। কী দরকার। আবার তারা ওইভাবে একদিন পালিয়ে যাবে। ওমুখোও আর আমি হই নি।

প্যারিসের একটা হোটেলে আস্তানা নিলাম আমি। ডাক্তারকে সব খুলে বললাম। ডাক্তার আমাকে বিদেশ ভ্রমণ করার উপদেশ দিলেন। আমি বিদেশ ভ্রমণে বেরোলাম।

২

সুরু করলাম ইতালী দিয়ে। সেখানকার সূর্য আমার উপকারই করল। জেনোয়া থেকে ভেনিস, ভেনিস থেকে ফ্লোরেন্স, সেখান থেকে রোম, রোম থেকে নেপলস্—ছ'টি মাস ধরে কেবল ঘুরতে লাগলাম আমি। তারপরে গেলাম সিসিলিতে। দেশটা গ্রীক আর নরম্যান-বিজয়ের প্রাচীন ধ্বংস-স্তূপের প্রতীকে বোঝাই। তারপরে গেলাম আফ্রিকাতে।

মার্সেলিস দিয়ে ফিরে এলাম ফ্রান্সে, দক্ষিণ ফ্রান্সের উজ্জ্বলতা সত্ত্বেও, মেঘলা আকাশ আমাকে যেন বিষণ্ণ ক'রে তুলেছিল। মনে হ'ল, আমার অসুখ একেবারে সারে নি। ফিরে এলাম প্যারিসে। মাসখানেকের মধ্যেই কেমন যেন অস্থির হয়ে উঠলাম আমি। তখন শরৎকাল, ঠিক করলাম, শীত আসার আগে আমি নরম্যাণ্ডির' দিকে যাব। সুরু করলাম রাওয়েন দিয়ে। দেশটির চারপাশে গোথিক কীর্তিগুলি বিকীর্ণ হ'যে রয়েছে। সপ্তাহখানেক তাদেরই মধ্যে ঘুরে বেড়ালাম আমি।

একদিন বিকাল প্রায় চারটে নাগাদ আমি একটি অদ্ভুত রাস্তার ওপরে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম। সেই রাস্তার পাশ দিয়ে কালির মত কালো জলের একটা স্রোত বয়ে যাচ্ছিল। ওখানকার বাসিন্দারা স্রোতটির নাম দিয়েছিল "রোবেক ওযাটার" তার চারপাশে পুরনো-পুরনো বাড়ি ছড়িয়ে রয়েছে। সেইখানেই অজস্র পুরনো আসবাবপত্র বিক্রীর দোকান পর-পর সাজানো।

সেগুলির দিকে হঠাৎ নজর পড়ল আমার। চারপাশে ভাঙা-চোরা টিনের দোকান, টালির ছাদ, ভাঙা ছাদ—তাদের একপাশে গলির মধ্যে কী অপূর্ব জায়গাই না খুঁজে বার করেছে ওরা। সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন দোকানগুলির মধ্যে নানান জাতীয় জিনিসপত্র, মাটি-পাথরের মূর্তি, গির্জার অলঙ্কার, মন্দির সারি-সারি সাজানো রয়েছে। কী আশ্চর্য নয়! সেইসব পরিত্যক্ত আবর্জনা—সংসারে যাদের প্রয়োজন শেষ হ'য়ে গিয়েছে—সেইসব জিনিস দিয়ে দোকানগুলি সাজানো।

এই পুরোনো জিনিসের ওপরে আমাব ঝোঁক চিরকালের। সেই ঝোঁকটাই হঠাৎ আমাকে ভেতরে তাড়িয়ে নিয়ে গেল। সেই পচা তক্তার ওপর দিয়ে আমি স্টলের পর স্টল ঘুরতে লাগলাম। কিন্তু একী! সেই পুরোনো আসবাবপত্রের কবরখানার ওপরে কী দেখলাম? দেখলাম, আমার সবচেয়ে সুন্দর একটি "ওয়ার্ডরোভ" চুপচাপ দাঁড়িয়ে রয়েছে। কাঁপতে-কাঁপতে সামনের দিকে এগিযে গেলাম আমি। ভযে হাত-পা আমার এতই কাঁপতে লাগল যে তার গাযে যে হাত দেব সে সাহসটুকু পর্যন্ত আমি হারিযে ফেললাম। না; এটি আমারই। তৃতীয লুই-এর আমলের একটি অনবদ্য বস্তু। একবার যে দেখেছে সে-ই একে চিনতে পারবে। বিস্মিত নয়নে এদিকে-ওদিকে চাইতে লাগলাম। ওই · ওই যে আমার আর্ম চেয়ারগুলি; তাদের পেছনে দ্বিতীয় হেনরীর আমলের আমার তুটি টেবিল মিট মিট ক'রে আমার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। এগুলিকে দেখার জন্যে প্যারিস থেকে মানুষ আমার বাড়িতে ছুটে আসত।

তখন আমার মনের অবস্থাটা কী একবার ভেবে দেখুন।

অন্ধকার যুগের নাইটরা যেমন বীরের মত মায়ার রাজত্বে প্রবেশ করতেন আমিও তেমনি বীরের মত আসবাবপত্রের অরণ্যের মধ্যে প্রচণ্ড মানসিক বিভ্রান্তি নিয়ে ঢুকে গেলাম! হরি, হরি! যত ভেতরে ঢুকে যাই ততই আমার বাড়ির পলায়মান আসবাবপত্রগুলি আমার চোখে পড়ে। আমার সব আসবাব এইখানে এসে জমেছে!

আমি সেই প্রায়ান্ধকার গ্যালারির ওপরে উঠতে লাগলাম। হ্যাঁ, সবই এখানে রয়েছে, একমাত্র আমার সেই লেখার টেবিলটি ছাড়া। তারই ভেতরে আমার চিঠিপত্র ছিল। সেটিকে আমি দেখতে পেলাম না। তাকিয়ে দেখলাম, আমি একা। কেউ কোথাও নেই। আমি চীৎকার ক'রে ডাকলাম। কেউ সাড়া দিল না। সেই বিরাট চৌহদ্দীর মধ্যে আমি একেবারে একা।

অন্ধকার নেমে এল। আমারই একটা চেয়ারের ওপরে আমি বসে রইলাম। ঠিক করলাম ওখান থেকে নড়ব না। মাঝে-মাঝে চীৎকার করে ডাকি—কে হে? কে আছ?

প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে মনে হ'ল আমি যেন কার পায়ের শব্দ শুনলাম—খুব আস্তে-আস্তে কে যেন চলাফিরা করছে। কোন্ দিকে তা আমি বলতে পারব না। একবার মনে হ'ল পালিয়ে যাই। তারপরে সাহস ক'রে আর একবার হাঁক দিলাম আমি। দেখলাম পাশের দোকানে আলো জ্বলছে।

কে যেন জিজ্ঞাসা করল—কে ওখানে ?

বললাম—একজন খরিদ্দার।

এইভাবে এত দেরীতে দোকানে !

আমি একঘণ্টা ধরে অপেক্ষা করছি।

আগামী কাল আসতে পারতেন।

আগামী কাল এখান থেকে আমি চলে যাব।

আমিও এগিয়ে যেতে সাহস করলাম না ; সে-ও সাহস করল না এগিয়ে আসতে। বললাম—আপনি আসছেন ?

আমি আপনার জন্যে অপেক্ষা করছি।

তার দিকে এগিয়ে গেলাম আমি। ঘরের মাঝখানে একটা ক্ষুদে রোগা, বীতিকিচ্ছি চেহারার লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে। লম্বা হলদে দাড়ি ; মাথায় একগাছিও চুল নেই ; একটা বাতি নিয়ে সে আমার দিকে তাকাল। সেই আলোতে দেখলাম—তার মুখ কুঁচকে গিয়েছে ; ফোলা-ফোলা ; তার চোখ দুটো বাইরে থেকে দেখা যাচ্ছে না।

তিনটে চেয়ারের জন্যে, ওইগুলি আমারই ; দরকসাকসি ক'রে সেইখানেই তাকে অনেকগুলি টাকা দিলাম। নাম বললাম না ; শুধু বললাম আমার হোটেলের ঘরের নম্বরটি। ঠিক হ'ল পরের দিন সকাল ন'টার মধ্যে সেগুলি আমার হোটেলে সে পৌঁছে দেবে।

আমি বেরিয়ে এলাম। সে বেশ নম্রভাবেই দরজা পর্যন্ত আমার সঙ্গে এগিয়ে এল।

বেরিয়ে এসে আমি সোজা পুলিশ ফাঁড়িতে গিয়ে সব কথা বললাম। পুলিশের কর্তা তক্ষুণি যে বিভাগ চুরির তদারক ক'রে সে বিভাগে ব্যাপারটা অনুসন্ধান করার জন্যে টেলিগ্রাম করলেন। উত্তরের জন্যে আমাকে একটু অপেক্ষা করতে বললেন। ঘণ্টাখানেক পরে যে উত্তর এল তাতে আমি সন্তুষ্ট হলাম। উত্তরটি হচ্ছে—আমি এখনই লোকটাকে গ্রেপ্তার করিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করতাম ; কিন্তু সম্ভবত, লোকটা কোনরকম সন্দেহ ক'রে জিনিস-পত্রগুলি নিয়ে কেটে পড়েছে। ঘণ্টা দুই পরে আপনি যদি নৈশ-ভোজ সেরে আমার সঙ্গে দেখা করেন তাহলে আমি তাকে গ্রেপ্তার করিয়ে এনে আপনার সামনেই তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করব।'

নিশ্চয়, নিশ্চয়…ধন্যবাদ।

হোটেলে খাওয়া-দাওয়া সেরে আমি তাঁর সঙ্গে যথাস্থানে হাজির হলাম।

চীফ ইনস্‌পেক্টর আমার জন্যে অপেক্ষা করছিলেন। তিনি বললেন—আমার লোকেরা তাকে এখনও ধরতে পারে নি।

বলেন কী!—আমার মূর্ছা যাওয়ার অবস্থা। কিন্তু তার বাড়িটা নিশ্চয় তারা খুঁজে পেয়েছে?

পেয়েছে। সে যতক্ষণ না ফিরে আসে ততক্ষণ বাড়িটার ওপরে আমরা লক্ষ্য রাখব। কিন্তু লোকটা যেন উঠে গিয়েছে বলে মনে হচ্ছে।

উঠে গিয়েছে?

উঠে গিয়েছে। লোকটা একজন কাঠের ব্যবসায়ী। সাধারণত সন্ধ্যের দিকে সে পাশের দোকানে গল্প-গুজব করে। পাশের দোকানদারের নাম উইডো বিদোইন। এই বেটিও ফার্ণিচারের ব্যবসাদার, বেটি ডাইনী বুড়ী। বুড়ীটা সন্ধ্যে থেকেই তাকে দেখে নি—সেইজন্যে তার কোন সংবাদ সে জানে না। আগামী কাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে আমাদের।

সেদিন রাত্রিতে আদৌ ঘুম হয় নি আমার। মাঝে-মাঝে দুঃস্বপ্নে আঁৎকে-আঁৎকে উঠেছি। কিন্তু বাইরে আমার অস্থিরতা প্রকাশ করতে আমি চাই নি। তার পরের দিন সকাল দশটা পর্যন্ত অপেক্ষা ক'রে আমি ইনস্‌পেক্টরের সঙ্গে দেখা করলাম। ইনস্‌পেক্টর বললেন—সমস্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাই আমরা গ্রহণ করেছি। চলুন; আমরা দু'জনে দোকানে যাই। সেইখানে আপনার জিনিস আপনি সনাক্ত করবেন।

তথাস্তু।

পুলিশ আর কামার সঙ্গে নিয়ে আমরা দোকানে হাজির হলাম। দোকান খোলা হল। কিন্তু একি! গত রাত্রিতে এইখানে আমার আসবাবপত্রের ভিড়ে এক-পাও আমি চলতে পারি নি। আজ তার একটাও নেই।

ইনস্‌পেক্টরও অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে একটু হাসলেন। আমি বললাম—হা ঈশ্বর! লোকটার সঙ্গে জিনিসগুলিও সব উধাও হয়ে গিয়েছে।

তিনি হেসে বললেন—সত্যি কথা। গতকাল টাকা দিয়ে আপনি ভুল করেছেন। লোকটা সাবধান হয়ে গিয়েছে।

আমি বললাম: গত রাত্রিতে যেসব জায়গায় আমার জিনিসগুলি ছিল আজ দেখছি সেইসব জায়গায় অন্য ফার্নিচার বোঝাই হয়ে রয়েছে। কেমন করে এ জিনিস ঘটতে পারে তা আমার মাথায় ঢুকছে না।

তিনি বললেন—এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। সারা রাত ধরেই লোকটা জিনিস সরিয়েছে। যাই হোক; আপনি দুশ্চিন্তা করবেন না। যা করার তা আমরা তাড়াতাড়িই করছি। আমরা তার ফিরে আসার পথ বন্ধ করেছি। বদমাসটাকে ধরতে আমাদের বেশী সময় লাগবে না।

হায়, অশান্ত হৃদয় আমার।

আরও দিন পনের আমি রাউয়েন-এ ছিলাম। লোকটা আর ফেরে নি।

জীবন্ত কোন মানুষ কি তার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারবে? ষোল দিনের দিন আমার বাগানের মালির কাছ থেকে আমি এই চিঠিটা পেলাম—

স্যার, গত রাত্রিতে একটা অদ্ভুত কাণ্ড ঘটেছে। আমাদের কথা দূরে থাক —পুলিশও পর্যন্ত হকচকিয়ে গিয়েছে। আপনার বাড়ির সমস্ত আসবাব-পত্র ফিরে এসেছে। চুরির রাত্রিতে যেসব জিনিস ছিল—তাদের সব ক'টি—মায় ক্ষুদে জিনিসগুলি পর্যন্ত, এটা হয়েছে শুক্র-শনিবার রাত্রিতে। বাইরে মাটির ওপরে দাগ দেখে মনে হয় কেউ তাদের প্রধান ফটক থেকে ঘসড়ে-ঘসড়ে ভেতরে নিয়ে এসেছে—আপনার ফিরে আসার জন্যে আমরা অপেক্ষা করে রয়েছি।

ইতি,

ভবদীয়

ফিলিপ।

না—না—না! আর ও বাড়িতে আমি কোনদিনই ফিরে যাব না।

চিঠি দেখে পুলিশ ইনস্‌পেক্টর বললেন—চোরটা ধূর্ত, সন্দেহ নেই। আমাদের যে আর কিছু করণীয় নেই—এইটাই বাইরে আমরা দেখাব। লোকটাকে শীগগীরই আমরা ধরে ফেলব।

না, লোকটাকে আজও তারা ধরতে পারে নি। আমার ভয় হচ্ছে একটা শিকারী জন্তুর মত সে অলক্ষ্যে আমার পিছু-পিছু ঘুরে বেড়াচ্ছে।

খুঁজে পাওয়া গেল না। তার তাকে পাওয়া যাবে না। আর সে তার বাড়ি ফিরে যাবে না। তাতে তার যায় আসে কী? একমাত্র আমি তার মুখোমুখী দাঁড়াতে পারি। কিন্তু আমি তা দাঁড়াব না। না—না—কিছুতেই না।

যদি সে ফিরে আসে তাতেই বা কী? কেউ কি প্রমাণ করতে পারবে যে আমার ফার্ণিচার তার দোকানে কোনদিন ছিল? তার বিরুদ্ধে সাক্ষী একমাত্র আমিই; আর আমার কথা যে পুলিশেও বিশ্বাস করে নি সেবিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। না, না—এ জীবন আর সহ্য করা যায় না। আমি যা দেখেছি তার গোপন রহস্য আর আমি বুকের মধ্যে চেপে রাখতে পারছিনে।

একজন বেসরকারী ডাক্তারের কাছে গিয়ে আমি সব খুলে বললাম। অনেকক্ষণ ধরে প্রশ্ন ক'রে তিনি বললেন—কিছুদিন আপনি এখানে থাকতে চান?

খুব চাই।

সে সামর্থ্য আপনার রয়েছে?

রয়েছে।

আলাদা ঘর আপনার দরকার?

হ্যাঁ।

বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করতে চান?

মোটেই না। ওই রাওয়েনের লোকটা সেই সুযোগে প্রতিহিংসা নেওয়ার জন্যে আমার ঘরে ঢুকে পড়তে পারে।

মাস তিনেক আমি এখানে শান্তিতে রয়েছি। আমার কেবল একটিমাত্র ভয় রয়েছে। সেটি হচ্ছে যদি সেই পুরানো আসবাব-পত্রের ব্যবসাদারটি পাগল হয়ে এইখানে আশ্রয় নেয়···কারাগারও আজকাল নিরাপদ নয়।

Who knows—Maupassant

ছায়াময়ী

কোন একটা মামলা সম্পত্তি পৃথকীকরণের সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করছিলাম। রু দ্য গ্রেনেল-এর পুরানো বাড়িতে সন্ধ্যার সময় কয়েকজন বন্ধু মিলে জটলা করছিলাম আমরা। কথা ছিল আমাদের মধ্যে প্রত্যেকেই এক একটা সত্যি কাহিনী বলবে। তারপরে বিরাশী বছর বয়স্ক মার্ক্'ই দে লা টুর স্যামুয়েল দাঁড়িয়ে উঠে কম্পিত স্বরে নিম্নলিখিত কাহিনীটি বললেন—

আমিও কিছু আশ্চর্য কাহিনীর কথা জানি। কাহিনীগুলি এমন অদ্ভুত যে সারা জীবন ধরে তারা আমাকে ভাবিয়ে তুলেছে। ছাপ্পান্ন বছর আগে এই ঘটনাটি ঘটেছিল, তবু এমন একটা মাসও যায় নি যে মাসে সেই কাহিনী নিয়ে আমি স্বপ্ন দেখি নি। সেদিন যে ভয়টা আমি পেয়েছিলাম সেই ভয়টা আজও আমার মন থেকে অপসৃত হয় নি। পুরো দশটি মিনিট ধরে সেই ভয়ঙ্কর ঘটনার সামনে আমি বসেছিলাম। সেই স্মৃতিটা আজও আমার মন থেকে মুছে যায় নি। হঠাৎ কোন গোলমাল শুনলেই আমার অন্তরাত্মা কেঁপে ওঠে; রাত্রির অন্ধকারে আবছা কিছু দেখলেই ভয়ে সেখান থেকে ছুটে পালিয়ে যাওয়ার জন্যে অস্থির হয়ে উঠি। মোট কথা, রাত্রিতে আমি ভয় পাই।

ঘটনাটি আমাকে এতই ভয়বিহ্বল আর বিপর্যস্ত করে তুলেছিল যার কোন কারণ আমি খুঁজে পাই নি; খুঁজে পাই নি বলেই সেকথা কাউকে মুখ ফুটে কিছু বলতে পারি নি। ঠিক যেভাবে ঘটনাটা ঘটেছিল সেভাবে আমি তোমাদের কাছে বলব না; এর কোন কৈফিয়তও আমি তোমাদের দেব না। সেসময় আমি যদি উন্মাদ হয়ে না যেতাম তাহলে হয়ত ঘটনাটিকে আমি ব্যাখ্যা করতে পারতাম। কিন্তু আমি প্রমাণ করব যে আমি উন্মাদ হই নি। তোমাদের যা ইচ্ছে হয় মনে করতে পার। ঘটনাটা হচ্ছে এই—

১৮২৭ সাল—মাসটা হচ্ছে জুলাই। তখন আমি রাওয়েনে চাকরি করছি। একদিন সমুদ্রের ধারে বেড়াচ্ছিলাম—এমন সময় একটি ভদ্রলোকের

সঙ্গে আমার দেখা হল। মনে হল, তাঁকে আমি চিনি; কিন্তু কবে আর কোথায় যে আমাদের পরিচয় হয়েছিল তা আমি মনে করতে পারলাম না। স্বাভাবিকভাবেই আমি দাঁড়িয়ে গেলাম। তিনিও তা লক্ষ্য করলেন, তারপরে জড়িয়ে ধরলেন আমাকে।

ভদ্রলোকটি আমার যৌবনের বন্ধু। তাঁকে একসময় আমি খুবই ভালবাসতাম। পাঁচটা বছর তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয় নি। মনে হল, এই ক'বছরের মধ্যে তিনি পঞ্চাশ বছরের বৃদ্ধ হ'য়ে গিয়েছেন। চুল সাদা; জীর্ণের মত তিনি কুঁজো হ'য়ে হাঁটছিলেন। আমাকে অবাক হ'য়ে তাকিয়ে থাকতে দেখে তিনি তাঁর জীবনের কাহিনী বললেন।। একটি দুর্ভাগ্য তাঁকে একেবারে ধরাশায়ী করেছে। একটি যুবতীর প্রেমে পড়ে তিনি তাকে বিয়ে করেছিলেন। বছরখানেক উন্মাদের মত ভালবেসেছিলেন তাকে, সুখের সাগরে ভেসে দিন কাটিয়েছিলেন। তারপরে হঠাৎ হৃদ-রোগে যুবতীটি মারা যায়—খুব সম্ভবতঃ প্রেমের ব্যর্থতাও সেই মৃত্যুর জন্যে কিছুটা দায়ী ছিল। স্ত্রীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া যেদিন শেষ হল সেইদিনই তিনি তাঁর বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসেন; এবং রাওয়েনে তাঁর যে নিজের বাড়ি রয়েছে সেইখানে বসবাস করতে থাকেন। সেইখানে শোকে মুহ্যমান হ'যে তিনি নিঃসঙ্গ জীবনযাপন করছেন। মাঝে-মাঝে শোকের উচ্ছ্বাসটা তাঁর এত বেড়ে ওঠে যে আত্মহত্যার কথা চিন্তা না ক'রে তিনি পারেন না।

তিনি বলে গেলেন—তোমার সঙ্গে আবার যখন আমার দেখা হ'য়ে গেল, তখন তুমি একটা কাজ করে দাও। কাজটা খুব জরুরী। তুমি আমার পুরানো বাসায় যাও; সেখানে আমার অর্থাৎ আমাদের শোয়ার ঘরের ডেস্ক-এ আমার কয়েকটা দরকারী কাগজ পড়ে রয়েছে। সেগুলি নিয়ে এস। জিনিসটাকে গোপন রাখার প্রযোজন রয়েছে বলেই আমি কোন উকিল বা চাকরকে সেখানে পাঠাতে চাইনে। আমার কথা যদি বল তাহলে বলব বিশ্বের কোন কিছুর লোভেই আর আমি সেখানে যাব না। তোমাকে আমি ঘরের চাবিটা দিচ্ছি। চলে আসার সময় নিজেই আমি ঘরে তালা দিয়ে এসেছিলাম। সেই সঙ্গে দিচ্ছি ডেস্ক-এর চাবি—মালিকেও একখানা চিঠি লিখে দিচ্ছি। সে-ই তোমাকে দরজা খুলে দেবে। কিন্তু কাল এস, আমার সঙ্গে প্রভাতী চা খাবে। পরের ব্যবস্থাটা আমরা তখনই করে ফেলব।

এইটুকু সাহায্য আমি করব—এই বলে তাঁকে আমি আশ্বাস দিলাম। একটু বেড়িয়ে আসা ছাড়া অন্য কোন কঠিন ব্যাপার নয়। রাওয়েন থেকে মাত্র কয়েক মাইল দূরে তাঁর পূর্বতন বাড়ি। ঘোড়ায় চড়ে সেখানে পৌঁছতে ঘণ্টাখানেক সময় লেগেছিল মাত্র।

পরের দিন সকাল দশটায় ব্রেকফাস্টের জন্যে আমি বন্ধুর বাসায় হাজির হলাম; দু'জনে বসে একসঙ্গেই খেলাম, কিন্তু তিনি বিশেষ কথা বললেন না।

তিনি কথা না বলার জন্যে আমার কাছে ক্ষমা চাইলেন—বললেন ও-বাড়ির কথা মনে হতেই আমি শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়েছি। পুরানো শোকটা আবার আমার উথলে উঠেছে।

তাঁকে দেখে বেশ উত্তেজিত মনে হল। মনে হল তিনি কী যেন ভাবছেন। যেন তাঁর মনের মধ্যে একটা ভীষণ সংঘর্ষ চলছে।

অবশেষে কী আমাকে করতে হবে সে সম্বন্ধে আমাকে সব বুঝিয়ে বললেন। কাজটা খুব সহজ। ডেস্ক-এর ডান দিকের প্রথম ড্রয়ারে দুটো চিঠির প্যাকেট রয়েছে আর রয়েছে এক বাণ্ডিল কাগজ। সেই ড্রয়ারের চাবিটা আমাকে তিনি দিলেন। তিনি বললেন—চিঠিগুলির ওপরে ইচ্ছে করলে তুমি চোখ বুলাতে পার।

তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বেলা একটার সময় আমি কাজে বেরিয়ে গেলাম।

আবহাওয়াটি বড চমৎকার ছিল। ভরতপাখির গান শুনতে-শুনতে বুটের ওপরে তরোযালের ঝংকার তুলে মাঠের ওপর দিয়ে মহা আনন্দে ঘোড়ার পিঠে চড়ে এগোতে লাগলাম। তারপরে আমি বনের মধ্যে ঢুকলাম —ঘোডাটাকে হাঁটিযে নিযে গেলাম। তাঁর পল্লীনিবাসে পৌছিয়ে মালির জন্যে যে চিঠিটি পকেটে ছিল সেটিকে আমি বার করলাম। অবাক হ'য়ে দেখলাম সেটার মুখ গালা দিয়ে জোড়া। শুধু চটিই নি, বিরক্ত হ'য়ে আমি ভেবেছিলাম ফিরে আসি, কিন্তু তারপরেই মনে হল—এইভাবে ফিরে গেলে নিজের ভাবাবেগকেই প্রাধান্য দেওয়া হবে। আমার বন্ধুটি তাঁর বর্তমান মানসিক বিপর্যয়ের জন্যই হয়ত অন্যমনস্কভাবে চিঠিটা এঁটে দিয়েছেন, আর আমি তা লক্ষ্য করি নি।

দেখে মনে হল, প্রায় বছর কুড়ি বাড়িটি পরিত্যক্ত হযেছে। গেট খোলা, এতটা ভাঙা যে ওই অবস্থায় ওটা যে কেমন করে দাঁড়িয়ে রয়েছে সেটা ভেবেই আমি আশ্চর্য হলাম। ভেতরে ঢোকার রাস্তাটা বড়-বড় ঘাসে বোঝাই হ'য়ে গিযেছে। ফুলগাছগুলিকে উঠোনের ঘাসে আর চেনা যায না। জানালায় জোরে ঝাঁকানি দেওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে পাশের দরজা দিযে একটি বুড়ো লোক বেরিয়ে এসে আমাকে দেখে কেমন যেন অবাক হ'য়ে গেল। চিঠিটি পেয়ে সে পড়ল, একবার নয়, বার বার, তারপরে সেটি পকেটে ঢুকিয়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করল: কী চাই আপনার?

আমি ছোট করে বললাম: তোমার তা জানা উচিৎ কারণ মনিবের নির্দেশ তুমি পড়েছ। আমি ঘরে ঢুকতে চাই।

কেমন যেন বিভ্রান্ত হ'য়ে গেল লোকটি—মানে আপনি······মেয়েটির ঘরে ঢুকবেন······

ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটার যোগাড় হল আমার—এই···শোন······তুমি কি

আমাকে পরীক্ষা করতে চাও ?

বিভ্রান্ত হ'য়ে সে আমতা-আমতা করতে লাগল—না, তা নয় স্যার। সেই থেকে, তাঁর মৃত্যুর পর থেকে ও-ঘরটা আর খোলা হয় নি।···আপনি যদি একটু অপেক্ষা করেন · ···আমি দেখে আসি···

আমি চটে উঠে থামিয়ে দিলাম তাকে ; বললাম : কী বলতে চাচ্ছ তুমি ? চাবি আমার কাছে। তুমি ঘরে ঢুকবে কী করে ?

তাহলে, স্যার, আসুন।····· এ ছাড়া আর কিছুই বলার ছিল না তার।

বললাম : আমাকে সিঁড়িটা দেখিয়ে দিয়ে তুমি চলে যাও। আমি নিজেই ঘরে ঢোকার ব্যবস্থা করব।

কিন্তু স্যার·· মানে···বাস্তবিক ·

এবারে আমি সত্যি-সত্যিই চটে উঠলাম ; বললাম : এখন তুমি চুপ কর। বকবক করলে মজাটা বুঝতে পারবে।

এই বলে তাকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে আমি ঘরের মধ্যে ঢুকে গেলাম।

প্রথমে আমি রান্নাঘরে ঢুকে গেলাম। তারপরে ঢুকলাম দু'টি ঘরে—একটি ঘরে থাকত তার চাকর, আর একটি ঘরে তার স্ত্রী। তারপরে পড়ল একটি বড় হল ঘর। সেখান থেকে উঠলাম সিঁড়িতে। তারপরে বন্ধুর নির্দেশিত ঘরের দরজাটাকে চিনতে পারলাম। দরজাটা সহজেই খুলে ফেললাম। তার-পরে ভেতরে ঢুকলাম। ঘরটা এত অন্ধকার ছিল যে প্রথমে আমি কিছুই দেখতে পাই নি। আমি একটু চুপ করে দাঁড়িয়ে গেলাম। অনেকদিন ধরে ঘর বন্ধ থাকলে, বিশেষ ক'রে যে ঘরের মধ্যে কেউ মারা গিয়েছে সেইরকম ঘরের মধ্যে গিয়ে দাঁড়ালে যেরকম একটা পচা ভ্যাপসা গন্ধ বেরোয় এই ঘরটির ভেতরেও সেইরকম শ্বাসরোধকারী একটা দুর্গন্ধ ছাড়ছিল। তারপরে ধীরে-ধীরে অন্ধকারে আমার চোখ দুটি থিতিয়ে এল। সেই বিরাট অগোছালো শোওয়ার ঘরটি আমি বেশ ভাল করেই দেখতে পেলাম। দেখলাম, বিছানার ওপরে কোন চাদর পাতা নেই ; কিন্তু তখনও একটা মাদুর পাতা রয়েছে, আর রয়েছে বালিশ। তার একটির ওপরে বেশ গভীর একটা দাগ পড়েছে, দেখলেই মনে হবে কিছুক্ষণ আগেই কেউ যেন কনুই-এর ওপরে তার মাথাটি রেখে বিশ্রাম করছিল। চেয়ারগুলি এদিকে-ওদিকে ছড়ানো। একটা ছোট ঘর আমার চোখে পড়ল। তার দরজা অর্দ্ধেকটা খোলা।

প্রথমেই আমি জানালার ধারে গেলাম ; আলো ঢোকার জন্যে পাল্লাগুলো খুলে দিলাম। কিন্তু জানালার খড়খড়িগুলি অনেক দিন বন্ধ থাকার ফলে এমনি শক্ত হ'য়ে বসে গিয়েছিল যে সেগুলিকে কিছুতেই আমি নড়াতে পারলাম না। তরোয়ালের খোঁচা দিয়ে ভাঙার চেষ্টা করলাম। তাতেও কিছু হল না। তারপরে আমি বড় উত্তেজিত হ'য়ে উঠলাম—এবং সেই

আলোতেই মোটামুটি রকম সবকিছু দেখতে পারছিলাম এই ভেবে খড়খড়ি খোলার চেষ্টায় আর পণ্ডশ্রম না করে টেবিলের দিকে এগিয়ে গেলাম।

একটা আরাম কেদারার ওপরে বসে যে ড্রয়ারটির কথা বন্ধু আমাকে বলেছিল তার ডালাটা টানলাম। ড্রয়ারটা একেবারে বোঝাই হয়ে ছিল। আমার দরকার ছিল মাত্র তিনটি কাগজের প্যাকেটের। সেইগুলিই হাতড়াতে লাগলাম।

প্যাকেটগুলির ওপরের লেখাগুলি পড়ার জন্যে আমি যখন চোখ চিরে-চিরে দেখছি এমন সময় হঠাৎ আমার মনে হল আমার পেছনে একটা যেন খস-খস শব্দ হচ্ছে। বাইরের হাওয়ায় ভেতরের কোন কাগজপত্র নড়ছে এই ভেবে প্রথমে ব্যাপারটাকে আমি কিছুমাত্র গ্রাহ্যের মধ্যেই আনি নি। কিন্তু দু' এক মিনিটের মধ্যেই আর একটা খসখসানি হ'ল; এবারে খুব কাছে—আর প্রায় অস্পষ্ট সে শব্দ। আমার চামড়ার ভিতর দিয়ে একটা অস্বস্তিকর কনকনে শিহরণ বয়ে গেল। ব্যাপারটাকে গ্রাহ্যের মধ্যে আনা মূর্খতা হবে ভেবে একবারও ঘাড় ফিরিয়ে দেখলাম না আমি। তখন আমি দ্বিতীয় প্যাকেটটা পেয়েছি; এবং তৃতীয় প্যাকেটটা তুলে নেওয়ার জন্যে হাত দিয়েছি এমন সময় ঠিক আমার কাঁধের ওপরে একটি দীর্ঘ আর করুণ যন্ত্রণাদায়ক নিঃশ্বাস এসে পড়ল! হঠাৎ পাগলের মত এক ঝটকায় পেছন ঘুরেই লাফ দিলাম আমি—কয়েক ফুট দূরে গিয়ে দাঁড়ালাম। লাফ দিয়েই তরোয়ালের মাথাটা মুঠোর মধ্যে ধরে আমি দাঁড়ালাম ঘুরে। সত্যি কথা বলতে কি অশরীরীটি আমার ঠিক পাশেই দাঁড়িয়ে রয়েছে এটা অনুভব করতে না পারলে কাপুরুষের মত আমি চোঁ-চোঁ দৌড় দিতাম।

কী দেখলাম! একটি মহিলা—দীর্ঘাঙ্গিনী—সাদা ধবধব করছে তার পোশাক; যে চেয়ারের ওপরে একমুহূর্ত আগে আমি বসেছিলাম সেই চেয়ারের পেছন থেকে আমার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। আমার সারা শরীরের ভেতরে এমন একটা কাঁপুনি ধরল যে আর একটু হলে আমি মেঝের ওপরে পড়ে যেতাম। সেই ভয়ানক আতঙ্ক যে কোনদিন অনুভব করে নি তাকে আমার অবস্থাটা বোঝানো যাবে না। অথচ, সেই আতঙ্কের পিছনে কোন যুক্তি আমি খুঁজে পাই নি। এই অবস্থায় কোন কিছু চিন্তা করার মত মানসিক অবস্থা মানুষের থাকে না; হৃদস্পন্দন থেমে যাওয়ার উপক্রম করে; সারা শরীরটা স্পঞ্জের মত শিথিল হ'যে যায়—মনে হয় প্রাণটুকু এবারে বুঝি বেরিয়ে যাবে।

ভূত-টুতে আমি বিশ্বাস করিনে; তবু সেদিন ভূতের ভয়ে আমি আঁতকে উঠেছিলাম। সেদিন সেই অশরীরী আত্মাটিকে চোখের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে আমি যে ভয় পেয়েছিলাম ওরকম ভয় জীবনে আর কোনদিনই আমি পাই নি। সে যদি কথা না বলত তাহলে হয়ত আমি মারাই যেতাম।

কিন্তু সে কথা বলল; এমন মিষ্টি সুরে বলল যে আমার হৃদয়ের সমস্ত তন্ত্রীগুলি ঝঙ্কৃত হয়ে উঠল। একথা আমি বলতে পারব না যে নিজেকে সামলিয়ে নিতে পেরেছিলাম আমি। সূক্ষ্মভাবে চিন্তা করার শক্তিও যে ফিরে পেয়েছিলাম সে কথাও বলব না আমি। না, আমি এত ভয় পেয়েছিলাম যে কী করছি, তা আমি মোটেই বুঝতে পারি নি। তবে হ্যাঁ, একটা গর্ব, সৈনিকের শেষ দম্ভ নিয়ে মুখের চেহারাটাকে আমি মোটামুটিভাবে সহজ করে রাখতে পেরে-ছিলাম। নিজের কাছে ভূতই হোক, অথবা কোন নারীই হোক—তার কাছে আমি যে ভয় পাই নি সেইটাই প্রমাণ করতে চেয়েছিলাম। অবশ্য পরে এটা আমি বুঝতে পেরেছিলাম ; কারণ সেই মূর্তিটি দেখার পরে, আমি তোমাদের নিশ্চয় করে বলতে পারি, ওসব কথা আদৌ মনে হয় নি আমার। তখন আমি সত্যিই ভয় পেয়েছিলাম।

মেয়েটি বলল—করুণ কণ্ঠে বলল—স্যার, আমার জন্যে অনেক কিছু করতে আপনি পারেন।

উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করেছিলাম আমি, কিন্তু মুখে কোন কথা যোগায় নি। গলার ভেতর থেকে কেবল একটা অস্পষ্ট শব্দ তালগোল পাকিয়ে বেরিয়ে এসেছিল মাত্র।

সে বলে গেল—করবেন ? আপনি আমাকে বাঁচাতে পারেন ; নিরোগ করতে পারেন আমাকে। আমার ভীষণ কষ্ট হচ্ছে—ভীষণ, ভীষণ।—এই ভাবে বলতে-বলতে সে সেই চেয়ারের ওপরে বসে পড়ল। তারপরে আমার দিকে তাকিয়ে আবার বলল—করবেন ?

তখনও আমার গলা দিয়ে স্বর বেরোল না , কেবল ঘাড় নেড়ে বললাম—হ্যাঁ, করব।

এই কথা শুনে মেয়েটি আমার সামনে কচ্ছপের খোলার একটা চিরুনী ধরে আস্তে-আস্তে বলল : আমার চুলগুলি আঁচড়িয়ে দিন। তাতেই আমার অসুখ সেরে যাবে। চুল আমার আঁচড়ে দিতেই হবে আপনাকে। আমার মাথার দিকে চেয়ে দেখুন। কী কষ্টই না পাচ্ছি। এই চুলগুলিই আমাকে যন্ত্রণা দিচ্ছে।

তার চুল খোলা, লম্বা, আর কালো। মনে হল চেয়ারের পেছন দিয়ে ঝুলে মেঝের ওপরে লুটিয়ে পড়েছে। কাঁপতে-কাঁপতে সেই চিরুনীটা আমি নিলামই বা কেন, আর তার সেই লম্বা কালো চুলগুলি—যেগুলি ছোঁয়ার সঙ্গে-সঙ্গে আমার শরীরে একটা ভীষণ ঠাণ্ডা কনকনে অবসাদ নেমে এল তা আমি বলতে পারব না। সেই অনুভূতিটা আজও আমার আঙুলের ডগায় লেগে রয়েছে। সে কথা মনে হলেই আজও আমি ভয়ে শিউরে উঠি।

কেমন করে তার সেই ঠাণ্ডা [illegible] সেদিন আমি আঁচড়েছিলাম তা আমি জানিনে। সেই [illegible] আঁচড়ে দিয়েছিলাম আমি

ছাড়িয়ে দিয়েছিলাম জট। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে মাথা নীচু করেছিল। দেখে মনে হচ্ছিল সে বেশ আনন্দ পাচ্ছে। হঠাৎ সে বলে উঠল—ধন্যবাদ। তারপর আমার হাত থেকে চিরুনীটা ছিনিয়ে নিয়ে সে পাশের ঘরে পালিয়ে গেল। আমি আগেই লক্ষ্য করেছিলাম পাশের ঘরের দরজাটা আধখোলা অবস্থায় ছিল।

একা বসে রইলাম আমি। দুঃস্বপ্ন দেখে জেগে উঠলে মানুষ যেভাবে চুপচাপ বসে থাকে বেশ কয়েক সেকেণ্ড আমিও সেইরকম চুপচাপ হতভম্বের মত বসে রইলাম। অবশেষে জ্ঞান ফিরে এল আমার। জানালার ধারে দৌড়ে গেলাম আমি, জোর করে খড়খড়িগুলো খুলে দিলাম। ঘরের মধ্যে এক ঝলক আলো ঢুকে এল। যে দরজা দিয়ে মেয়েটি ভিতরে ঢুকে গেল সেই দরজার সামনে হাজির হলাম। দেখলাম কপাট তার বন্ধ হ'য়ে গিয়েছে। তাকে খোলার সাধ্য আমার নেই।

তারপরে আকস্মিক একটা আতঙ্কের মত দৌড়ে পালিয়ে আসার একটা উন্মাদ বাসনা আমার ওপরে ভর করে বসল, যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্যরা জানে এ-আতঙ্ক কী জিনিস। ডেস্কের ওপরে কাগজের যে তিনটে প্যাকেট পড়েছিল সেগুলি তুলে নিয়ে ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে এলাম আমি, চারটে করে সিঁড়ির ধাপ এক একটা লাফে পেরিয়ে এলাম, কেমন করে যে শেষ পর্যন্ত বাইরে বেরিয়ে এলাম তা আমি জানিনে। ঘোড়াটা আমার একটু দূরে দাঁড়িয়েছিল। সোজা তার ওপরে লাফিয়ে পড়ে উর্দ্ধশ্বাসে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলাম।

পুরো একটি ঘন্টা ধরে আমি কেবলই ভাবতে লাগলাম—সত্যিই কি আমি দেখেছি। আমার স্নায়ুগুলি দুর্বোধ্য কোন আতঙ্কে যে দুর্বল হ'য়ে পড়েছিল সেবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। মানসিক দুর্বলতার ফলেই মাঝে-মাঝে আমরা অলৌকিক বস্তু দেখতে পাই, এই অলৌকিক ঘটনার মূলে রয়েছে অতিপ্রাকৃত কোন শক্তি।

জানালার কাছে এসে আমার মনে হল হয়ত আমি কোন অবাস্তব ছায়াই দেখেছি—। তারপরেই হঠাৎ আমার বুকের দিকে লক্ষ্য পড়ল। আমার সামরিক পোশাক চুলে ভর্তি হ'য়ে গিয়েছে। মেয়েদের লম্বা চুল—আমার গলার বোতামে আটকে রয়েছে। কাঁপতে-কাঁপতে একটি-একটি করে খুঁটে সেগুলি আমি বাইরে ফেলে দিলাম।

তারপরে আমি আর্দালীকে ডাকলাম। বিগত কয়েকটি ঘণ্টায় আমি এতই বিব্রত হ'য়ে ছিলাম যে তখনই বন্ধুটির সঙ্গে দেখা করার মত মানসিক অবস্থা আমার ছিল না। তাঁকে আমার কী বলা উচিত সে-বিষয়েও কিছু চিন্তা করার ছিল আমার। আর্দালীর হাতে বন্ধুটিকে তার চিঠিগুলি পাঠিয়ে দিলাম। বন্ধুটি সেনানীটির হাতে প্রাপ্তি স্বীকারও করেছিলেন। বিশেষ করে আমার কথাই তিনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন তাকে। সেনানীটি তাঁকে বলেছিল

যে রোদে আমার মাথা ধরেছে—আমি অসুস্থ। সংবাদটা পেয়ে তাঁকে আমার সম্বন্ধে বেশ উদ্বিগ্ন হতে দেখা গিয়েছিল। পরের দিন প্রভাতে সত্য কথাটা বলার অভিপ্রায় নিয়ে আমি তাঁর বাসায় গেলাম। শুনলাম আগের দিন সন্ধ্যেবেলাতেই তিনি বেরিয়ে গিয়েছেন—তখনও ফেরেন নি। সেদিন আবার গেলাম। তখনও তিনি ফেরেন নি। এক সপ্তাহ আমি অপেক্ষা করলাম—তখনও তিনি নিরুদ্দেশ। ব্যাপারটা আমি কর্তৃপক্ষদের জানালাম। অনুসন্ধান করার জন্যে দল বেরোল, কিন্তু তাঁর কোন চিহ্ন কেউ পেল না—বা, কী ভাবে তিনি নিরুদ্দেশ হ'য়ে গেলেন সে বিষয়েও কেউ কিছু জানে না।

বন্ধুর পরিত্যক্ত সেই গ্রাম্য বাড়িটিকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করা হল। সন্দেহজনক কোন কিছুই চোখে পড়ল না। সেখানে যে কোন মহিলাকে আটকে রাখা হয়েছে তারও কোন নিদর্শন পাওয়া গেল না।

অনুসন্ধানে কিছু পাওয়া গেল না দেখে অনুসন্ধান বন্ধ করে দেওয়া হল। পরের ছাপ্পান্ন বছর ধরে আর কিছু শুনি নি আমি। আমি আগেও যা জানতাম আজও তাই জানি—তার বেশী নয়।

An apparition—Maupassant

একটি ভূতের গল্প

ব্রডওয়ে ধরে' অনেকদূর গিয়ে একটা প্রকাণ্ড পুরনো বাড়ির একটা বড় ঘর আমি নিয়েছিলাম। আমি আসবার অনেক বছর আগে থেকেই বাড়িটার উপরের তলাগুলো সম্পূর্ণ খালি পড়ে 'ছিল। বাড়িটাকে যেন ধুলো আর মাকড়শার জাল, নির্জনতা ও নীরবতার হাতেই ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। প্রথম যেদিন সিঁড়ি বেয়ে আমার ঘরে উঠলাম, মনে হল আমি বুঝি গোরস্থানের ভিতর দিয়ে মৃত ব্যক্তিদের গোপনতাকে আক্রমণ করতে চলেছি। জীবনে এই প্রথম একটা কুসংস্কারগত ভয় আমাকে পেয়ে বসল; সিঁড়ির একটা অন্ধকার কোণে মোড় নিতেই একটা অদৃশ্য মাকড়শার জালের সূক্ষ্ম তন্তুগুলো যখন আমার মুখের উপর ঝুলে পড়ে সেখানে লেগে রইল, তখন আমি যেন ভূত দেখার মত শিউরে উঠলাম।

ঘরের ভিতরে ঢুকে দরজা বন্ধ'করে সেই অপচ্ছায়া ও অন্ধকারকে বিদায় করে তবে স্বস্তি পেলাম। চুল্লিতে আরামপ্রদ আগুন জ্বলছিল; আরামের নিঃশ্বাস ফেলে তার সামনে বসে পড়লাম। [illegible] সেখানে বসে অতীতের কথা ভাবতে লাগলাম; মনে পড়ল [illegible]। অতীতের কুয়াশা

ভেদ করে ফুটে উঠল কত আধ-ভোলা মুখ; কল্পনায় শুনতে পেলাম সেই সব কণ্ঠস্বর যা অনেকদিন আগেই চিরকালের মত নীরব হয়ে গেছে, আর সেই সব পরিচিত গান যা এখন আর কেউ গায় না। আমার জাগ্রত-স্বপ্ন যখন ধীরে ধীরে করুণ থেকে করুণতর সুরে নেমে গেল, তখন বাইরের ঝড়ের হাহাকার পরিণত হল মৃদু বিলাপে, জানালার কাঁচের উপরে বৃষ্টির ক্রুদ্ধ আঘাত অস্ফুট মৃদু শব্দে পরিণত হল, রাস্তার সব শব্দ একে একে থেমে এল, এবং সর্বশেষ বিলম্বিত পথিকের দ্রুত পদশব্দও দূর হতে দূরে মিলিয়ে গেল; কোথাও একটি শব্দও রইল না।

আগুনটা নিভে আসছে। একটা নির্জনতাবোধ যেন আমাকে জড়িয়ে ধরছে। উঠে পোশাক ছাড়লাম, ঘরের মধ্যে চলাফেরা করলাম পা টিপে টিপে, যা কিছু করছি সবই চুপে চুপে; যেন আমার চারপাশে এমন সব শত্রুরা ঘুমিয়ে আছে যাদের ঘুম ভাঙালে মারাত্মক বিপদ ঘটবে। বিছানায় শুয়ে পড়লাম; শুয়ে শুয়ে বৃষ্টির শব্দ, বাতাসের গর্জন ও অনেক দূরের সব জানালা বন্ধ করার অস্পষ্ট আওয়াজ শুনতে-শুনতে একসময় ঘুমিয়ে পড়লাম।

গভীর ঘুমই ঘুমিয়েছিলাম, কিন্তু কতক্ষণ ঘুমিয়েছিলাম তা জানি না। হঠাৎ দেখি ঘুম ভেঙে গেছে। আর একটা রোমহর্ষক প্রত্যাশায় বুকটা ভরে উঠেছে। চারদিকে স্তব্ধ। শুধু আমার বুকের ভিতরটা ছাড়া—সেখানে হৃদ্‌স্পন্দনের শব্দ হচ্ছে। ইতিমধ্যে বিছানার চাদরগুলো পায়ের দিকে নেমে যেতে লাগল, যেন কেউ সেগুলিকে ধরে টানছে! আমি নড়তে পারছি না; কথা বলতে পারছি না। কম্বলগুলো তখনও নেমে যাচ্ছে, আমার বুক পর্যন্ত খোলা হয়ে পড়ল। তখন অনেক চেষ্টায় সেটাকে চেপে ধরে মাথার উপর পর্যন্ত টেনে দিলাম। অপেক্ষা করে রইলাম, কান পাতলাম। অপেক্ষা করেই আছি। আবার সেই টান শুরু হল; একশ' সেকেণ্ড ধরে আবার আমি জড়বৎ পরে রইলাম; শেষ পর্যন্ত আবার আমার বুক পর্যন্ত খোলা হয়ে পড়ল। শেষ পর্যন্ত শক্তি সঞ্চয় করে কম্বলটাকে যথাস্থানে টেনে এনে শক্ত হাতে চেপে ধরে রইলাম। অপেক্ষা করতে লাগলাম। আবার একটা আল্‌তো টান অনুভব করলাম; সঙ্গে সঙ্গে মুঠোটাও শক্ত করলাম। আল্‌তো টান ক্রমে জোরদার হতে লাগল—আরও, আরও জোরদার হল। আমার হাত থেকে খসে গিয়ে এই তৃতীয়বার কম্বলটা পড়ে গেল। আমি আর্তনাদ করে উঠলাম। বিছানার পায়ের দিক থেকে জবাবে আর একটা আর্তনাদ উঠল! আমার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমতে লাগল। আমি তখন যেটুকু বেঁচে আছি, মরে গেছি তার চাইতে বেশী। ইতিমধ্যে ঘরের মধ্যে ভারী পায়ের শব্দ শুনতে পেলাম—মনে হল, একটা হাতির পা—মানুষের পায়ের মত মোটেই নয়। তবে শব্দটা আমার কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে—এক যা ভরসা। শুনতে পেলাম, শব্দটা দরজার [illegible] বা জানালা না খুলেই বেরিয়ে

গেল, দালান ও কড়িকাঠ নাড়াতে নাড়াতে দালান পার হয়ে গেল—আবার সেই স্তব্ধতা নেমে এল।

উত্তেজনা প্রশমিত হলে নিজে নিজেই বললাম, "এটা স্বপ্ন—একটা বীভৎস স্বপ্নমাত্র। এই কথা ভাবতে ভাবতে একসময় দৃঢ় প্রত্যয় জন্মাল যে সত্যি এটা স্বপ্নই ছিল; তখন একটা সুখকর হাসিতে আমার ঠোঁট দুটি ভরে উঠল; আবার খুশি হয়ে উঠলাম। উঠে একটা আলো জ্বালালাম; হুড়কো ও তালা যেমন ছিল তেমনই আছে; আর একটা স্বস্তির হাসি বুকের মধ্যে উথলে উঠে ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে গড়িয়ে পড়ল। পাইপটা তুলে নিয়ে ধরালাম। তারপর আগুনের সামনে বসবার উপক্রম করতেই—আমার কাঁপা আঙুলের ফাঁক দিয়ে পাইপটা নীচে পড়ে গেল, গাল থেকে উবে গেল সব রক্ত, আঁতকে উঠতেই আমার শান্ত শ্বাস-প্রশ্বাসও থেমে গেল! অগ্নিকুণ্ডের পাশে ছাইয়ের উপর আমার পায়ের ছাপের পাশাপাশি আর একটা পায়ের ছাপ—ছাপটা এত বড় যে তার তুলনায় আমার পায়ের ছাপটা যেন কোন শিশুর! তাহলে সত্যি অতিথি এসেছিল, আর হাতির পায়ের শব্দের ব্যাপারটাও বোঝা গেল।

আলো নিভিয়ে দিয়ে ভয়ে অবশ দেহ নিয়ে বিছানায় ফিরে গেলাম। বহুক্ষণ ধরে অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে কান পেতে রইলাম। মেঝের উপর দিয়ে কোন ভারী দেহকে টেনে নেবার মত একটা ঘস্-ঘস্ আওয়াজ মাথার উপরে শুনতে পেলাম; তারপর দেহটাকে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হল, আর তার ধাক্কায় আমার জানালাগুলো কেঁপে উঠল। বাড়িটার দূরবর্তী অংশগুলোতে সশব্দে দরজা বন্ধ করার শব্দ শুনতে পেলাম। কিছুক্ষণ পরে পরেই শুনতে পেলাম। কিছুক্ষণ পরে পরেই শুনতে পেলাম, চুপি-চুপি পায়ে কেউ যেন দালান দিয়ে ভিতরে ঢুকছে, আর বেরিয়ে যাচ্ছে, সিঁড়ি বেয়ে উঠছে আর নামছে। কখনও বা সেই শব্দ আমার দরজার কাছে এসে একটু ইতস্তত করে আবার চলে যাচ্ছে। দূরবর্তী দালান-পথে শিকলের অস্পষ্ট ঝন্-ঝন্ শব্দ শুনতে পেলাম, কান পাতলাম; ঝন্-ঝন্ শব্দ কখনও এগিয়ে আসছে—কখনও শ্রান্ত পায়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠছে; অপদেবতার প্রতিটি পদক্ষেপের তালে তালে বাড়তি শিকলের ঝন্-ঝন্ শব্দ হচ্ছে। কিছু অস্পষ্ট কথাও কানে এল; অর্ধ-উচ্চারিত কিছু আর্তনাদকে যেন জোর করে স্তব্ধ করে দেওয়া হল, অদৃশ্য পোশাকের খস্-খস্ শব্দ, অদৃশ্য পাখার শোঁ-শোঁ শব্দ। তখন মনে হল, কেউ আমার ঘরটাকে আক্রমণ করেছে—এখানে আমি একা নই। আমার বিছানাকে ঘিরে দীর্ঘশ্বাস ও শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ রহস্যময় ফিস্‌ফিস্ কথা। ঠিক মাথার উপরে, দেখতে, [illegible] গায়ে নরম প্রস্ফুরক আলোর তিনটি ছোট বৃত্ত; [illegible] ঝুলে রইল, তারপর নীচে পড়ে গেল— [illegible] একটা বালিশের উপর।

তরল পদার্থের মত চট্‌চট্‌ করতে লাগল, গরম লাগল। আমার মন বলল, সেগুলো রক্তের ডেলা—আলো জ্বালিয়ে সেগুলো দেখার দরকারও বোধ করলাম না। তারপরই দেখলাম কতকগুলি অনুজ্জ্বল পাণ্ডুর মুখ, উর্দ্ধে তোলা সাদা হাত, বিদেহী অবস্থায় বাতাসে ভাসছে, তারপরই অদৃশ্য হয়ে গেল। সব ফিসফিসানি, সব কণ্ঠস্বর, সব শব্দ থেমে গেল। নেমে এল নিস্তব্ধতা। কান পেতে অপেক্ষা করতে লাগলাম। মনে হল, আলো দেখতে না পেলে আমি মরে যাব, ভয় আমাকে দুর্বল করে তুলেছে। ধীরে ধীরে উঠে বসলাম। মুখের উপর একটা চটচটে হাতের ছোঁয়া লাগল। আমার সব শক্তি নিমেষে উধাও হয়ে গেল, আহত পঙ্গুর মত বিছানায় পড়ে গেলাম। তখন পোশাকের খস্‌খস্‌ শব্দ শুনতে পেলাম—মনে হল সেটা দরজার ভিতর দিয়ে বাইরে চলে গেল।

আমার সবকিছু শান্ত হলে রুগ্ন, দুর্বল দেহ নিয়ে গুড়ি মেরে বিছানা থেকে নামলাম, গ্যাসটা জ্বালাতে হাত কাঁপতে লাগল একশ' বছরের বুড়োর মত। আলো দেখে মনে কিছুটা বল ফিরে এল। আসনে বসে ছাইয়ের উপরকার বড় বড় পায়ের ছাপের কথাই যেন স্বপ্নের ঘোরে ভাবতে লাগলাম। দেখতে দেখতে সবকিছু কেমন ঝাঁপসা হয়ে এল। চোখ তুলে তাকালাম, গ্যাসের আলোও ধীরে ধীরে ম্লান হয়ে আসছে। ঠিক সেই মুহূর্তে আবার সেই হাতির পায়ের শব্দ শুনতে পেলাম। সেটা আসছে—কাছে, আরও কাছে, ছাতা-পরা হল-ঘর পেরিয়ে, সেটা যত কাছে আসছে ঘরের আলো ততই ম্লান হতে ম্লানতর হচ্ছে। পায়ের শব্দ আমার দরজার কাছে এসে থামল—আলো কমতে কমতে একটা ঈষৎ নীল রঙে রূপান্তরিত হল, আমার চার পাশে সব কিছু যেন একটা ভৌতিক গোধূলির আলোয় আচ্ছন্ন। দরজা খোলে নি, অথচ বাতাসের একটা মৃদু ঝলক এসে আমার গালে লাগল, আমার সামনে এসে দাঁড়াল একটা প্রকাণ্ড ধোঁয়াটে দেহ। বিস্ময়-বিস্ফারিত চোখে তাকে দেখতে লাগলাম। একটা পাণ্ডুর আভা জিনিসটার উপর ছড়িয়ে পড়ল, ধীরে ধীরে সেই ধোঁয়া আকার গ্রহণ করল—একটা হাত দেখা দিল, তারপর দুটি পা, তারপর শরীর এবং সকলের শেষে বাষ্পের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল একখানি বিষণ্ন মুখ। জালের বাসা থেকে মুক্ত হয়ে মহামান্য "কার্ডিফ্‌ দানব" তার পেশীবহুল সুন্দর উলঙ্গ দেহ নিয়ে আমার মাথার উপরে দেখা দিল!"

আমার সব দুঃখ অন্তর্হিত হল—কারণ একটি শিশুও জানে যে এই সদয় মুখ কারও কোন ক্ষতি করতে পারে না। আমার মনের খুশির ভাব তৎক্ষণাৎ ফিরে এল, আর তার সঙ্গে মিল রেখেই বুঝি গ্যাসের আলোটা আবার উজ্জ্বল দীপ্তিতে জ্বলে উঠল। এই প্রাচীন বন্ধুটিকে অভ্যর্থনা জানাতে পেরে আমি যত খুশি হলাম, কোন [illegible] পরিত্যক্ত মানুষই মানুষের সঙ্গ লাভ

করে তত খুশি হয না।

"আরে, এ সব তাহলে তুমি ছাড়া কেউ নয ? তুমি কি জান, দু' তিন ঘণ্টা ধরে আমি ভযে মরতে বসেছিলাম ? তোমাকে দেখে সত্যি খুব ভাল লাগছে। আহা, একটা এমন চেযার যদি থাকত—এখানে, ওটার মধ্যে বসতে চেষ্টা করো না।"

কিন্তু তখন অনেক দেরী হযে গেছে। আমি বাধা দেবার আগেই সে ওটার মধ্যে ঢুকতেই ওটা সবেগে নীচে নেমে গেল—জীবনে কখনও একটা চেযারকে ওভাবে খান্‌-খান্‌ হযে ভেঙে যেতে আমি দেখি নি।"

"থাম, থাম, তুমি তো সব কিছু ধ্বংস—"

আবার অনেক দেরী। আবার একটা শব্দ, আর সঙ্গে সঙ্গে আর একটা চেযার ভেঙে খান্‌-খান্‌।

"কী আশ্চর্য! তোমার কি বুদ্ধিশুদ্ধি কিচ্ছু নেই ? তুমি কি এখানকার সব আসবাবপত্র ভেঙে ফেলতে চাও ? এখানে, এখানে, ওরে কাঠ মুখ্‌খু—"

কিন্তু সবই বৃথা। আমি ধরে ফেলবার আগেই সে বিছানার উপর বসে পড়ল, আর সঙ্গে সঙ্গে সেটা একটা শোচনীয ধ্বংসস্তূপে পরিণত হল।

"আচ্ছা, এটা কি রকম আচরণ তোমার ? প্রথমে তো ঘরময ঘুরতে ঘুরতে একগাদা ভবঘুরে ভূতকে সঙ্গে নিযে আমাকে ভযে আধ-মরা করে ফেললে ; তার পরে এমন অশালীন পোশাক পরে এলে যা একমাত্র সম্ভ্রান্ত রঙ্গমঞ্চ ছাড়া অন্য কোন সভ্য সমাজই বরদাস্ত করত না, এমন কি ঐ উলঙ্গ-বাহার বেশ যদি তোমার জাতির হত তাহলে সেটাও তারা বরদাস্ত করত না, তবু যাহোক করে আমি যেই সেটাকেও মেনে নিলাম অমনিই তুমি তার প্রতিদানে বসবার মত যে আসবাব পাচ্ছ সেটাকেই ভেঙে চুরমার করে ফেলছ ? কেন এ রকম করছ ? যেমন নিজের ক্ষতি করছ, তেমনই আমারও ক্ষতি করছ। তোমার শিরদাঁড়ার শেষ প্রান্তটা ভেঙেছে, জংঘাস্থিটা ভেঙে টুকরো টুকরো হযে এমনভাবে ঘরময ছড়িযে পড়েছে যে, একটা শ্বেত পাথরের উঠোনের মত দেখাচ্ছে। এর জন্য তোমার যে লজ্জিত হওযা উচিত—সেটা বুঝবার মত বযস তোমার হযেছে।"

"আচ্ছা, আর কোন আসবাব ভাঙব না। কিন্তু আমিই বা কি করব ? একটা শতাব্দী ধরে একটু বসবার ফুরসুৎ পেলাম না।" তার চোখে জল এসে গেল।

আমি বললাম, "আহা বাছারে, তোমার প্রতি এতটা কঠোর হওযা আমার উচিত হয নি। হাজার হোক, তোমার বাপ-মা নেই। তবে এখানে মেঝেতে বস—আর কোন কিছুই তো তোমার ভর সইবে না—আর তাছাড়া, মাথার উপরে ওখানে ঝুলে থাকলে তো তোমার সঙ্গে আমরা মিশতে পারব না ; তাই আমার [illegible] নীচে বস, তাহলেই ঐ

উঁচু টুলটার উপর উঠে আমি তোমার মুখোমুখি বসে গল্প করতে পারব।”

সে মেঝেতে বসে পড়ল। আমার দেওয়া চুরুট ধরিয়ে আমার লাল কম্বলটা গলায় জড়িয়ে নিল এবং আমার স্নানের গামলাটাকে উল্টো করে শিরস্ত্রাণের মত মাথায় চাপিয়ে নিজেকে একটি দেখবার মত আরামদায়ক জীব করে তুলল। তারপর হাঁটু দুটো ভেঙে তার মৌচাকের মত গর্তওয়ালা অদ্ভুত পায়ের পাতা দুটোকে গরম করবার জন্য আগুনের দিকে মেলে ধরল।

“তোমার পায়ের পাতা ও পায়ের পিছন দিকটা ও রকম গর্ত আর কাটা-কাটা কেন?”

“ও তো নারকীয় শীতের ফাটা—নিউয়েল-এর গোলাবাড়িতে বিশ্রাম করতে গিয়ে মাথার পিছন দিকটা পর্যন্ত সবটা শরীর ঐ ভাবে ফেটে গেছে। তবু জায়গাটা আমার খুব পছন্দ, লোকে যেমন নিজের পুরনো বাড়ি ভালবাসে, আমিও তেমনই ওই জায়গাটাকে ভালবাসি। সেখানে থেকে যে শান্তি পাই তেমন শান্তি আর কোথাও নেই।”

এইভাবে আধ-ঘণ্টা গল্প করবার পরে আমার মনে হল তাকে খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছে। সেও সেই কথাই বলল।

“ক্লান্ত? তা হবে। এবার তোমাকে সব কথা বলব, কারণ তুমি আমার সঙ্গে বড় ভাল ব্যবহার করেছ। রাস্তার ওপাশে যাদুঘরে যে “প্রস্তরীভূত মানুষ”টি আছে আমি তারই আত্মা। আমি “কার্ডিফ দানব”-এর ভূত। ওই দেহটিকে যতদিন কবর না দিচ্ছে ততদিন আমার বিশ্রাম নেই। মানুষ যাতে আমার এই মনোবাসনা পূরণ করে সে জন্য আমার কি করা স্বাভাবিক বল? ভয় দেখিয়ে তাদের এ কাজে বাধ্য করা—দেহটা যেখানে আছে সেখানেই ভর করা! তাই তো রাতের পর রাত আমি যাদুঘরের উপর ভর করেছি। অন্য সব ভূতদের সাহায্যই আমি পেয়েছি। কিন্তু তাতে কোন কাজ হল না। কারণ মাঝরাতে কেউ যাদুঘরে আসে না। তখন মনে হল, পথের মাঝখানে এসে এই জায়গাটাতে একটু ভর করলে মন্দ হয় না। মনে হল, আমার কথাগুলি যদি কাউকে শোনাতে পারি, তাহলেই কাজ ফতে করতে পারব, কারণ পরলোকে এসে আমি খুব ভাল সঙ্গীসাথী পেয়েছি। রাতের পর রাত আমরা এই ছাতা-পরা হল-ঘরের মধ্যে কাঁপতে কাঁপতে ঘুরে বেড়িয়েছি, পায়ের শিকল টেনে টেনে চলেছি, আর্তনাদ করেছি, ফিস্‌ফিস্‌ করে কথা বলেছি, সিঁড়ি দিয়ে উঠেছি আর নেমেছি, আর তাতেই বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। কিন্তু আজ রাতে যখন তোমার ঘরে আলো দেখতে পেলাম, তখন নতুন উদ্যম নিয়ে নবীন উৎসাহে কাজে নেমে পড়লাম। কিন্তু আমি বড় ক্লান্ত—শ্রান্তিতে একেবারেই ভেঙে পড়েছি। তোমাকে মিনতি করছি, আমাকে কিছুটা আশা দাও!”

উত্তেজনায় আমার আসন থেকে ছিটকে পড়ে আমি চেঁচিয়ে বলে

উঠলাম : "এ যে ভয়ংকর বাড়াবাড়ি ! এ রকমটা তো কখনও ঘটে নি ! আরে ভুল-সর্বস্ব বুড়ো জীবাশ্ম, তোমার সব পরিশ্রম যে জলে গেছে—তুমি তো ভর করেছ তোমার একটা প্লাস্টারের মূর্তির উপর—আসল "কার্ডিফ দানব" তো রয়েছে আলবানী-তে* ; এমন ভুলটা করলে তুমি ? তোমার নিজের দেহাবশেষকেও তুমি চেন না ?"

কারও মুখে এতখানি লজ্জা ও শোচনীয় অপমানের দৃষ্টি আমি আগে কখনও দেখি নি।

"প্রস্তরীভূত মানুষ"টা ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল , বলল :

"ঠিক করে বল তো, এ কথা সত্য ?"

"আমি যেমন এখানে বসে আছি সেইরকম সত্য !"

মুখ থেকে পাইপটা নিয়ে সে ম্যাণ্টেল-এর উপর রাখল, একমুহূর্ত ইতস্তত করল (পুরনো অভ্যাসমত নিজের অজ্ঞাতেই যেখানে পাতলুনের পকেট থাকবার কথা সেখানে হাত দুটো ঢুকিয়ে দিল) এবং শেষ পর্যন্ত বলল :

"দেখ, এত অদ্ভুত আমার কখনও লাগে নি। "প্রস্তরীভূত মানুষ" সবাইকে বিক্রি করেছে, কিন্তু এবার দেখছি তার নীচ ফাঁকিবাজী এতদূর নেমে গেছে যে শেষ পর্যন্ত সে নিজের প্রেতাত্মাকেও বিক্রি করে দিয়েছে। দেখ বাবা, আমার মত একটি অসহায় বন্ধুহীন প্রেতাত্মার জন্য তোমার হৃদয়ে যদি এতটুকু করুণা থাকে তাহলে আজকের এই ঘটনা কখনও প্রকাশ করো না। ভাব তো, নিজে যদি নিজেকে এভাবে বোকা বানাতে তাহলে তোমার মনের ভাবটা কি হত।"

তার রাজকীয় পদশব্দ এক ধাপ এক ধাপ করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে পরিত্যক্ত রাজপথে মিলিয়ে গেল। বেচারি ! সে চলে যাওয়াতে আমার দুঃখ হল—আরও দুঃখ হল এই জন্য যে সে আমার লাল কম্বল ও স্নানের গামলাটাও সঙ্গে নিয়ে গেছে।

A Ghost Story—Mark Twain

আগেই বলে রাখা ভাল যে আমি কোন ভূতের গল্প বলছি না আপনাদের কাছে। আমি নিজেই যে ভূত আছে বলে বিশ্বাস করি না। আমার কথা

---

*এটা ঘটনা। মূল নকল মূর্তিটা থেকে সুকৌশলে আর একটা নকল মূর্তি তৈরি করে সেটাকেই "একমাত্র আসল" কার্ডিফ-দানব হিসাবে নিউ ইয়র্ক-এ প্রদর্শিত হয়েছিল, আর ঠিক [illegible] আলবানী-র যাত্ঘরেও সে মূর্তি প্রচুর দর্শক আকর্ষণ [illegible]

মনে ভাবছেন—কি বলে লোকটা। ভূতের গল্প বলছে অথচ ভূত যে আছে তা বিশ্বাস করে না। বেশ তবে শুনুন গল্পটা।

এই গল্পের শুরু বন্দর নগরী লাসস্পেজিয়াতে।

বড় অদ্ভুতভাবে মিউজিয়মে কাঠের তৈরি একটি নারীমূর্তি স্থান পায়।

কাঠের তৈরি এই অষ্টাদশী নগরের সকলেরই কৌতূহলের বস্তু। এই এই মূর্তিটিরই নাম এ্যাটলাণ্টা। এ্যাটলাণ্টা কিন্তু ইটালীর তৈরি নয়। কোন এক জাহাজ একে নিয়ে আসে এই বন্দরে।

এই মিউজিয়মের কিউরেটর যুবক পল স্মিথ কিন্তু ভালবাসে এই এ্যাটলাণ্টাকে। তাকে ছাড়া যুবকের চলে না—সে যেন তার ধ্যান জ্ঞান। বন্ধুরা তাকে এ নিয়ে ঠাট্টা করে, কিন্তু সরলপ্রাণ স্মিথ-এর সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই।

অনেকে অনেকভাবে লেখার বিষয়বস্তু সংগ্রহ করে কিন্তু আমার সংগ্রহের লক্ষ বস্তু ছিল মিউজিয়ম। সেখানে আমি নিয়মিত যেতাম, তাই স্বাভাবিক কারণেই স্মিথ আমার বিশেষ পরিচিত। আমি অবাক হয়ে দেখতাম স্মিথ সেই কাঠের তৈরি সুন্দরীর দিকে একমনে তাকিয়ে আছে—যেন পলক পড়ছে না।

একদিন তাঁর কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। বললাম, বন্ধু, সবসময় একাগ্রচিত্তে কি দেখেন বলবেন কি? অনেকদিন থেকেই দেখছি, আজ আর কৌতূহল দমন করতে পারলাম না, তাই জিজ্ঞাসা করছি। কি পেয়েছেন এর মধ্যে? একটা কাঠের পুতুল বৈ তো নয়। মানছি দেখতে খুবই সুন্দরী—তম্বী তরুণী।

মিঃ স্মিথ বললেন, জানেন, সকলে ভাবে হয় আমি পাগল, আর তা না হলে জানেন, আমি সব জানতে পারি। আজ থেকে অনেকদিন আগে যা ঘটেছে তা সব আমার জানা।

আমি অবিশ্বাসের ভাব দেখাই।

মিঃ স্মিথ বলেন, আপনি ভাবছেন, এ আবার কোন পাগলের পাল্লায় পড়লাম। কিন্তু আমার কথা বিশ্বাস করতে পারেন। শুনুন আমার অতীত কাহিনী।

সে আজ থেকে অনেকদিন আগেকার কথা। ১৩ই অক্টোবর ১৭৭৪ সন। সবে বিয়ে করেছি, নবযৌবনা সুন্দরী বউ পেলে একজন যুবকের যে অবস্থা হয়। আনন্দে, খুশিতে হাবুডুবু খাচ্ছি আমি আর সেই সঙ্গে আমার বউও—নাম তার এ্যাটলাণ্টা।

বিয়ের কয়েক মাস পরেই সমুদ্রযাত্রায় বেরিয়ে পড়লাম দুজনে। চলতে চলতে এসে পড়লাম পারস্য উপসাগরের তীরে। সেখানেই ঘটলো মর্মান্তিক ঘটনা। ভগবান বুঝি বে[illegible] কপালে।

সমুদ্রে ঘুরতে ঘুরতে [illegible] উঠেছিলাম। তাই বনপথ

দিয়ে দুজনে হাত ধরাধরি করে হাঁটছিলাম।

হঠাৎ চীৎকার করে উঠলো এ্যাটলান্টা। কিছু বোঝবার আগেই পড়ে গেল মাটিতে।

আমার তখন সাধারণ বুদ্ধি লোপ পেয়েছে। নিজেকে সামলে নিয়ে চেয়ে দেখি সব শেষ। এ্যাটলান্টা আমাকে ছেড়ে চিরজীবনের মত চলে গেছে।

আমি ওকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে অনেক কাঁদলাম। কিন্তু কাঁদলেই তো আর মৃত মানুষ ফিরে আসে না। আমার এ্যাটলান্টাও আর ফিরে এল না।

এ্যাটলান্টাকে নিয়ে দেশের দিকে রওনা হলাম। মিশরে গিয়ে তার কাঠের মমি তৈরি করে ফিরে আসি এখানে। তারপর আবার জন্ম নিয়ে আমি হয়েছি পল স্মিথ। এইভাবেই নতুন নতুন জন্ম নিয়ে আমার এ্যাটলান্টাকে আগলে রাখি। তাকে না দেখে, আমি থাকতে পারি না। আপনিই বলুন, লোকে কি বললো তাতে আমার কি যায় আসে? আমি যে তার কথা শুনতে পাই, তার সঙ্গে কথা বলি নির্জনে।

আমি ভাবি, তাও কি সম্ভব? পল স্মিথ যা বললেন, তা কি বিশ্বাসযোগ্য?

একমনে এইসব ভাবছি এমন সময় আমারই চোখের সামনে দেখলাম পল স্মিথ আর রক্ত মাংসে গড়া শরীরী মানুষ নেই—সে হয়ে উঠেছে বীভৎস এক কঙ্কাল। সেই কঙ্কাল হাসছে। প্রাণ খুলে হাসছে!

কিন্তু একি? সেই এ্যাটলান্টার কাঠের মূর্তির ঠোঁটেও দেখা দিয়েছে হাসি। হাসছে সে। দেখতে দেখতে সেই কাঠের মূর্তি এক সুন্দরী নারীর রূপ ধরে কাঁচের বাক্স থেকে বেরিয়ে এসে মিঃ স্মিথের কঙ্কালকে জড়িয়ে ধরে উন্মত্ত হয়ে ওঠে দুজনে।

The skeleton—Alfred Hitchcock

॥ সমাপ্ত ॥